সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে

(সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধসংগ্রহ)

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভূমিকা

দীর্ঘকাল ধরিয়া বিভিন্ন উপলক্ষ্যে লেখা ও বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত আমার প্রবন্ধগুলি একত্র সংগৃহীত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী সাহিত্যবিষয়ক; দ্বিতীয়, ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক।

উভয় জাতীয় প্রবন্ধসমূহের একত্র সন্নিবেশ হয়ত অনেকের নিকট বিসদৃশ মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস-মত উহাদের সম্পর্ক এরূপ অবিচ্ছেদ্য যে, উভয়কে একই অনুভবের দ্বৈত প্রকাশ রূপে গ্রহণ করিলেই উহাদের যথার্থ স্বরূপটি ব্যক্ত হইতে পারে। বাঙলাদেশের প্রাক্-আধুনিক যুগে সাহিত্যরস ও ধর্মচেতনার দ্বারা পুষ্ট হইয়া উহার বিশিষ্ট-সংস্কৃতি বা সামগ্রিক জীবনবোধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সাহিত্যের উদার আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যসৃষ্টি যখন জাতির মর্মমূলে দৃঢ়বদ্ধ হয় তখনই উহা জাতীয় রুচি, জীবনচর্চা ও অধ্যাত্ম সংস্কার রূপে পরিণতি লাভ করে। বাঙলাদেশে সাহিত্যে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল, জীবনে তাহাই দৃঢ় অবলম্বন রূপে গৃহীত ও অনুশীলিত হইয়াছিল। সাহিত্য-প্রেরণা ধর্মপ্রেরণার সহিত যুক্ত হইয়া জাতীয় জীবনে এক বলিষ্ঠ, আদর্শে স্থির, প্রাত্যহিক চিন্তা-কর্মের মধ্যে প্রতিফলিত প্রত্যয়-ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছিল। কাব্যে পরিবেশিত অমৃত জাতির প্রতিদিনকার পানীয় রূপে জীবনকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও প্রাণোচ্ছল করিয়া তুলিয়াছিল। কাব্যের বাণী পুঁথির জীর্ণপত্র হইতে জীবনের সবুজ পত্রে শিকড় গাড়িয়া জীবনকে স্নিগ্ধ ছায়ার আশ্রয় দিয়াছিল।

আধুনিক যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে যে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে তাহারই ফলে জীবন লক্ষ্যহারা উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছে। আমরা সাহিত্যসৃষ্টি ও সৌন্দর্যচর্চা করিতেছি; কিন্তু উহা আমাদের জীবন-সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিতেছে না। সাহিত্যসৌন্দর্য জীবনসংসর্গ-বঞ্চিত হইয়া সংস্কৃতির উন্নয়নে প্রভাবহীন হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যজগৎ জীবন হইতে উপাদান গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু জীবনকে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিদান ফিরাইয়া দিতেছে না। জীবনের বিশৃঙ্খলা সাহিত্যে পুনরাবৃত্ত;

কিন্তু সাহিত্যের উদার সুষমা জীবনে প্রবেশাধিকার পাইতেছে না। সাহিত্য ও সংস্কৃতি সুস্থ জাতীয় প্রাণের যুগ্ম বিকাশ; উভয়ের যোগসূত্রচ্ছেদ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। আমি এই সংযোগে একান্ত বিশ্বাসী বলিয়াই উভয় বিষয়ের একত্র সন্নিবেশে কোনও অসঙ্গতি লক্ষ্য করি নাই। তাই সাহিত্য ও সংস্কৃতির গঙ্গা-যমুনাধারা যে পবিত্র তীর্থসঙ্গমে মিশিয়াছে, সেই পুণ্যতীর্থে অবগাহনের আহ্বান জানাইয়াই এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিলাম। যদি কোন সহৃদয় পাঠকের এই তীর্থস্নান করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে তবে সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিষয়		পত্রাঙ্ক

[সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি]

সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে

সাহিত্য

[প্রাচীন ও মধ্যযুগ]

বাঙলার শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনা

(১)

বাঙলা দেশের ধর্ম ও সাহিত্যে যে দুইটি প্রধান ধারা বহু শতাব্দী ধরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাদের কাব্য-অভিব্যক্তিতে একটি বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। মঙ্গলকাব্যগুলিতে শক্তি-পূজার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা অনেকটা বহিরঙ্গমূলক; তাহাতে আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের বাহুল্য ও ভক্তের পূজা করিবার যে আগ্রহ তাহা অপেক্ষা দেবতার পূজা পাইবার লোভ প্রবলতর। পূজার উদ্দেশ্যও সাংসারিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও প্রলোভনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে সাধনার যে গভীর, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অন্তরঙ্গ আত্মনিবেদনের মাধুর্য আছে, মঙ্গলকাব্যের শক্তি-পূজায় ভক্তি তাহার তুলনায় অনেকটা নিম্নস্তরের—সাহিত্যিক গুণেও উভয়ের মধ্যে অনেকটা তারতম্য। আখ্যান-কবিতায় বাস্তব-প্রতিবেশ-চিত্র ও ঘটনা-বিবৃতিই বিশুদ্ধ ভাবাবেগ অপেক্ষা প্রধান। কিন্তু ক্রমশঃ বৈষ্ণব সাধনার অন্তরঙ্গ সুর ও বিগলিত ভাবাবেশ-মাধুর্য শাক্ত কাব্যেও সংক্রামিত হইল—দেবীর স্তব-স্তুতির মধ্যে ভক্তের আত্মসমর্পণ ও একান্ত নির্ভরের ভাবটি বৈষ্ণব কবিতার প্রভাবের ফল-স্বরূপ ফুটিয়া উঠিল। তারপর সপ্তদশ শতক হইতে বৈষ্ণব কবিতা ক্রমশঃ নিজ প্রাণশক্তি হারাইয়া গতানুগতিক ভাষা ও ভাবের কৃত্রিম বন্ধনে বাঁধা পড়িল। ইহার অলঙ্কার ভক্ত-হৃদয়ের অনুভূতিকে ছাপাইয়া উঠিল। যে অনুপাতে বৈষ্ণব কবিতায় ভাঁটা পড়িল, ঠিক সেই অনুপাতেই শাক্ত কবিতা জোয়ারের পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। শীর্ণ ধমনী হইতে রক্তধারা পুষ্ট শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল। পূর্ণিমা-প্রভাতে যেমন ম্লানায়মান চন্দ্রমণ্ডলের চারিদিকে উদয়োন্মুখ সূর্যের রক্তিম আভা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সেইরূপ বাঙলার সাহিত্যাকাশে বৈষ্ণব কবিতার পূর্ণচন্দ্র অস্তাচলে হেলিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত সাধনার সৌরকরজাল প্রখর হইয়া উঠিল। বাংলা সাহিত্যে শক্তিকেন্দ্র ও প্রাণস্পন্দনে আধার স্থানান্তরিত হইল। এই পরিবর্তনের ক্রমস্ফুরিত ইঙ্গিত ও বিক্ষিপ্ত ধারাগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে রামপ্রসাদের সাধনায় ও গানে।

মনে হয় যে, এই পরিবর্তনের পিছনে বাঙলার সমাজ ও পরিবার-জীবনও সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর অলৌকিক রস, রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-লীলার নিগূঢ় সাধনা, ভগবানকে কান্তরূপে উপলব্ধি করিবার অসামান্য অনুভূতি ক্রমশঃ সমাজ-জীবনের বাস্তব সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিল। বাঙলার সমাজ-ব্যবস্থা যতই দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিল, ইহার স্বাধীন প্রেম-চর্চার, ইহার অসামাজিক হৃদয়-বৃত্তির অনুশীলনের অবসর ততই সঙ্কুচিত হইয়া আসিল—ইহার মধ্যে অভাবনীয়ের আবির্ভাবের রন্ধ্র-পথগুলিও সেই পরিমাণে রুদ্ধ হইল। শুধু স্মৃতি, অধ্যাত্মসাধনা ও সাহিত্যিক প্রতিচ্ছবির ভিতর দিয়া পরকীয়া প্রেমের নিগূঢ়, মর্মদাহী আনন্দ ও তীব্র ভাবোচ্ছ্বাস বেশীদিন আস্বাদ করা যায় না—পুঁথির সঙ্গে বাস্তব জীবনের সংযোগ-সূত্রটি ছিন্ন হইলে জীবন-প্রবাহিত রসধারা পুঁথির কল্পনা-বিলাসের মধ্যে নূতন সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিতে পারে না। চণ্ডীদাস ও রামীর মধ্যে পাগল-করা প্রেমের সম্পর্কের কিংবদন্তী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না; তবে ইহার সাঙ্কেতিক তাৎপর্যটির যাথার্থ্য অস্বীকার করা অসম্ভব। এই প্রেম-কাহিনী চণ্ডীদাসের অনুপম প্রেম-কবিতাগুলির অপরিহার্য ভূমিকা—জীবনের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে তাঁহার পদাবলীর আকুল, আন্তরিকতার হৃদয়-গলানো সুরের অন্ত উৎসমুখ আবিষ্কার করা দুরূহ। এই কিংবদন্তীতে অন্তত: এইটুকু প্রমাণ করে যে, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিতা শুধু অনাবিল ভক্তি ও ঐতিহ্যের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ছাড়াও কবির জীবন-উৎসারিত গভীর উপলব্ধির অপেক্ষা রাখে। এই উপলব্ধি অতি মাত্রায় সংযত ও শৃঙ্খলিত সমাজ-জীবনে ক্রমশঃ অধিকতর দুর্লভ ও অনধিগম্য হইয়া উঠিতে লাগিল। রঘুনন্দনের কঠোর অনুশাসনের উদ্যত দণ্ড ব্রজবাঁশরীর অনেকগুলি সুরকেই স্তব্ধ করিয়া দিল। বাঙালী জীবনের বাস্তব প্রতিবেশে চির-কিশোর-কিশোরীর অপরূপ প্রেমলীলার প্রতিচ্ছবি ক্রমেই সুদূর ও অস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

বাঙালী কবির স্মৃতিপট ও হৃদয়ানুভূতি হইতে আদর্শ প্রেমিকার ছবি ম্লান হইয়া তাহার পার্শ্বে মহিমময়ী মাতৃমূর্তি উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিল। পারিবারিক কেন্দ্র প্রণয়িনী হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জননীতে সংলগ্ন হইল। সমাজের প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার তরুণ জীবনের অসম্ভব, অবাস্তব কল্পনা, তাহার প্রণয়ের মোহাবেশ, তাহার হৃদয়াবেগের সীমালঙ্ঘী প্রসার, তাহার অভিসার-যাত্রার অসীম আকূতি সঙ্কুচিত

হইয়া বাস্তব জীবনের সহজ সম্ভাব্যতার পরিধির মধ্যে সুস্থির হইল। মা ও সন্তানের সম্পর্কের স্বভাব-মাধুর্য, প্রতিদিনকার সংসার-নাট্যে অভিনীত মান-অভিমান, আদর-আব্দার, সোহাগের পরিমাণ লইয়া কপট অনুযোগের পালা, তাড়নার মধ্যে মাতৃস্নেহের পরিচয়-লাভ ও একান্ত আত্মসমর্পণ—এই সমস্ত অতি-পরিচিত ভাব ও ঘাত-প্রতিঘাতগুলি এক নূতন অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্র রচনা করিল, শক্তি-পূজার মধ্যে এক উষ্ণ জীবন-স্রোত ও ভাবগভীরতার সঞ্চার করিল। তন্ত্র-সাধনার ফলে বাঙালীর মনে মাতৃপূজার প্রেরণা নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ হইল। বঁধুর বাধা নিষেধ-কণ্টকিত, অন্তরের গহন তলে নিরুদ্ধ প্রেমের পরিবর্তে উচ্চকণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত মাতৃনাম দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিল। সুনিয়ন্ত্রিত বাঙালী পরিবারের মত, বাঙলা ধর্ম-জীবনেও প্রণয়িনী অন্তরালবর্তিনী হইয়া মাতার জগদ্ধাত্রী মূর্তির, তাঁহার সস্নেহ অভিভাবকত্বের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইল। বাঙালীর চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুলতার সহিত বৃন্দাবন-পরিক্রমা ত্যাগ করিয়া, প্রেম-সায়রে লীলা-বিহারে ক্লান্ত হইয়া, কালী-মন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে ভবরত্নাকরের অগাধ জলে নিঃসংশয় নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সহিত ডুব দিল।

ভক্তির এই আধার-পরিবর্তনের পিছনে পরিবারকেন্দ্র-বিচলন ছাড়াও রুচি ও রসবোধের প্রেরণা ছিল। বহুদিন ধরিয়া অবিমিশ্র মধুর রসের আস্বাদন জন-সাধারণের মনে তীক্ষ্ণতর রসের উপভোগের দ্বারা স্বাদ-বৈচিত্র্যের স্পৃহা জাগাইয়া-ছিল। তাছাড়া চৈতন্যদেবের তিরোভাবের দুই শতাব্দী পরে বৈষ্ণবধর্মের সামাজিক প্রতিষ্ঠারও কতকটা হ্রাস হইয়াছিল। সহজিয়া সম্প্রদায়ের হাতে ইহার বিকৃতি ও অপপ্রয়োগ যে কিয়দংশে ইহার জন্য দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। মনে হয় যেন এই সময় বৈষ্ণবধর্মাবলম্বিগণ কতকটা সমাজ-প্রতিকূলতার জন্য ও কতকটা নির্জন সাধনার সুবিধার জন্য সমাজের কেন্দ্রস্থল পরিত্যাগ করিয়া ইহার সীমান্ত-দেশে স্থান গ্রহণ করিতেছিলেন। "বেদ বিধি ছাড়া ত যা বৈরাগী-পাড়া" এই বহু প্রচলিত ছড়ার মধ্যে উচ্চ বর্ণের অবজ্ঞা ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কেন্দ্রচ্যুতির ইঙ্গিতটি নিহিত আছে। এতদ্ব্যতীত শক্তি-পূজার ক্রমবর্ধমান আড়ম্বর ও উৎসব-সমারোহ সাধারণ লোকের চিত্তকে অনিবার্যভাবে ইহার দিকে আকৃষ্ট করিতেছিল। সমাজের অভিজাত-সম্প্রদায় ও ক্ষমতাশালী ভূম্যধিকারীবর্গ বৈষ্ণবধর্মের নিরীহ শান্তিপ্রিয়তার মধ্যে নিজ উচ্চাভিলাষ ও অধিকার-স্পৃহার যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাইতেছিলেন না বলিয়াই শাক্ত আরাধনার দিকেই ঝুঁকিতেছিলেন। বিশেষতঃ উপচার-

বহুল মহামায়ার অর্চনার মাধ্যমেই তাঁহারা তাঁহাদের নবার্জিত ঐশ্বর্য ও নেতৃত্ব-শক্তির সাড়ম্বর প্রচারের অধিক সুবিধা পাইলেন। যেমন শারদীয়া পূজার জাঁকজমক ও আতিথেয়তা ও লোকরঞ্জনের আয়োজন-প্রাচুর্য দোল-রাস-ঝুলন প্রভৃতি বৈষ্ণব উৎসবসমূহের পরিমিত ও সাত্ত্বিকভাবপ্রধান অনুষ্ঠানের আকর্ষণ মন্দীভূত করিয়া দিল, সেইরূপ কয়েকটি নিষ্ঠাবান পরিবাব ব্যতীত অন্য সর্বত্রই শাক্তধর্মের জনপ্রিয়তা বৈষ্ণবধর্মের মানকে অতিক্রম করিয়া গেল। ভোগ ও প্রসাদের উপকরণ-বৈচিত্র্যও এই জনপ্রিয়তা-বর্ধনে কম সহায়তা করে নাই—রসনার তৃপ্তি ভক্তির আবেশকে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছিল। বৈষ্ণবের সাত্ত্বিক, নিরামিষ আহার অপেক্ষা শাক্তের মদ্য-মাংসের উপচার সাধারণ লোকের ভোগ-স্পৃহাকে প্রবল-ভাবে উদ্রিক্ত করিয়া অনেক হরি-ভক্তকেও শক্তিপূজার উৎসাহী সমর্থকে পরি-বর্তিত করিয়াছিল। এইভাবে সর্বত্রই মাতৃপূজার একটা বিপুল প্রেরণা অনুভূত হইতেছিল। পরিবার-জীবনে যে মাতার কল্যাণময় প্রভাব জীবনের নিয়ন্ত্রণে ও সংসার-শৃঙ্খলা-রক্ষায় আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তাহাই অধ্যাত্মজীবনে, দুর্গা-কালী-অন্নপূর্ণা প্রভৃতির লোক-পালিকা মূর্তিতে, চণ্ডীর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিষ্ঠাত্রী নিখিল-কেন্দ্র-শক্তিরূপে, ভক্ত-হৃদয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিমার সিংহাসন পাতিয়া বসিল। গৃহাঙ্গনের তুলসী-মঞ্চে প্রজ্বলিত মিট্‌মিটে স্নিগ্ধ দীপটির ন্যায়ই হরির নৈর্ব্যক্তিক প্রভাব আমাদের প্রাত্যহিক ঘর-কন্নার কাজে জাগিয়া রহিল; কিন্তু উৎসবের উত্তেজনা ও বর্ণ-সমারোহে প্রখরতর-ব্যক্তিত্বসম্পন্না মাতৃশক্তি আমাদের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক দুঃসাহসিকতার অভিযান পথে "মেঘরন্ধ্রচ্যুত জ্বলদর্চি—রেখার" ন্যায় চোখ-ধাঁধানো, অগ্নিময় সঙ্কেত বিকীর্ণ করিয়া চলিল।

(২)

এই প্রবহমান পরিবর্তন-স্রোতের সূর্য-করোদ্ভাসিত তরঙ্গ-শীর্ষ হইতেছেন সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ। তাঁহার সাধনায় ও গানে এই আন্দোলনের সমস্ত গতি-বেগ, সমস্ত মহনীয় সম্ভাবনা, সমস্ত আত্মবিশুদ্ধি ও অধ্যাত্ম-মুক্তি-প্রেরণার চরম উৎকর্ষ ও পরিণতি মূর্ত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যে শক্তিপূজার যে বিকৃত ঔদ্ধত্য, যে অশোভন আত্মপ্রচার-প্রবণতা দেখা যায়, রামপ্রসাদে তাহার বিশুদ্ধ, অকৃত্রিম ভাব-রূপটি পরিস্ফুট। তিনি অভ্রান্ত অনুভূতিবলে ইহার বিধি ও উপকরণের বস্তু-বাহুল্য হইতে ইহার খাঁটি ভক্তিরস-নির্যাসটি বিবিক্ত করিয়া লইয়াছেন। যেমন বসন্তে নবপল্লব-সমারোহের মধ্যে একটিমাত্র কোকিলের কণ্ঠস্বর ইহার মর্মবাণীর

অভিব্যক্তি, যেমন দিগন্তপুঞ্জিত জলভরা মেঘের ভিতর একটি বিদ্যুৎচমক বর্ষার স্বরূপের পরিচয়, তেমনি দুরূহ তন্ত্রসাধনার বিবিধ বিধিনিষেধ-প্রক্রিয়া-পদ্ধতির জটিলজালে বন্দী অধ্যাত্মরহস্যটিকে রামপ্রসাদ তাঁহার হৃদয়-গলানো, প্রাণমাতানো 'মা মা' ধ্বনির মধ্য দিয়া মুক্তি দিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে যেমন গোষ্ঠবিষয়ক পদসমূহের মধ্যে যশোদার হৃদয়মথিত বাৎসল্যরস ক্ষরিত হইয়াছে, রামপ্রসাদের সঙ্গীতে ঠিক তাহারই উল্টা দিক—মাতৃস্নেহপিয়াসী সন্তানের ব্যাকুল আর্তি ও অনুযোগ প্রকাশলাভ করিয়াছে। এই দুই রকম গানে মা ও ছেলের স্নেহ সম্পর্কটির দুই বিপরীত দিক মর্মস্পর্শী আন্তরিকতার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবপদে মায়ের জবানী, শক্তিপদে ছেলের প্রত্যুত্তর। যশোদা জগদীশ্বরকে নিতান্ত অসহায় শিশুরূপে কল্পনা করিয়া নিজের স্নেহাঞ্চলের আবরণে তাঁহাকে সমস্ত অসুবিধা-বিপদ হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। রামপ্রসাদ জগদীশ্বরীকে অসীম শক্তিশালিনী জানিয়া সাধনা ও ভক্তির দাবীতে তাঁহার এই শক্তিরহস্যের চাবিটি হস্তগত করার প্রার্থী। বৈষ্ণব কবি ভগবৎ-মহিমা সম্বন্ধে অজ্ঞত্বের ভান করিয়াছেন; তাঁহার পদে বাৎসল্যরসের ছদ্মবেশের মধ্যে অপৌরুষেয় শক্তির অনুভবের ব্যঞ্জনা নাই। শাক্ত কবি এই মহিমা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিয়াও ভালবাসার অসমসাহসিকতায় তাহার সঙ্গে সমান অধিকার ও মর্যাদার দাবী করিয়াছেন। একজন চোখের জল ফেলিয়াছেন, অহেতুক আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়াছেন, নানা অমঙ্গল কল্পনা করিয়া উদ্বেগের কশাঘাতে স্নেহের বক্ষস্পন্দন দ্রুততর করিয়াছেন। আর একজন চোখ রাঙ্গাইয়া, ধমক দিয়া, অনুযোগ-অভিমান করিয়া সর্বৈশ্বর্যময়ী মায়ের ঐশ্বর্যের অংশ জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছেন। একের ব্যাকুল অনুনয় ও অপরের স্পর্ধিত অধিকার-প্রয়োগ—এই দুই-এর মধ্যে একই রহস্যের লীলা, একই ভাবের দুইমুখো বিকাশ। ইহাদের মধ্যে শাক্ত-বৈষ্ণব সাধনারীতির আপাত-বৈপরীত্যের মধ্যে আসল সাম্যটি চমৎকারভাবে উদাহৃত হইয়াছে। এই উভয় সম্প্রদায়ের ছদ্ম কলহের মধ্যে শ্যাম-শ্যামার অভিন্নত্ব উভয়ের নিকটই প্রতিভাসিত—রামপ্রসাদ বৈষ্ণব কবির ভাবভাণ্ডার হইতে দেব ও মানবের মধ্যে এই অন্তরঙ্গতার স্পর্শটুকু আহরণ করিয়া তাহারই স্নিগ্ধ চন্দনপ্রলেপে তাঁহার ভয়ঙ্করী, শ্মশানচারিণী মাতার অঙ্গরাগ সাধন করিয়াছেন।

রামপ্রসাদ গান গাহিয়াছেন, কবিতা রচনা করেন নাই। তাঁহার অন্তরের নিবিড়, পরিপূর্ণ অনুভূতি স্বতঃউৎসারিত হইয়া গানের ক্ষুদ্র পাত্রে উপচাইয়া

পড়িয়াছে; পাত্রের কারুকার্য বা শিল্পকলাকৌশল সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাঁহার এই গানগুলি সংখ্যায় অল্প, আভরণে রিক্ত। কিন্তু অন্তরের সম্পদ যদি কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হয় তবে রামপ্রসাদের অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠতর কবিতা রচনা করেন নাই। মনে হয় যেন তাঁহার অধ্যাত্ম উপলব্ধি কাব্যকলার হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়া নিজের ভাবে নিজেই বিভোর হইয়া শিশুর কলকাকলীর ন্যায় এক নূতন স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গীতে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। তাঁহার ভাষা ভাবের একান্ত অধীন; তাঁহার শব্দচয়ন অর্থগৌরবের সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ ভৃত্য। প্রভুর আদেশ পালন করা ছাড়া তাহাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা উচ্চাভিলাষ নাই। এ যেন রামের পাদুকা শিরোধার্য করিয়া ভরতের রাজ্যশাসন। তাঁহার গানে উপমার অসদ্ভাব নাই। কিন্তু সে উপমা অভিজাতবংশীয় নহে, অতি সাধারণ জীবনযাত্রার উপাদানমাত্র। সংসার-চক্রের আবর্তন-পথে তিনি যে সমস্ত বস্তু বা কাজ লক্ষ্য করিয়াছেন তাহারাই তাঁহার অধ্যাত্ম-ভাব-মণ্ডলে পরিপ্লুত হইয়া, তাঁহার অন্তর অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। চাষের কাজ, বেড়া বাঁধা, কলুর বলদের চোখে ঠুলি দিয়া ঘানিকাষ্ঠের চারিদিকে ঘোরা, জেলের মাছ ধরা, বাজীকরের খেলা, ঘুড়ি ওড়ান, জমিদার-প্রজার সম্বন্ধ ইত্যাদি বাঙালীর পল্লীজীবনের অতি পরিচিত দৃশ্য ও ভাবগুলি তাঁহার গানে রূপক-গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার সাধকজীবনের ভাবতন্ময়তার মায়াসৌধের আশ্রয়-স্তম্ভ রচনা করিয়াছে। বাঙলার প্রতিদিনকার কাজ ও খেলা, শ্রম ও বিরাম, তাহার জীবনযাত্রার তুচ্ছ, ক্ষুদ্র উপকরণগুলি এক গহন, রহস্যময় সাধনার অঙ্গীভূত হইয়া অভিনব অর্থদ্যোতনায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের বহু পূর্বে সীমার মাঝে অসীম আপনার সুর প্রকটিত করিয়াছে।

(৩)

সাধারণতঃ যে সমস্ত কবি তর্কবুদ্ধির অতীত মর্মরহস্যের কথা আলোচনা করেন, তাঁহাদের সঙ্গে রামপ্রসাদের একটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য আছে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ফুটাইতে চর্যাপদের কবিগোষ্ঠী হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই একরকমের না একরকমের সন্ধ্যাভাষা-প্রয়োগে একটি ভাবমণ্ডল রচনা করেন; এবং ইহারই সূক্ষ্ম প্রতিধ্বনিময় প্রতিবেশে, আভাস-ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনার অর্ধস্ফুট অস্পষ্টতায় অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পান। রামপ্রসাদের মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতার লেশমাত্র নাই। তাঁহার নিকট রহস্যের অবগুণ্ঠন ছিন্ন হইয়া

পরম সত্যের জ্যোতির্ময় সত্তা স্বচ্ছ সুস্পষ্টতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। চোখে দেখা প্রত্যক্ষ, ব্যবহারিক ঘটনা সম্বন্ধেও যেরূপ অকুণ্ঠিত আত্মপ্রত্যয়ের সহিত বলা কঠিন, রামপ্রসাদ তাহাই নিঃশঙ্কচিত্তে ভাবরাজ্যের গহন অনুভূতি সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অন্ধের ভীরু হস্তসঞ্চালন নাই, সংশয়-কুণ্ঠিত চিত্তের সাবধান পদক্ষেপ নাই, দার্শনিক গোলকধাঁধায় পথভ্রান্ত অনুসন্ধানীর শব্দজাল-কুহেলিকায় অর্ধোপলব্ধ সত্যবিকৃতির কোন চেষ্টা নাই। তাহার কারণ যে, এই সত্য কল্পনার প্রদোষালোকে নহে, নিঃসংশয় উপলব্ধির উজ্জ্বল সূর্য-কিরণে কবির চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছে। এই নির্ভীক, অকুণ্ঠিত অভিব্যক্তি ধর্মসাধনার কাব্যরূপায়ণের ইতিহাসে খুব বিরল ব্যতিক্রম এবং ইহা রামপ্রসাদের সাধনার অনন্যসাধারণ উৎকর্ষই সূচিত করে।

সাধারণ গান ও সুরের যে সম্বন্ধ রামপ্রসাদী গান ও রামপ্রসাদী সুরের মধ্যে তাহা আরও ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য। এই সুরের মধ্যে বৈরাগ্যের উদাস-করা ব্যঞ্জনা মাখানো আছে। যেমন পালকের সাহায্যে তীর অভ্রান্ত সরলরেখায় লক্ষ্যের দিকে চালিত হয়, তেমনি এই বৈরাগ্যরসাপ্লুত সুরের সাহায্যে রামপ্রসাদের অনুভূত সত্য শ্রোতার মর্মমূল ভেদ করে। এই সুর এই গানের অপরিহার্য বহির্বেশ ও ভাব-রূপায়ণ। রামপ্রসাদ একদিকে যেমন কাব্যোচিত উপমা-অলঙ্করণের বহিরাভরণ বর্জন করিয়াছেন, তেমনি অভিজাত সুরের সূক্ষ্ম, জটিল কলাকৌশলও পরিহার করিয়াছেন। এ সুর আয়ত্ত করিতে দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন হয় না, রাগরাগিণীর ব্যূহভেদের উপযোগী শিক্ষিত-পটুত্ব অর্জন করিতে হয় না। ভক্তি মাত্র সম্বল করিয়া, চক্ষে অশ্রুজল ও কণ্ঠে কিঞ্চিৎ আবেগ-কম্পনের স্পর্শ লইয়াই এ গান গাওয়া যায়। তাই আজও বাঙলার পল্লী অঞ্চলে সর্বস্তরের লোকের কণ্ঠেই এই সরল, মর্মস্পর্শী সুর ধ্বনিত হইতে শোনা যায়। কর্মের ফাঁকে ফাঁকে, বিরল বিশ্রামের অবসরে এই গান গীত হইয়া বাঙলার পল্লীপ্রকৃতির আকাশ-বাতাসকে এক অপরূপ ভাব-ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। বাঙলার সাধারণ লোকের চিত্তবৃত্তি যে রামপ্রসাদী সঙ্গীতের দ্বারা বহুলাংশে গঠিত হইয়াছে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। আর কোনও দেশে কবিতার প্রভাব এরূপ বদ্ধমূল ও সুদূরপ্রসারী হইয়াছে কি-না সন্দেহ।

কেহ কেহ রামপ্রসাদকে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই অভিযোগের খণ্ডন তাঁহার গানের মধ্যেই পাওয়া যায়। তিনি কালীকীর্তন

ও কৃষ্ণকীর্তন এই উভয়বিধ গানই রচনা করিয়াছেন। 'কালী হলি মা রাসবিহারী,' 'যেই শ্যাম সেই শ্যামা,' "ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেশী" ইত্যাদি সঙ্গীতগুলিতে রামপ্রসাদের সমন্বয়মূলক মনোভাবই অভিব্যক্ত হইয়াছে। যিনি সাধনার গভীরতম স্তরে অবতরণ করিয়াছিলেন, পরম অধ্যাত্ম সত্য যাঁহার স্ফটিকস্বচ্ছ দৃষ্টির সম্মুখে অনবগুণ্ঠিত হইয়াছে, যিনি ঐশী শক্তির সহিত একেবারে ব্যক্তিগত সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আরোপ যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ভূত ইহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বৈষ্ণব সাধনার মন্ত্র-রহস্য আয়ত্ত করিয়া তিনি ইহা শক্তিপূজায় সার্থকভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ইহাতেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রের রাখীবন্ধন বাঁধিয়াছেন।

আজ রামপ্রসাদের অন্তর্মুখী সাধনা হইতে আমরা বহু দূরে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছি। আদর্শভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত বাঙালী কি আর রামপ্রসাদের সাধনা ও আত্মনিবেদনের হারানো সুরটি ফিরিয়া পাইবে? তপঃক্লিষ্ট সাধকের মনে মাঝে মধ্যে দৈবী মায়ার প্রভাবে যে গভীর নৈরাশ্যবাদ মোহবিভ্রম জাগায় তাহাই কি আজ রামপ্রসাদের সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগসূত্র? কবির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আজ এই কথাই বলিতে ইচ্ছা করে:

রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো।

জননীর স্নেহক্রোড়ে প্রত্যাবর্তনের সৌভাগ্য কি আমাদের হইবে?

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ বাঙ্গালার জীবনচর্যার দুই বিপরীত কোটির প্রতিনিধিরূপে অষ্টাদশ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই দুই বিপরীত কোটির আবার ভাব-সাধনার একটি সাধারণ বিন্দুতে সংলগ্ন থাকার কোন বাধা ছিল না। দ্বাদশ শতকে জয়দেব-কবিতে বিলাসকলাকৌতূহল ও

ভক্তিবিহ্বল আত্মনিবেদন রাধাকৃষ্ণের লীলামাধুর্যরসের মধ্যে মিশিয়া এক হইয়াছিল। বৈষ্ণবধর্মের মধুর রসে প্রাকৃত শৃঙ্গার রসের দিব্য পরিণতি ; লৌকিক প্রেমকে উপাদানরূপে ব্যবহার করিয়া ভগবৎ-সাধনার ভক্তিপ্লুত, আত্মবিলোপী আবেগটি স্ফুরিত হইয়াছে। সুতরাং বৈষ্ণবধর্মে এই উভয় উপাদানের একটি সহজ সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে পৌঁছিয়া শাক্ত-উপাসনার মাতৃপূজার সঙ্গে কেমন করিয়া এই আবিল সৌন্দর্যমুগ্ধতার ধারাটি আসিয়া মিশিয়া গেল! যেখানে ভগবান ও ভক্তের সম্পর্ক মাতা-পুত্রের বিশুদ্ধ স্নেহ-ভক্তি-বাৎসল্যের মাধুর্যে পরিপ্লুত, সেখানে আদিরসের উদ্বেলতা ও ভোগবিলাসের দুর্দম কামনা নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু মনে হয় যেন বৈষ্ণব সাধনার অনুকরণে শক্তিপূজার মধ্যেও এই প্রাকৃত দেহলালসা আবির্ভূত হইয়াছে। বোধ হয় পাঠকের রুচি এইরূপ সম্ভোগকাহিনী প্রত্যাশা করিত বলিয়াই শাক্ত কবি মাতৃপূজার পটভূমিকায় এইরূপ বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তবে বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমই কেন্দ্রস্থ রস, দিব্যানুভূতিস্ফুরণের প্রধান উপায় ও উপাদান। শাক্ত কবির বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে ইহা আরোপিত, ভিন্ন উৎস হইতে সংগৃহীত ও মাতৃমহিমা-ঘোষণার একটা পরোক্ষ উপলক্ষ্য। এই প্রেমচর্চা সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ নয়, এমন কি সাধনার সহিত ইহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্পর্ক। ইহা কেবল ভক্তের প্রতি মাতৃরূপিণী দৈবশক্তির অহেতুক কৃপার নিদর্শন ও তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার পরিচয়ক্ষেত্র। ভক্ত যে মাতৃ-আশীর্বাদে বলীয়ান হইয়া যে-কোন দুঃসাহসিক অভিযানে ব্রতী হইতে পারে ও মাতার প্রতি অসীম নির্ভরশীলতায় যে-কোন লৌকিক আচার ও সুরুচিসঙ্গত আচরণকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের তাহাই প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ পরস্পরের মধ্যে গভীর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এক বিষয়ে যুগের বিকৃত রুচির অনুবর্তন করিয়াছিলেন—তাঁহারা উভয়েই যুগপ্রচলিত বিদ্যাসুন্দর আখ্যায়িকা লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। 'বিদ্যাসুন্দর' ভারতচন্দ্রের কবি-প্রকৃতি ও রাজসভাবর্ধিত ব্যক্তিগত রুচির যথার্থ প্রতিবিম্ব—তাঁহার কামকলাবিলাসের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা, তাঁহার ব্যঙ্গশ্লেষ-কটাক্ষের নিপুণ প্রয়োগ, শব্দ ও ছন্দে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ও শিল্পকুশলতা, তাঁহার সুচতুর, সপ্রতিভ হাস্যরস-রসিকতা, এবং এই লঘুতরল প্রকৃতির সহিত ভক্তির আবেগহীন, মননশক্তিসমৃদ্ধ, অথচ আন্তরিক অনুভবের সংমিশ্রণ সমস্তই তাঁহার অমর কাব্যে

প্রকাশ লাভ করিয়াছে। রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' তাঁহার কবিপ্রকৃতির একটা বিস্ময়কর ব্যতিক্রম—তাঁহার ভাবতন্ময়, সাধনাক্রমের নিগূঢ়তায় ব্যঞ্জনাপূর্ণ, আবেগঘন পদাবলীর সঙ্গে ইহার কোন মিল নাই। এই পদাবলী রচনার পর যদি তিনি বিদ্যাসুন্দর-রচনায় ব্রতী হন, তবে পৌর্বাপর্যবিচারে ইহা যেন আরও বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। সুধাপানে যিনি স্বর্গীয় আনন্দরসের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার এই পার্থিব মাদকরস-আস্বাদনে প্রবৃত্তি আরও অস্বাভাবিক রূপে প্রতিভাত হয়। রামপ্রসাদের অধ্যাত্মসাধনার মধ্যে হয়ত একটি লৌকিক দিক ছিল, আজু গোঁসাই-এর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গশর এই দুর্বলতাকে লক্ষ্য করিয়াই নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। বিদ্যাসুন্দর এই লৌকিক দিকেরই কাব্য-পরিচয়। হয়ত আশ্রয়দাতা ও পৃষ্টপোষক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়াই রামপ্রসাদ তাঁহার এই প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন। কবির লড়াই দেখিতে অভ্যস্ত মহারাজা ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদকে একই বিষয়ে কাব্য রচনায় প্রণোদিত করিয়া উভয়ের শক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বিতার মল্লযুদ্ধ উপভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন। যে কোন কারণেই হউক, সুদূর পল্লীর নির্জনতায় ধ্যানসাধনায় নিমগ্ন প্রসাদ-কবি রাজসভার বিদগ্ধরুচি, নিজ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন ভারতের সহিত রাজদরবারের কৃত্রিমতাদুষ্ট, আবিলরসপিপাসু, মসী যুদ্ধের সুলভ উত্তেজনার জন্য উন্মুখ প্রতিবেশে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথের গল্পের শেখর ও পুণ্ডরীকের কাব্যযুদ্ধের একটা পালা কৃষ্ণনগরের রাজসভাতলে অভিনীত হইয়াছিল। এখানে অবশ্য যবনিকার অন্তরালবর্তিনী তরুণী রাজকন্যার কঙ্কণ-নিক্বণের পরিবর্তে পারিষদবর্গের চাপা ও উচ্চহাসি শোনা যাইত ও করুণ, বিয়োগান্ত পরিণতির পরিবর্তে রুচিপরিতৃপ্তির স্থূল আত্মপ্রসাদ চিত্তকে অধিকার করিত।

(২)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতকের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই শতকে বাংলার রাজনৈতিক গগনে ব্রিটিশসূর্যের অভ্যুত্থান হয় ও উহার সংস্কৃতির বিবর্তনে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগের পূর্বেই অষ্টাদশ শতকের প্রথম হইতেই একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভাবপরিবর্তনের পূর্বাভাস দৃষ্ট হয়। মনে হয় যেন দেশের ও জাতির বিধাতা-পুরুষ দেশকে পূর্ব হইতেই আসন্ন রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রভাতের পূর্বে যেমন আলো-অন্ধকারে জড়িত, তন্দ্রাঘোরের মধ্যে অর্ধজাগরণের

ইঙ্গিতবাহী উষার উদয়, তেমনি সাহিত্যের নবজাগরণের পূর্বে তাহার একটি অস্ফুট, অর্ধসচেতন ভাবান্তর দেখা দিয়া থাকে। অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ উভয়ই কোন-না-কোন দিক দিয়া আধুনিকতার অগ্রদূতরূপে গণ্য হইতে পারেন। (ভারতচন্দ্র বিশেষ করিয়া এক অভিনব বাস্তববোধের, এক নূতন সমাজ-সচেতনতা ও তীক্ষ্ণ, মোহমুক্ত স্বচ্ছদৃষ্টির, জীবন-পর্যালোচনার এক স্বতন্ত্র স্বকীয়তার জন্য আধুনিকতাধর্মী।) ভারতচন্দ্রের পূর্বে বিদ্যাপতি ও মুকুন্দরামের মধ্যেও এই আধুনিক বাস্তবতার সুর শোনা যায়, কিন্তু উভয়েই এক ভাবমুগ্ধ কাব্যপ্রথানুবর্তনের পরোক্ষতায় এই প্রবণতাটির পূর্ণ অনুশীলন করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির যুগে বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের প্রথম আরম্ভ; মুকুন্দরামের যুগে মঙ্গলকাব্যের পূর্ণপরিণতি। তাঁহাদের পর্যবেক্ষণশক্তি প্রশংসনীয় হইলেও ইহা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত প্রথাবদ্ধতার বিপরীত স্রোতের বিরুদ্ধে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। বিদ্যাপতি চোখে যাহা লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা অতীন্দ্রিয় রূপ-আরাধনার অর্ঘ্যরূপে নিয়োজিত করিয়াছেন; তাঁহার বয়ঃসন্ধিস্থলে উপনীতা গ্রাম্য কিশোরীর মধুর, আত্মসচেতন প্রগল্‌ভতা, আসন্ন যৌবনের অপরিস্ফুট লাবণ্য-হিল্লোল অধ্যাত্ম অনুভূতির নিবিড় ভাবরোমাঞ্চে রূপান্তরিত হয়, রূপ-সমুদ্রের কল্লোলিত চঞ্চলতার উপর অরূপলোকের রহস্যঘন গোধূলি-স্তব্ধতা নামিয়া আসে। মুকুন্দরামের ভক্তি অবশ্য ঠিক আধ্যাত্মিক ভাবসাধনার পর্যায়ে উঠে নাই—ইহাতে দৈবশক্তির অলৌকিক লীলার সম্মুখীন প্রাকৃত মানবের আদিম সরল বিস্ময়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহাতে সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-প্রতিষ্ঠার বিনিময়েই আত্মনিবেদনের প্রেরণা জাগিয়াছে। তাঁহার চণ্ডী লৌকিক জীবনের দেবী; সুতরাং সমাজ-জীবনের সরস উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার দেবমহিমা-প্রতিপাদনের প্রতিকূলতা করে নাই। তথাপি তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহার বাস্তব চিত্রণকে যে সীমায়িত করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। জীবনের ছবি আঁকিতে গিয়া তিনি উহার স্বয়ংসম্পূর্ণ সমগ্রতার দিকে লক্ষ্য করেন নাই। উহার যে অংশটুকু দৈবশক্তির অনুগ্রহ-নিগ্রহের লীলাক্ষেত্র, যাহার উপর দেবতার প্রসাদ সূর্যালোকের ন্যায় উজ্জ্বল ও দেবরোষ দুর্যোগের মেঘের ন্যায় ঘনায়মান, সেই মেঘ-রৌদ্রের খেলার ছোট অঙ্গনটিই তাঁহার পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনার বিষয়।

(ভারতচন্দ্রের যুগে মঙ্গলকাব্য-প্রথার মূল অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের স্বভাবসিদ্ধ ভক্তিরসের স্রোত মঙ্গলকাব্যের অর্ধশুষ্ক খাত

পরিত্যাগপূর্বক ব্যক্তিক সাধনা ও অনুভূতির নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। পৌরাণিক আদর্শে কল্পিত বৃহৎ আখ্যায়িকার পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবপ্রধান, ভক্তহৃদয়ের আকুতি-প্রকাশক গীতি-কবিতার মাধ্যমে দেবমহিমা ব্যক্ত হইতে লাগিল। সুতরাং ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের কেবল বাহিরের কাঠাম যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া উহার অন্তঃপ্রকৃতিটিকে যুগের রুচি ও নিজের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পরিবর্তন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। একদিক হইতে বিচার করিলে 'অন্নদামঙ্গল' ঠিক প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ে পড়ে না। উহাতে কোন নূতন, স্বল্পপরিচিত দেবতার পূজা-প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচলিত জন-মতের বিরুদ্ধাচরণ বা অনিচ্ছুক, অবিশ্বাসী ব্যক্তির উপর ছলে বলে কৌশলে বাধ্যতামূলক দীক্ষার আরোপের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয় নাই। দেবতার আত্ম-প্রতিষ্ঠার দুর্দম লিপ্সা ও দুর্জয় সংকল্প, মানবের প্রাণপণ প্রতিরোধ, দেবরোষের অতন্দ্র জিঘাংসায় নানা দুঃখ-লাঞ্ছনা-শাস্তি-উপভোগের পর দেব-প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ—এ সমস্ত কিছুই ভারতচন্দ্রের কাব্যে নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, অতীত দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে অপরিচিত দেবতা একান্ত পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। চণ্ডী তাঁহার চণ্ডরূপ ত্যাগ করিয়া অন্নদাত্রীর প্রসন্ন মূর্তি গ্রহণ করিয়াছেন। স্বর্গের দেবতা গৃহদেবতা বা কুলদেবতায় পরিণত হইয়াছেন, প্রতিদিনকার সুখ-দুঃখের সংসারে তাঁহার আসনটি চিরতরে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে চণ্ডীর অলৌকিক রূপলাবণ্য ও চোখ-ধাঁধানো দিব্য বিভা দেখিয়া কালকেতু-ফুল্লরা মূর্ছিত হইয়াছিল, এখন তিনি কুলবধূর আড়ম্বরহীন, সাদা-মাঠা শাঁখা-শাড়ীর অন্তরালে তাঁহার সেই অপ্রাকৃত জ্যোতিকে আবৃত করিয়াছেন। ঈশ্বরী পাটনী তাঁহাকে বাঙ্গালীর মধ্যবিত্ত সংসারের কুললক্ষ্মী বলিয়াই চিনিয়াছে ও পদের অলক্তকরাগ ধুইয়া যাইবে বলিয়া সেঁউতির উপর তাঁহার চরাচর-বন্দিত শ্রীচরণযুগল রাখিতে বলিয়াছে। নদী পার হইবার সময় দেবী যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা যে-কোন কুলীন নারীর পক্ষে প্রযোজ্য, এই পরিচয়ের দ্ব্যর্থমূলক শ্লেষবাক্যের দ্বারা তিনি তাঁহার স্বরূপটি একসঙ্গে উদ্‌ঘাটিত ও অবগুণ্ঠিত করিয়াছেন। সমস্ত পরিবেশের মধ্যে একটি ঘরোয়া সুর লাগিয়াছে; এই স্নিগ্ধ-মধুর আলাপ যেন দেবলোকের সমস্ত অস্বস্তিকর রহস্যবোধকে ধুইয়া মুছিয়া দেবীকে ঘরের মানুষ করিয়া লইয়াছে। দেবীর অলৌকিক মহিমার লুপ্তাবশেষ সেঁউতিকে সোনাতে রূপান্তরিত করার মত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যাপারে নিজ

নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে—অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় এখানে বিশাল রত্নখচিত রাজপুরী নির্মাণের জন্য সুরশিল্পী বিশ্বকর্মাকে আবাহন করিতে হয় নাই। সর্বশেষে পাটনীর বর-প্রার্থনায় রাজ্য, স্বর্গ বা মোক্ষলাভের পরিবর্তে গৃহকেন্দ্রিক বাঙ্গালীর শান্তিময় জীবন-যাপনের সনাতন আকুতি ধ্বনিত হইয়াছে—সন্তানের দুধে-ভাতে থাকার অপেক্ষা কোন উন্নততর বর অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালী কবি কল্পনা করিতে পারেন নাই। সাধারন বাঙ্গালী ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছে এবং সেই সাধারণ বাঙ্গালীর প্রতিনিধি কবি ভারতচন্দ্রও তাঁহার কাব্যে অবাস্তব স্বপ্নালুতার পরিবর্তে বাস্তব জীবনের সামান্য আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই রূপ দিয়াছেন।

(৩)

মঙ্গলকাব্যের ভিতরকার শাঁস শুকাইয়া গিয়া যে শূন্যস্থানের অবকাশ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা পূর্ণ করিবার জন্য ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের ছদ্মভক্তিমণ্ডিত কামকেলি-কাহিনীটি উহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন। অবশ্য এই প্রবর্তনের প্রথম কৃতিত্ব তাঁহার প্রাপ্য নহে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে গোবিন্দদাস ও সপ্তদশ শতকের শেষে নিমতার কবি কৃষ্ণরাম এ-বিষয়ে ভারতচন্দ্রের অগ্রবর্তী। মূলে 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্যের সংস্কৃত কবি এই দেবানুগ্রহের ছাড়পত্র-পাওয়া দেহ-সম্ভোগের কল্পনাটি চালু করেন। বাংলা কাব্যে ইহার প্রতিধ্বনি পৌছিতে বেশ কয়েক শতাব্দী সময় লাগিয়াছিল। বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্বের পরকীয়াবাদ ও তন্ত্র-সাধনা-পদ্ধতির পঞ্চ 'মকারের' বিকৃত প্রয়োগে যখন দেশবাসীর রুচি এই অনাবৃতপ্রায় ইন্দ্রিয়লালসার প্রতি উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই কবিরা ভক্তির মোড়কে এই কামকলার কাব্যবটিকা পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। বিশেষত তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অসাধ্য-সাধনের সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে যখন দেশবাসীর বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মিল, তখনই কালীমন্ত্রের বলে সুরঙ্গ-খনন ও মশানে আসন্ন মৃত্যু হইতে উদ্ধার কবি-কল্পনাকে উদ্দীপিত করিল। প্রাচীনতর মঙ্গল-কাব্যেও এইরূপ দৈবশক্তির অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের উদাহরণ আছে, কিন্তু উহার প্রতিবেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন—সমুদ্রে ঝড়-তুফান ও নৌকাডুবি, তরঙ্গ-লহরীর উত্তাল উত্থান-পতনের মধ্যে কমলে-কামিনীর মরীচিকার আবির্ভাব ও বিদেশীয় রাজসভায় অভাবিত বিপদ হইতে মুক্তি ঘটনার দিক দিয়া প্রায় অভিন্ন, কিন্তু অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিক দিয়া সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীমন্ত ও ধনপতির বিপদ দেব-

রোষসঞ্জাত ও স্তবস্তুতির দ্বারা দেবের প্রসাদলাভে উহার নিবারণ। সুন্দরের বিপদ স্বয়ংসৃষ্ট, রূপমোহের অসংযত আতিশয্য হইতে উদ্ভূত; কালীমন্ত্র-সিদ্ধিতে তাহার যে কেবল বিপদ কাটিয়াছে তাহা নহে, তাহার নৈতিক অপরাধেরও ক্ষালন হইয়াছে। সুতরাং ঘটনাগত কিছুটা সাম্য থাকিলেও এই বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলি নীতিসমস্যা ও অসামাজিক ও অশালীন আচরণের জন্যও দেবতার সমর্থন ও প্রশ্রয় লাভের দিক দিয়া, পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যসমূহ হইতে পৃথক্ এক নূতন সমাজ-চেতনার সাক্ষ্য বহন করে।

সে যাহাই হউক, ভারতচন্দ্র যে এই জাতীয় কাব্যরচয়িতাদের মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ তাহা সর্বজন-স্বীকৃত। মনে হয় যে, তাঁহার নৈসর্গিক কবিপ্রতিভা ও জীবন-অভিজ্ঞতা হইতে অর্জিত রুচি তাঁহাকে এই ধরণের কাব্য লিখিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল। এই অশ্লীল দেহসম্ভোগের চিত্রকে যতদূর কাব্যগুণোপেত করা যায়, ইহার স্থূল ও রুচি-বিগর্হিত বস্তু ও ঘটনাগত উপাদানসমূহকে যতদূর বস্তুর অতীত একটি ভাবরসে পরিণত করা সম্ভব, ভারতচন্দ্র সেই দুরূহ কার্যে চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শুধু বর্ণনার কৌশল বা শব্দ ও ছন্দের পারিপাট্যই তাঁহার অভাবনীয় সাফল্যের কারণ নহে। ইংরাজীতে যাহাকে gusto বলে, সেই জীবনরস-উচ্ছলতার সবটুকু উপভোগ-শক্তি দিয়া তিনি এই কলুষিত, অথচ মোহকারী সৌন্দর্যের চরম স্বাদুতা আস্বাদন করিয়াছেন। এই উচ্ছৃঙ্খল যৌবনমাদকতার রূপসজ্জাময় প্রতিবেশ-রচনায়, সংলাপে, গানে, সহায়ক পাত্র-পাত্রীর নিপুণ সমাবেশে, বর্ণনা-বিবৃতিতে উপচাইয়া-পড়া রস-সঞ্চারে তিনি সমগ্র কাব্যটিকে একটি কামকলাবিলাসের পীঠস্থানের মর্যাদা দিয়াছেন। তাছাড়া কবির নিজের হাবভাব-কটাক্ষে, তির্যক ইঙ্গিত ও সঙ্কেতে, ঈষৎ শ্লেষাত্মক মন্তব্যে, সমাজ-জীবনের গ্লানিকর, ছেঁড়া-তালি-দেওয়া নীচের দিকের উদ্‌ঘাটনে, বাস্তবলবণ-সংযোগে কৃত্রিম আদর্শবাদক্লিষ্ট রুচির বিস্বাদ-দূরীকরণে এমন একটা সোৎসাহ সমর্থন ও বর্ণিত বিষয়ের সহিত একাত্মতার নিদর্শন পাওয়া যায় যে, ইহাতে যে মধ্যযুগীয় ভাব-কুম্ভকর্ণের ষড়শতাব্দব্যাপী নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, কবিচিত্তে যে নূতন ক্ষুধা, রসনা-পরিতৃপ্তির নূতন প্রেরণা অনুভূত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যেমন মুরশিদকুলি খাঁর রাজস্ব-ব্যবস্থায়, আলিবর্দির মহারাষ্ট্র-আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য উৎকোচদান-নীতির অবলম্বনে, সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে কূট-রাজনৈতিক

চক্রান্তের প্রবর্তনে, ইংরেজ কোম্পানীর সহিত বৈষয়িক সম্পর্ক স্থাপনে বাংলার রাজনৈতিক নাটকের দৃশ্যপরিবর্তন সূচিত হইয়াছে, তেমনি ভারতচন্দ্রের কাব্যেও বাঙালী কবিচিত্ত দীর্ঘকাল প্রথানুগত্যের পর এক নবচেতনার প্রথম উন্মেষের পরিচয় দিয়াছে।

(৪)

রামপ্রসাদের কবিতায় আধুনিকতার চিহ্ন খুব সুস্পষ্ট না হইলেও গভীরভাবে অনুধাবন করিলে লক্ষ্যগোচর হয়। তিনি সাধকরূপে প্রাচীন তন্ত্রসাধনা-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু কবিরূপে তাঁহার প্রকাশরীতি ও অনুভূতির স্বকীয়তা আধুনিকত্বের পরিচয় বহন করে। তাঁহার পদাবলীতে রূপবর্ণনা ও সাধনাক্রম-নির্দেশ প্রাচীন সংস্কৃতির প্রভাবের ফল। কিন্তু মাতৃরূপিণী বিশ্বশক্তির সহিত পরিচয়-স্থাপনের প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁহার যে মানবিক আবেগ-আকৃতি ও দুরূহতত্ত্বে অনুপ্রবেশশীলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আধুনিক। এই আবেগ-আকৃতি রামপ্রসাদের পদে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণ নহে, ইহা তাঁহার নিজস্ব অধ্যাত্মদৃষ্টি-সঞ্জাত। বৈষ্ণব পদাবলীতে যে হৃদয়াবেগের অসংবরণীয়তা ও মর্মস্পর্শী গভীরতা দেখা যায় তাহা উহার অঙ্গীভূত প্রেমসাধনা ও মধুররস-মন্থনের অনিবার্য পরিণতি। তাছাড়া বৈষ্ণবকাব্যে তত্ত্ব আবেগকে বাঁধিয়া রাখিবার বেষ্টনীরেখা, উহারই ঘনীভূত কঠিন রূপ। সুতরাং বৈষ্ণব দর্শন ও পদাবলীর ভাবমাধুর্য রসের প্রকারভেদ—কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত' বৈষ্ণবরস-প্লাবনের পলি-পড়া কোমল ভূখণ্ড। কিন্তু তন্ত্রসাধনায় সুকোমল হৃদয়বৃত্তির বিশেষ কোন স্থান নাই—বরং সাধারণ প্রবৃত্তির উৎসাদনের উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত। নারী লইয়া সাধনা, মদ্যমাংসের উপচার, নরবলি, কৌমার্যহরণ প্রভৃতি নৃশংসাচার, শ্মশানের ভয়াবহ পরিবেশে পূজানুষ্ঠান—এ সমস্তই সহজ জীবনযাত্রা ও ভক্তিনিবেদন-প্রণালীর বীভৎস ব্যতিক্রম। এই কঠোর তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দয়ামায়াপ্রীতি-মানঅভিমান-আত্মনিবেদন প্রভৃতি সুকুমার হৃদয়াবেগের উৎসারণেই রামপ্রসাদের মৌলিকতা। বীভৎসের মধ্যে মধুরের আবিষ্কার, প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসলীলায় উন্মত্তা কালীমূর্তির নৃশংসতার অন্তরালে স্নেহমমতাময়ী মাতার স্পর্শ, জীবনের সমস্ত জটিলতার পিছনে এক মায়াময়ীর রহস্যজাল-বিস্তারের অনুভূতি, ইহার সমস্ত বিভ্রান্তি-বঞ্চনার মধ্যে পরম সান্ত্বনার নিশ্চিন্ত আশ্বাস—এই মৌলিকতার স্বাক্ষর বহন করে।

তা ছাড়া রামপ্রসাদ দেবী ও মানবের সম্পর্ক-রহস্যকে এক সম্পূর্ণভাবে পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে অধ্যাত্মরহস্যকে পরিবারকেন্দ্রিকরূপে দেখাইবার চেষ্টা আছে, কিন্তু বৈষ্ণবের রসলীলার প্রকৃত পটভূমিকা অপ্রাকৃত বৃন্দাবন, যেখানে পরিবারজীবনের ছায়ারূপ আছে, কিন্তু কায়ারূপ নাই। শ্রীরাধার স্বামী আছে, শাশুড়ী-ননদী আছে, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের সখাগোষ্ঠী ও স্নেহময় অবলম্বন পিতামাতা আছেন, কিন্তু ইঁহারা, যেন ঐশী লীলার এক একটি ক্ষণিক বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র—দুরত্যয়া দৈবী মায়ার ছলনাময়ী সৃষ্টি। লীলার চরম মুহূর্তে এই কল্পিত সমাজটি, মধ্যাহ্নসূর্য—প্রক্ষিপ্ত সঙ্কুচিত ছায়ার ন্যায়, কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে; প্রাণবেগচঞ্চল রক্তমাংসের মানুষগুলি অবয়বহীন হইয়া মনের সুদূর প্রান্তে একটি বেদনাময় স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। এই বিরাট, বিশ্বব্যাপী শূন্যতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নির্লিপ্ত-নিষ্ঠুর, রহস্যমধুর হাসি দিয়া ঢাকা, নিগূঢ় নিয়তি-লীলার প্রকটন, আর শ্রীরাধার নিখিলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত অপ্রশমিত বিরহ-বেদনা যুগল শাশ্বত সত্যের ন্যায় চিরন্তন মহিমায় বিরাজিত।

রামপ্রসাদের সংসার-চিত্রের মধ্যে এরূপ অবাস্তবতা ও দৃষ্টিবিভ্রমের মরীচিকা নাই। সংসারের খেরুয়া খাতাকে তিনি ভক্তির স্বর্ণসূত্রে শতপাকে জড়াইয়াছেন। তিনি হিসাবের বইএ কালীনাম লেখেন; জগদীশ্বরী কন্যারূপে তাঁহার বাড়ীর বেড়া বাঁধিতে সাহায্য করেন। আদালতের পেয়াদা যখন তাঁহার উপর ডিক্রিজারী করিতে আসে তখন তাহার তকমার উপর কালীনামের শীলমোহর অঙ্কিত থাকে। সংসারের শত তুচ্ছ অভাব-অভিযোগ, পীড়ন-অপমানের রন্ধ্রপথ দিয়া তিনি কালীর কল্যাণ হস্তের স্পর্শ অনুভব করেন। জীবনের খেলাধূলা, ক্রীড়া-কৌতুক সবই তাঁহার কাছে অধ্যাত্মলোকের দ্বার উন্মুক্ত করে। পাশাখেলায় এক অদৃশ্য হস্ত তাঁহার দান উল্‌টাইয়া দেয় ও পাকা ঘুঁটিকে কাঁচা করে ও কাঁচাকে পাকাইয়া দেয়। মন-ঘুড়ি কালীপদ-আকাশের ঊর্ধ্বলোকে উড়িতে উড়িতে হঠাৎ কু-বাতাসের ঝাপটায় পৃথিবীর কাছাকাছি নামিয়া আসে ও আবিল বায়ুস্তরে মাথা লুটাইয়া পড়ে। প্রত্যেকটি ব্যবসায় ও বৃত্তি অপার্থিব জীবন-সাধনার প্রতীকরূপে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয়। কৃষিকর্মরত কৃষককে দেখিয়া অকস্মাৎ তাঁহার মনে জাগে যে, স্বর্ণপ্রসূ মানবজমীন অকর্ষিত রহিয়া গেল এবং চাষের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার রূপকে সাধনার সমস্ত

ক্রমগুলি তাঁহার মনে পুনরাবৃত্ত হয়। চোখে-ঠুলি-আঁটা কলুর বলদ তাঁহাকে অনিবার্যভাবে মোহান্ধ, প্রবৃত্তি-তাড়িত মানবজীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জেলের জাল ফেলায় মৎস্যকুলের আকুলতা মহাকালের পাশবদ্ধ হইবার জন্য অসহায়ভাবে প্রতীক্ষমান মানবের করুণ চিত্রটি তাঁহার মনে ফুটাইয়া তোলে। সুতরাং রামপ্রসাদের ভক্তি-সাধনার পদগুলিতে বাংলা গ্রামীণ চিত্রের সমগ্রতা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহা কিন্তু সত্যকার গ্রামজীবন, ইহার মধ্যে কোন ভাবাদর্শগত রূপান্তর বা কল্পনা-বিলাস নাই। এই গ্রাম্যজীবন অধ্যাত্মসাধনার প্রতীক, কিন্তু ইহা স্বধর্ম হারায় নাই, ইহার অঙ্গবিন্যাসে রক্তমাংস উবিয়া যায় নাই। ইন্ধনগুলিতে হোমশিখা জ্বলিয়াছে, কিন্তু বস্তুজগতের এই উপাদানগুলি উহাদের ইন্ধনধর্মিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এইখানেই রামপ্রসাদের সত্যিকার আধুনিকতা—আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে তিনি সনাতন সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ উভয়েই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী গতানুগতিকতার অর্ধচেতন অনুবর্তনের মধ্যে পূর্ণসচেতন মননশক্তির ও মৌলিক অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন।

(৫)

সুখের বিষয় যে, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের শুধু রচনাগত কাব্যোৎকর্ষ নয়, ঐতিহাসিক তাৎপর্যও স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ডাঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য এই বিষয়ে যে মৌলিক গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখিয়া ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন, তাহা এক্ষণে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি প্রথমত কবিদ্বয়ের যুগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া তাহার পর তাঁহাদের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে বিশদ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বিদ্যাসুন্দর কাব্যে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে তিনি উভয়ের কবিপ্রকৃতির ও রুচির পার্থক্য ও সাময়িক মিল সম্বন্ধে অনেক যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরিশিষ্টে গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থমধ্যে ভারতচন্দ্রের সত্যপীরের পাঁচালি ও রামপ্রসাদের কালীকীর্তনের দুইখানি অজ্ঞাতপূর্ব পাণ্ডুলিপি সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থ দুইটি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করিয়াছেন ও কোথাও কোথাও উন্নততর পাঠান্তর স্থিরীকরণে সাহায্য

করিয়াছেন। সর্বশেষে রামপ্রসাদ নামে একাধিক পদ-রচয়িতার রচনা কিরূপ বিচারের মানদণ্ডে পৃথক্ করা সমীচীন, সে সম্বন্ধে পূর্ব-পূর্ব সঙ্কলনকারীর মতবাদ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ও নিজ অভিমতের ভিত্তিতে সমস্ত প্রসাদী পদাবলীকে তিনটি পৃথক শ্রেণীতে বিন্যস্ত করিয়া পাঠককেও স্বাধীন বিচারে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। মোটকথা, তাঁহার আলোচ্য গ্রন্থখানি অদূর অতীতের দুই শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যের প্রতি আধুনিক সমালোচনা-রীতির সার্থক প্রয়োগে উহাদের নূতন মূল্য নির্ধারণ-প্রয়াসের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। আমি তাঁহার আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে কোন কোনটি সম্বন্ধে আমার নিজের কিছু কিছু মন্তব্য সংযোজনা করিয়া তাঁহার মূল্যবান গ্রন্থটিকে পাঠকসমাজে পরিচিত করিবার দায়িত্ব পালন করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম প্রশ্ন হইল যে, বাঙলায় অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল কি না যাহা ভারতচন্দ্রের ও রামপ্রসাদের কুরুচি ও প্রায়-অনাবৃত ইন্দ্রিয়লালসা-প্রবণতাকে উত্তেজিত করিয়াছিল ও প্রশ্রয় দিয়াছিল? বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের প্রভাব কখনই খুব সুস্পষ্ট ছিল না—বাঙ্গালী কবি কোন-দিনই ইতিহাসের বহির্ঘটনার দ্বারা তাদৃশ প্রভাবিত হন নাই। যুগে যুগে অন্তর-প্রেরণার বহিঃপ্রকাশস্বরূপ যে এক একটি কাব্যপ্রথা, মানুষের দেবতা সম্বন্ধে ধারণার এক একটি নূতন কল্পনা উদ্ভূত হইয়াছিল, কবিগোষ্ঠী সমসাময়িক ইতিহাস-সংঘটনকে অনেকটা উপেক্ষা করিয়া অবিচলিতচিত্তে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতা, মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন শাখা, সহজিয়া সাহিত্য, শাক্ত পদাবলী—এ সবই বাঙ্গালীর ধর্মচর্চা ও অধ্যাত্মসাধনার একটি অধ্যায়—হয়ত ইহাদের মধ্যে কোথাও কোথাও ইতিহাসের ক্ষীণ স্মৃতি খুঁজিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু মোটের উপর ইহারা ইতিহাস-নিরপেক্ষ। ইতিহাসের পরিবর্তন-ধারা যখন পরোক্ষভাবে সমাজ-চেতনায় ও দেব-পরিকল্পনায় অনুভূতির একটা নূতন সুর সংযোজনা করিয়াছে, যখন ইহার দীর্ঘকালব্যাপী নিঃশব্দ ক্ষরণ চিত্তফলকে গভীর দাগ কাটিয়া বসিয়াছে, তখনই ইহা সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে। ইতিহাস, গুহাশ্রয়ী নির্ঝরধারার ন্যায়, বাহিরের ঘটনা হইতে যখন অন্তরের গভীরে আত্মসংহরণ করিয়াছে, তখন ইহার একটি অভাবনীয় রূপান্তর-সাধন ঘটিয়াছে—ইহার স্রোতোবেগ, ইহার কলধ্বনি, ইহার সংঘাত ও উত্তেজনা সবই আশ্চর্যরূপে শুদ্ধ হইয়া ইহা মানস-সংস্কারের শান্ত ছন্দের সহিত মিশিয়া এক

হইয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে কি এই যুগযুগান্তরব্যাপী প্রক্রিয়ার কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়?

অবশ্য মনের ভাবনিষ্ঠা কমিলে বাহির সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়—অন্তরের উৎস শুকাইলে বাহিরের কোথায় কি রসের প্রস্রবণ আছে সে দিকে লক্ষ্য যায়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকটা অন্তত এইরূপ একটি অন্তর-রিক্ততার যুগ—মানুষ তখন ঘরের সঞ্চয় হারাইয়া বাহিরের আহরণের দিকে খানিকটা মন দিয়াছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অশ্লীলতা ও কুরুচি কি যুগ-প্রভাবের ফল? ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন হইতে সমস্ত পরবর্তী ঐতিহাসিক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা ও ব্যক্তিগত প্রভাবকে এই কুরুচির উৎসরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান উদ্ভাবন করেন নাই। ভারতচন্দ্রও উহার সর্বপ্রথম প্রবর্তক নহেন। তা ছাড়া, বিদ্যাপতিও মিথিলা-রাজসভায় এই আদিরসের প্রস্রবণ বহাইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য সে যুগে প্রথম-অনুভূত ভক্তিরসের জোয়ারে এই আদিরস চাপা পড়িয়া গিয়াছিল—রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা বিদ্যাপতির নাগর-প্রণয়-কলার অশালীন ইঙ্গিত-বর্ণনার কলঙ্করেখাসমূহকে নিজ বিশুদ্ধতর ভাব-ব্যঞ্জনার স্নিগ্ধচন্দ্রিকায় আবৃত করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের যুগে ভক্তির সেই সর্বশোধনকারী শক্তি অনেকটা ক্ষীণ হইয়া পড়ায়, প্রাকৃত লক্ষণগুলি আবার মাথা তুলিয়া উঠে। এ যেন দেহের প্রাণশক্তির সহিত রোগবীজাণুর চিরন্তন সংগ্রামের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিরূপ। নবাবী যুগ বঙ্গদেশে কৃষ্ণচন্দ্রের সময় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং মুসলমানী আদর্শের বিলাস-ব্যসন-ব্যভিচার যে এই যুগের রুচিবিকারের কারণ তাহাও ঐতিহাসিক তথ্য-সমর্থিত নয়। রাজশক্তির স্বৈরাচার, জমিদারের উৎপীড়ন, সমাজ-শৃঙ্খলার শিথিলতা—এ সমস্ত দুর্বিপাকও বাঙলার ইতিহাসে নূতন আগন্তুক নহে, অতীতকাল হইতে পুনরাবৃত্ত অভিজ্ঞতা। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে এই অরাজকতার চিত্র পাই, কিন্তু উহা তাঁহার কাব্যে ও জীবনে নৈতিক শিথিলতা ও আদিরসাত্মক আবেশের প্রবর্তন করে নাই। অষ্টাদশ শতকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এইটুকু স্বীকার করা যায় যে, ইহার প্রারম্ভ হইতে বাঙ্গালা দেশ কার্যত দিল্লী-সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইয়া প্রাদেশিক শাসন-কর্তার উগ্রতর ও প্রত্যক্ষতর কুশাসনের পাপচক্রে বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। মুরশিদকুলি খাঁ নিজের হাতে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া যে শাসন ও

রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রচলন করিলেন, তাহা নৈকট্যের তীক্ষ্ণতায় ও প্রয়োগের বজ্র-কঠোরতায় ভূস্বামীবর্গের ও প্রজাসাধারণের অনেক বেশী অশান্তি ও দুর্গতির কারণ হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বর্গীর আক্রমণ বাঙ্গালার মর্মস্থলে একটা তীব্র আতঙ্ক ও অস্বস্তির অনুভূতি জাগাইয়া শুধু যে উহার বৈষয়িক জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়াছিল তাহা নহে, উহার কল্পনাকে অভিভূত করিয়া উহার শিশুমনে পর্যন্ত একটা ভীতি-রহস্যের দোলা দিয়াছে—মায়ের ঘুমপাড়ানি গানের মধ্যে, মাতা ও শিশুর মধুর কল্পনাভরা সম্পর্কের মধ্যে একটি অশুভ, আতঙ্ক-কণ্টকিত দুঃস্বপ্নের ছায়াপাত করিয়াছে। যে আবিল প্রবাহ কর্দমাক্ত চূর্ণীর স্রোতের ন্যায় কৃষ্ণনগরের রাজপ্রাসাদের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহা সুদূর অতীত হইতে আগত জলধারারই একটি অশোধিত, অসংস্কৃত রূপ। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই প্রবাহের খাত খনন করেন নাই। সুতরাং যুগের রুচি-নিয়ামকের গৌরব বা অগৌরব তাঁহার প্রাপ্য নহে। তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র অভিযোগ যে, তিনি এই মলিন প্রবাহে রামপ্রসাদকে অবগাহন করাইয়া তাঁহার কালী-নামাবলীর উজ্জ্বলতা কথঞ্চিৎ ম্লান হইবার হেতু হইয়াছেন।

এখন রামপ্রসাদ-সমস্যা সম্বন্ধে দুইচারি কথা বলিয়া এই আলোচনার উপসংহার করিব: একাধিক রামপ্রসাদের অস্তিত্ব ঈশ্বরগুপ্তের সময় হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিয়া লাভ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ববঙ্গের চিনিশপুরের রামপ্রসাদ সত্য সত্যই কতগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন ও কোন আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে হালিশহর ও চিনিশপুরের রামপ্রসাদের রচনাকে পৃথক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় কি না। যে সমস্ত পদে দ্বিজ ভণিতা আছে, সেগুলি, ভণিতার অকৃত্রিমতা মানিয়া লইলে, ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব পূর্ববঙ্গীয় রামপ্রসাদের বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। কেননা রামপ্রসাদ নিজেকে দ্বিজসংস্কৃতির অধিকারী বলিয়া মনে করুন আর নাই করুন, তিনি বহুপদে ও কালীকীর্তনে নিজেকে দাস উপাধিতে অভিহিত করিয়া আবার দ্বিজসংজ্ঞায় পরিচিত হইতে চাহিবেন ইহা অবিশ্বাস্য। দাস ও দ্বিজ এক মনোবৃত্তি হইতে প্রসূত হইতে পারে না। সুতরাং দ্বিজ ভণিতার পদগুলি না হয় রামপ্রসাদের রচনা হইতে বাদ দেওয়া গেল। পূর্ববঙ্গের ভাষা ও বাগ্‌ধারার প্রয়োগ যে সমস্ত পদে আছে সেগুলিও না হয় ভাগীরথীতীরবাসী রামপ্রসাদের রচনাসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত না হইল। পূর্ব-

জীবনের যে সমস্ত উল্লেখ রামপ্রসাদের জীবন সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে সেগুলিতেও তাঁহার দাবী প্রত্যাহৃত হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু আভ্যন্তরীণ কোন নির্ভর-যোগ্য প্রমাণের দ্বারা উভয়ের রচনা চিহ্নিত হইতে পারে কি না সন্দেহ। কেহ কেহ এখানকার রামপ্রসাদের শাস্ত্রজ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও সাধনপ্রণালীর সহিত পরিচয়ের অন্তরঙ্গতার উল্লেখ করিয়া ও ঐ সমস্ত গুণের আপেক্ষিক অসদ্ভাব পূর্ববঙ্গের রামপ্রসাদের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া উভয়ের পার্থক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু আমি এরূপ কোন নিশ্চিত মানদণ্ডের পরিচয় পাই নাই। দ্বিজ-চিহ্নিত কোন পদে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বা সাধনা-স্বাতন্ত্র্যের কোন ইঙ্গিত আবিষ্কার করা কঠিন। তাছাড়া চিনিশপুরের রামপ্রসাদের রচিত পদগুলি সংখ্যায় এত অল্প যে, সেগুলিকে কোন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী কবির রচনার মর্যাদা দেওয়া যায় না। যাঁহার ভাব-উৎস রামপ্রসাদ হইতে পৃথক, অথচ রামপ্রসাদের মত গভীর ও জীবনের সর্ব-অনুভূতি-ব্যাপ্ত, তাঁহার রচিত কবিতা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলে উহা কাব্যপ্রতিভার সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়ে। অবশ্য এমনও হইতে পারে যে, পূর্ববঙ্গের রামপ্রসাদের অনেক পদ লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তিনি অপর রামপ্রসাদের সমকালীন হইলে ও প্রায় তুল্যরূপ জনপ্রিয় হইলে, লোকের মুখে মুখে তাঁহার অনেক পদ প্রচারিত থাকিত ও উহাদের ব্যাপক বিলুপ্তি সম্ভব হইত না। সুতরাং সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হইয়া পড়ে যে, পূর্ববঙ্গের রামপ্রসাদ হয় স্বাধীনভাবে কিংবা শ্রেষ্ঠতর রামপ্রসাদের সচেতন অনুকরণে পূর্ববঙ্গের বাগ্‌-রীতিতে ও নিজ জীবন-অভিজ্ঞতার সার-নির্যাস সন্নিবিষ্ট করিয়া কয়েকটি ভাবঘন পদ রচনা করেন ও এগুলি রামপ্রসাদের রচনার সহিত এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, জনসাধারণের অনুভূতিতে ও সমালোচকের বিচারে উহারা প্রায় অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য একাধিক রামপ্রসাদের অস্তিত্ব-স্বীকারও রাম-প্রসাদের কবিগৌরবের মর্যাদা-হানি করে না। বৃহত্তর তারকার নিকট যদিই বা কোন ক্ষুদ্রতর তারকা মৃদু রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া থাকে, তথাপি দ্যুতির অখণ্ডতা ও স্নিগ্ধতা সমানই আছে। রামপ্রসাদ নামের পিছনে যে অধ্যাত্ম-তাৎপর্য নিহিত আছে, তাঁহার যে পুণ্যপ্রভাব বাঙ্গালীর অন্তরলোকে প্রবেশ করিয়া তাহার সংস্কৃতি ও ভক্তিবাদকে একটি সুসংহত ও পরিবর্তনের অতীত রূপ দিয়াছে, নাম-বিভাগের দ্বারা তাহাকে কোন মতেই খণ্ডিত করা যাইবে না।

তাঁহার ব্যক্তিসত্তা যতই বিদারণ-রেখায় অঙ্কিত হউক না কেন ভাববিগ্রহরূপী রামপ্রসাদ এক ও অদ্বিতীয়।

শ্রীগীতগোবিন্দ

প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে যদি কোন বাঙালীর রচিত কাব্য সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, তবে তাহা জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ। ইহার টীকা ও ব্যাখ্যাকার-সম্প্রদায় ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতেই আবির্ভূত। ইহার অনুকরণে সমস্ত প্রদেশেই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যে নূতন ধারা প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা সমুদয় প্রদেশে অনুসৃত হইয়া ক্ষীয়মাণ সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে নূতন স্রোতোবেগ ও নবীন প্রেরণা সঞ্চারিত করিয়াছে। সর্বভারত-প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়া ইহা দেশের সংস্কৃতি ও ধর্ম-ভাবমূলক ঐক্যবোধকে দৃঢ়তর করিয়াছে ও সমস্ত ভারতব্যাপী এক নূতন কাব্য-রীতির উৎসমুখ খুলিয়া দিয়াছে।

কিন্তু গীতগোবিন্দের আসল বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা যুগসন্ধিক্ষণে রচিত ও ভবিষ্যৎ সাহিত্যের গতিপথের নির্দেশক ও নিয়ামক। গীতগোবিন্দ-রচনার সময় সংস্কৃত সাহিত্যের মৌলিক সৃষ্টিপ্রেরণা নিঃশেষিতপ্রায় হইয়াছে ও নবজাত প্রাদেশিক ভাষাসমূহ সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের জন্য প্রস্তুত হইয়া উন্মুখ-ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। দেশের চিত্ততলে নূতন রস ও ভাবাবেগ সঞ্চিত হইয়া অভিনব বহিঃনিষ্ক্রমণের পথ খুঁজিতেছে। পুরাতন সংস্কৃত ছন্দবিন্যাস মহাদেব-জটার মধ্যে ক্রমউপচীয়মান ভাগীরথিতরঙ্গধারার ন্যায় এই নবীন প্রাণ-শক্তির চাঞ্চল্য ও গতিবেগকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। নবজাত বাংলা ভাষা ভাব-প্রকাশের উপযুক্ত শক্তি, বহু-পরীক্ষিত অনুশীলনের আত্ম-প্রত্যয় ও অতীত-কীর্তিসঞ্জাত আভিজাত্যবোধ এখনও আহরণ করিতে পারে নাই। কাজেই দেশের কবিপ্রতিভা সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করিতে বাধ্য

হইলেও নিজ নবোন্মেষিত সৌন্দর্যবোধ ও উদ্বেলিত হৃদয়াবেগের জন্য পুরাতন, পরিমিত কাব্যরীতির অপ্রাচুর্য তীব্রভাবে অনুভব করিতেছে। দেশের প্রবহমান ভাবধারা সংস্কৃত ছন্দের চিত্রিত ঘটকে ছাপাইয়া উছলিয়া পড়িতেছে। মিলনের নিবিড় আনন্দ, বিরহের অন্তরদীর্ণ ব্যাকুলতা, প্রবুদ্ধ ধর্মবোধের উদাত্ত উন্মাদনা, প্রতিবেশ-সৌন্দর্যের মুগ্ধ আবেদন, গীতিকবিতার আকাশ-ছোঁয়া সুর, সর্বোপরি মন-ময়ূরীর পেখম-ধরা, ঐশ্বর্যরশ্মি—প্রতিঘাতী উল্লাসনৃত্য—এত সঙ্গীতমূর্ছ্না, এত হিল্লোলিত প্রাণধারা, কল্পনার এরূপ অপরিমিত প্রসার, কি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন, জীর্ণ, প্রথাবিড়ম্বিত ছন্দোরীতির বন্ধনসীমায় ধরা দিতে পারে?

তাই মন্থিত সমুদ্রের গভীরতা হইতে সুধাভাণ্ডহস্তে ধন্বন্তরির ন্যায় এই নব-আশা-আকাঙ্ক্ষায় বিক্ষুব্ধ হৃদয়সিন্ধুর অতল স্তর হইতে বৈষ্ণব দর্শনের অমৃত-কলস পূর্ণ করিয়া উদিত হইলেন শ্রীজয়দেব কবি। তিনি বাংলা ভাষাকে হাতের কাছে পান নাই, কিন্তু বাঙালীর সুকুমার হৃদয়বৃত্তি, তাহার সৌন্দর্য-প্রবণ, ভাববিভোর, অধ্যাত্মরসপিপাসু মনটি তাঁহার মধ্যে স্বপ্রকাশ। বাঙালী কবি-কল্পনা, বাঙালীর বিশিষ্ট সৌন্দর্যবোধ ও ভাবপ্রবণতা জয়দেবে প্রথম মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের নেতৃত্ব সবলে অস্বীকার করিয়া এক স্বাধীন, দুঃসাহসিক অভিযানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মেঘ-মেদুর আকাশ-তলে, তমালশ্যাম বনভূমিতে, বর্ষাসন্ধ্যার স্নিগ্ধ গন্ধবিধুর অন্ধকারে, এক অদৃশ্য প্রেরণার সংকেত তাহাকে পরিচিতের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া অপরিচিতের প্রতি রহস্য-মধুর অভিসার-যাত্রার আহ্বান জানাইয়াছে। এইখান হইতেই রবীন্দ্রনাথে যাহার শেষ বাঙালী কবি-প্রতিভার সেই জয়যাত্রা শুরু হইয়াছে। বাঙালী আপনার মনকে পাইয়াছে, ভাষাকে পায় নাই—পুরাতন নৌকায় নূতন পাল খাটাইয়া, নববায়ুপ্রবাহে হেলিতে দুলিতে সে অসীম সম্ভাবনার পথে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছে। বাংলা ভাষার সূর্যোদয় এখনও হয় নাই, কিন্তু এই আসন্নপ্রায় আবির্ভাবের অরুণচ্ছটায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত। জয়দেব কবির প্রতিভা-প্রদীপ্ত মুখ, তাহার স্বপ্নবিভোর চক্ষুদুটি এই অনাগত আলোক-ধারার উৎসে স্নাত হইয়া অর্থগূঢ়—লাবণ্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

তাই জয়দেবের সত্য ঐতিহাসিক পরিচয়—তিনি বাংলা ভাষার জন্মের পূর্বেই প্রথম বাঙালী কবি। রাম জন্মিবার পূর্বেই রামায়ণ-রচনার যেমন প্রসিদ্ধি আছে তেমনি জয়দেবও বাংলা ভাষার আবির্ভাবের পূর্বসূচনা। তিনি

যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কাব্যের মধ্যে ভবিষ্যতের নিগূঢ় ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বীজাকারে বিধৃত করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যে ভাব-প্রবাহ উদ্দাম হইয়া কখনও শ্লোকের সুষমা-বেষ্টনীকে অতিক্রম করিয়া যায় না, স্তরে স্তরে শ্লোক হইতে শ্লোকান্তরে সংক্রামিত হইয়া সৌন্দর্যের পূর্ণ, শোভন পরিণতি লাভ করে। প্রতি শ্লোকের মণিকুট্টিমরচিত তটরেখা এই কূলে কূলে পূর্ণ অথচ মন্থরগামী ভাবধারার গতিবেগে ক্ষুণ্ণ বা বিপর্যস্ত হয় না—তরুণীর উচ্ছ্বসিত দেহলাবণ্যের মত ইহা শরীরের প্রতি রেখায় প্রকটিত হইয়া নিজ আধারের মধ্যে আপনাকে সংহৃত করিয়া রাখে। জয়দেবের প্রতি সর্গের সমাপ্তি-শ্লোকসমূহে সংস্কৃত শ্লোকের এই সীমায়িত গাঢ়বন্ধ সুষমা যথাযথরূপে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ভাবাবেগের উচ্ছ্বসিত বর্ণনায় দ্রুতগামী শ্লোকপরম্পরার সীমারেখা যেন আর সুস্পষ্ট নাই, ভাবপ্রাবল্যে সব মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমরা যেন বাংলা পয়ারের পূর্বসূচনা অনুভব করি। শ্লোকের আত্মসমাহিত গাঢ়তা যেন পয়ারের সমষ্টিগত, বৃহত্তর ভাবায়তনের মধ্যে বিলীন হইয়াছে। হ্রদের ক্ষুদ্রলহরীসংকুল বারিরাশির মধ্যে দ্রুত-প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী-নিচয়ের সম্মিলিত তরঙ্গধারার নৃত্যলীলা জাগিয়া উঠিয়াছে। আর যেখানে এই হৃদয়াবেগ গীতিকবিতার সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে সংস্কৃত ছন্দের রীতিবন্ধন সম্পূর্ণরূপেই উপেক্ষিত হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা মাঝে মধ্যে গানের সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু এগুলি অগ্র ও পশ্চাৎবর্তী শ্লোকের সহিত আকৃতি-প্রকৃতিতে প্রায় অভিন্ন। অন্তরাল হইতে শ্রুত হংসপদিকার গান শকুন্তলার সর্বব্যাপী রমণীয়তার মধ্যে উহার বিশিষ্ট আবেদন হারাইয়াছে ; ইহা তাহার হৃদয়ের সমাচার বহন করে সত্য, কিন্তু তাহার রিক্ত জীবনের করুণ নিঃসঙ্গতার সুরটি ইহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না। রঘুবংশে তপোবন-পরিত্যক্তা সীতার শোকোচ্ছ্বাস 'যথা ইহা তৎ জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ'—শ্লোকের গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে, গানের সুদুঃসহ, মর্মান্তিক তীব্রতা লাভ করে নাই। 'গাথাসপ্তশতী', 'আর্যসপ্তশতী' প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থগুলি হয়ত সংগ্রাহকের উদ্দেশ্যের দিক দিয়া সঙ্গীতধর্মী ছিল, কিন্তু রচনাভঙ্গীর দিক দিয়া তাহারা শ্লোক-সমষ্টি মাত্র। ইহাদের মধ্যে কোথাও কোথাও এক-আধ বিন্দু অশ্রু চক্‌মক্ করিয়া উঠে, কিন্তু উহা মুক্তার ন্যায় নিটোল ও উজ্জ্বল ; সত্যিকার অশ্রুর পর্যাকুলতা ও লবণাস্বাদ উহার মধ্যে অনুভব করা

যায় না। মাঝে মধ্যে অন্তর্বেদনার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি কানে ভাসিয়া আসে, কিন্তু মধ্য পথেই শব্দালঙ্কারের শিঞ্জিত-সমারোহে উহা চাপা পড়িয়া যায়। আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি শোক হইতে শ্লোকের উদ্ভব সাধন করিয়া সমস্ত পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যেই হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তির মাত্রা-ছন্দটি চিরতরে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন—শোক আর কোনদিনই শ্লোককে ছাপাইয়া উঠিতে পারিল না।

শ্লোক-বন্ধন হইতে হৃদয়াবেগের মুক্তি ও শ্লোকের অন্তঃপ্রকৃতির রূপান্তর-সাধন—ইহাই জয়দেবের কবি-কৃতির প্রধান উপাদান। সংস্কৃত ছন্দকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু উহার চরণের মধ্যে অন্ত্য ও মধ্যস্থানীয় মিল প্রবর্তন করিয়া উহার মন্থর-গম্ভীর গতির মধ্যে নূপুর-নিক্কণের দ্রুতাবর্তিত ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। পয়ার, ত্রিপদী ও আধুনিক বাংলা কবিতায় পরীক্ষিত নানা বিচিত্র ছন্দের সূচনা তাঁহার কাব্যে মিলে। গীতি-কবিতার উচ্ছ্বসিত সুর-প্লাবনকে তিনিই প্রথম নূতন ছন্দোবন্ধনে স্থিররূপ দিয়াছেন। এই বহিরঙ্গের পরিবর্তন গভীরতর অন্তরানুভূতির পরিবর্তনেরই প্রতীক ও প্রতিরূপ। অভিনব ছন্দোবৈচিত্র্যের পরিকল্পনা তখনই কবির মনে জাগে, যখন অজ্ঞাতপূর্ব নব রহস্যের বিস্ময়মণ্ডিত ভাবাকৃতি তাঁহার অন্তরে সঞ্চিত হইয়া বহিঃনিষ্ক্রমণের পথ খোঁজে। রসের নূতন আবেদন, অন্তর মধ্যে ভাবের বিচিত্র সঞ্চরণ—লীলাই নব ছন্দোময়ী বাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই দিক দিয়া জয়দেব কেবল যে নূতন ছন্দের প্রবর্তক তাহা নহে, বাঙালীর নূতন মনোজগৎ, অনুভূতি ও রূপানুরাগের বৈশিষ্ট্যেরও সূচনা করিয়াছেন তিনি।

গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে একটি প্রচলিত মতবাদ এই যে, ইহা আদৌ বাংলা বা প্রাকৃতে রচিত হইয়া পরে সংস্কৃতে অনূদিত হইয়াছিল। এই মত আক্ষরিকভাবে সত্য না হইলেও ইহার মধ্যে নিগূঢ়তর ভাব-সত্য নিহিত আছে। এই কল্পনা অন্ততঃ প্রাদেশিক ভাষার সহিত ইহার আত্মীয়তার ইঙ্গিত বহন করে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা জয়দেবের কাব্যে অধ্যাত্ম সত্যের মহিমা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়া বিগলিত ভাব-মাধুর্যের রূপসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে বৈষ্ণবের দেবতা ঐশ্বর্য পরিহারপূর্বক পারিবারিক জীবনের স্নেহপাশে, দাম্পত্য প্রেমের মধুর আত্মবিস্মৃত একাত্মতায় বন্দী হইয়াছেন, তাঁহারই প্রথম সূচনা পাই জয়দেবের কাব্যে। সংস্কৃতের অটল, দৃঢ়বদ্ধ গাম্ভীর্য হইতে দ্রবীভূত মাধুর্য-রঙ্গিমায়

রূপান্তরিত ভাষাই এই ভাবগত পরিবর্তনের সার্থক প্রতিবিম্ব। যে দেবতা ভাগবত ও পুরাণের তত্ত্বপ্রধান, ভক্তিকুণ্ঠিত আলোচনার মধ্যে সুদূর, অনধিগম্য সম্ভ্রমে বিবিক্ত ছিলেন, যাঁহার প্রতি মানবিক স্নেহ-প্রেমের স্ফুরণ দেব-ভাষার নির্লিপ্ত শীতলতার স্পর্শে জমিয়া তুষারের মত স্বচ্ছ কঠিন হইয়াছে, জয়দেবের কাব্যে তিনিই সোহাগে গলিয়া, মান-বিরহ-আকূতির তরঙ্গলীলায় আন্দোলিত হইয়া, আমাদের হৃদয়ের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন। জয়দেবের ভাষার ইন্দ্রজালই এই দূরত্বের নৈকট্য-বিধানে সহায়তা করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব জয়দেবের কবিতায় ঐশী প্রেমলীলার এই অভিনব মাধুর্যের রসাস্বাদন করিয়াছেন ও ইহাকে নব-ধর্ম-সংহিতার মর্যাদা দান করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের অন্তঃকৃষ্ণ, বহির্গৌররূপ দ্বৈতমূর্তির ন্যায় গীতগোবিন্দেরও দ্বৈতমূর্তি তাহার বৈশিষ্ট্যদ্যোতক ; বাহিরে সংস্কৃতের কাঠিন্য, অন্তরে বাঙালীর সুকুমার কোমলতা ইহার মধ্যে এক অপরূপ সমন্বয়ে সংসক্ত হইয়াছে।

২

এই যুগ-সৃষ্টিকারী কাব্যের আদর যে কোন কালেই কমে নাই তাহা ইহার টীকাকারদের প্রাচুর্য, ইহার পরম্পরাগত ব্যাখ্যার অবিচ্ছিন্ন ধারার দ্বারাই নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত। সম্প্রতি বাংলার প্রথিতনামা বৈষ্ণবসাহিত্যবিদ্ পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন বাংলা সরকারের অর্থানুকূল্যে ইহার একটি উপাদেয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংস্করণের সুদীর্ঘ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা বৈষ্ণব সাহিত্য, দর্শন ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিবিধ মহামূল্য তথ্যের খনিস্বরূপ। সুদূর বৈদিক ও উপনিষদ যুগে বৈষ্ণবধর্মের পূর্বাভাস, ভারতের নানাস্থানে আবিষ্কৃত শিলালিপি, প্রস্তরমূর্তি ও গ্রন্থাদিতে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ, ভাগবতে অনুল্লিখিতনাম্নী রাধার সাহিত্যে আবির্ভাব, ক্রমিক প্রসার ও তাহার প্রতি গভীর ভাবঘন অধ্যাত্ম তাৎপর্যের আরোপ, কবি-সাময়িকী, জনশ্রুতি-তথ্যে মেশান, ভক্ত-কল্পনা-রচিত কবি-জীবনী—এই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ তথ্যালোচনা একত্র সংগৃহীত হইয়া জয়দেবের কাব্য-পরিবেশের উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছে ও কাব্যরসাস্বাদনের নূতন উপাদান ও দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পাঠককে পরিচিত করিয়াছে। বৈষ্ণব দার্শনিক তত্ত্বের সহিত গীতগোবিন্দের সম্পর্ক, একদিকে

ভাগবত, অন্যদিকে পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সহিত ইহার তুলনামূলক বিচার ইতিহাসে গীতগোবিন্দের স্থান-নির্ণয়ের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে। সাহিত্যরত্ন মহাশয় ভূমিকাতে পূজারী গোস্বামীর যে টীকা উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে জয়দেবের প্রাচীন প্রচলিত ব্যাখ্যার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানলাভের যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গীতগোবিন্দের সর্গবন্ধ, রাগ-তাল-প্রকরণ ও পাঠভেদ সম্বন্ধে নানা মৌলিক, কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য সন্নিবিষ্ট হইয়া ভূমিকার মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। সদুক্তিকর্ণামৃত হইতে উদ্ধৃত জয়দেবের শ্লোকাবলী ও পুরীধামে প্রাপ্ত দ্বিতীয় জয়দেব কবির বৈষ্ণবামৃত বা পীযূষলহরীর সন্নিবেশ জয়দেবের কবি-প্রতিভার স্বরূপ-নির্ধারণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে ও তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত সংস্কারের অনেকটা পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। সাহিত্যরত্ন মহাশয় একাধারে বৈষ্ণবদর্শনে সুপণ্ডিত ও কাব্যরস-গ্রাহিতার, তীক্ষ্ণ রসবোধ ও বিচারবুদ্ধির অধিকারী; এবং এই উভয় গুণের সংমিশ্রণ তাঁহার ভূমিকার জন্য আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সম্মানজনক আসন নির্দেশ করিয়াছে। তাঁহার প্রদর্শিত আলোকে গীতগোবিন্দ পাঠ করিয়া পাঠক ইহার মধ্যে নূতন অর্থদ্যোতনা, ভক্তি ও প্রেমরসের সার্থক স্ফুরণের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া মুগ্ধ হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই। আমি তাঁহার ভূমিকানিহিত সূত্র অনুসরণ করিয়াই জয়দেবের কাব্যের কিছু আলোচনার চেষ্টা করিব।

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যকে ঐতিহ্যের মানদণ্ডে বিচার করিলে উহাকে একটি পারম্পর্যসূত্র-গ্রথিত পুষ্পমাল্যের সহিত উপমিত করা যাইতে পারে। বিভিন্ন কবি হয়ত নূতন ফুল আহরণ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু নব-আহরিত ফুলগুলি প্রাচীন সূত্রেই গ্রথিত হইয়াছে এবং কবি ও পাঠক-সম্প্রদায়ের বিচারে ফুল হইতে সূত্রের মূল্যই অধিক। কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-স্ফুরণের পূর্বে কাব্য-রচনা গোষ্ঠীমনোভাব-শাসিত ছিল। যে-কোন নূতন কবি আবির্ভূত হইতেন, তাঁহার মৌলিকতা অপেক্ষা তাঁহার প্রথানুবর্তন-কুশলতা, অলঙ্কার-নির্দিষ্ট রীতির সার্থক অনুসৃতিই অধিক আদরণীয় হইত। কাজেই এই পূর্ব ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়া শুধু স্বাধীন রসবোধের আদর্শে কোন প্রাচীন কবির বিচার তাঁহার যথার্থ মূল্য-নির্ধারণের সহায়ক না হইয়া পরিপন্থীই হইত। বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহ্যের কথা চিন্তা করেন নাই বলিয়াই জয়দেবের কাব্যকে মদন-

মহোৎসব আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। আধুনিক রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ অনুযায়ী এইরূপ সংজ্ঞাই যথার্থ বিবেচিত হইবে। কিন্তু কবি ও পাঠকের উদ্দেশ্যের মর্যাদা এইরূপ ব্যাখ্যায় রক্ষিত হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বরগুপ্তের অশ্লীলতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে জয়দেব সম্বন্ধে আরও সার্থকভাবে প্রযোজ্য তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যে মুহূর্তে ভাগবতকার রাসলীলার মাধ্যমে অধ্যাত্মসাধনার উন্নততম উৎকর্ষ ব্যঞ্জিত করিয়াছেন, সেই মুহূর্তেই শৃঙ্গার-রসের সহিত ভক্তিরসের অবিচ্ছেদ্য, চিরন্তন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কামকলাকুতূহল ভগবল্লীলার রসাবিষ্ট অনুধ্যানের শ্রেষ্ঠ উপায়ের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। সেইদিন হইতেই দেহসম্ভোগের অনাবৃত বর্ণনা, কেলি-বিলাসের অসংবৃত উচ্ছ্বাস কলঙ্কমুক্ত হইয়া ভক্ত ও রসিক হৃদয়ে অবাধ প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। উহার ভাবের বিশুদ্ধি উহার বস্তুগত অসংযমের উপর জয়ী হইয়াছে; রতি-প্রসাধনের ভিতর দিয়া আরতির ধূপ-সৌরভ উত্থিত হইয়া আকাশকে সুরভি-সমাকুল করিয়াছে। সুতরাং জয়দেবের কাব্যে ও উহার অনুসরণে বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে রূপ-মুগ্ধতার আতিশয্য দেখিয়া কাহারও কোন সংকোচ অনুভবের প্রয়োজন নাই—রূপের ভিতর দিয়াই অরূপের স্পর্শ বৈষ্ণব সাধনার সর্বজন-স্বীকৃত, ভক্ত-দৃষ্টান্ত-সমর্থিত পন্থারূপে গৃহীত হইয়াছে। জয়দেব যখন তাঁহার কাব্য-প্রারম্ভে হরি স্মরণে চিত্ত-সরসতা ও বিলাসকলাকুতূহলকে সমপর্যায়ভুক্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন. তখন টীকাকারের পক্ষে বিলাসকলাকে কেবল হরিলীলা-বিষয়ে সীমাবদ্ধ করিয়া উহার ভাব-বিশুদ্ধি রক্ষার চেষ্টাকৃত প্রয়াস অপ্রয়োজনীয় ত বটেই, সমগ্র বৈষ্ণব রসতত্ত্বের বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। চিত্তের সৌন্দর্য-প্রবণতা যখন মধুর রস-ভজনার অপরিহার্য প্রস্তুতি, তখন ইহাকে জোর করিয়া ধর্মতত্ত্বমাত্রাত্মক না করিলেও ক্ষতি নাই।

এ বিষয়ে দুইটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, অধ্যাত্ম সাধনায় রূপমুগ্ধতা ভারতীয় জীবনে এরূপ প্রাধান্য লাভ করিল কেন? দ্বিতীয়তঃ, এই রূপানুরাগ কি সর্বত্র ইন্দ্রিয়বিলাসমুক্ত ভাবতন্ময়তা, উপায় কি কখনই উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই? যাত্রাপথের রমণীয়তা, দেহ-সৌন্দর্যের আকর্ষণ কি কবি-সাধককে তাঁহার চরম লক্ষ্য হইতে, রূপাতীতকে লাভ করিবার একান্ত আগ্রহ হইতে কখনও কখনও ভ্রষ্ট করে নাই? মদন-মহোৎসব-

বর্ণনার উচ্ছ্বসিত আতিশয্যের মধ্যে এই শাশ্বত দিব্য অনুভূতি, পারমার্থিক তত্ত্বচেতনা কি মাঝে মধ্যে ক্ষণিক বিস্মৃতির যবনিকান্তরালে অন্তর্হিত হয় নাই? ভোগের মাঝে বৈরাগ্যের, রতির মাঝে আরতির সুর কি সর্বদা অবিসংবাদিতভাবে ধ্বনিত হইয়াছে? পার্থিব সৌন্দর্যের নিবিড় মায়া, মানবিক প্রেমের অসংবরণীয় রসবিহ্বলতা কি ইহাদের সূক্ষ্মতর ঐশী অনুরণনকে ছাপাইয়া উঠিয়া আত্ম-ঘোষণা করে নাই? জয়দেবের কাব্য, তথা সমগ্র পদাবলী-সাহিত্য সম্বন্ধে এবংবিধ জিজ্ঞাসার অবসর আছে।

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে এই উত্তর দেওয়া চলে যে, প্রত্যেক জাতিরই ধর্মসাধনার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা ইহার জাতীয় জীবনের বিশেষ প্রবণতার উপর নির্ভরশীল। যে জাতির মধ্যে সৌন্দর্যপিপাসা ও পরমার্থতত্ত্ব—জিজ্ঞাসা সমভাবে প্রবল, তাহার চিত্তাভিব্যক্তির মধ্যে এই দুই বৃত্তির নিবিড় পারস্পরিক সংযোগ নিতান্ত স্বাভাবিক। ইহার জীবনে অধ্যাত্ম আকুতি যত তীব্র, যত সর্বাতিশায়ী হইবে ততই ইহা মানবের শ্রেষ্ঠতম অনুভূতি, তাহার প্রেমের মুগ্ধ ভাবাতিশয্যের সমীপবর্তী হইবে; উহারই অর্ধস্ফুট, ভাবরুদ্ধ বাণী, উহারই অপরিমেয় অতৃপ্তি, উহারই কামনার রক্তিম বর্ণাঢ্যতা অনিবার্যভাবে এই শ্রেয়োসন্ধানের অঙ্গীভূত হইবে। বাইবেলের কোন কোন প্রাচীন অংশে নর-নারীর প্রেমের আবেগবিহ্বলতা ভগবানের প্রতি নিবেদিত হইয়াছে। ভারতে যতদিন ভগবদারাধনা কর্মানুষ্ঠান ও জ্ঞানানুশীলনের পথ অবলম্বন করিয়াছিল, ততদিন ইহার মধ্যে মধুর রসের খুব বেশি প্রভাব ছিল না। কিন্তু যখন হইতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া মানবিক সুকুমার বৃত্তিসমূহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, ভক্তিপ্রেম-বাৎসল্য মনন-প্রধান ব্রহ্মানুভূতির শৈল-দেহে ভাব-মন্দাকিনীর প্রস্রবণ ছুটাইল, ধ্যানের আত্মসমাহিত নির্জনতার মধ্যে ব্যাকুল হৃদয়াবেগের বিচিত্র গীতিমূর্ছনা এক অপরূপ সুরলোকের সৃষ্টি করিল, তখন হইতে আমাদের সাধনা-পদ্ধতিতে এক বিস্ময়কর, বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হইল। ভাবোন্মত্ত কল্পনা, হৃদয়ের গহন গভীরতা হইতে উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাস, দেহের প্রতি রক্তবিন্দু, মনের প্রতি অনুভূতি-কণিকার মধ্যে পরিব্যাপ্ত উদগ্র আকাঙ্ক্ষা শত ব্যগ্র বাহু বিস্তার করিয়া অপ্রাপনীয়ের দিকে ধাবিত হইল। মানবাত্মার এই অভিযানের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া কবি জয়দেব ইহার মধ্যে প্রথম গতিবেগ সঞ্চারিত করিলেন। ভাগবতে যে অভীপ্সার আভাসে-ইঙ্গিতে অর্ধ-

প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল, জয়দেবে তাহাই পূর্ণ, অনাবৃত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

এই কামনার রূপকে অর্ধাবৃত অধ্যাত্ম অভীপ্সার প্রকৃত উৎস শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের—লোকোত্তর মহিমা ও মাধুর্য। জগতের অন্য কোন ধর্মে, এমন কি হিন্দু ধর্মের অন্যান্য অবতারের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের মত এরূপ অপরূপ আকর্ষণ-শক্তি-মণ্ডিত, বিচিত্র ব্যক্তিত্বের অনুরূপ কিছু মিলে না। অবশ্য অবতারবাদের মধ্যে ভগবানে মানবিক গুণের আরোপ ও মানবিক বৃত্তির ভিতর দিয়া তাঁহার সাধনা-রহস্য নিহিত আছে কিন্তু অন্যান্য অবতার সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত মানবিক সম্বন্ধ-স্থাপন খুব বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবতার রামচন্দ্র পিতৃভক্ত পুত্র, আদর্শ স্বামী ও ভ্রাতা, ও প্রজারঞ্জক শাসকরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন, কিন্তু মোটামুটি এই শ্রেণীগত পরিচয়ই তাঁহার ব্যক্তি-সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। পারিবারিক ব্যাপারের বাহিরে তিনি যে সমস্ত মানবিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উদারতা ও আশ্রিত-বাৎসল্যের নিদর্শন মিলে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়াবেগের স্ফুরণ খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। তিনি গুহক চণ্ডাল, বানর সুগ্রীব ও রাক্ষস বিভীষণের সঙ্গে মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু এই সম্বন্ধগুলির মধ্যে সখ্যরসের বিশেষ কোন উচ্ছ্বাস দেখা যায় না। এই সৌহার্দ্য-বন্ধন মুখ্যত রাজনৈতিক ও সামাজিক উদারতা-প্রসূত, কিন্তু ইহা যে হৃদয়ের গভীর উৎস হইতে উদ্ভূত বা সহজ প্রীতির মাধুর্যে অভিষিক্ত এরূপ ধারণা আমাদের হয় না।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বেলা দেবের মধ্যে মানবিকতার এক সম্পূর্ণ অভিনব বিকাশ ঘটিয়াছে। দশরথ রামচন্দ্রের শোকে প্রাণ-বিসর্জন করিয়াছেন, কৌশল্যা তাঁহার নির্বাসনে যথেষ্ট খেদ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরিয়া নন্দ-যশোদার যে অজস্র বাৎসল্যরস শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, যে অন্ধ স্নেহাতিশয্য অতি তুচ্ছ আশংকায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, রামচন্দ্রের ক্ষেত্রে অপত্য-স্নেহের সেই অহেতুক ব্যাকুলতা, সেই আত্মভোলা মোহ আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে না। এ যেন ভালবাসার বাঁধাধরা বরাদ্দ, ঔচিত্যবোধ-নিয়ন্ত্রিত অভিব্যক্তি। রামচন্দ্র তাঁহার বিনয়-নম্রতা, তাঁহার আত্মবিস্মৃত দীনতা, আদর্শনিষ্ঠা ও উদাত্ত চরিত্র-গৌরবের জন্য আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, কিন্তু তাঁহার আভিজাত্য কোন দিনই সাধারণ মানবের সমতল-ভূমিতে নামিয়া আসে নাই। কৃষ্ণ একেবারে

আমাদের ঘরের ছেলে ; তাঁহার দুরন্তপনা, শৈশবচাপল্য তাঁহাকে আমাদের অন্তরের স্নেহ-প্রেমের রাজ্যে অসপত্ন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহার বাঁশীর স্বরে বৃন্দাবনের তরু-লতা, পশুপক্ষী, গোপবধূর চিত্ত ও রাধিকার উদ্‌ভ্রান্ত প্রণয়াবেগের সহিত আমরাও একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। তিনি নিজে মধুর রসের মূর্ত বিগ্রহ বলিয়া ভক্তের চিত্তে মধুর রসেরই উদ্বোধন করিয়াছেন। তাঁহার মধুর মুরলীধ্বনিতে যেমন শিলা দ্রবীভূত হইয়াছে, যমুনা উজান বহিয়াছে, তেমনি জয়দেবের গীতগোবিন্দেও সংস্কৃত কাব্যের চিরাচরিত রীতির বৈপরীত্য সাধিত হইয়াছে, তাঁহার শ্বেতমর্মর-রচিত মসৃণতার বক্ষ ভেদ করিয়া দুরন্ত ভাব-নির্ঝরিণী চটুল নৃত্যচ্ছন্দে আপনাকে উন্মুক্ত করিয়াছে। ভগবানকে মধুর রসে উপাসনা করিতে হইলে যে সৌন্দর্যময় প্রতিবেশ, যে ভাবাকুলতা, হৃদয়ের মধ্যে যে বিপুল উদ্বেলিত আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রয়োজন, গীতগোবিন্দ সেই প্রয়োজনেরই প্রথম সার্থক বাণীরূপ।

শৃঙ্গাররসের সহিত ভক্তিরসের সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, কাব্য-সাহিত্যে শৃঙ্গার-রসের বান ডাকিয়া গেল। সংস্কৃত কাব্যের চিরন্তন সৌন্দর্য-প্রবণতা অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার সমর্থন পাইয়া, ভক্তিরসে শোধিত হইয়া আরও নিঃসংকোচে নিজ মায়াজাল বিস্তার করিল। এই সঙ্গমতীর্থে ভোগরসিক ও ভক্তিরসিক উভয়েই আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। কামকলার মাধ্যমে ভগবৎ-ভজনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কাম মানবের আদিমতম ও প্রবলতম রিপু, এই প্রবৃত্তির দুর্নিবার রমনীয়তাকে যদি ভগবদ্‌মুখী করা যায়, তবে সাধনা-পথের প্রধান বিঘ্নকে সিদ্ধির প্রধান সহায়ে রূপান্তরিত করা সম্ভব। মানবচিত্তের প্রবলতম প্রেরণা, তাহার জীবনীশক্তির কেন্দ্রীয় উৎস যদি ঊর্ধ্বায়িত হয়, তবে তাহার মোক্ষ-পথে অগ্রগতি যে বেগবান ও অপ্রতিরুদ্ধ হইবে, তাহা সহজেই বোঝা যায়। বৈষ্ণব দর্শন ও পদাবলী-সাহিত্যে সাধনার এই রূপটিই অনুপম মাধুর্য ও গভীরতম অনুভূতির সহিত চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিষধর কালীয়নাগের সহস্র ফণার উপর দাঁড়াইয়া নিজ নৃত্যচপল চরণপাতে এই ফণাগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছিলেন, তেমনি বৈষ্ণব কবি কামনানাগিনীর বিষদন্ত উৎপাটন করিয়া ইহাকে সাধনার কিঙ্করীতে পরিণত করিয়াছেন। বিষ যদি অমৃত হয়, বাধা যদি সহায়ক হয়, তবে চরম সিদ্ধি সাধকের করতলগত হইতে বিলম্ব হয় না। জয়দেবের কাব্যে বৈষ্ণব-সাধনার এই প্রথম সূচনা তাঁহার অতিপল্লবিত সৌন্দর্য-বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

তিন

জয়দেব বৈষ্ণব সাধনার উৎস, ইহা সর্বস্বীকৃত। তথাপি তাঁহার কাব্যে যে ইহার চরমোৎকর্ষ, ইহার অবিমিশ্র বিশুদ্ধ রূপটি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, এরূপ দাবী ভক্তজন-সমর্থিত হইলেও সমালোচকের সম্পূর্ণ অনুমোদন লাভ করিবে না। গীতগোবিন্দে ভগবানের ঐশ্বর্যরূপ যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—তাঁহার মাধুর্য যেন এই চোখ-ধাঁধানো ঐশ্বর্যের অন্তরাল হইতে ঈষৎ উঁকি দিতেছে। ঐশ্বর্য-দীপ্তি-বিচ্ছুরিত ভাবমণ্ডলে মাধুর্যের স্নিগ্ধ কমনীয়তা যেন কতকটা সসংকোচে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমবিহ্বল অবস্থার বর্ণনার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদ্যোতক অলৌকিক শক্তির বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে—তাঁহার 'কংসারি', 'কেশীমথন' প্রভৃতি আখ্যার মধ্যেই তাঁহার শক্তিমত্তা সম্বন্ধে সচেতনতা পরিস্ফুট হইয়াছে। জয়দেব যখন রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার আখ্যায়িকা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কৃষ্ণের ঐশ্বর্য দ্রবীভূত মাধুর্য-ধারায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই, উহার মাধুর্যে রূপান্তর-সাধন কেবল আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। সম্পাদক মহাশয় যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে, জয়দেবের 'দেহিপদপল্লবমুদারং' এই অর্ধপংক্তি-সংযোজনার সংকোচ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহাই তাঁহার ঐশ্বর্য-মাধুর্যের মধ্যে দোলায়িত, দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তবৃত্তির নিদর্শন ও প্রতীক। শেষে ভগবান স্বয়ং আসিয়া ভক্তের হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়া তাঁহার দ্বন্দ্ব-সংকোচের অবসান ঘটাইলেন, নিজ কিরীটরশ্মিমণ্ডিত মস্তক শ্রীরাধার পদারবিন্দে লুটাইয়া আপনার রাজ-সম্মান চিরতরে বিসর্জন দিলেন। সমস্ত পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতা এই 'দেহি পদপল্লবং'-এর সুরে বাঁধা। শুধু জয়দেব নয়, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যেও বৈষ্ণব ভাবাদর্শের চরমোৎকর্ষ স্ফুরিত হয় নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে রাধার বিরহব্যাকুল আত্মনিবেদনের মধ্যে প্রেমের সর্বত্যাগী মহিমার সুরটি প্রথম বাজিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতিতে নানা নিম্ন পর্যায়ের ভাবের মধ্যে স্থানে স্থানে বৈষ্ণব সাধনার অপ্রাকৃত ভাব-মাধুর্য আমাদের মনে অসীম ব্যঞ্জনার রেশটি জাগাইয়া তোলে। প্রাক্‌-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণব সাধনার পূর্ণ আদর্শটি যে কবি-চিত্তকে অধিকার করে নাই, ইহা ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের দিক দিয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যাঁহারা চৈতন্য-চন্দ্রের অপরূপ-স্নিগ্ধ-প্রেম-কৌমুদী-প্লাবিত, দিব্যোন্মাদে আত্মহারা জীবনলীলা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদের নিকট রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মর্মগত

তাৎপর্য, ইহার মাধুরীর পূর্ণ অনুভূতি উদ্‌ঘাটিত হওয়া সম্ভব ছিল না। যে ভোগ-লালসা, সৌন্দর্যমোহ এই প্রেমের স্থূল দেহের বহিরাবরণ রচনা করিয়াছিল, শ্রীচৈতন্যের মুগ্ধ দৃষ্টি, তাঁহার ভাবস্বচ্ছ অনুভূতি সেই আবরণ ভেদ করিয়া তাহার মর্মকোষলগ্ন বিশুদ্ধ রূপটি, তাহার অন্তরশায়ী অপ্রাকৃত সৌরভটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, দেহের অন্তর্লীন আত্মাকে রূপ-রসের বন্ধনে বন্দী করিয়া ভক্তের গোচরীভূত করিয়াছিল। জয়দেব ও চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে এই দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্বের পরিপূর্ণ নিরসন হয় নাই।

জয়দেবের প্রাচীন টীকাকার-গোষ্ঠী ও তাঁহাদের অনুসরণে সাহিত্যরত্ন মহাশয় জয়দেবকে পদাবলী-সাহিত্যের উৎস বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার কাব্যবিচারে পরবর্তী যুগের বৈষ্ণবভাবাদর্শের পূর্ণ পরিণত রূপটিকেই মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের প্রতিটি উক্তির প্রতি ভাবোচ্ছ্বাসকে তাঁহারা বৈষ্ণব দার্শনিক সিদ্ধান্তের পরিপোষকরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই মনোভাব ভক্তের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও ইতিহাসের ক্রমপর্যায়রীতির বিরোধী। শ্রীমন্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের মধ্যে বৈষ্ণবতত্ত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার সর্বাতিশায়ী শ্রেষ্ঠত্বের যে প্রমাণ ভাগবতে অনুল্লিখিত আছে, তাহা গীতগোবিন্দের একটি শ্লোকের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া বৈষ্ণব-শাস্ত্র মধ্যে গীতগোবিন্দকে শ্রেষ্ঠতম প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা দিয়াছেন। রাধাতত্ত্ব প্রতিপাদনে গীতগোবিন্দের যে অবদান তাহাই উহাকে চৈতন্যোত্তর যুগে রচিত ভক্তিশাস্ত্রসমূহের পুরোভাগে স্থান দিয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য ও সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর সাম্য সত্ত্বেও, ভক্ত-সাধকের দিব্যানুভূতির নিকট যে ভবিষ্যৎ তত্ত্বরহস্য সহজ সংস্কার রূপে প্রতিভাত হয়, ইহা মানিয়া লইলেও, জয়দেব যে যুগপ্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া প্রায় চারি শতাব্দী পরবর্তী লেখকগোষ্ঠীর সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন, এরূপ ধারণা অনৈতিহাসিক। অবশ্য স্থানে স্থানে কেলিবিলাস-বর্ণনার আতিশয্যের মধ্যে গভীর ভাবদ্যোতনা, অসীমের স্পর্শাভিলাষী চিত্তের একাগ্র আকূতি অনুভব করা যায়। চরিতামৃতকার যে শ্লোকের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাম্
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ।

—গীতগোবিন্দ ৩,২

তাহার মধ্যে শঙ্খমধ্যে সমুদ্র-স্বননের ক্ষীণ আভাষের মত একটা অনন্তাভিমুখী সংকল্পের দৃঢ়তা, একটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের অনুরণন বাজিয়া উঠে। "মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা" প্রভৃতি মন্তব্যের মধ্যে চৈতন্যোত্তর যুগের ভাব-তন্ময়তা, ধ্যানসমাহিত চিত্তের মধুর আত্মবিস্মৃতি আমাদের মনে আকস্মিক দোলা দিয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত দৃষ্টান্ত ব্যতিক্রম। কবিরাজ গোস্বামী রাধার রূপমাধুরী, দেহ-প্রসাধন, এমন কি খট্টা পর্যন্ত গৃহসজ্জার উপকরণের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জয়দেব তাহাতে সম্পূর্ণ সায় দিতেন কি না সন্দেহ। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'নন্দনিদেশতঃ' শব্দটির অর্থকে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুমোদিত ও সমাজপ্রচলিত ঔচিত্যবোধের অনুসারী করিতে টীকাকারগণ যে কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা 'সদুক্তিকর্ণামৃত' হইতে উদ্ধৃত সমসাময়িক কবিরচিত অনুরূপ শ্লোকের প্রমাণ হইতে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। রাজসভার চটুল আমোদপূর্ণ প্রতিবেশে, যুগের বিকৃত সৌন্দর্যরুচির তৃপ্তির প্রয়োজনে ও সুপ্রাচীন আদিরসপ্রধান কাব্যধারার ঐতিহ্যানুবর্তনে রচিত কাব্যের মধ্যে ভক্তহৃদয়ের সদ্যোজাগ্রত আকূতি, নবধর্মসাধনার প্রথম বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ ইঙ্গিত যতটুকু অনুপ্রবিষ্ট করা যায়, জয়দেব তাহাই করিয়াছেন। গীতগোবিন্দ রচনার সময় তিনি যে উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিধিবদ্ধ নির্দেশের কথা চিন্তা করেন নাই তাহা নিরাপদে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। জয়দেবের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তাঁহার সাধনাবলে সুদূর ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহ উজান বহিয়া কেন্দুবিল্ব-প্রান্তবাহী অজয়ের জলস্রোতে মিশিয়া যাইত ও সাধক-প্রবর সেই পবিত্র সঙ্গমতীর্থে স্নান, তর্পণ, ইষ্টপূজা সমাপ্ত করিতেন। এই কিংবদন্তী তাঁহার সাধক-জীবন হইতে কাব্যজীবনেও সংক্রামিত হইয়াছে। চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্ম যে কালের স্বাভাবিক গতির বিপরীত মুখে প্রবাহিত হইয়া দ্বাদশ শতকের কাব্যধারার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, পরবর্তীযুগের ভাবস্রোত যে উজান বহিয়া অতীতের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, এই অলৌকিক প্রক্রিয়া ভক্তের দ্বিধাহীন বিশ্বাসের নিকট গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতির মানদণ্ডে ইহা ঠিক বিচারসহ নহে। জয়দেবের কবিতা বৈষ্ণব কাব্যরীতির আদিম উৎস ইহা অবিসংবাদিত সত্য, কিন্তু এই ক্রমবিস্তারশীল স্রোতোধারার সমগ্র ভবিষ্যৎ ইতিহাস ইহার মধ্যে প্রতিবিম্বিত দেখিবার আশাকে ঠিক সঙ্গত বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

ধর্মগ্রন্থ হিসাবে ইহার শ্রেষ্ঠতা ছাড়াও কেবল কাব্য হিসাবে ইহার সৌন্দর্যসৃষ্টি অনবদ্য ও ইহার রস-আবেদন চিরন্তন। ইহা বাঙালী প্রতিভার মৌলিকতার বিশিষ্ট নিদর্শন। সংস্কৃত কাব্যের মত প্রথাবদ্ধ, ঐতিহ্যশাসিত সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব প্রবর্তন করা অল্প কৃতিত্বের ব্যাপার নহে। সেই অনন্যসাধারণ কৃতিত্বই জয়দেবের প্রাপ্য। সংস্কৃতের সুসংযত, সুগম্ভীর, মহিমান্বিত পদক্ষেপের মধ্যে তিনি অনাগত বাংলা সাহিত্যের নৃত্যছন্দ, ইহার প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস, প্রেমানুভূতির বিপুল আত্মহারা ব্যাকুলতা, ইহার ভক্তিরসের আভাস—ব্যঞ্জনাজড়িত ঊর্ধ্বায়ন প্রবর্তন করিয়া কাব্যের ভাবপরিধি বর্ধিত ও ইহার ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। জয়দেবের মধ্যে বীজাকারে যাহা নিহিত, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতিতে তাহাই অঙ্কুরিত ও প্রেমধর্মের অবতার শ্রীচৈতন্যে তাহা জীবন-ছন্দে হিল্লোলিত। জয়দেব-বৃক্ষের অন্তর্গূঢ় রসপান করিয়া, তাহার ভাব-বর্ষণের অবিরল ধারায় অভিস্নাত হইয়াই শ্রীচৈতন্যের দেহে মনে পুলক-কদম্ব শিহরিয়া উঠিয়াছিল। পদাবলী-সাহিত্যে এই পুলক-শিহরণই, পুষ্পকোরক মধ্যে সৌরভের ন্যায়, কোমলকান্ত ভাষার আলিঙ্গন-পাশে চিরকালের জন্য ধরা দিয়াছে। বাঙালীর সমস্ত সংস্কৃতি ও সাধনা, তাহার সাহিত্য ও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জয়দেবের আদিম অনুপ্রেরণার নিকট ঋণী। তাঁহারই মাধ্যমে বাঙালী তাহার হৃদয়াবেগের মাধুর্য, তাহার কল্পনার রমনীয়তা সমস্ত ভারতে প্রসারিত করিয়াছে। গীতগোবিন্দের আবেদন শাশ্বত, চিরন্তন, সাময়িক রুচি-পরিবর্তনের অতীত। জয়দেব হইতে যে বাঙালীর মানস জন্মের আরম্ভ, ইহা উপলব্ধি করিলে আমাদের অতীত সংস্কৃতির উদ্ভব-রহস্য আমাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ হইবে ও আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথও সাময়িক উদ্‌ভ্রান্তির কুহেলিকাজাল হইতে মুক্ত হইয়া দিগন্ত-প্রসারিতরূপে দেখা দিবে।

মহাকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্য-সাধনা

বৈষ্ণব জগতে কৃষ্ণদাসের অমর গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠার কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা অবিমিশ্র কবিত্বশক্তির উৎকর্ষের জন্য নহে। সরল ও মর্মস্পর্শী বর্ণনায় বৃন্দাবন দাস বা লোচন দাস নিতান্ত উপেক্ষণীয় প্রতিযোগী নহেন; এমন কি বহু স্থানে তাঁহাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূত হয়। কৃষ্ণদাস কেবল কবিত্বশক্তির অনুশীলনের ক্ষেত্রস্বরূপ চৈতন্যদেবের জীবনের উপাদানকে ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে যে কাব্য-সৌন্দর্য আছে, তাহা গৌণ ও মনে হয় যে, লেখকের অনভিপ্রেত। ভক্তিরস, বিবেক ও বিনয়ের অবতার কবি নিজ বিষয়-গৌরবের মাহাত্ম্যে এত অভিভূত যে সচেতন সৌন্দর্য-সৃষ্টির শিল্পী মনোভাব তাঁহার মধ্যে প্রায় অলক্ষ্য বলিলেই হয়। কাব্য-রচনা বিষয়ে তিনি যেন এক রহস্যময় দৈবশক্তির অর্ধ-অচেতন বাহন মাত্র। চৈতন্যদেবের লোকোত্তর মহিমা যেন তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজ অন্তর্নিহিত শক্তির প্রেরণায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সচেতন সৃষ্টিকর্তার অভিমানের সম্পূর্ণ বিসর্জনে, আত্মদীনতার একান্ত অনুভবে ও সময় সময় কাব্যোচিত সুষমার প্রতি উদাসীনতায় তিনি সাধারণ কবিগোষ্ঠী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর লেখক।

তাহা হইলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বৈশিষ্ট্যের মূলসূত্র কোথায়? আমার মনে হয় যে, তাঁহার বৈশিষ্ট্য দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। **প্রথমতঃ**, তাঁহার গ্রন্থে চৈতন্যদেবের লোকোত্তর চরিত্রটি সর্বপ্রথম এক রসঘন ভাবসংহতির রূপ ধারণ করিয়াছে—তাঁহার নানা অলৌকিক ঘটনার মধ্যে কৃষ্ণদাস একটি কলাগত সুষমা ও ভাব-সমগ্রতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। **দ্বিতীয়তঃ**, ইহাতে চৈতন্যজীবনী এক স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্ব-বিরোধশূন্য দার্শনিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বিধৃত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের প্রায় ৮০ বৎসর পরে কবিরাজ গোস্বামীর জীবনী রচিত হয়। এই আশী বৎসর ধরিয়া চৈতন্য-জীবনের ঘটনাবলী অনাবিল ও অজস্র ভক্তিরস-বিধৌত হইয়া, নানা ভক্তের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাক্ষ্যে, সুসংবদ্ধ ধর্মমতের কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রণে, দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর বাস্তবাতিসারী তাৎপর্য-বিশ্লেষণে

ধীরে ধীরে এক নূতন অধ্যাত্ম সত্তার ভাব-উপাদানে রূপান্তরিত হইতেছিল। যাহা লৌকিক, যাহা স্থূল, যাহা বহির্মুখী, যাহা স্থান-কালে সীমাবদ্ধ তাহা ভক্তের চোখে, কবির সৌন্দর্যানুভূতিতে ও দার্শনিকের শাশ্বত সত্যানুসন্ধিৎসার মধ্যে এক নূতন ভাব-ব্যঞ্জনার কিরণসম্পাতে ভাস্বর হইয়া চিরন্তন রস ও রহস্যলোকের সূক্ষ্ম, সুকুমার পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছে। তথ্যের এই সুকুমার রূপান্তরটাই কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থেব বিশেষ পরিচয়।

তাঁহার পূর্ববর্তী জীবনীগ্রন্থে চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা সেরূপ সবিস্তারে বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু পঞ্চমাঙ্কহীন নাটকের মত লীলারসের দিব্যোন্মাদবর্জিত চৈতন্য-জীবনী অঙ্গহীন ও কেন্দ্রিকতাভ্রষ্ট। এই শেষ কয়েকটি বৎসরের লীলার মধ্যেই তাঁহার জীবনের পূর্ণ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নিহিত আছে। তাঁহার পূর্ব জীবনের সমস্ত ভাবৈশ্বর্য এই চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুতিমাত্র। তাঁহার অজস্র-প্রবাহিত ভাবধারার শাখা-নদীসমূহ নীলাচলপ্রান্তবর্তী মহাসমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বিলীন হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের অঙ্কিত চিত্রেই শ্রীচৈতন্যের দেবকান্তি পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনিই সহস্র সহস্র বৈষ্ণব ভক্তের মনে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার কারুণ্যসিক্ত অলৌকিক মহিমাটি অবিস্মরণীয়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিয়াছেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল দার্শনিকতার সহিত কাব্যের বিচিত্র সমন্বয়। তাঁহার রচনায় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের অতি নিগূঢ় দার্শনিক আলোচনা কাব্যরসমণ্ডিত হইয়া একাধারে জ্ঞান, ভক্তি ও সৌন্দর্য-পিপাসার পরিতৃপ্তি ঘটাইয়াছে। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের দার্শনিক পটভূমিতে সন্নিবেশ ভারতীয় ধর্মসাধনার সনাতন বৈশিষ্ট্য। এই রূপান্তর-সাধন প্রধানতঃ রূপ, সনাতন, জীব ও অন্যান্য বৃন্দাবনবাসী গোস্বামী-গোষ্ঠীর প্রভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। একদিকে যখন বাঙলা দেশ চৈতন্যপ্রেমে মাতোয়ারা, তাহার আকাশ-বাতাস কীর্তনের রোলে মুখরিত ও পদাবলী-সাহিত্যের মাধুর্যরসে অভিসিঞ্চিত, তখন অন্যদিকে বৃন্দাবনের নির্জন সাধনাতীর্থে গোস্বামীবৃন্দ এই ভাবমত্ততার প্রভাবমুক্ত হইয়া নবজাত ধর্মের ও সাহিত্যের অলঙ্কারশাস্ত্র ও দার্শনিক ভিত্তিভূমি রচনায় প্রশান্ত নিষ্ঠার সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে কোন ধর্মকে ধর্মোচিত মর্যাদা দিতে হইলে শুধু তাহার কর্মনিষ্ঠা ও হৃদয়াবেগের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; তাহাকে দার্শনিক যুক্তিবাদের অপরিবর্তনীয় আশ্রয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া

উপনিষদ ও গীতার সমপর্যায়ভুক্ত করিতে হইবে। ভাবোচ্ছ্বাস অচিরস্থায়ী; কর্ম-প্রচেষ্টা যতই উপাদানবহুল হউক না কেন, উহা বুদ্বুদের মত বিলয়শীল। কিন্তু এই ভাবযমুনাকে দার্শনিকতার দৃঢ় তটভূমির মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারিলে উহার প্রবাহকে চিরন্তন করা যায় এবং সেই সুরক্ষিত তটের উপর কর্মের কীর্তিমন্দির নির্মাণ করিলে তাহা কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবে না।

রসজ্ঞ সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় স্ত্রীলোকের রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে রমণীর করাভরণ বলয়-কঙ্কনের উপযোগিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, সর্বাঙ্গে প্রবহমান রূপধারা যাহাতে উপচাইয়া পড়িয়া নষ্ট না হয় সেইজন্যই এই সমস্ত অলঙ্কার-বন্ধনের প্রয়োজন। কাব্য-সৌন্দর্যের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও অপচয়-নিবারণের জন্য দার্শনিকতার দৃঢ় বেষ্টনীও অনুরূপভাবে কার্য করে। সুর ও তালের মধ্যে যে সম্বন্ধ দার্শনিকতা ও কাব্যরসের মধ্যেও অনেকটা সেই সম্বন্ধ। কবিরাজ গোস্বামী তাই বৈষ্ণব-ধর্মকে ভক্তিবিলাস ও রসোপভোগের উপকরণ হইতে শাশ্বত জ্ঞানের বিষয়ে উন্নীত করিয়া ইহার স্থায়িত্বের কাল ও প্রভাবের পরিধি বাড়াইয়া দিয়াছেন; কর্ম ও ভক্তির মত্ত, ফেনিল উচ্ছ্বাসের উপর জ্ঞানের শান্ত চিরন্তনতার আরোপ করিয়াছেন। ভক্তির আবেশের নিবিড়তা টুটে, কর্মের তীব্র আকর্ষণ কালে মন্দীভূত হয়। সুতরাং যে ধর্ম ইহাদের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তাহার স্থায়িত্ব-সম্ভাবনা খুব বেশি নহে। কিন্তু অপ্রমত্ত জ্ঞান ও যুক্তিবাদের পরীক্ষায় যে ধর্ম উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহা মহাকালের নিকট চিরস্থায়িত্বের অধিকার লইয়া আসিয়াছে। ইহাই বৈষ্ণব সাহিত্যে ও ধর্মে কবিরাজ গোস্বামীর অনন্যসাধারণ অবদান।

এ হেন মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি আমরা কেমন করিয়া উপযুক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করিব? তিনি শুধু কবি নন যে, কাব্য-সৌন্দর্য-বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁহার মহিমার পরিমাপ করিব। তিনি শুধু দার্শনিক নন যে, তাঁহার মতবাদের মৌলিকতা ও যুক্তিনৈপুণ্যের মানদণ্ডে তাঁহার উৎকর্ষ নির্ণীত হইবে। তিনি একজন সাধক ও ভক্ত; নিজের অধ্যাত্ম অনুভূতি, নিগূঢ় সাধনা ও ভক্তিই তাঁহার কাব্যরচনার মূল প্রেরণা। আমরা নিজ নিজ রুচি ও ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁহার

সর্বাঙ্গীণ মানস ঐশ্বর্যের অংশমাত্র আস্বাদনের অধিকারী। আধুনিক যুগের বহুধা-বিভক্ত, অগভীর চিত্তবৃত্তি লইয়া বৈষ্ণব-রস-সাহিত্যের অতলস্পর্শ গভীরতায় ডুব দিবার শক্তি আমাদের নাই। রাধাকৃষ্ণের নামোচ্চারণ, চৈতন্যদেবের স্মৃতি-মাত্র বৈষ্ণব কবির মনে যে ভাবের স্বর্গরাজ্য উন্মুক্ত করিত, যে বাহ্যজ্ঞানহীন আনন্দ-তন্ময়তার আবেশ সৃষ্টি করিত, তাহা আমাদের অনুভূতি-বহির্ভূত। যাহা প্রাণের গভীরতম উৎস হইতে উৎসারিত, যাহা সত্যশিবসুন্দরের একাত্মতার সহজ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, আমরা সাহিত্য-সমালোচনার সংকীর্ণ মানদণ্ডে, ভাষা ও ছন্দের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া তাহার বিচার করিতে বসি। কাজেই আমাদের শতচ্ছিদ্র চালুনির ভিতর দিয়া এই কাব্যের খাঁটি রস-নির্যাসটুকু আমরা ছাঁকিয়া লইতে পারি না—ছাঁকিতে চেষ্টা করিয়া ইহার আসল সৌরভ ও আস্বাদটুকু হারাইয়া ফেলি।

বৈষ্ণবযুগের প্রতিবেশ ও মনোভাব কিয়ৎ পরিমাণে ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে আমাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। কবির কাব্যে তাহার যেটুকু পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সম্পূর্ণ করিতে গেলে তাঁহার কাল ও স্থান প্রতিবেশের প্রভাবটি মনে মনে কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। কবি এই প্রতিবেশ হইতে রস আহরণ করেন; যুগের চিন্তা-ধারা, আদর্শ-স্বপ্ন, কর্মানুষ্ঠান তাঁহার দেহমনকে সহস্র বন্ধনে সমসাময়িক জীবনযাত্রার সহিত জড়াইয়া ধরে। আজ বিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ পরিবর্তিত প্রতিবেশে ও প্রতিকূল মনোভাবের মধ্যে আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজের আবেদনের কতটুকু গ্রহণ করিতে পারি? মধ্যযুগের যে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী গিরিগুহার মধ্যে ইষ্টমন্ত্রধ্যানে নিজ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, বর্তমান যুগে আমরা কতটুকু তাঁহার সহিত রক্তের আত্মীয়তা অনুভব করি? চৈতন্যচরিতামৃত আমাদের সমস্যা-বিক্ষুব্ধ জীবনে হয়ত খানিকটা আত্মবিস্মৃতি আনিয়া দিতে পারে; কিন্তু এই জটিল জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রণরশ্মি কি তাহার হাতে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিতে আমরা প্রস্তুত আছি? কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্মৃতিরক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার জন্য কিছু করা নয়, ইহা তাঁহার প্রভাব-স্বীকারের জন্য আমাদেরই চিত্ত-বিশুদ্ধির আয়োজন। তুলসীবৃক্ষ রোপণ করা সহজ; তুলসীতলা পরিষ্কৃত রাখাই কঠিন। জানিনা, ঝামটপুরের শূন্য প্রান্তরে তাঁহার স্মৃতি-বিজড়িত যে ধূলিরেণু বাতাসে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহার মধ্যে অতীতের সেই বিস্মৃত সুরটি, তাঁহার সাধক জীবনের সেই নিগূঢ় মন্ত্র-রহস্যটি খুঁজিয়া পাইব কিনা।

পদাবলী সাহিত্যের পরিচিতি

১

সপ্তদশ শতকের ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ড্রাইডেন একদা তাঁহার রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "ভাবসমূহ এত দ্রুতগতিতে আমার চিত্তে উদিত হয় যে, আমার দ্বিধা জাগে যে উহাদিগকে কাব্যের ছন্দোরূপ দিব, না গদ্যের যে অপরবিধ ছন্দধ্বনি আছে (other harmony of prose) তাহার মধ্যেই গাঁথিয়া তুলিব।" আমাদের সমসাময়িক বাঙালী কবি শ্রীকালিদাস রায়ও বোধ হয় সময় সময় অনুরূপ দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া থাকেন। গদ্যে-পদ্যে এই সমশক্তিসম্পন্ন সব্যসাচিত্বেই তাঁহার অনন্যসাধারণতা। স্বর্গগত কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারেরও এই উভয়বিধ পটুত্ব ছিল, কিন্তু তাঁহার কাব্য গুণে শ্রেষ্ঠ মৌলিকতার অধিকারী হইলেও পরিমাণে অপেক্ষাকৃত স্বল্প। মনে হয় যে তাঁহার যৌবন ও কাব্য-প্রেরণা প্রায় একসঙ্গেই নিঃশেষিত হইয়াছিল ও প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্তির পর তাঁহার পরিণত মণীষা ও কাব্য সম্বন্ধে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি সমালোচনাকে অবলম্বন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কবি কালিদাস তাঁহার জীবনের পঞ্চাশৎ বৎসর পর্যন্ত প্রধানত কাব্যরসে বিভোর ও কবি-আখ্যায় পরিচিত ছিলেন—পঞ্চাশোর্ধে তাঁহার কবিমন কাব্যরস-বিশ্লেষণের বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছে। এ যেন কাব্য-রচনার প্রত্যক্ষ রাজৈশ্বর্যভোগ ত্যাগের পর তাহার পরোক্ষ রহস্য-অনুধ্যানের পালা কবি-জীবনে আবির্ভূত

এই যাত্রাপথ-পরিবর্তনের ও আশ্রমান্তর-গ্রহণের জন্য অবশ্য বাঙালী পাঠক-সমাজ তাঁহার নিকট নূতন ঋণে আবদ্ধ হইয়াছে। কালিদাসের কবিতার রস আমরা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়াছি। এখন তাঁহার নূতন রচনার মধ্যে পুরাতন সুরেরই পুনরাবৃত্তি শোনা যায়। কিন্তু তাঁহার কাব্য-সমালোচনার ভিতর দিয়া তাঁহার যে নূতন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা আমাদিগকে যেমনি বিস্মিত তেমনি পুলকিত করিয়াছে। ব্রজ-রাখালের বেণু আজ সমালোচকের মানদণ্ডে পরিবর্তিত হইয়াছে; যিনি বাঁশী বাজাইয়াছেন তিনি বাঁশীতে সপ্তস্বর-বিন্যাস-রহস্য ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়

এই যে, রূপান্তর সত্ত্বেও ইহার স্বভাবসুলভ মাধুর্যের কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। কবির কাব্যরস-আস্বাদন কখনও গুরু মহাশয়ের বেত্রদণ্ড-আস্ফালনের রূপ লইয়া আমাদের ভীতি উৎপাদন করে নাই। কালিদাস যে রূপমুগ্ধ, অন্তর্মুখী মন লইয়া নিজের কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা লইয়াই অপরের কবিতা আলোচনা করিয়াছেন। কবির সমালোচনা কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া, কবি-মনের রহস্য-উদ্‌ঘাটনের গোপন মন্ত্রটি আয়ত্ত করিয়াই, আমাদের সম্মুখে দ্বিতীয় কাব্য-সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। স্বভাবসুন্দরী শকুন্তলার অনভ্যস্ত প্রসাধন-সজ্জা দেহ-সৌষ্ঠবকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে নাই।

রচনার উৎকর্ষ ও স্থায়িত্বের দিক দিয়া কবি কালিদাস সমালোচক কালিদাসকে অতিক্রম করিয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের দিক দিয়া সমালোচকেরই প্রাধান্য। এইটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক: কবির প্রথম যৌবনের যে সুরভিত মদির আবেশে কবিতা-গুচ্ছ থরে থরে ফুটিয়া উঠে, কবি-চিত্তের সেই ক্ষণবসন্ত ঠিক তাঁহার ইচ্ছাধীন নহে, ইহা এক নিগূঢ় রসোচ্ছলতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যাঁহার কাব্যানুভূতি আছে তাঁহার পক্ষে ইহার যুক্তিগত অনুশীলন কেবলমাত্র অবসর ও রুচির সাপেক্ষ। কালিদাস এই অবসর ও রুচির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পর্যালোচনা করিয়া কবির দৃষ্টিতে ইহার ক্রমবিকাশের ধারাটি সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই সাহিত্যালোচনার মধ্যে কবিসুলভ সহানুভূতি ও রসোপলব্ধির প্রচুর পরিচয় মিলে।

সাহিত্য-আলোচনার বিভিন্ন রীতি ও সুর আছে। সমালোচনার মধ্যে সব সময় যে মৌলিক আবিষ্কার-শক্তি বা বিচারকের কঠোর, দোষ-গুণ বিচারে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, অপক্ষপাত মূল্য-নির্ধারণ থাকিতেই হইবে এমন কথা নহে। সমালোচনার অপ্রীতিকর দায়িত্ব, নির্ভীক দোষ-উদ্‌ঘাটন, অপাত্রন্যস্ত অতি-প্রশংসার প্রতিরোধ সকল সমালোচকের লেখার মধ্যে দেখা যায় না। কালিদাস কবির কোমল, সৌন্দর্যপ্রবণ মনোভাব লইয়াই সমালোচনা-কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। সাহিত্যের সহজ মর্মোদ্ধার, সরস, রুচিকর আস্বাদন ও বিন্যাস-কৌশলের দ্বারা উহার অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও আদর্শের সুস্পষ্ট নির্দেশ—ইহাই কালিদাসের সমালোচনার বিশেষত্ব। তিনি হয়ত খুব চমকপ্রদ, নূতন কথা বলেন নাই। কিন্তু প্রাচীন ও

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শান্ত, করুণ আবেদন, ইহার ভক্তিরসাশ্রিত, গভীর অনুভূতি ও স্নিগ্ধ ও পরিচ্ছন্ন রচনা-পারিপাট্য তাঁহার রচনার প্রসাদগুণে, তাঁহার কবি-মনের সরল স্পর্শে ও স্বচ্ছ প্রতিবিম্বনে আরও মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক হইয়া পাঠকের সাহিত্য রুচির তৃপ্তি বিধান করিয়াছে।

২

কালিদাস যখন লালা-বক্তৃতামালার অঙ্গীভূত ভাষণদানে ব্রতী ছিলেন তখন তাঁহার অনেকগুলি বক্তৃতার সভাপতিরূপে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের রসবিশ্লেষণ তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল। এই বক্তৃতাগুলির রসসিক্ত কাব্যালোচনা শুনিতে শুনিতে বৈষ্ণব কবিদের সহিত তাঁহার নিগূঢ় ভাবঐক্য নূতন করিয়া আমার মনে প্রতিভাত হইতেছিল। কালিদাসের কাব্যে পদাবলী-সাহিত্যের প্রভাব অতি গভীর ও প্রায় সর্বব্যাপী—বৃন্দাবনলীলার শান্ত, দাস্য ও মধুর রস আধুনিক কবির রূপক-সন্ধানী, পুরাতন ভাবাষঙ্গের মধ্য হইতে নূতন তাৎপর্য-গভীরতা ও ভাব-নিবিড়তা অনুসন্ধানে তৎপর, বিচিত্রসঞ্চারী কল্পনা-জালের এককেন্দ্রিকতাসাধনপ্রবণ মনোধর্মের মাধ্যমে এক অভিনব প্রগাঢ়তা ও অন্তর্মুখিতা লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার ভাব-ধ্বনি আধুনিক কবির মনোগহনের গহ্বরে এক গভীরতর প্রতিধ্বনির অনুরণ তুলিয়াছে।

পদাবলী-সাহিত্যের সহিত বৈষ্ণবভাবাশ্রয়ী আধুনিক কবিতার পার্থক্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবির সমস্ত বেদনার্তির, সমস্ত অশ্রু-সজল বিলাপ-বিস্তারের মধ্যে এক নিশ্চিত আশ্বাস, এক প্রশান্ত-মধুর, রমনীয় পরিণাম বর্তমান, তাহা না হইলে ইহার খেদোচ্ছ্বাস, ইহার ক্ষোভ-অনুযোগের মধ্যে ভক্তিবিহ্বল আত্মনিবেদনের নিঃসন্দিগ্ধ সুরটি শোনা যাইত না। সাধনায় স্থির বিশ্বাস, আদর্শের অবিচল অনুসরণ সমস্ত ব্যর্থতার উপরে অটুট-মহিমায় বিরাজিত। বৈষ্ণবের খেদ দয়িতের অপ্রাপনীয়তায়, ভালবাসার প্রতি অবিশ্বাসে নহে। উহার "হৃদয়-মন্দিরে কানু ঘুমায়ল, প্রেম-প্রহরী রহু জাগি।" শ্রীরাধার নিরাশ প্রণয়-জ্বালা, বেদনার বুকফাটা হাহাকার পড়িতে পড়িতে হঠাৎ মনে হয় যে, এ সবই যেন লীলা-রহস্য, মায়ার বাজী। এ বিরহ যেন চির-মিলনেরই

একটা কল্পিত দীর্ঘশ্বাস, শাশ্বত প্রেমেরই হৃৎস্পন্দনের একটা ছদ্মবেশী ছন্দ, সদা-জাগ্রত ভালবাসার নিমীলিত আঁখি-পল্লবের ছলনা। আধুনিক কবির মনে বেদনা ও আত্মবিলাপের নানা উপাদান সঞ্চিত; আদর্শচ্যুতি, মানস উদ্‌ভ্রান্তি, মোহ-মরীচিকার দিশা-ভুলানো ইঙ্গিত ও নিরাশ্রয় চিত্ত-বিক্ষেপের অপার শূন্যতা। সুতরাং তাঁহার কণ্ঠে যখন বৈষ্ণব কবির খেদোক্তি উচ্চারিত হয়, তখন তাহাতে এক অনভ্যস্ত অস্বস্তির সুর ফুটিয়া উঠে। কমলাকান্ত যখন বৈষ্ণব পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছে, তখন তাহা এক অপ্রত্যাশিত, তির্যক-পথচারী বিলাপ-মূর্ছনার মর্মভেদী আক্ষেপে পরিণত হইয়াছে। "এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস, নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি"—পরিপূর্ণ প্রেমের এই মহিমাময় প্রশস্তি পরবর্তী যুগে এক অভিনব রূপক-দ্যোতনায়, এক জটিলতর অতৃপ্তি-বোধে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয়া-কণ্ঠের সোহাগ-বাণী দেশ-মাতৃকার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে; অন্তরের ভাবময় আকূতি বহির্জগতের গ্লানিকর পরাভবে আরোপিত হইয়া খানিকটা আতিশয্য-অসঙ্গতির সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমান কবি-মানসের পক্ষে দয়িতের প্রতি এই আহ্বানের আন্তরিকতা, তাহাকে আধ আঁচলে বসাইবার একাত্মতা ও তাহার প্রেম-উপলব্ধির বহির্চৈতন্যহীন আত্মমগ্নতা সবই অনায়ত্ত আদর্শ। কাজেই উপরি-উক্ত পদটির আধুনিক প্রয়োগ যে ব্যাকুলতায় উন্মনা হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে সংশয়াকীর্ণ চিত্তের অনির্দেশ্য বেদনা-বিষাদের সুরটি মিশিয়া গিয়াছে।

কবি কালিদাস বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর অতি নিকট আত্মীয়; তাঁহার মধ্যে আধুনিক চিত্তের দোলাচলতা ও সমস্যা-বিহ্বলতা তাঁহার প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের জন্যই অনেকটা অনুপস্থিত। মধ্যযুগীয় ভাব-ও-রস-সর্বস্বতা একটা আদর্শানুগামী যুক্তি-প্রতিষ্ঠা-প্রবণতার ও অভিজাত প্রকাশরীতির সহিত সংযুক্ত হইয়া তাঁহার বৈষ্ণব-ভাবাশ্রয়ী কবিতার বিশিষ্ট রূপের হেতু হইয়াছে। তথাপি আধুনিক মনোধর্মের যে অপরিহার্য লক্ষণ, রূপ ও দেহধর্মী কল্পনার মধ্যে অপরূপ ভাব-ব্যঞ্জনার অনুসরণ, তাঁহার মধ্যেও অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। তাঁহার মাথুর বিরহ বৈষ্ণব কবির মাথুর বিরহের নানামুখী সম্প্রসারণ, মনের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে, অনুভূতির স্তরে স্তরে ইহা একটা সূক্ষ্ম অনুরণন জাগায়—ইহার ভাবকেন্দ্র বৈষ্ণবী নিষ্ঠার পরিধি অতিক্রম করিয়া গভীরতার আপেক্ষিক অভাব ব্যাপকতার দ্বারা পূর্ণ করিয়াছে। তাঁহার নৌকাবিলাসের কবিতায় এই সুরের নূতনত্ব সুপরিস্ফুট। বৈষ্ণব কবির

নিকট ইহা তরুণ-তরুণীর লীলাবিহার, ঐশী প্রেমের ক্রীড়াকৌতুক-বৈচিত্র্য। উপরে মেঘের ভ্রূকুটি, নিম্নে তীব্র-বায়ু-প্রখর যমুনা-তরঙ্গের ফেনিল দংষ্ট্রাবিকাশের বিভীষিকা, মধ্যে টলমল তরণীর উপর কপট ব্রীড়ায় মুখর, ব্যাজ-তর্জনে রুষ্ট, ছদ্ম আশঙ্কায় ত্রস্ত কিশোরীর চক্ষে প্রেমের স্থির দীপ্তি, বিশ্বাসের অবিচল নির্ভরতা। "তরী করে টলমল পশরায় উঠে জল"—এই সংকটময় দৃশ্য বিপদের সংকেতরূপে নহে, কাণ্ডারীর উপর একান্ত আস্থাশীলতার পটভূমিকারূপেই কল্পিত হইয়াছিল। জ্ঞানদাসের নৌকাবিহারের দুই একটি পদে ভবভয়ক্লিষ্ট, মুক্তি-কামনায় উদগ্র-ব্যাকুল, অনিশ্চয়তার গোধূলি-রহস্যে অভিভূত আধুনিক মনের পূর্বাভাস পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণতঃ বৈষ্ণব কবিরা সংশয়াতীত বিশ্বাসে আত্মপ্রতিষ্ঠিত। কবি কালিদাসের পদে আধুনিক-শঙ্কা--ভীরুতাই সূচিত হইয়াছে। তাঁহার 'নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতায় বৈষ্ণব ভাব-পরিবেশের অনবদ্য পুনর্গঠন থাকিলেও এই অন্ধকার কেবল বৃন্দাবনলীলার উপর যবনিকা-পাতের জন্যই নহে; ইহার সংগত আদর্শ অবলম্বন হারানোর বিমূঢ়তা, স্থির জ্যোতি অস্তমিত হইবার পর আলোর সন্ধানে লক্ষ্যহীন সঞ্চরণের অস্থিরত্ব খানিকটা মরীচিকা-কম্পনের করুণ দৃষ্টিভ্রান্তি যুক্ত করিয়াছে।

বৈষ্ণব ভাবমণ্ডলের সহিত তাঁহার এই অন্তরঙ্গ সম্পর্কই তাঁহাকে পদাবলীর রস-বিশ্লেষণের অধিকার দিয়াছে। তাঁহার আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল এই সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ের সুষ্ঠু বিন্যাসের দ্বারা ইহার বিরাট আয়তন ও বিচিত্র রসসম্ভারের মধ্যে সাধারণ পাঠকের স্বচ্ছন্দ পদচারণার পথরচনা। তাঁহার আলোচ্য গ্রন্থে তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্বের দিক ও রূপরসের দিকটা পাশাপাশি রাখিয়া উহাদের পারস্পরিক প্রভাব নির্ণয় করিয়াছেন। তত্ত্ব কেমন করিয়া একান্ত ভক্তিবিহ্বলতা ও দ্রবকারী অনুভূতির সাহায্যে অপরূপ রসপরিণতি লাভ করিয়াছে, ও মাধুর্য কেমন করিয়া তত্ত্বের সুদৃঢ় বেষ্টনে আপনাকে অপচয় ও অসংযম হইতে রক্ষা করিয়াছে তাহা তাঁহার আলোচনায় চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধনার ক্রম, দর্শনের সত্যানুভূতি, ভক্তিশাস্ত্রের যত্নরচিত অনুশাসন এক নির্মল ভাব-নির্ঝর-স্নাত হইয়া, এক অপরূপ রূপমুগ্ধতার প্রলেপ অঙ্গে মাখিয়া কেমন করিয়া তরুণ প্রেমের সুকুমার-শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, মানব-চিত্তবিহারী আদর্শ সৌন্দর্যস্বপ্নের অনবদ্য বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়াছে তাহা আমরা অনুভব করি। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় কবির দ্বারা কাব্য-সমালোচনা কাব্যে গহনশায়ী প্রেরণাকে

আমাদের প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। সময় সময় কবির অসংবরণীয় ভাবোচ্ছ্বাস, নিগূঢ় মর্মানুভূতি গদ্যালোচনার পায়ে-হাঁটা পথ ছাড়িয়া কাব্যাভিব্যক্তির পরাগ-সুরভিত, গীতি-মর্মরিত বনবীথির অনুসরণ করিয়াছে। দীপ হইতে দীপান্তর প্রজ্বলিত করার মত মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতা আধুনিক কবির মনোমন্দিরে এক নূতন অর্ঘ্যনিবেদনের প্রেরণা জাগাইয়াছে—কবি গদ্য-সমালোচনার ভোঁতা অস্ত্র ফেলিয়া তাঁহার কাব্যের দীপ্ত, মন্ত্রপূত আয়ুধ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতামালার স্বল্প পরিসরে বৈষ্ণব সাহিত্যের সার্বিক আলোচনা স্থান পায় নাই। কিন্তু তিনি যেটুকু বলিয়াছেন তাহা কবির অনুভূতি লইয়া কাব্যময় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণব রস-মাধুরীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রীতি ও সহানুভূতি গদ্য ও পদ্যের দ্বিমুখী গঙ্গা-যমুনা ধারায় প্রবাহিত হইয়া আবেগধর্মী ও বিশ্লেষণ-কাঙ্ক্ষী উভয়বিধ পাঠকেরই রুচিকে তৃপ্তি দিয়াছে।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ভূমিকা

১

(মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্যগোষ্ঠীর মধ্যে যে একখানি কাব্য সংকীর্ণ ধর্মগত প্রয়োজন ছাড়াইয়া সার্বভৌম রসস্বীকৃতি লাভ করিয়াছে তাহা মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডী। গ্রন্থখানির রচনাকাল ১৫৭৯ খৃঃ অঃ বলিয়া মোটামুটিভাবে গৃহীত হইয়াছে) মুকুন্দরাম যে যুগে চণ্ডীকাব্য রচনায় ব্রতী হন, তাহা এই কাব্যধারার প্রথম সূচনা হইতে বিশেষ দূরবর্তী ছিল না। ইহাতে তাঁহার মাত্র দুইজন পূর্বগামীর কথা শোনা যায়। চণ্ডীধারার প্রবর্তক মানিক দত্তের উল্লেখ মুকুন্দরামের গ্রন্থে মিলে, কিন্তু মানিক দত্তের রচিত পুঁথি এখনও প্রকাশিত না হওয়ায় এই ধারার আদিম স্তরের রূপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্টই আছে। চণ্ডীধারার দ্বিতীয় কবি দ্বিজ মাধব বা মাধবানন্দ মুকুন্দরামের ঠিক সমসাময়িক—১৫৭৮ খৃঃ অঃ তিনি তাঁহার গ্রন্থরচনা আরম্ভ করেন। সুতরাং মুকুন্দরাম ইঁহার দ্বারা যে প্রভাবিত

হইয়াছিলেন তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। দ্বিজ মাধবের সহিত মুকুন্দরামের গ্রন্থের তুলনা করিলেই মুকুন্দরামের কল্পনার মৌলিকতা ও প্রসারশীলতার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

চণ্ডীদেবীর উদ্ভব, তিনি পৌরাণিক দেবতা কি অনার্য দেবতা, তাঁহার সহিত ব্যাধজাতির সম্পর্ক, তাঁহার পরিকল্পনার মধ্যে বিবিধ দেবীর গুণবৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ ইত্যাদি যে সমস্ত ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক প্রশ্ন মঙ্গল-কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আমি এই ভূমিকায় তাহার পুনরুক্তিমূলক আলোচনা করিব না। যাঁহারা সাহিত্যের এই পরিমণ্ডলঘটিত আলোচনায় বিশেষ আগ্রহশীল তাঁহাদিগকে ডাঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের 'মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস' ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুধীভূষণ ভট্টাচার্যের দ্বারা সম্পাদিত দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে'র নানা মৌলিক-তথ্যসংবলিত ভূমিকা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৈদিক, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক, হিন্দু-তান্ত্রিক ও পৌরাণিক ইত্যাদি বিবিধ উৎস হইতে উদ্ভূত দার্শনিক মতবাদ ও দেবমূর্তি-পরিকল্পনার একটি সমন্বয়সূচক সংমিশ্রণ ঘটিতেছিল ও নানা দেবীর অবয়ব ও অন্তঃপ্রকৃতি একটি বিশিষ্টরূপে সংহত হইয়া উঠিতেছিল। বোধ হয় সুসংবদ্ধ সমাজ-জীবনে যে মাতৃপূজা পারিবারিক সংস্থার কেন্দ্রশক্তিরূপে প্রতিভাত হইতেছিল তাহারই একটা অতিলৌকিক প্রতিরূপ এই নবজাত মঙ্গলকাব্যগুলিতে দৈবী-মহিমামণ্ডিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। অথবা পরিবর্তন-ধারা এই প্রক্রিয়ার বিপরীত গতি অনুসরণেও প্রবাহিত হইয়া থাকিবে। ধর্মসাধনায় শক্তিপূজার ক্রম-প্রাদুর্ভাব পরিবারজীবনে মাতৃমহিমা-স্বীকৃতির ভিত্তি রচনা করিয়া থাকিবে। সে যাহাই হউক, এই সময়ে হয়ত যুগপ্রয়োজনের অনুরোধে বাঙ্গালীর মনে মাতৃশক্তির প্রতি একটা প্রবল আবেগ জাগিয়া উঠিয়া তাহার সাহিত্যে সংক্রামিত হইয়াছিল। বেদ ও উপনিষদের যুগে পুরুষ-দেবতারই প্রাধান্য; নারী-দেবতা এখানে প্রায় অশরীরী ছায়ামূর্তির মত পুরুষ-দেবতার কায়ার অনুগামী; তন্ত্রশাস্ত্রে নারী মুখ্য, পুরুষ গৌণ। মনে হয় ব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার অতিরিক্ত জটিলতা ও সূক্ষ্ম মনন-প্রাধান্যের প্রতিক্রিয়ারূপেই জনসাধারণের চিত্ত ভক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়, এবং এই ভক্তিবাদ প্রধানত মাতৃরূপিণী নারী-দেবতাকে আশ্রয় করিয়াই স্ফুরিত হয়। তন্ত্রশাস্ত্র শক্তির অসীম মহিমা কীর্তন করিয়া ও শক্তিপূজার নানা দুরূহ সাধনপ্রণালী নির্দেশ করিয়া এই প্রবণতার

সূত্রপাত করে। বৈষ্ণবদর্শনে শ্রীরাধাতত্ত্ব ও পদাবলীসাহিত্যে শ্রীরাধার উচ্ছ্বসিত স্তবস্তুতি ও তাঁহার মধ্যে অসীমত্বের ব্যঞ্জনা বাঙ্গালীর চিত্তে নারী-দেবতার প্রভাব বদ্ধমূল করিতে সহায়তা করিয়াছে। মোটকথা, যখন দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানস-সংস্থিতি উহার সুকুমারত্ব, ভাবার্দ্রতা ও পুরুষকারহীন অদৃষ্টনির্ভরতা লইয়া স্থায়িরূপ গ্রহণ করিল, তখন উহার অধ্যাত্ম আকৃতি ও কাব্যসৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য মঙ্গল-কাব্যের দেবীপূজার মাধ্যমে আত্মবিকাশের স্বাভাবিক প্রেরণা আবিষ্কার করিল।

কাব্যে রূপ পাইবার পূর্বে প্রায় দুই-তিন শতাব্দী ধরিয়া এই দেবী-পরিকল্পনা তন্ত্রশাস্ত্রের ধ্যানে ও ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন শিলামূর্তিসমূহে জাতীয় চেতনাকে অধিকার করিয়া আসিতেছিল। সাধক ও শিল্পী কবির অগ্রদূতরূপে এই নবস্ফুরিত ধর্মবোধকে আবেগময় অনুভূতি ও কলাসৌন্দর্যের বিষয়ে রূপান্তরিত করিতেছিল। শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য তন্ত্রশাস্ত্রের ধ্যান উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, চণ্ডীর মধ্যে বৈদিক সরস্বতী, পৌরাণিক গজ-লক্ষ্মী ও নানা তান্ত্রিক দেবীর সংমিশ্রিত সত্তা এক সুষমাময় ঐক্যে সংহত হইয়াছে। এই যৌগিক-সত্তাবিধৃতা দেবী ভক্ত-মানসের একাগ্র অভিলাষের প্রেরণাতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভক্ত যাঁহাকে কামনা করিয়া ধ্যানের মধ্যে যাঁহার মূর্তি কল্পনা করিয়াছিল, সাহিত্য ও শিল্প তাঁহাকেই ধ্যানলোক হইতে প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করিল। এখন প্রশ্ন এই যে, নানা দেবীর অন্তঃসার লইয়া গঠিত এইরূপ মিশ্রমূর্তির প্রতি শাস্ত্রকার ও কলাবিদের হঠাৎ এইরূপ আকর্ষণ কেন জাগিল? বৌদ্ধ-তান্ত্রিকেরা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধধর্মের ক্ষীয়মাণ প্রভাবের প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে নিজেদের উপাস্য ধর্মতত্ত্বকে হিন্দু-দেবদেবীর সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এই রূপান্তরীকরণ-প্রক্রিয়ায় তাঁহারা বিভিন্ন হিন্দু-দেবদেবীর পার্থক্যটি ঠিকমত বজায় রাখিতে যত্নবান্ ছিলেন না ইহাই মনে করা স্বাভাবিক। হিন্দুমূর্তির বহিরাবরণে বৌদ্ধ-ধর্মতত্ত্বের সারাংশ পরিবেশন করা তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই মূর্তি-পরিকল্পনার আদিম বিশুদ্ধি তাঁহাদের হাতে নানা সমজাতীয় নূতন উপাদানের সংমিশ্রণে সংকররীতির বিমিশ্রতায় পরিণত হইতেছিল। বিশেষতঃ, বৌদ্ধ কাপালিকদের মধ্যে বীভৎস ও ভীষণের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত ছিল বলিয়াই এই মিশ্রধাতুতে গড়া মঙ্গল-কাব্যের দেবীসংঘের মধ্যে একটা হিংস্র উগ্রতা প্রধান উপাদানরূপে অন্তর্ভুক্ত

হইল। এই উগ্রা, প্রচণ্ডা, ধ্বংসাত্মিকা শক্তির সঙ্গে হিন্দুপুরাণের শমগুণপ্রধানা, ভক্তবৎসলা, কল্যাণরূপিণী মাতৃমূর্তির সংযোজনা হইয়া ক্রমশঃ উভয়ের সমীকরণ সংঘটিত হইল। বিশ্বনিয়ন্ত্রী শক্তির মধ্যে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের বিপরীত অথচ গূঢ়নিয়মবদ্ধ কার্যাবলীর মধ্যে, একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই কবিকল্পনায় দেবীর এই ভীষণ ও মধুর দিক্ সহজেই এক হইয়া গেল, এই পরস্পরবিরোধী উপাদানগুলি যে বিভিন্ন উৎস হইতে সংগৃহীত তাহা লোকে ভুলিয়া গেল। মঙ্গল-কাব্যরচয়িতার কাব্যে এই দ্বিমূর্তি এক হইয়া গিয়াছে, তবে বিভিন্ন কবির রচনায় উগ্র ও শান্তগুণগুলির আপেক্ষিক পরিমাণ বিভিন্ন। দ্বিজ মাধবে দেবীর উগ্রচণ্ডামূর্তিই প্রধান; মুকুন্দরামে দেবীর শান্ত বরাভয়-প্রদা মূর্তির স্নিগ্ধতাই বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

এই মিশ্রগুণসম্পন্না দেবীর জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে আমাদিগকে মুসলমান শাসনের প্রারম্ভিক যুগের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রতিবেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বৌদ্ধতন্ত্র হইতে উদ্ভূত এই ভীমকান্তগুণের সমাবেশ তৎকালীন সমাজের বাস্তব অবস্থার সমর্থন পাইয়া জীবনের একটি প্রধান অভীপ্সার বিষয় হইল। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার ও ইহার প্রতিবিধানে আত্ম-ও-রাষ্ট্র শক্তির অপ্রাচুর্যের হেতু মানুষ নিজ-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা-ঐশ্বর্যের জন্য অতিমাত্রায় দৈব-শক্তির অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া পড়িল। বিশেষ দেবীর পূজা করিলে অভাব-অনটন, সাংসারিক আধি-ব্যাধি, শত্রুর অভিভব ও উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে এইরূপ একটি বিশ্বাস সার্বজনীন হইয়া উঠিল। ভক্তির আতিশয্য ও দৃঢ়তা, দৈব-প্রসাদের সুনিশ্চিত প্রাপ্তির প্রতি ঐকান্তিক প্রত্যয়ের ভিতরে এক করুণ, পরমুখাপেক্ষী অসহায়তার সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। এই দেবী নূতন বলিয়া তাঁহার প্রসাদও অসীম; অনেকের গুণ তাঁহার মধ্যে মিলিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্যাশা তাঁহার কারুণ্যের পরিমাপ, তাঁহার দানশীলতার সীমানির্দেশ করিতেও অসমর্থ। সর্বোপরি এই অকৃপণ প্রসাদবর্ষণের মূলে আছে মাতৃহৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহশীলতা ও সন্তান-বাৎসল্য। এই দান মাতৃস্নেহসিঞ্চিত বলিয়া ইহা নির্মল, বিশুদ্ধ, সর্বপ্রকার আত্মাবমাননার স্পর্শবিমুক্ত। সন্তানের প্রতি মাতার অতিপক্ষপাত ভক্তের সমস্ত জীবন ধরিয়া উদাহৃত হইয়াছে; সাংসারিক একচোখো জননীর মত ইনি শুধু ভক্তের ভাল করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাঁহার শত্রুর মন্দ করিতেও

সর্বদা প্রস্তুত। এ যেন ঘরের মা স্বর্গের দেবীর অমিতশক্তির অধিকারিণী হইয়া তাঁহার সমস্ত শক্তি ভক্তহিতে নিয়োগ করিতে কোন উচ্চতর নীতির বাধা মানেন না। চণ্ডী কেবল যে কালকেতুকে সাতঘড়া ধন ও মহামূল্য অঙ্গুরীয় দিয়াছেন তাহা নহে; তাহার নগরে প্রজা বসাইবার জন্য তাঁহার পূর্বভক্ত নিরপরাধ কলিঙ্গরাজের রাজ্যের উপর বন্যার ধ্বংসকারী প্লাবন বহাইয়া দিয়াছেন। ভক্তের তুচ্ছতম খেয়াল পূর্ণ করিতেও তাঁহার কোন অনিচ্ছা নাই। তাঁহার নিয়মিত পূজা সম্পন্ন হইলেই তিনি ভক্তের অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধ। মাতৃস্নেহের সীমাহীন প্রশ্রয়ের সহিত যদি বিশ্ববিধানের অমোঘ শক্তির এরূপ শুভসমন্বয় ঘটে, তবে এই সম্মিলিত শক্তির নিকট যে পুরাতন আদর্শের দেবদেবীসংঘ পরাজয় বরণ করিবেন, তাঁহার ভক্তের সংখ্যা যে দিন দিন বাড়িয়াই যাইবে, প্রসাদলোভী প্রাকৃত জনসাধারণের প্রতিনিধি-স্থানীয় অসংখ্য কবি যে তাঁহার স্তবগানে মাতিয়া উঠিবেন তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে?

(২)

মঙ্গল-কাব্যে যে সমস্ত দেবদেবীর স্তবগান করা হইয়াছে তাঁহাদের সকলের মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের মধ্যে শান্ত ও উগ্র রস বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে ও ইহারা সকলেই ধর্মক্ষেত্রে নূতন আগন্তুকরূপে জনসাধারণের মধ্যে নিজ পূজাপ্রচারের জন্য উৎকট ও অশোভন-রূপে আগ্রহশীল। এই নবাগত দেবদেবীগোষ্ঠীর মধ্যে চণ্ডী ও ধর্মঠাকুর মোটের উপর শমরসপ্রধান। চণ্ডীদেবীর চরম পরিণতিতে যদি-বা কোন অনার্য-উপাদান মিশ্রিত থাকে, তথাপি মোটের উপর ইঁহার পৌরাণিক রূপটিই আর্যধর্মের যুগ-যুগান্তরবাহী সহজ ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। বাঙ্গালীর বিশিষ্ট মানসগঠন যখনই সর্বভারতীয় আদর্শ হইতে স্বাতন্ত্র্যে তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখনই দৈবশক্তিকে মাতৃরূপে পরিকল্পনা করা ইহার স্বভাবধর্ম হইয়া দাঁড়াইল। চণ্ডী এই স্বভাবধর্মের অনুকূল ও পরিপোষকরূপে শীঘ্রই বাঙ্গালীর ধর্ম-সংস্কারের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভয়ংকর রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার দয়াময়ী অন্নপূর্ণামূর্তি প্রবল হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ, ভিখারী, ছন্নছাড়া,

আত্মভোলা মহেশ্বরের গৃহিণী ও কার্তিক-গণেশের জননীরূপে তিনি বাঙ্গালী পরিবারের পালনীশক্তির আধার মাতার সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতিভাত হইলেন। যেমন বৃহত্তর জ্যোতির মধ্যে ক্ষুদ্রতর বিলীন হইয়া যায়, তেমনি বিশ্বমাতার দিব্য প্রভার মধ্যে গর্ভধারিণীর ত্যাগমহিমা-সমুজ্জল, স্নিগ্ধ কান্তি মিশিয়া এক হইয়া গেল। সেইজন্য চণ্ডীপূজার প্রচলনের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন উদ্যম দেখা যায় না—কলিঙ্গরাজ ও কালকেতু উভয়েই স্বপ্নাদেশ পাইয়া দেবীর ইচ্ছাপূরণে তৎপর হইয়াছেন। অবশ্য মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি সদাগর দেবীর ঘটে পদাঘাত করিয়া বিপদ্‌কে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু এই ঔদ্ধত্য কেবল অবিবেকপ্রসূত, কোন বদ্ধমূল বিমুখতা বা বিরোধের ফল নহে। শ্রীমন্তের সহিত দেবীর আচরণ তাঁহার ছলনাময়ী প্রকৃতির নিদর্শন, কিন্তু মাতৃস্নেহের অগাধ গভীরতা ও অপরিমেয় বিস্তারের মধ্যে এইরূপ কপট অভিনয়ের স্থান আছে। কুপথগামী পুত্রের প্রতি শাসন-তর্জন মাতার স্নেহশীলতার বিরোধী নহে। ধর্মঠাকুর যদিও বিষ্ণুর অবতাররূপে হিন্দু-দেব-পরিমণ্ডলে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার চরিত্র হইতে বহিরাগত আগন্তুকের চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার পূজাপদ্ধতি ও চরিত্র-পরিকল্পনায় আর্যেতর প্রভাব এতই সুস্পষ্ট, তাঁহার প্রতিবেশ ও প্রতিষ্ঠানভূমির মধ্যে এমন একটা উদ্ভট অসাধারণত্ব বিদ্যমান, এমন কি তাঁহার আবির্ভাবের মধ্যে এমন একটা কুণ্ঠিত অপরিচয়ের অস্পষ্টতা পরিব্যাপ্ত, যাহাতে তিনি ঠিক হিন্দু-ধর্মসংস্কারের অনুমোদিত দেবতত্ত্বের অন্তর্লীন হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি অন্ত্যজ সমাজের খিড়কি দরজা দিয়া হিন্দুর পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিলেও তাঁহার বিরুদ্ধে কোন তীব্র বিদ্রোহ ও উগ্র প্রতিবাদ প্রধূমিত হইয়া উঠে নাই। তাঁহার ভক্ত লাউসেনের প্রতি মহামাত্যের আক্রোশ রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত কারণে, ঠিক ধর্মবিরোধমূলক নহে।

মনসা দেবী কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। তাঁহার দেবত্বস্বীকৃতি প্রচলিত সংস্কার ও ঔচিত্যবোধের প্রতি এরূপ রূঢ় আঘাত হানে যে, ইহা মানুষের মনে ভক্তিবৃত্তির সমর্থনবঞ্চিত। মানবমনের স্বাভাবিক গতির বিপরীতমুখী বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ কোনদিনই সম্পূর্ণ শান্ত হয় নাই। বাস্তব জীবনের একটা রূঢ় বিভীষিকা, জন্তুজগতের গহনতার বিবর হইতে উৎক্ষিপ্ত একটা হিংস্র জিঘাংসা, অতর্কিত অপঘাতের একটা

ভয়াবহ আবির্ভাব—ভক্তির বাহ্য অনুষ্ঠান, পূজার আড়ম্বরের দ্বারা যতই আবৃত হউক না কেন—কখনই দেবত্বের অবিসংবাদিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সেইজন্য মনসার পূজাপ্রচার বরাবরই একটা বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছে। অবশ্য মনসা ঠিক নূতন দেবতা নহেন, পৌরাণিক যুগ হইতেই তাঁহার দেবমহিমা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। মহাভারতে নাগমাতা নিজ আত্মবিসর্জনের দ্বারা পিতৃকুল রক্ষা করিয়া দেবত্ব অর্জন করিয়াছেন; তাঁহার মন্ত্র-উচ্চারণ সর্পদংশন হইতে রক্ষা করে, কিন্তু তাঁহার অহেতুক ক্রোধ বা প্রতিহিংসা-পরায়ণতার কোন নিদর্শন দেখিতে পাই না। আর সর্প ইতর জীব হইলেও অধ্যাত্মশক্তির প্রতীকরূপে সুপ্রাচীন কাল হইতে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। কালিকার মন্ত্রে, তিনি যে সর্পবাহনা ও সর্পভূষণা তাহা উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং দেবপরিকল্পনার ভাবমণ্ডলে সর্পের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ভীষণা কালিকাদেবীর সর্পসংকুলতা তাঁহার অন্যান্য গুণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক নূতন দেবীবিগ্রহে মূর্ত হইয়াছে—মনসাদেবী যেমন লৌকিক সম্পর্কে চণ্ডীর আত্মীয়া, তেমনি অধ্যাত্ম তাৎপর্যের দিক্ দিয়াও তিনি চণ্ডীপ্রকৃতির ক্রূর অংশেরই একটা সমগ্র রূপায়ণ। দক্ষিণ রায় যেরূপ স্থূল, জড়শক্তিপ্রধান দেবতা, মনসা ঠিক তাহা নহেন—তাঁহার অঙ্গবিচ্ছুরিত বর্ণবৈচিত্র্যের আভা তাঁহার সূক্ষ্মতর সত্তারই সূচনা করে। সে যাহা হউক, তিনি মানবের অবিমিশ্র ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, ভক্তির মধ্যে যে ভয়ের অংশ বিদ্যমান তাহাই তাঁহার পূজার পাদপীঠ রচনা করিয়াছে। যেমন কালীয় নাগ লক্ষ্মীন্দরের লোহার বাসরের অলক্ষ্য রন্ধ্রপথ দিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাকে দংশন করিয়াছিল, তেমনি মনসাদেবী আমাদের বদ্ধমূল বিরাগের লৌহপ্রাচীরের অভ্যন্তরে ভয়ের যে সূক্ষ্ম সঞ্চরণপথ খোলা আছে তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের অন্তরে দেবত্বের আসন অধিকার করিয়াছেন ও তাঁহার বিষাক্ত প্রভাবে আমাদের পৌরুষকে নিস্তেজ ও মোহাচ্ছন্ন করিয়াছেন।

মনসাদেবীর প্রতি এই অপ্রশমিত বিরোধ বাঙালী কবির পক্ষে এক হিসাবে বিশেষ হিতকর হইয়াছে, তাঁহার কল্পনায় উদ্দীপ্ত পৌরুষ ও অনমনীয় দৃঢ়সংকল্পের প্রতীক চাঁদ সদাগরের সৃষ্টিপ্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। রণক্ষেত্রে বীরত্বপ্রদর্শনের মধ্যে বিশেষ কিছু অসাধারণত্ব নাই—কালকেতু ও লাউসেন যুদ্ধে ও পশু-

শিকারে অস্ত্রশিক্ষা ও দৈহিক শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়া বীরত্বের সনাতন আদর্শের অনুবর্তন করিয়াছে। কিন্তু সাধারণ জীবনে, পারিবারিক শোকের উপর্যুপরি অভিঘাতের মধ্যে নিজ আদর্শে অবিচলিত থাকার ভিতর যে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় নিহিত, তাহার নৈতিক মূল্য অনেক উচ্চতর। কালকেতুর স্বাভাবিক নিঃশঙ্কতা অতর্কিত ত্রাসের দ্বারা অভিভূত হয়—সে কলিঙ্গরাজের সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পৌরাণিক বীরের ন্যায় বিক্রম দেখাইয়া এক অপ্রত্যাশিত সংকটমুহূর্তে ধানের গোলার মধ্যে লুকাইয়াছে। কিন্তু চাঁদের দৃঢ়তা মনোবলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শত আঘাতে অচল, অটল। মনসা তাঁহার ক্রূর জিঘাংসার দ্বারা বাঙালী চরিত্রের এই অনমনীয় প্রতিরোধশক্তির উদ্বোধন করিয়াছেন, বাঙালী কবির কল্পনাকে বীরত্বের এক নূতন আদর্শের সন্ধান দিয়াছেন। বাংলা সাহিত্য এইজন্য তাঁহার নিকট ঋণী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের উল্লেখ থাকায় অনুমান করা যায় যে, মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের পূর্ববর্তী। পরবর্তী যুগের যে-কোন বণিক্‌-সম্মিলন হইতে চাঁদকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।

মনসাদেবীর দ্বিতীয় অবদান বেহুলাচরিত্রের সতীত্বদীপ্ত মাধুর্য। বাঙালীর সমাজে ও কাব্যে সতীর অভাব নাই। চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরা ও খুলনা সতীধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে। বিশেষতঃ খুলনার সতীত্বপরীক্ষার কাহিনীতে পৌরাণিক সতীর অলৌকিক মহিমার ছায়াপাত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি স্বামি-শব সঙ্গে লইয়া নির্জন নদীপথে বেহুলার নিরুদ্দেশযাত্রা, তাহার মৃত্যুবিভীষিকার মধ্য দিয়া অমৃতের সন্ধানে দুঃসাহসিক অভিযান হৃদয়কে যেরূপ গভীরভাবে স্পর্শ করে, কল্পনায় যেরূপ দুর্গম রহস্যলোকের দোলা দেয় অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে তাহার তুলনা মিলে না। ফুল্লরা ও খুলনাকে আমরা সাংসারিক খুঁটিনাটির তুচ্ছতার দ্বারা খণ্ডিতরূপে দেখি; তাহাদের বৃত্তি ও জীবনযাত্রার বাস্তব স্থূলতা তাহাদিগকে লৌকিক সীমার সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে। তাহাদের দুঃখকষ্টের মধ্যে মর্মান্তিক তীব্রতা বা কোন সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা নাই—তাহাদের বিচ্ছেদ-ব্যথা ও উহার সান্ত্বনা উভয়েই সুলভ ও সাধারণ। বেহুলার অপরিমেয় দুর্ভাগ্য যেন মানবের সাধারণ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত, তাহার মধ্যে মানববুদ্ধির অতীত দৈব-রহস্যস্পর্শ সুপরিস্ফুট। তাহার নিয়তিবিড়ম্বিত জীবন যে গভীর সমবেদনা ও করুণরসের সৃষ্টি করে তাহার মধ্যে তাহার ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যকে ছাড়াইয়া এক সার্বভৌম অনুভূতির ব্যাপ্তি ও অনুরণন নিহিত। তাহার স্বামীর পুনর্জীবনলাভ ও

সৌভাগ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এই অন্তর্বিদীর্ণকারী শোকোচ্ছ্বাস সমতা প্রাপ্ত হয় না। দাম্পত্য-মিলনের সুখ এই বেদনাক্ষতের অন্তস্তল পর্যন্ত সান্ত্বনার প্রলেপ বিস্তার করিতে পারে না। মনসার অত্যাচার উৎপীড়িতের চিত্তে যে আলোড়ন জাগায় তাহারই সংবেগ একদিকে চাঁদ সদাগরের উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মহিমায়, অপর দিকে বেহুলার অতলস্পর্শী বেদনায় সঞ্চারিত হইয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যপর্যায়ে মুকুন্দরামের মত অনবদ্য শিল্পসুষমাসম্পন্ন, যুগপ্রতিনিধি কবি নাই; কিন্তু মুকুন্দরাম যুগজীবনের যে সমতল ভূমিতে স্বচ্ছন্দ গতিতে বিচরণ করিয়াছেন, মনসামঙ্গলের কবিরা তাহার উর্ধ্ব ও অধোদেশে প্রসারিত উচ্চাবচ ভূসংস্থানে আয়াসসাধ্য, অসম পদক্ষেপে এক অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

(৩)

মঙ্গলকাব্যের বহিঃপ্রতিবেশ ও অন্তঃপ্রেরণা ও বিভিন্ন জাতীয় মঙ্গলকাব্যের পারস্পরিক প্রভাবসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা গেল। অতঃপর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের বিষয়বিন্যাস ও কাব্যোৎপত্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। তাহার পূর্বে মঙ্গলকাব্যগুলির কালপারম্পর্যসম্বন্ধে আর-একটি প্রমাণ বিচার করা উচিত। চণ্ডীকাব্য যে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সহিত তুলনায় অনেকটা অর্বাচীন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ইহার উপর বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের প্রভাবে। দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম—চণ্ডীকাব্যের দুই প্রাচীনতম প্রবর্তকই—বৈষ্ণব ভাব ও কাব্য-রীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। দ্বিজ মাধব তাঁহার আখ্যায়িকার মধ্যে যেখানে যেখানে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার সহিত কোন সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, বা যে মুহূর্তে তাঁহার ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে সেই-খানেই তিনি পদাবলীর অনুকরণে নূতন পদ রচনা করিয়াছেন। এই পদগুলিকে তিনি বিষ্ণুপদ নামে নূতন আখ্যা দিয়াছেন। ইন্দ্রের গুরুপত্নীহরণের পূর্বে ইন্দ্রের মনোহর রূপসম্বন্ধে অহল্যার মনোভাবদ্যোতনার উপায়স্বরূপ তিনি 'কালিয়া'র রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কালকেতুর জন্মবৃত্তান্তের পূর্বসূচনারূপ ঐরূপ একটি কৃষ্ণের রূপপ্রশস্তিমূলক পদ রচিত হইয়াছে। চণ্ডীদেবীর নিকট পশুদের বিলাপ একটি ভক্তি স্তোত্রের সংক্ষিপ্ত পয়ারপ্রবন্ধে স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

"জয় গোপাল করুণাসিন্ধু।
এহলোকে পরলোকে তুমি দীনবন্ধু॥"

কালকেতু যখন দেবীর মায়ায় পশুশিকারে ব্যর্থকাম হইয়া অন্নচিন্তায় আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে, তখন তাহার ক্ষুব্ধ বিমূঢ়তা রাধিকার প্রণয়বিভ্রান্ত, নৈরাশ্য-বঞ্চিত চিত্তের দিশাহারা ভাবের মাধ্যমে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। সময়ে সময়ে কবির এই বৈষ্ণবভাব-প্রবণতা অনেকটা বিসদৃশভাবে ও বর্ণিত বিষয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা না করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভাঁড়ুদত্তের প্ররোচনায় যখন কলিঙ্গরাজ কালকেতুর ঐশ্বর্যের খবর লইবার জন্য গুজরাট নগরে কোতোয়ালকে পাঠাইলেন, তখন ছদ্মবেশী কোতোয়ালের প্রসঙ্গে কবির মনে হইয়াছে কালার রসসার সত্তার নিগূঢ় দুর্নিরীক্ষ্যতার কথা, যেখানে উচ্ছল লাবণ্যতরঙ্গে কালাগোরার ভেদ বিলুপ্ত হইয়াছে। কোতোয়ালের ছদ্মবেশের সহিত কালার ছলনাকুশলতার সাদৃশ্যবোধ কেবল বৈষ্ণবভাবোদ্বেলতায় বাস্তব-চেতনাহীন চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব।

দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি-শ্রীমন্ত উপাখ্যানে বিষ্ণুপদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। হয়ত আখ্যায়িকার নিজস্ব আকর্ষণের ফলে কবিচিত্তে বৈষ্ণব-ভাবপ্রবাহ অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে—গল্পের অন্তর্নিহিত রসই কবিকে আরোপিত মাধুর্যরসের প্রতি কতকটা উদাসীন করিয়াছে। সপত্নীপীড়িতা খুলনার বনবাসের করুণরস বৈষ্ণবপদের একটি কলির মধ্যে ঘনীভূত নির্যাসের রূপ লাভ করিয়াছে।

চল ঘর হাম্ পরিহরি।
কালো কাহ্নায়ির লাগি হৈছ বনচরী॥

দীর্ঘ প্রবাস হইতে প্রত্যাগত ধনপতির পত্নীমিলন-প্রতীক্ষার অত্যাগ্রহ রাধার লাজভয়ে-জলাঞ্জলি-দেওয়া প্রেমোন্মত্ততার সুরে নিজ মর্মকথা প্রকাশ করিয়াছে। যুবতী স্ত্রী ফেলিয়া ধনপতির সিংহলগমনে অনিচ্ছা, বাঁশীর সুরে ঘরছাড়া রাধিকার উদ্বেগ ও অস্বস্তির চিত্রটি স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। বিচ্ছেদকাতরা খুলনার মনোভাবটি মাথুরযাত্রার প্রাক্কালে রাধিকার অশুভশংসী চিত্তের পূর্বানুমানের বেনামীতে ব্যক্ত হইয়াছে। সদাগর যখন গণকের অমঙ্গলগণনা উপেক্ষা করিয়া সিংহলযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তখন খুলনার মনো-ভাবদ্যোতনার জন্য রাধিকার কাতরোক্তির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে—রাধিকা প্রেমিকার অভ্রান্ত সংস্কারবশে জানিতে পারিতেছেন যে, শ্যাম আর মথুরা

হইতে ফিরিবেন না, অন্য প্রণয়িনী পাইয়া রাধাকে ভুলিবেন, সেইজন্য শ্যামকে বাঁশী রাখিয়া যাইতে বলিতেছেন খুল্লনারও স্বামীসম্বন্ধে অনুরূপ সন্দেহ মর্মবেদনা জাগিতেছে। শ্রীমন্তের প্রতি বাৎসল্যরস গোচারণে গত কানাইয়ের জন্য যশোদার উৎকণ্ঠা ও আত্মানুশোচনার ভাব-পরিমণ্ডলে বিধৃত হইয়াছে। হারানো ছেলের জন্য গৃহস্থবধূর লজ্জাসম্ভ্রম হারাইয়া খুল্লনার পথে পথে অন্বেষণের প্রতি লহনা যে তিরস্কার করিতেছে তাহার উত্তর খুল্লনা মুখের কথা ও বৃন্দাবনলীলা-সম্পর্কিত গীত এই দুই রকম ভাবে দিয়াছে—গীতটি কানুপ্রেম-কলঙ্কিনী রাধিকার আত্মসংযমে অক্ষমতাবিষয়ক। শ্রীমন্তের পিতৃ-সন্ধানে সিংহলযাত্রার প্রস্তাবে খুল্লনার কাতরতা গোষ্ঠলীলার গীতে যশোদার উক্তির প্রতিধ্বনি—রায় অনন্ত ভণিতাযুক্ত একটি পদ উভয়েরই মনোবেদনা প্রকটিত করিতেছে। আবার, এই ঘটনাই নবদ্বীপলীলায় পুত্রশোকোন্মাদিনী শচীর শোকাবেগের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চণ্ডীমঙ্গলের কবি বৈষ্ণব-ভাবরসসিক্ত মন লইয়া শক্তিপূজার কাহিনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—ইহার সমস্ত রূঢ় সংঘর্ষ, স্থূল বৈষয়িকতায় ক্লিন্ন জীবনযাত্রার উপরে অপার্থিব মাধুর্যরস সেচন করিয়া ইহাকে কাব্যলোকের উন্নততর স্তরে উঠাইতে ও ইহার মধ্যে ভাবসৌকুমার্য সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (কালকেতু-ফুল্লরার দারিদ্র্যজীর্ণ কুটীর, ধনপতির সপত্নী-কলহমুখরিত অট্টালিকা ও ভাঁড়ুদত্ত-সোমদত্তের শাঠ্যপ্রবঞ্চনামূলক দোকানদারীর উপর কেবল যে চণ্ডীদেবীর অলৌকিক রূপপ্রভা মাঝেমধ্যে বিদ্যুচ্চমকের মত উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহা নয়; এই অসঙ্গতিপূর্ণ, পরিহাসের উপাদানে ভরা সংসারজীবনের উপর মানবহৃদয়ের গভীর আনন্দবেদনা ও বৃন্দাবনলীলার অধ্যাত্ম ভাবব্যঞ্জনার আরোপ ইহার তুচ্ছতাকে সহজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যে দৈবী শক্তির সহিত মানবিক দুর্বলতার এই মিতালী স্বর্গমর্ত্যের সংযোগসেতু রচনা করিয়া আমাদের ভাঙ্গাচোরা জীবনের পর্ণকুটীরে স্বর্গীয় দীপ্তির প্রখরতা ও চিন্ময় রসলীলার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোককে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে।)

মুকুন্দরামে এই বৈষ্ণবভাবপ্রাধান্য অনেকটা ক্ষীণ হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ তাঁহার চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেমধর্মের প্রতি অনাস্থা বা পদাবলীসাহিত্যের মাধুর্যের প্রতি ঔদাসীন্য নহে। তিনি তাঁহার দেববন্দনার মধ্যে চৈতন্যদেবের অলৌকিক চরিত্রমাধুর্য ও সর্বভূতে করুণার প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন।

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে তিনি কবির নিকট দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। আর-এক বিষয়ে বৈষ্ণবধর্মের ভাবপ্লাবন সরিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার কাব্যের বেলাভূমিতে একটি শুভ্র রজতোজ্জ্বল ফেনপুষ্পমালা রাখিয়া গিয়াছে। তাঁহার কাব্যের অন্যত্র বৈষ্ণবপ্রভাব লক্ষিত না হইলেও তাঁহার নায়িকার রূপ-বর্ণনায় পদাবলীর কান্তকোমল মাধুর্য স্থপরিস্ফুট। তাঁহার আদ্যা ও চণ্ডী উভয়েই বৈষ্ণবকবিবর্ণিত শ্রীরাধিকার ভাবদ্যুতিসমুজ্জ্বল। স্থকোমল দেহলাবণ্যে, বর্ণনার মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে, স্থষমাময় উপমা-প্রয়োগে ও মাধুর্যপ্রধান ভাবাবহরচনায় মুকুন্দরামের চণ্ডী বৈষ্ণবের রাধিকার সহিত অভিন্ন। তাঁহার বর্ণনায় তাঁহার উগ্রচণ্ডা প্রকৃতি, তাঁহার মাতৃমূর্তির গাম্ভীর্যসম্ভ্রম স্থকুমার রূপব্যঞ্জনার অন্তরালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। চণ্ডীর আচরণ ও সংলাপের মধ্যে, এমন কি তাঁহার হাসি-তামাসা-রহস্যপ্রিয়তার আবরণেও তাঁহার মহিমময়ী, ভক্তবৎসলা, শক্তিরূপিণী প্রকৃতিটি স্থপরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য বর্ণনা করিতে গেলেই বৈষ্ণব-আদর্শের ছায়া আসিয়া পড়ে। মনে হয় যেন মুকুন্দরাম তাঁহার প্রতিভার অবিসংবাদিত স্বকীয়তা সত্ত্বেও নায়িকার রূপায়ণে পদাবলীর ভাবাদর্শপ্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

গ্রন্থের অন্যান্য অংশে যে কবি যুগপ্রচলিত বৈষ্ণবপ্রভাবে আত্মসমর্পণ করেন নাই তাহার কারণ তাঁহার পরিণত শিল্পজ্ঞান ও বিষয়ের স্বভাবধর্ম-সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর সঙ্গতিবোধ। এই বিষয়ে দ্বিজ মাধবের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য সহজেই অনুভূত হয়। মঙ্গলকাব্যের রস যে গীতিকবিতার রসের সহিত এক নয়, উভয় শ্রেণীর কাব্যে কবিত্বশক্তিস্ফুরণের উপায় যে বিভিন্ন তাহা দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দ উভয়েই জানিতেন। কিন্তু দ্বিজ মাধব নিশ্চিত আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে চণ্ডীমঙ্গলের আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার চিত্ত পদাবলী-সাহিত্যের গীতিমাধুর্য ও আখ্যায়িকার বাস্তব-রসপ্রাধান্যের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্তভাবে আন্দোলিত হইয়াছে—ঘটনাবিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে তিনি অহেতুক গীতিগুঞ্জরণের স্থর তুলিয়া বাস্তববর্ণনার পূর্ণ রসটিকে জমাট বাঁধিতে দেন নাই। গীতিকবিতার উতলা বায়ু আখ্যায়িকার স্থির সরোবরে তরঙ্গ তুলিয়া লেখক ও পাঠক উভয়েরই কতকটা দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়াছে—সমুদ্রের বিজন বিস্তারে কমলে-কামিনীর অপ্রাকৃত সৌন্দর্য যেমন ধনপতি-শ্রীমন্তের চক্ষুকে প্রতারণা করিয়াছিল, আমরা কতকটা সেইরূপ বিসদৃশ বস্তুর সমাবেশজাত বিভ্রান্তি অনুভব করি।

(৪)

[অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতার সহিত তুলনায় মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে তাঁহার আখ্যায়িকার স্বভাবধর্ম-আবিষ্কারে ও বাস্তব-রসপ্রসারে। আখ্যানে বাস্তব-প্রবর্তনের কৃতিত্ব ঠিক মুকুন্দরামের প্রাপ্য নহে, কেন-না, দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাঠামোতে বাস্তব স্বীকৃতির ছাপ আছে।] অভিশপ্ত ইন্দ্রকুমারের মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আখ্যায়িকা তাহার অনুসরণে স্বর্গলোক হইতে মর্ত্যলোকে নামিয়া আসিয়াছে ও গর্ভস্থ শিশু মাতার জীবনরসে পুষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব রসেও পুষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রসূতির আহারে অরুচি, গর্ভবেদনা, নবজাতকের মাঙ্গল্যকর্মানুষ্ঠান, কালকেতুর শৈশবলীলা ও বিবাহের উদ্যোগ, বিবাহের পণনির্ধারণ ও উৎসব, কালকেতুর জীবনসংগ্রাম ও ব্যাধবৃত্তি, তাহার দরিদ্র সংসারের অভাব-অনটনের তালিকা, অঙ্গুরীয়-বিক্রয়কালে বণিকের শঠতা, নবনির্মিত নগরে প্রজাসংস্থাপন ও তাহাদের বিভিন্ন বৃত্তিবর্ণনা, ভাঁড়ুদত্তের ব্যবসায়ী ঠকাইয়া জীবিকার্জনের অভিনব কৌশল ও প্রভুদ্রোহিতা, কলিঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধের পৌরাণিক-প্রভাব-মুক্ত বাস্তব চিত্রণ—বাস্তব রসের এইরূপ সুপ্রচুর বিস্তার ও পরিণতি যেমন মুকুন্দরামে তেমনি দ্বিজ মাধবেও পাওয়া যায়।) চণ্ডীমঙ্গলের এই বাস্তব-প্রাধান্যের কারণনির্দেশ অনেকটা অনুমানের পর্যায়েই পড়িবে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলই সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, যুগধর্মের স্বাভাবিক প্রেরণাতেই চণ্ডীমঙ্গল-রচনার যুগে কবিমানসে সমাজচেতনা ও প্রত্যক্ষনিষ্ঠা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, অলৌকিক কাহিনীর মধ্যেও সংসারজীবনের প্রতিচ্ছবি লেখকের কৌতূহল ও বর্ণনাশক্তিকে উদ্রিক্ত করিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের আদিম আঙ্গিক রচনার জন্য কে কৃতিত্বের দাবী করিতে পারে তাহা আমাদের অজ্ঞাত—ইহার প্রথম নামহীন স্রষ্টা ইতিহাসের পাতায় কোন ব্যক্তিপরিচয় মুদ্রিত করিয়া যান নাই। কিন্তু ষোড়শ শতকের শেষ পাদে যখন দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরামের সমকালীন কাব্যরচনার সহিত অনিশ্চিত অনুমানের যবনিকা আমাদের সম্মুখ হইতে উত্তোলিত হইল, তখন দেখা গেল যে, আখ্যানের মূলধারা ও বস্তুনিষ্ঠাসম্বন্ধে চণ্ডীমঙ্গল-কবিগোষ্ঠীর মধ্যে একটা সর্বস্বীকৃত প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।)

এই পরিকল্পনা-ও-রূপসৃষ্টি-গত ঐক্য নিশ্চয়ই আকস্মিকভাবে, কবিপ্রতিভার অতর্কিত খেয়ালে আবির্ভূত হয় নাই। মাধব-মুকুন্দের পূর্ববর্তী দীর্ঘকালব্যাপী কবিপরম্পরার সম্মিলিত চেষ্টাতেই এই আঙ্গিকের উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তন-সঞ্জাত দৃঢ়বদ্ধতা সম্ভব হইয়াছে। চণ্ডীমাহাত্ম্য-কীর্তনের দৈব আধারে রক্ষিত মর্ত্যপ্রীতির একটি ক্ষুদ্র বীজ যে অঙ্কুরিত অবস্থা হইতে পুষ্টিলাভ করিয়া পরিণতির রূপ গ্রহণ করিয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই অভিব্যক্তির সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল। এই প্রথম অবস্থার কোন কাব্যপ্রতিরূপ আমাদের নিকট পৌঁছে নাই; ইহার দৃষ্টান্ত থাকিলে বাংলা কাব্যসাহিত্যে বাস্তবতার ক্রমবিকাশের যোগসূত্রটি আমরা সহজেই ধরিতে পারিতাম। এখন আমাদের একমাত্র উপায় হইতেছে মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য শাখার সহিত চণ্ডীমঙ্গলের তুলনা করিয়া ইহার মধ্যে বাস্তবতার ক্রমিক প্রসার, বাস্তব কৌতূহলের ক্রমোন্মেষের ছন্দটি নির্ণয় করার প্রয়াস। যুগ-প্রতিবেশের প্রভাবে, সুসংহত পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু মাতার সহিত চণ্ডীদেবীর ক্রমবর্ধমান ভাবসারূপ্যের ফলে, মানবজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ অনুপ্রেরণায় চণ্ডীমঙ্গলের কবিসম্প্রদায় স্বর্গ হইতে চোখ ফিরাইয়া মর্ত্যে নিবদ্ধ করিলেন, স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে কালকেতুর ভাঙ্গা কুটীরদ্বারে বসাইয়া তাঁহার দৈবী বিভার আলোকে তাহার রিক্ত গৃহস্থালীর টুকরা-টাকরা, জীর্ণ আসবাব ও গৃহসজ্জাগুলি আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যগুলিতে কবিমানস-রূপান্তরের একটি বৈপ্লবিক ইতিহাসের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে।

চণ্ডীমঙ্গলে বাস্তবরস-স্ফুরণের আপেক্ষিক উৎকর্ষ ও প্রাচুর্যের কারণ ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মানবিক আবেদনের মধ্যেই নিহিত। মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম রূপ ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরের মানবিক প্রকৃতি ও পরিচয়টি অনেকটা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। তাঁহার অবয়বচিহ্নহীন, লেপামোছা শিলামূর্তিটি তাঁহার আন্তর অনির্দেশ্যতারই প্রতীক। তাঁহার পূজার উৎকট সাধনাপদ্ধতি ও উপচারবৈশিষ্ট্য, তাঁহার চারিদিকে একটা অর্ধ-বিলুপ্ত অতীতের গোধূলিপরিমণ্ডল, তাঁহার সেবকগোষ্ঠীর সামাজিক হীনতা ও অদ্ভুত রীতিনীতি যেন তাঁহাকে আমাদের অন্তরের সহজ ভক্তির উৎস ও আত্মীয়তাবোধ হইতে খানিকটা দূরে রাখিয়াছে। তিনি যেন হিন্দুধর্মের মূলধারা হইতে বিচ্ছিন্ন এক বালুকাবিশীর্ণ শাখানদীপথে পাড়ি দিয়া ভক্তিসাধনার এক দুর্গম জনবিরল তীর্থে তাঁহার ভক্তবৃন্দকে আহ্বান করিয়াছেন। যে বল্লুকানদীর সহিত তাঁহার স্মৃতিবিজড়িত তাহা যেন কোন

পরিচিত ভাবাষঙ্গের মধ্যে বিধৃত নয়; এই নদীপথ দিয়া যে চাঁদসদাগর বা ধনপতি কোন দিন তাহাদের অভ্যস্ত বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইয়াছিল তাহা আমরা কখন কল্পনা করিতে পারি না। ইহা আমাদের সহজ গতিবিধি, দৈনন্দিন কক্ষপথের সম্পূর্ণ বহির্ভূত।) ধর্মঠাকুর ভক্তের প্রতি সদয় ও বর দিয়া ভক্তের দ্বারা অসাধ্য-সাধন করাইতে পারেন; এমন কি তাঁহার বিশেষ শক্তিতে পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উদিত হইয়া জগতের চিরাচরিত বিধানের বৈপরীত্য ঘটাইতে সমর্থ। কিন্তু তাঁহার অসীম অলৌকিক শক্তিসত্ত্বেও তিনি ভক্তের হৃদয়-উৎস হইতে ভক্তির সহজ অনাবিল স্রোত বহাইতে পারেন না। যে আত্মবিস্মৃত, একাগ্র ভক্তি ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য লোপ করিয়া নিবিড় একাত্মতার সৃষ্টি করে ধর্মমঙ্গলে আমরা তাহার কোন নিদর্শন পাই না।) অবশ্য ধর্মঠাকুর সময়ে সময়ে নিজের অপূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া হিন্দু-ভাবকল্পনার সুপরিচিত নারায়ণের রূপান্তররূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু এই ধার করা মাধুর্যমহিমা তিনি ঠিক আপনার করিয়া লইতে পারেন নাই। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় কেন ধর্মঠাকুর তাঁহার চারণকবিদের মধ্যে বাস্তববোধের উদ্দীপন করিতে সমর্থ হন নাই। ধর্মমঙ্গলের কবিগোষ্ঠী তাঁহাকে নিজেদের চিরপরিচিত বাস্তব পরিবেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রতিবেশের প্রতিও তাঁহাদের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়াছে। প্রকৃতি-বিধানের বৈপরীত্যসাধন যাঁহার শক্তির পরিমাপক মানদণ্ড, তিনি যে বস্তুনিষ্ঠ কৌতূহলের সহায়ক হইবেন না তাহা সহজেই অনুমেয়।

মনসামঙ্গলের স্থানসংস্থিতি অবশ্য এরূপ অপরিচয়ের কুহেলিকামণ্ডিত নহে। মনসাদেবীর ন্যায় তাঁহার অধ্যুষিত অঞ্চলও আমাদের অতি-বাস্তব জগতেরই একটা অংশ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এই অতিপরিচিত পরিমণ্ডলও আমাদের বাস্তববোধকে তীক্ষ্ণতর করিতে পারে নাই। মনসাকে দেবীর আসনে বসাইতে যে আমাদের মনে একটা অনুচ্চারিত প্রতিবাদ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহাই কবিমানসের উপর একটা অস্বচ্ছন্দতার ভার চাপাইয়া তাহার সহজ স্ফূর্তির অন্তরায় হইয়াছে। যেখানে ভক্তি প্রধানতঃ ভয়মূলক, যেখানে দেব-প্রশস্তি দেবরোষ এড়াইবার একটা গত্যন্তরহীন উপায়মাত্র, যেখানে মন আসন্ন বিপৎপাতের সম্ভাবনায় সংকুচিত ও শঙ্কাতুর, সেখানে সহজ-আনন্দজাত বাস্তববোধস্ফুরণ প্রত্যাশা করা যায় না। মধ্যযুগের বাস্তবতা ও অতি-আধুনিক বাস্তবতার মানস উৎস সম্পূর্ণ

বিভিন্ন। আধুনিক বাস্তবতা রোমান্সের প্রতি আস্থাহীনতা ও জীবনের প্রতি গভীর নৈরাশ্যবাদ হইতে উদ্ভূত; বস্তু-ও মনো-জগতের রুগ্ন, ভগ্ন, জীর্ণ উপাদানগুলিকে একত্রিত করিয়া কবিজীবনের এমন একটি অসুস্থ, বিকৃতরূপ সৃষ্টি করেন, যাহা রোমান্স ও সুস্থ জীবনবোধ হইতে প্রায় সমান দূরে অবস্থিত। আধুনিক বাস্তবতা হইতেছে দীপ নির্বাপিত হওয়ার পরে যে উগ্রগন্ধ, শ্বাস-রোধকারী ধূম কক্ষমধ্যে পরিব্যাপ্ত হয় তাহার অনুরূপ। মধ্যযুগের সাহিত্যের বাস্তবতা হইতেছে আলোছায়ার সহজ লীলায় আকাশে যে মাঝে মাঝে মেঘ ঘনাইয়া আসে তাহার মত, তাহাতে জীবনের স্বাভাবিক রূপের কোন বিপর্যয় ঘটে না। মনসামঙ্গলের কবিরা মনসার সম্ভাবিত রোষ ও বেহুলার দুঃখরাহুগ্রস্ত জীবন লইয়া এত উন্মনা যে, বাস্তব জীবনযাত্রার সহজ আনন্দ ও কৌতূহল তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ক্ষীণভাবে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। চাঁদসদাগরের জীবনে উপর্যুপরি এমন বজ্রাঘাত নামিয়া আসিয়াছে যে, ইহার প্রচণ্ডতা আমাদের চিত্তকে অসাড় ও বাস্তববিমূঢ় করিয়া তোলে। চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরা ও খুলনার মত মনসামঙ্গলে বেহুলারও বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু যে বিবাহের বাসররজনী আসন্ন সর্বনাশের অসহায় প্রতীক্ষায় লৌহকক্ষের মৃত্যুশীতল আবহের মধ্যে কাটাইতে হয়, সেখানে জীবনের সহজ উল্লাসের, স্ত্রী-আচারের সরস খুঁটিনাটি বর্ণনার, বাস্তব রসের কৌতূহলপূর্ণ উপভোগের অবসর কোথায়? লৌহ-প্রাচীরের সূচ্যগ্রপ্রমাণ রন্ধ্রপথ দিয়া যে মৃত্যুদূত বাসরকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার বিষাক্ত ফুৎকারে উৎসবের সমস্ত মঙ্গলদীপকে নিবাইয়া দিবে ও নববধূর তরুণ ললাটের সৌভাগ্য-সিন্দুরবিন্দুকে লেহন করিয়া মুছিয়া দিবে, কবিও বেহুলার মত তাঁহার সমস্ত চিত্ত একাগ্র করিয়া, এই আলোছায়াচঞ্চল, বিচিত্র জীবনলীলা হইতে তাঁহার দৃষ্টি সংহরণ করিয়া, তাহারই সর্পিল অভ্যাগমের প্রতি নিবদ্ধ করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ বিপন্মুক্তির পূর্বজ্ঞানও কবি ও পাঠকের এই আতঙ্ক-কণ্টকিত চিত্তের অসাড়তার মধ্যে কোন পুলকচাঞ্চল্য জাগায় না; হতভাগিনী বেহুলার সর্বনাশের অতলকূপে আমাদের সমস্ত আশা-আনন্দের সাময়িক সমাধি ঘটে। মেঘ কাটিয়া যাইবে এই আশ্বাসও আমাদের ঘনমেঘাচ্ছন্ন অদৃষ্টের উপর একবিন্দু সূর্যালোকেরও প্রবেশপথ রচনা করে না। অবশ্য চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় ও সিংহলবাসীর সহিত তাহার দ্রব্যবিনিময়ের কাহিনীতে খানিক সুলভ, অথচ উদ্ভট কৌতুকরসের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তাহার দৈবাহত

জীবনের এই স্বল্পস্থায়ী পরিচ্ছেদটুকু ব্যতিক্রম বলিয়াই আমাদের মনে হয়। বিশেষতঃ, মনসামঙ্গলে যে নৌযাত্রা আমাদের মনের উপর গভীর রেখায় অঙ্কিত হয় তাহা চাঁদের বাণিজ্যাভিযান নয়, তাহা মৃতস্বামীর শব লইয়া কলার মান্দাসের উপর বেহুলার স্বর্গমর্ত্যের সীমান্ত উত্তীর্ণ হইয়া অনির্দেশ্যলোকে প্রয়াণ। অদৃষ্ট-রহস্যোদ্ভেদের উদ্দেশ্যে বেহুলার এই মায়ানদীবাহিত অসমসাহসী অভিযাত্রা আমাদের মনে বাস্তব জগতের সমস্ত স্মৃতিকে ঝাপ্‌সা করিয়া দিয়া উহাকে এক অনির্বচনীয় আশ্চর্যরসে, এক অপার্থিব লোকের সুদূরাগত আভাসব্যঞ্জনায় পূর্ণ করিয়া তোলে। মনসা ও বেহুলা এই দুই বিপরীত কোটির মধ্যে আবর্তিত মনসামঙ্গলের জীবনযাত্রা ঠিক যেন বাস্তব জীবনের প্রতিরূপ বলিয়া আমাদের মনে হয় না; মনে হয় যেন ইহার উপর আর-একটা অচেনা রহস্যঘেরা জগতের আকর্ষণ ইহাকে কতকটা কক্ষচ্যুত করিয়াছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবতা-মানুষের সহজ বিরোধ-মিতালির কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে—এ যেন রূপকথার রাজ্যের ফুৎকারে-উড়িয়া-যাওয়া মায়ামেঘের উদ্ভববিলয়ের কথা। কিন্তু মনসামঙ্গলের শেষ সমাধানের মধ্যে যেন একটি বেদনার সুর, একটা গরমিলের সন্দেহ প্রচ্ছন্ন থাকে। বিরোধমিলন উভয়ের মধ্যেই একটি আতিশয্য যেন সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে; বাঁকা ধনুক আর সম্পূর্ণ সোজা হয় না। মনসাদেবী সমুদ্রে-ডোবা ধনরত্নভরা জাহাজগুলি উদ্ধার করিয়া, চাঁদের মৃত ছয় পুত্রকে বাঁচাইয়া দিয়া তাঁহার পূর্ব-অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের যেন মনে হয় ক্ষতরেখা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই—বেহুলা দিগন্তপারের রাজ্য হইতে কি একটা সংসারভোলানো মন্ত্র শিখিয়া আসিয়াছে, যাহাতে এই পৃথিবীর দাম্পত্যজীবনের নিবিড় আনন্দ তাহার নিকট ফিকে হইয়া গিয়াছে—আর চাঁদসদাগরের অপ্রশমিত মানস বিদ্রোহ তাহার বামহাতে দেওয়া অবহেলার পূজাঞ্জলির তির্যক্ তাৎপর্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সুতরাং মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বাস্তববোধস্ফুরণ কেন যে প্রধানত চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের মাধ্যমে ঘটিয়াছে তাহার কারণ কিছুটা বোঝা গেল। (দেবমহিমার খরোজ্জ্বল রৌদ্র ও ভাবাবেগ-বিগলিত ভক্তির স্নিগ্ধ চন্দ্রিকা মানবজীবনের উপর পতিত হইয়া উহার মধ্যে নূতন তাৎপর্য ও আকর্ষণীয়তা সঞ্চার করিল ও মানবের সহিত সম্পর্কস্থাপনের জন্য দেবতার আগ্রহাতিশয্যের সূত্র অনুসরণ করিয়া কবিও সাধারণ মানুষের প্রতি অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হইলেন। দেবতা

যাহাকে চাহেন কবি তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। যে অনুপাতে দেবতা ঘরোয়া জীবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িলেন, ঠিক সেই অনুপাতে সেই ঘরোয়া জীবনও কবির চক্ষে নূতন কৌতূহলের আকর হইয়া উঠিল। চণ্ডী ব্যাধ কালকেতুকে দয়া করিয়াছেন, অতএব ব্যাধের দারিদ্র্যবিড়ম্বিত, "চোয়াড়" জীবনযাত্রা কবিকল্পনার বিষয়ীভূত হইল—দেবানুগ্রহের সোপান বাহিয়া এই অনার্যজাতির প্রতিনিধি কাব্যকৌলীন্যের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হইল। খুল্লনা-লহনা-ধনপতি-শ্রীমন্ত তাহাদের পারিবারিক জীবনের সমস্ত ছোটখাট কোন্দল ও ধনিগৃহের আদর্শহীন সংসারনীতি ও ভোগবিলাস লইয়া কবির বাস্তব চিত্রণে বিধৃত হইল—স্বর্গীয় আলোকসম্পাতে, বাঙ্গালী ঘরের এই সাদা-মাটা, আত্মতৃপ্ত ও সর্বতোভাবে আদর্শলোকের জ্যোতিঃসংস্পর্শ হইতে আড়াল-করা জীবনযাত্রা কবির আলোকচিত্রযন্ত্রে ছবি হইয়া ফুটিয়া উঠিল।) রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার ভাবের পরিমণ্ডলে শাশুড়ী-ননদী, কলঙ্ক-পরিবাদের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও বাঙালী জীবনের দৈনন্দিন তুচ্ছতা স্থান পায় নাই। (চণ্ডীমঙ্গলে কিন্তু আমাদের জীবনের সমস্ত ইতর কাকলী, সবটুকু মলিনতা ও স্থূল ধূলি-অবলেপ নিঃসংকোচে, মাতৃ-অঙ্কে ধূলিধূসরিত শিশুর ন্যায়, স্থান গ্রহণ করিয়াছে—দেবাশীর্বাদের পূতস্পর্শ উহার সমস্ত অশুচিকে শুচি করিয়া দিয়াছে।

(৫)

(মুকুন্দরাম এই বাস্তবতার প্রবর্তক নহেন, কিন্তু তাঁহার কাব্যে ইহার শ্রেষ্ঠতম, সাবলীলতম প্রকাশ। বিষয়নির্বাচনের দিক্ দিয়া তিনি বিশেষ মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন না। যে সমস্ত বর্ণনা আমরা তাঁহার মৌলিক বাস্তবতার নিদর্শনরূপে উল্লেখ করিয়া থাকি সেগুলি দ্বিজ মাধবেও পাওয়া যায়, সুতরাং সেগুলি তাঁহার নিজস্ব উদ্ভাবন নহে, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হইতেই প্রাপ্ত। বরং কোন কোন স্থলে দ্বিজ মাধবের সহিত তুলনায় মুকুন্দরাম অধিকতর আদর্শবাদী; বাস্তব ঘটনাকে তিনি ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি-সাধনার আদর্শে পরিমার্জিত করিয়া লইয়াছেন। দ্বিজ মাধবে কালকেতুর বিবাহব্যাপারে বরের পিতা সোজাসুজি কন্যার পিতার নিকট গিয়া তাহার নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে ও ব্যাধসুলভ সরলতার সহিত পণ নির্ধারণ করিয়াছে।

মুকুন্দরামে কিন্তু এই সমস্ত দরদস্তুর ঘটকের মাধ্যমে সংঘটিত হইয়াছে, উচ্চ বর্ণের রীতিনীতি তিনি নির্বিচারে নীচ বর্ণে আরোপ করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবে ধর্মকেতুর মৃত্যু ঘটিয়াছে সচরাচর বন্যপশুশিকারে নিযুক্ত ব্যাধের যেরূপ ভাবে ঘটিয়া থাকে—সিংহের আক্রমণে, অবশ্য নিদয়া উচ্চবর্ণসুলভ হিন্দু-আদর্শ অনুসরণে স্বামীর চিতায় পুড়িয়া সহমরণে গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিপুষ্ট মুকুন্দরাম কিন্তু এরূপ প্রাকৃত মৃত্যুতে সন্তুষ্ট না হইয়া নিজ কাব্যের আভিজাত্য বজায় রাখিতে ধর্মকেতু-নিদয়াকে বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া কাশী পাঠাইয়াছেন। জাতকর্ম বা বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানেও তিনি ব্যাধপরিবারে ভদ্রঘরের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর, ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের নিখুঁত ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহাদের উৎসবকালীন সচ্ছলতার সহিত দৈনন্দিন সংসারযাত্রার দারিদ্র্য-বিড়ম্বনার যে অসামঞ্জস্য তাহা অবশ্য বাস্তব জীবনে বিরল নহে; তথাপি মনে হয় যেন এইরূপ জীবনচিত্রণে কবি তাঁহার অবিসংবাদিত বাস্তববোধের সহিত কবিজনসুলভ আদর্শপ্রীতির খানিকটা সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন।

(কিন্তু তথাপি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে জীবনের যে প্রত্যক্ষ রূপ, যে স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রচুর জীবনরস-রসিকতা পাওয়া যায় তাহা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁহার কৃতিত্ব কেবল বস্তুসঞ্চয়ে নহে, বাস্তবরসের পরিবেশণ-নৈপুণ্যে। তাঁহার কাব্য হইতে কেবল যে সমকালীন সামাজিক অবস্থার প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করা যায় তাহা নহে, ইহাতে সমাজ-জীবনের স্বচ্ছন্দ-লীলায়িত গতিচ্ছন্দ, ইহার বহির্ঘটনার অন্তরালশায়ী মর্মস্পন্দন চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরাম যে সহজ কৌতুক ও সুস্থ, বলিষ্ঠ উপভোগশক্তির সহিত তাঁহার আখ্যায়িকা বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে আমরা আমাদের সাধারণ ঘরোয়া জীবনকে নূতনভাবে আস্বাদন করিতে শিখিয়াছি। (তাঁহার প্রসন্ন কৌতুক-প্রিয়তা, বঙ্কিম কটাক্ষ, ঈষৎ তির্যক্ দৃষ্টিভঙ্গী দারিদ্র্যের ঊষর উপরিভাগের অভ্যন্তরে যে রসনির্ঝর প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাই আবিষ্কার করিয়াছে।) বস্তুর কারবারী ও বাস্তবরসের স্রষ্টা ঠিক এক নহে—বস্তুপুঞ্জ হইতে বাস্তব-রস-নিষ্কাশন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্পবোধ-সাপেক্ষ।) ইংরেজী সাহিত্যে চসার বাস্তবরসের কবি, কেন-না, তিনি ইংলণ্ডে চতুর্দশ শতকের যে সমাজচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে বস্তুতথ্যসমূহ এক রসতরঙ্গে ভাসমান হইয়া তাহারই অঙ্গীভূত হইয়াছে। উনবিংশ

শতকে ক্র্যাব জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, দারিদ্র্যের নিরানন্দ, রক্তশোষী সংগ্রাম, রিক্ত জীবনের মানস ও অনুভূতিগত রিক্ততা প্রশংসনীয় মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সৃষ্টিধর্মী দৃষ্টিশক্তির অভাবে তিনি এই উপাদানসমূহকে রসে পরিণত করিতে পারেন নাই। সমসাময়িক যুগের কাব্যে যে অবাস্তব সৌন্দর্যবোধ ও শূন্যগর্ভ আদর্শবাদ পল্লীজীবনের আসল রূপটিকে আড়াল করিয়া উহাকে এক কল্পলোকের শ্রীমণ্ডিত করিয়া দেখাইয়াছে, ক্র্যাবের কবিতা তাহারই প্রতিবাদ; কিন্তু এই নিম্নতম মানের জীবনের প্রাণকেন্দ্র কোথায় তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি বস্তুর কবি, কিন্তু বাস্তবরসের কবি নহেন। মুকুন্দরামের বস্তুনিষ্ঠতা চসারের পর্যায়ের; জীবনের সমস্ত ত্রুটি-অসঙ্গতি-অকিঞ্চিৎকরতা সত্ত্বেও ইহা যে প্রচুর আনন্দরসের উৎস ও উপভোগ্য আস্বাদ্যতার কারণ তাহা তিনি স্বয়ং আবিষ্কার করিয়াছেন ও পাঠককে অনুভব করাইয়াছেন।

মুকুন্দরাম সম্বন্ধে একটি বহুপ্রচলিত মতবাদ এই যে, তিনি দুঃখবাদের কবি ও তাঁহার জীবনের অত্যাচার-উৎপীড়ন-জনিত তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। যিনি জীবন-রসরসিক কবি, তিনি জীবনে দুঃখ পাইলেও দুঃখকে খুব বড় করিয়া দেখেন না। তাঁহার কাব্যে দুঃখের উল্লেখ থাকিলেও তিনি দুঃখবাদের কবি নহেন। দুঃখের অভিজ্ঞতা তাঁহার মানস প্রবণতাকে এক বিশেষ রূপ দেয়, কিন্তু তাঁহার মনকে অপ্রীতিকর স্মৃতিরোমন্থন ও নৈরাশ্যবাদের অন্ধকূপে আবদ্ধ রাখে না। কষ্টের খনিত্র দিয়া তিনি জীবনের ক্লেশবন্ধুর ভূমিকে কর্ষণ করিয়া তাহার মধ্যে স্নিগ্ধ সমবেদনা ও সরস কৌতুকের ভোগবতীধারা প্রবাহিত করেন। মুকুন্দরামের আত্মজীবন-কাহিনী মধ্যযুগীয় সাহিত্যের একটি সনাতন ধারারই অনুবর্তন—প্রত্যেক কবিই গ্রন্থারম্ভে তাঁহার কিঞ্চিৎ বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার পূর্বপুরুষ-সম্বন্ধে দুই-একটি বিচ্ছিন্ন তথ্য পাঠককে জানাইয়াছেন। কিন্তু মুকুন্দরামের হাতে পড়িয়া এই মামুলি আত্মপরিচয় এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, নিজ ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র পটভূমিকায় সমগ্র যুগের পরিচয় উজ্জ্বল, অবিস্মরণীয় বর্ণে দীপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই অবিচার-অরাজকতার স্বরূপ-উদ্ঘাটনে কবির কোন তীব্র উষ্মা বা মর্মদাহী জ্বালা প্রকাশ পায় নাই। যে লেখনীসাহায্যে তিনি প্রজাসাধারণের দুর্দশা

বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তিনি বিদ্রূপের বিস্ফোরক দ্রাবকরসে ডুবান নাই, তাহাকে এক শান্ত, কৌতুকস্মিত বিস্ময়বোধের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন। এই অত্যাচারীদের প্রতি তিনি রক্তচক্ষু অভিশাপ বর্ষণ করেন নাই, সমস্ত ব্যাপারটির অহেতুক অসঙ্গতিটি তাঁহার মনে একটি কারুণ্যমিশ্রিত কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সৃষ্টি করিয়াছে। কবি যেন এই নির্মম অত্যাচারের দ্রষ্টা-রূপে গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন যে, এই সুস্থমস্তিষ্ক, সুনিয়ন্ত্রিত জীবনটা হঠাৎ পাগলামির খেয়ালে পরিণত হইল কি করিয়া? এই বেদনাবিদ্ধ আকস্মিক বিপর্যয়বোধই তাঁহার বর্ণনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। অত্যাচারের নিষ্পেষণযন্ত্রে তিনিও ব্যক্তিগতভাবে পিষ্ট ও দলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মানসভঙ্গী বদলায় নাই, নিজের কথা বলিতে গিয়াও তাঁহার কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক রহস্যপ্রিয়তা অশ্রুবাষ্পোচ্ছ্বাসে অভিভূত হয় নাই। "তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান করিলুঁ উদক পান শিশু কাঁদে ওদনের তরে"—দারিদ্র্যের এই মর্মভেদী অনুভূতি তাঁহার শিল্পিজনোচিত প্রশান্তি ও সার্বভৌমতাবোধকে বিচলিত করে নাই। ঝটিকা-তাড়িত বালুকণা যেমন বিলয়ের আশঙ্কার অপেক্ষা বায়ুসঞ্চরণের অভিনব অভিজ্ঞতার কৌতুকাবহ দিক্‌টি বেশী অনুভব করে, তেমনি রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রলয়ঝটিকায় উন্মূলিত ও ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত এই কবিসত্তা নিজ ক্ষতি ও সর্বনাশের দিক্‌টা লঘু করিয়া দেবীর প্রত্যাদেশে/তাঁহার কবিত্বশক্তির স্ফুরণজনিত আনন্দ, নূতন স্থানে আশ্রয়প্রাপ্তির নিশ্চিন্ত আরাম ও আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসকেই মুখ্যভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। হাস্যরসিকের বৈশিষ্ট্যই ইহাই—জলসিক্ত রাজহংসের পাখার ন্যায় তাঁহার দুঃখ-আর্দ্র চিত্ত সংসক্ত দুঃখকণিকাগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলাইয়া আরও মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখায়।

কোন কোন সমালোচক কালকেতুর দ্বারা উৎপীড়িত পশুসমাজের অনুযোগের ভিতর তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিধ্বনি, তাহার মধ্যে তাঁহার তিক্ত অভিজ্ঞতার উদ্‌গীরণের নিদর্শন পান। কিন্তু সত্য ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা উহার তীব্রতা হারাইলে, উহার স্থূল বস্তুঅংশ ও মানস তীক্ষ্ণ অভিঘাত বর্জন করিয়া সূক্ষ্ম রস-রূপে, একটা ঊর্ধ্বায়িত, নিরপেক্ষ অনুভূতিরূপে অধিষ্ঠিত হইলে তবেই উহাকে এক সম্পূর্ণ উদ্ভট প্রতিবেশে স্থানান্তরিত করিয়া অবিমিশ্র রসিকতার উপাদানে পরিণত করা সম্ভব। উত্তাপের আলোকে রূপান্তরের মত শিল্পিমনের রহস্যময় প্রক্রিয়ায়

ব্যথা হাসিতে বিলীন হয়। এ যেন রূপকথার রাজকন্যার "হাসিতে মাণিক, কান্নায় মুক্তা" ঝরার মত ব্যাপার—হাসি ও কান্নায় তফাৎ যেন মাণিক ও মুক্তার মত। নিজের মর্মবেদনা পশুতে আরোপ করার পিছনে দুঃখবোধের স্থায়িত্ব ততটা নাই, যতটা আছে দুঃখক্লিষ্ট মনের স্থিতিস্থাপকতা। 'নেউগি চৌধুরী নই না রাখি তালুক'—এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য আত্মদুঃখ-নিবেদন নহে, জমিদার ও সাধারণ প্রজার মধ্যে ব্যবধানের ইঙ্গিত। ভালুকের বেনামীতে কবির অনুযোগ এই যে, যে অত্যাচার জমিদার-ডিহিদারের উপর অনুষ্ঠিত হইলে বিধানসঙ্গত হইত, তাহা সাধারণ পশু বা মানবের উপর কেন অনুষ্ঠিত হইতেছে? ঝড় বড় গাছে লাগিলে কাহারও কিছু বলার থাকে না, কিন্তু ঘাসকে উৎপাটিত করিলে সঙ্গতিবোধ বিপর্যস্ত হয়। বড় শোষক ক্ষুদে শোষককে গ্রাস করিলে শোষণক্রিয়াই দণ্ডিত হয় ও ন্যায়নিষ্ঠার মর্যাদা রক্ষা হয়; কিন্তু যে সামান্য প্রজা সমস্ত মধ্যস্বত্বকেই মানিয়া লইতে প্রস্তুত তাহার উপর অনর্থক জুলুম কি শক্তির অপব্যবহার নয়? এখানে লক্ষ্য করা উচিত যে কবির কাতরতার মধ্যে তাঁহার প্রতি অনুষ্ঠিত আচরণের অসঙ্গতির অনুযোগই মুখ্য সুর। ইহা গভীর মর্মবেদনার অভিব্যক্তি নয়, হাস্যরসিকের তির্যক্ কটাক্ষ ও বিচারের কৌতুকাবহ মানদণ্ড। এই উক্তির গূঢ় তাৎপর্যটি বুঝিতে পারিলে পশুরাজ সিংহ যে ভালুককে স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিতেন না তাহা নিশ্চিত এবং কবির আশ্রয়দাতা 'সুধন্য বাঁকুড়া রায়'ও যে তাঁহার শিরোপার ব্যবস্থা করিতেন না তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

"ফুল্লরার বারমাস্যা"র দুঃখকাহিনী-বর্ণনাও সমালোচকগণ কবির দুঃখবাদ-প্রবণতা ও দারিদ্র্যের প্রতি সহানুভূতির অকাট্য প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সহানুভূতি কবিমাত্রেরই থাকিবে ও তাঁহার মানসসৃষ্টি যদি দরিদ্রশ্রেণীভুক্ত হয়, তবে এই সহানুভূতি যে বহুলাংশে দারিদ্র্যের প্রতি তাহাও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার অপত্যস্নেহ প্রধানত অবলম্বন করিয়াছে কালকেতু-ফুল্লরা বা হর-গৌরীকে, তাঁহাদের দারিদ্র্যকে নহে। প্রতি পিতামাতা কানা ছেলেকেও ভালবাসে, কিন্তু সে কানা বলিয়া নহে। সমালোচকগণ ব্যাধজীবনের দৈনন্দিন অভাব-অনটন, উহার উপকরণের স্বল্পতাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু এই ঘটা করিয়া দারিদ্র্যবর্ণনার উপলক্ষ্যের প্রতি তাদৃশ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। এই দারিদ্র্যের আড়ম্বর যে

সম্ভাবিত সপত্নীকে তাড়াইবার কৌশলমাত্র, ফুল্লরার মনের কথা নয়, দুঃখবাদ-গ্রস্ত, আধুনিক সমালোচক তাহা বুঝিবেন না। হয়ত এই চিত্রের মধ্যে তথ্যগত অতিরঞ্জন না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার ভাবগত প্রেরণা যে করুণরস-উদ্দীপন নহে, তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ফুল্লরা কাহারও সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য তাহার গৃহস্থালীর রিক্ততা ও তাহার জীবন-সংগ্রামের তীব্রতার মসীময় চিত্র আঁকে নাই, এক 'উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া-বসা' অবাঞ্ছিত আগন্তুককে বিদায় দিবার জন্যই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছে। তাহা না হইলে সে এতদিন এ সম্বন্ধে নীরব ছিল কেন? যখন চণ্ডীর ছলনায় শিকার না পাওয়ার দিন সে সই-এর কাছে চাল ধার করিতে গেল, ও পূর্ব-ঋণ পরিশোধ না করার খোঁটা নিঃশব্দে পরিপাক করিল, তখন তাহার ত এই দারিদ্র্যবিলাসের কোন চিহ্নই দেখি না। আমাদের আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদী মন মাস হইতে মাসান্তরে প্রসারিত অভাবের এই সুদীর্ঘ, ক্রমবর্ধমান তালিকা দেখিয়া মধ্যযুগীয় বাংলাতেও যে সমাজতন্ত্রী কবি ছিল এই নিজ মনের মত সত্য প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। কিন্তু এই চিত্র আঁকিবার সময়ে কবি যে রুমাল বাহির করিয়া ঘন ঘন অশ্রুমোচন করিতেছিলেন না, পরন্তু বিবদমানা দুই নারীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া ও তাহাদের বিভিন্নভাব-প্রতিবিম্বী মুখের দিকে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিতেছিলেন—এই দৃশ্য বোধ হয় আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

হর-গৌরীর দারিদ্র্যও সেই একই মনোভাবের দ্যোতক। দেবমহিমা-কীর্তক মঙ্গল-কাব্যের পটভূমিকায় দারিদ্র্যের এই চিত্র ইহাকে গুরুত্ব দিবার জন্য নহে, ইহাকে লঘু করিয়া দেখিবার জন্য। যেখানে স্বয়ং শিব ভিখারী ও অন্নপূর্ণা অন্নরিক্তা, সেখানে তোমার আমার দারিদ্র্যের প্রতি অনুযোগে উচ্চকণ্ঠে গগন বিদীর্ণ করিবার কি অধিকার আছে? পৃথিবীর যত অনাহার অর্ধাশন-ক্লিষ্ট জনসাধারণ সকলেই হর-গৌরীর পরিবারভুক্ত। দরিদ্রের দেবতাকে আমাদের মাঝে পাইয়াও কি দারিদ্র্য আমাদের বিভীষিকা হইবে? আর ইহা কি বুঝিতেছ না যে, ইহা সমস্তই মায়াপ্রপঞ্চ, দেবের ছলনা? যে অন্নপূর্ণা অন্নবিহনে স্বামী ও পুত্রকন্যাকে উপবাসী রাখিতে বাধ্য হইতেছেন, তিনিই আবার ভক্ত কালকেতুকে সাত ঘড়া মোহর দান করিতেছেন। সুনিপুণ গৃহিণীর ন্যায় ইহার এক ঘড়া নিজের জন্য রাখিলেই

ত তিনি এই তিক্ত গৃহবিবাদের হাত হইতে রক্ষা পাইতেন। অতএব (দারিদ্র্যের জন্য বৃথা মাথা না ঘামাইয়া যিনি কটাক্ষমাত্রে রিক্ততাকে রাজৈশ্বর্যে পরিণত করিতে পারেন তাঁহারই চরণাশ্রয় ইহকাল ও পরকাল এই উভয় অবস্থারই যে কাম্য এই সত্য হৃদয়ঙ্গম কর। কবি আমাদের এই কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু যুগধর্মের প্রভাবে আমরা বুঝিতেছি অন্যরূপ।)

আসল কথা দুঃখদারিদ্র্যের প্রসঙ্গ কাব্যে উত্থাপন করিলেই কবি দুঃখবাদী হন না। আমরা তাঁহার অভাবের তালিকা দেখিতেছি, তাঁহার দুঃখজয়ী মনোভাবকে ঠিক গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। এই দুঃখসম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকারত্ব, দুঃখসচেতনতার একান্ত অভাব, দুঃখে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়াও জীবনরসের উপভোগ—ইহাই ইতিহাসের যুগযুগান্তর ধরিয়া বাঙ্গালী নিম্নতর সমাজের বৈশিষ্ট্য ও টিকিয়া থাকিবার রহস্য।) ফুল্লরার জীর্ণ কুটীরে পাতার ছাউনি ও ভেরেণ্ডার থাম কালবৈশাখীর ঝড়ে উড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, কিন্তু যে অবিচল শান্তি ও সন্তোষ, স্বামিসৌভাগ্যের যে সুদৃঢ় স্তম্ভাশ্রয় তাহার গার্হস্থ্য জীবনকে আচ্ছাদন ও স্থায়িত্ব দিয়াছে তাহার উপর ঝটিকার কোন এক্তিয়ার নাই। পাত্রের অভাবে সে মেজেতে গর্ত খুঁড়িয়া আমানি রাখে, কিন্তু তাহাতে আমানির স্বাদুতার বিন্দুমাত্র অপচয় ঘটে না। যে কবি অভাবপীড়িত কালকেতুর অন্নের গ্রাসকে 'তে-আঁটিয়া তালের' সহিত তুলনা করিয়াছেন, তিনি যে অভাবের শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন এমত বোধ হয় না। জানি না চণ্ডীপূজার সহিত ব্যাধজীবনের সম্বন্ধ কি সূত্রে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু বিখ্যাত স্মার্ত রঘুনন্দন চণ্ডীপূজার যে স্মৃতির ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাতে ব্যাধোপাখ্যান-শ্রবণ পূজার একটা অপরিহার্য অঙ্গরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্যাধের সঙ্গে সঙ্গে অনার্যজাতির হীন মানের জীবনযাত্রার চিত্র আসিয়া পড়িয়াছে; এবং এই চিত্রাঙ্কনের জন্য মুকুন্দরাম দারিদ্র্যের প্রতি বিশেষভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন কবি বলিয়া সমালোচক-মহলে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার বিষয়নির্বাচনে স্বাধীনতা থাকিলে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য অনস্বীকার্য হইত। কিন্তু দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম উভয়ের কাব্যেই ঘটনাগুলি সাধারণ থাকায়, মুকুন্দরামের সহানুভূতির প্রমাণ খুঁজিতে হইবে তাঁহার বিষয়বিন্যাসের মধ্যে নহে, আলোচনাপদ্ধতি হইতে অনুমিত তাঁহার মনোভাব ও জীবনদর্শনে।)

(৬)

দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরামের মধ্যে তুলনা করিলে উঁহাদের মধ্যে বাস্তবরসের আপেক্ষিক প্রসার সম্বন্ধে ধারণা করা যাইবে। মোটের উপর এই কথা বলা যাইতে পারে যে, দ্বিজ মাধবে বাস্তবতার অঙ্কুর আছে, কিন্তু ইহা শাখাপল্লবে, ফুলে-ফলে ব্যাপ্ত হয় নাই। তিনি যেখানে বাস্তব তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন, সেখানেও স্বচ্ছন্দ গতি ও পরিপূর্ণ প্রসারের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই, তাঁহার বস্তুবর্ণনার মধ্যে খানিকটা আড়ষ্ট ভাব রহিয়া গিয়াছে। বস্তুবিন্যাসকে চারুশিল্পে পরিণত করিতে হইলে প্রয়োজন প্রশস্ত পরিবেশ ও কবিচিত্তের সহজ উল্লাস। বর্ণনীয় বিষয় যে আত্মপ্রসারণের উপযোগী বিস্তারভূমি পাইয়াছে ও লেখকের বর্ণনাভঙ্গী যে তাঁহার জীবনরসিকতার পরিচয় বহন করিতেছে, এই দুইটি সর্ত পূর্ণ না করিলে বাস্তবরসের কবি হওয়া যায় না। দ্বিজ মাধব তাঁহার পর্যাপ্ত বস্তুসঞ্চয়ের মধ্যে সহজ গতিচ্ছন্দ আনিতে পারেন নাই, বা তাঁহার বস্তুর প্রাচীর ভেদ করিয়া তাঁহার চিত্তের আনন্দহিল্লোলও আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

হর-গৌরীর পারিবারিক জীবন তাঁহার কাব্যে স্থান পায় নাই; দরিদ্রের ঘরের গৃহিণী, সাংসারিক কর্তব্যভারে ক্লিষ্টা গৌরী তাঁহার কাব্যে উগ্রপ্রকৃতি, মঙ্গলদৈত্যসংহারিণী চণ্ডী। কালকেতুর মাতার গর্ভসঞ্চারের সহিত কবির উর্ধ্বলোকসঞ্চারিণী কল্পনা মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে—নিদয়ার গর্ভযন্ত্রণা কতকটা বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত হইয়াছে, তবে ইহার মধ্যে বাস্তবরসবিস্তারের যে সুযোগ ছিল কবি যেন তাড়াতাড়িতে তাহার সবটা গ্রহণ করেন নাই। মুকুন্দরামে গর্ভবতী ব্যাধরমণীর সাধভক্ষণের যে আয়োজনকে আশ্রয় করিয়া কবি তাঁহার জীবনরসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, দ্বিজ মাধবে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। কালকেতুর শৈশবজীবনের যে অনুপম চিত্র আমরা মুকুন্দরামে পাই, দ্বিজ মাধবে তাহার একটা সংক্ষিপ্তসার মাত্র আছে—বর্ণনার যেরূপ সরস, সাবলীল ও পূর্ণাঙ্গ বিস্তারে রস সৃষ্টি হয় দ্বিজ মাধব ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। মাধব একনিঃশ্বাসে কালকেতুকে শৈশব হইতে যৌবনে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—শৈশবক্রীড়া ও বাঁটুলদ্বারা পক্ষিশিকারে শিক্ষানবিসির রস উপভোগ করিবার পূর্বেই তাহাকে জীবিকার্জনের জন্য পশুবধে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। মুকুন্দরামে ক্রীড়ারত 'শিশু মধ্যে মোড়ল' ব্যাধবালকের উপর পৌরাণিক

রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণের খানিকটা ছায়াপাত হইয়াছে, তাহার অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্যের ভিতর দিয়া তাহার মধ্যে একটা বৃহত্তর সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করি; মাধবের কাটা-ছাঁটা, স্বল্পতম তথ্যমাত্রে সীমাবদ্ধ বর্ণনা আমাদের মনে কোন উদারতর কল্পনা জাগায় না। কালকেতুর বিবাহ-বর্ণনা দ্বিজ মাধবে খুব সংক্ষিপ্ত, এবং উহার বৃহত্তর অংশ দুই বৈবাহিকের মধ্যে পণনির্ধারণ লইয়া ব্যাপৃত; বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান, অনার্য-বিবাহে মন্ত্রপাঠের মত, অনেকটা নমো নমো করিয়া সারা হইয়াছে; রন্ধনের তালিকাও ব্যাধের রুচি ও অর্থসঙ্গতির মানদণ্ডে খুব স্বল্পোপকরণ। মুকুন্দরামে বিবাহের কৌতুকরস, প্রাকৃত নরনারীর সহজ আনন্দ সমস্ত বর্ণনার বাহুল্য ও প্রসারের মধ্য দিয়া সুপ্রচুর ধারায় প্রবাহিত। বিবাহপূর্বের ক্রিয়াকাণ্ড প্রায় সমস্তই বৈদিক-নির্দেশানুসারী, ও বিবাহোৎসবের মধ্যেও উচ্চবর্ণসুলভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেরই প্রাধান্য। অবশ্য গৃহসজ্জা-যৌতুক-উপহারের মধ্যে ব্যাধজীবনের বাস্তব রুচি ও বৃত্তির কথা লেখক বিস্মৃত হন নাই। মাধব বিবাহসভায় উপস্থিত ব্যাধরমণীগণের শরীরের দুর্গন্ধ ও উদ্ভট সাজসজ্জার কথা উল্লেখ করিয়া আমাদের কৌতুকরস উদ্রিক্ত করিতে চাহিয়াছেন। মুকুন্দরাম কিন্তু উৎসবের সমীকরণশক্তির মধ্যে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের সমস্ত ভেদকে বিলুপ্ত করিয়াছেন, তাঁহার এয়োরা আচরণ ও বেশভূষায় কোন অনার্যজাতিসুলভ বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন বহন করে না। মাধব ধর্মকেতুর জীবনাবসান ঘটাইয়াছেন খুব স্বাভাবিক উপায়ে—বন্য পশুর আক্রমণে; ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিশাসিত মুকুন্দ কিন্তু তাহাকে বারাণসীধামে বানপ্রস্থ অবলম্বন করাইয়াছেন ও প্রতিদিনকার সম্বলহীন কালকেতুর দ্বারা উচ্চবর্ণের অনুকরণে পিতামাতার জন্য মাসিক বৃত্তিপ্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যাধের এই পরিণাম হয়ত ঠিক বাস্তবানুগামী নহে, কিন্তু পূর্বাপরসঙ্গতির দিক্ দিয়া অত্যন্ত উপযোগী। কালকেতুর বিবাহসভায় যে বৈদিক-অনুষ্ঠান-প্রাধান্য ও তাহার ভবিষ্যজ্জীবনে চণ্ডীর অনুগ্রহে তাহার যে আভিজাত্যে উন্নয়ন তাহাদেরই সহিত মিল রাখিয়া তাহার পিতামাতার এই বারাণসী-প্রয়াণ।

কালকেতুর পশুশিকার-কাহিনীকে উপলক্ষ্য করিয়া মুকুন্দরামের কাব্যরস, হাস্যরসিকতা ও রূপকের আরোপদক্ষতা যেন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন পশুর চরিত্রসৃষ্টি, তাহাদের উক্তির মধ্যে চরিত্রানুযায়ী সঙ্গতিবিধান ও কবির নিজ অভিজ্ঞতা হইতে এই আরণ্যক নাটকে মানবজীবনের কৌতুককর সাদৃশ্য-

আরোপ—এই সমস্ত মিলিয়া একটি উপভোগ্য নাট্যরস জমিয়া উঠিয়াছে। কবিপ্রতিভার যাদুস্পর্শে বন যেন লোকালয়ের মত মুখর হইয়া উঠিয়াছে; পশুদের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাহাদের কাতর কলরবের বিচিত্র ঐকতান, তাহাদের জীবনস্পৃহার রসোচ্ছল আকৃতি, মানবসমাজের অনুকরণে পশুসমাজের অধিকার-কর্তব্য-নির্দেশ কবিমানসের একটা গভীর আলোড়ন, একটা উতরোল প্রাণহিল্লোলের সংবাদ বহন করে। এই কাহিনী যেন কবির বেদনাময় পূর্বস্মৃতি ও দীর্ঘসঞ্চিত কৌতুকরসকে জাগাইয়া দিয়া তাঁহার মনোরাজ্যে একটা বিরাট্ তোলপাড়ের সৃষ্টি করিয়াছে ও তাঁহার সরস বর্ণনাকৌশলের ভিতর দিয়া এই উত্তেজনার ঢেউ পাঠকের হৃদয়তটে আসিয়া প্রহত হইতেছে। অবশ্য দ্বিজ মাধবেও পশুজগতের এই জীবনচাঞ্চল্যের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মুকুন্দ যেমন প্রাণের গভীর অনুভূতি ও নাটকীয় রসসৃষ্টির বাসনা লইয়া এই চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার সহিত মাধবের ক্ষীণ ঔৎসুক্যের তুলনা হয় না। আখ্যানভাগ উভয়ের মধ্যে কেহই উদ্ভাবন করেন নাই—উভয়েই ইহা কোন-এক সাধারণ ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কবিচিত্তের ভাবাসঙ্গসৃজনের কোন এক নিগূঢ় সূত্র ধরিয়া এই কাহিনীটি মুকুন্দরামের অন্তর্জগতের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়াছে; অকস্মাৎ তাঁহার পূর্বজীবনের উৎপীড়নের স্মৃতি ইহার সহিত যোগ দিয়া তাঁহার মর্মকোষক্ষরিত প্রাণরসে ইহাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, কবির বেদনা কেমন করিয়া কৌতুকরসে, জীবন-কৌতূহলে, পরিণত হইয়াছে; বেদনার বিস্মৃত হৃদয়াবেগ বাস্তবচিত্রণের বর্ণাঢ্যতা-বিধানের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার রূপ বদলাইয়াছে, কিন্তু শক্তি নিঃশেষিত হয় নাই। চণ্ডীমঙ্গলের এই প্রাণিজগতের চিত্র কবিমনস্তত্ত্বের এক কৌতূহলোদ্দীপক নিদর্শনরূপে বাংলাসাহিত্যে চিরন্তনতা লাভ করিবে।

তারপর মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্ত মধ্যযুগীয় বাংলাসমাজের এক নূতন স্তরের প্রতিনিধিরূপে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দুইটি চরিত্রও সাধারণ ভাণ্ডার হইতে গৃহীত। দ্বিজ মাধবে যে বেনের নিকট কালকেতু চণ্ডীদত্ত অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইতে গেল তাহার নাম সোমদত্ত। মুকুন্দরামের সহিত তুলনায় এই আখ্যানভাগ অনেক নীরস ও সংক্ষিপ্ত। এখানে খুড়া আছে, কিন্তু খুড়ার উপযুক্ত সহধর্মিণী, তাহার শাঠ্যের সহযোগিনী খুড়ী নাই। ধার শোধ দিবার ভয়ে বেনের আত্মগোপন, রঙ্গমঞ্চে বেনেনীর আবির্ভাব ও স্তোকবাক্যে কালকেতুকে এড়াইবার

চেষ্টার মধ্যেই আবার নূতন ধারের প্রস্তাব, লাভের গন্ধ পাইয়া খিড়কি দরজা দিয়া বেনের প্রবেশ, কালকেতুকে ঠকাইবার ফিকির ও শেষ পর্যন্ত দেবীর আকাশবাণী শুনিয়া ভক্তিতে নয় ভয়ে, বাধ্যতামূলক সাধুতার অবলম্বন—এ সমস্ত মাধবের গ্রন্থে নাই। এই তথ্যসমাবেশের মধ্যে যে প্রাণের ঝলক, ধর্মনীতি-নিরপেক্ষ নিছক অস্তিত্বের যে আনন্দ তাহাই এই ক্ষুদ্র ঘটনাসংস্থানকে একটি কৌতুকোজ্জ্বল জীবন-নাট্যের রূপ দিয়াছে। দ্বিজ মাধবে ঠকাইবার একটা প্রাণহীন উদ্যম আছে, কিন্তু বেনে আকাশবাণীর সাহায্য ব্যতিরেকেই অঙ্গুরীয়টি যে চণ্ডীর ধন তাহা বুঝিয়া তাহার ঠকাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে। তবে দ্বিজ মাধব যে এই বিষয়ে তাঁহার পর্যবেক্ষণশক্তিকে প্রথাবদ্ধতার আফিং-এর নেশায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই, তাহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত এই দুই ছত্রে মিলে :—

চাকর ধরিল বীরে ত্তারে কিছু দিয়া।
ছালায়ে ভরিয়া ধন লই যায়ে বহিয়া॥

বাস্তব জীবনের ভগ্নদূত এই চাকর ও বাস্তব দারিদ্র্যের প্রতীক ধন বহিবার ছালা কবিকল্পনার নেপথ্যলোক হইতে অতর্কিতভাবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ইহাকে বস্তুরাজ্যের অঙ্গীভূত করিয়াছে। মুকুন্দরাম আকাশবাণীর সহিত তাঁহার বাস্তব-বোধের একটা আপস-নিষ্পত্তি করিয়া এই দেব-প্রত্যাদেশকে কেবল বেনেরই গোচরীভূত করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতেও সংশয়বাদীরা আকাশবাণীর সার্বজনীন পরিবেশনে ঠিক রাজী ছিল বলিয়া মনে হয় না।

নগরপত্তন-ব্যাপারেও বাস্তববোধ ও প্রথানুস্মৃতির মধ্যে একটা সন্ধিবন্ধন-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। নগরের ঐশ্বর্য ও আয়তন পৌরাণিক যুগের স্বর্ণলঙ্কার আদর্শে নির্ধারিত হইয়াছে—মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি অতিস্ফীত কল্পনার প্রভাব বহন করে। কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গে এই অলৌকিক সমৃদ্ধিবর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কোন অসতর্ক মুহূর্তে বাস্তব অবস্থার দুই-একটি ইঙ্গিত কবিকল্পনার শাসন অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। একদিকে "ইন্দ্রনীল-পাষাণে রচিত কৈল পোতা"; আবার অন্যত্র "চারি হালা খড়েতে ছাইল চারি পাট"—মনে হয় যেন কবি সৌধকিরীটিনী, রত্নদীপ্তিমণ্ডিতা কোন পৌরাণিক পুরীর কল্পনার সহিত তাঁহার বাস্তব প্রতিবেশের খড়ো ঘরের প্রত্যক্ষতাকে মিশাইয়াছেন।

এই কল্পনাবাস্তবের সংমিশ্রণ-ব্যাপারে দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দ একই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবেও দেখি "কনক কলসী ভরি প্রজা থায়ে

পানি"; কিন্তু ছেলেদের খেলা-বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি চোখে যাহা দেখিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন—"আনিয়া পোতলা ভাল নাচায়ে ছাওয়ালে।" যেখানে প্রজাসাধারণ সোনার কলসী হইতে জল পান করে, সেখানে ছেলেদের খেলার জন্য অন্তত সোনার ভাটার ব্যবস্থা করিলে কল্পনায় সঙ্গতি রক্ষা হইত। মধ্যযুগীয় বাংলা কবির ভূগোলতত্ত্ব-বিশারদ হওয়ার জন্য কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, তথাপি নবনির্মিত ও পুরাতন দুইটি নগরের নামকরণ-ব্যাপারে কলিঙ্গ ও গুজরাট এই দুইটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জনপদের নাম কেন ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা কৌতূহলপূর্ণ অনুমানের ব্যাপার। কলিঙ্গ যাহা হউক প্রতিবেশী প্রদেশ—মেদিনীপুর হইতে উড়িষ্যার ব্যবধান তখনকার দিনের পক্ষেও খুবই সামান্য। কিন্তু ভারতের সুদূর পশ্চিমপ্রান্তস্থিত সমুদ্রতরঙ্গবিধৌত গুজরাট দেশ কেন যে বাঙ্গালী কবির কল্পনাকে অধিকার করিয়াছিল তাহার কারণ ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। ষোড়শ শতকে ঐতিহাসিক সংঘটনের দিক্ দিয়া না হইলেও হয়ত কোন ধর্মগত আন্দোলনের সূত্র ধরিয়া গুজরাট বাংলার মনোরাজ্যের অতি সন্নিহিত হইয়া থাকিবে। তবে উভয় কবিই কলিঙ্গ-গুজরাটের দূরত্ব কমাইয়া উভয় দেশকে প্রতিবেশী রাজ্যে পরিণত করিয়াছেন।

। নূতন শহরে প্রজা বসাইবার জন্য আকিঞ্চন, আগন্তুক জনসংঘকে বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থা, নানাজাতির আগমন ও বৃত্তিবৈচিত্র্য ও মণ্ডল বা দেশমুখের পদগৌরব লইয়া ঈর্ষা-প্রতিযোগিতা—উভয় কবিই সরস বাস্তববোধের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।) মাধবে দেখি যে, চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া গ্রামপ্রধান বুলন মণ্ডল কলিঙ্গ হইতে সমস্ত প্রজা উঠাইয়া আনিয়া গুজরাটে বসতি স্থাপন করিল। কিন্তু মুকুন্দরামের গ্রন্থে এই migration বা দেশত্যাগের ব্যাপারটি এত সহজে সম্পন্ন হয় নাই। তখনকার যুগে ধর্মবিশ্বাসের বোধ হয় খানিকটা শিথিলতা আসিয়া থাকিবে, কেন-না, দেবীর স্বপ্নাদেশকে মণ্ডল নিছক স্বপ্ন বলিয়াই উড়াইয়া দিল। দেবীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অতিবর্ষণের ফলে জলপ্লাবন ঘটাইয়া কলিঙ্গদেশের প্রজাকে দেশত্যাগে বাধ্য করিতে হইল। কিন্তু তথাপি দৈব অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণই দেশত্যাগের প্রবলতর প্রেরণা যোগাইল। কলিঙ্গরাজ যে এই দুর্দৈবপ্রপীড়িত প্রজাবৃন্দের খাজনা মাপ করিবেন না এবং কালকেতুর নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যে যে তিন বৎসর রাজস্ব দিতে হইবে না দেবমহিমার সহিত সম্পূর্ণরূপে অসংশ্লিষ্ট এই হিসাবী মনোবৃত্তিই তাহাদের

শেষ সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হইয়াছে। মুকুন্দরামের কাব্য মনোযোগ দিয়া পড়িলে বোঝা যায় যে, সমসাময়িক সমাজের বাস্তব প্রেরণাই কেমন করিয়া দৈবপ্রভাবের সার্বভৌম প্রসারের মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে। সমুদ্রের নির্দেশে কলিঙ্গদেশকে ভাসাইবার জন্য সমস্ত নদনদীর উল্লসিত দ্রুতধাবন কবির বর্ণনার মধ্যেও সরস গতিবেগের সঞ্চার করিয়াছে। এই সর্বভারতীয় নদীসংঘের অধিবেশনের পরিকল্পনাটি মুকুন্দরামের নিজস্ব। সুদূর ইংলণ্ডের সমসাময়িক কবি স্পেন্সার তাঁহার *Faery Queene* কাব্যে টেম্‌স্ ও মেডওয়ের বিবাহ উপলক্ষে ইংলণ্ডের সমস্ত নদনদীকে বিবাহবাসরে আমন্ত্রণ করিয়াছেন ও বিপুল বিচিত্রনামা জলরাশির কল্লোলিত শোভাযাত্রা-সমারোহের একটি মনোজ্ঞ, কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছেন। ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, পৃথিবীর অপর প্রান্তে অবস্থিত বঙ্গীয় কবির মনেও ঠিক সেই সময়ে অনুরূপ কল্পনার উদয় হইয়াছে। পার্থক্য এই যে, স্পেন্সারের নদনদীবৃন্দ বিবাহের আমন্ত্রিত অতিথিরূপে সভ্য-ভব্য-বেশে ও শালীন গতিচ্ছন্দে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছে। মুকুন্দরামের স্রোতস্বতীসমূহ প্রলয়কালীন উচ্ছৃঙ্খলতা ও ধ্বংসাত্মক গতিবেগ লইয়া এই সংহারযজ্ঞে অবতীর্ণ হইয়াছে। মনে হয় যে, মুকুন্দরামের নদীগুলি যেন মনসামঙ্গলের সর্পগোষ্ঠীরই এক প্রাকৃতিক সংস্করণ—তাহাদের সর্পিল গতি ও হিংস্র উদ্দেশ্য মনসামঙ্গলের ক্রূর জিঘাংসা দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি ও ব্যবসায়বৃত্তির প্রতিনিধি এই নূতন শহরে বাস করিতে আসিল, তাহাদের মাধ্যমে ষোড়শ শতকের বাঙালী-সমাজবিন্যাসের একটা অতি তথ্যসমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক ছবি পাওয়া যায়। এই বিবৃতি মাধবের গ্রন্থে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত, মুকুন্দরামে আরও বিস্তৃত ও রসাল। ব্রাহ্মণের যে সমস্ত গোত্র ও গাঁই উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই এখন বৃহত্তর কয়েকটি সুপরিচিত গোষ্ঠীতে সংহত হইয়াছে। অন্যান্য জাতির মধ্যে কায়স্থের উল্লেখ কবির বিশেষ ঔৎসুক্যের পরিচয় বহন করে—সম্ভবত কায়স্থ-কুলতিলক ভাঁড়ু দত্তের মহিমারশ্মি সমস্ত জাতির উপরই বিচ্ছুরিত হইয়াছে। কায়স্থের কৌলীন্যগর্ব ও নেতৃত্বস্পৃহা যেন ব্রাহ্মণকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। মসীজীবি-সম্প্রদায়ের স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ততা প্রথম কায়স্থের মধ্যেই স্ফূর্ত হইয়াছে। হিন্দুসমাজের বহুবিভক্ত সাম্প্রদায়িক সংস্থিতি ও তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সরস বর্ণনা এক সমৃদ্ধ, প্রাণবেগচঞ্চল, দৃঢ়সংহত সত্তার ধারণা জন্মায়। বর্ণনা পড়িয়া

মনে হয় যে, ষোড়শ শতকের শেষপাদ যেন হিন্দুসমাজের একটি স্বর্ণযুগ—ভেদের দুর্বলতা নাই, কিন্তু বৈচিত্র্যের বহুমুখী কর্মোদ্যম ও সংহত সমবায়শক্তি আছে।

এই সমাজবিন্যাসের সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক স্তর হইতেছে নবাগত মুসলমান-সমাজ-সম্বন্ধীয়। তিনশত বৎসরের একত্রাবস্থানের ফলে মুসলমান জাতি যে বাঙালী সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছে ও তাহাদের মধ্যেও যে ধর্মগত ঐক্যের মধ্যে বৃত্তিগত নানা বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সরস বর্ণনা আমরা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, মুসলমানের উল্লেখে কোন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বা তিক্ত মনোভাবের চিহ্নমাত্র নাই। সেইজন্য মনে হয় যে, সে যুগে হিন্দুসমাজের উদার পরমতসহিষ্ণুতা ও সুস্থ সংহতিবোধ প্রবল ছিল। মুকুন্দরামের ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতায় ডিহিদার মামুদ শরীফের যে অংশ ছিল, কবি তাহাকে বৈষয়িকতার সীমাতেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন, ইহার মধ্যে কোন বৃহত্তর সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য আরোপ করেন নাই। দ্বিজ মাধব দুইটি সংক্ষিপ্ত ত্রিপদী পংক্তিতে মুসলমান সমাজের ধর্মপরায়ণতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন :—

বৈসয়ে মুসলমান পড়ে কিতাব কোরাণ
নমায়াজ পড়ে পাঁচবার।
সোলেমানী মালা করে খোদার নামে জিগির কাড়ে
সৈদ কাজী বোসিল অপার॥

মুকুন্দরামের বর্ণনা আরও বিস্তৃত ও বাস্তবগুণসমৃদ্ধ। মুসলমানের জীবনযাত্রার যে চিত্র কবি আঁকিয়াছেন তাহা একদিকে যেমন সত্যানুগ, অন্য দিকে তেমনি সহৃদয়। তাহাদের ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে যে গোঁড়ামির সংমিশ্রণ ছিল তাহা তীক্ষ্নদৃষ্টি কবির দৃষ্টি এড়ায় নাই :—

বড়ই দানিশবন্দ না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
যার দেখে খালি মাথা তার সনে নাহি কথা
সারিয়া চেলার মারে বাড়ি॥

হিন্দুর চক্ষে মুসলমানের আচার-ব্যবহারের অপরিচ্ছন্নতার প্রতি কবি কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই—"ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মোছে হাত"। বর্তমানকালেও জীবিকার

জন্য মুসলমানেরা যে নানা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে ও বৃত্তি অনুসারে নানা বিচিত্র আখ্যায় আখ্যায়িত হয় তাহার ভিত্তিপত্তন মুকুন্দরামের যুগেই হইয়া থাকিবে। কালকেতুর রাজত্বে এই দুই প্রতিবেশী সমাজ আপন আপন বৃত্তি ও ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়া পরম সৌহার্দ্যের সহিত বাস করিত, তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। হিন্দুরচিত কাব্যে মুসলমানের এই অপক্ষপাত ও সহৃদয় চিত্রণ বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়।)

(৭)

এইবার চরিত্রচিত্রণের দিক্ দিয়া চণ্ডীমঙ্গলের সার্থকতম সৃষ্টি ভাঁড়ু দত্তের বিষয় আলোচনা করিলেই ভূমিকাটি সম্পূর্ণ হইবে। মাধব ও মুকুন্দের ভাঁড়ুবিষয়ক আখ্যান অনেকটা পরস্পরের পরিপূরক। মাধব বলেন যে, ইদিলপুর হইতে যে শঠপ্রকৃতি ষোল শত প্রজা আসে, ভাঁড়ু তাহাদের অন্যতম ও সে বিনা খাজানায় নগরে সাতখানা বাড়ি তৈয়ার ও অধিকার করে; কিন্তু ভবিষ্যতে যখন কর নির্দিষ্ট হইবে তখন সে খাজানা কেমন করিয়া দিবে কালকেতুর এই সতর্কবাণী উচ্চারণের ফলে সে ছয়খানি বাড়ী ছাড়িয়া দেয়। বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সহিত ভাঁড়ুর ঠকাম ও নানা মিথ্যা অজুহাত ও ভীতিপ্রদর্শনে তাহাদের নিকট ভোজ্যদ্রব্যাদি আদায়ের কাহিনী মাধব সবিস্তারে ও সরসভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে ভাঁড়ুর ভয়ে কালকেতুর নিকট কোন প্রবঞ্চিত ব্যবসায়ী নালিশ করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু তৎপরদিন সভায় বুলন মণ্ডলকে গ্রাম্যপ্রধানের পুষ্পচন্দন দেওয়াতে ঈর্ষাবশে ভাঁড়ু কালকেতুকে কটূক্তি করায় তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। কালকেতুর বন্ধনমুক্তির পরে ভাঁড়ুর সহিত মহাবীরের অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হওয়ায় কালকেতুর হুকুমে তাহার মাথা মুড়াইয়া ও তাহার গালে চুণকালি দিয়া তাহাকে নগর হইতে বাহির করা হইল ও মুণ্ডিতমস্তক ভাঁড়ু নিজ লজ্জা ঢাকিবার জন্য সে যে গঙ্গাসাগরে মাথা মুড়াইয়াছে ইহাই প্রচার করিতে লাগিল। মাধব এইখানেই ভাঁড়ু-উপাখ্যানের উপর যবনিকাপাত করিয়াছেন।

মুকুন্দরামের বর্ণনাভঙ্গী আরও সরস ও ব্যঙ্গের তির্যক্ ব্যঞ্জনা আরও তীক্ষ্ণ ও সাহিত্যিকগুণসমৃদ্ধ। ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর নিকট আসিয়াছে কোন দলে

মিশিয়া নয়, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদের দৈন্যের অন্তরালে আত্মশ্রেষ্ঠতাবোধের একক স্বাতন্ত্র্যে। সে আসিয়াই উচ্চকণ্ঠে নিজ কুলগরিমা ঘোষণা করিয়া মণ্ডলপদের ও সকল রকমের সুখ-সুবিধা-প্রাপ্তির জন্য নিঃসংকোচে দাবী জানাইয়াছে। কূটকৌশলী জমিদার-কর্মচারীর ন্যায় প্রজার নিকট কি প্রকারে পাওনাগণ্ডা আদায় করিতে হইবে সে সম্বন্ধে সে কালকেতুকে অযাচিত সদুপদেশ দিয়াছে। যে বুলন মণ্ডলকে কালকেতু প্রধানের মর্যাদা দিয়াছে সে যে ভাঁড়ুর তুলনায় অতি তুচ্ছ তাহাও বলিয়াছে। অযোগ্য পাত্রে আস্থাস্থাপনের কুফল যে কি তাহা কবি ভাঁড়ুর মুখ দিয়া তীক্ষ্ণাগ্র, অবিস্মরণীয় প্রবাদবাক্যের মধ্যে অভিব্যক্ত করিয়াছেন :—

"নফরের হাতে খাণ্ডা বহুড়ীর হাতে ভাণ্ডা
পরিণামে দেয় অতি দুখ।"

মুকুন্দরামে ভাঁড়ু দত্তের হাটুরিয়াদের নিকট তোলা দাবী ও তাহাদের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী দ্বিজ মাধবের মত এত তথ্যবহুল ও উদ্ভাবনীশক্তির পরিচায়ক নহে। তাহার আচরণ সোজাসুজি লুটতরাজ ও জোরজবরদস্তি—ইহার মধ্যে কোন সূক্ষ্মতর উপায়নৈপুণ্যের নিদর্শন মিলে না। তাহার পুত্র-কন্যাও এই অত্যাচারের অংশ গ্রহণ করিয়াছে—পুত্রের জ্বালায় ঝি-বৌ-এর বাড়ির বাহির হওয়া দায় ও কন্যার কোন্দলপটুতা ও দাম না দিয়া হাঁড়ি ও মাছ আদায় করার অভ্যাস সমস্ত পরিবারটিকে এক সাধারণ হীনতায় চিহ্নিত করিয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া মহাবীরের সহিত তাহার বচসা ও মহাবীর-কর্তৃক তাহার মণ্ডলপদচ্যুতি—'প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল।' মুকুন্দরামের কাব্যে ভাঁড়ু কলিঙ্গরাজের সৈন্যদলে থাকিয়া কোটালকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছে ও কোটাল যখন রণে ভঙ্গ দিতে উদ্যত তখন তাহাকে ভয় দেখাইয়া পুনরায় যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য করিয়াছে। ভাঁড়ুর এই বৈরনির্যাতন-স্পৃহা এক চমৎকার রণনীতির ন্যায় ফলপ্রসূ হইয়াছে। পরাজিত শত্রুর পুনরাক্রমণে কালকেতু এক অজ্ঞাত বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া ফুল্লরার পরামর্শে ধান্যঘরে লুকাইয়াছে। সে বনে বাঘভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে ও অপরিমিত শক্তির অধিকারী; কিন্তু সত্যিকার ক্ষাত্র সংস্কার ও বীরত্বাভিমান তাহার নাই। কাজেই ক্ষত্রধর্মবিগর্হিত এই পলায়নে তাহার চিত্তে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়

নাই। মুকুন্দরাম তাহার বীরত্বের আদর্শচ্যুতি দেখাইয়া তাহার চরিত্রের বাস্তবানুগামিতা চমৎকারভাবে রক্ষা করিয়াছেন। যাহা হউক, এখানেও ভাঁড়ু দত্তের ধূর্ততা কালকেতুর আত্মগোপনস্থলের রহস্য ভেদ করিয়াছে। ধরা পড়িয়া কালকেতু আবার অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়াছে ও শেষ পর্যন্ত চণ্ডীর ইচ্ছায় সে বন্দী হইয়াছে। তাহার বন্ধনমোচনের ও রাজ্যে পুনরধিষ্ঠানের পর নির্লজ্জ ভাঁড়ু নিজেই রাজসভায় উপনীত হইয়াছে ও অপরিসীম ধৃষ্টতার সহিত তাহার সমস্ত আচরণই যে কালকেতুর কল্যাণের জন্য তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। দ্বিজ মাধবে ভাঁড়ুর সহিত অতর্কিত সাক্ষাৎ; মুকুন্দরামে সে গায়ে-পড়া হইয়া আসিয়া আবার কালকেতুর বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহার লাঞ্ছনাশাস্তি ও প্রত্যাখানের কাহিনী উভয় কবিতেই একরূপ; তবে মুকুন্দের ক্ষমাশীলতা একটু বেশি, তিনি আবার ভাঁড়ু দত্তকে নগরে বাস করাইয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলের ভাঁড়ু দত্তের মত এরূপ জীবন্ত চরিত্র মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যে আর কোথাও মিলে না। ইহার জন্য দায়ী কতকটা সে যুগের নবোন্মেষিত বাস্তবসচেতনতা, কিন্তু প্রধানত কবির সৃষ্টিপ্রতিভা। দ্বিজ মাধবেও ভাঁড়ু যথেষ্ট সজীব; কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে সে আরও গভীরভাবে পরিকল্পিত ও নিগূঢ় প্রাণরসে অধিকতর সঞ্জীবিত। ভাঁড়ু দত্তের পিতৃদত্ত নাম কি ছিল তাহা অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে; তাহার চরিত্রদ্যোতক সংজ্ঞাটিই তাহার আসল নামকে চিরকালের মত আবৃত করিয়া যুগযুগান্তরে তাহার পরিচয় ঘোষণা করিতেছে।

(৮)

মধ্যযুগের কাব্যে যুদ্ধবর্ণনা এক গতানুগতিক রীতির অনুবর্তন করিয়াছে। এই রীতি মূলত পৌরাণিক মহাকাব্যের আদর্শানুযায়ী। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতে যে অতিরঞ্জনপ্রবণতা ও অতিপ্রাকৃত ঘটনাসংস্থান যুদ্ধ-বর্ণনার প্রধান অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সমস্ত পরবর্তী সাহিত্য সেই প্রথারই জের টানিয়া চলিয়াছে। যেমন পুরাণে তেমনি পরবর্তী মঙ্গলকাব্যে মানবশক্তির ভিতর দিয়া প্রধানত দৈব শক্তিরই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে—কাজেই অলৌকিকত্বের অতিপ্রাধান্যই ইহাদের সাধারণ লক্ষণ। তবে মঙ্গলকাব্যের যুগে আরও সম্পূর্ণভাবে অতিপ্রাকৃতের অধীন নহে, ইহার স্বতন্ত্র স্ফুরণেরও কিছু

কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ছন্দ-ও শব্দ-নির্বাচনের মধ্য দিয়া যুদ্ধের ভয়াবহতা ও তুমুল বিপর্যয়ের কিছুটা আভাস দিবার চেষ্টা দেখা যায়। কৃত্তিবাস-কাশীদাস অবলীলাক্রমে সুদীর্ঘগ্রথিত পয়ার-পরম্পরার ভিতর দিয়া রণক্ষেত্রের স্বচ্ছন্দ প্রবহমান, একটানা ঘটনাধারার বর্ণনা দেন—তাহার মধ্যে কোথাও বিশেষ উত্তেজনা, সংগ্রামতরঙ্গের জোয়ারভাটার রূপান্তর ও ভাগ্যবিপর্যয়ের অভাবনীয়তার ছন্দোবৈলক্ষণ্য প্রতিবিম্বিত হয় নাই। শ্রাবণমেঘের ধারাপাতের ন্যায় শর-বর্ষণের অবিচ্ছিন্নতা যুধ্যমান সৈন্যের যেমন চিরনিদ্রার ব্যবস্থা করে, তেমনি পাঠকেরও চিত্তে একটা অসাড় নিদ্রালুতার সঞ্চার করে। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্নাবেশ হইতে জাগিয়া উঠিয়া চোখ মুছিয়া ভক্তিরসাত্মক হৃদয়োচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তিগুলির প্রতি আমাদের সচেতন চিত্তবৃত্তিকে নিয়োজিত করি। মঙ্গলকাব্যে লেখক বাস্তবতার দাবী একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। সৈন্যসমাবেশে, যুদ্ধের গতিচ্ছন্দে, সংঘর্ষের বাস্তব অভিঘাতে, হাতী-ঘোড়া-পাইক-মাহুত-রণবাদ্য-আত্মশ্লাঘা-আস্ফালন প্রভৃতি যুদ্ধসজ্জার যান্ত্রিক ও মানসিক উপকরণবাহুল্যে মঙ্গলকাব্যের লেখক নিজ উত্তেজিত কল্পনা ও বাস্তবানুভূতিব কতকটা পরিচয় দেন। তবে সমস্তটা মিলিয়া একটা অস্পষ্ট কোলাহল, একটা দ্রুতসঞ্চারী দৃশ্য-পরিবর্তনের আবছা প্রতিচ্ছবি, সৈন্য-পদোত্থিত ধূলিজালে সমাবৃত দিগন্তের ন্যায় আমাদের অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে।

ইহার মধ্যে কতকটা local colouring বা মৃৎ-বৈশিষ্ট্যপ্রবর্তনের চেষ্টা দেখা যায়। যুদ্ধ যে বাঙলা দেশে ও বাঙালী সৈন্যের মারফত হইতেছে লেখক সে সম্বন্ধে সচেতন আছেন। বাঙ্গাল পাইক, ব্রাহ্মণ পাইক, ডোম পাইক, এমন কি মুসলমান পাইকও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছে ও যুদ্ধে পরাজয়ের পর আপন আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে কাতরোক্তি করিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিতেছে। এমন কি, বেগার পাইক তাহাদিগকে যে বলপূর্বক যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করা হইয়াছে এই অজুহাতে বিজেতার অনুগ্রহ-যাচ্ঞা করিতেছে। মোটের উপর এই জাতীয় যুদ্ধবর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যেন কবিও মালসাট মারিয়া এই মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার ভাঙ্গা-চোরা অসম দৈর্ঘ্যের ছন্দ, মাঝে মাঝে ছন্দোযোজনায় শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, উদ্ভট শব্দ-সমাবেশপ্রবণতা, হাঁক-ডাক-লম্ফ-ঝম্পের দ্বারা বীররসসৃষ্টির হাস্যকর প্রয়াস—সবই কবির মল্লবেশের বহির্লক্ষণরূপে প্রতিভাত হয়। কবি সেনাপতির মত

নিয়ন্ত্রণ না করিয়া একেবারে সৈনিকের মত ধূলাকাদা মাখিয়া যুদ্ধের প্রতি তাঁহার শিশুক্রীড়ামূলক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই ব্যাপারে দ্বিজ মাধব মুকুন্দরামের সহিত তুলনায় অধিকতর বাস্তবপ্রবণতা দেখাইয়াছেন—তাঁহার চণ্ডী গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলদৈত্যকে বিনাশ করিয়া তাঁহার রণপিপাসার নিবৃত্তি করিয়াছেন, কাজেই কলিঙ্গ-কালকেতুর যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন নাই। মুকুন্দরামের চণ্ডী কিন্তু ডাকিনীযোগিনী সঙ্গে লইয়া সশরীরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও তাঁহার অতিমানবিক শক্তির প্রয়োগে কালকেতুকে বিপক্ষের অস্ত্রক্ষেপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আরও একটা বিষয়ে মাধবের বাস্তবতা প্রকটিত হইয়াছে—কালকেতু যুদ্ধজয়েব পর নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রু-সৈন্যের নিকট অতর্কিতভাবে বন্দী হইয়াছে—সে মুকুন্দরামের কালুর মত স্ত্রীর পরামর্শমতে ধান্যঘরে লুকাইয়া নিজ বীর-নামে অনপনেয় কলঙ্ক লেপন করে নাই।

(৯)

মহাকবির প্রকৃত পরিচয় তাঁহার প্রকাশের ঋজুতা, যাথার্থ্য ও চমৎকারিত্বে। মুকুন্দরাম রোমাণ্টিক কবি ছিলেন না, জীবনের সূক্ষ্ম, অপ্রত্যক্ষ ভাবব্যঞ্জনা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবের কবি এবং এক সুপ্রতিষ্ঠিত ধারার বাহন। কাজেই বৈষ্ণব কবির অতীন্দ্রিয়, ভাববিভোর কল্পনা তাঁহার মধ্যে প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও সুপরিচিত ভাবসমূহের অভিব্যক্তিতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মঙ্গলকাব্যের কবির শিল্পবোধ সাধারণত শিথিল ও অপরিণত, বিষয়মহিমা তাঁহার চিত্তকে এমনভাবে অভিভূত করিয়াছে যে প্রকাশে অনবদ্য মনোহারিতা তাঁহার নিকট গৌণ। তিনি গতানুগতিকতার প্রবহমান ধারায় গা ভাসাইয়া দিয়া কোনমতে সমাপ্তির তীরে উঠিতে পারিলেই কৃতার্থ; জলমধ্যে দেহসঞ্চালনের ছন্দোময় লীলাভঙ্গি বা সন্তরণকৌশল তাঁহার সচেতন উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই শিথিল, ঢিলেঢালা, হাই-তোলা, আড়ি-মোড়া কাব্যাদর্শের মধ্যে মুকুন্দরামই প্রথম এক সদাজাগ্রত শিল্পবোধ ও চারুত্বসৃষ্টির প্রবর্তন করিলেন। এমন কি দেববন্দনার মধ্যেও দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক বিশেষণ-নির্বাচনেও তাঁহার পরিমিতিজ্ঞান ও প্রয়োগ-সার্থকতার নিদর্শন মিলে। অতিপল্লবিত, অহেতুক বিস্তারের স্থলে অর্থঘন সংক্ষিপ্তি, অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ ও ভক্তিবিহ্বলতার অস্বচ্ছতার স্থলে মিতভাষিতা

ও তীক্ষ্ণ ভাস্বরতা, নির্বিচার প্রথানুবর্তনের স্থলে বাস্তবস্বীকৃতির প্রখর মৌলিকতা, অর্ধ যান্ত্রিক পূর্বরোমন্থনের স্থলে নূতন অনুভূতির দীপ্ত ঝলক—এই সমস্তই তাঁহার রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য। তাঁহার রচনার উপর এক সচেতন, সমগ্র-প্রসারিত মননশক্তির পরিচয় দেদীপ্যমান। তাঁহার শিল্পবোধমার্জিত, জীবনবাদ-সম্ভূত রসিকতা তাঁহার পূর্ববর্তীদের গ্রাম্য ভাঁড়ামো হইতে স্বতন্ত্রজাতীয়। তাঁহার কৌতুকরস কেবল কথায় সীমাবদ্ধ নহে, তাঁহার বঙ্কিম কটাক্ষ, অর্থগূঢ় মন্তব্য ও সমগ্র মনোভাব ও জীবনদর্শনের নানামুখী বিস্তার হইতে ইহা তির্যক রেখায় ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে। বারমাস্যার দুঃখবর্ণনাতেও তিনি চোখ হইতে প্রথাবদ্ধতার ঠুলি সরাইয়া ব্যাধজীবনের নানা বাস্তব দুর্ভোগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনাকে কাব্যবেষ্টনী হইতে উদ্ধার করিয়া প্রত্যক্ষ জীবনের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রে যে ছন্দঃকুশলতা ও মার্জিত ভাষণ-নৈপুণ্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে, তাহার প্রথম সূচনা মুকুন্দরামে; তফাৎ এই যে মুকুন্দরামের সরস কৌতুক ও সরল গ্রাম্যজীবনের স্বাভাবিকতা ভারতচন্দ্রে রাজসভার কৃত্রিম আবহাওয়ায় শ্লেষপ্রধান, আক্রমণশীল মনোভাবে পরিণত হইয়াছে। মুকুন্দরামের স্নিগ্ধ পরিহাস নিউগি-চৌধুরী-প্রমুখ অত্যাচারী মধ্য-স্বত্বভোগীদের, এমন কি বিশ্বজননী চণ্ডীকেও মৃদুভাবে স্পর্শ করিয়াছে; তাহাতে কোন জ্বালা বা দাহ নাই। ভারতচন্দ্রের কামকলাচাতুরীর ওস্তাদী বর্ণনা, তাঁহার নাগরালী অভিজ্ঞতা-প্রকাশের বাগ্‌ভঙ্গীর বৈদগ্ধ্য মুকুন্দরামের স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুক-রসকে নূতনভাবে ভিয়ান করিয়া উহাকে ঘন ও গুরুপাক করিয়া তুলিয়াছে। এক চৌতিশা স্তবেই মুকুন্দরামের সদাসক্রিয় বাস্তবতাবোধ কাব্যপ্রথার অভিভবে আত্মস্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে।

দুঃখের বিষয় মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যে বঙ্গ-সাহিত্যে যে নূতন বাস্তবতাধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, পরবর্তীদের রচনায় তাহাতে আবার চড়া পড়িয়াছে। চণ্ডী কালিকাও অন্নদায় রূপান্তরিত হইয়া বিদ্যাসুন্দরের কুরুচিপূর্ণ কেলিবিলাসের প্রশ্রয়দাত্রী ও সমর্থনকারিণীরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণ জীবনযাত্রার বহুবিসর্পিত বিস্তার সংকুচিত হইয়া রাজসভার কৃত্রিম আদবকায়দা-ঘেরা সংকীর্ণ গণ্ডিতে, তন্ত্রসাধনার ছদ্মবেশধারী স্থূল ভোগাসক্তির প্রমোদকক্ষে আত্মসংহরণ করিয়াছে। প্রথার প্রস্তরশৈল ভেদ করিয়া বাস্তবতার যে প্রবাহ নির্গত হইয়াছিল, নূতন প্রথার চড়ায় প্রতিহত

হইয়া আবার তাহা স্রোতোবেগ হারাইয়া ফেলিয়াছে। এমন কি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সহিত পরিচয়ও আমাদের বাস্তববোধ অপেক্ষা আমাদের আদর্শবাদ-প্রবণতাকেই অধিকতর উদ্দীপ্ত করিয়াছে। কিন্তু মুকুন্দরাম বঙ্গসাহিত্যে এই বাস্তবতার ক্ষণস্থায়ী স্বচ্ছন্দলীলার চিরন্তন প্রতিনিধিরূপে বিরাজ করিতে থাকিবেন।

রামপ্রসাদ

(১)

বর্ষচক্রের আবর্তনে আবার রামপ্রসাদের স্মৃতি-বার্ষিকী উদ্‌যাপনের দিন ফিরিয়া আসিয়াছে এবং আমরা আবার তাঁহার সাধনা-পূত জীবন ও কাব্যের পর্যালোচনা করিবার অবসর পাইয়া ধন্য হইয়াছি। এইমাত্র যে রামপ্রসাদী সঙ্গীতের দ্বারা সভার উদ্বোধন সম্পন্ন হইল, তাহা আমরা রামপ্রসাদের যুগ হইতে কতদূরে সরিয়া আসিয়াছি সেই সত্য আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কালের দিক দিয়া তাঁহার সঙ্গে আমাদের ব্যবধান প্রায় দুইশত বৎসর। যখন পলাশীর যুদ্ধে কামান-গর্জন বজ্রকণ্ঠে আমাদের রাজনৈতিক ভাগ্য-বিপর্যয় ঘোষণা করিতেছিল, তখন সেই রূঢ় কোলাহলের মধ্যেও রামপ্রসাদের প্রাণ-মাতান স্বর্গীয় সঙ্গীত সাধকের কণ্ঠোত্থিত হইয়া বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস প্লাবিত করিতেছিল। কিন্তু মনোবৃত্তির দিক্ দিয়া বিচার করিলে আমরা যেন রামপ্রসাদকে বহু শতাব্দী পিছন ফেলিয়া আসিয়াছি এইরূপ ধারণা জন্মে। তাঁহার গান আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে কোন এক বহুদিন-লুপ্ত অতীতের স্মৃতিতে বিভোর করিয়া তোলে, আমাদিগকে বর্তমান জীবনের সহিত প্রায় সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক এক অপরিচিত ভাব-রাজ্যে ক্ষণিকের জন্য লইয়া যায়। যে সাধনা-বলে রামপ্রসাদ আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও পরাধীনতার গ্লানিকে উপেক্ষা করিয়া শান্ত-সংযত, আদর্শনিষ্ঠ জীবন যাপনের প্রেরণা দিয়াছিলেন, বর্তমান বাঙালীর জীবনযাত্রা হইতে তাহার প্রভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। বাঙলার সুদূর পল্লীতে রামপ্রসাদী সঙ্গীত আজ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—বিরল ব্যতিক্রমক্ষেত্রে যদি বা এই গান শোনা যায়, তথাপি ইহার

প্রাণশক্তি যেন নিঃশেষিত হইয়াছে এইরূপ মনে হয়। এ যেন প্রাণবেগচঞ্চল, আত্মবিশ্বাসে দৃপ্ত বলিষ্ঠ প্রেরণা বহন করে না; বাস্তব জীবনের লাঞ্ছনা-দুর্গতির উপর আত্মপ্রতিষ্ঠার গৌরব ইহার মধ্যে লুপ্ত। ইহাকে যেন ভক্তির সমাধি'পরে উদাসিনী স্মৃতির দীর্ঘশ্বাসের মত করুণ ও অসহায় শোনায়।

রামপ্রসাদের গান যদি কেবল কাব্য হইত, তাহা হইলে কাব্যোৎকর্ষের জন্যই ইহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিত। কিন্তু ইহা কেবল, এমন কি মুখ্যতঃও কাব্য নহে। ইহার পিছনে বাঙ্গালা দেশের সুদীর্ঘ ধর্মসাধনার ইতিহাস আছে। এই সাধনা ও সাধনাপ্রসূত মনোবৃত্তির সহিত সম্বন্ধ শিথিল হইলে গানগুলির কাব্য-রসাস্বাদনের শক্তিও সেই পরিমাণে কমে। যে যুগে বাঙলা দেশ তন্ত্রসাধনায় নিবিষ্ট ছিল, মাতৃমূর্তির অনুধ্যান ও তাঁহার শরণ-ভিক্ষা যখন ইহার একান্ত আকৃতি ছিল, সেই ভক্তিরসোচ্ছল প্রতিবেশেই রামপ্রসাদের গানের উদ্ভব। এক হিসাবে রামপ্রসাদ প্রচলিত তন্ত্র-উপাসনাপদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর উঠাইয়াছিলেন, ইহার জটিল, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম অনুভূতির অনুশীলনের সুস্পষ্ট নির্দেশ তিনি দিয়াছেন। লৌকিক আচার-ব্যবহারের সহিত তুলনায় অন্তরের অকৃত্রিম, অনুষ্ঠানবর্জিত ভক্তি-সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব তিনি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, আড়ম্বরপূর্ণ রাজসিক পূজা হইতে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক উপাসনার দিকে তিনি আমাদের চিত্তকে ফিরাইতে চাহিয়াছেন। দীর্ঘযুগব্যাপী মাতৃপূজার পূর্ণপরিণতি, শক্তি-আরাধনার বিশুদ্ধ সারনির্যাস রামপ্রসাদের গানে অপূর্ব কাব্যোৎকর্ষের সহিত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে; অন্তরের গভীর আকূতি, নিঃসংশয় উপলব্ধি সরল, ভাব-ঘন, আত্মপ্রত্যয়-স্ফুরিত ভাষায় নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। যাঁহারা রাম-প্রসাদ-জননী বঙ্গভূমির অতীত সাধনার কথা ভুলিয়াছেন, তাঁহাদের মনে যে রামপ্রসাদের প্রভাবও ক্ষীণ, তাঁহার সুধাস্রাবী কণ্ঠস্বরও যে সুদূরশ্রুত প্রতিধ্বনির ন্যায় অস্পষ্ট হইয়া আসিবে তাহার আর আশ্চর্য কি?

রামপ্রসাদ-প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলোদ্দীপক সমাজতত্ত্বঘটিত প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়। সমাজ-সংস্থিতির কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য এই বিশেষ যুগে বাঙালীর মন কালীধ্যানের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল? অবশ্য শক্তিপূজার প্রেরণা হিন্দু বহুদিন হইতেই অনুভব করিয়া আসিতেছিল—মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সূক্ষ্ম, দার্শনিক ভাবাবহের মধ্যে বিশ্ববিধানের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিতা, মাতৃরূপে পরিকল্পিতা,

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপিণী এই চিৎশক্তির লীলা প্রকটিত হইয়াছে। নিছক সংহারাত্মিকা শক্তির সহিত হিন্দুধর্মের পরিচয়ও সুপ্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ —মঙ্গলকাব্যের নূতন দেবীসংঘের পূজা মূলতঃ তাহাদের সংহারাত্মক প্রকৃতির ভয়-ভক্তিমিশ্র স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেখানে ঐশ্বর্যশালিনী, সর্ববিধ সুখসম্পদপ্রদায়িনী, সিদ্ধিদাত্রী দুর্গা মাতৃরূপে বাঙ্গালীর হৃদয়ে আসীনা, সেখানে এই শ্মশানচারিণী, রক্তাপ্লুতদেহা, রিক্ত সর্বনাশের প্রতীক, বিভীষিকারূপিণী কালীমূর্তি ধূমকেতুরূপে তাহার চিত্তাকাশে উদিত হইয়াছিল কেন এই প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজন।

হয়ত বৈষ্ণবসাধনার অবিমিশ্র মাধুর্যের প্রতিক্রিয়াস্বরূপই জীবনের ভয়াবহ, বীভৎসরসপ্রধান দিকটা বাঙ্গালীর অনুভূতিতে প্রথম ধরা পড়িয়াছিল। জীবনের সবটাই যে বৃন্দাবনলীলা নহে, সেখানে যে সব সময়ই বাঁশী বাজে না, প্রেমের মধুর লীলা অভিনীত হয় না, হৃদয়ের কোমলতম বৃত্তিসমূহেরই একাধিপত্য চলে না, যমুনা-প্রবাহের মধুর সঙ্গীত, কেলিকুঞ্জের কান্ত সৌন্দর্য স্বপ্নমাধুরী রচনা করে না—এই সত্য কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতার চাপেই তাহার মনে স্ফুরিত হইয়াছিল। অমাবস্যা-নিশীথে, অস্থিকঙ্কালসার -রচিত মৃত্যুর বীভৎস প্রতিরূপ ও শ্মশানের প্রেত-বিভীষিকার পরিবেষ্টনে যে আর এক প্রকারের কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া জীবনের পরমাসিদ্ধি করায়ত্ত হইতে পারে এই আবিষ্কারই কালী-উপাসনার প্রধান প্রেরণা। আর একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই দুই সাধনার মধ্যে কোন পরস্পর-বিরোধী বৈপরীত্য নাই। বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের মহাশ্মশানে, প্রেমের পরিণতি জিঘাংসা-প্রণোদিত যুগাবসানকারী রক্তপ্লাবনে। এই উভয় লীলার নায়ক একই ব্যক্তি—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। যিনি কৈশোর লীলায় প্রেমের বাঁশী বাজাইয়া নিখিলচিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনি কুরুক্ষেত্র ধ্বংসলীলার আপাত-নিষ্ক্রিয় দর্শক ও প্রভাসের আত্মঘাতী, মূঢ় হত্যাতাণ্ডবের শ্রেষ্ঠ বলি। কাজেই জীবনের এই নির্মম, শ্বাপদধর্মী, হিংসাগহন দিকটাকে ধর্মসাধনার অঙ্গীভূত করার মরণশীলতার চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া তাহার কেন্দ্রস্থলে গোপন-রক্ষিত সুধারস আহরণ করার একটা প্রয়োজন আছে।

বৈষ্ণব সাধনার প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ—জীবনের সহজ বৃত্তিগুলিকে ভগবদভিমুখী করিয়া দিলেই, লৌকিক জীবনের সুখগুলিকে কৃষ্ণার্পিত করিলেই

স্বতঃউৎসারিত আনন্দের প্রবাহ বাহিয়াই সিদ্ধি ভাসিয়া আসিয়া অনুভূতিলগ্ন হইবে। কোন প্রবৃত্তির উৎসাদনের, কোন বুভুক্ষার অবদমনের প্রয়োজন নাই—তাহাদের মুখ ফিরাইয়া দিলেই চলিবে। তন্ত্রসাধনায় মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উপর এতটা আস্থা নাই; দুরূহ, ক্লেশকর তপশ্চর্যার ভিতর দিয়া, কণ্টকাকীর্ণ পথে রক্তাক্তচরণে অগ্রসর হইয়া সিদ্ধির শিখরদেশে পৌঁছিতে হইবে। হিন্দুধর্ম এই তন্ত্রনির্দিষ্ট উপাসনার মধ্য দিয়া জীবনের সমস্ত রহস্যাবৃত জটিলতা, বাস্তবের সমস্ত বীভৎস ভয়াবহতা, সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে প্রবাহিত সংহারলীলার পূর্ণ নিদারুণতা স্বীকার করিয়া লইয়া ইহারই প্রতিকারে ব্রতী হইয়াছে। রামপ্রসাদের ভাব-প্রবাহের সরল একটানা স্রোতে অনেক বাধা-বিঘ্নের মগ্নশৈল, অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘূর্ণাবর্ত লুকাইয়া আছে; তাঁহার সঙ্গীতের সুমিষ্ট স্বাদুতার মধ্যে জটিল দার্শনিক তত্ত্বের পাক-দেওয়া রস উপাদানরূপে ব্যবহৃত। তাঁহার নিঃসঙ্গ নির্ভরশীলতার নির্মল, রৌদ্রদীপ্ত আকাশে আগন্তুক ও অতিক্রান্ত বিপদের পক্ষচ্ছায়া মাঝে মধ্যে প্রতিভাসিত হয়।

(২)

প্রাকৃতিক জগতে জ্যোৎস্না ও অন্ধকারের ন্যায় মানবের অন্তর্জগতে মধুর ও ভীষণের প্রতি প্রবণতা পাশাপাশি বা পর্যায়ক্রমে প্রবাহিত। মানুষ ইহাদের মধ্যে কোন্ পথটি অবলম্বন করিবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে জন্মের আকস্মিকতা ও ব্যক্তিগত রুচি ও আদর্শের উপর; কিন্তু ইহাতে যুগপ্রভাবেরও যথেষ্ট অংশ আছে। এক এক যুগে মানব সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া উৎকট বিভীষিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিক প্রতিবেশের বিশেষ রংটি তাহার চিত্তকে অনুরঞ্জিত করিয়া তাহার জীবনদর্শন ও সাধনার প্রকৃতিটি নির্ধারণ করে। বিশৃঙ্খলা ও সঙ্কটের সময় বিশ্ববিধায়িনী শক্তির সংহাররূপিণী মূর্তিটিই তাহার মানস অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে; মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে, বিপর্যয়ের ভূমিকম্পে থরথর কম্পমান ধরিত্রীর উপর দাঁড়াইয়া সর্বনাশিনী শ্যামার ভয়ঙ্কর কালো রূপটিই চারিদিক হইতে চোখে পড়ে। বাঙলা ধর্মসংস্কৃতির ইতিহাসে শ্যামাপূজার প্রাধান্য এক বিপদসঙ্কুল অনিশ্চয়াত্মক অবস্থার পটভূমিকার উপর নির্ভরশীল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙলার রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে বিপ্লবের ঘনকৃষ্ণ মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, কালী-উপাসনা তাহারই

অনিবার্য, চোখধাঁধানো বিদ্যুৎ-বিলাস। শাক্ত-কবির শ্যামার রূপবর্ণনাতে এই বর্ণের বৈপরীত্য, নিকষকালো দেহে রক্তধারার অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য, অসিত পদযুগলে রাঙ্গা জবার আরক্ত আভা, আঁধারের গায়ে উৎকট দীপ্তির তীব্র ব্যঙ্গ কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। রণরঙ্গিণীর রণতাণ্ডবমত্ত নৃত্য, উলঙ্গিনীর সাধারণ ভব্যতা-শালীনতার স্পর্ধিত অস্বীকার, পতি-বক্ষে স্থাপিত-চরণার সহজ দাম্পত্য-রীতির উৎকট উল্লঙ্ঘন ভক্ত-সাধকের মনে যে ভক্তির ভীতি-রোমাঞ্চ জাগাইয়াছে তাহা বর্ণনাভঙ্গীর প্রথাবদ্ধ গতানুগতিকতা, কবিযশঃপ্রার্থীর অনুপ্রাসের আতিশয্য, অপটু হস্তের ভাব-গ্রন্থনশিথিলতা ভেদ করিয়া বর্তমান যুগের পাঠকের চিত্তেও সংক্রামিত হইয়াছে।

এই মূর্তি বিশেষ করিয়া কোন কোন যুগে বাঙ্গালীর কল্পনায় আবর্তিত হইয়াছে কেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। অবশ্য পুরাণে ও তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ মূর্তির পরিকল্পনা আছে; কিন্তু শুধু প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের অনুসরণেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কবির চিত্তাকাশে এই প্রলয়ঙ্করী মূর্তি এরূপ কালবৈশাখীর রক্ত-পিঙ্গল মেঘের মত উদিত হয় নাই। ইহার পিছনে নবযুগের প্রেরণা, নূতন উপলব্ধির শিরা-স্নায়ু-অভিভবকারী তীব্রতা নিশ্চয়ই ছিল। যে সমস্ত সাধক কবি এই কালোরূপের অনুধ্যানে বিভোর হইয়াছেন, তাঁহাদের চোখে সদ্যোদৃষ্ট রণক্ষেত্রের রক্তচ্ছবি, যুগান্ত-সূর্যাস্তের শোণিতস্রাবী রশ্মিপুঞ্জ রং-এর মায়া-তুলিকা বুলাইয়াছিল। বাস্তব জীবনের বিভীষিকা, মাথার উপরের আবীর-রাঙ্গা আকাশ ও পায়ের নীচের অস্থির, টলটলায়মান পৃথিবী তাঁহাদের কল্পনার রূপটিকে এত ভয়াবহরূপে উজ্জ্বল, এত মর্মান্তিকরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। এই ভয়-ত্রস্ত, অথচ আতঙ্ক-সাহসিক মনোবৃত্তিতে শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হয়। হরিনাম আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শান্ত অথবা শোক—বিহ্বল বৈরাগ্যের উৎস হইতে—যখন আমাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা শমিত ও মৃত্যুর অনিবার্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কালীনামের উচ্চারণ আসে বিপদের উত্তেজনা ও বিপদ হইতে উদ্ধারের সঙ্কল্প হইতে—যখন আমরা পুরুষকারের অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে দৈবানুগ্রহের অনুকূল বায়ুর প্রত্যাশী। হরিকে আমরা আবেদন জানাই পার করিতে, কালীর নিকট প্রার্থনা করি রক্ষার জন্য। অবশ্য সমস্ত প্রার্থনার সুর শেষ পর্যন্ত এক হইলেও ইহার প্রেরণা-দায়ক মনোভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটু সূক্ষ্ম তারতম্য আছে।

(৩)

এই প্রসঙ্গে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শাক্তসঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই রাজা, মহারাজা, দেওয়ান প্রভৃতি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, বৈষয়িক ব্যাপারে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত ব্যক্তি ছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজা নন্দকুমার, বর্ধমানাধিপতি মহাতাপচাঁদ, দেওয়ান রঘুনাথ রায় প্রভৃতি দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ শ্যামার প্রতি উচ্ছ্বসিত ভক্তিতে গদগদ হইয়া সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তাঁহাদের আবেগ ব্যক্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্মে সংসারত্যাগী বা নির্ধন সাধনাতৎপর বৈরাগীর প্রাদুর্ভাব—শক্তি-পূজায় বিত্ত ও প্রভাবশালীর ভিড়। ইঁহারা নিজ নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া সংসারসুখের অনিত্যতা ও অলীকতা, মায়াপাশের দুশ্ছেদ্যতা, সংসার-সংগ্রামের দুর্বিষহতা, সাধনপথের বিঘ্নভূয়িষ্ঠতা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া কাতরকণ্ঠে মহামায়ার সহায়তাপ্রার্থী হইয়াছেন। ইঁহারা কেবল সাধনার ক্ষেত্রে নয়, বাস্তব জীবনেও জীবনের বিষাদময় পরিবর্তনশীলতা, ভাগ্যের ক্ষণভঙ্গুরতা আস্বাদন করিয়াছিলেন; সঙ্কটসমুদ্রে নিমজ্জমান, রুদ্ধশ্বাস ব্যক্তির অসহায় আর্তনাদ ইহাদের জীবনের ভিতর দিয়া রচিত সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। বাঙলা সমাজের নেতা কৃষ্ণচন্দ্র ও নন্দকুমার এক মুহূর্তে প্রতিষ্ঠার উন্নত শিখর হইতে সর্বনাশের অন্ধতম গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন—নন্দকুমারকে অত্যাচারী বিদেশী প্রভুর বিচার-বিপর্যয়ে ফাঁসিকাষ্ঠেও ঝুলিতে হইয়াছিল। যাঁহাদের এরূপ চরম দুর্গতির সম্মুখীন হইতে হয় নাই, তাঁহারাও বৈষয়িক জীবনের বিষজ্বালা, দুর্দৈবের অতর্কিত কশাঘাত সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাজীকরের মেয়ের ভেল্কি, রহস্যময় মাতৃস্নেহের উদ্ভট বিপরীত অভিব্যক্তি, তাঁহার দুর্বোধ্য বিধানে মোদকপ্রার্থী বালকের প্রতি তিক্তরসের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিপর্যয়মূলক অভিজ্ঞতা তাঁহাদের সত্যকার জীবনে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছিল, এবং ইহারই উপভুক্ত রসসার তাঁহাদের গানের ক্ষুদ্র পেয়ালায় বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষরিত হইয়াছে। এই অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি যে তাঁহাদিগকে নানারূপে বিভ্রান্ত করিতেছেন, কুহকমন্ত্রে তাঁহাদের হিতাহিতবোধ আচ্ছন্ন করিতেছেন, দৈবী মায়ার দুরত্যয়তায় তাঁহাদের সংসার-অরণ্য হইতে নিষ্ক্রমণের পথ রুদ্ধ করিতেছেন, গন্তব্যপথে প্রলোভনের জাল বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে হোঁচট খাওয়াইতেছেন—জীবনের এই বহুধা-পরীক্ষিত সত্যই তাঁহাদের কাব্যের প্রেরণা যোগাইয়াছে। অতিসাধারণ লোকের সহিত মায়ের

এই লুকোচুরি খেলার ততটা প্রয়োজন হয় না; কিন্তু যাঁহারা বৈভবের স্বর্ণ সিংহাসনে আসীন হইয়াও তাঁহার নিগূঢ় রহস্যোদ্ভেদের দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, যাঁহারা কেবল বাপের কোলে সন্তুষ্ট না হইয়া মায়ের কোলেরও দাবী করেন, তাঁহাদিগকে তিনি গোলকধাঁধায় ফেলিয়া, সম্পদের চোরাবালিতে ডুবাইয়া ভালরূপ পরীক্ষা না করিয়া ছাড়েন না। রামপ্রসাদ নিজে অবশ্য দেওয়ান-মহারাজজাতীয় ছিলেন না; কিন্তু কৌতুকময়ী শঙ্করী তাঁহাকেও তহবিলদারী দিয়া তাঁহাকে আভিজাত্যের দুরবস্থার অংশীদার করিতে কার্পণ্য করেন নাই। রামপ্রসাদ কেবল তহবিলের খাতায় কালীনাম লিখিয়া বিষয়-ভূতের প্রতিষেধক মন্ত্র সাধনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পার্থিব মনিবের প্রতি নিমকহারামী করিয়া তাঁহার আসল প্রভুর প্রতি অবিচল বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়াছিলেন।

অবশ্য শক্তি-পূজার ক্ষেত্রে কেবল যে অভিজাত-বর্গের একাধিপত্য ছিল তাহা নহে; উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে অধিকাংশই সংসারী গৃহস্থ ও সংসারবিরাগী মুমুক্ষু পর্যায়ভুক্ত ছিল। কৌতূহলের বিষয় এই যে, প্রচলিত শক্তিপূজার প্রভাবে ধনী-মানী ব্যক্তিদের মধ্যেও সংসারের অনিত্যতার ধারণা তীব্রভাবে স্ফুরিত হইয়াছিল। সমাজসংস্থিতির এই সঙ্কটময় মহাশ্মশানে, সত্যিকারের শ্মশানে সাম্য-বোধের অনুরূপ, ধনী-দরিদ্র, মহারাজ-ফকিরের মধ্যে একটা বৈষম্যনিরসনকারী ঐক্যভাব সংযোগসূত্র রচনা করিয়াছিল। মাতার প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতায়, সংসার-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতিলাভের আকুতিতে, মাতৃস্নেহলাভের আগ্রহাতিশয্যে সকল সাধকের কণ্ঠে একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে। রামপ্রসাদ এই সাধকসম্প্রদায়ের মধ্যমণিরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হন। অনুভূতির প্রগাঢ়তায় ও প্রকাশ-ভঙ্গীর স্বচ্ছ সারল্যে তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অবশ্য তাঁহার গানের মধ্যেও স্তরবিভেদ করা যায়। শাক্ত কবিদের সাধারণ বিষয়-প্রকরণ—যথা আগমনী-বিজয়া, রূপবর্ণনা ও আত্মনিবেদন—তাঁহার কবিতাতেও উদাহৃত হইয়াছে। আগমনী-বিজয়া ও রূপবর্ণনাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত নহে; তাঁহার স্থান যে সমজাতীয় কবিগোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। দেবীকে দুহিতারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তনে ও সেখানে তিনদিন অবস্থিতির পর বিদায়গ্রহণে, মাতার মনে যে প্রতীক্ষার সংশয়াচ্ছন্ন আগ্রহ, মিলনের আনন্দ ও বিরহের শোকোচ্ছ্বাস তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে, রামপ্রসাদ তাঁহার সমধর্মী অন্যান্য কবির ন্যায় তাঁহার গানে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু

অনুভূতির কোন বিশেষ তীব্রতা, অন্তঃপ্রবাহিত ঝটিকার কোন অসাধারণ ব্যঞ্জনা, প্রকাশের কোন অনির্বচনীয় সৌকুমার্য, কোন হৃদয়দ্রাবী সুরকম্পন তাঁহার এই জাতীয় কবিতায় অনুভূত হয় না। হয়ত রামপ্রসাদের সাধক-জীবনে পারিবারিক স্নেহরস যথেষ্ট গভীরতা লাভ করে নাই। রূপবর্ণনাতেও তিনি গতানুগতিক প্রথার অবলম্বন করিয়াছেন—অনুপ্রাস ও অলঙ্কার-বাহুল্য, প্রতি অঙ্গের স্বতন্ত্র আলোচনা ঠিক অনুভূতির সমগ্রতার অনুকূল হয় নাই।

কিন্তু তাঁহার আত্মনিবেদনমূলক কবিতাগুলি যে অনুপম তাহা সন্দেহাতীত। তাঁহার এই-বিষয়ক গীতগুলিতে দর্শনের জটিলতত্ত্ব, সাধনার নিগূঢ় অনুক্রম, জীবনের সমস্ত বিভ্রান্তকারী রহস্য, অন্তরের উল্লাস-বিষাদ, আবদার-অনুযোগ, অশান্তি-নির্বেদ, বিনয়-দুঃসাহস প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিসমূহ উপলব্ধির তীব্র অগ্নিশিখায় গলিয়া এক হইয়া গিয়াছে ও এই যৌগিক আবেগের দ্রবীভূত প্রবাহ কবির লেখনীমুখে এক অনিবার্য স্বতঃস্ফূর্ততার সহিত নিঃসারিত হইয়াছে। অধ্যাত্মসাধনার গুহা-নিহিত তত্ত্ব যেন আটপৌরে জীবনের ক্ষুদ্র ভাব-লহরীতে প্রতিবিম্বিত হইয়া, উহারই পারিপার্শ্বিক ভাবাসঙ্গের সহিত বেমালুম মিশিয়া, বৈজ্ঞানিকের নিঃসন্দেহ প্রতীতির সহিত কবির ঋজু, অন্তর্ভেদী প্রকাশভঙ্গীর সম্মিলন ঘটাইয়া এক নব সৃষ্টির অপরূপত্বে আমাদিগকে চমকিত করে। (বৈষ্ণবভক্ত কল্পনা করেন যে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' 'দেহি পদপল্লবমুদারং' এই চরণটি কবির ছদ্মবেশধারী ইষ্টদেবতা স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। এই ভক্তজনানুমোদিত কল্পনার অনুবর্তনে আমরা বলিতে পারি যে, রামপ্রসাদের প্রায় সমগ্র পদাবলী তাঁহার জননীরূপিণী মহামায়া কবির হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়া নিজেই লিখিয়াছেন। ভগবানের দ্বৈতবিলাস-রহস্য কি কেবল ভক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিবে, কাব্যক্ষেত্রে কি উহা প্রসারিত হইবে না?)

(৪)

আজ রামপ্রসাদ যে সংস্কৃতি ও সাধনার প্রতীক্ তাহার সঙ্গে আমাদের সত্যকার সম্বন্ধ নির্ণয় করা প্রয়োজন। আন্তরিকতাহীন ভাববিহ্বলতার কুহেলিকাজাল হইতে সত্যের সূর্যালোককে উদ্ধার করিতে হইবে। সভাসমিতিতে রামপ্রসাদের গুণকীর্তন করিয়া, প্রবন্ধে তাঁহার সাহিত্যিক গুণের বিশ্লেষণ ও মূল্যনির্ধারণ করিয়া আমরা আমাদের জীবন হইতে তাঁহার আসল গৌরবকে বিসর্জন

দিয়াছি। তাঁহার মূল্যবোধকে আমরা সাহিত্যে স্বীকার করিয়া জীবনে অস্বীকার করিতেছি। তাঁহার 'মন তুমি কৃষি কাজ না' গানটি মুখে গাহিয়া, জীবনে সোনা ফলানর চেষ্টা দূরের কথা, আগাছা কাঁটাগাছে পূর্ণ করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছি না। চোখে ডবল ঠুলি আঁটিয়া, সংসারের ঘানিগাছে অবিশ্রান্ত ঘূর্ণ্যমান হইয়া 'মা, আমায় ঘুরাবি কত' গানে কৃত্রিম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। বাষ্পগদগদ কণ্ঠে আমাদের প্রাচীন ঐশ্বর্যের গৌরব ঘোষণা করিয়া রিক্ত দারিদ্র্যের অনুসরণই জীবনাদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। রামপ্রসাদের বাস্তুভিটায় পুস্তকাগার স্থাপন করিয়া উহাকে জনমানবহীন শূন্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইতে রক্ষা করিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় বিড়ম্বিত হইতেছি। রামপ্রসাদের পুণ্য প্রভাব যাহাকে আকর্ষণ করিল না তাহাকে সস্তা নভেলের প্রলোভনে তীর্থযাত্রার ফল ভোগ করাইতেছি। কবি-সাধকের স্মৃতি কি কোন সদ্যোপ্রতিষ্ঠিত স্মৃতিমন্দিরে, না তাঁহার অমর কবিতায় চিত্তের নিগূঢ়তলশায়ী অধ্যাত্ম প্রভাবে? সাধনায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ ও সিদ্ধিলাভ দুর্বল সাধারণ মানুষের আয়ত্তাতীত; কিন্তু সেই আদর্শের দিকে মানসপ্রবণতা ত' অনুশীলন করা চলে। গৌরীশঙ্করের উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ সমতলবাসী মানবের পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু এই অনায়ত্ত আদর্শের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ, তাহার হিমশীতল বায়ুর স্পর্শরোমাঞ্চ-অনুভবও কি আমাদের কাম্য নহে? শক্তি হয়ত নাই, কিন্তু ইচ্ছাও নির্মূল হইল কেন? পক্ষীর ইচ্ছাশক্তির অবিশ্রান্ত প্রয়োগেই তাহার পক্ষোদ্গম সম্ভব হইয়াছে। দয়িতের সহিত মিলনের পথ প্রতিরুদ্ধ, কিন্তু মানস-অভিসারের কল্পনা পর্যন্ত নিঃশেষিত কেন? রামপ্রসাদের নামে যে স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে প্রসাদী ভাবধারা সচল রাখিবার কোন আন্তরিক চেষ্টা আছে কি? না সেখানেও জড়বাদী শিক্ষার পাষাণস্তূপে অধ্যাত্ম অনুভূতির ক্ষীণতম স্পন্দনটুকুও পিষিয়া মারা হইয়াছে? সেখানে অন্ততঃ রামপ্রসাদী গানগুলি পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইলে, বালক-বালিকার কণ্ঠে আধুনিক সিনেমা সঙ্গীতের পরিবর্তে এইগুলির প্রচলন হইলে, অন্ততঃ কাহারও কাহারও মনে একটু উচ্চ ভাবের বীজ উপ্ত হইতে পারিত। তাই আজ ঐতিহ্যবিস্মৃত বাঙালীকে আত্মবঞ্চনার পালা শেষ করিয়া জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে—আমাদের প্রাচীন ধর্মসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিবৃন্দকে সাহিত্য-খেলায় পুতুলরূপে ব্যবহার না করিয়া প্রাণশক্তির উৎসরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এখনও পল্লী-অঞ্চলের সরল, নিরক্ষর তাঁতি-চাষা-জেলের

মানস প্রবণতার যে স্তর হইতে তাহাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে প্রসাদী সঙ্গীত গাহিয়া জীবিকার প্রয়োজন ও আত্মার বুভুক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে, শিক্ষাভিমানী, মার্জিতরুচি, উচ্চ চিন্তায় অভ্যস্ত আমরা কি ততটুকু নিষ্ঠা ও চিত্তশুদ্ধির পরিচয় দিতে পারি না?

মধ্যযুগের পল্লী-সাহিত্য

(১)

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত সমস্ত বাংলা সাহিত্যই পল্লীকেন্দ্রিক ও ধর্মানুভূতিমূলক ছিল। শত শত কবি সুদূর, অখ্যাত পল্লীগ্রামে বসিয়া ও পরস্পরের সহিত কোন যোগসূত্রে আবদ্ধ না হইয়া একই ধর্ম-কাহিনী পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিতেন। আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের সঙ্গে ইঁহাদের কাব্য-প্রেরণা ও মানস গঠনের একটা আশ্চর্য রকমের পার্থক্য ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের খুব কম কবিই মৌলিকত্বের আকর্ষণ অনুভব করিতেন বা সাহিত্যিক অমরতা-লাভের আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইতেন। জনসমাজের মধ্যে ধর্মপ্রচার ও দুরূহ শাস্ত্র হইতে সংকলিত ধর্মতত্ত্বের সরল ব্যাখ্যাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তুলট কাগজে পুঁথি রচনা করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে উহা মহাকালের হাতে অর্পণ করিতেন, পুঁথির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। সমস্ত রচনার মধ্যে তাঁহাদের যে প্রসন্ন ও প্রশান্ত মনোভাব প্রকাশ পাইত, তাহার উপর সংসারের কোন দুঃখ-দৈন্য বা ব্যক্তি-জীবনের কোন অতৃপ্তি বা অভাববোধ কোন কলঙ্করেখা অঙ্কিত করিতে পারিত না।

ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ বা কাশীদাসের মহাভারতের ন্যায় যে সমস্ত অমর কাব্য সমগ্র জাতির জীবন-দর্শন গঠিত করিয়াছে, তাহারাও নিতান্ত আকস্মিকভাবে, যেন কালের অভাবনীয় দাক্ষিণ্যে, ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়া, অসংখ্য নকলকারদের অনুলিপির দ্বারা বহুগুণিত হইয়া বর্তমান যুগের নিরাপদ আশ্রয়ে আসিয়া পৌছিয়াছে। এই জাতীয় মহাগ্রন্থগুলি সব যে একহাতের রচনা তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না—এক অদৃশ্য প্রেরণা পিতা হইতে পুত্রে, গুরু হইতে শিষ্যে সংক্রামিত হইয়া, বহু পুরুষের মিলিত প্রচেষ্টায় ইহাদের সমাপ্তির সম্পূর্ণতা বিধান করিয়াছে। কিংবদন্তী বলে যে, কাশীরামদাস বনপর্ব শেষ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গদাধর

দাস মহাভারতটি শেষ করেন—মৃত্যু-কবলিত জ্যেষ্ঠতাতের হস্তস্খলিত লেখনী তুলিয়া লইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র একই রচনা-ভঙ্গীতে, একই উচ্ছ্বসিত আত্মপ্রত্যয়ে, অটুট-ভক্তিরসের কালিতে ডুবাইয়া উহার দ্বারাই রচনাটি শেষ করিয়াছেন। আধুনিক যুগের অতি সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকও উভয়ের রচনার পার্থক্য ধরিতে এমন কি উভয়ের পরিকল্পনাগত কোন বৈষম্যও অনুভব করিতে পারেন না। সংস্কৃত মহাভারতের কোন্ তত্ত্ব বর্জন বা গ্রহণ করিতে হইবে, কোন্ আখ্যায়িকাটিকে নূতন যুগের ভক্তি-সাধনার আদর্শে রূপান্তরিত করিতে হইবে, কোথায় সুর চড়াইতে বা নামাইতে হইবে এই সমস্ত বিষয়ে উভয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া, স্বাধীন রুচির পরিচয় দিয়াও এক আশ্চর্য ভাবসাম্যে পৌছিয়াছে। জল-শোষণে স্ফীত স্পঞ্জ যেমন একই রকমের ছাপ রাখিয়া যায়, ভক্তি-আর্দ্র কবির মনও রচনার মধ্যে এক অভিন্ন স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে।

(২)

এই পুঁথিগুলি রচিত হইবার পর সমাজ ইহাদের রক্ষণের ও সম্প্রসারণের যে ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহা একমাত্র ধর্মপ্রাণ হিন্দু জাতির দ্বারাই সম্ভব। যদিও ধর্মমূলক রচনামাত্রই হিন্দুর মনে এক প্রবল আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি করিত এবং যদিও এই মানসপ্রবণতার ফলেই শনির পাঁচালী, গঙ্গার মাহাত্ম্য, সত্য-নারায়ণের ব্রতকথা প্রভৃতি বহু নিকৃষ্ট হস্তলিখিত পুঁথির অনেক অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে, তথাপি কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের লোকোত্তর মহিমা ও অনুপম কাব্যোৎকর্ষ সম্বন্ধে সমাজ-চেতনা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এক গভীর রস-প্রেরণা ও ভক্তির আবেগ অনুভব করিয়াছিল। এই গ্রন্থগুলির শত শত অনু-লিপি বাংলাদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—সুদূর মগ-অধ্যুষিত চট্টগ্রাম অঞ্চলেও এই হস্তলিখিত পুঁথি অনুপ্রবেশ করিয়া গৃহস্থের পূজাগৃহে অথবা গৃহ-দেবতার বেদীর উপর শালু-কাপড়মণ্ডিত হইয়া বা বিচিত্র-চিত্রাঙ্কিত কাষ্ঠ-বেষ্টনীর মধ্যে সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। সমস্ত গ্রন্থের, এমন কি রামায়ণ মহাভারতের আঞ্চলিক সংস্করণগুলিরও যে এরূপ দেশব্যাপী ও সার্বজনীন প্রসার হয় নাই, তাহাতে বোধ হয় অতীতের জন-সাধারণের আপেক্ষিক উৎকর্ষ-বিচার ও রুচির মানদণ্ড অশিক্ষিত-পটুত্বের এক উচ্চ পর্যায়ে ও অভ্রান্ত সংস্কারে পৌছিয়াছিল।

রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন অনুবাদের মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক দিয়া এই দুইটি গ্রন্থের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি ছিল তাহা অনুসন্ধান করিতে স্বতঃই কৌতূহল জাগে। সাহিত্যিক গুণের সজ্ঞান তুলনামূলক বিচারের দ্বারা জনসাধারণের রুচি কখনই প্রভাবিত হয় নাই। মনে হয়, গ্রন্থদ্বয়ের যে সমস্ত অংশে অকৃত্রিম ভক্তির সুর ধ্বনিত হইয়াছে কিংবা উচ্ছ্বসিত করুণরসের প্রস্রবণ উৎসারিত হইয়া পাঠকের চিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত ও সহানুভূতির অশ্রুধারায় সিক্ত করিয়াছে, সেইগুলিই জনচিত্তে অবিস্মরণীয়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে ও উহাদের জনপ্রিয়তার তারতম্য উহাদের দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়াছে ; আখ্যান-রসের স্বাদ ও গন্ধলোলুপ শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তকে ইহারা মুগ্ধ ও প্রভাবিত করিয়াছে। তাছাড়া, উহাদের মধ্যে ঘরোয়া সুরের সুপরিচিত স্পর্শটিই—হিন্দু পরিবারে প্রচলিত প্রথার সরস বর্ণনা, বিবাহের সমারোহ, রাজ্যাভিষেকের ঐশ্বর্য-প্রদর্শনী, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের শাস্ত্র-বিধি-সম্মত আয়োজন সম্ভার, তপস্যায় তুষ্ট দেবদেবীর আবির্ভাব ও বরদান, প্রাকৃত হাস্য-কৌতুক প্রভৃতি ইহাদের আকর্ষণকে গাঢ়তর করিয়াছিল। প্রাথমিক ব্যাপ্তি ও পরিচয়ের পর শুধু অভ্যাসের জন্যই ইহাদের প্রভাব কালজয়ী হইয়াছিল। যেমন এক রকমের রান্না জিহ্বাতে অভ্যস্ত হইলে উহার প্রকরণ-ভেদগুলি তাদৃশ রুচিকর বলিয়া বোধ হয় না, সেইরূপ রামায়ণ-মহাভারতের একরূপ বর্ণনাভঙ্গী ও রসসৃষ্টি-কৌশল দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে রুচিকর বলিয়া প্রতীতি জন্মিলে আর কোনও বর্ণনা বা আখ্যান-বিবৃতি রসবোধের অনুমোদন লাভ করিতে পারিত না। পুরুষ-পরম্পরাক্রমে এই রুচি সঞ্চারিত ও অনুশীলিত হইয়া, নানা সুখময় ও বেদনাময় জীবন-স্মৃতির সহিত জড়িত হইয়া, ভাবানুষঙ্গের নানা বিচিত্র তারে ঝঙ্কৃত ও অনুরণিত হইয়া ক্রমশ মানব প্রকৃতির অস্থিমজ্জাগত অত্যাজ্য সংস্কারে পরিণত হইল। এইরূপ প্রক্রিয়া ও পরিণতির ফলেই নানা প্রতিযোগী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক সীমায় প্রচলিত রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৩)

কিন্তু এই অমর মহাকাব্যদ্বয় কেবল যে নিজেরাই অটুট মহিমায় যুগ যুগ ধরিয়া বিরাজিত তাহা নহে, ইহারা কাব্যপ্রেরণা ও উপকরণ যোগাইয়া সমগ্র জাতির চিত্তকে ভক্তিপ্রবণ ও কাব্য-মাধুর্য্যের আস্বাদনে উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতের বিশাল হ্রদ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়ঃ-প্রণালীর দ্বারা প্রবাহিত

ভক্তি-চন্দন-সৌরভবাহী সুমিষ্ট জলরাশি বাঙালী জনসাধারণের চিত্তকে উর্বরা করিয়া উহাকে কবি-কল্পনায় উদ্‌বুদ্ধ ও আদর্শে স্থির করিয়াছে। অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যেও যে কাব্যচর্চা এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত তাহার মূল উৎস হইল এই মহাকাব্যদ্বয়ের প্রভাব। কত গান, কত যাত্রা ও পাঁচালীর পালা, কত কবি-সঙ্গীত, কত তর্জার লড়াই, কত ক্ষুদ্র খণ্ড আখ্যায়িকা এই উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়া সমগ্র দেশে একটা সরল, সচল ভাবের বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলার কাব্য-নিকুঞ্জে নাম-না-জানা কত পাখী ইহাদের সুরে সুর মিলাইয়া বাঙলার আকাশ-বাতাস গীতিমুখর করিয়াছে, কত ছোট ছোট ভাবের ঝরণা চারিদিকে শীতল শীকররাজি ছড়াইয়া সরস-শ্যামল সৌন্দর্য বিছাইয়াছে, কত সরল বিশ্বাসে স্নিগ্ধ ভক্তির অনুভূতি জীবনের তাপ-জ্বালা জুড়াইয়া চিত্তকে অমৃত-নিষিক্ত করিয়াছে। যুগে যুগে বাঙালীর জীবনে কত বিষাদের ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে—রাষ্ট্র-বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ-মহামারী, সামাজিক অত্যাচার-অবিচার, অর্থনৈতিক দুর্দশা—সমস্ত রকমের দুর্দৈব তাহার জীবনের উপর শ্বাসরোধকারী পাষাণভারের ন্যায় চাপিয়া বসিয়াছে। এই সমস্ত দুর্বিপাকের মধ্যে সে কোনরকমে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে মাত্র; জীবনের পূর্ণ ঐশ্বর্য, শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ ও অনুশীলন হইতে সে চিরকাল বঞ্চিত হইয়াছে।

এক চৈতন্যদেবের আবির্ভাব-যুগে বাঙালীর অন্তঃশীলা ভক্তি-সাধনা কিছুদিনের জন্য কূল-প্লাবী স্রোতস্বিনীর ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি পূর্ণ-বিকশিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। কিন্তু এখানেও রাজনৈতিক পরাধীনতা, কাজীর অত্যাচার দুঃস্বপ্নের মত তাহার জীবন-সাধনার দিব্যানুভূতিকে মাঝে মাঝে মোহগ্রস্ত করিয়াছে। চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদলীলা ও ভক্তিতন্ময়তার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটিয়াছে বাংলার সংক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিমণ্ডল হইতে দূরে, উৎকলের শান্ত, স্বধর্মনিষ্ঠ পরিবেশে। মনে হয় যেন শ্রীচৈতন্যের লীলাবিকাশের ক্ষেত্র-নির্বাচনে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পুণ্য-মন্দিরের আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক আনুকূল্যও কারণরূপে বর্তমান ছিল। বাংলার বৈষ্ণব কবিরা নবদ্বীপ ও নীলাচলের অপরূপ লীলামাধুর্যকে অবলম্বন করিয়া ও কৃষ্ণলীলার সহিত উহাদের নিগূঢ় ভাবসাম্য অনুভব করিয়া যে পদাবলী-সাহিত্য রচনা

করিয়াছিলেন তাহাতে বাংলাদেশের জলবায়ু, প্রকৃতি-পরিবেশ ও সমাজ-ব্যবস্থা যেন এক অপার্থিব দিব্য জ্যোতির অন্তরালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইহা বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করিয়া এক ভাববিভোরতার আদর্শলোকে উধাও হইয়াছে।

চৈতন্য-প্রভাবিত ভাবরাজ্যের এই অসাধারণ ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে বাংলাদেশের কাব্যানুশীলন প্রধানতঃ আখ্যান ও গীতি-কবিতার ভিতর দিয়া পৌরাণিক সাহিত্যের সার-সংকলনে ব্যাপৃত হইয়াছে। যে সমস্ত কবি এই কার্যে ব্রতী হইয়াছে, তাহাদের মানস গঠন অনেকাংশে অদ্ভুত। তাহারা যে নিজ কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে খুব আস্থাবান ছিল তাহা মনে হয় না—অন্ততঃ তাহাদের রচনায় কবিত্বের উচ্চ নিদর্শন মিলে না। মধ্যযুগের কবিত্ব যেন একটা যৌথ কারবার এবং কারবারে অংশীদার হইবার প্রধান মূলধন কাব্যশিল্প-বিদগ্ধতা নহে, ভক্তি। কেবল মাত্র এই ভক্তি ও ন্যূনতম প্রকাশক্ষমতা লইয়া সকলেই এই ভারতীমন্দিরে প্রবেশাধিকার দাবী করিয়াছে। মৌলিক অনুভূতি ও কল্পনার কোন প্রয়োজন ছিল না—পুরাণ ও ভক্তিতত্ত্ব হইতে সংগৃহীত এক সাধারণ ভাণ্ডার সকলের জন্যই সমভাবে উন্মুক্ত ছিল। কবি-যশঃপ্রার্থী কাব্য রচনার প্রেরণা কোন্‌খানে অনুভব করিতেন তাহা নির্ধারণ করিতে কৌতূহল হয়। তিনি যে বিশেষ কবিত্ব-শক্তির অধিকারী এই আত্মপ্রত্যয় কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে খুব কম লোকেরই ছিল। তাঁহাদের ভগবদ্দত্ত সনন্দ কবিপ্রতিভা নয়, ভক্তির অনুভূতি। গ্রন্থের পাঠকগোষ্ঠী ও গ্রন্থের রচয়িতার মধ্যে কোন অনতিক্রম্য ব্যবধান ছিল না—যে সামান্য ব্যবধান ছিল তাহা বর্তমান যুগে গ্রন্থের আবৃত্তিকারক ও শ্রোতার অনুরূপ। কবি ও শ্রোতার মধ্যে স্থান-বিনিময়ও অসম্ভব ছিল না—যে-কোন মুহূর্তে শ্রোতা আসর হইতে রঙ্গমঞ্চে উন্নীত হইয়া গানের দুই এক কলি বা নূতন আঁখর সংযোজন করিতে পারিত। কত নকলকারক পুঁথি নকল করিতে করিতে গ্রন্থের মধ্যে নিজ রচনা কয়েক পংক্তি যোগ করিয়া দিয়াছে। এখন আর আদিম রচনা ও প্রক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে পার্থক্য করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোটকথা, ভক্তি যেখানে প্রধান ও কবিত্বশক্তি অপেক্ষাকৃত গৌণ, সেখানে সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে একটা গণতান্ত্রিক সাম্যভাব বিরাজিত ছিল। যে-কণ্ঠ মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারে, সে যে স্বরচিত গানে সুর লাগাইতে পারে, যে হাত পূজার অর্ঘ্য রচনা করিতে

অভ্যস্ত তাহা যে প্রয়োজন হইলে লেখনীর মুখে কাব্য-পুষ্পাঞ্জলি দেবপদে অর্পণ করিতে পারে এই ধারণা প্রায় সর্বস্বীকৃত ছিল। সুতরাং মধ্যযুগীয় সমাজে কবি নামে কোন বিশেষ জাতি বা কবি-কৌলীন্য নামে কোন বিশেষ রকমের আভিজাত্য প্রচলিত ছিল না। গঙ্গার ঘাটে স্নানরতা মহিলাবৃন্দের মুখে স্খলিতবাক্, অশুদ্ধ স্তবপাঠের ন্যায় অনেক পল্লী-কবি নিঃসঙ্কোচে খণ্ড ছন্দ ও অর্ধমূক বাক্য-বিন্যাসের সমাবেশে নিজ অন্তরের ভক্তিরসের প্রবাহকে উন্মুক্ত করিতেন।

(৪)

এই সমস্ত কাব্যগ্রন্থে লেখক ও পাঠকের প্রধান উৎসাহ ছিল দেবদেবীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক অলৌকিক আখ্যায়িকা-পরিবেশনে ও দেবদেবীর উপর যথাসম্ভব মানবিক দোষ-গুণের আরোপে। মধ্যযুগের বাঙালী ভক্তির আতিশয্যে ও অকৃত্রিমতায় একদিকে দেবতাকে নিজ পরিবারভুক্ত করিয়া দেখিতে চাহিত, অপর দিকে জীবন-যাত্রার মধ্যে তাঁহার অলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় ও ভক্তির পুরস্কারস্বরূপ মুহুমুর্হু প্রসাদ লাভ করিয়া, তাহার বিস্ময়রস ও ভোগ-বাসনার পরিতৃপ্তি বিধানের প্রত্যাশী ছিল। সেইজন্য সমস্ত রচনাতেই স্তবস্তুতির মাধ্যমে দেবতার অলৌকিক শক্তি-প্রকাশের উপলক্ষ্য-সৃষ্টি ও তাঁহাদিগকে ঘরোয়া আবহাওয়ার মধ্যে ফেলিয়া, তাঁহাদের মধ্যে মানব-সুলভ ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্ব, মান-অভিমান, দাম্পত্য-বিরোধ প্রভৃতি বৃত্তির স্ফুরণ দেখাইয়া কৌতুকরস ও মানবিকতার বিকাশ-চেষ্টা প্রধান স্থান অধিকার করে। একদিকে শিবদুর্গার বিবাহ ও বিবাহোত্তর প্রণয়লীলা, তাঁহাদের পারিবারিক জীবনের দারিদ্র্য ও দাম্পত্য কলহ, দুর্গা ও গঙ্গার পারস্পরিক সপত্নী-বিদ্বেষ, শিবের যৌন অসংযম ও নির্লজ্জ কামুকতা, শিব ও বিষ্ণুর দুই প্রতিবেশী রাজার মত শক্তি-পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমবর্ণনার ভিতরে প্রাকৃত কেলিবিলাস, ব্যঙ্গ-শ্লেষ প্রভৃতির চটুল মুখরোচক বর্ণনা এই সমস্ত কাব্যের উপজীব্য। অন্যদিকে শিব ও বিষ্ণুর বারংবার লীলাবিভূতি-প্রকটন, দেবতাসমূহের দানবের অভিভব হইতে ত্রাণ, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য নানা অলৌকিক মহিমার পরিচয়-দান—ইহাদেরও বিস্তৃত বর্ণনা ও ভক্তিমূলক অভিনন্দন ইহাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মিলে। মনে হয় যেন সেকালের কবি ও শ্রোতারা সব সময়েই এই স্বর্গ ও মর্ত্যের দ্বিবিধ আকর্ষণের মধ্যে আন্দোলিত হইত ও ইহাদের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যের

অনুভব তাহাদের কল্পনাতীত ছিল। তাহাদের ভক্তির বর্ম তাহাদিগকে সমস্ত অবিশ্বাসের শরাঘাত হইতে রক্ষা করিত। মহাদেবের ধ্যান-গম্ভীর প্রশান্ত মহিমা, তাঁহার নির্বিকার নির্লিপ্ততা তাঁহার বিশ্বরহস্যবেত্তৃত্বের সহিত তাঁহার কোচনী-পাড়ায় ঢলাঢলি, তাঁহার মুহুর্মুহু কামোন্মত্ততা, তাঁহার শালীনতা ও সুরুচির অভাবের কোনও অসঙ্গতি তাহাদের লক্ষ্যেই আসিত না। হিমালয় কখনও বা কুজ্ঝটিকায় ঢাকা, কখনও বা প্রভাত-সূর্যের অম্লান কিরণে সমুজ্জ্বল, কিন্তু কোন সময়ই তাহার নিজস্ব মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় না। পল্লী-কবির চক্ষে দেব-মহিমাও সেইরূপ কলঙ্ক-লাঞ্ছিত হইয়াও চির-ভাস্বর।

আধুনিক যুগে আমরা কাব্য-রচনার অনেক উন্নততর মানে পৌঁছিয়াছি। কবির কল্পনা-প্রসার, ছন্দোকৌশল, অনুভূতির নিবিড়তা, শব্দচয়ন সবই অভাবনীয় ও অপূর্ব পরিণতি লাভ করিয়াছে। মধ্য-যুগের পল্লী-কবিদিগকে যেন ইহাদের সগোত্রীয় বলিয়াই মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি গত যুগের কবিরা যে কল্পনা-সমুন্নতির ও মননশীলতার রাজ্যের অধিবাসী তাহা নিরক্ষর, ভক্তি-মাত্র-সম্বল পূর্বতন কবিদের অনধিগম্য। তথাপি পাঠকের দিক দিয়া বিচার করিলে সময় সময় সন্দেহ জাগে যে, এই উন্নয়ন কি সবটাই আমাদের পক্ষে লাভের হইয়াছে? শিল্পসচেতন, ভাব-গভীরতার স্তরে বিচরণশীল আধুনিক কবি-গোষ্ঠীর সঙ্গে সাধারণ বাঙালী পাঠকের কতটুকু সহানুভূতি ও ঐক্যবোধ? আধুনিক কবিদের রস-উপভোগের জন্য এক বিশেষ বিদগ্ধ-রুচি পাঠক-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু প্রাকৃত জনসাধারণ উহাদের গানের আসর হইতে নির্বাসিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সূক্ষ্ম ও দুরূহ চিৎপ্রকর্ষ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদরণীয়, এবং এই সংবেদনশীল পাঠকবর্গও কবির ভাবে সায় না দিয়া কেবল তাঁহার কাব্য-সৌন্দর্যই আস্বাদন করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে ও নিজ অনুভূতির গভীরে যে ভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া কাব্য-রচনায় অনুপ্রেরিত হইয়াছেন, কয়জন শিক্ষিত পাঠক নিজ অন্তরে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পান? আমরা কবির সমগ্র মানসিকতা হইতে কেবল তাঁহার সৌন্দর্য-সৃষ্টিটুকু বিবিক্ত করিয়া লইয়া তাহারই রসাস্বাদনে নিমগ্ন। কবি-মানসের যে স্থির প্রত্যয় ও সুগভীর ভাবানুভূতির উৎস হইতে তাঁহার কাব্য-ধারা জন্মলাভ করিয়াছে, উৎসের সেই দুরারোহ উত্তুঙ্গতায় আমরা কয়জন উঠিবার প্রয়াস করি?

কবির সঙ্গে পাঠকের দুরতিগম্য ব্যবধান ঘটিয়াছে—কবি আজ আর সমাজ-চিত্তের নিয়ামক নহেন। তাঁহার কবিতাকে আমরা সৌন্দর্য-বিলাসের সুলভ উপকরণে পর্যবসিত করিয়াছি। আজকাল রবীন্দ্রভক্ত অর্থে রবীন্দ্র-সাধনায় বা রবীন্দ্র-জীবনবেদে বিশ্বাসী নহে, রবীন্দ্র-কাব্যের সৌন্দর্য-রসপায়ী মধু-মক্ষিকার দলকেই বোঝায়। সেকালে যাঁহারা রামপ্রসাদ বা দাশরথি রায়ের কবিতা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন, তাঁহারা কবির সমগ্র মানসিকতাই অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া লইতেন। শাঁস বাদ দিয়া খোলাটুকু গ্রহণ করিবার, ক্ষীর বাদ দিয়া নীরটুকু আহরণ করিবার শ্রম-লাঘব-কৌশল তাঁহাদের আয়ত্ত ছিল না। কবির জীবন-দর্শনকে বাদ দিয়া তাঁহার কাব্য-সৌন্দর্য-উপভোগ অমূল তরুর ফল আস্বাদনের মত, তাহাতে মিষ্টত্ব থাকিতে পারে, পুষ্টিকরত্ব নাই। প্রাচীন যুগের কবিরা সমগ্র জাতীয় জীবন গঠিত করিয়াছিলেন, আধুনিক কবিরা প্রধানতঃ একদল উন্নাসিক, রুচি-বিলাসী সমালোচক সৃষ্টি করিতেছেন। কবিতার ভাল-মন্দ আছে, কিন্তু কবিতা সম্বন্ধে প্রধান কথা হইল যে, কাব্যরস সমাজ-চেতনায় প্রবিষ্ট হইতেছে কি না। বর্তমান কালে দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া যে কবিতা লেখা হয়, তাহা দরিদ্রেরাই বোঝে না। আমাদের দেশে মহাকবি জন্মগ্রহণ করুন, তাহা দেশের ও ভাষার সৌভাগ্য; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন কবিও থাকা চাই যিনি মহাকবির ভাবধারা সহজ, সরল, কাব্যালঙ্কার-বর্জিত ভাষায় পাঠক-সাধারণের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারিবেন। একশ্চন্দ্রো তমোহন্তি ন চ তারাগণৈরপি—প্রবাদটি প্রকৃতি-রাজ্যে চলিলেও সাহিত্য-রাজ্যে অপ্রযুক্ত বলিয়াই মনে হয়।

প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ

বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পক্ষে যে প্রধান অন্তরায় তাহা হইতেছে ইহার উপকরণের ইতস্তত বিক্ষিপ্ততা ও অপ্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত উপকরণের যথাযথ প্রয়োগ সম্বন্ধে পটুতার আপেক্ষিক অভাব। এই কারণেই মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস এত অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে ও এতৎসম্বন্ধীয় নানা বিতর্কমূলক সমস্যা এখনও সমাধানের পথে অগ্রসর হয় নাই। হস্তলিখিত বহু পুঁথি কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থশালায় সংগৃহীত হইয়া তাহাদের সুষ্ঠু প্রয়োগের প্রতীক্ষা করিতেছে। এ বিষয়ে স্বর্গগত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি পথিকৃৎগণ যে প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের অনুরাগীবৃন্দের নমস্য; কিন্তু অধুনাতন কালে অনুসন্ধানের এই ধারা যে বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে এরূপ দাবী করা যায় না। বরং এখনকার সমালোচনা মধ্যযুগীয় অপেক্ষা আধুনিক সাহিত্যের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করিয়াছে—মধ্যযুগ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পূর্ব সীমান্তেই আবদ্ধ রহিয়াছে। আধুনিক কালে যে সাহিত্য মুদ্রাযন্ত্রের অনুগ্রহে একটি স্থায়ী ও নির্দিষ্টরূপ গ্রহণ করিতেছে, তাহার আলোচনায় বিশেষ ত্বরান্বিত না হইলেও চলে। কিন্তু যে বিপুল কীটদষ্ট, জীর্ণ পুঁথির রাশি কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ধূলিধূসর গ্রন্থশালায় কিংবা কোন অজ্ঞ ব্যক্তিবিশেষের অযত্নরক্ষিত কাগজপত্রাদির স্তূপে আত্মগোপন করিয়া সর্বধ্বংসী কালের কবলে অবলুপ্তির সম্মুখীন হইয়া আছে, তাহাদের সম্বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন। যে সমস্ত অমূল্য উপকরণ চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। কিন্তু যাহা এখনও টিকিয়া আছে তাহাদের সম্বন্ধে অবহেলা যে অমার্জনীয় অপরাধ তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুখের বিষয় রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি উহার গ্রন্থশালায় সংরক্ষিত পুঁথিগুলির একটি বিবরণী প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়া একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ-তালিকা মুদ্রিত করিয়াছেন। আমার উপর উক্ত তালিকার একটি পরিচিতি লিখিয়া দিবার ভার অর্পিত হইয়াছে।

দেশবিভাগের পর পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে পূর্বের মত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ-রক্ষা ও অখণ্ড ঐক্যের অনুভূতি অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। ইহার ফলে বাংলা সাহিত্যের চর্চা এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। একদিকে সাংস্কৃতিক অবিচ্ছিন্নতা ও নাড়ীর টান, অন্যদিকে রাজনৈতিক বিভেদ সাহিত্য-চর্চা ও পণ্ডিতমণ্ডলীর ইতিহাস-রচনার প্রয়াসকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া গবেষণার ইচ্ছাকে কুণ্ঠিত ও ইহার গতিবেগকে মন্থর করিয়াছে। এখন পারস্পরিক ভাব-বিনিময় ও পরস্পরের ভাণ্ডারে সঞ্চিত উপাদানের ব্যবহারের পথে বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। এ অবস্থায় উভয় বঙ্গের প্রত্যেকটি অংশের দায়িত্ব ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের পরিচয় দেওয়ার পবিত্র কর্তব্য বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং আশা করা যায় যে, রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কেবল গ্রন্থতালিকা প্রকাশ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না—ঐ গ্রন্থগুলির ভিত্তিতে সাহিত্যের নূতন ইতিহাস রচনার কার্যেও আত্মনিয়োগ করিবেন। সহযোগিতা ও ভাব-বিনিময়ের পথে যে বর্তমান বাধা প্রতিটি বাংলা সাহিত্যানুরাগীর মনে উদ্বেগ ও অস্বস্তি সঞ্চার করিয়াছে, ভরসা করি তাহার অপসারণ অধিক বিলম্বিত হইবে না।

এইবার সংগৃহীত পুঁথিগুলির কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। পুঁথিগুলির সংখ্যা ক্রমিক সংখ্যানুসারে ৩৬১, প্রকৃত গণনায় প্রায় ৪০০ হইবে। ইহাদের মধ্যে মধ্যযুগীয় বঙ্গ সাহিত্যের প্রতিটি প্রধান বিভাগই অন্তর্ভুক্ত আছে। (১) বৈষ্ণব গ্রন্থ, (২) রামায়ণ, (৩) মহাভারত, (৪) ভাগবতের অংশ-বিশেষ অথবা উহাদের ঘটনা অবলম্বনে রচিত উপাখ্যান, ও (৫) কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের অনুলিপি—সমস্তই এই গ্রন্থ-সংগ্রহে সন্নিবিষ্ট।

(১) বৈষ্ণব গ্রন্থ

বৈষ্ণব গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি তত্ত্বমূলক ও কয়েকটি পদাবলী-সংগ্রহের পর্যায়ভুক্ত। প্রথম বিভাগে অকিঞ্চন দাসের 'ভক্তিরসচন্দ্রিকা' (পুঁথি ১, ২) ও শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামীর ভণিতায় ছয়টি পত্রে সম্পূর্ণ 'জিজ্ঞাসাতত্ত্বসার' (২৭৮ ক) ভক্তির প্রকারভেদ প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহের উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বিচার-বিষয়ক। কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের সহিত এই

ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি মিলাইয়া দেখিয়া উহার মধ্যে কিছু নূতনত্ব আছে কি না তাহা যাচাই করিয়া দেখা দরকার। যদি ইহা সত্য সত্যই কবিরাজ গোস্বামী-রচিত হয়, তবে ইহার তাত্ত্বিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, রচয়িতার নাম-সম্পর্কে ইহা বৈষ্ণব-সমাজের বিশেষ আদরণীয় হইবে। উদ্ধবানন্দের 'রাধিকামঙ্গল' (১৫), অভিরাম দাসের 'গোবিন্দ বিজয়' ও উহার একাংশ 'নন্দবিদায়' (৫, ৬) কবিশেখরের 'গোপাল বিজয়' (২৭৯) ও কালীকৃষ্ণ দাসের 'মানভঞ্জন' (২৯২) বৈষ্ণব ভাবালম্বনে রচিত আখ্যান ও পালাগানের নিদর্শন। কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী-রচিত দানখণ্ড (১৫৪ ক), কোকিল-সংবাদ বা রাসলীলা (১০১-১০২), দিবারাস (১৫৫-১৬১), পূর্ণরাস (২১০) ও গেড়ুয়া পালা (১১৪-১২৩) ও এই সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুঁথি কবিচন্দ্রের বৈষ্ণবভাবের প্রমাণ দেয়।

পদাবলী-সংগ্রহ পর্যায়ে 'অনন্ত দাস পদাবলী' (৩), আনন্দমোহন পদাবলী (১৩) ও উত্তম দাস পদাবলী (১৪)—এই তিনখানি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে রচয়িতা ছাড়াও রামানন্দ, চণ্ডীদাস ও একজন অজ্ঞাত পদকর্তা শম্ভুনাথের নাম দেখা যায়। এই সংগ্রহগুলিতে রামানন্দ ও চণ্ডীদাসেব কোন নূতন পদ আছে কি না তাহা নির্ধারণযোগ্য।

(২) রামায়ণ

'রামায়ণ'-পর্যায়ে অনন্ত দাস নামে একজন অজ্ঞাতপরিচয় রচয়িতার আদিকাণ্ডের (৪) উল্লেখ আছে। ইনি পদাবলী-সাহিত্যে সুপরিচিত অনন্ত দাস কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই অনুমান যথার্থ হইলে পদকর্তার এক নূতন পরিচয় পাওয়া যায়। এই পর্যায়ে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কবিচন্দ্র শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তীর 'কুম্ভকর্ণের রায়বার' (৮৬-৯৪), 'অঙ্গদের রায়বার', 'রাম বনবাস' (২৭৭—দ্বিজ পঞ্চাননের ভণিতা-সমন্বিত), 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' (২৪৮—নিধিরাম দাস, দ্বিজ দুর্লভ ও দ্বিজ হরিদাসের ভণিতা-সংযুক্ত), 'সীতার উদ্দেশ' ও 'সীতাহরণ' (২৫৮-২৬০), শিব-রামের যুদ্ধ (সম্ভবত অপৌরাণিক ও কল্পনাশ্রয়ী, ২৪৯), হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান (২৬২-২৭৪) প্রভৃতি পয়ার-রচিত পালা-গানসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। 'কুম্ভকর্ণের রায়বারের' একখানি পুঁথি (৮৮) ১০৫০ সালে অনুলিখিত ও বীরভূমের ? দুবরাজপুর হইতে সংগৃহীত। সংগ্রহ মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম অনুলিখনের নিদর্শন। কৃত্তিবাস রামায়ণে সংযোজিত

ও বটতলার অনুগ্রহে বহু-প্রচারিত 'অঙ্গদের রায়বারে'র (৪০ক, ৪৪) দুইখানি পুঁথি ১০৭৩ ও ১০৮১ সালে অনুলিখিত ও এই দুইখানি অবলম্বনে উক্ত ব্যঙ্গ রচনাটির বিশুদ্ধতর সংস্করণ উদ্ধারিত হইতে পারে। অন্যান্য পুঁথিতে সংযোজিত অপরের ভূমিকা কবিচন্দ্রের বিপুল জনপ্রিয়তারই পরিচয় বহন করে। হরিশচন্দ্র উপাখ্যানের একটি পুঁথি (২৬৬) ১০৯৩ সনে লিখিত ও খণ্ডঘোষ হইতে সংগৃহীত। বর্তমান সংগ্রহে মহাভারতের সহিত তুলনায় রামায়ণ-বিষয়ক পুঁথি সংখ্যায় অল্প ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়া অনুল্লেখনীয়।

(৩) মহাভারত

মহাভারতের অনেকগুলি পুঁথি এই পুঁথিশালায় সংগৃহীত আছে। প্রথমত, অভিরাম দ্বিজের জৈমিনি ভারত হইতে সংকলিত কয়েকখানি অশ্বমেধ পর্বের পুঁথি (৭-১২) দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে একখানি (১১) ১০৮২ সালে অনুলিখিত। অপর একটিতে (৮) রাইচরণ ও দ্বিজ রামপ্রসাদের ভণিতা আছে। এই দ্বিজ রামপ্রসাদ নামটি আমাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করে, কিন্তু বিখ্যাত ভক্ত-সাধক রামপ্রসাদের সহিত ইহার অভিন্নতা-প্রতিপাদনের কোন উপকরণ নাই। কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর রচিত আদিপর্বকথা ও মহাভারত (গদা, শৌপ্তিক, স্ত্রী ও মূষলপর্ব, ২৪৫-৫০) এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ভণিতাতে দ্বিজ কবিশঙ্কর ও দ্বিজ কবিচন্দ্র এই উভয় নামই উল্লিখিত। পুঁথিখানি মাত্র নয় পত্রে (১ম পত্র নাই) সম্পূর্ণ। কবিচন্দ্র শঙ্কর মহাভারতের নানা বিচিত্র আখ্যান অবলম্বনে তাঁহার কাব্যশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু মহাভারতের আনুপূর্বিক অনুবাদ তাঁহার উদ্দেশ্য-বহির্ভূত বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ, আদি পর্বের ও অন্যান্য পর্বের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আখ্যানই পুঁথিটির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। কবিচন্দ্রের অনুসৃত রীতি হইতেছে মহাভারত বা ভাগবত হইতে একটি সম্পূর্ণ কাহিনী গ্রহণ করিয়া তাহার বিস্তৃত রসপূর্ণ বর্ণনা—কতকগুলি নিঃসম্পর্ক কাহিনী একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া অনুবাদের অসম্পূর্ণ চেষ্টা তিনি আর করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং পুঁথি দুইখানি যে তাঁহারই রচনা এ সম্বন্ধে সংশয়ের অবসর আছে।

কবিচন্দ্র মহাভারতীয় উপাখ্যান অবলম্বনে যে সমস্ত কাব্য-কাহিনী রচনা

করিয়াছেন তাহার মধ্যে 'অর্জুনের সাগর-বাঁধা' উপলক্ষে অর্জুন-হনুমানের কক্ষা বা দ্বন্দ্ব (বনপর্ব হইতে গৃহীত, ৪৮, ৪৯), উঞ্ছবৃত্তি পালা (৫১), ভারত-প্রসঙ্গ নামে সুধন্বার তৈল-পরীক্ষা (২৪১ ক) ভারত-প্রসঙ্গ-কথা নামে কুন্তীর শিবপূজা, ও ভারত সঙ্গীতরস নামে মহাভারতের বনপর্বীয় অরুণী হরণ ও বকধর্ম-সংবাদ বৃত্তান্ত (২৪৩ক, লিখিত ১০৯৩ সালে), যযাতি রাজার উপাখ্যান (২৪৬), শিবি উপাখ্যান (২৫০-২৫৪), সাবিত্রী উপাখ্যান (২৫৫-২৫৭), দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ (১৬৫-১৮৮) প্রভৃতি পালা আকারে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

কবীন্দ্র ও কবীন্দ্র দ্বিজ ভণিতায় অশ্বমেধপর্বের একখানি ও দ্রোণ হইতে অশ্বমেধপর্ব পর্যন্ত একখানি, মোট দুইখানি পুঁথি (২৮০-২৮১) এই সংগ্রহ-শালায় বিদ্যমান। প্রথম পুঁথি মাত্র ছয়পত্র-যুক্ত ও দ্বিতীয়টির পত্রসংখ্যা ৯৪ হইতে ১৮৪। প্রথমটিতে সুধন্বার তৈল-পরীক্ষা ও যুদ্ধ ও দ্বিতীয়টিতে দ্রোণ হইতে অশ্বমেধপর্বের আনুপূর্বিক বিবৃতির মধ্যে সুধন্বার যুদ্ধ-কাহিনীও সন্নিবিষ্ট আছে। এই উভয় পুঁথি যে একই লোকের রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সুধন্বার যুদ্ধ-কাহিনীতেও উভয় পুঁথির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ইহা সম্ভবত অনুলেখকের অনুগ্রহে। দ্বিতীয় পুঁথিটিতে 'খান সুত পরাগল', 'বিজয় পাণ্ডব কথা' প্রভৃতি ভণিতার মধ্যে পরাগলী মহাভারতের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। দ্বিতীয় পুঁথিটির সহিত কাশীরাম দাসের যে বহু মিল দৃষ্ট হয়, তাহাতে কাশী-দাসীর মধ্যে পরাগলী মহাভারতের অনুপ্রবেশের প্রমাণ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই দুইটি পুঁথির অনুলেখনের কোন তারিখ পাওয়া যায় না।

কাশীরাম দাসের মহাভারতের বিভিন্ন পর্ববিষয়ক অনেকগুলি পুঁথি (২৮৩-৩৬১), আদি হইতে দ্রোণ পর্ব পর্যন্ত এই পুঁথিশালায় সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কাশীরাম সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্যের সন্ধান না মিলিলেও, কিছু কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। প্রথমত, কাশীরাম যে বনপর্ব পর্যন্ত অনুবাদ শেষ করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছিলেন এই সংবাদ ৩০৮ ও ৩১০ সংখ্যক পুঁথি হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু যিনি এই অনুবাদ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ও আত্মপরিচয় কিছু দেওয়া নাই, তবে তিনি যে কাশীরাম দাসের আলয়েই এই গ্রন্থ-রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, এইটুকু তথ্য দেওয়া আছে। এই পুঁথিটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, ইহার নকলের তারিখ ১১৯২ সাল। কাশীরাম যে "হরিহরপুর নিবাসী পুরুষোত্তম-মুখুটি-নন্দন অভিরামের আশীর্বাদে"

গ্রন্থ রচনা করেন তাহারও উল্লেখ মিলে। কাশীরামের বংশপরিচয় সম্বন্ধে বিভিন্ন পুঁথিতে কিছু অনৈক্য দেখা যায়—তাঁহার প্রপিতামহের নাম কোন পুঁথিতে প্রিয়ঙ্কর, শুভঙ্কর ও শঙ্কর দাস, (২৮৪, ২৪২, ২৯৫, ৩১৯) ২৫৫ ও কোন পুঁথিতে (২৮৩) প্রভাকর; তাঁহার পিতামহের নামও কোন পুঁথিতে দুর্বাকরের পরিবর্তে মধুকর বলিয়া উল্লিখিত। কবির ঊর্ধ্বতনপুরুষ সম্বন্ধে স্মৃতি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল ও জনশ্রুতির ঘোষণা পরস্পর-বিরোধী হইয়া উঠিতেছিল ইহাতে তাহারই প্রমাণ মিলে। ভণিতার মধ্যে পরাগলী মহাভারতের অনুকরণে 'বিজয়-পাণ্ডব কথার' সমাবেশও ভীষ্মপর্বের একখানি পুঁথিতে (৩৪০) আছে। ৩০৯ নং পুঁথিতে রামনারায়ণ ঘোষ ভণিতাযুক্ত নলোপাখ্যান কাশীদাসী বনপর্বে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। কতকগুলি পুঁথি বেশ প্রাচীন ও বাংলা একাদশ শতকের পূর্ববর্তী। এই পুঁথিগুলি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্যপরিষদের পুঁথিগুলি মিলাইয়া ও প্রক্ষিপ্ত অংশ যথাসম্ভব বর্জন করিয়া কাশীরাম দাসের মহাভারতের একখানি প্রামাণ্য সংস্করণ প্রস্তুত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না।

মহাভারতের অষ্টাদশপর্ব ছাড়াও স্বপ্নপর্ব নামে ঊনবিংশতি পর্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ কুরুপাণ্ডবের মধ্যে পাণ্ডব-দূতরূপে মধ্যস্থতা করিতে আসিয়া দুর্যোধন-মহিষী ভানুমতীকে বিভীষিকাময় স্বপ্নদর্শন করাইয়া দুর্যোধনকে সন্ধি-প্রস্তাবে রাজি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই পর্ব সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কাশীরামের নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে এই গুহ্য বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু অনুকূল দৈববাণী শুকদেবের সংশয় দূর করিয়া শুকদেবকে গ্রন্থ-প্রকাশে প্রণোদিত করিয়াছে। এই বৃত্তান্তে কাশীরাম যে শুকদেবের সমসাময়িক হইয়া পড়িয়াছেন ও দৈববাণী যে শ্রীকৃষ্ণ-নির্দেশকে অতিক্রম করিয়া বলবান হইয়া উঠিয়াছে এই অসঙ্গতিগুলি লেখকের ধর্মান্ধ কাল্পনিকতার নিকট ধরা পড়ে নাই। (পুঁথি ৩৩৮, ৩৩৯)।

(৪) ভাগবত ও অন্যান্য পৌরাণিক সাহিত্য

এই পর্যায়ভুক্ত, ভাগবত হইতে গৃহীত বিভিন্ন আখ্যায়িকা প্রায় সমস্তই কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর রচনা। ইহার মধ্যে অক্রুরাগমন (৩১—৩৯ক), অজামিল

ও অম্বরীষ উপাখ্যান, (৪৬-৪৭), উদ্ধব সংবাদ (৫১-৫৬), উষাহরণ (৫৬ক), কৃষ্ণমঙ্গল (শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও দ্বারকালীলা, ৯৫-১০০), নন্দবিদায় (১৯৬-২০০ক), নবনীত-হরণ (২০০-২০১, মল্লভূমের মহারাজা গোপাল সিংহের প্রশস্তি-সংবলিত), পারিজাত-হরণ (২০৩-২১০), ধ্রুবচরিত (১৮৯-১৯৫), প্রহ্লাদ-চরিত্র (২১১-২৪০), ফল-ভক্ষণ (২৪১), ভরত উপাখ্যান (২৪২), দুর্বাসার পারণা (১৬২-১৬৪), গুরুদক্ষিণা (১০৩-১১৩ক), চিত্রকেতু উপাখ্যান (১২৪-১২৪ক), দাতা কর্ণ পালা (১২৫-১৫৪), কণ্ব মুনির পারণা (৬০-৬৩) ও কপিলা-মঙ্গল (স্বর্গ হইতে কপিলার ভূতলে অবতরণ ও গোপালন—মহত্ত্ববিষয়ক, ও বিষ্ণুপুরের মদনমোদন দেবের সুদীর্ঘ বন্দনা-যুক্ত ৬৪-৭৭) সন্নিবিষ্ট আছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই সমস্ত বিষয়ই পরবর্তী যুগে যাত্রাগানের আকারে সমাজের সর্বস্তরের মনোরঞ্জন করিত ও এক নূতন ধরণের সাহিত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছিল।

(৫) চণ্ডীমঙ্গল

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কয়েকখানি প্রাচীন প্রতিলিপি (১৬-২৯) এই গ্রন্থশালায় সংগৃহীত হইয়াছে। ১২১৩ সালে অনুলিখিত একখানি পুঁথিতে (২১নং) শেষ পত্রে গ্রন্থ রচনার তারিখ-নির্দেশক একটি উক্তি আছে।

সাল শাকে বসু পৃষ্ঠে ঠেকিল অম্বর।
নির্ঘাত মারিল বাণ চন্দ্রের উপর॥
এই শাকে পুথি হইল চণ্ডী অনুভব।
ডিল্লীর তক্তেতে তখন বাদশা অরংজেব॥

এই শ্লোক হইতে গ্রন্থ রচনার বৎসর চন্দ্র (১), বাণ (৫), অম্বর (০), ও বসু (৮) অর্থাৎ ১৫০৮ শকাব্দ বা ১৫৮৬ খৃঃ অঃ অনুমিত হয়; সাধারণত মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য-রচনার যে কাল গৃহীত হইয়া থাকে তাহা ১৪৯৯ শক বা ১৫৭৮ খৃঃ অঃ। পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য যথার্থরূপে গৃহীত হইলে গ্রন্থ-রচনার তারিখ মানসিংহের বঙ্গ-শাসনের (১৫৯৪-১৬০৬) কালের আরও একটু সন্নিকটবর্তী হইয়া পড়ে। আর, শ্লোকের অর্থ গ্রন্থ-রচনার সমাপ্তিসূচক না হইয়া প্রারম্ভ-সূচকও হইতে পারে ("এই শাকে পুঁথি হইল চণ্ডী অনুভব"—অর্থাৎ চণ্ডীদেবীর অনুপ্রেরণা এই শাকে প্রথম অনুভূত হইল)। মানসিংহের প্রশস্তিমূলক উল্লেখ গ্রন্থ-রচনা-সমাপ্তির পরেও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারই রাজত্বকালে

তাঁহার ডিহিদারের অত্যাচারে যদি কবিকে বাসচ্যুত হইয়া পরাশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তবে ইহা গ্রন্থ-রচনার পূর্ববর্তী কালই নির্দেশ করে ও পূর্বোক্ত অনুমান খাটে না। যাহা হউক, শ্লোকটির প্রামাণ্যতা উহার শেষ চরণের উক্তিতে (অর্থাৎ তখন অরংজেব দিল্লীর বাদশা ছিলেন) অনেকটা খণ্ডিত ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। অন্তত শেষ দুই পংক্তি কোন ইতিহাস-জ্ঞানাভিমানী, অথচ প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ অনুলেখকের দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে এইরূপ অনুমান ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। সম্পূর্ণ চণ্ডিকামঙ্গল (৪১৯ পত্রবিশিষ্ট) নকল করিতে কত সময় লাগিত লিপিকারের বিবৃতি হইতে (২৫) সেবিষয়ে আমাদের কৌতূহল কতকটা নিবৃত্ত হয়। "প্রথম আরম্ভ সন ১১৮৭ সাল চৈত্রমাস, সমাপ্ত হইল সন ১১৯০ সাল, জ্যৈষ্ঠ মাস তারিখ ৭, রোজ রবিবার, তিথি প্রতিপদ, সতের শত পাঁচ শকাব্দা ১৭০৫ সারা হইল। সাকিম কের্ণা পরগণে কিং ছোটাপুরা। দরজায় বসিয়া বেলা একপ্রহর মধ্যে সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রীজগন্নাথ ও রামপ্রসাদ দুইজনে লিখিলাম ইতি।" উভয় লিপিকার যদি একসঙ্গে লিখিয়া থাকেন, তবে একক লেখকের পক্ষে এই সময়ের প্রায় দ্বিগুণ লাগিত এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

৩

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কবিচন্দ্র শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বর্তমান পুঁথি-সংগ্রহে তাঁহার যে নানাবিষয়ক রচনা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্র-জ্ঞান ও বিষয়-নির্বাচনের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, অন্যান্য পুরাণ, বৈষ্ণবশাস্ত্র—সমস্ত বিষয়েই তাঁহার সমান অধিকার ও সমস্ত হইতেই তিনি রস আহরণ করিয়া পাঁচালী আকারে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করিয়াছেন। উদ্ধৃতিসমূহ হইতে তাঁহার রচনার প্রসাদ-গুণ ও প্রাঞ্জলতা সুপরিস্ফুট। তাঁহার রচনার পরিমাণ ও বিভিন্ন পুঁথির সংখ্যাধিক্যও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তাঁহার সমস্ত রচনা একত্র করিয়া প্রকাশ করিলে তাহা বিরাট আকার ধারণ করিবে, ও তিনি যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার মানস সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার প্রতিনিধিস্থানীয় কবি ছিলেন তাহাও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। পরবর্তী যুগেরঃ যাত্রা-সাহিত্য যে অন্ততঃ বিষয়-নির্বাচন ও ভক্তি-

রসাশ্রিত বিবৃতি-প্রবণতার দিক দিয়া তাঁহার নিকট পরোক্ষভাবে ঋণী তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কলঙ্কভঞ্জন, দাতা কর্ণ, প্রহ্লাদ-চরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র, কণ্বমুনির পারণা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, রাম-বনবাস, সুধন্বার তৈল-পরীক্ষা, শিবি-উপাখ্যান, হরিশ্চন্দ্র-উপাখ্যান—ইহার প্রত্যেকটি যাত্রাভিনয়ের বিষয়রূপে নির্বাচিত হইয়াছিল ও করুণ ও ভক্তিরস প্রবাহের দ্বারা বাঙ্গালীচিত্তের সুকুমার ভাবপ্রবণতার উদ্বোধনে সহায়তা করিয়াছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বাংলা সাহিত্যে শঙ্করের সম্পূর্ণ পরিচয় এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ও তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিরাট ও বহুভাবধারাপুষ্ট কলেবরের মধ্যে প্রায় আত্মগোপন করিয়া স্বতন্ত্র মর্যাদা হারাইয়াছেন। রামায়ণী ও পৌরাণিক সাহিত্যের একজন অখ্যাত, ক্ষুদ্র উপগ্রহরূপেই তিনি আমাদের নিকট পরিচিত, কিন্তু তাঁহার যে একটি স্বয়ংদীপ্ত কবিসত্তা আছে তাহা আমাদের নিকট অজ্ঞাতপ্রায়ই রহিয়া গিয়াছে।

মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত কবির ন্যায় এই কবির পরিচয় সম্বন্ধেও খানিকটা সংশয় আছে। কবিচন্দ্র এক ও অবিভাজ্য অথবা নানা কবি এই উপাধির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছেন এই প্রশ্ন মীমাংসার অপেক্ষা রাখে। গ্রন্থশালার অন্তর্ভুক্ত পুঁথিগুলি হইতে তাঁহার সম্বন্ধে দুই রকম বিবরণ পাওয়া যায়। গুরু-দক্ষিণা পর্যায়ের দুইটি তারিখহীন পুঁথি (১০৩, ১০৫) হইতে আমরা পাই :—

শঙ্কর রচিল যার কুলচণ্ডায় বাস

ও

আনন্দে গাইল ইহা শ্রীকবিশঙ্কর

আবার ঐ পর্যায়েরই ১০৮ নং পুঁথিতে একটি ভণিতায় পাই

রচিল শঙ্কর দাস গোবিন্দ চরণে।

এখানে দাস জাতি-নির্দেশক উপাধি, অথবা কবির গোবিন্দ-ভক্তি-প্রকাশক তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। ১১১ নং পুঁথিতে আচার্য্য শঙ্কর ভণিতা আছে। দুর্বাসার পারণার কয়েকটি পুঁথিতে (১৬২, ১৬৪) কবির নিম্নলিখিত পিতৃ-পরিচয় মিলে :—

চক্রবর্তী ম (মু) নিরাম, অশেষ গুণের ধাম

তস্য পুত্র কবিচন্দ্র কয়।

ইহার মধ্যে ১৬৪ নং পুঁথিখানি সুপ্রাচীন, ১০৯৩ সালে অনুলিখিত। দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণের (গোবিন্দমঙ্গল নামে অভিহিত) একখানি তারিখহীন

পুঁথিতে (১৭৭ ক) ও নন্দবিদায়ের ১৯৭ নং পুঁথিতে এই পরিচয়ের সমর্থন পাওয়া যায়।

পক্ষান্তরে নবনীত-হরণের ২০১ ও ২০২ নং পুঁথিতে, ২৪৫ ক মহামায়ার শঙ্খপরা-বিষয়ক পুঁথিতে, যযাতির উপাখ্যান, ২৪৬ নং পুঁথিতে, সাবিত্রী উপাখ্যান, ২৫৬ নং পুঁথিতে, হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান ২৬২ ও ২৬৮ নং পুঁথিতে কবির আত্মপরিচয় একটু বিভিন্ন রকমের ও প্রথমোক্ত দুইটি পুঁথিতে মহারাজা গোপাল সিংহের প্রশস্তি-সংবলিত।

গোপাল সিংহ মহারাজা কৃষ্ণ নামে মত্ত।
সাধু সঙ্গে সদা থাকে, কহে কৃষ্ণ-তত্ত্ব॥
মল্লবংশে গজপতি বড় দয়াবান্।
শঙ্কর দ্বিজের হএ তার ধাম॥
কবিচন্দ্র দ্বিজ কহে কৃষ্ণের কৃপায়।
হরি হরি বল সবে পালা হইল সায়॥
নেষ্টের দক্ষিণ দিকে পেন্যায় বসতি।
ভকতজনেরে দয়া কর যদুপতি॥

(২০১), তারিখ ১২৭৮ সাল

সন ১১১...সালে লিখিত ২০২ নং পদে কবির বাসস্থানের বিবরণটি পরিত্যক্ত হইয়াছে, অথচ উভয় পুঁথিই একই স্থলে বীরসিংহ গ্রামে লিখিত।

২৪৫ (ক) মহামায়ার শঙ্খপরা :—

নেগার দক্ষিণে ঘর পান্নায় বসতি।

২৪৬, যযাতি-উপাখ্যান :—

দ্বিজ কবিচন্দ্র গান পান্নায় নিবাসি।

২৫৬, সাবিত্রী-উপাখ্যান, লিখিত ১০৭৩ সাল

নেগর দক্ষিণে ঘর, পেল্লায় বসতি।

হরিশ্চন্দ্র-উপাখ্যান, ২৬২ (১২৫৮ সাল), ২৬৮ (১০৭৭ সাল)

নেগার দক্ষিণ দিকে পান্নায় বসতি।
নেগার দক্ষিণ ঘর পান্নাএ বসতি।

২০১ নং পদ হইতে প্রমাণিত হয় যে, কবিচন্দ্র যাঁহার উপাধি, শঙ্কর তাঁহার নাম, এবং দ্বিজ তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক। সুতরাং কবিচন্দ্র ও

দ্বিজ শঙ্করের একত্র সমাবেশ কোন দ্বিতীয় কবির প্রতি প্রযুজ্য না হওয়াই সম্ভব ও উভয়ত্র উল্লিখিত কবির একত্বই প্রতিপাদন করে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, দ্বিতীয় কবির সঙ্গে মহারাজা গোপাল সিংহের সংযোগ ও তাঁহার ভিন্ন স্থানে বাস উভয়ের অভিন্নত্বের বিরোধী প্রমাণরূপে উত্থাপিত করা যাইতে পারে কি? যেখানে নাম ও উপাধি সম্বন্ধে বিভিন্ন কালে লিখিত ও বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত পুঁথির একইরূপ সাক্ষ্য পাওয়া যায়, ও যেখানে সমস্ত পুঁথিগুলির মধ্যে পরিকল্পনাগত ঐক্য আছে সেখানে গোপাল সিংহের উল্লেখ ও আবাস-স্থানের বিভিন্নতা কি এই ঐক্যের বিরোধী ও দুই স্বতন্ত্র কবির অস্তিত্বের নির্দেশক? ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, কবি অপেক্ষাকৃত পরিচিতি ও খ্যাতিলাভের পর মহারাজা গোপাল সিংহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন ও হয়ত তাঁহারই দাক্ষিণ্যে নূতন আবাসে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে কুলীন ও কবির আবাসস্থল-পরিবর্তন একটা নিয়মিত-প্রায় ঘটনাই ছিল। যেখানে লক্ষ্মীর দাক্ষিণ্য ভূমির সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিত না, সেখানে সারস্বত প্রেরণার উতলা বায়ু যে কবিকে যাযাবরত্বধর্মী করিয়া তুলিবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে?

প্রহ্লাদ-চরিত্র পালাটির বিভিন্ন পুঁথির মধ্যে কেবল ২১১ নং পুঁথিতে (তারিখহীন) প্রহ্লাদ শব্দটি শুদ্ধভাবে দেখা যায়। অন্য সমস্ত পুঁথিতে প্রহ্লাদ বোধ হয় লিপিকার-প্রমাদের জন্যই প্রসাদে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহাদের ভণিতায় কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, দ্বিজ কবিচন্দ্র, শঙ্কর এই তিন প্রকার প্রয়োগই দৃষ্ট হয়, সুতরাং এগুলি যে কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর রচনা তাহা নিঃসন্দেহ। প্রহ্লাদ ভাগবতের এমন একটি সুপরিচিত চরিত্র ও সর্বজনস্বীকৃত ভক্তি-ধর্মের প্রতীক যে, তাঁহার নাম সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাদ অস্বাভাবিক বলিয়াই ঠেকে এবং একখানি পুঁথি ছাড়া আর সমস্ত পুঁথিতে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে ইহাও খুব অবিশ্বাস্য মনে হয়। এই ভুল উপাধিবিশিষ্ট পুঁথিগুলির মধ্যে ১০৬৮, ১০৮৪, ১০৯৫ ও ১০৯৮ সালে অনুলিখিত প্রাচীনতম পুঁথিও বর্তমান। অবশ্য পুঁথিগুলি প্রায় একই অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং বোধ হয় একই মূল আদর্শ হইতে অনুলিখিত।

একমাত্র শুদ্ধ-অভিধান-যুক্ত পুঁথিটিতে পুঁথির বহির্ভাগে লেখক মন্তব্য করিয়াছেন: "'প্রহ্লাদ-চরিত্র' পুস্তক সপ্তদশ পাত লেখা গেল, আর আদর্শ না

পাওয়া প্রযুক্ত সমাধান হইল না।" এই মন্তব্য হইতে আদর্শ পুঁথির অপ্রাপ্যতা সূচিত হইতেছে, সুতরাং যে দুই একখানি অশুদ্ধ আদর্শ প্রচলিত ছিল তাহা হইতে সকলেই নকল করিয়া একই রূপ প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। এই ভ্রান্তির ব্যাপকতা হইতে আর একটি অনুমান করা যাইতে পারে। তাহা এই যে প্রহলাদ নামটি যাত্রা-কথকতার মাধ্যমে আমাদের নিকট যত সুপরিচিত ও তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, হয়ত বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ইহাদের আবির্ভাবের পূর্বে নামটি ততটা লোকসমাজে প্রচারিত ছিল না, কাজেই এ বিষয়ে এইরূপ ব্যাপক ভ্রান্তির সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। এই পর্যায়ের কোন কোন পুঁথিতে মল্লভূমের মহারাজা বীরসিংহ কর্তৃক বিষ্ণুপুরে মদনমোহন-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় উল্লেখ মল্লভূম রাজবংশের সহিত কবির ঘনিষ্ঠতার কথা জানায় ও ইহা যে কবির পরিণত বয়সের রচনা তাহা প্রমাণ করে। 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' সম্বন্ধে আর একপ্রকারের ভ্রান্তি দেখা যায়—ইহা ভাগবতের স্কন্ধ-উল্লেখ-সম্বন্ধীয়। সমাপ্তি-সূচক ভণিতায় কবি যে সপ্তম, অষ্টম বা দশম স্কন্ধ হইতে অনুবাদ করিতেছেন, বিভিন্ন পুঁথিতে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতেও অনুলেখকগণের মধ্যে ভাগবত-জ্ঞানের অনিশ্চয়তাই প্রমাণিত হয়।

কবিচন্দ্র কেবল যে পুরাণ হইতে মুখ্য আখ্যায়িকাগুলি সংকলন করিয়া তাহার উপর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, ভক্তিরস-উদ্বোধক, অজ্ঞাত আখ্যানও তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল। কপিলা-মঙ্গল কাহিনী (৬৪-৭০), ফলভক্ষণ (২৪১) ও ভরত-উপাখ্যানের (৩৪২) উপরও তাঁহার রচিত পালা আছে। কপিলা-মঙ্গলের একখানি পুঁথিতে (৬৯) বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ মদনমোহন দেবেরও একটি সুদীর্ঘ বন্দনা-গীত দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুর রাজবংশের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার নিদর্শনস্বরূপ ইহা তাঁহার উত্তর জীবনে সংকলিত কোন পুঁথিতে সংযোজিত ও সেই আদর্শ হইতে অনুলিখিত হইয়া থাকিবে। ভরত-উপাখ্যানের পুঁথিটি এই সংগ্রহের মধ্যে প্রাচীনতম, ইহা ১০৪৫ সালে পাত্রসাএর গ্রামে লিখিত হইয়াছিল।

দুইটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে লিখিত ও সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বিষয়ের উপর রচিত কবিতা কবিচন্দ্রের কাব্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাদের

নাম কাপাসে গুরুদক্ষিণা (৮৪-৮৫) ও মশার কবিতা (২৪৭)। সম্পাদক মহাশয় এই কবিতাদ্বয়কে সাময়িক সমাজ-চিত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রথমোক্ত পুঁথিতে গুরুকে দক্ষিণা দিবার জন্য পাঠশালার পড়ুয়ারা ঘরে ঘরে গৃহিণীদের নিকট কার্পাস ভিক্ষা করিতেছে ও এই উপলক্ষে দানের সুকৃতি-কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ইহা অতীত যুগে বাঙ্গালার বস্ত্র-শিল্পে স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতার ইঙ্গিত দেয়। পুঁথি দুইখানি ১৮৫৯ ও ১৮৬৩ খৃঃ অঃ লিখিত—প্রথমটির ভণিতায় রচয়িতারূপে শঙ্করের নামের উল্লেখ আছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় যে, ৮৫নং পুঁথিটি—শ্রীকেরামত মিঞা, শ্রীকিসমত মিঞা ও শ্রীহিঙ্গুজ খাঁ এই তিন জন মুসলমান লেখকের দ্বারা অনুলিখিত হইয়াছে।

'মশার কবিতা'টি ঈশ্বর গুপ্তের ধরণে লেখা সরস ব্যঙ্গ-কবিতা। ইহার অনুলিখন কাল ১১০২ ও ১২০৫ এই দুই সনের দ্বারাই নির্দিষ্ট হইয়াছে। বোধ হয় লিপিকার বর্তমান পুঁথিটি ১২০৫ সালে নকল করিবার সময় আদর্শ পুঁথির তারিখ যে ১১০২ ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন। পরবর্তী তারিখ লইলেও ইহা ঈশ্বর গুপ্তের বহু পূর্বের কবিতা। 'অঙ্গদের রায়বার' ও 'কুম্ভকর্ণের রায়বারে' কবিচন্দ্র শঙ্কর যেরূপ ব্যঙ্গ-রচনা-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তীক্ষ্ণ উত্তর-প্রত্যুত্তর-গ্রন্থনে যেরূপ সিদ্ধহস্ততার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে 'মশার কবিতা' তাঁহার রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। যদি ইহা তাঁহারই রচনা হয়, তবে ইহা তাঁহার মনীষার বহুমুখীনতার একটি সুন্দর নিদর্শন। কবিতা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, পাঠক ইহা হইতে কবির সরস বাক্-চাতুর্য ও কৌতুকরস-সৃষ্টিতে দক্ষতার পরিচয় পাইবেন।

লোকের দৈবের দশা, বিধাতা সৃজিল মশা,
কীটরূপে আল্য পৃথিবীতে।

জতেক লোকের হিংসা, কর‍্যা বুলে নির্বংশ্যা,
উপায় নাহিক নিবারিতে॥

পঞ্চশব্দ বাদ্য করে, যখন আসিয়া পড়ে,
ডাকাতি পড়ে স্যা জেন রাতে।

মশা কিবা মন্ত্র জানে, হরি-নাম দেই কানে,
তাড়ালে সেহো নাই চায় যাতে॥

তাড়ালে না যায় ভাড়্যা খায় গ্যা কাপড় কুড়্যা,
জিঞা জেন নিঞা উঠে হাল।
বিউনি পাখাতে কিবা করে না মানে তুষের ধুঙা
হাতী হেন জন্তু পড়ে।
ধরে গ্যা বাঘের ঘাড়ে, মহিশ কাঁপয়ে মশার ডরে,
মশার কথা কি কহিব এক মুখে॥
ঘোড়া দিয়া কুলি গায়, গোরু নাচে চারি পায়,
ছাগল ফিরচে পাকে পাকে॥
সবাই মশার ডরে, মশারি খাঁচায় ঘরে,
গোরিব-গুরুবা খাটায় টোনা।
শিপাই? মশার ডরে, সদাই কাকার? করে,
শিরেতে ঢাকিয়া থাকে সানা॥
মশা কোথা থাকে আড়ে উড়ে, দাড়িতে কামড় ঝাড়ে,
পায়রা সামায় যেন খোপে।
বলে মশা ক্রোধ হয়্যা, শুনরে নাপিত ভায়্যা,
তোরে খাল্যে রাখে কোন বাপে।
তোমার এমন·· না দেখিয়া বিশ খান,
তুরিতে পেলাগে······দাঁড়ি।
ভোজনের কাল হইতে,······জল খাতে,
হাত নিবারণ হোল্য ঝারি॥
মশা কোথা থাকে আড়ে ওড়ে, দাঁড়িতে প্রবেশ করে,
দুহাত দেখিল যখন জোড়া।
ঝাড়ি থুয়্যা জল খাতে, মশাত পালিয়া গেল,
সেই মশা হারামজাদের গড়া।
ভাদ্র মাসে নিড়া কাড়া, পিতঞ্জিরা? লক্ষ্মী-ছাড়া,
তারে জধৈষ্ট? (যথেষ্ট!) করিয়া খায় রাতে॥
ঢাকপারা পেট কর্যা, থাকেন উদর পুর্যা,
মশাতে না দেই নিদ্রা জাতে

হাতুড়্যাতে হাত দেখ্যা, তখন বলিছে ডাক্যা,
ঔষধ কর্য্যাছে তোর পেটে।
যতন করিব আমি, ভাল নাই হবে তুমি,
যম ধর্য্যাছে তোর জটে॥
রোগ আছে যত তত, ঔষধ আছে তার মত,
মশার ঔষধ কোথাও নাঞি।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয়, জানি মোলে মশা হয়,
পুরাণে শুন্যাছি সর্ব্ব ঠাঞি॥"

'কাপাসে গুরুদক্ষিণা' কবিচন্দ্রের রচনা কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবসর আছে। ভণিতাতে কেবল মাত্র শঙ্কর এই নাম হইতেই কবির ব্যক্তিত্ব-নির্ধারণ অনিশ্চিত। বিশেষতঃ কবিচন্দ্রের রচনা ১৮৫৯ খৃ: অঃ পর্যন্ত কেন অনাবিষ্কৃত থাকিবে তাহার কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে অন্যান্য পুঁথিশালার সংগ্রহ হইতে প্রাচীনতর কালের কোন পুঁথির সমর্থন না পাইলে ইহাকে কবিচন্দ্রের রচনা বলিয়া স্বীকার করা হঠকারিতার পরিচয় দেওয়া হইবে।

সে যাহা হউক, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর বিপুল ও বিচিত্র রচনাসম্ভার যে বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য, ও মধ্যযুগের সাহিত্যে কবির স্থান-নির্দেশ যে একান্ত প্রয়োজনীয় সেবিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এইবার পুঁথি-সংগ্রহ-সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচয় ও ইহাদের মধ্যে সামাজিক প্রতিবেশের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। পুঁথিগুলি প্রায় সমস্তই বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক পুঁথি (৩১ খানা) পাওয়া গিয়াছে বীরসিংহ গ্রাম হইতে। এই গ্রাম পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থানরূপে বাংলার সামাজিক ও সাহিত্যিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয়তা অর্জন করিয়াছে। রাজ্যশাসন-ঘটিত ভূমিবিন্যাসে ইহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বিষ্ণুপুরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলভুক্ত। এই গ্রামে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের মধ্যে পুঁথি নকল করাইবার যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। বীরসিংহের পর বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের, সোনামুখি, ইন্দাস ও বিষ্ণুপুর প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও

বাঁকুড়া-বর্ধমানের সীমান্তে অবস্থিত খণ্ডঘোষ এবিষয়ে অগ্রণী। বীরভূমের মধ্যে দুবরাজপুর ও ইলামবাজারের নাম কোন কোন পুঁথিতে দেখা যায়। একখানি পুঁথি (২৪) কলিকাতা শহরের কলিঙ্গা গ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এখন যে কলিঙ্গা-অঞ্চল কলিকাতার ফিরিঙ্গি-পাড়ারূপে অঙ্গীভূত, তখন (১১৯৮ সন বা ১৭৯১ খৃঃ অঃ) তাহা কলিকাতার উপকণ্ঠে একখানি স্বতন্ত্র গ্রামরূপে পরিচিত ছিল। যে সমস্ত অন্যান্য ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইতে পুঁথি সংগ্রহ করা হইয়াছে সেগুলিও খুব সম্ভবত বর্ধমান-বাঁকুড়া অঞ্চলেরই অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত অখ্যাত, সংস্কৃতিকেন্দ্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত গ্রামে প্রাচীন পুঁথির প্রাপ্তি বাঙালীর গ্রামীণ সভ্যতা ও তাহার অস্থি-মজ্জাগত সাহিত্যানুরাগের উজ্জ্বল নিদর্শন।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সাহিত্যপ্রীতি শুধু উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমাজের মধ্য ও নিম্নস্তরেও ইহা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল। হয়ত প্রীতিটা বিশুদ্ধ সাহিত্যিক ছিল না; ইহার সঙ্গে একটা গভীর ও বদ্ধমূল ধর্মসংস্কার, পারলৌকিক কল্যাণের আশা ও কামনা জড়িত ছিল। তাহা হইলেও কাব্যের সহিত ধর্মবিশ্বাস ও কল্যাণবোধের এই অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সামাজিক শৃঙ্খলা ও হিতের দিক দিয়া যে অশেষ মঙ্গলের হেতু ছিল তাহা সহজেই অনুমেয় এবং যে সমাজ-নেতাদের চেষ্টায় এই সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাঁহাদের দূরদর্শিতা ও সমাজ-হিতৈষণা আমাদের নমস্য। এই পুঁথিগুলির অধিকাংশ মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের অধিকারে ছিল; বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। হয়ত ইঁহারা কাব্য রচনা করিয়া তাঁহাদের সারস্বত সাধনার পরিচয় দিতেন, কিন্তু পুঁথির রক্ষণ, অনুলেখন ও বহুলীকরণের দায়িত্ব সমাজের নিম্নতর স্তরগুলির উপরেই ন্যস্ত ছিল। পুঁথির মালিকদের নাম হইতেই এই সমাজ-তত্ত্বটি পরিস্ফুট হইবে। মধুসূদন রজক (১২০), কেনারাম বাএন (১৩৩গ), মোহন কলু (১৪৯), লক্ষ্মণ দাস তাঁতি (১৪৮), নবীন বাগদি (১৭০), দামোদর বাউড়ি (১৮৬), প্রেমচাঁদ স (১৮৯), গোপাল গরাঞি (১৯৩), শ্রীদামু বাউড়ি (২০৬, ২৭০), প্রসাদ ভূঁই (২৫০), কাশীনাথ ভূঁই (২৪২ক) প্রভৃতি তথাকথিত নিরক্ষর ও নিম্নশ্রেণীভুক্ত সাহিত্যানুরাগিবৃন্দ ভূগর্ভ-প্রোথিত ভিত্তি-প্রস্তরের ন্যায় বাংলা সাহিত্যের এই বিরাট সৌধকে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহারা

নিজে লিখিতে জানিতেন না বলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ বর্ণের লেখকের দ্বারা পুঁথিগুলি নকল করাইয়া সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদেরই যত্ন ও অনুরাগের ফলে আজ এগুলি উদ্ধারিত হইয়া ভবিষ্যৎ সাহিত্য-ঐতিহাসিকের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। জানি না, অন্য কোন দেশে অশিক্ষিত জনসাধারণের সহযোগিতায় প্রাচীনসাহিত্য-রক্ষণের এরূপ ব্যবস্থা ছিল কি না। মনে হয় যেন চৈতন্যদেবের আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রেম-ধর্ম-প্রচারের ফলে ইঁহাদের ভক্তি-আর্দ্র চিত্তক্ষেত্রে সাহিত্যানুরাগের বীজ উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইয়াছিল। কারণ যাহাই হউক, ইঁহাদের কাব্যপ্রীতি অশেষ কল্যাণকর ও সর্বথা অভিনন্দনযোগ্য।

লেখকবৃন্দ অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণভুক্ত ছিলেন। কোন কোন লেখক একাধিক পুঁথি নকল করিয়াছেন; মনে হয় যেন ইঁহারা পুঁথি নকল করা পেশারূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীউমাচরণ সরকার, সাকিম ধর্মপুর বীরসিংহ গ্রামের বিভিন্ন ব্যক্তির আটখানি পুঁথি নকল করিয়াছিলেন—ইঁহার নকলের তারিখ বাংলা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ৪৯ সংখ্যক পুঁথির লেখক একজন মুসলমান, শ্রীসেখ জাদু সরকার, সাকিম মীরপাড়া, পরগণা চাকুন্দানগরী। 'কাপাসে গুরুদক্ষিণা' ৮৫নং পুঁথির তিনজন লেখকই মুসলমান ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। চক্রদহ-নিবাসী জনার্দন দাস বা সরকার, কসবা নিবাসী রামধন সিংহ, ইন্দাশ-নিবাসী মথুর বিশ্বাস, হাজরাবাদ-নিবাসী ব্রজ-কিশোর ঘোষ প্রভৃতি একাধিক পুস্তকের লেখকরূপে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। ক্বচিৎ ব্রাহ্মণ লেখক ও পাঠকের সন্ধান পাওয়া যায়।

সংগৃহীত পুঁথিগুলির মধ্যে অনেকগুলি বাংলা একাদশ শতকের লেখা। প্রাচীনতম পুঁথি (২৪২) ভরত উপাখ্যান ১০৪৫ সালে পাত্রসায়েরে লেখা। "পাঠক শ্রীপ্রিয়রাম কর, সাকিম পাত্রসায়ের। লিখিতং শ্রীবলরাম দাস, সাকিম নিজ গ্রাম। ইতি সন ১০৪৫ সাল, বিঃ তারিখ ২৩শে আষাঢ়, রোজ রবিবারের বেলা দুই দণ্ড থাকিতে শ্রীরত্নেশ্বর মদকের উত্তর দ্বারে পিড়াতে সংপূর্ণ হইল।" ইহার পরেই কুম্ভকর্ণের রায়বার-বিষয়ক ৮৮নং পুঁথি ১০৫০ সালে দুবরাজপুরে লিখিত হইয়াছে—"লিখিতং শ্রীআনন্দীরাম দেবশর্ম্মা। সাকিম……পঠনার্থ শ্রীপাঁচু দে, সাকিম দুবরাজপুর। ইতি সন ১০৫০ সাল, তারিখ ৫ চৈত্র।" এই অনুলিখন একটি পবিত্র ধর্ম-কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত, ও সমাপ্তিকালে লেখক ও

পাঠকের তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ আনুষঙ্গিক খুঁটি-নাটি তথ্যের সযত্ন সমাবেশে কৌতূহলোদ্দীপকভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিত। মজার কথা এই যে কাব্য রচনার সময় যে ইতিহাসবোধ সুপ্ত থাকিত অথবা তির্যক, দুর্বোধ সংকেত-রহস্যে আত্মগোপনশীল ছিল, তাহা নকলের সময় তীক্ষ্ণভাবে জাগ্রত হইত। এই তথ্যসমাবেশে ব্যগ্রতার দুই একটি কৌতুককর উদাহরণ দিতেছি। ১৩৬নং দাতাকর্ণ পালার লেখক হারাধন কর গ্রন্থ-সমাপ্তিকালে লিখিতেছেন :

'পুস্তক লিখিতে আমি সত্যণত্য (যত্বণত্ব) নাহি জানি।
যে জন পড়িবে পুস্তক, কহিবে শুদ্ধ বাণী॥
শ্রীহারাধন কর, সেই দেশড়াতে ঘর।
পাঠক পোঠ্যা সেই, প্রভু দিবে বর॥
বার সত্ব (শত) পঞ্চাশ সাল শুন সর্বজনে।
এই পুস্তক সারা হইল ফাল্গুনের ছয় দিনে॥

আর একজন উৎসাহী পুস্তক-সংগ্রাহক শ্রীরামমোহন নন্দী নিজ বাসস্থানের চৌহদ্দি-সমন্বিত বর্ণনা দিতেছেন (১৫৭)। "পরগণে বিষ্ণুপুর, চৌকী রাধানগর, সামিল মৌজে বীরসিংহা শিবতলার পূর্বাংশে, নন্দীদিগের বাড়ীর উত্তর অংশে, নবীন চক্রবর্তীর বসত বাড়ীর দক্ষিণ, রামমোহন নন্দীর বাড়ী জানিবে।"

১৮২নং পুঁথির লেখক পুঁথি-অপহরণের বিরুদ্ধে দিব্য দিয়া বলিতেছেন :

"যত্ন করি এই পুঁথি করিলাম লিখন।
ইহা যদি চুরী করি লয় কোন জন॥
মাতা তার শূকরী হয়, জনক শূকর।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ তাহার উপর॥"

(১২২২ সাল, তাং ২০ ভাদ্র)

"এ পুস্তক (২৪০) সাঙ্গ হয় রবিবার দিবসে, বেলা দুই প্রহরের ওক্তে। শ্রীগোসাঞী দাস। নতুন উত্তর দরজা ঘরেতে বসিয়া, তেখন ঘরের চৈদিওার দেওাব? (চৌদিকের দেওয়াল) হইয়াছে এবং কাষ্ঠ চড়েচে। আসন কম্বলেতে বসিঞা উত্তর মুখে পুস্তক সাঙ্গ। ইতি সন ১১১৫ সাল, তারিখ ২ ফাল্গুন।"

এখানে পুণ্যব্রত-উদ্‌যাপনের আনন্দ আবেষ্টনের খুঁটিনাটি-বর্ণনার ভিতর দিয়া যেন উপচাইয়া পড়িয়াছে। এই কৃতকৃতার্থ লেখকের মনে চারিদিকের দৃশ্য কেমন উজ্জ্বলভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে! এই পুণ্যের ছটা যেন নবনির্মি

গৃহটিকে দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে! সাধুভাষায় ক্রিয়াপদ (হইয়াছে) 'হইতে' কথ্যরূপের ক্রিয়াপদে (চড়েচে) পরিবর্তন হৃদয়ের অকৃত্রিম আবেগের জন্যই ঘটিয়াছে। এই উচ্ছ্বাসের মধ্যে পুস্তক-লেখাকালীন মনোভাবটি চমৎকারভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এই পুস্তক (২৪৬)· "এখানে পাত্রসাএর পাঠশালে বসিয়া লিখি দিলাম, চৌপাড়ি শ্রীজগন্নাথ ধোবার উঠনে।" ইহাতে মনে হয় ধোবার উঠানেই পাঠশালা বসিত এবং সেই পুণ্যেই ধোবার নাম গ্রন্থ-লিখনের সহিত চিরতরে সংযুক্ত হইয়া রহিল! ২৮৩নং মহাভারত আদিপর্বের পুঁথি-লেখক শ্রীরামমোহন দাসের, "সাং কনকপুর পরগণে হাবেলি, সাদিপুরের নিকট এক পোয়া হয় না হয়", সমাপ্তিসূচক মন্তব্য :

পুস্তক লিখিয়া মনে আনন্দ জন্মিল।
যতন পূর্বেতে তেঁই লিখিয়া রাখিল॥
কেহ যদি লয়্যা যায় পুস্তক লিখিতে।
লিখিয়া সত্বরে আনি দিবে সুনিশ্চিতে॥
আমার পুস্তক যেই জন হরিবেক।
তাহার বাপের মুখে বিষ্ঠা পড়িবেক॥
অনেক যতনে আমি লিখিলাম পুস্তক।
শুনহ লিখিতে হৈল যতেক যে দুখ॥
কুড়ি পাত সাগর যুগী লিখিতে দিয়াছিল।
তার পর এক পাত (ও) লিখিতে না দিল॥
পারুলাতে লিখিলাম ডেড় শত পাত।
তাহাতে যতেক দুঃখ জগত বিখ্যাত॥
আঙ্গুল-হাড়া হইয়া তিন মাস দুঃখ পাইনু।
এতেক দুঃখ যে ভাই তোমারে কহিনু॥
তেই পাকে বলি পুঁথি কেহ না হরিবে।
হরিবেক যে জন সে নরকে পড়িবে॥

যথাদিষ্ট···ইতি তারিখ ১৮ই পৌষ, রোজ মঙ্গলবার, দুই প্রহরের সময় সমাপ্ত। ইতি শকাব্দা ১৭২০।

এই কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনার মধ্যে সরল, ভক্তিপ্রবণ, আনন্দোচ্ছল মনের কি স্বচ্ছ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে! দেখা যাইতেছে যে, দেড় শত বৎসর পূর্বেও

পুস্তক-অপহরণ-ভীতি ও চাহিয়া ফেরৎ না দেওয়ার রীতি বর্তমান সময়ের মতই প্রবল ছিল। বিশেষতঃ তখন পুঁথির মায়া ও মূল্য এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। এই মমতাধিক্যের জন্যই অভিশাপ শালীনতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। গ্রন্থ-লিখনের দুরূহতার কথাও সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে—দাতার কার্পণ্যহেতু কাগজের অভাব, কাগজ-সংগ্রহে দুঃখ, অঙ্গুলির অত্যধিক চালনায় ক্ষতের উদ্ভব ইত্যাদি কোন খুঁটি-নাটিই লেখক বাদ দেন নাই। যে সাগর যুগী কুড়ি পাতা কাগজ যোগাইয়া লিখনের প্রেরণা দিয়াছিল, অথচ সেই প্রেরণাকে সার্থক করিবার সুযোগ দেয় নাই, অর্থাৎ যে গাছে চড়াইয়া মই সরাইয়া লইয়াছিল, সে আশীর্বাদ অথবা অভিশাপের পাত্র তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। লেখক তাহার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াও তাহাকে স্মরণীয়তার বর দান করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত মুখরতার, আত্মপ্রকটনের এই প্রেরণার মূলে আছে পুণ্য কর্মসমাপ্তির আনন্দ—এই আনন্দোচ্ছ্বাসের ছোটখাট তরঙ্গগুলিই লেখক তথ্যের শীকর-বর্ষণে বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। যে দেশে পরের পুঁথি নকল করিয়া লোকে আনন্দ পায়, যে লোকশিক্ষায় এই আনন্দ সম্ভব, উভয়ই ধন্য।

আদিপর্ব মহাভারতের আর একখানি পুঁথিতে (২৮৪) একটি কৌতুকজনক ব্যাপার দৃষ্ট হয়। পুঁথি-লিখনের তারিখ ১২০২ সাল, লেখক শ্রীগণেশদাস দত্ত সাং আকুই। পাঠনার্থে শ্রীহরিচরণ দে, সাং জোতবিহার পরগণে সাহাজাদাপুর। লেখক ও মালিকের নামের পর লেখকের একটি মন্তব্য সংযোজিত হইয়াছে। "এ পুস্তকের দক্ষিণা শ্রীহরিচরণ দাস দে সাসুড়্যা হইয়াছেন, তাহার সাক্ষী শ্রীগোকুলদাস দে ও শ্রীগৌরাঙ্গদাস দে ও শ্রীপ্রসাদদাস দে ও শ্রীকাশীনাথ দে ও শ্রীকমলাকান্ত দে।" ইহা হইতে মনে হয় যে, লিখনের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে লেখক ও পাঠকের মধ্যে মনান্তর হইয়াছিল ও পাঠক প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক দেন নাই। তজ্জন্য তাঁহাকে সাক্ষীর সমক্ষে সাসুড্যা অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীগমনের পাপীরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। তৎকালীন সমাজে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের উপর কিরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হইত ও ইহা জনসমাজে কিরূপ হেয় বিবেচিত হইত ইহা তাহারই একটি কৌতুকাবহ নিদর্শন।

২৯২ সংখ্যক কাশীদাসী মহাভারতের আদিপর্বের পুঁথির শেষে নিম্নোদ্ধৃত রচনাটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুঁথিখানির পত্রসংখ্যা—৩০৭, পরিমাণ—১৪$\frac{1}{2}$ × ৫, পংক্তি—১০, সন ১১৮৬ সালে সমাপ্ত হৈল, ২৫ ফাল্গুন, অমাবস্যা দিন।

আদিপর্ব আরম্ভ করিলাম লিখিতে।
প্রথমে লিখিলাম পুঁথি পঁচাশী পৌষেতে॥
পূর্ণ হইল ছআশি ফাল্গুনের শেষে।
সমাপ্ত করিনু পুথি সপ্তদশ মাসে॥

হিসাবে একটু গোল দেখা যাইতেছে। ১১৮৫ পৌষে আরম্ভ করিয়া ১১৮৬ ফাল্গুনে শেষ করিলে মোট সময় ১৪ মাস হয়, ১৭ মাস নহে। বোধ হয় পুনঃপরীক্ষা (revision) ও সংশোধন প্রভৃতিতে আরও তিনমাস লাগিয়া থাকিবে। ৩০৭×১০ বা ৩০৭০ পংক্তি লিখিতে ১৪ মাস লাগিলে প্রতিদিন গড়পড়তা ৭ পংক্তি করিয়া পড়ে। এই হিসাবে প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির পাঠোদ্ধারে যে সময় লাগিত তাহাও গণনা করা উচিত। তথাপি মনে হয় যে, অনুলিখনের গতি অতি মন্থর ছিল ও ঠিক নিয়মিতভাবে প্রতিদিন লেখা হইত কি না তাহাও সন্দেহের বিষয়।

লেখক নিজের নিম্নোক্ত বংশপরিচয় দিয়াছেন:

শ্রীযুক্ত শচীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় গুণের নিধান।
তার পুত্র বলরাম বড় গুণবান্॥
তস্য পুত্র কৃষ্ণরাম বড় ভাগ্যবান।
তার পুত্র হাড়োরাম দেশেতে বাখান॥
তস্য পুত্র শ্রীপরীক্ষিত,—তিন সহোদর॥
তার পুত্র রামপ্রসাদ তিনের পেয়ার॥
শিবপ্রসাদ রাএ কৃষ্ণ তুমি দিয় আয়ুদান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

এই পুঁথি শ্রীরামপ্রসাদ রায়ের লিখন এবং তার পুঁথি। কেগ্নাতে? বসিয়া লিখিলাম। এই পুথি যে চুরী করিবেক, সেই অধম দুরাচার পাপিষ্ঠ, নরাধম, তাকে কৃষ্ণের দোহাই। এই পুঁথির লেখকের সঙ্গে নিতান্ত আকস্মিকভাবে ৩৬৬নং উদ্যোগপর্বের এক তারিখহীন পুঁথির সংযোগ ঘটিয়া গিয়াছে। এই শেষোক্ত পুঁথিটির মধ্যে ১০৯৬ সালের তারিখযুক্ত একটি হিসাবের পত্র পাওয়া গিয়াছে—তাহা 'শ্রীপরিক্ষিত রায়ের মাতার কার্য্য'-বিষয়ক। এই পরীক্ষিত রায় ২৯২ নং পুঁথির লেখক রামপ্রসাদ রায়ের পিতার সহিত এক ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হয়। রামপ্রসাদ গ্রন্থ শেষ করেন ১১৮৬ সালে, ও তাঁহার পিতামহীর শ্রাদ্ধ

অনুষ্ঠিত হয় ১০৯৬ সালে—উভয় ঘটনার ভিতর ৯০ বৎসরের ব্যবধান। যদি অনুমান করা যায় যে, পরীক্ষিতের নিতান্ত শৈশবকালে (১০ বৎসর বয়সে) তাঁহার মাতা পরলোকগমন করেন ও তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় জন্মগ্রহণ করেন, তবে মহাভারত লেখার সময় রামপ্রসাদের পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইতে পারে। এই অনুমান যে অসঙ্গত নয়, তাহার সমর্থনে দুইটি যুক্তি দেখান যায়। প্রথমতঃ, রামপ্রসাদ নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "তস্য পুত্র শ্রীপরীক্ষিত তিন সহোদর। তার পুত্র রামপ্রসাদ তিনের পেয়ার॥" অর্থাৎ তিনি তাঁহার পিতা, পিতৃব্য সকলেরই অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইহাতে মনে হয় যে, পরীক্ষিতেরা তিন সহোদর অপুত্রক ছিলেন ও পরীক্ষিতের পরিণত বয়সে জাত পুত্রটি পরিবারের সকলেরই আদরের পাত্র হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, রামপ্রসাদও অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে মহাভারত লিখেন, কেননা তখন তাঁহার পুত্র শিবপ্রসাদ বর্তমান ও ইহার দীর্ঘজীবনের জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন। যদি শ্রীপরীক্ষিত গ্রন্থ-লিখনের সময় জীবিত ছিলেন, তবে অবশ্য তিনি শতবর্ষ অতিক্রম করিয়াছিলেন ইহা স্বীকার করিতে হয়।

এই গ্রন্থ-তালিকা-প্রণয়নের মাধ্যমে আমরা দুই-তিনশত পূর্বেকার বাঙ্গালা সমাজজীবনের যে পরোক্ষ পরিচয় পাইলাম তাহা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনই আমাদের পূর্বপুরুষের গৌরবের পরিচায়ক। আমরা আধুনিক যুগের নৈতিক বিশৃঙ্খলা ও ধর্মবোধক্ষীণতার মধ্যে ইহাতে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারি। এই পুঁথির বিবরণীটি প্রকাশ করিয়া বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি যে বাংলা সাহিত্যের উপর নূতন আলোকপাত করিলেন তাহার জন্য ঐ প্রতিষ্ঠান আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। এই উপলক্ষে যাঁহার উৎসাহে ও বদান্যতায় এই পুঁথি-সংগ্রহ সম্ভব হইয়াছে, সেই দীঘাপতিয়ার স্বর্গীয় কুমার শরৎকুমার রায়ের নাম সশ্রদ্ধ স্মরণযোগ্য। আমরা সর্বান্তঃকরণে আশা করি যে, এই পুঁথিগুলি হইতে যে নূতন উপকরণ পাওয়া যাইবে তাহার অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক অজ্ঞাতপূর্ব অধ্যায় অবিলম্বে রচিত হইবে।

কবিয়াল ও কবিগান

১

কবিগান বাংলা সাহিত্যের একাধারে লজ্জা ও গৌরব, বঙ্গসরস্বতীর ভালে একসঙ্গে কলঙ্কচিহ্ন ও চন্দনতিলক। একদিকে কুরুচি ও অশ্লীলতার জন্য ইহা শিষ্টসমাজে নিন্দাভাজন, অপর দিকে অশিক্ষিত, প্রাকৃত জনসাধারণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বশক্তি, অকৃত্রিম ভক্তিরস ও বাদ-প্রতিবাদে সপ্রতিভ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য ইহা আমাদের বিস্ময়াশ্রিত প্রশংসার অধিকারী। কবিয়ালদের কুরুচির জন্য ইহারা ততটা দোষী নহে; আসল অপরাধ অশ্লীলরসভোগী, কুরুচির প্রশ্রয়দাতা সমকালীন সমাজ। তৎকালীন সমাজের মনোরঞ্জনের জন্যই ইহাদের আসরে খেউড় গাহিতে হইত। উচ্চরসের গান গাহিলে শ্রোতৃসমাজ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত। কেষ্টা মুচির কাল-কোকিলের উল্লেখযুক্ত শ্রীরাধার বিরহ-সঙ্গীতের প্রতি যে প্রাকৃতরুচিসম্পন্ন শ্রোতা প্রতিবাদ জানাইয়াছিল সে সে যুগের শ্রোতৃসমাজের যথার্থ প্রতিনিধি। নাচের আসরে নামিয়া ঘোমটা দেওয়া যেমন নিরর্থক, কবিগানের গাঁজান রসের মজলিশে রুচিবিশুদ্ধির আড়ম্বর তেমনি অপ্রাসঙ্গিক। বিশেষতঃ প্রতিযোগিতামূলক পালাগানে প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু উপায় হইল অশ্লীল গালিগালাজের মাত্রা চড়ান। চড়া সুর আর কড়া খেউড়—এই ছিল কবিয়ালের তূণীরে সর্বাপেক্ষা শাণিত অস্ত্র। মিহি সুর ও সুরুচির মাত্রারক্ষা ছিল পরাজয়ের সর্বস্বীকৃত আত্মঘোষণা। কাজেই কুরুচির জন্য নিন্দা কবিয়ালের ঠিক প্রাপ্য নহে, উহা সঙ্গীত-প্রথা ও সমাজের প্রত্যাশা ও চাহিদারই প্রত্যক্ষ ফল। ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধে সূক্ষ্ম কলাকৌশলের বিশেষ কোন স্থান ছিল না। কর্দম-নিক্ষেপ উৎসবে অভ্রান্ত লক্ষ্য ও মাপসই টিপ পরাইবার নৈপুণ্য কেহই প্রত্যাশা করিত না।

সুতরাং নিন্দার দিকটা বাদ দিয়া প্রশংসার দিকে লক্ষ্যনিবেশ করিলেই অধিকতর লাভবান হওয়া যাইবে। হিসাব-নিকাশে খরচের অঙ্কটা বাদ দিয়া জমার অঙ্কের খোঁজ লইলেই কারবারের যথার্থ পরিচয় মিলিবে। কেননা

লোকসানটা সমাজের খাতায়, আর লাভটা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হিসাবে। সকল দেশেই উচ্চতর অভিজাত সংস্কৃতির একটা নিম্নতম ধারা জনসাধারণের মনে শেষ আশ্রয় পায়—প্রবহমান নদীর পঙ্ক-মিশানো তলানি প্রাকৃতচিত্তে রসের ও ক্লেদের একটা মিশ্র উপাদান যোগান দিয়া থাকে। কিন্তু বাঙলাদেশে লোক-শিক্ষার ব্যাপকতা ও উপায়-বৈচিত্র্যের ও লোকচিত্তের সহজ রস-পিপাসুতার জন্য বাঙালী নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারিত্বের যে অপূর্ব নিদর্শন রক্ষিত হইয়াছে, অন্য কোনও দেশে তাহা বিরল। ইংরেজী সাহিত্যে অভিজাত ও লোককল্পনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুই ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে—উভয়ের মধ্যে সংযোগসূত্র অতি ক্ষীণ। এক ব্যালাড বা গাথা-সাহিত্যে উভয় প্রকার মানস প্রবণতার একটা সমন্বয় বা সংমিশ্রণ দেখা যায়—কিন্তু ইহাতে আদিম কৌম মনের নৈর্ব্যক্তিক, যৌথ রচনা-প্রণালী পরবর্তী যুগের উন্নততর শিল্পবোধের দ্বারা অনেকটা মার্জিত মনে হয়। আর ইংরেজীতে যে অবিমিশ্র লোকসাহিত্য তাহা বাঙলাদেশের শিশুকল্পনামূলক ছড়ার সহিত সমপর্যায়ের—একেবারে অবাস্তব ও অসংলগ্ন ভাবচিত্র-সমষ্টিমাত্র। শেক্সপিয়ার ও এলিজাবেথীয় যুগের নাটকে মাঝে মাঝে ইহাদের খণ্ডাংশের উদ্ধৃতি দেখা যায়; Sir Walter Scott ও Burns-এর কবিতায় স্কটল্যাণ্ডের লোকগাথার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি কখনও কখনও প্রথাগত কাব্যের সুরের সঙ্গে মিশিয়া আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে; ও বিংশ শতকে Yeats ও A. E-.এর কবিতায় Ireland-এর জনশ্রুতি ও অলৌকিক সংস্কারের কিছু নিদর্শন পরিণত কাব্যশিল্পের অন্তরালে অনুভবগম্য হয়। কিন্তু মোটের উপর এই কথা বলা চলে যে, পাশ্চাত্ত্য দেশে লোক-সাহিত্য অভিজাত-সাহিত্যের পাশাপাশি ও উহার অনুকরণাত্মক কোন শিথিলতর রূপে, উহার ভাব ও ভাষা বিকৃত-অপকৃষ্ট রূপে গ্রহণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই।

২

বাঙলাদেশের কবি-সঙ্গীত ও অন্যান্য প্রকারের লোক-সাহিত্য এই পাশ্চাত্ত্য-দেশসুলভ সাধারণ নিয়মের অসাধারণ ব্যতিক্রম। উচ্চতর হিন্দুধর্মের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা, মাতৃপূজা ও পৌরাণিক সংস্কার-চেতনা শিষ্টজনের আভিজাত্য-মর্যাদা-সম্পন্ন ও শিল্পরীতি-পরিশীলিত মহিমা পরিহার করিয়া একেবারে শিক্ষা-

ও-রুচিহীন একদল স্বভাবকবির হাতে একটা অমার্জিত, অথচ অকৃত্রিম-অনুভূতি-লালিত, রাখালিয়া রূপকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অবশ্য রাধাকৃষ্ণ-প্রেম ও মাতৃপূজা আদৌ অনার্যসংস্কৃতিপ্রসূত কি না, পূর্বতন যুগে উহাদের একটা স্থূল, উদ্ভট-কল্পনা-বিকৃত ছাঁচের উপরই সূক্ষ্মতর অনুভূতির প্রয়োগে উহারা বর্তমান শিল্পসৌন্দর্য ও ভাবমহিমায় উন্নীত হইয়াছে কি না এই সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়াও বলা চলে যে, কবিগানের দেবদেবী-প্রশস্তি সেই সুপ্রাচীন যুগের জের নহে, আর্যঋষি ও কবি-উদ্ভাবিত ভাবচর্যারই অনুস্মৃতি। সুতরাং কবিগানের মধ্যে আমরা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর কবির একই বিষয় লইয়া প্রতিযোগিতার যে দৃষ্টান্ত পাই, তাহা বিশ্বজগতের সাহিত্যে অসাধারণ। এই আর্যধর্ম-চেতনা নিম্নতর সমাজগোষ্ঠীর মর্মে এমন গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে যে, উহার আদিম সংস্কারের বিশেষ কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট নাই। এখন ধর্মের সহিত অসংস্পৃষ্ট লোক-কল্পনা বাঙলার কোন কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেমন মানভূমের টুসুগান, কয়লাখনি অঞ্চলের ভাদুগান প্রভৃতি বিরল নিদর্শনের মধ্যে সজীব আছে। কিন্তু সাধারণত বাঙলার নিম্নশ্রেণীর দেব-পরিকল্পনা ও পরলোকতত্ত্ব উচ্চবর্ণ-প্রচলিত ভাবসমুন্নতি ও আবেগবিশুদ্ধির মধ্যে নিশ্চিহ্নভাবে মিশিয়া গিয়াছে। এমন কি রংপুর, কুচবেহার প্রভৃতি স্থান হইতে সংগৃহীত নাথ গীতিকার মধ্যেও নিয়মশৃঙ্খলাহীন, শিশুসুলভ উদ্ভট কল্পনার সহিত পৌরাণিক ধর্মের সারকথা এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে একীভূত হইয়াছে।

এই বিষয়টি ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে বিস্মিত হইবার যথেষ্ট উপাদান আছে। হিন্দুধর্মের সূক্ষ্ম দার্শনিক-তত্ত্বকণ্টকিত, ভক্তি ও আত্মনিবেদনে মধুর ও অধ্যাত্ম সাধনার চরমস্তরে উন্নীত মূল আবেদনটি নিরক্ষর কবিয়ালদের এরূপ অস্থি-মজ্জাগত সহজ সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল যে, তাহারা অবলীলাক্রমে এ সম্বন্ধে স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যরসের পরিচয় দিয়াছে। ব্যাপক অনুশীলন ও ব্যাখ্যার ফলে ধর্মের তত্ত্ব ও ধর্মের আবেগ দুইই তাহাদের এমন অনায়াস-অধিগত হইয়াছিল যে, শিক্ষাদীক্ষার সহায়তা ছাড়াও ইহারা তাহাদের কবিত্বরসস্ফূর্তির অবলম্বন হইয়াছে। ইহা তাহাদের সহজ গানের সুরে, গ্রাম্য সংলাপের ভাষায়, প্রাকৃত জীবন-চর্যার অ-সম্ভ্রান্ত সরলতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী ও শাক্ত কবিতার ভাব ও সুর, অলঙ্কার ও আবেগমাত্রা দীর্ঘ ও অন্তরঙ্গ পরিচয়ের

ফলে তাহাদের এতই আপনার হইয়া গিয়াছে যে, নিজেদের বাগ্‌রীতি ও ঔচিত্যবোধের মাধ্যমে ইহাদের প্রকাশ করিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র কৃত্রিমরীতি-অনুসরণের অসুবিধা হয় না। রাধাকৃষ্ণপ্রেমের মধুর রস হয়ত তাহারা তাহাদের প্রাকৃত চিত্তবৃত্তি দিয়া সহজেই অনুভব করিতে পারে। কেননা, বৈষ্ণব পদকর্তাগণ অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার মধ্যে প্রাকৃতজনসুলভ ইন্দ্রিয়াকুলতা ও শ্লেষতীক্ষ্ণ বাগ্‌বিনিময়ের কিছুটা ছদ্মসারূপ্য ইচ্ছাপূর্বকই রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণচরিত্র যাহাতে সাধারণ বোধের অতীত না হয়, গোপসমাজের রীতি-নীতি ও সমাজ-প্রতিবেশের বহিরাবরণের মধ্য দিয়াই যাহাতে তাঁহার ঐশী লীলা স্ফুরিত হয়, ভক্তি যেন ভালবাসাকে অভিভূত না করে, দেবমহিমার দুঃসহ জ্যোতি যাহাতে নৈকট্যবোধের কাচাধারে স্নিগ্ধ হইয়া দেখা দেয়, ভাগবতকার হইতে পদকর্তাগণ পর্যন্ত সকলেই সেইদিকে বিশেষ অবহিত ছিলেন। সুতরাং সখা-সখী-দূতী প্রভৃতির মধ্যবর্তিতায়, হাস্য-পরিহাসের মনোজ্ঞতায়, প্রাকৃত মান-অভিমান-বিরহ-জ্বালা প্রভৃতির সহ-উপস্থিতিতে রাধাকৃষ্ণপ্রেম অধ্যাত্মলোকের দুরবগাহতা হইতে গ্রাম্য মজলিসের তরল সর্বজনবোধ্য রসোচ্ছলতায় সহজেই নামিয়া আসিয়াছে। বেদব্যাস হইতে কবিয়াল পর্যন্ত উদ্দেশ্যসমতার মধ্যে রুচিবৈষম্যের ক্রমাবরোহণকারী সোপানপরম্পরা বাহিয়া একই প্রক্রিয়ার সূত্রবিধৃতি দুর্লক্ষ্য নহে।

কিন্তু যখন আমরা দেখি যে, শিব, দুর্গা ও কালীর বিচিত্র প্রকৃতি, তাঁহাদের দেবলীলার রহস্যময় বৈপরীত্য সম্বন্ধেও কবিয়ালের বোধশক্তি ও ভক্তিচেতনা সমভাবেই প্রকটিত, তখন আমাদের চমৎকৃতি মাত্রা ছাড়াইয়া উঠে। বিশেষ করিয়া শিব ও কালী পরিকল্পনার মধ্যে যে বিপরীত গুণাবলীর দুরূহ দার্শনিক সামঞ্জস্যবিধান নেপথ্যশায়ী, যে রূপকদ্যোতনা উদ্ভট, বিসদৃশ বেশভূষা-আচরণের নিগূঢ়-মহিমা-প্রকাশক, একজন অশিক্ষিত তরল-আমোদ-বিতরণকারী কবিয়ালের পক্ষে তাহার মর্মানুধাবন আশ্চর্যরূপ সূক্ষ্মানুভূতির নিদর্শন। জন্ম-দার্শনিকের জাতিসম্ভূত না হইলে, যুগযুগান্তর-বাহিত সংস্কৃতি-ধারা শিরাস্নায়ুর রক্তধারার সহিত সংমিশ্রিত না থাকিলে এরূপ দুঃসাধ্যসাধন তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। শিবের যে অংশ নেশা-ভাঙ্গে মশগুল, যে অংশ পরস্ত্রীলোলুপ ও কামোচ্ছল, যে অংশ উলঙ্গ, অসংবৃত, রীতিমর্যাদার উল্লঙ্ঘনকারী ও দারিদ্র্যবিলাসী তাহার সহিতও কবিয়ালের সহজ রক্তসম্বন্ধ। নিম্নবর্ণের বিশেষ রুচি-মেজাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ও তাহাদের বিকৃত ভক্তিক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই ত

উচ্ছৃঙ্খল সমাজের এই ছন্নছাড়া দেবতা, স্বভাবমাতাল গোষ্ঠীর এই ভোলা-মহেশ্বর, অভাব-শীর্ণ ও দাম্পত্যকলহদীর্ণ গৃহস্থালীগুলির এই ঔদরিক ও কোন্দল-প্রিয় নির্লিপ্ত গৃহস্বামী বিশেষভাবে কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই উপহাস্য প্রিয় দেবচরিত্রটির বিরাট, মহিমান্বিত রজতগিরিসন্নিভ উত্তুঙ্গতার দিকটিও তাহাদের অনুভূতিতে সেইরূপ সহজভাবেই প্রতিভাত হইয়াছে। গ্রীক জনসাধারণ সুরাদেব Bacchus-এর পানমত্ত ও দোদুলদেহ রূপটিই মনে রাখিয়াছিল—তাহার মহত্তর, দিগ্বিজয়ী, অমিতশক্তি রূপটি হয়ত কবিকল্পনায় ছিল, কিন্তু জনস্মৃতি হইতে উহা বিলুপ্ত হইয়াছিল। হিন্দু জনসংঘ মহাদেবের দ্বৈতরূপের কোনটাই ভুলে নাই—মানুষের দুর্বলতাকে সে দেবের মর্যাদা দিয়াছে।

বীভৎসরসের প্রতি জনচিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা—এমন কি মধুর রসেও দু'চারি ফোঁটা বীভৎসাতিরঞ্জন না মিশাইলে ইহা স্থূলরুচি সমাজের আস্বাদনীয় হয় না। ব্যাস-বাল্মীকি কুম্ভকর্ণ-ঘটোৎকচ প্রভৃতি চরিত্রের অবতারণা ও রাক্ষস ও বানর সৈন্যের বিবিধ অঙ্গবিকৃতির চিত্রণে সম্ভবতঃ প্রাকৃত-মনোরঞ্জন-উদ্দেশ্যের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। আমাদের দেবমণ্ডলীতে কার্তিকেয় সুঠাম আর্য কল্পনারই অভিব্যক্তি; গজানন গণেশ তাঁহার দেবাগ্রগণ্যতা ও সিদ্ধিদাতৃত্বের মহিমার সহিত প্রাকৃত কল্পনার অনুবর্তনেই কদাকার, নরদেহের সহিত মিলহীন হস্তিমুণ্ডটির সংযোজনা করিয়াছিলেন। কালী বীভৎসতার সহিত মহিমার অপূর্ব সমন্বয়ে উচ্চ ও নিম্ন উভয় বর্ণের নিকটই সমভাবে সংবর্ধনা লাভ করিয়াছেন। উচ্চ বর্ণ ধ্যানানুভূতি ও রূপক-কল্পনার সার্থক প্রয়োগে তাঁহার মধ্যে অসীম রহস্যময়তার ব্যঞ্জনা অনুভব করে। নিম্নস্তরের মানুষেরা কালীর দিগম্বরী, শালীনতালঙ্ঘিনী, অসিতবর্ণা ও রুধিরচর্চিতা মূর্তি দেখিয়াই তাঁহার সঙ্গে একটা সহজ আত্মীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়। তাঁহার চরণে তাহারা যে ভক্তি-প্রণতি জানায় তাহা অভিন্নত্ববোধের চৌম্বক আকর্ষণে আরও মোহময় হইয়া উঠে। সুতরাং কবিয়ালদের গানে কালী-প্রশস্তি যে একটা বড় স্থান অধিকার করে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

৩

এ পর্যন্ত পৌরাণিক দেবদেবী সম্বন্ধে কবিয়ালদের অনুকূল ও গ্রহণশীল মনোভাবের কথা বলা হইল। এখন কবিগানের মধ্যে শিল্পবোধের শিথিলতা

সত্ত্বেও সহজ কবিত্বশক্তির কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিব। বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক ও ভক্তিরসসিক্ত পরিমণ্ডলে যে এত অধিকসংখ্যক নিরক্ষর ব্যক্তির মধ্যে কবিত্বরস ও ভক্তিপ্রবণতার স্ফুরণ সম্ভব হইয়াছিল ইহা বাঙালীর পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। এখানে যে নিম্নশ্রেণীর রচয়িতারা ছেলেভুলান ছড়া, অর্থহীন, অসংলগ্ন চিত্র ও ছন্দ এবং আদিম অপ্রাকৃত কল্পনার পরিবর্তে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব, ভাবসমুন্নতি ও বিশুদ্ধতর অধ্যাত্ম অনুভূতিকে কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা অন্যান্য দেশের তুলনায় একটা প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম। ইংরাজী সাহিত্যে একমাত্র স্কটল্যাণ্ডের কৃষক কবি বার্ণস-ই সূক্ষ্মরুচি, সংস্কৃতিবান লেখক-সম্প্রদায়ের সহিত প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ও তাহাদের নিজের অস্ত্রে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এখন উচ্চ কোটির বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর সহিত তুলনায় কবিয়ালদের এতদ্ সম্বন্ধীয় কবিগানগুলির কাব্যকৃতি বিচার করা প্রয়োজন।

কবিগান সম্বন্ধে একটা কথা মনে করা দরকার—ইহা গানের আসরে গীত হইবার জন্য যথাসম্ভব সত্বর রচিত, ইহা প্রধানতঃ কাব্য নহে, সুরলয়যোগে গানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পরিকল্পিত। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীও গানের মাধ্যমেই উহাদের পূর্ণতম মাধুর্য প্রকাশ করিয়াছে। তথাপি এই গীত-ধর্মিতা উহাদের অত্যাজ্য সহজ ধর্ম নহে, উহাদের কাব্যাবেদনকে ঘনীভূত ও রসভূয়িষ্ঠ করার জন্য পৃথক্-সংযোজিত আয়োজন। পদাবলী রচিত হইবার বহু পরে উহারা কীর্তনের সুর ও ভাবাবেশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বা গোবিন্দদাস সচেতনভাবে সুরশিল্পের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাঁহাদের পদগুলি রচনা করেন নাই। ভক্ত সাধক ও সুরকর্তাদের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও ভাবানুসারী বিস্তারে ইহারা আরও মধুর ও মর্মস্পর্শী হইয়াছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু কবিপ্রেরণায় ভক্তিবিহ্বলতা, কলারসিকতা ও রূপসৃষ্টি ছাড়া আর কোন উপাদানের অস্তিত্ব ছিল না। সুর ও ভাবুকতার সংযোগে সোহাগা-সংযোগে স্বর্ণের ন্যায় উহাদের সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়াছে, কিন্তু ইহা ছাড়াও তাহাদের যে স্বতন্ত্র কাব্যমূল্য ছিল তাহাও বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় অন্যনিরপেক্ষ দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। কীর্তনরীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর যে সমস্ত পদাবলী লেখা হইয়াছে, তাহারা কীর্তন-আসরের প্রত্যাশিত রসোচ্ছলতা

ও ভাবুকতার আবেশ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু প্রথম যুগের পদগুলি সম্বন্ধে এ মন্তব্য প্রযোজ্য নহে। শাক্ত-পদাবলীতে রামপ্রসাদী সুর রামপ্রসাদী কাব্যকলার অবিচ্ছেদ্য অংশ, কিন্তু এখানে শকুন্তলা ও মৃগশিশুর ন্যায় ভাবের আরণ্যকৌ। সরল বৈরাগ্যস্পৃষ্ট সুর অকৃত্রিম ভক্তি-আবেগের একান্ত নিজস্ব বাহন। কাব্যানুভূতির অতিরিক্ত যেন সুরের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই। কিন্তু কবিয়ালের সুর তাহার কাব্যকৃতিকে ছাপাইয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। ভক্তিরসের ঈষৎ আমেজকে অবলম্বন করিয়া, গতানুগতিক বাগ্‌ভঙ্গীর ক্ষুদ্র অঞ্জলিকে ছাপাইয়া কবিয়ালের কণ্ঠনিঃসৃত সুরই প্রধানতঃ রসসৃষ্টির হেতু। এই সুরনির্ভরতার জন্যই কবিগান নিছক কাব্যোৎকর্ষের মানদণ্ডে বিচারণীয় নহে।

কবিগানের সঙ্গীতধর্মিতার নিদর্শন পাওয়া যায় উহার সঙ্গীত-প্রয়োজনানুযায়ী অঙ্গবিন্যাসে। এই জাতীয় গানগুলি প্রথমে নানা অংশে বিভক্ত ছিল,—মহড়া, চিতেন, পরচিতেন, খাদ, ফুকা, মেলান, ধুয়া, পড়তা, অন্তরা প্রভৃতি বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভাগে উহাদের অবয়ব গঠিত হইত। এই বিভাগের প্রয়োজনে উহাদের দৈর্ঘ্যও সাধারণ গান অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। কিন্তু এরূপ পূর্ণাঙ্গ কবিগানের রক্ষিত নিদর্শন খুব বেশী নহে। মনে হয় কালক্রমে এইরূপ নানাপ্রকরণবিশিষ্ট শ্রেণী-বিভাগের অবশ্যপালনীয়তা বিলুপ্ত হইয়া গেল। কবিগান সাধারণ গানের ন্যায় সংক্ষিপ্ত ও দুই তিনটি কলিতে মাত্র সীমাবদ্ধ হইল। গীতপ্রকরণের প্রয়োজনে অঙ্গবৃদ্ধি ও কবিত্বসঙ্কোচের যে ধারা কবিগানে প্রচলিত ছিল তাহা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী না হইয়া উহা সাধারণ গানের লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া উঠিল।

বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর সঙ্গে তুলনায় কবিগান অনেকটা শিথিলগঠন ও অতিভাষণ-প্রবণ। ইহা হওয়াই স্বাভাবিক। শিক্ষিত ও অনুশীলিত কবিমন যত অল্পকথায় ও নিবিড় ভাববন্ধের সহিত ভাব ব্যক্ত করিতে পারে, অশিক্ষিত কবিরা ভাববস্তুর নির্বাচনে ও সংক্ষেপীকরণে তাদৃশ পারদর্শিতা দেখাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ভাবানুভূতি যখন নূতন থাকে তখন উহা নিজ আবেগের আবর্তনছন্দেই নিজের সুঠাম অবয়ব গঠন করে। এই আবর্তনবেগ যখন গতানুগতিকতার জন্য শিথিল ও মন্দীভূত হয়, তখন উহার বক্তব্য বিষয়ের দেহ-পরিধি মাত্রাতিরিক্ত বিস্তারের দিকে ঝোঁকে। কুম্ভকারচক্র বেগে ঘুরিলে

অনাবশ্যক মৃত্তিকাপুঞ্জ গতিবেগেই কাটিয়া যায় ও মৃৎপাত্রের সুডৌল আকার-সুষমা ফুটিয়া উঠে। কবিয়ালগণ অপরের ভুক্ত দ্রব্য আস্বাদনে অভ্যস্ত ছিল বলিয়া উহাদের রচিত গানের রূপ সব সময় সুগঠিত হয় নাই। যখন বিষয়বস্তু অত্যন্ত সুপরিচিত হয়, তখন কবি-কল্পনার সীমালঙ্ঘনের প্রবণতা বাড়ে। কবিয়ালেরা যখন বৈষ্ণব ও শাক্ত-পদাবলীর বিষয় লইয়া লেখে, তখন তাহাদের মনোভাব অনেকটা সূত্রের ভাষ্যকারের বা কীর্তনের আঁখরিয়ার মত—নূতন কথা না বলিয়া পুরাতনের দাগে দাগ বুলাইবার প্রবণতাই তাহাদের বেশী দেখা যায়।

বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর মধ্যে তুলনা করিলেও শাক্ত-পদাবলীর মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার ও শব্দসংযোজনা-বাহুল্য বেশী লক্ষ্য করা যায়। প্রেম অপেক্ষা বাৎসল্য অধিকতর প্রগল্‌ভ ও বহুভাষী। প্রেমের অসাধারণত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, বিশেষতঃ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মধ্যে অধ্যাত্মব্যঞ্জনার ইঙ্গিত উহার প্রকাশকে উর্ধ্বলোকচারী ও সংযতবাক্‌ করিয়াছে। পদগুলির সাধারণ দৈর্ঘ্যও এই মিতভাষণ ও প্রকাশমর্যাদার সহায়স্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু আগমনী ও বিজয়া গানে বাৎসল্যরসের স্বভাব-আতিশয্য, মা ও মেয়ের বাধাবন্ধহীন স্নেহ-উৎসার উহার কাব্যরূপকেও অনেকটা অতিস্ফীত করিয়াছে। রামপ্রসাদী সঙ্গীতের নিগূঢ় তত্ত্বসাধনা, তান্ত্রিক উপাসনার রহস্যময় ক্রমানুসরণ, দুরূহ ব্রতের কঠোর বিধি-পালন ও আকুল অথচ সংযত আবেগ ইহাকে অভিজাত-অনুভূতির উন্নত স্তরে ধরিয়া রাখিয়াছে। রামপ্রসাদের কালীর প্রতি মাতৃ-সম্বোধন আর মেনকার উমার প্রতি স্নেহব্যাকুল ভাবোচ্ছ্বাস ঠিক এক পর্যায়ের নহে; উভয়ের উৎস এক নহে। রামপ্রসাদের ভাব উর্ধ্বাভিমুখী; অনেক বস্তুজগতের বাধা অতিক্রম করিয়া, প্রাকৃত আবেগের সীমা ছাড়াইয়া, সাধনার নিগূঢ় সুড়ঙ্গপথে অলক্ষ্যসঞ্চারিত হইয়া ইহা একটা আপাত-আত্মহারা উচ্ছ্বাস-শীর্ষে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু মেনকার বাৎসল্যরস মাতৃস্তনের ক্ষীরধারার ন্যায় সহজ-উৎসারিত ও গিরিনির্ঝরের ন্যায় সমতলভূমির দিকে মাধ্যাকর্ষণের অনিবার্য বেগে প্রবাহিত। কবিগান এই আগমনী-বিজয়া গানের স্বভাবোৎসারকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে ও উহার কলাগত অসংযমের জন্য এই আদর্শকে আরও বিকৃত করিয়াছে।

এই প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও কবিগান মাঝে মধ্যে বিস্ময়কর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাকে কোনও কোনও কবিয়াল বৈষ্ণবভাব-

পরিমণ্ডলমুক্ত এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়া ইহার মধ্যে এক অভিনব ভাবকদম্বের বিকাশ অনুভব করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবির দৃষ্টি অধ্যাত্মব্যঞ্জনা ও সম্প্রদায়সম্মত ভাবসাধনার উপর স্থির-নিবদ্ধ; তাঁহার কবিয়াল উত্তরসাধকগণ এই প্রেমের নিগূঢ় মানবিকতা ও সার্বজনীন আলোড়নছন্দটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইহারা বৈষ্ণব ভাবধারাকে অতিক্রম করিয়া প্রেমের মনোবিকারের ছবিটি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছে। আদি কবিয়াল গোঁজলা গুঁইএর যে একখানি মাত্র গান প্রচলিত আছে, তাহাতে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের নিবিড় একাত্মতা দার্শনিক তত্ত্বনিষ্ঠা ও কাব্যানুভূতির মিলিত সৌন্দর্যে হৃদয়গ্রাহীরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রাসু-নৃসিংহের কয়েকটি গান বৈষ্ণব প্রেমতন্ময়তার মধ্যে আধুনিক সুর যোজনা করিয়াছে। "বিষাদের বাতি, জ্বেলেছেন শ্রীমতী, তাহাতে আহুতি দিও না" বা

শ্যাম, প্রদীপের আলো প্রকাশ পাইল
চন্দ্রমা লুকাল গগনে।
ও হে গোখুরের জল জগত ব্যাপিল
সাগর শুকালো তপনে।

প্রভৃতি পংক্তিনিচয়ে বৈষ্ণব ভাবনিষ্ঠা আধুনিক অনুভূতির দীপ্তিতে ঝলমল করিতেছে। এই যুগ্ম কবির 'কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা' আত্মনিবেদনের চরম বিশুদ্ধির অভিব্যক্তি। রাম বসুর 'জলে জলে কেগো সখি' কবিতায় কালিন্দীজলে কৃষ্ণপ্রতিবিম্বদর্শনে তন্ময় শ্রীমতীর আর্তি পদাবলীসাহিত্যের বিরাট ক্ষেত্রেও কিছু নূতন অনুভূতির পরিচয় দিয়াছে।

'আচম্বিতে আলো কেন যমুনারি জল।
দেখ সখি, কূলে থাকি
কে করে কি ছল॥'

এই পংক্তি কয়টিতে রবীন্দ্রনাথের ছন্দবিন্যাসের দূরশ্রুত পূর্বাভাস মনকে স্পর্শ করে না কি?

৪

কিন্তু বৈষ্ণব প্রেমভক্তিরসের সার্থক নবরূপায়ণ ছাড়া কবিগানের সত্যকার ভূমিকা আরও তাৎপর্যপূর্ণ ও ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনাময়। ইহা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকে

বৈষ্ণব পটভূমিকা হইতে মুক্তি দিয়া একটা সার্বভৌম প্রেমচেতনার উন্মেষকল্পে প্রয়োগ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবির নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কবিয়াল কিয়ৎ পরিমাণে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে। রাধিকার অন্তরদীর্ণ ব্যাকুলতা নিখিল মানব-মানবীর প্রণয়ার্তিরূপে কবিগানে প্রকাশ পাইয়াছে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা কাব্যের আকাশে-বাতাসে একটা তীক্ষ্ণ, জীবনসমস্যাজটিল, সার্বিক প্রেমসচেতনতা কবিগানে ও নিধুবাবুর টপ্পায় আশ্চর্যভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অধ্যাত্ম প্রেম উহার স্বপ্নময়তা, আদর্শ অভীপ্সা ও রূপকাবরণ ভেদ করিয়া লৌকিক প্রণয়ের প্রখর দীপ্তি, নিষ্ঠুর সংঘর্ষ ও অপ্রশমিত জ্বালা লইয়া অনাবৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এতদিন রাধাকৃষ্ণের বেনামীতে যে প্রেম ভদ্রভাবে চালু ছিল তাহা সমস্ত ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া উহার কলঙ্ক-মহিমামিশ্র স্বরূপ-পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কামকেলিবিলাস সেই একই রুচিপ্রবণতার অন্যরূপ অভিব্যক্তি; তবে বৈষ্ণবদ্বেষী ভারতচন্দ্র রাধাকৃষ্ণের নজীর না দেখাইয়া কালীর অভয় চরণের আশ্রয়ে ও তির্যক্ ভাষণের ইঙ্গিতময় আবরণে কুরুচিপূর্ণ দেহসম্ভোগ-কাহিনীকে ধর্মের আনুকূল্য ও রসিকচিত্তসংবেদ্যতা দান করিয়াছেন।

কবিয়ালদের মধ্যে হরু ঠাকুর ও রাম বসু এই দুইজনই ধর্মসংস্পর্শহীন প্রেমবিবশতার বিচিত্র অবস্থা-বিশ্লেষণে, উহার মান-অভিমান, নৈরাশ্য-নির্বেদ, অতৃপ্তি-অনুযোগ প্রভৃতি মনোভাবের বস্তুরসপ্রধান বর্ণনায় বাংলা কাব্যে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। শ্রীমতীর হৃদয় হইতে আর্তি ও কণ্ঠ হইতে ভাষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা প্রাকৃত নারীর বাস্তব মনোবেদনা-প্রকাশে উহাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, তাঁহাদের কবিতায় প্রেমের আদর্শ, ভাবনিষ্ঠ রূপের পরিবর্তে উহার বাস্তব ক্ষোভ ও জ্বালাই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙলার তৎকালীন সমাজজীবনে এমন একটা উত্তপ্ত, সংঘাতবিক্ষুব্ধ, আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে ধূম্রাকুল ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্ট হইয়া থাকিবে যেখান হইতে এই কবিয়ালের প্রেমগীতিগুলি তাহাদের বাহ্য উপলক্ষ্য ও অন্তর-প্রেরণা আহরণ করিয়াছিল। বৈষ্ণব কবিতার কাল্পনিক ভাবসম্মিলন ও আদর্শবাদমূলক আত্মনিরোধ এই দাহজ্বালাময় পরিবেশে কোন সুলভ সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে পারে নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, হরু ঠাকুর ও রাম বসু উভয়েই কিছু কিছু রাধাকৃষ্ণ-বিরহ-বিষয়ক গান রচনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই অপ্রাকৃত, অতীত যুগের ভাববৃন্দাবনে তাঁহাদের কবিপ্রেরণা সীমাবদ্ধ থাকে নাই। তাঁহার বৈষ্ণব লীলাকুঞ্জের মন্ত্রশান্ত বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া বাস্তব জীবনের অশান্ত, অন্তর্দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ পরিবেশে অবতরণ করিয়াছিলেন ও সেখান হইতেই তাঁহাদের কবিতার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙলা দেশের সমাজে কোন্ দাহ্য পদার্থ হইতে এরূপ তাপ সঞ্চিত হইয়াছিল, সেকালের অনুশাসন-নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার মধ্যে স্বাধীন প্রেমের এত মর্মদাহ কেমন করিয়া জ্বালা বিকীর্ণ করিয়াছিল তাহা হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। এই কবিতা পড়িয়া মনে হয় যেন বাঙলা সমাজ পাশ্চাত্ত্য সমাজের ন্যায় নিরঙ্কুশ মনোবৃত্তিচর্চার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, বৃন্দাবনলীলার সখি-দূতী-অভিসার-মিলন-সংবলিত স্বাধীন মানস বিহার যেন অষ্টাদশ শতকের বাঙলার বাস্তব সমাজে আরোপিত হইয়াছে। এখানে পরিবেশটা অর্ধ-কাল্পনিক, কিন্তু পরিবেশের আশ্রয়ে মানবহৃদয়ের যে বিচিত্র বেদনানুভূতি তাহা সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বানুসারী। মনে হয় যেন কৌলীন্যবিড়ম্বিত, স্বামিসৌভাগ্যবঞ্চিত উচ্চ বর্ণের যুবতীদের ব্যথাতুর, যত্ননিরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস বাঙলার আকাশ-বাতাসকে বিস্ফোরক উপাদানে পূর্ণ করিয়া কবিদিগকে প্রেমমনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে প্রেরণা যোগাইয়া থাকিবে। কুলীন ব্রাহ্মণ যুবতীর বাহিরের প্রশান্ত, বিষাদগম্ভীর মুখমণ্ডলের পিছনে যে ঝটিকা তাহাদের অন্তর্লোককে আলোড়িত করিতেছিল, যে অনুচ্চারিত অনুযোগ ও বিদ্রোহ-প্রবণতা দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরের আবরণতলে তাহাদের সমস্ত সত্তাকে বিপর্যস্ত করিতেছিল, কবিরা হয়ত তাহার কিছুটা অনুমান করিয়া এই অকথিত বেদনাকে তাঁহাদের গানে ভাষা দিয়াছেন।

হরু ঠাকুরের বিখ্যাত গান "পীরিতি নাহি গোপনে থাকে" প্রেমরহস্যের চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। বৈষ্ণব পদাবলীর চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের পদে প্রেমের আনন্দ-বেদনামিশ্র, দুর্বোধ্য দ্বৈতরহস্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রেম উপর মহলের ব্যাপার, লৌকিক আকর্ষণের রূপকে অধ্যাত্মরাজ্যের বিরহ-মিলনের কাহিনী। প্রেম যে স্তরে দেহসীমা ও সংসার-স্থূলতার ঊর্ধ্বে উদারতর ভাবব্যঞ্জনার স্পর্শে ভাস্বর হইয়া উঠে ইহা সেই স্তরের সঙ্কেত-চমকিত। ইহার মধ্যে মানবিক উপাদান অতিমানবিক জ্যোতির্মণ্ডলের অন্তরালে দুর্নিরীক্ষ্য। শ্রীরাধার ভাবতন্ময়তা, তাঁহার ঊর্ধ্বতার নেত্র, কৃষ্ণসাদৃশ্য-ভ্রমে মেঘলোকে উৎক্ষিপ্ত ও ময়ূরের বিচিত্রবর্ণ

কণ্ঠনিরীক্ষণে নিবদ্ধ দৃষ্টি বা প্রেমের অতলস্পর্শ রহস্যসাগরে নিমজ্জিত চিত্তবৃত্তি যে মনোভাবের বহির্লক্ষণ, তাহাকে মনস্তত্ত্ব-বিচারের সাধারণ মানদণ্ডে মানবায়িত করা যায় না। কিন্তু হরু ঠাকুর ও রাম বসুর প্রেমকবিতা সম্পূর্ণরূপে পার্থিব অনুভূতির স্তরেই সীমাবদ্ধ। বৈষ্ণব ভাবাদর্শের সহিত যাহার পরিচয় নাই তাহারও ইহার রসগ্রহণে কোন বাধা নাই। ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, এই কবিরা কেমন করিয়া বাঙালীর সাধারণ জীবনে প্রেমের এত অস্বস্তি, এত ভাববৈচিত্র্যের ওঠা-নামা, তীব্র আক্ষেপ হইতে নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য পর্যন্ত মনোভাবের এত সুর-পরিবর্তন, 'হিয়াদগ্‌দগি পরাণ-পোড়নি'-র এত নিদারুণ ক্ষতজ্বালা এরূপ সূক্ষ্ম অনুভূতিমূলক মনোজ্ঞতার সহিত বর্ণনা করিবার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

রাম বসু বিরহগানে এখন পর্যন্ত অপরাজিত। নরনারীর প্রণয়-পথে যত রকম আন্তর বাধা উপস্থিত হইতে পারে, প্রেম-নদীতে যত জোয়ার-ভাঁটা, ঝড়-তুফান, চড়া-আবর্ত দেখা দিতে পারে তিনি সমস্তকেই লক্ষ্য করিয়াছেন ও তাহাদিগকে সঙ্গত-স্বাভাবিক বাণীরূপ দিয়াছেন। তিনি অনেক সময় এই সমস্ত অবস্থা-বর্ণনায় নূতন বাগ্‌রীতিরও প্রয়োগ করিয়াছেন। নির্মমহৃদয়া প্রেমিকাকে প্রেমিক অনুযোগ করিতেছে, "মানচণ্ডীর তলায়, তুমি নাগর কেটে দিবে নর-বলিদান।" এ ভাষা কোথাও ধার করা নহে, কবির অনুভূতির টাঁকশালায় সদ্যোনির্মিত। অবিশ্বাসী নায়কের রুষ্টভাষণে নায়িকার প্রেমানল নির্বাপিত হইল, "উষ্ণ জলে করে যেমন অনলনির্বাণ।" উপমার তাজা গুণটি লক্ষণীয়। বিবাহিতা স্ত্রী কর্তব্যহীন স্বামীর সম্বন্ধে ক্ষোভ জানাইতেছে—"নামে ভার্যা কাজে ত্যাজ্যা, সই, লোকের যেমন নদীর চড়ার সনন্দ।" নদীর চড়াতে স্বত্ব থাকিলেও যেমন মালিক কার্যতঃ স্বত্বহীন, দাম্পত্য-অধিকারচ্যুতা স্ত্রীরও অবস্থা তদ্রূপ। প্রণয়হীন স্বামীর স্ত্রীর নিকট আচরণ যেমন অনিচ্ছুক বালকের নামতা-শিক্ষা, "যেন শতকেতে পাঠ এগুলো।" আবার নায়িকারও অব্যবস্থিতচিত্ততা কবির কষাঘাত এড়ায় নাই—"নারী, বারি, দুই জনারি নীচ পথে গমন।" "যেমন সসর্প গৃহেতে বাস, হোলে দুষ্টে ভার্যে, বেড়ায় গর্জে, খেলে খেলে এমনি ত্রাস।" প্রেমিকের নিষ্ঠুর ব্যবহারে বিগতপ্রেম নায়িকা বলে, "একবার পোড়ে যে পতঙ্গ হে, তার আতঙ্ক কি রয়?" উদাসীন, বীতরাগ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর উক্তি, "আমার প্রাণপতি এসেছে এবার শান্তিশতক পড়ে।"

প্রেমের আদর্শবাদ ও ভাববিশুদ্ধির দিকটাও কবি একেবারে উপেক্ষা করেন নাই। মাটির পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া নীল, নির্মল আকাশের দিকেও তিনি মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়াছেন। তিনি দ্বিধাদোদুল প্রেমিকাকে প্রেমের একনিষ্ঠতার কথা শুনাইয়াছেন—"একবার চাও পীরিতকে, আবার চাও বিচ্ছেদকে, দ্বিধা মনে কর রসময়ী" ও এই প্রসঙ্গে ভগীরথ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও স্বয়ং মহাদেবের একনিষ্ঠ তপস্যার কথা শোনাইয়াছেন। প্রেমের আত্মসুখপরায়ণতার প্রতি তিনি কটাক্ষ করিয়াছেন—"তুমি পীরিত আত্মসুখে সুখী।" যথার্থ প্রেমের অসাধ্যসাধন-ক্ষমতার সম্বন্ধেও তিনি অনবহিত নহেন :—

প্রেম সুধা পান যে করে তারো
নাহি থাকে কোন খেদ।
সপক্ষ, বিপক্ষ প্রেমে শত্রু নাহি ভেদ।
নাই উঠতে বসতে শক্তি যার,
শুনে প্রেমের কথা যায় সাত সমুদ্র পার ॥
প্রেমে বোবায় কথা শুনে কানায় চক্ষু পায়,
আবার পঙ্গু এসে হেসে লজ্ঘায় গিরি ॥

প্রেমের এই প্রশস্তিমন্ত্র-উচ্চারণে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও রোমান্টিক কবিকল্পনা, আটপৌরে জীবনের স্বাদ ও কল্পলোকের দূরাভিসারের অভাবনীয়তা উভয়েরই মিলিত সুর শোনা যায় না কি ?

সাধারণতঃ কবিয়ালদের গান খুব কমই ভাব, ভাষা, কল্পনা, আবেগ সব মিলিয়া অনবদ্য প্রকাশসৌন্দর্য লাভ করে। ইহাতে দুই-একটি শক্তিশালী ও গাঢ়-অনুভূতিসম্পন্ন পংক্তি থাকিলেও সমস্ত কবিতাটি নিখুঁত ও পূর্ণতৃপ্তিবিধায়ক হয় না। হরু ঠাকুর ও রাম বসুর ও উঁহাদের পূর্ববর্তী রাসু নৃসিংহের কয়েকটি গান স্মরণীয় সর্বাঙ্গসুন্দরতা লাভ করিয়াছে। হরু ঠাকুরের 'সখি, আমায় ধর ধর', 'পীরিতি নাহি গোপনে থাকে' ও রাম বসুর 'যৌবন জনমের মত যায়', 'মনে রৈল সই মনের বেদনা', 'জলে কি জলে, দেখ গো সখি', 'হর নই যে আমি যুবতী', 'দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ', 'কে সাজালে হেন যোগির বেশে' ও রমাপতি ঠাকুরের 'সখি, শ্যাম না এল' প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর প্রেম-কবিতারূপে স্থান পাইবার যোগ্য।

নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯) প্রধানতঃ সুরকার ছিলেন, তাঁহার সঙ্গীতরচনা তাঁহার গৌণ কৃতিত্ব। তিনি যদিও কবি হিসাবে হরু ঠাকুর বা রাম বসুর সঙ্গে তুলনীয় নহেন, তবুও তাঁহার প্রণয়গীতিগুলি কবিত্ববর্জিত বা হৃদয়ানুভূতিতে হীন নহে। তাঁহার গানগুলির মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি বিরহের সঙ্গীত-সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হইবার অধিকারী। নিধুবাবু হইতেই বাংলা কাব্যে প্রেমতত্ত্ব ও প্রণয়বিশ্লেষণ বিষয়ে যে অসাধারণ আগ্রহ দেখা গিয়াছিল তাহার এই বিশেষ ধারাটা নিঃশেষিত হইল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্ত্য ভাবকল্পনায় অনুপ্রাণিত, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষায় সুসংস্কৃত কবিগোষ্ঠীর রচনায় প্রেম আবার নূতন জন্মপরিগ্রহ করিল। ইহাতে আমাদের লাভ হইয়াছে প্রচুর, তবে ক্ষতিও যে একেবারে উপেক্ষণীয় তাহা বলা যায় না। এই কবিতায় প্রেমের সঙ্গে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের যে বিচ্ছেদ ঘটিল তাহাতে প্রেম যতটা নভোচারী হইয়াছে ততটা মৃত্তিকাশ্রয়ী হয় নাই। বিগত এক শতাব্দী ধরিয়া আমরা এই কবিকল্পনাবিহারী প্রেমের ছন্দটিকে আমাদের প্রাত্যহিক অনুভূতির মধ্যে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। কবিগানের প্রেম জীবনোদ্ভূত হ্রদ-তড়াগ-কূপের জল; আধুনিক কাব্যের প্রেম মেঘলোক হইতে বর্ষিত বৃষ্টিধারা—ইহা আমরা চাতকবৃত্তি হইয়া ঊর্ধ্বমুখে পান করি, কিন্তু ইহাকে স্থায়িভাবে রক্ষা করিবার আধার আমাদের নাই।

কবি গানের যে নমুনাগুলি আমাদের যুগ পর্যন্ত পৌছিয়াছে সেগুলি যে গানের আসরে মুখে মুখে রচিত তাহা মনে করিবার বিশেষ কারণ নাই। দ্রুতরচনার কাঁচা দৃষ্টান্তগুলি বোধ হয় কালের প্রসাদে আপনা-আপনি বিলুপ্ত হইয়াছে। যেগুলি এখনও সংগৃহীত আছে তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে শিল্পবোধ ও সচেতন রচনা-কৌশলের কমবেশী কিছু নিদর্শন মিলে। কবিয়ালের শিল্পবোধ শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি কবির মত সদাজাগ্রত ছিল না—অবান্তরের প্রক্ষেপ ও গঠনশিথিলতা ইহাতে বিশেষ প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। তবে কাব্যরচনার মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণার দিক দিয়া কবিগান যে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক তাহাতে সন্দেহ নাই। কবিয়ালরা আসরে গান বাঁধা আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত শিল্পশালার সূক্ষ্ম কারুকার্য পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। আসরের জনপ্রিয়তা ও কবি-যুদ্ধের উত্তেজনা না থাকিলে ইহাদের অনেকেরই কবিত্বশক্তি অনাবিষ্কৃত থাকিত।

কিন্তু ইহারা জাতিকে একটা নূতন শিক্ষা দিল যে, কাব্যরচনায় পুঁথিগত বিদ্যা ও শিল্পসাধনার বিশেষ প্রয়োজন নাই। মন ভক্তি ও আদি রসের মিশ্রিত তরলতায় পূর্ণ থাকিলে ভোঁতা কলম দিয়া, এমন কি কলম ছাড়িয়া শুধু মুখ দিয়া রচনা করা যায়। সাধারণ মানুষের এই কাব্যরসোচ্ছল অবস্থা জাতীয় জীবনে আর পুনরাবৃত্ত হইবে না—রস-সঞ্চয় ও রস-আহরণের পূর্বতন আয়োজনগুলি সবই বিপর্যস্ত হইয়াছে। এখন জনতায় শতমুখে যাহা নিঃসৃত হয় তাহা রাজনৈতিক উত্তেজনার উগ্র সুরা, ভক্তিরসমধুর কাব্যসুধা নহে। তথাপি সাহিত্যের ইতিহাসে এই কবিগানের একটি চিরন্তন তাৎপর্য আছে। ইহা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকে উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাববেষ্টনী হইতে মুক্ত করিয়া সার্বভৌম রসানুভূতির ধারায় প্রবাহিত করিয়াছে। এই দিক দিয়া কবিয়ালেরা আধুনিক বৈষ্ণবভাবাশ্রয়ী কবিগোষ্ঠীর পথপ্রদর্শক ও পূর্বসূরী। বৃন্দাবন-প্রেমলীলাকে তাহারা প্রথম কবিদৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছে ও ইহার বিভিন্ন খণ্ডগুলিকে সামগ্রিক তাৎপর্যের সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাদের ভাবা-বেদনকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কুমুদরঞ্জন বা কালিদাস যে অর্থে বৈষ্ণব কবি সেই অর্থের প্রথম সূচনা কবিয়াল-গোষ্ঠীর মধ্যেই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা প্রেমের লৌকিক দিকের বিস্তারিত কাব্যালোচনার দ্বারা বাঙলার সমাজ-জীবনে উহার একটা বিশিষ্ট স্থান নির্ধারণ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, ধর্মনিরপেক্ষ গীতিকবিতা বা গানের চর্চার দ্বারা তাহারা গানকে ধর্মের অনুচরত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছে। এই সমস্ত দিক দিয়াই বাংলা কাব্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু যাহারা এই পথরেখার প্রথম সূচনা করিয়াছিল তাহাদিগকে কুরুচি ও শিক্ষাহীনতার অপবাদ দিয়া তাহাদের প্রতি ঋণের বিষয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে। কবিয়ালের যুগ আর ফিরিবে না। বঙ্কিমের ভাষায়, উহার ফিরিবার আর প্রয়োজনও নাই; কিন্তু যাহা একদা ছিল ও কাব্যধারাকে প্রবাহিত রাখিতে সহায়তা করিয়াছিল তাহাকে ভুলিলে ইতিহাসকেই বিকৃত করা হইবে।

আধুনিক যুগ

ঊনবিংশ শতক

পুরাণবোধোদ্দীপিকা—বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের এক অজ্ঞাত অধ্যায়

(১)

অসম্পূর্ণ তথ্যজ্ঞানের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আমাদের অনেক সিদ্ধান্তই ভ্রান্ত ও একদেশদর্শী হইয়া পড়ে। এই একই কারণে সাহিত্যে আকস্মিক উন্মেষের অতি-প্রাচুর্য আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। গদ্য-রীতির পূর্ণ পরিণতি, উপন্যাসের উদ্ভব, গীতি-কবিতার মধ্যে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা—এই সমস্ত যেন অনেকটা পূর্বসূচনাহীন অতর্কিত আবির্ভাব বলিয়াই আমাদের চোখে ঠেকে। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ এই বিষয়গুলিতে প্রাথমিক প্রচেষ্টাসমূহের সহিত আমাদের অপরিচয়। ক্রমবিবর্তনের নিয়ম অন্যান্য সাহিত্যের মত বাংলা সাহিত্যেও সমভাবে ক্রিয়াশীল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে উপকরণের অপ্রাপ্তি ও ঐতিহাসিক বোধের অপূর্ণতার জন্যই ধারাবাহিকতার যোগসূত্রটি অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। যাঁহারা প্রথম যুগের সংবাদ-পত্রগুলির সুস্থ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বাংলার প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল-এর আবির্ভাব নিতান্ত অপ্রত্যাশিত বলিয়া বোধ হইবে না। সাময়িক পত্রিকায় 'বাবু' চরিত্রের সংক্ষিপ্ত, শ্লেষাত্মক সূচনাই কালক্রমে উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ও ব্যাপক সমাজচিত্রের পরিণতি লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পটভূমিকায় তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনার অসংখ্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা অগ্রদূতরূপে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। বিহারীলালের মধ্যবর্তিতায় রবীন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক অভিনবত্ব কতক পরিমাণে ক্রমপরিণতির শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া ঐতিহাসিক প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এইরূপে যে সমস্ত সাহিত্যিক বিকাশকে আমরা আকস্মিক মনে করিতেছি, পর্যাপ্ত উপকরণ সংগৃহীত হইলে, তাহাদের পূর্বাভাস-আবিষ্কারের ফলে, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্তিত হইতে পারে।

সম্প্রতি একখানি গ্রন্থ-আবিষ্কারের ফলে গদ্য-রীতির বিবর্তন-ধারা সম্বন্ধে উপরি-উক্ত নীতির প্রয়োগের একটি কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে। গৌহাটী কলেজের বাংলার অধ্যাপক স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ যতীন্দ্র-মোহন ভট্টাচার্য পূর্ব শ্রীহট্টবাসী কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক রচিত ও ১৮২৭ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত 'পুরাণবোধোদ্দীপনী' নামক একখানি গদ্যগ্রন্থ আবিষ্কার ও সম্পাদন করিয়া গদ্য-রীতির ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট করিবার উপাদান উপস্থাপিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শেষাংশের সারসংকলন ও ভাবানুবাদ। আলোচ্য গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্বে আরও তিন খণ্ড অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ লেখক আমাদিগকে জানাইতেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্বপ্রকাশিত ঐ তিনখণ্ড এপর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। যাহা হউক, যতীন্দ্রমোহন কর্তৃক আবিষ্কৃত এই চতুর্থ খণ্ড বাংলা সাহিত্যের আলোচনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেই সম্বন্ধেই দুই-এক কথা লিখিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের অনুবাদ মধ্যযুগের প্রারম্ভ হইতেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মুখ্য প্রচেষ্টা। এই অনুবাদ-ধারা বৈষ্ণব কবিতাধারার সহিত পাশাপাশি বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত অনুবাদই পদ্যে রচিত হইয়াছিল। পুরাণের ধর্ম ও নীতিশিক্ষা লোকসমাজে সরস ও মধুর ভাবে বিতরণ করিতে হইলে কবিতাই একমাত্র উপযুক্ত বাহন এই সত্যই সম্ভবতঃ অনুবাদকবৃন্দের মনে জাগরূক ছিল। তা ছাড়া, সেই সুদূর অতীতে সাহিত্যিক গদ্যের অনুদ্ভবও কবিতার একাধিপত্যের অন্যতম কারণ। শাস্ত্রগ্রন্থের নীরস ও তথ্যানুগ সারসংকলনে রচয়িতাদের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, সে বিষয়ে তাঁহারা সচেতন ছিলেন। তাই শাস্ত্রনির্দিষ্ট নীতিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহারা অনেক সময় স্বাধীন কাব্য রচনা করিয়াছেন; সমসাময়িক পাঠকগোষ্ঠীর প্রয়োজন ও রুচির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের অনুবাদের মধ্যে মূল-বহির্ভূত অনেক নূতন রসের সঞ্চার করিয়াছেন। সেইজন্য বৈষ্ণব-ধর্মের ভক্তিবিহ্বলতা ও দ্রবীভূত মাধুর্য পুরাণের যুদ্ধ-বিগ্রহ-কণ্টকিত, ক্ষাত্রধর্ম-প্রধান পটভূমিতে অনেকটা সামঞ্জস্য ক্ষুন্ন করিয়াও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই কাব্যানুবাদকারীদের মনোভাব আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। তাঁহাদের অন্তর্নিহিত কবিত্বপ্রেরণা ও ভক্তিরস

নূতন বিষয়ের অনুসন্ধান না করিয়া পুরাতন পৌরাণিক কাহিনীর নির্দিষ্ট প্রণালীতে প্রবাহিত হইয়াছে। পরিচিত উপাখ্যানসমূহের সরস আলোচনার দ্বারা তাঁহারা শ্রোতৃবৃন্দের রুচির সমর্থন সহজেই পাইবেন, এই ধ্রুব বিশ্বাস তাঁহাদের বিষয়-নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। 'রচিব মধুচক্র গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'—মধুসূদনের এই মনোভাব তাঁহার পূর্ববর্তী সমস্ত কবিদের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। মধুর পুরাতনত্ব ও চক্রের পৌনঃপুনিকতা তাঁহাদিগকে নিরুদ্যম না করিয়া আরও উৎসাহশীলই করিত। যেখানে পুণ্যের আকর্ষণ ও সপ্রশংস স্বীকৃতির নিশ্চয়তা তুল্যভাবে ক্রিয়াশীল, সেখানে একই কথা বলিবার জন্য বহু কবির আবির্ভাব মোটেই অপ্রত্যাশিত নহে।

(২)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে, মুখ্যতঃ ব্যবহারিক প্রয়োজনের অনুরোধে, গদ্যের অনুশীলন আরম্ভ হইল। প্রধানতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিভিলিয়ানী ছাত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্যই বাংলার সাহিত্যের এই নূতন পথে পদক্ষেপ। যখন সংস্কৃতাভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীকে গদ্য পাঠ্য-পুস্তক রচনার ফরমাইস দেওয়া হইল, তখন বোধ হয় তাঁহারা একটু বিপদগ্রস্তই হইলেন। তাঁহাদের বলিবার নিজস্ব কথা কিছুই নাই; তাহাদের মনে কোন অন্তঃরুদ্ধ, সঞ্চিত আবেগ প্রকাশব্যাকুলতায় তাঁহাদিগকে অস্থির করিয়া তোলে নাই। সমসাময়িক সমাজের পরিবর্তনোন্মুখতা তখনও কতকটা দুনিরীক্ষ্যই ছিল। কেহ কেহ স্মৃতির মণি-কোঠায় হাতড়াইয়া দুই-একটা ঐতিহাসিক চরিত্র বা সন্নিহিত অতীতে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন দুই একটা রাজ-রাজড়ার কথা-খুঁজিয়া পাইয়াছেন—হয়ত ইঁহাদের সঙ্গে লেখকদের পারিবারিক বা বাধ্যবাধকতামূলক কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' ও রাজীবলোচন রায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রস্য চরিতম্' এইসূত্রে গদ্য সাহিত্যের বিষয়রূপে নির্বাচিত হইয়া থাকিতে পারে।

কিন্তু অধিকাংশের সম্বল সেই প্রাচীন পুরাণ-কাহিনী; সুতারং ১৮০০ হইতে ১৮২৫-এর মধ্যে যে সমস্ত গদ্য সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহারা অধিকাংশই

পৌরাণিক-বিষয়-মূলক। কিন্তু গদ্যানুবাদ ঠিক পদ্যানুবাদের মত এত সহজ ও সাবলীল হয় নাই। এই নূতন পথে পদক্ষেপে অনভ্যস্ত লেখকেরা পৌরাণিক যষ্টির সাহায্যে চলিতে চেষ্টা করিলেও, তাঁহারা বহু-বিসর্পিত, অনিয়ন্ত্রিত-বিস্তার বাক্য-গঠন-রীতির লম্বা কোঁচায় পা আটকাইয়া বারে বারে আছাড় খাইয়াছেন। তাঁহাদের রচনা-রীতির মধ্যে অপটু শব্দ-নির্বাচন, ভারসাম্যচ্যুত বাক্যবিন্যাস, অনভ্যস্ত রচনাভঙ্গী প্রভৃতির ভিতর দিয়া দুর্গমপথযাত্রীর গলদ্ঘর্ম সচেষ্টতাই প্রকটিত হইয়াছে। আর এই বিষয়-নির্বাচনের প্ররোচক মনোভাবও একটু স্বতন্ত্র ধরণের; এক্ষেত্রে পুরাতনের আশ্রয়াকাঙ্ক্ষা বহুদিন-প রচিত, সুখ-দুঃখের সাথী মানস সুহৃদের সঙ্গে নব-সম্বন্ধ-স্থাপনের প্রীতিপূর্ণ আগ্রহের বা পরীক্ষিত-স্বাদ, তৃপ্তিকর আহার্যের প্রতি রসনালোলুপতার জন্য নহে; ইহা নিরাশ্রয় শূন্যের মধ্যে পতনরোধকারী অবলম্বনের জন্য হস্ত-প্রসারণ। মনে হয় এই যুগে যাঁহারা পুরাণের গদ্যানুবাদে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা যেন অনেকটা দায়ে পড়িয়াই এ কার্য করিয়াছেন—তাঁহাদের পরিপাক-শক্তির উপর বিশেষ আস্থা ছিল না বলিয়াই এই অতিরোমন্থিত বিষয়ের ভুক্তাবশেষ গ্রাসরূপে মুখের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এই চর্বিত-চর্বণ ভোজন-ব্যাপারে সাহিত্যের জারক রস প্রচুর পরিমাণে নিঃসারিত হয় নাই। পদ্যানুবাদের সাবলীল, সোৎসাহ প্রথানুবর্তন গদ্যানুবাদের অন্তঃপ্রেরণার সমর্থনহীন, আড়ষ্ট, "হাঁটি-হাঁটি-পা-পা" জাতীয় গতিভঙ্গীতে পর্যবসিত হইয়াছে।

এতদিন আমাদের ধারণা ছিল এই অপটু গদ্যরচনা-রীতি প্রথম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে বহিঃসৌষ্ঠব ও অন্তঃসামঞ্জস্য লাভ করিয়া সাহিত্যিক মর্যাদা অর্জন করিয়াছে। কিন্তু শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থে এই ধারণার একটু পরিবর্তন হইল। প্রথম যুগের পুরাণ-অনুবাদকবৃন্দ ও ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে শিল্পজ্ঞানমূলক ব্যবধান এই গ্রন্থের আবির্ভাবে খানিকটা সংকীর্ণতর হইয়াছে। আলোচ্য-পুস্তকের রচনাপদ্ধতি অনেকটা সরস, বাক্য-বিন্যাস-রীতি অনেকটা সংক্ষিপ্ত ও প্রমাদহীন। তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পাদকের ভূমিকায় সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া আমি তাহার আর পুনরবতারণা করিলাম না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ঘটনাবলীর সারসংকলনে, অনাবশ্যক অংশের পরিবর্জনে ও সংক্ষিপ্তি-নির্দেশক সংকেতের সুষ্ঠু প্রয়োগে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক প্রশংসনীয় ও সেকালের পক্ষে বিরল স্বাধীনচিত্ততার

পরিচয় দিয়াছেন। যে স্তব ও স্তবের ফলশ্রুতি পুরাণপাঠের প্রধান আকর্ষণ ছিল, লেখক তাহার উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে পুরাণসমূহের ধর্মপ্রভাব যে কতটা হ্রাস পাইয়াছিল ইহা তাহারই পরোক্ষ নিদর্শন। এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনার এখানে স্থান নাই। কেবল বাক্যবিন্যাস-কৌশল ও ভারসাম্যবিধানের পটুতার নিদর্শন হিসাবে গ্রন্থখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার পূর্বাভাসরূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য। বাক্যের পরিধি-সঙ্কোচ ও প্রকাশভঙ্গীর সুস্পষ্টতার দিকে লেখকের স্বাভাবিক প্রবণতা আছে বলিয়া মনে হয়। সাপেক্ষ বাক্যাংশের (dependent clauses) সংখ্যাহ্রাস ও সমগ্রতার মধ্যে তাহাদের যথাযথ স্থাননির্দেশ ইহার রচনার একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। অপটুতা ও আড়ষ্টভাবের উদাহরণ বিরল নহে, কিন্তু মোটের উপর যে ধারণা প্রবল হয় তাহা এই যে, রচনা-রীতির পরিচ্ছন্নতা ও শিল্প-সুষমা-বোধের উপরই ইহার প্রতিষ্ঠা।

পুরাণের গদ্যানুবাদ সাহিত্য নহে, সাহিত্যের জন্য প্রস্তুতি; ইহা নবজাত গদ্যশিশুর ভারসাম্যের অনুসন্ধান। সেইদিক দিয়া এই "পুরাণ:বাধোদ্দীপনী" গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য আছে। ইহাতে পূর্ণ পরিণতি নাই, আছে তাহার সম্ভাবনা ও পূর্বসূচনা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'শকুন্তলা' ১৮৫৪ খৃঃ অঃ ও 'সীতার বনবাস' ১৮৬০ খৃঃ অঃ প্রকাশিত হয়। এই দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে ১৮২৭ খৃঃ অঃ প্রকাশিত একজন অজ্ঞাতনামধেয় লেখকের গদ্যরচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির নিদর্শন পাওয়া যায়। চরম সাফল্যের পিছনে যে ছোট-খাট অর্ধ-সার্থক প্রচেষ্টা সাধারণতঃ দৃষ্টির অগোচরে থাকে, এই গ্রন্থটিকে তাহারই পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। সম্পাদক মহাশয় এই গ্রন্থখানি আবিষ্কার ও তাহার এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ সম্পাদনের দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে খানিকটা শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়াছেন ও বঙ্গসাহিত্যের শ্রদ্ধাশীল পাঠকমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর ও বাংলা ভাষা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে বাংলা গদ্য পরিণতির যে স্তরে পৌঁছেচে তাতে এই লক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট হয়েছে—(১) ভারসাম্য ও দ্বিধাহীন দৃঢ় পদক্ষেপ, (২) বাক্যগঠনে সুসমঞ্জস পরিমিতি-বোধ ও (৩) খানিকটা ধ্বনি-প্রবাহের অবিচ্ছিন্নতা। এতে ভাষা অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক দিয়ে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে; কিন্তু যে পরিমাণ দেহপ্রসাধন হয়েছে, সে পরিমাণ অন্তরের মাধুর্য, আত্মার সুরভিত বিকাশ হয়নি। এর একটা কারণ এই যে, লেখকের নিজস্ব ভাব বা অনুভূতি ভাষার ভিতর দিয়ে ব্যক্ত হয়নি—সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের অনুবাদের দ্বারা আহরিত সৌন্দর্যবোধ একটা অর্ধ-কৃত্রিম, সচেতনভাবে গঠিত ছাঁচের মধ্যে মসৃণভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। যেখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবানুবাদের সরল পথ ছেড়ে নিজ অনুভূতির গহন স্তরে প্রবেশ করেছেন, সেখানে তাঁর ভাষার মধ্যে পল্লবিত বিস্তারের পরিবর্তে অর্থগূঢ় সংক্ষিপ্তি ও আবেগের উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে। অবশ্য এই জাতীয় দৃষ্টান্ত তাঁর রচনায় খুব বেশী নাই। তাঁহার বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবে যেখানে তিনি দেশাচারের বিরুদ্ধে আক্ষেপমূলক অনুযোগ করেছেন, সেইখানে তাঁর ভাষায় এক নূতন তীব্রতা ধ্বনিত হয়েছে ও ভাষার স্বচ্ছন্দ ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে একটু আবর্তের আভাস দেখা দিয়েছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় গদ্যের যে আদর্শ স্থির করলেন—এর সংস্কৃতবহুলতা, মন্থরগতি, গুরুগম্ভীর ছাঁদ, সাধারণ অবস্থা বর্ণনার উপযোগিতা, অসাধারণত্বের স্পর্শহীনতা ও অনবদ্য আঙ্গিক মসৃণতা—তাই পরবর্তী যুগের দ্বারা গৃহীত ও সমর্থিত হয়েছে। প্রায় সমস্ত সমসাময়িক ও পরবর্তী লেখক মূলতঃ এরই অনুবর্তন করে নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর পার্থক্য অনুসারে একটু-আধটু অদল-বদল করেছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব-বিশ্লেষণের জন্য বিদ্যাসাগরী ছাঁদই ব্যবহার করেছেন—তবে তথ্যবিবৃতি ও সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদনের প্রয়োজন তাঁকে কতকটা অলঙ্কার-বর্জনে প্রণোদিত ও সচেতন সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াস থেকে প্রতিনিবৃত্ত করেছে। বস্তুতন্ত্রতা এই নবোদ্ভিন্ন ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠবের কিছু হানি করেছে; কিন্তু শূন্যগর্ভ ছাঁচের রন্ধ্রপথ পূর্ণ করে ও ভাবের চাপে এর

মসৃণতার বিকৃতি ঘটিয়ে নূতন সম্ভাবনার পথও উন্মুক্ত করেছে। অক্ষয়-কুমার যেখানে কল্পনা-বিলাসের আশ্রয় নিয়েছেন—যেমন তাঁর স্বপ্নদর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে—সেখানে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর ভাষার বেশী তফাৎ নাই। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলিতে সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ের আলোচনা হয়েছে; কিছু সাহিত্য-সমালোচনাও তাঁর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলিতে মৌলিক চিন্তার প্রেরণা ও তথ্যচয়ন ও সমাবেশের শৃংখলাবোধ বিদ্যাসাগরীয় ভাষার সাধারণ কাঠামোর মধ্যে অভিনব প্রকাশভঙ্গীর মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করেছে। যখন ভাষাকে নূতন নূতন ভাব-দুরূহতার পাষাণস্তূপের মধ্যে নিজ পথ রচনা করতে হয়, তখন তাকে অনিবার্য কারণে পরিচ্ছদের বিস্তৃতি ও উত্তরীয়ের কুঞ্চিত আতিশয্য বিসর্জন দিতে হয়। পরিশ্রমের স্বেদধূলি তার সৌখীন ভব্যতাকে অভিভূত করে সত্য, কিন্তু এই অপরিচ্ছন্নতার ভিতর দিয়ে নূতন মাংসপেশীর দৃঢ়তা, নূতন শক্তির গতিবেগ অনুভূত হয়।

বিদ্যাসাগরীয় ভাষা যখন সাহিত্যিক গদ্যের আদর্শরূপে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তখন একখানা গ্রন্থের চমকপ্রদ আবির্ভাবে তার সিংহাসনের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠল। এটি হচ্ছে প্যারীচাঁদ মিত্রের সুপ্রসিদ্ধ 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খৃঃ)। এতে বিদ্যাসাগরীয় আদর্শের সমস্ত আভিজাত্য-গৌরবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কলিকাতা অঞ্চলের সাধারণ প্রচলিত ভাষার কথ্যরীতিকে সাহিত্যিক মর্যাদাদানের চেষ্টা হলো। অবশ্য এটা উপন্যাস, কোন গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা নয়; এবং পাত্রপাত্রীর সংলাপ এর মধ্যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করে। নাটকে নিম্নশ্রেণীর চরিত্রদের কথাবার্তা প্রাকৃতে রচনা করার প্রথা সংস্কৃত-সাহিত্যের দিন থেকে প্রচলিত আছে—এতে শব্দ-প্রয়োগের দিক থেকে না হলেও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কথ্যরীতির বাস্তব অনুবর্তন সাহিত্যে স্থানলাভ করেছে। উপন্যাস কতকাংশে নাটকের উত্তরাধিকারী—সুতরাং নাটকের এই বৈশিষ্ট্য অতি সহজেই উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্যারীচাঁদের মৌলিকতা হচ্ছে যে, তিনি আলাপ-সংলাপের কথ্যরীতি লেখকের নিজস্ব উক্তির—যথা, আখ্যায়িকা-বিবৃতি ও মন্তব্যের মধ্যেও চালিয়ে দিয়েছেন। এই অভিনবত্বের মধ্যে কতখানি কেবল বিদ্রোহ-ঘোষণার স্পর্ধিত দুঃসাহস ও কতখানি বা নূতন রসানুভূতির আবিষ্কার ছিল তা' ঠিক করা দুঃসাধ্য।

প্যারীচাঁদের অন্যান্য রচনায় বাক্যগঠন ও শব্দ-নির্বাচন অনেকটা সরল

হলেও "আলাপের ঘরের দুলালের" আদর্শ সম্পূর্ণভাবে অনুসৃত হয়নি। কাজেই মনে করা অসঙ্গত নয় যে, এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ঠিক সাহিত্যিক সংস্কার নয়, বিদ্যাসাগরীয় ভাষা-দুর্গের প্রাকারমূলে ডিনামাইট লাগিয়ে তাকে খানিকটা বিধ্বস্ত করার চেষ্টা।

ধারাবাহিকতার সূত্র অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, প্যারীচাঁদের ভাষার পিছনে একটা দীর্ঘকালব্যাপী পূর্বপ্রচেষ্টা ছিল এবং সেই অনুপাতে এর বৈপ্লবিক বিস্ময়াবহতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খানিকটা সংযত করতে হবে। "আলালের ঘরের দুলাল"-এ বিষয়বস্তু ও ভাষার পিছনে আছে সংবাদপত্রের আদর্শের প্রভাব ও ব্যঙ্গাত্মক মনোবৃত্তির সঙ্কোচনশীলতা। সংবাদপত্র কতকটা বিষয়ের লঘুতার জন্য ও কতকটা প্রকাশভঙ্গীকে সর্বজনবোধ্য করবার প্রয়োজনে, সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাসাগরীয় আদর্শ গ্রহণ করতে পারে না। প্রাকৃত জনের নিকট সংবাদ সরবরাহ ও আবেদন পৌঁছে দেবার এর যে দায়িত্ব আছে তাহা অনতিক্রম্য। কাজেই গদ্য-সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের ভাষার একাধিপত্যের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রসমূহ ঠিক বিদ্রোহ না হোক, একটা আংশিক অসহযোগের নীতি অবলম্বন করেছিল। সাময়িক সাহিত্যের এই গোপন-সুড়ঙ্গচারী প্রবাহ 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ এসে সাহিত্যিক প্রকাশ্যতা ও প্রসার লাভ করেছে। তা ছাড়া, সংবাদপত্রের পরিচালনা-নীতিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অম্লরসের, ভাষার মেদ-স্ফীতির প্রতিষেধক ঔষধ হিসাবে যে উপযোগিতা আছে তা সহজেই বুঝা যায়। কাজেই 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ বংশ-পরিচয়ের চিত্ররেখা টান্‌তে গেলে তা প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রবর্তিত সংবাদপত্রের সীমানায় গিয়ে ঠেক্‌বে। যাঁরা সংবাদপত্রের ক্রমবিস্তৃতির ধারাটি মনোযোগের সঙ্গে অনুসরণ কর্‌বেন, তাঁরা খুব বেশী রকম চমকিত না হয়ে প্যারীচাঁদের ভাষায় এক চরম সাহিত্যিক পরিণতি লক্ষ্য করতে ও আকস্মিককে ঐতিহাসিক বিবর্তনের শৃঙ্খলায় যুক্ত করতে পারবেন।

প্যারীচাঁদের গদ্যভাষা যে পরিমাণে চমক সৃষ্টি করেছিল, সে পরিমাণে স্থায়ী ফল প্রসব করতে পারেনি। ইহা প্রচলিত প্রথার সম্বন্ধে সংশয় জাগিয়েছিল, কিন্তু নূতন রীতি প্রতিষ্ঠা করেনি। ১৮৬২ খৃঃ অঃ প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' পরবর্তী সাহিত্যে আলালী ঢংএর একমাত্র সার্থক প্রয়োগের দৃ[illegible] তারপর প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী ব্যবধানের পর ১৯১৪ খৃঃ অঃ সবুজপত্রের

মারফৎ এর বীরবলী ঢংরূপে পুনরাবির্ভাব। যে নিম্নগামী বস্তুনিষ্ঠতা ও শ্লেষপ্রধান মনোভাব থেকে "আলাল" ও "হুতোমের" জন্ম পরিবর্তনশীল সমাজ—প্রতিবেশে তা প্রশ্রয় বা সমর্থন পায়নি। উচ্ছ্বসিত আদর্শবাদ ও দেশপ্রীতির প্লাবন এসে এই হাসি-মস্করা-ভাঁড়ামোর প্রবৃত্তিকে, এই বহিরিন্দ্রিয়মূলক, ভাবাবেগবর্জিত সাহিত্য-প্রবণতাকে তিরস্কৃত করে সুচিরস্থায়ী বিস্মৃতির অতল তলে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। যে ভগীরথ বাংলা-সাহিত্যের শুষ্কপ্রায় খাতে নবভাবপ্লাবনের ভাগীরথী-ধারাকে প্রবাহিত করে দিলেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। তিনিই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা গদ্য-রীতির প্রবর্তক ও স্রষ্টা।

ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরী ও আলালী রীতি যে দুই বিপরীতমুখী আদর্শের চরম অভিব্যক্তি তা বিশদ করে ব্যাখ্যা করেছেন ও উভয়ের সমন্বয়েই যে ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যে সার্থক গদ্যভঙ্গী গড়ে উঠবে তার নির্দেশ দিয়েছেন। (অবশ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সংস্কৃতরীতির অন্ধ অনুকরণকারী ছিলেন তা মোটেই ঠিক নয়—তাঁর সংস্কারজাত সুষমাবোধের ফলেই তিনি সংস্কৃত গদ্যের মাত্রাতিরিক্ত বিস্তার, বিশেষণ-বাহুল্য ও অন্বয়-শিথিলতাকে অনেকটা সংকুচিত করে এদের বাংলার উপযোগী করে নিয়েছিলেন। ভবভূতির উত্তররামচরিতের সঙ্গে সীতার বনবাস-এর তুলনা করলেই ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাভাবিক শিল্পজ্ঞান ও বাক্যগঠননৈপুণ্যের নিদর্শন পাওয়া যাবে।) তথাপি তাঁর সরলীকরণ-প্রক্রিয়া যতদূর যাওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। দেবভাষার কটির মেখলা ও চরণের মঞ্জীর তিনি পরিহার করেছিলেন, কিন্তু এই অতি-ব্যবহৃত অলঙ্কারের কলঙ্কচিহ্ন তাঁর ভাষাকে স্পর্শ করেছিল। আধুনিকের বিচারে তাঁর ভাষার যে ত্রুটি সবচেয়ে ধরা পড়ে, সেটা হচ্ছে এর উপরিভাগের অতিরিক্ত মসৃণতা। যেমন মার্বেলের মেঝে বা মোম-মার্জিত বর্ষাতীর উপর দিয়ে জল সিক্ত না করে গড়িয়ে যায়, তেমনি বিদ্যাসাগরের ভাষার প্রস্তর-সমতল স্তরের মধ্যে কোন আবেগ বা রসগভীরতা হৃদয়কে স্পর্শ করার অবসর পায় না। কৃত্তিবাসের সরল পয়ারছন্দে রচিত রাম-সীতার বিরহ-বর্ণনা সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্রের ন্যায় আমাদের মর্মমূলে বিদ্ধ হয় ও আমাদের নয়নে শোকাশ্রুর সঞ্চার করে। বিদ্যাসাগরের সযত্নবিন্যস্ত ভাষাপারিপাট্য ও শব্দাড়ম্বর কানে শ্রুতিমধুরতার সৃষ্টি করে; কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে আর কোনও গভীরতর প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।)

'আলালী' ভাষার মধ্যে গতির ক্ষিপ্রতা ও প্রকাশভঙ্গীর অকুণ্ঠিত তীক্ষ্ণতা আছে, কিন্তু এ ভাষা অতি লঘু, হালকা বিষয় নিয়ে লেখা ও প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাস্তব বর্ণনাতে সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে শৈশবের দুরন্ত চাপল্য আছে, কিন্তু পরিণত মনের গভীর ভাবাবেগ বা চিন্তাশীলতা নাই। যেখানেই গুরু বিষয়ের অবতারণা হয়েছে—যেমন বরদাবাবু ও রামলালের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে আলোচনায়, মতিলালের পরিবারবর্গের দুঃখ-দুর্দশা-বর্ণনায় ও মতিলালের নিজের অনুতাপ ও আত্মগ্লানির অভিব্যক্তিতে—সেখানেই এই ভাষার রিক্ততা ও অপ্রাচুর্য প্রমাণিত হয়েছে। এই পদাতিক ভাষা যে কোনও দিন ভাবলোকের ঊর্ধ্বগগনে আরোহণ করতে পারবে এ সম্ভাবনা কারুর মনে উদয় হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে এ সত্য কারুর মনে প্রতিভাত হয়নি যে, ভাষার শক্তি নির্ভর করে শুধু শব্দচয়নের ও গঠনরীতির উপর নয়, এর ভাবগত আবেষ্টনের সমবেত ব্যঞ্জনার উপর। গভীর আবেগে সাধারণ কথাবার্তার মধ্যেও যেমন অজ্ঞাতসারে কণ্ঠস্বরের আরোহণ-অবরোহণ চলে ও কম্পনের আভাস কানে বাজে, সাহিত্যিক ভাবপ্রকাশেও তেমনি ছোট-বড় শব্দগুলি এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে ও শব্দগত অর্থ অতিক্রম করে সুরের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। যে যাদুমন্ত্রে বঙ্কিম এই অসমগতি অশ্বযুগলকে নিজ সাহিত্যরথের বাহনরূপে নিযুক্ত করে ভাবরাজ্যের নূতন নূতন দেশ জয় করেছিলেন, তার রহস্য—বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য স্থগিত থাকল।

মহাকবি গ্যেটে

(১)

মহাকবি গ্যেটের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত সভ্য জগতে আয়োজন চলিতেছে। ভারতেও ঐ অনুষ্ঠান যথারীতি পালন করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। জগতে যে সমস্ত স্রষ্টা ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সমস্ত বিশ্বের মানসলোকে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন গ্যেটে তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগস্ট ফ্রাঙ্কফোর্টে ইহার জন্ম হয়। আজ দুইশত বৎসর পরে তিনি সর্বসম্মতভাবে পৃথিবীর অন্যতম মহাকবিরূপে

স্বীকৃত হইয়াছেন। আধুনিক যুগের দ্রুত গমনাগমন ও নিবিড় ভাব-বিনিময়-প্রবণতার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এক ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগসূত্রে সংযুক্ত হইয়াছে। স্বাধীনতা-লাভের পর ভারতও সম্মিলিত জাতিসংঘে সম্মানজনক আসন গ্রহণ করিয়াছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে মিলন ও সমতা-লাভের প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কাজেই আজ স্বাধীন ভারতে গ্যেটের বাণী ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বর্তমান যুগে বাস করিলে সেই যুগের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করিতে হইবে—নতুবা অন্যান্য প্রগতিশীল জাতির সহিত সমভাবে পা ফেলিয়া অগ্রসর হওয়া ভারতের পক্ষে অসম্ভব হইবে। এইদিক দিয়া গ্যেটের সাহিত্য ও মানসলোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে একান্ত কর্তব্য।

গ্যেটে সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তিনি আধুনিকতার একজন প্রধান অগ্রদূত। আধুনিক জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান জটিলতাকে সুসমঞ্জসভাবে জীবনের অঙ্গীভূত করিতে হইলে যে উদার ও সমন্বয়শীল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন তাহা এই মহাকবির রচনায় সুষ্ঠুরূপে উদাহৃত হইয়াছে। যে যুগে ও যে প্রতিবেশে তাঁহার প্রতিভা নিজ অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তাহাদের সাধারণ প্রভাব ও প্রবণতা ইহার বিপরীতধর্মীই ছিল। অথচ গ্যেটে নিজ প্রতিভার যাদুশক্তিবলে এই প্রতিকূল সমসাময়িক উপকরণকে রূপান্তরিত করিয়া ইহাকে নিজ মানস পরিণতির সহায়ক উপাদানরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার শিল্পীজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, ভাইমার (Weimar) নামক একটি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রখণ্ডে। তথাকার ডিউকের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে ও সেখানকার রাজসভা ও শাসন-ব্যবস্থার সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া পড়েন। এই রাজসভার আদব-কায়দা, রীতিনীতি, ধরণ-ধারণ, ইহার উৎসব-সমারোহ ও শিষ্টাচার-পদ্ধতি সমস্তই মধ্যযুগের সুনিয়ন্ত্রিত আদর্শের অনুগামী ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সংকীর্ণ কৃত্রিম-অনুশাসন-নিয়ন্ত্রিত, অলঙ্ঘনীয় বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ জমিদার-সভার অধিবাসী হইয়াও তিনি এক বিশ্বপ্রসারী জীবনদর্শনের অধিকারী হইয়াছেন—অতীত যুগের হাওয়ার ভিতর দিয়া তিনি সপ্তসমুদ্রের জীবনশক্তি-সমৃদ্ধ উচ্ছ্বসিত বায়ুপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়াছেন। ছোট ডিমের খোলা ভেদ করিয়া নভস্বান গরুড় পক্ষীর কিরূপে উদ্ভব হইল, তাহা সাহিত্য-জগতের একটি চিরন্তন প্রহেলিকা।

যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা মুখ্যতঃ রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসের যুগ। গ্যেটের তরুণ বয়সে ক্লাসিকাল রীতির সুপ্রতিষ্ঠিত আধিপত্য রোমান্টিক মনোভাবের অভ্যাগমে ক্রমশ শিথিল হইয়া পড়িতেছিল—পাষাণ-দুর্গের ফাটল দিয়া বন্য প্রকৃতির দুর্বার শক্তি ক্রমশ অংকুরিত হইতেছিল। গ্যেটের প্রথম রচনাগুলি এই অনিয়ন্ত্রিত, অপরিণত, সদ্যোমুক্ত ভাবের বাষ্পোচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়াছে। তরুণ মনের অসম্ভব আশা-আকাঙ্ক্ষা, অস্পষ্ট সৌন্দর্যাবেশ, অতি-স্ফীত হৃদয়াবেগ এই সমস্ত কাব্য ও নাটকে আপন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অর্ধ-সচেতন এক ঝটিকাবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। ইউরোপীয় সমস্ত সাহিত্যেই তরুণ মনের এই অশান্ত আবেগ-চাঞ্চল্যের সাহিত্যিক অভিব্যক্তি 'ঝড়-ঝাপটা আন্দোলন' এই বিশেষ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিল।

(২)

গ্যেটের পরিণত জীবনে এই ঝড়-ঝাপটা কাটিয়া গিয়া জ্ঞান-গম্ভীর, প্রজ্ঞা-সমুজ্জ্বল প্রশান্তি তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিল। সকালের মেঘ-কুয়াশা কাটিয়া সূর্যের ভাস্বর, দিঙ্মণ্ডল-উদ্ভাসী আবির্ভাবের সহিত তাঁহার এই মানস পরিণতি তুলনীয়। আবেগ-অনুভূতির অকুণ্ঠিত তীব্রতার সহিত স্বচ্ছ, বাষ্পাভাসমুক্ত মননশীলতার সমন্বয়ই তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। কাব্যে এই মননশীলতা, জ্ঞানগরিমা ও নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তনেই তাঁহার গৌরবময় মৌলিকতা। এই দিক্ দিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত সমসাময়িক কবিদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। ইংরেজ রোমান্টিক কবিগোষ্ঠীর মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী ও কীটস্ সকলেই প্রথম বয়সের প্রমত্ত ভাবাতিশয্যের স্তর অতিক্রম করিয়া আপন-আপন চিরন্তন বৈশিষ্ট্যে স্থির হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই কাব্যের এক এক ক্ষেত্রে দিক্‌পাল। কিন্তু তাঁহাদের কবিতায় অপরূপ ও বিচিত্র সৌন্দর্য-সৃষ্টির অবিনশ্বর নিদর্শন থাকিলেও জীবনের মহনীয় অভিজ্ঞতার সারনির্যাস, পরিপক্ব ও পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার প্রশান্ত গাম্ভীর্য বিষয়ে তাঁহারা কেহই গ্যেটের সমকক্ষ নহেন। আর কোন কবিই কাব্যের মাদকতার সহিত ঋষিজনোচিত দিব্যদৃষ্টির, রসানুভূতির সহিত চিত্তবৈদগ্ধ্যের এমন সার্থক সমন্বয় ঘটাইতে, ফেনোচ্ছ্বসিত, রক্তিম-বুদ্‌বুদ-বিক্ষুব্ধ পানপাত্রে জীবনের পরম তাৎপর্যদ্যোতক সুধা পরিবেশন করিতে পারেন নাই।

ম্যাথিউ আর্নল্ড যখন ইংরেজ রোমান্টিক কবিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মননশীলতার অভাবের অভিযোগ আনেন, তখন তিনি প্রধানত গ্যেটের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। অবশ্য ইংরেজ কবিদের মধ্যে যে চিন্তাশীলতা একবারেই ছিল না তাহা নয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ আপনাকে দার্শনিক কবিরূপে পরিচিত করিতে বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন এবং তাঁহার 'আত্মজীবনী' কবি-মনোভাবের উন্মেষ-রহস্য-আলোচনায় খুব সূক্ষ্ম দার্শনিক অনুভূতির পরিচয় দিয়াছে। কোলরিজ দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও জার্মেনীর জড়াতীত দর্শনশাস্ত্রের বাণীকে প্রথম ইংরেজী সাহিত্যে পরিবেশন করেন। তথাপি ইঁহাদের দার্শনিকতা একদেশদর্শী ও মতবাদাত্মক ছিল—জীবনের বিচিত্র গ্রন্থ হইতে তাঁহারা দার্শনিকতা আহরণ করেন নাই। ইহারই ফলে তাঁহাদের কাব্যে দার্শনিকতার ধারা অল্পদিনেই শুকাইয়া গেল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেষ পর্যন্ত নীতিবাদ ও প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের সমর্থকে পরিণত হইলেন; কোলরিজ—যাহাকে শেলী অভিহিত করিয়াছিলেন 'সূক্ষ্মানুভূতিশীল মনস্তত্ত্ববিদ্' আখ্যায়—কেবল অতিপ্রাকৃত ও অপ্রকৃতিস্থ-জাতীয় উপলব্ধির রূপায়ণেই তাঁহার মননশীলতার প্রয়োগ করিয়াছেন। ইংরেজ কবিগোষ্ঠীর মধ্যে কীটস্ জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত এক নূতন দার্শনিক মনোভাব গঠনের সাধনা করিতেছিলেন—যে দর্শন নাড়ীস্পন্দন ও রক্তপ্রবাহের সহজ ছন্দে জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইবে। কিন্তু এই দর্শনের কাব্যপরিচয় তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া যাইবার অবসর পান নাই—যখন তাঁহার চিত্তের গহনতলে এই নব দার্শনিকতার অপরিণত আদর্শ গোপন ছায়াপাত করিতেছিল তখন তাঁহার লেখনী রূপের ছবি আঁকিতেই ব্যস্ত ছিল। ম্যাথিউ আর্নল্ডের প্রচারিত কাব্যের আদর্শ সর্বজনস্বীকৃত নহে; কিন্তু ইহার বৈধতা মানিয়া লইলে রোমান্টিক কবিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তিনি যে প্রজ্ঞা-সমর্থন-রহিত আবেগাতিশয্যের অভিযোগ আনিয়াছেন তাহার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না।

গ্যেটের দার্শনিকতা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল। তিনি কোন বিশিষ্ট মতবাদ অনুসরণ করিয়া সুলভ দার্শনিক খ্যাতি অর্জন করেন নাই। যুগের বিচিত্র ভাব-প্রবাহ, ইহার শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, বিজ্ঞানের অনুশীলনে যে সমস্ত অভিনব চিন্তাধারা পরীক্ষিত হইতেছিল, ইহার কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে যে মানবিকতার আদর্শ নানা ব্যর্থতা, লক্ষ্যচ্যুতি ও দ্রুত ফললাভের দুরাশা-বিড়ম্বনার ফাঁকে ফাঁকে ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল, জীবনের বিভিন্নমুখী,

অথচ সমবেত অভিজ্ঞতা যে নিগূঢ় সত্যপরিণতির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিতেছিল—গ্যেটের কাব্য এই সমস্তকে আত্মসাৎ করিয়া জীবনের এক মহনীয় সম্ভাবনাকে, এক সর্বব্যাপী তাৎপর্যকে, আধুনিকতার মূলবীজস্বরূপ এক বিরাট বিশ্বরূপ-দর্শনকে নিজ অনবদ্য সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্যে বিধৃত ও সংহত করিয়াছিল। মানবের অগ্রগতি ও ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতাকে আর প্লেটো-আরিস্টটলের দর্শন, মধ্যযুগের ধর্মবোধ বা নবজাগরণের হর্ষোৎফুল্ল, বিজয়দৃপ্ত আশাবাদের গণ্ডির মধ্যে ধরিয়া রাখা যাইতেছিল না। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপচীয়মান ভাণ্ডার আর পূর্বকালীন দার্শনিক মতবাদের গৃহিণীপণায় সুবিন্যস্ত হইতেছিল না। গ্যেটের কাব্য এই যুগ-প্রয়োজনের প্রেরণাকেই নিজ নিয়ামক শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ জড়বিজ্ঞানের প্রগতি মানবের পূর্বযুগের সংস্কার-বিশ্বাসের ভারসাম্যকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহার চিন্তায় ও জগতের সহিত তাহার সম্পর্ক-স্থাপনের প্রয়াসে তুমুল অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার প্রবর্তন করিয়াছিল। সৃষ্টিতত্ত্ব, মানব সম্বন্ধে ভগবানের উদ্দেশ্য, জীবনের অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী, পাপ-পুণ্যের মানদণ্ড, জীবনযাত্রানির্বাহের নূতন আদর্শবাদ—এই সমস্ত বিষয়ে যত্নরচিত প্রাচীন ব্যবস্থাগুলি আততায়ী বিজ্ঞান-শক্তির অভিভবে তাহাদের প্রভাব হারাইতেছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এক সুদূর, অনিশ্চিত ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও কাব্যের মিলনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এই স্বপ্ন যে কবে সত্য হইবে, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন দৃঢ় প্রতীতি ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহারই প্রায় সমসাময়িক এই জর্মান মহাকবি তাঁহার স্বপ্ন-পরিকল্পনাকে যে অনেকখানি বাস্তবের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না। গ্যেটে কবি হইয়াও দীর্ঘদিন ধরিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত ছিলেন; এবং এই গবেষণার স্থায়ী ফল যত সামান্যই হউক না কেন, ইহা যে তাঁহার কাব্যে একটি নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর, একটি সত্যান্বেষী মনোভাবের প্রবর্তন করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ।

(৩)

গ্যেটের বহুসংখ্যক রচনার মধ্যে মাত্র দুইটির একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনার সাহায্যে তাঁহার মানস প্রবণতা ও সত্যনিষ্ঠার সহিত কাব্যোৎকর্ষের বিরল সমন্বয়ের কিছুটা ধারণা জন্মিতে পারে। প্রথম হইতেছে তাঁহার "ভিল্‌হেল্‌ম মাইস্টারের শিক্ষানবীশী"; এবং দ্বিতীয়টি তাঁহার জগৎবিখ্যাত অমর নাট্য-কাব্য

"ফাউস্ট"। প্রথমটি তাঁহার অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের রচনা। বাইরের ঘটনা-বিন্যাসের দিক দিয়া এইটি রোমান্সধর্মী আখ্যায়িকার পর্যায়ে পড়ে। নানা অপ্রত্যাশিত ঘটনার সমাবেশ, অতর্কিত পরিচয়-উদ্ঘাটন, জীবনের বিসর্পিত পথে নানা পথিকের ক্ষণিক মিলন—এই সমস্ত লক্ষণ উপন্যাসটিকে একটি ভ্রমণ-অভিযান-কাহিনীর (picaresque novel) বাহ্য সাদৃশ্য আরোপ করিয়াছে। কিন্তু ইহার অন্তরের নির্ভীক সত্যানুসন্ধিৎসা ইহার বাহ্য চাঞ্চল্যকে এক অভিনব জীবনবেদের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। জীবনের বিশৃঙ্খলা ও বৈচিত্র্য, ইহার আপাতঃ-অসংলগ্ন, কিন্তু বস্তুত নিগূঢ় বিধানের অনুবর্তী ঘটনা-পরম্পরা, ইহার হিল্লোলিত প্রাণ-প্রাচুর্য ও অনুভূতির প্রসার ও গভীরতা এই উপন্যাসের অন্তর-সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়াছে। পথের দুই পাশে যেন জীবনের মহামেলা বসিয়াছে; অগণ্য-কণ্ঠধ্বনিত কলকোলাহলের মধ্য দিয়া যেন জীবনের নিগূঢ় সত্যবাণী রূপ লাভ করিতেছে; নরনারীর বিরহ-মিলন, ভুল-ভ্রান্তি, ভাব-বিনিময়ের মধ্য দিয়া অদম্য প্রাণশক্তির দুর্বার প্রবাহ এক অজ্ঞাত কল্যাণময় লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। রক্তের উত্তপ্ত প্রবাহ, হৃদয়ের দুর্নিবার আবেগ, প্রণয় ও মোহভঙ্গের বিপরীতমুখী মন্থন হইতে, বিধাতার ঐন্দ্রজালিক কটাহে জ্বাল দেওয়া সুধাসারের ন্যায়, এক অমোঘ-বীর্য সত্য-রসায়ন বাষ্প-ফেনা-বুদ্‌বুদের মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। মহাকবি এই উপন্যাসে পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের যে ধারা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা চিরপ্রথাগত নীতিবাদের গতানুগতিক পথ অনুসরণ করে না। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে ও তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রাবলীর জীবন-অভিজ্ঞতায় যৌন সংযম ও একনিষ্ঠতার আদর্শ বিশেষ মর্যাদা লাভ করে নাই। প্রায় সর্বত্রই দুর্বার কামনা, সৌন্দর্যোপভোগের অনিবার্য মোহ লেখক ও তাঁহার মানস সন্ততিসমূহকে বারে বারে দৈহিক বিশুদ্ধির অনুশাসন-লঙ্ঘনে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত রোমাঞ্চকর, সত্তার গভীরদেশাবগাহী অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তাহাদিগকে আত্মপরিচয়লাভ ও আত্মোৎকর্ষের পথে পরিচালিত করিয়াছে। অসামাজিক প্রণয়ের উন্মাদনা তাহাদের শিল্পানুভূতিকে প্রখরতর ও শিল্পী-জীবনকে সমৃদ্ধতর করিয়াছে। ইহা যেন তাহাদের পক্ষে পলিমৃত্তিকাবাহী, মলিন স্রোতোজলে অবগাহন-চলমান জীবনধারার সংস্পর্শে যে মানস উল্লাস ও স্ফূর্তি তাহাই দেহের পঙ্কিলতা-শোধনের উপায় হইয়াছে। আমাদের অতি-আধুনিক সাহিত্যের কোন কোন বিভাগে যে নিছক পঙ্কায়ন-প্রবণতা ও অশ্লীলতার

রোমন্থন-প্রক্রিয়া লক্ষিত হয় তাহার সহিত ইহা মোটেই একজাতীয় নহে। উপন্যাসের যাত্রাপথে, ইহার অগণিত সংঘটনের ফাঁকে ফাঁকে, ইহার জনসংঘের পারস্পরিক সম্মিলনের উপলক্ষে, শিল্প ও জীবন সম্বন্ধে মহামূল্য অভিজ্ঞতা, মন্তব্য-আলোচনার গভীর অর্থ-গৌরব প্রচুরভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই জীবনদর্শনের মৌলিকতা ও যুগোপযোগী তাৎপর্যের মধ্যেই গ্যেটের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্যিক মর্যাদার রহস্য নিহিত আছে।

ইহার পরে গ্যেটের অমর রূপক-কাব্য 'ফাউস্ট'-এর সংক্ষিপ্ত আলোচনার সহিত প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অমিত জ্ঞানার্জনে সহায়তার শর্তে শয়তানের নিকট আত্মবিক্রয়—একটি অতি প্রাচীন লোকসংস্কার ও কিংবদন্তী। মধ্যযুগে ও তৎপরবর্তী নবজাগরণের যুগে এই কাহিনী অনেকবার কাব্যে ও চিত্র-শিল্পে রূপায়িত হইয়াছে। মধ্যযুগে শয়তানের সঙ্গে সহযোগিতার প্রায়শ্চিত্তই প্রধান উদ্দেশ্যরূপে চিত্রিত হইয়াছে—সহযোগিতার কারণ যতই শ্লাঘনীয় হউক মধ্যযুগের যাজক-শাসিত মনোবৃত্তির নিকট উহার পাপের বিশেষ কোন তারতম্য হয় নাই। নব-জাগরণের যুগে মার্লোর নাটকে ফাউস্টের জ্ঞানার্জন-স্পৃহার মধ্যে যে মহনীয় আদর্শবাদ ক্রিয়াশীল তাহার প্রতি কথঞ্চিৎ মর্যাদা দেখান হইয়াছে। নাট্যকার অবশ্য শেষদৃশ্যের অনুতাপ ও মৃত্যুভীতিব্যাকুলতার চিত্রাঙ্কনেই তাঁহার নাটকীয় শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভাব-কল্পনার দিক হইতে ফাউস্টের সর্বজ্ঞতা-লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা শক্তিমদমত্ততারই একটি প্রকারভেদরূপে গৃহীত হইয়াছে—এই অদম্য জ্ঞানানুসন্ধিৎসার মধ্যে নূতন নূতন ভোগসুখের প্রকরণ-আবিষ্কারই নায়কের আসল উদ্দেশ্য। ইহার মধ্যে সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ, অস্তিত্বের চরম উৎকর্ষ-শিখরে আরোহণ বা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ-কামনা মৌলিক বীজরূপেও আভাসিত হয় নাই।

মহাকবি গ্যেটে এই প্রাচীন কাহিনীটিকে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুগযুগান্তরের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির সঞ্চয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং সত্যান্বেষী মানবাত্মার দুর্গম, রহস্যময় পথে পূর্ণ আত্মবিকাশের দিকে বিজয়াভিযানই ইহার মর্মবাণী-রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার ফাউস্ট আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী মহাপুরুষ—সে মধ্যযুগের শয়তান-সহচর বা তৎপরবর্তী যুগের আত্মাভিমানস্ফীত, উত্তপ্তমস্তিষ্ক, মন্ত্রশক্তিতে অঘটন-ঘটন-প্রয়াসী যুবক মাত্র

নহে। শুষ্ক জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চায় ক্লান্ত হইয়া ও ইহার ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া সে বিচিত্র অভিজ্ঞতার রস-গ্রহণের দ্বারা দিব্যচেতনার উদ্বোধন করিতে অভিলাষী এবং মানববক্ষনিহিত স্বর্গীয় অতৃপ্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই সে মেফিস্টো-ফিলিসের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। পবিত্র, উচ্চতম আদর্শে উৎসর্গীকৃত মানবাত্মা যে কোন প্রলোভনেই তাহার ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা হারাইতে পারে না, শয়তানের সহস্র প্ররোচনাতেও যে তাহার শাশ্বত সৌন্দর্য ও পবিত্রতা কলঙ্কলিপ্ত হইবার নহে, ভগবান তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই তাহাকে শয়তানের হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন। শয়তান তাহাকে লইয়া নানা খেলা খেলিয়াছে, তাহার মনে নানা বাসনা উদ্রিক্ত করিয়াছে, সরলতার প্রতিমূর্তি মার্গারেটকে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী করিয়া তাহার দ্বারা তাহার সর্বনাশ ঘটাইয়াছে; তাহার যাদুবিদ্যা-প্রভাবে গ্রীসের প্রাচীন সৌন্দর্যবাদমূলক সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া গ্রীক সৌন্দর্য-জগতের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী হেলেনকে তাহার অঙ্কশায়িনী করাইয়াছে; নানা বিকৃত, ব্যঙ্গাত্মক নীতিবাদের প্রভাবে তাহার সুস্থ প্রকৃতিকে বিষজর্জর ও অধোগামী করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু তাহার সমস্ত ক্রুর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ফাউস্টের স্বাভাবিক চরিত্রগৌরব সমস্ত প্রলোভন ও কুশিক্ষার উপর জয়ী হইয়া নিজ মহিমা ঘোষণা করিয়াছে। তাহার জীবনা-বসানের পর দেবদূতেরা তাহাকে লইয়া উন্নততম স্বর্গে আরোহণ করিয়াছে। মানবিক করুণা ও তাহার পূর্ব প্রণয়িনী মার্গারেটে রূপপ্রাপ্ত স্বর্গীয় মার্জনা তাহাকে ঊর্ধ্বলোকের পথে আলোক দেখাইয়া লইয়া গিয়াছে। আধুনিক জীবনাদর্শের কর্মতৎপরতা ও মানস প্রগতির বিরাট পরিধি, ইহার অধ্যাত্ম সাধনার শ্রেষ্ঠতা এই মহাগ্রন্থে অনুপম কাব্যসৌন্দর্য ও সার্থক রূপক-ব্যঞ্জনার সাহায্যে অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৪)

গ্যেটের রচনাবলীতে যে সাংস্কৃতিক আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা এখনও সাধারণ শিক্ষিত ও রসপিপাসু সমাজের অনায়ত্ত। যে উদার, অনাসক্ত ও সর্বসমন্বয়কারী মনোবৃত্তি লইয়া তিনি তাঁহার জীবনদর্শন রচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা এখনও গ্রহণ করিতে শিখি নাই। যাহারা শুধু গীতধর্মী ভাবোচ্ছ্বাস, প্রণয়-বিহ্বলতার সুলভ উত্তেজনার পক্ষপাতী, মহাকবি সেই শ্রেণীর পাঠকের

তৃপ্তি বিধান করিতে পারিবেন না। তাঁহার গভীর সমাজ-চেতনা, আধুনিক যুগের নানা পরস্পর-বিরোধী উপাদানের মধ্যে সমন্বয়-স্থাপনের দুরূহ সাধনা, জীবন-সমালোচনার প্রজ্ঞা-ভাস্বর প্রশান্তি, অতন্দ্রিত সুষমাবোধ—এই সমস্ত গুণই সুলভ জনপ্রিয়তার ঠিক অনুকূল নহে। উত্তুঙ্গ পর্বতশিখরে অবস্থিত, সূর্য-করোদ্ভাসিত-তুষাররাশি-বেষ্টিত মন্দিরে পূজারীর ভিড় বেশী না হইবারই কথা। তাঁহার নিজ জন্মভূমি জার্মানীও পরবর্তী যুগে নিট্‌শের নির্মম শক্তিবাদের মোহে, জাতীয় শ্রেষ্ঠতার মিথ্যা অভিমানে তাঁহার আদর্শকে বিসর্জন দিয়াছে। 'কালচার' কথাটিকেই জর্মনরা নূতন অর্থে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। বিদেশী মনীষীদের মধ্যে ফ্রান্সে রোমঁা রোলঁা ও ভারতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের জীবনদর্শনে ও সাংস্কৃতিক আদর্শে কতকটা গ্যেটের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। তাঁহার জন্মের দুই শত বৎসর পরেও তাঁহার মতবাদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আজ আণবিক বোমার যুগে বৈজ্ঞানিক শক্তি সমস্ত নীতি-নিয়ন্ত্রণ ও কল্যাণবোধকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া উদ্দাম ধ্বংসপ্রবণতার নেশায় আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। আজ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, জাতিতে জাতিতে উগ্র সংঘর্ষ কোন উচ্চতর আদর্শ বা চিত্ত-প্রকর্ষের দোহাই মানিতেছে না। আজ ক্ষুদ্র স্বার্থ-প্রণোদিত শ্রেণীসংঘাত জগতের বৃহত্তর শান্তি ও হিতবাদকে বিড়ম্বিত করিতেছে। সমস্ত মানব জাতি যেন গ্যেটের মহান্ আদর্শের বিপরীত পথে অতলস্পর্শ মৃত্যু-গহ্বরের দিকে আত্মঘাতী উন্মত্ততার সহিত ছুটিয়া চলিয়াছে। সুতরাং বর্তমান উদ্‌ভ্রান্তি ও বিমূঢ়তার যুগে গ্যেটের সাহিত্যের অনুশীলন ও তাঁহার আদর্শ-প্রচার জগতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতেও অকস্মাৎ-লব্ধ স্বাধীনতার অনুষঙ্গী আদর্শ-সংঘাত ও উদ্দেশ্য-বিভ্রান্তি আজ তীব্রতমরূপে দেখা দিয়াছে। জীবনকে সমগ্রভাবে বুঝিবার চেষ্টা, স্বচ্ছ, আবেশহীন প্রজ্ঞার আলোকে জীবনগ্রন্থ-পাঠের সাধনা, উদার চিত্তপ্রকর্ষের দ্বারা বর্বরতার অভিযানের প্রতিরোধ, অন্তর্দ্বন্দ্বহীন শান্তির ভিত্তিতে সমাজ-সাম্য-প্রতিষ্ঠা—ইহাই এখন আমাদের বিশেষভাবে কাম্য। মহাকবির জন্মোৎসব উপলক্ষে যদি অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজে তাঁহার প্রভাব আরও কার্যকরী হয়, তাঁহার আদর্শ আরও ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়, তবেই ইহা কেবল নিরর্থক, বহিরঙ্গমূলক অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে উন্নীত হইয়া সত্যিকার সার্থকতা লাভ করিবে।

* কবিগুরু গ্যেটে

(১)

কাব্যে ও সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ কি এই প্রশ্ন লইয়া বিস্তর আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু আলোচনা-ফলে যে সম্পূর্ণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এরূপ দাবী করা যায় না। তবে এই আলোচনা যে আমাদের সাধারণ ধারণা পরিষ্কার করিতে কতকটা সাহায্য করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্য মোটামুটি আবেগপ্রধান ছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। বাস্তব জীবনের সমস্যা, জীবনের সামগ্রিক সমালোচনা ও মননশীলতা তখনও কবি-চিত্তকে বিশেষভাবে অধিকার করে নাই। হয় মুহূর্তের আবেগ ও ভাবানুভূতি না হয় স্থির ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনদর্শন কাব্যের উপজীব্য বিষয় ছিল। গীতিকবিতাতে তীব্র হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি, মহাকাব্যে সাধারণ-লক্ষণান্বিত, একই আদর্শের অনুবর্তী জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি, দার্শনিক কবিতায় চির-প্রচলিত ধর্মসংস্কারের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিরচনা—কাব্যসাহিত্য এই ত্রিধারা অবলম্বন করিয়াই প্রবাহিত হইয়াছে। শেষ দুই জাতীয় কাব্যে চিৎপ্রকর্ষ বা মননশীলতার যে পরিচয় তাহা চিরপ্রথাগত জীবনবাদ ও অধ্যাত্মনিষ্ঠাপ্রসূত; তাহাতে বর্তমান জীবনের নূতন ছন্দকে অঙ্গীভূত করার, সদ্যোউদ্ভূত সমস্যাসমূহের উদার স্বীকৃতির কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না। ব্যাস-বাল্মীকি-হোমার-ভার্জিল-মিল্‌টন্-স্পেন্সার-ট্যাসো-আরিয়স্টো প্রমুখ মহাকাব্য-রচয়িতাগোষ্ঠী যে জীবনদর্শন রূপায়িত করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের নিজস্ব আবিষ্কার বা অনুভূতির ফল নহে, সুপ্রতিষ্ঠিত, সর্বজনস্বীকৃত নীতি ও আদর্শবাদের কাব্যসৌন্দর্যভূয়িষ্ঠ অনুসৃতি মাত্র। তাঁহাদের মানস-সত্তা প্রতিবেশের সহিত নিবিড়-সংশ্লেষপুষ্ট হইয়াই নিজ সক্রিয়তার নিদর্শন দিয়াছে। তাঁহাদের মানসমুকুরে জাতীয় সংস্কৃতি বা সম্প্রদায়গত মনোভাবই অখণ্ড সমগ্রতায় ও সুদীর্ঘ পরিচয়সঞ্জাত ভাবগভীরতার সহিত প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

এই বহুশতাব্দীব্যাপী ধারায় একমাত্র ব্যতিক্রম মিলে ডান্টের মহাকাব্যে। এখানে ব্যক্তিগত তীব্র অনুভূতির সহিত মহাকাব্যের চিরপ্রথানুযায়ী সার্বভৌম ভাব-সংস্কৃতির এক অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। মহাকাব্যের ঘটনাবিন্যাস,

* কবিগুরু গ্যেটে—কাজী আবদুল ওদুদ।

গঠনবৈশিষ্ট্য ও অখণ্ড ভাবসংহতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, উহার চিরনির্দিষ্ট আধারে সমসাময়িক ইতিহাসের তীব্র মানসবিক্ষোভ ও আদর্শ-সংঘাত, দ্রবীভূত গৈরিক প্রবাহের ন্যায় প্রবৃত্তির ধূমায়িত উষ্ণ উচ্ছ্বাস, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষোদ্গার—এককথায় বাস্তবতার তপ্ত কটাহে আবর্তিত মানবাত্মার আর্ত আক্ষেপ ও অস্বস্তি আশ্চর্য কলাকৌশল ও সঙ্গতিবোধের সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মহাকাব্যের প্রশান্ত, নিস্তরঙ্গ বেষ্টনীরেখার মধ্যে হৃদয়াবেগের, আত্মনিষ্ঠ অনুভূতির কি উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস, বাহিরে বিড়ম্বিত, কিন্তু অন্তরে আদর্শলোকের স্থির জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল, সার্থক প্রেমের কি মহিমামণ্ডিত, মর্মভেদী আনন্দ-বেদনা! মধ্যযুগের ধর্মবিশ্বাস ও যাজকতন্ত্রের মধ্যে, এক বিরাট আত্মার অধ্যাত্ম আকূতি, স্বর্গ নরকের রহস্যভেদী দিব্যদৃষ্টি, দৈববিড়ম্বিত মানবিকতার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা যে কেমন করিয়া সংকীর্ণ বোতলের মধ্যে ধূম্রপুঞ্জাকৃতি দৈত্যদেহের ন্যায় অবলীলাক্রমে বিধৃত হইল তাহা শিল্পপ্রতিভার এক অপূর্ব বিস্ময়। এই মহাকাব্যে মননশীলতা, দার্শনিক ও ধর্মবিষয়ক আলোচনার প্রাচুর্য আছে, কিন্তু ইহাতে বিশ্ববিধানকে নূতন করিয়া দেখিবার কোন চেষ্টা নাই, প্রচলিত ধর্মসংস্কারকেই আত্মানুভূতির আলোকে উজ্জ্বল করিয়া দেখান হইয়াছে। তাই ডান্টের মৌলিক প্রতিভা পুরাতনকেই নবসৌন্দর্যমণ্ডিত, নবপ্রাণোচ্ছলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সংস্কার-মুক্তি ও চিত্তের উদার অগ্রগতির প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক হয় নাই।

ইহার পর আসিয়াছে নবজাগৃতির যুগ (renaissance)। এই যুগে মানবচেতনায় আসিয়াছে নবভাবপ্লাবন, নূতন আলোক ও অনুভূতির জোয়ার। মধ্যযুগের ধর্মতন্ত্রশাসিত সীমা অতিক্রম করিয়া মানবমন এক নূতন জীবনবাদ ও সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে—জীবনপরিধি সুদূর, অপরিজ্ঞাত দিগন্তরেখা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। মানুষ নিজেকে দৈবের ক্রীড়নক, এক অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থার অঙ্গরূপে বিবেচনা না করিয়া আত্মশক্তির অনন্ত সম্ভাবনার প্রতি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। মানবের দুঃসাহসিকতা ভৌগোলিক রাজ্যে ও চিন্তারাজ্যে নব নব দেশ আবিষ্কার ও জয়ের অভিযানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এক অভূতপূর্ব উল্লাস ও উদ্দীপনা তাহার সমস্ত সৃষ্টির ভিতর দিয়া স্ফুরিত হইয়াছে—আত্মকেন্দ্রিকতায় আবর্তিত চিত্ত মুক্তি ও অগ্রগতির আকর্ষণে বিশ্বকেন্দ্রের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। মানবমনের আধুনিকতার মন্ত্রদীক্ষায় নবজাগৃতি-যুগের দানের মূল্য অপরিসীম।

তথাপি এ যুগেও কাব্য-সাহিত্যে আধুনিক মনোভাবের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় নাই—সংস্কারমুক্তির উৎকট আনন্দ, শিশুসুলভ মনের বিস্ময়-প্রত্যাশী উত্তেজনা প্রজ্ঞাবোধসঞ্জাত সামগ্রিক জীবন-বিচারকে বিচলিত করিয়াছে। শেক্সপিয়ারের নাটকাবলীতে মানবহৃদয়ের চমকপ্রদ বিচিত্র বিকাশের স্বরূপ-নিরূপণের ভিতর দিয়া যে জীবনদর্শন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার প্রশান্ত গভীরতা, ক্ষমাস্নিগ্ধ ঔদার্য ও আকস্মিক ব্যতিক্রমের সমীকরণনৈপুণ্য মানব-প্রজ্ঞার চরম উৎকর্ষরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু এই জীবনদর্শন ধীর, অপ্রমত্ত বিচারবুদ্ধির আলোচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নহে; ইহা দিব্যদৃষ্টির ধ্যানলব্ধ অতর্কিত আবিষ্কার। শেক্সপিয়ার যে অজ্ঞাত কৌশলে বিশ্বস্রষ্টার অপক্ষপাত মনোভাব ও সৃষ্টিরহস্য আয়ত্ত করিয়াছিলেন আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার রসাস্বাদন করি, কিন্তু এই অলৌকিক প্রতিভার নিগূঢ় প্রেরণা আমাদের নিকট অনাবিষ্কৃতই থাকিয়া যায়।

অষ্টাদশ শতকে সমগ্র ইউরোপের কাব্যসাহিত্যে কবিকল্পনা অপেক্ষা যুক্তিবাদ ও মননশীলতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই শতাব্দীতে অভিনব আবিষ্কারের বিস্ময়-চমক ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া জীবনকে নিয়মশৃঙ্খলার অধীনরূপে দেখিবার প্রয়াস আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের অন্তরজীবনের নিগূঢ় রহস্য অপেক্ষা তাহার সামাজিক ও রাজনৈতিক আচরণই বিশেষভাবে সাহিত্যের বিষয় হইয়া উঠে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের সঙ্গে যুক্তিবাদ ও তার্কিকতা সাহিত্যের সাধারণ গুণরূপে প্রকটিত হয়। কিন্তু এই তর্কপ্রবণতা মানুষের বহির্জীবনের কয়েকটি অগভীর দিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ইহা জীবনের সূক্ষ্ম, সুকুমার, রহস্যমণ্ডিত, অধ্যাত্মাভিমুখী বিকাশগুলিকে নিজ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে নাই—একটি সমগ্র জীবনদর্শন গড়িয়া তুলিবার কোন চেষ্টাই ইহার মধ্যে লক্ষিত হয় না। বিজ্ঞান পূর্বধারণা ও সমন্বয়কে বিপর্যস্ত করিয়াছে মাত্র, কিন্তু জীবনের ছন্দোমধ্যে ইহা গ্রথিত হয় নাই। প্রাচীন জীবনের ঠাসবুনানি আল্‌গা হইয়াছে, কিন্তু ইহার শূন্য স্থানগুলিকে নূতন উপাদানে পূর্ণ করিবার কোন ব্যবস্থা দেখা যায় নাই। জীবন-দর্শনের অগভীর একদেশদর্শিতা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের অনিবার্য প্রাথমিক ফলরূপে দেখা দিয়াছে।

(২)

এই পটভূমিকায় গ্যেটের আবির্ভাব ও সাহিত্যরচনার পূর্ণ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার সুবিধা হইবে। আধুনিকতার পূর্ণ দ্যোতনা সর্বপ্রথম তাঁহার মনে প্রতি-

বিস্মিত হয় ও তাঁহার সাহিত্যই ইহার প্রথম সার্থক অভিব্যক্তি। দুই শত বৎসরের জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞানসাধনা ও স্বাধীন মননশীলতা যে-সমস্ত নূতন তত্ত্ব আহরণ করিয়াছে, মানবের চিত্তক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে যে অভিনব ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে সে সমস্তই গ্যেটের কাব্যে কেন্দ্রীভূত ও সংহত হইয়া এক নূতন জীবনবেদের ভিত্তি রচনা করিয়াছে। তাঁহার সর্বতোমুখী স্বীকরণশক্তি জীবনের কোন অংশকেই বর্জন করে নাই—ইহার ক্রমবর্ধমান জটিলতা, ইহার সংশয়ক্লিষ্ট উদ্‌ভ্রান্তি, ইহার প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে নূতন তাৎপর্য ও প্রাণশক্তির আবিষ্কার, সর্বোপরি ইহার নানা বিচিত্র, বিভ্রান্তকারী অভিজ্ঞতার এক গভীরতর ঐক্যসূত্রে বিধৃতি তাঁহার অনুভূতি ও সৃষ্টিশক্তির মধ্যে ধরা দিয়াছে। বিজ্ঞান তাঁহার নিকট কেবল নেতিমূলক নিষেধবাক্য নহে, দর্শন কেবল মতবাদের সংঘর্ষাত্মক কূটতর্ক নহে, সাহিত্য কেবল সহজ স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ নহে, জীবন কেবল কতকগুলি বিভিন্নাভিমুখী প্রবৃত্তি ও প্রেরণার আকস্মিক সংযোগভূমি নহে। তাঁহার হাতে কাব্য ক্রীড়াশীল, দায়িত্বজ্ঞানহীন শৈশবকল্পনা ও তরুণের ভাববিহ্বল স্বপ্নাবেশের পর্যায় অতিক্রম করিয়া পূর্ণ-পরিণত, বিদগ্ধ রসিকচিত্তের উজ্জ্বল প্রজ্ঞাশক্তিতে উন্নীত হইয়াছে। এই সাহিত্য তাহার আবেগধর্মিতা না হারাইয়া ইহার সহিত বিচিত্র ও বহুমুখী অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটাইয়াছে; গীতিকবিতার ক্ষুদ্র পরিসর ও ক্ষণিক ভাবানুভূতির মধ্যে ক্রমবিবর্তনের সমস্ত নিগূঢ় ইঙ্গিত, সত্যানুসন্ধিৎসার সমস্ত সাধনা ছন্দের ললিত ভঙ্গী ও শব্দের ধ্বনিমাধুর্যের সহিত নিশ্চিহ্নভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

তাঁহার মহাকাব্য 'ফাউস্ট' আধুনিকতার জীবন-বেদরূপে অনন্যসাধারণ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্যযুগের একটি সুপরিচিত কিংবদন্তীকে আশ্রয় করিয়া, মধ্যযুগীয় মানসসংস্কৃতি ও আদর্শের কাহিনীকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া গ্যেটে এই বিরাট মহাকাব্যে মানবাত্মার অগ্রগতির সমস্ত স্তর ও পর্যায়পরম্পরা রূপক-ব্যঞ্জনার অসামান্য সার্থকতার সহিত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পুরাতন কাহিনীর স্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়া জীবনের নূতন ব্যাখ্যা, অনুভূতির নূতন প্রগাঢ়তা, অভীপ্সা ও আকাঙ্ক্ষার নূতন প্রেরণা, অস্তিত্বের লক্ষ্য ও পরম আদর্শের নূতন রূপ, আত্মবিকাশের অদম্য আগ্রহ গভীর দ্যোতনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগীয়

কল্পনার স্বর্গ-নরক-দেবদূত-শয়তান-ঈশ্বর এক অভিনব অর্থগৌরবমণ্ডিত হইয়া, নিগূঢ় বিশ্ববিধানের নূতন তাৎপর্যবাহী হইয়া, আধুনিক ভাবধারাপুষ্ট তত্ত্বান্বেষী মনের নিকট এক-একটি নূতন ভাববিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। প্রাচীন আখ্যানাশ্রয়ী শাশ্বত ধর্মবোধ কবিমানসস্পর্শে পুরাতনের মধ্যে নূতন প্রাণরসের সন্ধান পাইয়া আবার ভবিষ্যৎ যুগের যাত্রাপথের পাথেয় ও প্রেরণা যোগাইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে।

আধুনিকতার প্রতিষ্ঠার জন্যই গ্যেটে মানবের চিন্তাক্ষেত্রে চিরন্তন প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবেন। তাঁহার মানস উদারতা ও প্রসার, প্রজ্ঞাপ্রোজ্জ্বল, সমন্বয়কারী দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান যুগের সমগ্র অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করিয়া জীবনের মূল্যনির্ধারণ ও জীবনযাত্রার আদর্শ নির্ণয় করিয়াছে। তাঁহার সহানুভূতিস্নিগ্ধ ক্ষমাশীলতা, জীবনের অপরিমেয় রহস্যের উপলব্ধি প্রায় শেক্সপিয়ারের অনুরূপ; কিন্তু এই মনোভাব-অনুশীলনের পদ্ধতিটি বিভিন্ন। শেক্সপিয়ার নৈসর্গিক প্রতিভাবলে সৃষ্টিরহস্যের মূল তত্ত্বটি আয়ত্ত করিয়াছেন—একপ্রকার সহজ-সংস্কার-লব্ধ দিব্য চেতনা তাঁহার নিকট জীবনের কেন্দ্রীভূত মর্মকথাটি স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। গ্যেটে সমস্ত জীবনের শাখা-প্রশাখা, ইহার অসংখ্য বিচিত্র আবেগ ও প্রেরণাকে, বহুশতাব্দীব্যাপী জ্ঞানসাধনার পরিপূর্ণ সঞ্চয়কে ধীর স্থির প্রজ্ঞাময় দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া ইহার মূলগত তাৎপর্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন। সাধারণ মননশক্তিসম্পন্ন পাঠক তাঁহার ইঙ্গিত ও নির্দেশ অনুসরণ করিয়া জীবনের গোলোকধাঁধার মধ্য দিয়া গতিপথ করিয়া লইতে পারেন। এইখানেই গ্যেটের সমধিক উপযোগিতা। গ্যেটে আমাদের দুরন্ত কামনা, দুর্দমনীয় প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করেন নাই—তাঁহার নিজের জীবনে ও সৃষ্ট চরিত্রাবলীর আচরণে অসংযত প্রণয়াবেগের, নৈতিক পদস্খলনের বহু দৃষ্টান্ত পুঞ্জীভূত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত চ্যুতি-অসংযম প্রাণশক্তির বৃথা অপচয় ঘটায় নাই; ইহা পূর্ণতর বিকাশের সহায়তা করিয়াছে। তিনি অনিন্দনীয়তার সংকীর্ণ মানদণ্ডে জীবনের বিচার করেন নাই—আবেগের তীব্রতা, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি, নব নব অনুভূতির প্রচণ্ড অভিঘাত যে জীবনের অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহাই তাঁহার মতে শ্লাঘনীয় ও সৃষ্টির নিগূঢ় উদ্দেশ্যের অনুবর্তনশীল। জৈব বিজ্ঞান বংশানুক্রম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন ও ক্রমবিবর্তন-ধারা সম্বন্ধে যে নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, তাঁহার জীবন-বিচার তাহার পূর্ণ পর্যালোচনার উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার সচেতন

শিল্পবোধও অনন্যসাধারণ। কবিপ্রতিভার গতি, পুষ্টি ও পরিণতির প্রত্যেকটি স্তর, বাহিরের উপাদান কিরূপে কবিমানসের রূপান্তর ঘটায় ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি অসামান্যরূপে তীক্ষ্ণ। বৈজ্ঞানিক, নিরাসক্ত, সত্যসন্ধানী দৃষ্টি লইয়া তিনি কবিপ্রকৃতির অন্তর-রহস্য, কাব্যসৃষ্টির লোকোত্তর চমৎকৃতি ও ভাববিভোরতাকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং আশ্চর্যের বিষয় যে, এরূপ সূক্ষ্ম, সচেতন বিশ্লেষণ-শীলতা সত্ত্বেও তাঁহার কাব্যের অপার্থিব ইন্দ্রজাল কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। গ্যেটে কালিদাসের শকুন্তলা সম্বন্ধে যে স্মরণীয় উক্তি করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে তাঁহার নিজ কবিতা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, আদিম বিস্ময়ের ফুল ও পরিণত, রসসমৃদ্ধ প্রজ্ঞার ফল তাঁহার কাব্যে সার্থক সমন্বয়ে সংহত হইয়াছে।

(৩)

গ্যেটে চিত্তপ্রকর্ষ ও মানস সমুন্নতির যে উচ্চতম শিখরে অধিরোহণ করিয়াছেন ইউরোপীয় সংস্কৃতির সাধারণ মান তাহার তুলনায় বহু নিম্ন পর্যায়ের। জাহ্নবী-তরঙ্গের সমস্ত বেগ ও বিক্ষোভ জটাজুটের মধ্যে শান্তভাবে সংহরণ করার শক্তি এক মহাদেবেরই ছিল। গ্যেটের পরবর্তী বিশ্বসাহিত্যে বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায়ই কেহ সমন্বয়সাধনায় তাঁহার আদর্শের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া দুই বিরাট মহাযুদ্ধের অভিঘাতে সমগ্র বিশ্বের মানসসংহতি এরূপ-ভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে যে, ইহার কেন্দ্রিকতা ও ভাবসাম্য আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এখন শক্তিশালী সাহিত্যিকও জীবনকে উদ্‌ভ্রান্ত-বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখেন। উহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া, অণু-পরমাণুকে বিশ্লিষ্ট করিয়া একটি বিশেষ ভাব বা প্রবণতাকে অতিরঞ্জিত মর্যাদা-দানই আধুনিক সাহিত্যের রীতি। সমস্ত ইউরোপীয় সাহিত্যে এখন একদেশদর্শিতার ছাপ পড়িয়াছে ও ইহা গ্যেটের আদর্শ হইতে বহু দূরে সরিয়া আসিয়াছে।

ইউরোপীয় সাহিত্যেরই যখন এই অবস্থা তখন আমাদের বাংলা সাহিত্যের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এক রবীন্দ্রনাথের মানস প্রসার, নির্মল বিচার-বুদ্ধি ও সার্বভৌম গ্রহণশীলতা মহাকবি গ্যেটের আদর্শের সহিত অনেকটা সমকক্ষতার দাবী করিতে পারে। কিন্তু সাধারণ বাংলা সাহিত্যের চিত্তদৈন্য তাহার কল্পনাসমৃদ্ধির মধ্যেও অত্যন্ত সুপ্রকট। গ্যেটের কবিতার সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁহার মানসবৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া

আমাদের বিশেষ লাভবান হইবার সম্ভাবনা। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় শ্রীযুক্ত কাজী আবদুল ওদুদ মহাকবি গ্যেটের সহিত বাঙালী পাঠকের পরিচয় স্থাপনের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'কবিগুরু গ্যেটে' বাংলা সাহিত্যে মানসবৈদগ্ধ্যের গৌরবময় পরিচয়। এই গ্রন্থে সুধী ওদুদ সাহেব কবির জীবনচরিতের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বলবর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার আচরণের ব্যাখ্যা লইয়া যে যে স্থলে বিভিন্ন চরিতকারের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে ওদুদ সাহেব সেই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিয়া সর্বাপেক্ষা গ্রহণীয় মতটি যুক্তি-প্রমাণ-প্রয়োগসহ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই আলোচনার মধ্যে তাঁহার সত্যান্বেষী বিচারবুদ্ধির সুষ্ঠু পরিচয় মিলে। গ্যেটের পরিণত বয়স পর্যন্ত যে রূপোন্মাদ তাঁহাকে চঞ্চল করিয়াছে ও বারবার নৈতিক সংযমের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, কাজী সাহেব তাহার যথার্থ তাৎপর্য নির্ধারণ করিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বস্ফুরণে ও মানসপরিণতি-সাধনে তাহা কিরূপে সহায়তা করিয়াছে তাহা পরিষ্কাররূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। বিরাট প্রতিভার আলোচনায় শুচিবায়ুগ্রস্ত সংকীর্ণ নীতিবাদের মানদণ্ড সম্পূর্ণরূপে অপ্রযোজ্য। নিষেধাত্মক অনুশাসন তাঁহাকে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া তাঁহার সত্তাকে শীর্ণ করে। অপরাধের ভিতর দিয়াই তিনি পুণ্যের পথে অগ্রসর হন, ধূলিস্পৃষ্ট হইয়াই তাঁহার আত্মা মাজিত স্বর্ণপাত্রের ন্যায় আরও সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কাজী-সাহেব-বিবৃত কবির জীবনীপাঠে বাঙালী পাঠকের মনে তাঁহার সনাতন, অস্থিমজ্জাগত সংস্কার ভেদ করিয়া এই সত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙালীর যে অন্ধ, যান্ত্রিক গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র অভিযান চালাইয়াছেন, গ্যেটের জীবনী তাহারই সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিষেধক।

কাজী সাহেবের গ্রন্থে শুধু গ্যেটের ব্যক্তিত্বই আমাদের নিকট প্রোজ্জ্বল হইয়া ফুটে নাই, তাঁহার কাব্যসাধনার প্রেরণা ও উৎকর্ষও সমানভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার কাব্যিক ক্রমপরিণতির সমগ্র ইতিহাসটি অতি পরিষ্কারভাবে দেখান হইয়াছে। তরুণ জীবনের অপরিণত ভাবকুহেলিকা ও আবেগমত্ততা কেমন করিয়া ধীরে ধীরে কাটিয়া গিয়া প্রশান্ত, গাম্ভীর্যময়, পরিণত প্রজ্ঞার দীপ্ত সূর্য তাঁহার সমস্ত মনোলোককে উদ্ভাসিত করিল তাহার অতি মনোজ্ঞ চিত্র লেখক অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান প্রধান রচনাগুলির ভাবার্থ-

সংকলনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষ-বিচার একসূত্রে গ্রথিত হইয়া তাঁহার রচনার সঙ্গে অপরিচিত পাঠকের মনেও এবিষয়ে একটি ব্যাপক, সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি করে।

ইহা ছাড়াও আর-একটি দিক দিয়া লেখকের বিশেষ কৃতিত্বের দাবী আছে। তিনি গ্যেটের কবিতাবলীর কোন কোন অংশের বাংলা ভাষায় যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহার সাবলীলতা অতি চমৎকার হইয়াছে। আমি জর্মান ভাষায় অনভিজ্ঞ, কাজেই মূল জর্মানের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও ভাববৈশিষ্ট্য এই অনুবাদে কতদূর রক্ষিত হইয়াছে সেবিষয়ে মতপ্রকাশের আমার কোন অধিকার নাই। তবে ইংরেজী অনুবাদের সহিত তুলনা করিলে কাজী সাহেবের অনুবাদ যে কোনও অংশে নিকৃষ্ট এরূপ প্রতীতি জন্মে না। বাঙালী অনুবাদকের পক্ষে ইহা কম প্রশংসার বিষয় নহে। অনূদিত কাব্যাংশসমূহের স্বচ্ছন্দ গতি, সূক্ষ্ম ভাবের সাবলীল প্রকাশ ও কবিত্বশক্তি যে উচ্চাঙ্গের হইয়াছে তাহা অনুবাদকে স্বাধীন রচনার আদর্শে বিচার করিলে সহজেই অনুভূত হয়। বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতির রীতি কোথাও অশোভনভাবে উল্লঙ্ঘিত হয় নাই। অনিপুণ অনুবাদের উৎকট বৈদেশিক গন্ধ কোথাও আমাদের বোধশক্তিকে পীড়িত করে না। ইংরেজ ও জর্মান একই বংশসম্ভূত, একই সভ্যতা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, চিন্তারাজ্যের একই স্তরের অধিবাসী। সুতরাং ইহাদের মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান ও ভাষান্তরীকরণ অনেকটা সহজ ও স্বভাবধর্মী। কিন্তু বাংলা ভাষা ও বাঙালীর সঙ্গে পাশ্চাত্যের যে গভীর ব্যবধান তাহা সাহিত্যের অনুবাদকের পক্ষে একটি বিশেষ দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ গ্যেটের মত যুগনেতা, লোকোত্তর-প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবির মর্যাদা অনুবাদের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হওয়া কঠিন। কাজী সাহেব যে এই দুঃসাধ্য-সাধনে আশাতীতরূপে কৃতকার্য হইয়াছেন ইহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাঁহার অনুবাদে মহাকবির কাব্যপ্রতিভা ও মননশীলতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণার যে কোন বিপর্যয় ঘটে না, তাহাই তাঁহার কৃতিত্বের নিদর্শন।

বাঙালীর রসপিপাসু চিত্ত আজ নানা আঘাতে জর্জর, নানারূপ প্রমাদশীলতায় উদ্‌ভ্রান্ত, নানা সংকীর্ণতার চাপে রুদ্ধশ্বাস। আজ প্রাথমিক প্রয়োজনের কুজ্ঝটিকা, সংশয়-বিদ্বেষের বিষবাষ্প, নরকবহ্নির ধূমাকুল শিখাবিস্তার তাহার মানসলোককে শ্বাসরোধকারী অন্ধকূপে পরিণত করিয়াছে। মুক্ত বায়ুর, উদার বিস্তৃতির যে

ক্ষণস্থায়ী পুলকরোমঞ্চ তাহার সাহিত্যজীবনকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল তাহার অবসান হইয়া সেখানে নিশীথ-দুঃস্বপ্নের প্রেতচ্ছায়াগ্রস্ত বিভীষিকা নামিয়া আসিয়াছে। গ্যেটের কবিতার রসোপলব্ধির উপযুক্ত অবসর ও চিত্তপ্রসার আজ আমাদের আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তথাপি এই নিরপেক্ষ, সত্যনিষ্ঠ, সৌন্দর্যলিপ্সু মনোভাব আমাদের বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানের শ্যামল স্বপ্ন আমাদের চিত্তকোণ হইতে নির্বাসিত করিলে সমস্ত জাতির অপমৃত্যু ঘটিবে। তাই এই রুচিবিকার ও আদর্শবিচ্যুতির যুগে গ্যেটের কবিতা আমাদের মনে সঞ্জীবনী সুধার ন্যায় কার্যকরী হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। বর্তমানের মূঢ় উদভ্রান্তি ও বিকৃত আত্মঘাতী উন্মত্ততা হইতে যাহা আমাদিগকে শাশ্বত কল্যাণময় বিশুদ্ধ ভাব ও চিন্তার ঊর্ধ্বলোকে লইয়া যাইবে, সংকীর্ণ হিতবাদের দিক দিয়াও তাহার মূল্য অপরিসীম।

আধুনিক যুগ

মধুসূদন-জীবনী ও কাব্য

( )

মধুসূদনের চরিত্রগত নাটকীয়তা একাধিক নাট্যরচনাকে উদ্রিক্ত করেছে। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাঁর মত অন্তর্দ্বন্দ্বক্লিষ্ট, অসংযত আবেগের ঝটিকাবেগ-তাড়িত, জটিল চরিত্র আর দ্বিতীয় নেই। এখনও হয়ত তাঁর রহস্যাবৃত প্রকৃতির কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর মত্ত জীবনোচ্ছ্বাসের মূল প্রেরণা উদ্‌ঘাটিত হয়নি। দীনবন্ধুর অস্বীকৃতি সত্ত্বেও—'মধু কি কখনও নিম হতে পারে?'—তাঁর নিমচাঁদে মধুসূদনের অন্তর-জ্বালার একাংশ ধূমরূপে নির্গত হয়েছে। কিন্তু নিমচাঁদ মধুসূদন নয়, এইজন্য যে, তার মনীষা থাকলেও প্রতিভা ছিল না ও তার মোসাহেবীবৃত্তি মধুসূদনের দৃপ্ত তেজস্বিতার ঠিক বিপরীতই ছিল। তথাপি আগুন চন্দনকাষ্ঠেই জ্বলুক অথবা জীর্ণপত্রপুঞ্জেই হউক, নির্বাপিত ভস্মাবশেষের মধ্যে একটা সমতা থাকেই। রাজা বা ভিক্ষুক, সকলের ক্ষেত্রেই অসার্থক বিদ্রোহ ও আত্মাভিমানের প্রায় একই রূপ পরিসমাপ্তি ঘটে। যে পাখি সুদূর নভো-নীলিমায় পাখা মেলে আর যে পতঙ্গ সন্নিহিত বায়ুস্তরে নিজ স্বল্পায়ু বর্ণবিলাসের খেলা দেখায়, উভয়েই যখন মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতে ভূপতিত হয়, তখন তাদের পতন একই নিয়মাধীন। সুতরাং অবস্থা ও শক্তির ভেদ স্বীকার করেও এ-কথা বলা চলে যে, মধুসূদনের অন্তর-রহস্য খানিকটা নিমচাঁদের মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে। মধুর শেষ শুষ্কপ্রায় বিন্দু আস্বাদনে নিমের মতই তিক্ত-কষায় মনে হয়।

যাঁরা এ-পর্যন্ত মধুসূদনকে নিয়ে নাটক রচনা করেছেন, তাঁদের প্রতিবেশ-অঙ্কন ও মূল-চরিত্র-রূপায়ণের মধ্যে খানিকটা চলচ্চিত্ততা ও উদ্দেশ্যবিভ্রান্তি লক্ষিত হয়েছে। মধুর অন্তরের উত্তাপ ও অস্বস্তি যে খানিকটা ইয়ং বেঙ্গলের সাধারণ বিচরণভূমি থেকে সংগৃহীত হয়েছিল তা স্বীকার্য। কিন্তু যেমন প্রতি-বেশেই প্রতিভার চূড়ান্ত রহস্য নিহিত নয়, তেমনি কেবল ইংরেজী শিক্ষার প্রথম-মদিরাপানে উদভ্রান্ত, প্রাচীন বন্ধনছেদনে উন্মুখ, জোয়ারে-ভাসা তরুণগোষ্ঠীর চিত্তচাঞ্চল্যেই মধুসূদনের অন্তরের অনির্বাণ বহ্নিজ্বালার সম্পূর্ণ পরিচয় মিলবে না। আগ্নেয়গিরির পার্শ্বস্থ ভূসংস্থানে যে মাঝে মধ্যে ছাই, ধোঁয়া উৎক্ষিপ্ত হয়, সময়

সময় ভূকম্পনের অস্থিরতা জেগে ওঠে, তা-ই শতগুণ বর্ধিত হয়ে, বিস্ফোরক শক্তিতে বেগবান ও সৃষ্টিধ্বংসী বহ্নিচ্ছটায় উদ্দীপ্ত হয়ে তার চূড়াকে শতধাবিদীর্ণ করে। তরাই অঞ্চলে হিমালয়ের আরণ্য দুর্ভেদ্যতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তার উন্নততম শৃঙ্গের মেঘচুম্বী মহিমা তার পাদমূলের অনধিগম্য। মধুসূদনের অস্বস্তি কেবল যুগধর্মের অনিশ্চয়তা-প্রসূত নয়। প্রতিভার অনির্দেশ্য বেদনা, তার আত্মবিকাশের প্রতিরোধ-অসহিষ্ণু প্রবল স্ফীতিবেগ, তার বিশ্বজয়ের, সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মকে অতিক্রম করবার দুর্বার অভিযানস্পৃহা, সৃষ্টিরহস্যের এক অনির্বচনীয়, সর্বব্যাপী আলোড়ন—এর ভিত্তিভূমি রচনা করেছে।

( )

কেউ কেউ প্রেমকে এই মানস-অস্থিরতার মূল কারণরূপে নির্দেশ করেছেন— মধুসূদনের পিতামাতার নির্দেশ-অনুযায়ী বিবাহে প্রবল অসম্মতি, তাঁর কৃষ্ণ-দুহিতা দেবকীর প্রতি আকর্ষণ, তাঁর বিদেশী মহিলার পাণিগ্রহণ এইগুলিকে এর প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করেছেন। নাটকে প্রেম-বিষয়ক রোমান্স-রচনার স্বভাব-প্রবণতা থাকায় কোন-কোন নাট্যকার মধুসূদন-জীবনীতে একেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু মধুসূদনের জীবনে প্রেম যে কেন্দ্রস্থানীয় ছিল, এরূপ ধারণা তাঁর সমগ্র জীবন-আলোচনার দ্বারা সমর্থিত হয় না। মধুসূদন ঠিক প্রেমিক-কবি ছিলেন না, প্রেমানুভূতি তাঁর কাব্যজগতে মুখ্য নয়। ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার প্রেম "মেঘনাদবধ"-এ পার্শ্ব-চিত্র মাত্র; "বীরাঙ্গনা"য় প্রেম মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের উপায়স্বরূপ গৃহীত হয়েছে; প্রেমসর্বস্ব "ব্রজাঙ্গনা-কাব্য" বৈষ্ণব আদর্শের অনুসৃতি, কবির জীবনচেতনা-উদ্ভূত নয়। তাঁর গীতিকবিতায় যে নিবিড় প্রেমতন্ময়তা ও হৃদয়োচ্ছ্বাসের নিদর্শন নেই, তা-ই প্রেম সম্বন্ধে তাঁর আপেক্ষিক ঔদাসীন্যের অখণ্ডনীয় প্রমাণ। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে একটিও প্রেম-কবিতা নেই। "আশার ছলনে ভুলি"-কবিতায় যে মর্মভেদী আত্মগ্লানি ও জীবনের ব্যর্থতার জন্য খেদোচ্ছ্বাস অগ্নিস্রাবের ন্যায় নির্গত হয়েছে তার সঙ্গে তুলনীয় উত্তপ্ত ও অন্তর-বিদারী অনুভূতি কোন প্রেম-কবিতায় পাওয়া যায় না। মধুসূদনের ব্যক্তি-জীবনেও প্রেমসম্বন্ধীয় কোন অসংবরণীয় হৃদয়াবেগের পরিচয় নেই। দেবকীর অপ্রাপ্তি, রেবেকার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ তাঁর সংসার বা কাব্য-জীবনে কোথাও একটা দুরারোগ্য বেদনা-ক্ষতের চিহ্ন রেখে যায়নি। মনে হয় যে, উভয়

ক্ষেত্রেই ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগতে বেশি বিলম্ব হয়নি। হেনরিয়েটার সঙ্গে যে তাঁর আ-মৃত্যু দাম্পত্যজীবন, তাতে নিষ্ঠা ও সহানুভূতির স্পর্শ আছে, কিন্তু প্রেমের বিদ্যুৎ-প্রবাহে তা রহস্যদীপ্ত হয়ে ওঠেনি। আসল কথা, মধুসূদন প্রেমকে চেয়েছিলেন, অন্তরের কোন গভীর আকুতিতে নয়, নূতন জীবনযাত্রার একটা পরীক্ষামূলক সহায়রূপে। যেমন অতীত যুগের মল্লেরা দীর্ঘ লাঠির সাহায্যে উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করত, তেমনি মধুসূদন স্বাধীন প্রেমের সাহসিকতা ও চিত্তপ্রসার অবলম্বনে প্রাচীন রীতির দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে নবীন জীবনাদর্শের জন্য গতিবেগ সঞ্চয় করতে চেয়েছিলেন। প্রেমকে তিনি চেয়েছিলেন অন্তরলক্ষ্মীরূপে নয়, নূতন সংসার-প্রতিষ্ঠার গৃহিণীরূপে। এ-যেন বিলাত যাওয়ার প্রবল ইচ্ছার মত তাঁর কাব্যজীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার, যে আবহের মধ্যে তাঁর কবিস্বপ্ন সার্থকভাবে ফুটে উঠবে তারই উপাদান-সংগ্রহের একটা উপায়মাত্র। ইউরোপীয় মহিলার সহিত বিবাহের টান-করা ধনুকের ছিলার উপর জীবন-বাঁটুলকে রক্ষা করলে তা যে অভিজ্ঞতা-দিগন্তের সুদূর সীমা পর্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হতে পারে, সেই সম্ভাবনা যাচাই করে দেখাই যেন তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর অসামাজিক বিবাহ তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর পাদপীঠের উপর আলিম্পন-বর্ণবিন্যাস, যে-শতদলের উপর তাঁর আসন পাতা হবে তারই একটা রূপ-গন্ধোচ্ছ্বাসিত পাপড়ি। বিবাহের গিলটি সোনার চাবি দিয়ে তিনি কবি-জীবনের জয়তোরণের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করতে খুঁজেছিলেন, এ কেবলমাত্র চাবি, তাঁর সমগ্র কবি-জীবন-উদ্বোধনের সোনার কাঠি নয়। সুতরাং এই প্রেমের চাবিতে যে তাঁর সমগ্র জীবনরহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে না, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

(৩)

মধুসূদনের স্বরূপ-পরিচয় নিহিত আছে তাঁর জীবনব্যাপী কবি-প্রস্তুতি ও কাব্যসাধনার ইতিহাসে। তিনি সমস্ত জীবন ধরে নবযুগের শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিনিধি হবার সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি, পিতা-মাতার অবাধ প্রশ্রয়, উচ্ছৃঙ্খল অমিতাচারিতা, মাত্রাহীন ভোগবিলাস, খামখেয়ালী মেজাজ, গর্বিত আত্মপ্রত্যয় ও করুণ আত্মনির্বেদ—সবই তাঁর কবি-পরিণতির সোপান। তিনি নবযুগের কবিতাকে বাঙলা সাহিত্যে রূপ দেবার জন্য যে মহাযজ্ঞে ব্রতী হয়েছিলেন, এ-সবই তার সমিধ ও ইন্ধন। শেষ পর্যন্ত চরম আত্মোৎসর্গের দ্বারা

এই যজ্ঞে তিনি পূর্ণাহুতি দিয়ে যজ্ঞকুণ্ড হতে উদ্ভূত দিব্যকবিতার আবির্ভাবরূপ ঈপ্সিত বর লাভ করেছিলেন। মহাকবিসুলভ দিব্য অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি তাঁর কাব্যজীবনের পরিপোষকরূপে কিরূপ জীবনাভিজ্ঞতার প্রয়োজন তা অনুভব করেছিলেন ও সাধারণ বিজ্ঞতা ও নীতিবোধের পরামর্শ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজ নিয়তি-নিয়োজিত পথেই অকম্পিত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছিলেন। দুষ্কর তপশ্চর্যার দ্বারা তিনি বিশ্বামিত্রের মত এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। হিসাব ও ওজন বুঝে জীবনকে নিয়মিত করলে তিনি এই মহাতপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে পারতেন না। ভূগর্ভস্থ যে মহাগ্ন্যুৎসবের ফলে হিমালয়ের উত্তুঙ্গতা ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হয়ে আকাশ স্পর্শ করেছে তা কি গতানুগতিক গার্হস্থ্য জীবনের ছোটখাট প্রদীপ বা নিম্নতর উদ্দেশ্য-সাধনের নিয়ন্ত্রিত অগ্নিশিখার উত্তাপে সম্ভব হত? মধুসূদন যদি পিতামাতার বাধ্য সুশীল সন্তানরূপে একটি নোলক-পরা, অবগুণ্ঠিতবদনা বাঙালী বালিকাবধূর চেলাঞ্চলবদ্ধ হয়ে সাংসারিকতার মসৃণ, সহস্রপদচিহ্নাঙ্কিত পথের পথিক হতেন, তবে তাঁর সারস্বত সাধনার ধারা যে পার্বত্য নদীর দুর্বার স্রোতে প্রবাহিত হত না তা সুনিশ্চিত—তিনি "ব্রজাঙ্গনা"-রচয়িতা হতে পারলেও "মেঘনাদবধ"-এর তড়িৎ-শক্তি-ভরা কবি হতে পারতেন না। যে মর্মভেদী দুঃখ তিনি তাঁর স্নেহময় পিতা-মাতাকে দিয়েছেন, তাই শতগুণিত হয়ে ফিরে এসে তাঁর বক্ষে নিদারুণ আঘাত হেনে তাঁর কবি-কল্পনার উৎসমুখ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। শেলি-বর্ণিত ঈগলের ন্যায় তিনি প্রেম-গিরিশৃঙ্গের স্বর্ণাভ চূড়াপরম্পরায় ক্ষণিকের জন্য পক্ষ-বিশ্রাম খুঁজে নভোবিহারের নূতন শক্তি অর্জন করেছেন, সাধারণ পাখির ন্যায় একনিষ্ঠতার সোনার খাঁচায় নিজেকে বন্দী করেননি। কীটস শেকস্‌পিয়ার সম্বন্ধে বলেছেন যে, কবি সর্বাত্মক বলে তাঁর কোন ব্যক্তিক চরিত্র নেই। মধুসূদনের ন্যায় নূতন পথের পথিকৃৎ মহাকবি সম্বন্ধেও বলা চলে যে, যে-মানদণ্ডে আমরা চরিত্রের অনিন্দনীয়তার পরিমাপ করি তা তাঁর সম্বন্ধে অপ্রযোজ্য। এক কবিধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মের আনুগত্য তিনি স্বীকার করেননি।

(৪)

মধুসূদনের কবিপ্রতিভার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর কৈশোরস্মৃতি এক উদ্‌বেলিত অনুতাপ সমুদ্রের ব্যবধান হতে রমণীয়রূপে তাঁর

কবিচিত্তে পুনরাবির্ভূত হয়েছিল। এক শ্রেণীর কবি আছেন যাঁরা তাঁদের সকল অনুভূতিকেই কাব্য-উপাদানে রূপান্তরিত করতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মুকুন্দরাম যা চোখে দেখেছেন তাকেই একটু তির্যক কটাক্ষে পরিহাসমণ্ডিত করে, প্রীতি ও সহানুভূতির স্নিগ্ধ স্পর্শ দিয়ে স্মরণীয় কাব্যরূপ দিয়েছেন। মধুসূদনের ক্ষেত্রে কিন্তু বিচ্ছেদ ও অদর্শনই যা সামান্য ছিল তার প্রতি অসামান্যতা আরোপের হেতু হয়েছে। তিনি বাঙালী সমাজের একজন হয়ে জীবন কাটালে রামায়ণ-মহাভারতের মাধুর্য বা বাল্যস্মৃতির রমণীয়তা অনুভব করতেন না। মাদ্রাজ-প্রবাসের নিঃসঙ্গতা থেকেই তিনি চির-উপেক্ষিত বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন-যাত্রার ভাবৈশ্বর্যের প্রথম উপলব্ধি করেন; তাঁর অন্তরের শূন্যতা-গোধূলির মধ্যেই পূর্বস্মৃতির তারকাদীপ্তি ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। যে কপোতাক্ষ নদীর আকর্ষণ তিনি প্রথম জীবনের অতি-নৈকট্যের মধ্যে অনুভব করেননি, সেই নদীই ফরাসী প্রবাসের দূরত্ব থেকে তাঁর রসনায় মাতৃস্তনক্ষরিত দুগ্ধধারার সুমিষ্ট আস্বাদ সঞ্চার করেছিল—"সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে"—এই স্নেহ-সম্বোধনে ও রূপচেতনায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যে মনস্তাত্ত্বিক নিয়মে নদীর এপার তার ওপারের মধ্যে সকল সৌন্দর্যের সার কল্পনা করে, সেই অমোঘ নিয়মেই মধুসূদনের প্রৌঢ় জীবন তাঁর অনাদৃত, নিজের অন্ধ প্রত্যাখ্যানের জন্য চিরকালের মত প্রত্যাবর্তন-সম্ভাবনাহীন অতীতে কল্পলোক-সুষমা আরোপ করেছিল। এপার ওপারের মধ্যে যদি স্থলযোগের অবিচ্ছিন্নতা থাকত, তবে হয়ত এই ভাবালুতার উদ্ভব হত না; মধুসূদন যদি বিনা আয়াসে তাঁর সমাজ ও পরিবার-জীবনের পূর্বস্থানটিতে ফিরে আসতে পারতেন, তবে এই স্মৃতি-মন্থনের আকুলতা তাঁর কবিতায় এত মর্মস্পর্শী নৈরাশ্যের হাহাকারে ধ্বনিত হত না। নিজের অবিমৃষ্য-কারিতার কথা স্মরণ করেই হারান অতীতের জন্য তাঁর এই শোকোচ্ছ্বাস উত্তাল, অসংবরণীয় হয়ে উঠেছিল।

এই অনুতাপ-দগ্ধ বেদনাবোধই তাঁর কাব্যপ্রতিভা-উন্মেষের প্রধান উপাদান। একদিকে বিদ্রোহ ও বন্ধনচ্ছেদের অনমনীয় দৃঢ়সংকল্প, অপরদিকে প্রত্যাখ্যাত জীবনের জন্য অশ্রুসজল, স্বপ্নকরুণ আর্তি, এই উভয় সুর তার জীবন থেকে কাব্যে সংক্রামিত হয়েছে। মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা-কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাহিত দৃপ্ত শৌর্যের বজ্রগম্ভীর মন্দ্রের ফাঁকে ফাঁকে যে দৈবাহত, ঐশ্বর্যশিখর হতে ভূলুণ্ঠিত জীবনের করুণ বিলাপের অন্তঃসঙ্গীত

শোনা যায় তা কবির জীবন-অভিজ্ঞতা-প্রসূত। বিদ্রোহের সর্ববাধা-চূর্ণকারী উন্মত্ত আবেগ ও আত্মগ্লানির মর্মদাহী অনির্বাণ তুষানল, এই দুয়ের টানাপড়েনে কবি-প্রকৃতি গঠিত হয়েছে। মধুসূদনের জীবনে ভার-সাম্য থাকলে তার কবি-প্রাণে ছন্দের অশান্ত দোলা জাগত না। তার উদ্ধত আত্মতৃপ্তি ও উদ্দাম ভোগবাসনা তার চরিত্রে যে নিদারুণ বিদারণ-রেখা অঙ্কিত করেছিল, তারই ফাঁক দিয়ে কাব্যলক্ষ্মী তার অন্তরে প্রবেশ করেছিলেন। তার ভাঙনের নেশায় আবিল রক্তচক্ষু অনুতাপের যজ্ঞধূমে শোধিত হয়ে কবির স্বচ্ছ দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিল। উত্তপ্ত-বাষ্পময় সৌরজগৎ যেমন অন্ধ বেগে ঘূর্ণিত হতে হতে কোন এক অজ্ঞাত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শীতল বায়ুস্পর্শে জমাট বাঁধে ও নিয়মিত কক্ষপথে আবর্তিত হয়, মধুসূদনের উল্কা-জ্বালাময়ী প্রকৃতির মানস-আকাশ তেমনি বেদনার নিবিড় মেঘে আবৃত হয়ে স্নিগ্ধ আসার-ধারাবর্ষী হয়েছে ও কবিধর্মের ছন্দোবন্ধনে সুবলয়িত হয়েছে। সাহেবিয়ানার "প্রথিবীকে" তিনি কেবল যে সুস্থ জীবনবোধের "পৃথিবী'তে সংশোধিত করেছেন তাই নয়, এই পৃথিবীকে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই দিব্যচেতনার জ্যোতির্মণ্ডিত করে তাঁর কাব্যলোকে অভিষিক্ত করেছেন। এই রূপান্তরটি কবির "ক্যাপটিভ লেডি" থেকে "মেঘনাদবধ"এ উত্তরণের প্রতীক। তাঁর প্রবাস-যাত্রার পূর্বে "রেখো মা দাসেরে মনে"—শীর্ষক কবিতায় তিনি মাতৃভূমির পদে যে অপরূপ ভাবমুগ্ধতার অঞ্জলি অর্পণ করেছেন, কে জানে তার পিছনে যে গর্ভধারিণী জননীকে মর্মান্তিক আঘাত হেনে তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রতি অবরুদ্ধ স্নেহ ও অস্বীকৃত অপরাধবোধ তির্যক ব্যঞ্জনায় কতটা আত্মপ্রকাশ করেছে ?

অতএব মধুসূদনের কাব্যকে অভিনন্দিত করতে গেলে তাঁর সমগ্র জীবনকে তার অপরিহার্য ভূমিকারূপে গ্রহণ করতে হবে। বাংলা কাব্যের সমস্ত গতিধারাকে পরিবর্তন করে তাকে নূতন খাতে প্রবাহিত করতে যে বিপুল, অপরিমেয় শক্তির প্রয়োজন, মধুসূদনের নানা আঘাত-ক্ষুব্ধ, বিচিত্র বেদনায় আবর্তিত, অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দে আত্মহারা জীবনই সেই শক্তি জুগিয়েছিল। বাল্মীকি ও ব্যাস, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের সঙ্গে হোমার, ভার্জিল, ট্যাসো, মিল্টনকে নিশ্চিহ্নভাবে মিশিয়ে দিতে যে বিরাট কল্পনা-গৌরব, বিষয়-বিন্যাস ও মণ্ডন-কলার যে বিস্ময়কর সমাবেশ, অনুভূতির যে সর্বসমন্বয়ী স্বচ্ছন্দচারিতা

অপরিহার্য উপায়স্বরূপ, তা কবির অন্তর্লোকে এক তুমুল ভূমিকম্পের ফলেই স্ফূরিত হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য জগতের অপরিচিত ভাবলোককে প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল জাতির সংস্কৃতি-কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করার যে অসাধ্যসাধন, মধুসূদন-প্রতিভা তা-ই সম্পন্ন করেছিল। তারপর পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ও ভাবকল্পনা আমাদের সাহিত্যে অবাধ প্রবেশাধিকার পেয়েছে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের ভেদরেখা বহু পরিমাণে বিলুপ্ত হয়েছে। আজ আমরা এই অবাধ ভাব-বিনিময়ে এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, মধুসূদনের এই কীর্তি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তিনি যদি এই সমন্বয়ের কার্যে কম পারদর্শিতা দেখাতেন, উগ্র বিদেশীয় গন্ধ যদি তাঁর কাব্যে বেশি মাত্রায় প্রকট হত, তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যে ভিন্নপথে প্রবাহিত হত, তা জোর করে বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ, প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মধুসূদনের এই সমন্বয়-সাধন-প্রয়াসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই বিরাট বিজাতীয় ভাবসমুদ্র তিনি যে অগস্ত্য-ঋষির ন্যায় এক গণ্ডূষে পান করেছিলেন ও পানের পর তাকে স্বদেশের সুমিষ্ট স্নিগ্ধ পানীয়ে রূপান্তরিত করে উদ্গীর্ণ করেছিলেন, এতেই তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভার নিদর্শন মেলে।

(৫)

সাম্প্রতিক কোন সমালোচক মধুসূদনের কাব্যের সম্বন্ধে বিরূপ অভিমত প্রকাশ করে তার মূল্য-লাঘবের চেষ্টা করেছেন। মধুসূদনের ভাষা বাংলা কাব্যের সহজ-বাগ্‌রীতি-বিরোধী, তিনি বহু অপ্রচলিত ও ভাষাপ্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যহীন শব্দ-প্রবর্তনের দ্বারা এক কৃত্রিম শূন্যগর্ভ আড়ম্বর সৃষ্টি করেছেন ও তাঁর ভাষার শব্দমুখরতার মধ্যে সূক্ষ্ম, অন্তর্গূঢ় ভাবপ্রকাশ-শক্তির একান্ত অভাব—এইগুলিই তাঁর প্রধান অভিযোগ। স্পেন্‌সার ও মিলটনের বিরুদ্ধে অষ্টাদশ শতকে ও অতি-আধুনিক যুগে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, এ যেন তারই প্রতিধ্বনি। স্পেন্‌সার ও মিল্টনের ভাষা যেমন ইংরেজী-কাব্য-ঐতিহ্যের মূলধারা-বহির্ভূত, তেমনি মধুসূদনের কাব্যরীতিও বাংলা কাব্যে স্থায়ী আসন পায়নি। একথা সত্য হলেও এতে উল্লিখিত মহাকবিদের অগৌরবের কিছু নেই। স্পেন্‌সারের প্রভাব শেলি, কীট্‌স, সুইনবার্নে ও আধুনিক কবিদের মধ্যে ব্রিজ্‌সে কিছু কিছু পড়েছে;

মিল্টনের উদাত্ত ভাষণের প্রতিধ্বনি অষ্টাদশ শতকের বহু কবিতে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোল্‌রিজে, টেনিসনের কোন কোন কাব্যে ও ফ্রান্সিস টমসনে শোনা যায়। জাতির ভাবধারা যদি উত্তুঙ্গ-বন্ধুর পর্বতশৃঙ্গ থেকে নেমে এসে শ্যামল সমতলভূমির ছায়াশীতল সৌন্দর্যকুঞ্জ বা অন্তর-বেদনার কপোতকূজন-করুণ বন-বীথিকার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়, তবে মিল্টন বা মধুসূদনের ধ্বনিগাম্ভীর্য ও ওজস্বী প্রকাশভঙ্গী তার সাহিত্যে অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ে। মধুসূদনের প্রভাব যদি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী না হয়ে থাকে, তার কারণ জাতির রুচি-পরিবর্তন, তার আত্যন্তিক গীতি-প্রবণতা এবং তার ফল সাহিত্যের পক্ষে মোটেই শুভ হয়নি। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কিছু পরিমাণে মধুসূদনের বিরাট কল্পনা ও মর্যাদাময় বাচন-রীতি অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের হাতে মহাকাব্যের সঙ্গে গীতি-কবিতার সংমিশ্রণ ঘটেছিল ও বীণার তার অনেক নিম্নতর ঘাটে এসে ঠেকেছিল। আজ বাংলা কাব্যে ওর্জস্বিতার যে একান্ত অভাব ও ভাল-মন্দ-মাঝারী গীতি-সর্বস্বতার অতি-প্রচলন দেখা যায়, তা মধুসূদনের অনুপ্রেরণা স্বীকরণের অক্ষমতার ফলে। বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক্যাল আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগেই রোমান্টিক ভাবের জোয়ার এসেছিল—সেইজন্যই এখানে রোমান্টিকতা এত স্বল্পায়ু ও অত্যুচ্ছ্বাসধর্মী হয়ে উঠেছে। উচ্ছ্বসিত ভাবগঙ্গাকে দৃঢ় বেষ্টনীতে ধরে রেখে এর অপচয় বন্ধ করতে গেলে শাশ্বত রীতির মর্যাদাবোধ ও সংযম একান্ত প্রয়োজনীয়। কাব্যে নবীন প্রেরণা অবসিত হলে প্রতিষ্ঠিত প্রথার সার্থক অনুবর্তনেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু আমাদের মধ্যে এই ক্লাসিক্যাল প্রথা সজীব রাখার কোন চেষ্টা হয়নি বলে আমরা নদীর অভাবে সরোবরের জল-পান থেকেও বঞ্চিত হচ্ছি।

অপ্রচলিত শব্দসম্ভার যে উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছিল, আমাদের সাহিত্যে যদি সে-উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তবে শব্দগুলিও ক্রমশ অপ্রয়োগের ফলে যে বিস্মৃত হয়ে পড়বে, সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সমুদ্রবাহী অতিকায় জাহাজ যে নদী-নির্ভর সমাজে স্মৃতি-সংরক্ষণশালায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হবে ও সামুদ্রিক অভিযানে অনভ্যস্ত জনগণের কৌতুকমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক করবে, এতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? তবে নিতান্ত বিকৃতরুচি না হলে কেউ এর জন্য জাতির ক্ষয়িষ্ণু জীবন-সম্পদ ও তজ্জনিত দুর্ভাগ্যকে দায়ী না করে জাহাজ-নির্মাতার প্রতি দোষারোপে প্রণোদিত হবে না। যাঁরা ফুলবাগানে ফুলের কেয়ারি তৈরির

কাজে রত থাকেন, সূক্ষ্ম কারুকার্যবিলাস যাঁদের অভিপ্রেত, তাঁরা পর্বত বিদারণ করে ভাষার পথ খনন করতে যে ওজনে ভারী ও পরিমাণে স্থূল অস্ত্রের দরকার, তার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করবেন না। মধুসূদনের 'ইরম্মদ', 'হর্যক্ষ', 'মদকল করী' প্রভৃতি শব্দরাজি প্রেম-কবিতার কমলবনে একটু বেমানান ঠেকবে বই কি! তবে যদি কোনদিন বাংলা সাহিত্যে বৃহৎ মহীরুহ রোপণ ও লালনের প্রয়োজন হয়, সমুদ্র ও পর্বতের মহিমা ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে হয়, তবে হয়ত এই সমস্ত মর্চেপড়া শব্দসম্ভারকে আবার খুঁজে বের করে কাজে লাগাতে হবে। "যাদঃপতিরোধ যথা চলোর্মি-আঘাতে" পংক্তিটি পদ্মদীঘিতে সাঁতারকাটা রাজহংসকুলের পক্ষে বিড়ম্বনাময় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বিদেশীয় ভাবের স্রোত যখন পর্বতপ্রমাণ উঁচু হয়ে ভাষার তটভূমিতে আঘাত করে, তখন তাকে বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড-সন্নিবেশের দ্বারা সুদৃঢ় না করলে এই স্রোতধারণের শক্তি কোথা থেকে আসবে? রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেখানে ভাবসমুন্নতি সেখানেই সংস্কৃতের রাজৈশ্বর্যের আবাহন; অবশ্য তিনি কোথাও যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তেজনাকে কাব্যে প্রকাশ করতে চাননি বলে তাঁর অন্তর-সংঘাতের অভিব্যক্তির জন্য যে ভাষা-প্রয়োগ করেছেন, তা সংস্কৃতধর্মী হলেও বাংলার অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। মধুসূদন যে ক্ষাত্রতেজকে বাণীরূপ দিয়েছেন, বাংলার অন্তরলোক থেকে তা নির্বাসিত হয়েছে। বাংলা এখন যে মেঠোপথে বাউলের একতারা বাজিয়ে চলেছে বা যে শ্মশানোপান্তে গায়ে চিতাভস্ম মেখে কাপালিক সেজেছে, সেখানে রণভেরীকে অতি অনাবশ্যক ও শ্রুতিপীড়াকর বাদ্যযন্ত্র বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যে একেবারে অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছেছে, এ অনুমান অভ্রান্ত না হতে পারে। মধুসূদনের ধ্বনিবহুল শব্দরাজি কেবল যে অনুচিত প্রয়োগের দৃষ্টান্তস্বরূপ চিরদিন উদ্ধৃত হবে, এরূপ অভিমতের চূড়ান্ত সত্যতায় বিশ্বাসের কোন হেতু নেই। যা জীবন্ত কবিপ্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়েছে, তা এখন না হউক ভবিষ্যতে মানুষের অন্তরকে জীবন্ত শক্তিরূপেই স্পর্শ করবে। কাব্যের বিচিত্র গতিপথ ও অভাবনীয় পরিবর্তন-সম্ভাবনার কথা স্মরণ রেখে মধুসূদন-প্রতিভাকে প্রস্তরীভূত নরকঙ্কালের পর্যায়ভুক্ত না করলেই সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা

(১)

অধুনা বঙ্কিম সাহিত্যের আলোচনা অনেকটা নিশ্চল প্রথাবদ্ধতার মধ্যে বাঁধা পড়িয়াছে। এই সাহিত্যবিষয়ে অভিমত দুইটি পরস্পর-বিরোধী মতবাদে ব্যূহবদ্ধ হইয়াছে। নব্যপন্থী পাঠক ও সমালোচক বঙ্কিমের মধ্যে মার্কস্-প্রবর্তিত শ্রেণী-সংঘাত ও ফ্রয়েড-প্রতিষ্ঠিত যৌনবিজ্ঞানের বিশেষ কোন ছায়াপাত না দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আসন হইতে সরাসরি খারিজ করিয়া দেন। তাঁহার জীবনদর্শন খণ্ডিত ও একদেশদর্শী, তাঁহার মধ্যে বাস্তবতার আদর্শ শিথিল ও ভ্রান্তিসংকুল, তিনি রোমান্সসুলভ ভাববিলাসের কারবারী, তাঁহার আলোচনা অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন-কাহিনীতে সীমাবদ্ধ—ইত্যাদি নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁহার প্রতি যথেচ্ছ আরোপিত হয়। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, রাম জন্মিবার পূর্বে রামায়ণ-রচনা কবি-কল্পনার বিষয় হইতে পারে,—ঠিক উপন্যাসের বিষয় নয়। সর্বহারার প্রতি বঙ্কিমের সহানুভূতি যে আজকালকার তথাকথিত দীনবন্ধুদের অপেক্ষা কত গভীর ও আন্তরিক ছিল তাহার প্রমাণ তাঁহার সমাজবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে অখণ্ডনীয়ভাবে নিহিত আছে। কিন্তু তিনি এই বিষয়ের আলোচনার জন্য উপন্যাসকে ঠিক উপযোগী ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন নাই। যাহা সার্বভৌম নহে, সূক্ষ্ম, অবিমিশ্র ভাব-লোকের উপাদান নহে, যাহা বিচার-বিতর্কে কণ্টকিত, মতবাদের রূঢ় সংঘাতে আন্দোলিত, স্থূল ও গ্লানিকর ইন্দ্রিয়-লালসায় মলিন ও নগ্ন দারিদ্র্যের বস্তুস্তূপে অযথা ভারাক্রান্ত, তাহার বিশুদ্ধ রসরূপটি অবান্তরের প্রক্ষেপে প্রায়ই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; সুতরাং বঙ্কিমের শিল্প-সৌন্দর্যজ্ঞান এইরূপ বিষয়কে যতদূর সম্ভব পরিহার করিতে চাহিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে দারিদ্র্যের সার্থক ইঙ্গিত আছে—অতিপল্লবিত বিস্তার নাই; লালসার সর্বধ্বংসী প্রভাবের দ্যোতনা আছে—ইহার কুৎসিত, পঙ্কিল ইতিহাস নাই। বস্তু ও বাসনার অসহনীয় পেষণ স্টীমরোলারের মত মানুষের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলিকে দলিয়া-মথিয়া সমান করিয়া দিতে চায়: কাজেই যিনি কেবল করুণরস ছাড়া অন্যান্য রসেরও স্ফুরণাভিলাষী তিনি মানবের অন্তঃপ্রকৃতিকে যতদূর সম্ভব এই জাতীয় সর্বগ্রাসী, সমীকরণকারী অভিভব হইতে মুক্ত রাখিবার পক্ষপাতী। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার মধ্যে অনেকেই দরিদ্র—কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী,

প্রফুল্ল, শ্রী—ইহারা সকলেই অভাবের সহিত পরিচিত, কিন্তু অভাবের আঁচে ইহাদের প্রকৃতির সরস মাধুর্য ঝলসিয়া যায় নাই, কিংবা আত্মার স্বাধীন উন্মেষ ব্যাহত হয় নাই। দারিদ্র্য যেখানে মানস আভিজাত্য নষ্ট করে, সেখানেই ইহা সত্যই দীন। বিশেষতঃ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের বাঙালী জীবনে আজকালকার অভাব ও যৌন-বুভুক্ষার কেন্দ্রিকতা ছিল না; দারিদ্র্যে বৈরাগ্যের উদার স্পর্শ ও আকাঙ্ক্ষায় সংযমের প্রবল প্রতিরোধ শুধু আদর্শের নয়, বাস্তব জীবনযাত্রার সত্য পরিচয় বহন করিত। এই আচারপূত, স্বধর্মনিষ্ঠ, ঐক্য-বোধসংহত সমাজের চিত্রই বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত। বর্তমান যুগের বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্জীর্ণ বিকার বঙ্কিমের উপন্যাসে নাই বলিয়া তিনি অনেকের রুচির নিকট স্পৃহণীয় না হইতে পারেন, কিন্তু এই হেতুবাদে তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভার অস্বীকারকে বিচার-বিপর্যয় ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

আর যাহারা এখনও বঙ্কিম-প্রতিভার প্রতি আস্থা হারান নাই, তাঁহারাও বঙ্কিমের রসাস্বাদনে আগেকার সেই তীব্র আগ্রহ, সেই সর্বতোমুখী গ্রহণশীলতা হারাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহারা বঙ্কিমকে "Classic"-এর পর্যায়ে ফেলিয়া তাঁহাদের কর্তব্যের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। যে গ্রন্থ বহু-উল্লিখিত, কিন্তু বিরল-পঠিত তাহাই Classical সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, Classics-এর এইরূপ একটি ঈষৎ শ্লেষাত্মক সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। বঙ্কিম-সম্বন্ধে আধুনিক যুগের প্রাচীন-পন্থী লোকের মধ্যে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আছে—সানন্দ, সাগ্রহ রসগ্রহণ নাই। তাঁহারা মূল্যবান্ চামড়ায় বাঁধানো ও সোনার জলে নিজেদের নাম-লেখা বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর রাজসংস্করণ তাঁহাদের গ্রন্থাগারের দর্শনীয় অংশে রাখিয়াই সন্তুষ্ট। বড় জোর কোটেশনের ছোট ঘটীতে তাঁহার অমৃতহ্রদ হইতে দুই-এক গণ্ডূষ পরিমাণ উদ্ধার করা হয়) কিন্তু তাহাতে অবগাহন করিয়া পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। বঙ্কিমী নেশা, বঙ্কিম-সম্বন্ধে রস-বিভোরতা, তাঁহার যাদুকরী প্রভাবে আত্মসমর্পণের আবেশ আজ টুটিয়া গিয়াছে। সেই উচ্ছ্বসিত স্তুতি, সেই মনঃপ্রাণ-উৎসর্গকারী পূজা, সেই মন্ত্রসুলভ নিগূঢ় শক্তির উপলব্ধি,—সেই প্রশ্নাতীত, সন্দেহাতীত শিষ্যমনোভাব বর্তমান যুগে বিরল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও পঁচিশ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত মাসিক পত্রে প্রবাহিত অসংখ্য সমালোচকের ভক্তি-গদ্গদ, বিস্ময়-বিহ্বল শ্রদ্ধা-নিবেদনের ধারা আজ শুকাইয়া আসিয়াছে।

আধুনিক সমালোচকেরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নৈর্ব্যক্তিকতার অন্তরালে তাঁহাদের মনের আনন্দ ও উত্তেজনা যথাসম্ভব চাপা দেন ; যথাযথ মূল্য-নিরূপণের তাগিদে তাঁহাদের ভাষা দ্বিধাগ্রস্ত ও পরিমিত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের প্রশংসা সংশয়-কুণ্ঠিত, বিরুদ্ধবাদীরমত-খণ্ডনে অতিমাত্রায় বিব্রত ; রসোপভোগের অবাধ স্বচ্ছন্দতা, ভাবপ্রকাশের অকৃপণ অজস্রতা আজ প্রতিকূল মনোভাবের পিছুটানে বিড়ম্বিত। আর বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-পদ্ধতির অনুকরণকারীর গোষ্ঠী প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অবলুপ্ত—আজকাল তাঁহার ভাষায় কাহাকেও লিখিতে দেখি না। ভাষার সেই ঋজু, সরল বিন্যাস, প্রকাশভঙ্গীর সেই অকুণ্ঠিত তীক্ষ্ণতা ও প্রত্যক্ষ আবেদন, আবেগের জোয়ারে পালতোলা নৌকার মত, স্বচ্ছসরোবরে রাজহংসের মত সেই স্বচ্ছন্দ, সাবলীল গতি, বাঙালীর মর্মরস-পুষ্ট শব্দ ও ভাবের সেই সার্থক প্রয়োগ, অপ্রত্যাশিতের চমক জাগাইবার সেই স্বভাব-নৈপুণ্য, সর্বোপরি ছোট-বড়, সংস্কৃত-দেশী শব্দ-যোজনার সেই অনবদ্য, অননুকরণীয় স্থাপত্য-কৌশল আধুনিক বাংলা ভাষা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাবসম্পদ্ ও শব্দৈশ্বর্যের দিক্ দিয়া অনেক দিয়াছেন, ভাষাবীণার তারে অনেক সূক্ষ্ম মীড়মূর্ছনা লাগাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য সার্বভৌমতার বৃহত্তর সত্তায় বিলীন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে বিশ্বজগতের অধিবাসী করিয়াছেন, বীরবল আমাদিগকে বিদগ্ধ নাগরিক জীবনযাত্রার উপযোগী বাগ্‌ভঙ্গিমা শিখাইয়াছেন ; কিন্তু বাঙালীত্বের সনাতন প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে দাঁড়াইয়া, বাঙালী জীবনের আদর্শরসে পুষ্ট হইয়া, বিশ্বজগৎকে ইহারই কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া আর কেহ সাহিত্যরস সৃষ্টি করেন নাই। দেশের তথা গদ্য-সাহিত্যের যৌবন-শক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেই নিঃশেষিত হইয়াছে—বঙ্কিমের পরে আমরা সমস্যামথিত, দারিদ্র্যপিষ্ট, কুব্জপৃষ্ঠ প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়াছি, এবং ইতিমধ্যেই অকালবার্ধক্যের বলিরেখাও আমাদের মনে ও মানসপ্রতিবিম্ব সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। হারানো রত্নের মত তাই বঙ্কিমের মূল্য অপরিসীম।

(২)

বঙ্কিম-সাহিত্য-আলোচনার এই স্তিমিত, নিস্তরঙ্গ অবস্থায় সম্প্রতি একটি ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখিয়া আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র

সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা' নাম দিয়া একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাস হইতে রূপবর্ণনামূলক কয়েকটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের ভাষা-সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করিয়াছেন। সরকার মহাশয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়টি ঠিক মৌলিকতার দাবি করিতে পারে না। বঙ্কিমের ভাষা যে প্রথম স্তরের সংস্কৃতঘেঁষা অতিরিক্ত গুরুগাম্ভীর্য পরিহার করিয়া ক্রমশঃ সহজ, সরল দেশী ভাষার বহুলতর প্রয়োগের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, বঙ্কিম-সাহিত্যের এই সুপরিচিত-সত্যটিকেই তিনি উদাহরণ-সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন; এবং ইহারই সঙ্গে ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, বঙ্কিম নিজের নীতি ব্যবহারিকভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের যুক্তি-শৃঙ্খলা ও আলোচনা-পদ্ধতির কথা পরে বলিব। তাঁহার যে গুণটি আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়াছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধে পুরাতন সুরটির পুনরুদ্ধার। গ্রন্থকার বঙ্কিমের অন্তরঙ্গ শিষ্যগোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পুত্র; সুতরাং বঙ্কিমের প্রতি উচ্ছ্বসিত অনুরাগ তিনি হয়ত উত্তরাধিকারসূত্রেই পাইয়াছেন। যে যুগে বাংলা সাহিত্যের আকাশ-বাতাস বঙ্কিমের প্রতি নিবিড়, একনিষ্ঠ প্রীতিতে ভরপুর ছিল, সেই অতীত হইতে প্রবহমান বায়ুমণ্ডলেই তিনি নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়াছেন। আর তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, তিনি বঙ্কিমের কাব্যমানসোদ্ভূত নায়িকা-সম্প্রদায়ের আলেখ্যপরম্পরা একই স্থানে সাজাইয়া আমাদিগকে তুলনামূলকভাবে তাহাদের রসাস্বাদনের একটি চমৎকার সুযোগ দিয়াছেন। বঙ্কিমের বিভিন্ন উপন্যাসের মালঞ্চ হইতে রমণীয় কুসুমরাজি চয়ন করিয়া তিনি যে মালা গাঁথিয়াছেন, তাহার বর্ণবৈচিত্র্য ও গন্ধের অভিনবত্ব বঙ্কিমের প্রতিভা-সম্বন্ধে আমাদিগকে নূতন করিয়া সচেতন করিয়া তোলে।

গ্রন্থকার বঙ্কিমের ভাষায় পরিবর্তন দেখাইতে তাঁহার রচনাবলীকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসই কিন্তু প্রথম দুই স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত—তৃতীয় স্তরের জন্য মাত্র দুইখানি উপন্যাস—'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'—অবশিষ্ট আছে। উপন্যাসের অভাব পূরণ করিবার জন্য বঙ্কিমের সমালোচনা ও বিবিধ প্রবন্ধ এই তৃতীয় স্তরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই স্তরনির্দেশ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় কি

না সেবিষয়ে কিছু সন্দেহের অবসর আছে। ভাষার পরিবর্তন বুঝাইতে সমজাতীয় বিষয়ের মধ্যে তুলনা করাই সমীচীন—রূপবর্ণনা ও সাহিত্য-রসবিশ্লেষণ বা যুক্তি-শৃঙ্খলা-সংযোজন ঠিক একরূপ ভাষার দাবি করে না। রূপবর্ণনাতে খানিকটা কাব্যানুরঞ্জন থাকিবেই; বিচার-বিতর্কে রং-এর প্রয়োগ থাকিলেও তাহার গাঢ়তা কিছু কম হওয়াই স্বাভাবিক। আবার উপন্যাসের ক্ষেত্রে সরল ভাষার ওজস্বিতা ও প্রকাশশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে ভবিষ্যৎ বিভিন্ন প্রয়োজনেও এইরূপ সরলীকৃত ভাষা বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হইবে। তারপর উদ্দেশ্যের পার্থক্যের দ্বারাও ভাষার পার্থক্য নির্ণীত হয়। সামাজিক জীবনের নায়িকা ও ইতিহাসের নায়িকার রূপবর্ণনায় বর্ণ-প্রলেপের তারতম্য থাকিবেই। গার্হস্থ্য পরিবেশে ভাব-সৌকুমার্যের স্ফুরণ ও ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে চোখ-ঝলসান দীপ্তি ও উদাত্ত মহিমার দ্যোতনাই বিশেষভাবে লেখকের লক্ষ্য হইবে। আমার সেইজন্য মনে হয় যে, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হইতেই বঙ্কিমের ভাষার নিগূঢ় পরিবর্তনের সূচনা। দ্বিতীয় স্তরের সর্বশেষে সন্নিবিষ্ট 'আনন্দমঠ' ও 'রাজসিংহ' নিজ বিষয়-গৌরব ও আদর্শ-বিহারী ভাবসমুন্নতির জন্য আবার সংস্কৃতগন্ধী ভাষা-গাম্ভীর্যের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং ঠিক কালানুক্রমিক পারম্পর্য অনুসরণ না করিয়া সমস্ত উপন্যাসকে মোটামুটি দুইটি স্তরে ভাগ করিলেই বোধ হয় স্তরবিন্যাস অধিকতর তথ্যানুসারী হইত। অবশ্য এক স্তরের মধ্যেও কাল ও লেখকের শক্তির বিকাশ-অনুসারে সংস্কৃত-পরিহার ও সহজ প্রবর্তনের ধারায় অগ্রগতির চিহ্ন আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

অনুচ্ছেদগুলির নির্বাচনে ও আলোচনায় শ্রীযুক্ত সরকার প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ভবানন্দের দ্বারা কল্যাণীর ও গঙ্গারামের দ্বারা রমার সৌন্দর্যানুধ্যান-বর্ণনায় ভাষার পার্থক্যে যে উভয়ের প্রকৃতির পার্থক্য প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহা তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন্তব্যগুলি সাধারণভাবে সমর্থন করিয়া একটু নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয়টির বিচার করিতে চেষ্টা করিব। পূর্বেই বলিয়াছি লেখকের উদ্দেশ্যের উপর তাঁহার রচনাভঙ্গী নির্ভরশীল। নায়িকার রূপবর্ণনার পদ্ধতি ও ভাষা ও অলঙ্কারের সংযোজনা নিয়ন্ত্রিত হয় নায়িকার প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য লেখক ফুটাইতে চাহেন তাহার দ্বারা। যেখানে নায়িকা

ইতিহাস বা রোমান্সরাজ্যের অধিবাসিনী সেখানে তাহার প্রকৃতির মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য খুব বেশী থাকে না; সেখানে প্রতিবেশের বর্ণসমারোহ ও ঘটনার রোমাঞ্চকর অসাধারণত্ব হইতে বিচ্ছুরিত দীপ্তি নায়িকাকে মণ্ডিত করে; নিজের অন্তঃপ্রকৃতি হইতে উদ্ভাসিত জ্যোতি এই বহিঃসজ্জার উজ্জ্বলতার মধ্যে বিলীনপ্রায় হইয়া যায়। সুতরাং এই সমস্ত ক্ষেত্রে বঙ্কিম সাধারণতঃ সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসরণ ও তাহারই বর্ণনাপ্রণালী ও শব্দসন্নিবেশ গ্রহণ করিয়াছেন।

(৩)

'দুর্গেশনন্দিনী'তে তিলোত্তমা, আয়েষা ও বিমলা—ইহারা একাধারে রোমান্সরাজ্যের অধিবাসিনী ও বিভিন্ন শ্রেণীর নায়িকার প্রতিনিধি। ইহাদের ক্ষেত্রে লেখক প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন এবং বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে উপমা ও উচ্ছ্বসিত আবেগের দ্বারা রূপের মোহময় আকর্ষণের ইঙ্গিতটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই তিন জাতীয় সৌন্দর্যের পার্থক্য ফুটাইতে হইয়াছে বলিয়া তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনার ভিতর দিয়া রূপের সমগ্রতা ও অন্তরের প্রতিফলন বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন —এই সমগ্র-দ্যোতনার দ্বারাই ইহা উচ্চাঙ্গের আর্ট হইয়াছে। ভাষা প্রধানতঃ সংস্কৃতবহুল ও সন্ধি সমাসে দীর্ঘায়তন; কিন্তু বঙ্কিম যে গোড়া হইতেই সহজ সরল শব্দের উপযোগিতার বিষয়ে অবহিত ছিলেন তাহার প্রমাণ এখানেও মিলে।

'কপালকুণ্ডলা'য় কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি- উভয়ের সৌন্দর্যের ভিতর দুইটি বিভিন্ন মূলসূত্রের প্রভাব লক্ষিত হয়। উভয়ই অসাধারণ, কাজেই অসাধারণত্বের ছাপ বর্ণনার ভাষার উপরও মুদ্রিত। কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্য প্রকৃতির সহিত একাত্ম, প্রতিবেশের সহিত এক সুরে বাঁধা; ইহা গম্ভীর-নাদী বারিধিকূল ও অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকের সমগোত্রীয়; কাজেই ভাষাতেও সাগর-কল্লোলের প্রতিধ্বনি শোনা যায় এবং গোধূলির রহস্যময় অস্পষ্টতা ঘনাইয়া আসে। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ উল্লেখ নাই, আছে সকলকে

ছাপাইয়া, অঙ্গদ্যুতির পটভূমিকা ও পরিপূরক—অবেণীসংবদ্ধ, সর্বাঙ্গব্যাপ্ত কেশসম্ভার, আর অনির্বচনীয় মোহিনী শক্তি। মতিবিবির বর্ণনায় প্রাধান্য পাইয়াছে রূপের চঞ্চল উদ্বেলতা, চক্ষুর মুহুর্মুহুঃ ভাবপরিবর্তন, বিশেষতঃ দৃষ্টির মুগ্ধ মন্মথাবেশ, আর সমস্ত দেহভঙ্গীর মধ্য দিয়া বুদ্ধি ও আত্মগরিমার স্ফুরণ। উভয়েরই চক্ষুতে কটাক্ষ, কিন্তু উপমার দ্বারা উহার বিভিন্নতা আশ্চর্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।—মতিবিবির "লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ - যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম"; আর কপালকুণ্ডলার স্থির, স্নিগ্ধ কটাক্ষ "সাগর-হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ-লেখার ন্যায়"।

'মৃণালিনী'তে মনোরমার রহস্যময় দ্বৈত-প্রকৃতিটির মধ্যেই তাহার বৈশিষ্ট্যের পরিচয়। প্রৌঢ়া ও বালিকার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ তাহার বয়স-সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি ও তাহার সম্বন্ধে পাঠকের বিচারবুদ্ধিকে সংশয়াচ্ছন্ন করিয়াছে। তাহার আচরণে প্রৌঢ়ভাবের প্রাধান্য বলিয়া বঙ্কিম দাঁড়িপাল্লার সমতা-রক্ষার জন্যই যেন তাহার দেহসৌন্দর্যবর্ণনায় সৌকুমার্যের উপর বেশী জোর দিয়াছেন। তাহার সর্ববিধ দৈহিক ও মানসিক প্রচেষ্টা হইতে এই সুকুমার রস ক্ষরিত হইতেছে—ইহা যেন তাহার অনপচিত কৈশোরের জীবন রসায়ন। এই দ্বৈতপ্রকৃতির বহিঃপ্রকাশরূপ তাহার দেহসৌন্দর্যে লেখক পরস্পর-বিরোধী উপাদানের সমাবেশ কল্পনা করিয়াছেন—দ্বিরদদের কোমলতা, চম্পকের কাঠিন্য, চন্দ্রকিরণের সাবয়বতা সবই এই দ্বৈতরহস্যের অনুসন্ধিৎসার দ্যোতক। আর বঙ্কিম নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় যে বিশিষ্ট অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে মনোরমার ছবি তুলিয়াছেন তাহাই—তাহার সেই সাগ্রহ, সকৌতূহল প্রতীক্ষা—যেন তাহার অন্তর-রহস্যটিকে খানিকটা উদ্ঘাটিত করে বলিয়া লেখকের দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছে।

'বিষবৃক্ষ'-এ কুন্দনন্দিনী রোমান্সের নায়িকা নহে,—আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরী। সুতরাং তাহার রূপবর্ণনায় শব্দ বা উপমার আড়ম্বর নাই, বা সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের ঐতিহ্যানুবর্তন নাই। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন বর্ণনাই নাই। তাহার সম্বন্ধে প্রধান কথা—তাহার আত্মবিস্মৃত সরলতা ও সর্বাঙ্গীণ শান্ত ভাব। তাহার দেহের মধ্যে কেবল তাহার বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষুর উপর সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করা হইয়াছে। এই চক্ষুর মধ্যে এক অনন্যসাধারণ, অপার্থিব ভাবমুগ্ধতা দর্শকের

মনে অন্যমনস্কতা জাগায়। তাহার সৌকুমার্য বুঝাইতে 'চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী' করার কথা বলা হইয়াছে কিন্তু অত্যন্ত শান্ত, নিরুচ্ছ্বাসভাবে। আর তাহার শান্ত-ভাব বুঝাইতে 'শরচ্চন্দ্রের কিরণ-সম্পাতে স্বচ্ছসরোবরের ভাব-ব্যক্তি'র উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই উপমাগুলির মধ্যে কবির উন্মাদনা অপেক্ষা দার্শনিকের সত্যানুসন্ধিৎসাই অধিকতর প্রকট।

ভাবোচ্ছ্বাসের এই প্রশান্তি, এই সহজ কথায় আবদ্ধ মিতভাষিতা গার্হস্থ্যজীবনে অধিষ্ঠিত সমস্ত নায়িকাবর্ণনাতেই অনুসৃত হইয়াছে। কমলাকান্তের মনোহারিণী যুবতীর বর্ণনায় পরিহাস-রসিকতা ও খাম-খেয়ালী ভাবই নিয়ন্ত্রী শক্তি; কাব্যোচ্ছ্বাস ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের দ্বারা উপহসিত হইয়াছে। যুবতীর পদক্ষেপে পাঁজরের হাড়ভাঙ্গার অনুভূতি বর্ণনাটিকে যেন হাস্যরসের স্তরে নামাইবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। এখানে সহজ শব্দ-প্রয়োগ ও সংস্কৃত-রীতি-বর্জনের পিছনে এই পরিহাসকুশল মনোভাবই ক্রিয়াশীল। তেমনি 'ইন্দিরা'য় সুভাষিণীর সৌন্দর্য পুরুষ নহে, নারীর মুগ্ধদৃষ্টির মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কাজেই অনতিশিক্ষিতা পল্লীবালিকার মুখে যে সমস্ত কথা মানায়, যে সমস্ত উপমা তাহার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের মধ্যে পড়ে, সেই সবেরই দ্বারা রূপ বর্ণিত হইয়াছে। রূপের উদ্বেলতা, সমস্ত শরীরে সৌন্দর্যের একটি হিল্লোলিত প্রবাহ—মতিবিবির মধ্যেও যেমন, সুভাষিণীর মধ্যেও তেমনি দেখা যায়। কিন্তু এই সাধারণ লক্ষণগুলির প্রকাশের ভাষা দুই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এবং ইহারই দ্বারা সুভাষিণীর সৌন্দর্যের মধ্যে এক অনির্বচনীয় যাদু থাকা সত্ত্বেও ইহা সাধারণ গার্হস্থ্য আবেষ্টনের সঙ্গে ঠিক মানাইয়াছে। নারীর চোখে দেখা রূপের প্রকাশ-ভঙ্গীতে পুরুষোচিত কাব্যোচ্ছ্বাস ও ভাববিহ্বলতা নাই।

(৪)

'চন্দ্রশেখর'এ শৈবলিনীর বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্যসৃষ্টি-কুশলতার পরিচয়। শৈবলিনী দরিদ্র গ্রাম্য বালিকা; তাহার প্রেমরহস্যও তাহার অন্তরমধ্যে কঠোরভাবে অবরুদ্ধ। সেইজন্য নায়িকাসুলভ প্রশস্তি-রচনার দ্বারা তাহার অনুপম সৌন্দর্যের প্রতি অর্ঘ্যনিবেদনের

কোন স্বাভাবিক উপলক্ষ্য লেখক গ্রহণ করেন নাই। তাহার সুষুপ্তি-সুস্থির রূপ তপোভঙ্গের এক বিরল মুহূর্তে তাহার উদাসীন স্বামীর অতর্কিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শৈবলিনীর দেহ-সংস্থিতির রেখায় রেখায় যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে অপরিতৃপ্তি, তেমনি বর্ণনার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়াছে অনুতাপের বিষণ্ণ-গম্ভীর ছায়া। সুখ-স্বপ্নের প্রভাবে তাহার অধরে ঈষৎ-উদ্ভিন্ন হাসিটি যেন তাহার বঞ্চিত, ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনের রহস্যটির ইঙ্গিতশংসী ম্লান দীপশিখা। তাহার জীবনের মূল সঙ্কেত, তাহার সৌন্দর্যের বিশিষ্ট আবেদন সুপ্তির আবরণে, হাসির করুণ ব্যঞ্জনায় যেন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বর্ণনা পড়িয়া চন্দ্রশেখরের ন্যায় পাঠকেরও চোখে জল আসিয়া পড়ে।

'রজনী'তে লবঙ্গলতার বর্ণনায় বৈষ্ণব পদাবলীর বয়ঃসন্ধিবিষয়ক পদের প্রভাব পড়িয়াছে মনে হয়। কিশোরীর সহিত যুবতীর সৌন্দর্যের ও সৌন্দর্যানুভূতির পার্থক্যটিই ইহার বিশেষ বর্ণনীয় বস্তু। লবঙ্গলতাকে উপলক্ষ্য করিয়া লেখক এ বিষয়ে কিছু সাধারণ উক্তি করিয়াছেন; সুতরাং ঠিক বর্ণনাত্মক রচনার পর্যায়ে ইহা পড়ে না।

রোহিণীর সৌন্দর্যও যেন তাহার অন্তরের প্রতিচ্ছবিরূপে পরিকল্পিত। কলসীতে জল আনার সময়ে তাহার যে মন্দান্দোলিত অঙ্গভঙ্গী, পদক্ষেপের সঙ্গে সমতালে কলসীর যে ছন্দোবদ্ধ ওঠা-নামা—এই সবই যেন তাহার অন্তরের রূপতৃষ্ণার বহিঃপ্রকাশ। রোহিণীর রূপের প্রধান কথা তাহার লীলাচঞ্চল, নৃত্যশীল গতিচ্ছন্দ; তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবের তটদেশকে বেষ্টন করিয়া আছে এই রূপ-নদীর প্রবাহ-ধর্মী চলমানতা। আর বিষধরীর সঙ্গে সাদৃশ্য-ব্যঞ্জনার জন্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার 'কালভুজঙ্গিনীতুল্যা' কবরী। বঙ্কিমের ভাষা কিরূপ অভ্রান্ত শিল্পজ্ঞানের সহিত সরল ও গুরুগম্ভীর শব্দাবলীর সমন্বয়-সাধন করিতে পারে তাহা এই বর্ণনাতেই চমৎকারভাবে উদাহৃত হইয়াছে। "অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতেপেড়ে-ধুতিপরা, আর কাঁধের উপর"—লিখিতে লিখিতে বঙ্কিমের অবদমিত কবি-প্রতিভা, তাঁহার ব্যঞ্জনার ঔচিত্য-বোধ জাগ্রত হইয়া উঠিল, এবং তিনি বাক্যটিকে শেষ করিলেন অসাধারণ শব্দাড়ম্বর ও ধ্বনিগাম্ভীর্যের মধ্যে—"চারু-বিনির্মিতা, কালভুজঙ্গিনীতুল্যা, কুণ্ডলীকৃতা, লোলায়মানা, মনোমোহিনী কবরী"।

প্রতিভাবানের ভাষা যে নাম্‌তার ছক ধরিয়া চলে না, ইহা তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

(৫)

'দেবী চৌধুরাণী'তে দেবীর রূপ-পরিকল্পনায় সূক্ষ্মতর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মিলে। এখানে কপালকুণ্ডলার ন্যায় প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণ একাত্মতা নাই,—আছে নিবিড় সহানুভূতি। তাহার রূপকে উদ্বেলিত নদীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, কিন্তু অন্য নায়িকার সহিত পার্থক্য সূচিত হইয়াছে চঞ্চল লাবণ্যপ্রবাহের মধ্যে লাবণ্যময়ীর নির্বিকারতায়। তাহার সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হইয়াছে নদীর সহিত সমধর্মিতায় ও জ্যোৎস্নালোকে নদীজলের মত তাহার অঙ্গ-বিন্যস্ত অলঙ্কারের মুহুর্মুহুঃ দীপ্তি-বিচ্ছুরণে। আর তাহার অন্তরের গভীর ভাবোচ্ছ্বাস, তাহার অসংবরণীয় হৃদয়াবেগ মুক্তি পাইয়াছে বীণা-ঝঙ্কৃত রাগিণী-পরম্পরার ভিতর দিয়া। রাজমহিমার সঙ্গে উদ্বেল-প্রায় প্রণয়-বেদনার অপূর্ব সমন্বয় ভাষার সাঙ্কেতিকতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে--দেবীর জীবন-সমস্যার সংক্ষিপ্তসার তাহার এই রূপবর্ণনায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারাম'-এ অনেকগুলি রূপচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই চিত্রাঙ্কনের বিভিন্ন ধারায় উপন্যাসটির দুইটি প্রধান অঙ্গের সমতা রক্ষিত হইয়াছে। সীতারাম রাজা ও গৃহস্থ; উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবনের প্রচণ্ড আকর্ষণে তাহার গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবন কিভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে তাহারই বিবৃতি পাই। অনায়ত্ত বিদ্যুৎ-শিখাকে গৃহস্থালীর নিয়মিত কক্ষানুবর্তনে আবদ্ধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় তাহার জীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। রমা এই গার্হস্থ্য জীবনের ম্লান প্রদীপ; এবং শ্রী এই অনধিগম্য আদর্শলোকের বিভ্রান্তকারী তড়িৎ-ছটা। উভয়ের সৌন্দর্যবর্ণনার প্রণালীও উভয়ের চরিত্রানুসারী। রমা প্যান্‌পেনে কাঁদুনে বাঙালীর মেয়ে—তাহার চোখের জল "কখনও মুষলের ধার, কখনও ইল্‌শে গুঁড়ি"। রমার প্রণয়ীও তাহার নির্জন অনুধ্যানের মধ্যে তাহাকে লইয়া কবিত্ব করে না। তাহার রূপের অসাধারণত্ব তাহার আচরণের সাধারণত্বের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীর সিংহ-বাহিনী ও ভুবনেশ্বরী—এই উভয়মূর্তির

পার্থক্যটি চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। সিংহ-বাহিনীর আত্মবিস্মৃত উদ্দীপনার সহিত ভুবনেশ্বরীর প্রশান্ত, বিকারহীন ভাব-বিশুদ্ধির যে বৈপরীত্য তাহা কল্পনা হইতে ভাষাতে নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

(৬)

বঙ্কিমচন্দ্রের আলেখ্য-প্রদর্শনীর এইখানেই শেষ। এই চিত্রশালায় সংগৃহীত চিত্রগুলির প্রত্যেকটি বর্ণসমাবেশে, চরিত্র-দ্যোতনায়, বর্ণনাভঙ্গীর বিভিন্নতায় ও বর্ণিত বিষয়ের স্বকীয়তায় অসাধারণ শিল্পকুশলতার নিদর্শন। আজকাল আমাদের সাহিত্যে ও জীবনে সৌন্দর্য-পূজার যুগ অতীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। রূপের অগ্নিশিখা এখন সমস্যার ভস্মাবরণে আচ্ছন্ন। যে রূপমুগ্ধতার উচ্ছ্বসিত আবেগ বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিশক্তির প্রেরণা ছিল তাহা তাঁহার পরবর্তীদের মনে শান্ত, সংযত ও অন্তর্গূঢ়তার লক্ষণাক্রান্ত হইয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নায়িকাদের দেহ-সৌন্দর্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বর্ণনা পাই না—তাঁহার সুচরিতা বা কুমুদিনী যেন অন্তর-সৌকুমার্যের মূর্ত বিগ্রহ; দেহের যতটুকু আশ্রয় অন্তঃপ্রকৃতির বিকাশের জন্য অপরিহার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠিক ততটুকুই বর্ণনা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মধ্যে যাহাদের রূপের খ্যাতি লেখক ঘোষণা করিয়াছেন—যথা কিরণময়ী ও ষোড়শী—তাহাদের রূপের বর্ণনা শুনি না, অন্যের উপর ইহার সম্মোহন-প্রভাব, বিস্ময়-বিমূঢ় ভাব-সৃষ্টির কথাই শুনি। আজকাল সৌন্দর্যের নিগূঢ় রহস্যময় প্রকৃতির উপলব্ধির ফলেই বোধ হয় বর্ণনার প্রত্যক্ষ স্থানে পরোক্ষ রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। অতি-আধুনিক যুগের ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর মধ্যে আদিম প্রবৃত্তির উষ্ণনিঃশ্বাসে সৌন্দর্য-প্রতিকৃতির স্বচ্ছ নির্মলতা অস্পষ্ট ও আবিল হইয়া পড়িতেছে। মনে হয়, আমাদের মধ্যে সৌন্দর্য-আস্বাদন-বিষয়ে এক যুগান্তকারী রুচি-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। আমরা সূক্ষ্মের আকর্ষণে অবয়বকে ছাড়িয়াছি, আত্মার সন্ধানে দেহকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছি, রূপ ও রং-এর লীলাকে অন্তঃপ্রকৃতির জটিলতার জটাজালে সংহরণ করিয়াছি। এই পরিবর্তন ভালর দিকে কি মন্দর দিকে—সে প্রশ্ন এখন নাই তুলিলাম; তবে যাহা হারাইলাম, তাহা আর কোন কালে ফিরিয়া পাইব কি না সন্দেহ। বার্ধক্যের দিকে দ্রুত অগ্রসরণশীল জাতিমানস আর

পিছন ফিরিয়া যৌবনের প্রাণশক্তি, সৌন্দর্যানুরাগ ও আদর্শবাদ আয়ত্ত করিতে পারিবে না—ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের অবসান ঘটিল—এই উপলব্ধি তাঁহার মহিমা-অনুভবের আনন্দকে কিয়ৎ-পরিমাণে ম্লান করিয়া দেয়। বাংলা সাহিত্য অগ্রগতির পথে নানা বন্দরে তরী ভিড়াইবে, নানা পণ্যের আদান-প্রদানে নিজ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবে, নানা অজানা দেশের কুহকমন্ত্রে দীক্ষা পাইবে; কিন্তু চির-পরিচিত সৌন্দর্যের যে শ্যাম-স্নিগ্ধ উপকূল ছাড়িয়া ইহা তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি জমাইয়াছে ইহার সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ জীবনে সেইরূপ আর একটি স্নেহচ্ছায়া-নিবিড় আশ্রয়স্থল ইহার মিলিবে কি? কংসনিধনে ব্রতী বাংলা সাহিত্য আর কি কোন দিন ভাব-বিভোর বৃন্দাবন-লীলায় প্রত্যাবর্তন করিবে?

ভূমিকা সুদীর্ঘ হইল। পাঠকবর্গের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ও সঙ্কলয়িতাকে আর একবার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া ইহার উপসংহার করিলাম।

মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র

(১)

ইহা অত্যন্ত সুখের কথা যে, উচ্চতর পরীক্ষার জন্য বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সহিত ইহার তুলনামূলক আলোচনার ফলে আমাদের তরুণ ছাত্র ও গবেষক সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন প্রণালীতে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রেরণা জাগিয়াছে। বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন আলোচনা-পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে উপাদানের অপ্রাচুর্য ও তথ্যগত অনিশ্চয়তা পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পক্ষে যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, সৌভাগ্যবশত আধুনিক সাহিত্য তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত। এখানে প্রয়োজন জীর্ণ পুঁথিপত্র হইতে তথ্য-সংগ্রহ নহে, বিচারবুদ্ধির স্থিরতা

ও অনুভূতির গভীর-অনুপ্রবেশশীল মৌলিকতা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পুনর্গঠন করিতে হইলে আধুনিক যুগের অধ্যায় হইতে সেই কার্য আরম্ভ করিতে হইবে। অনতিপূর্ব অতীত ও বর্তমান সাহিত্য আস্বাদনের দ্বারা অনুশীলিত রসবোধ লইয়া মধ্যযুগের গহন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার মধ্যে সুস্পষ্ট পথরেখা আবিষ্কার অধিকতর সম্ভব হইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র ও অধুনা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক শ্রীমান্ তারাপদ মুখোপাধ্যায় এই পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্য পরিচিতি-প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আধুনিক বাংলা কাব্যের একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই ইতিহাস ঈশ্বরগুপ্ত হইতে নবীনচন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত। আধুনিকতার সূত্রপাত হইতে উহার দৃঢ়প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এই আলোচনার অঙ্গীভূত। এই যুগের কবিগোষ্ঠীর সহিত মোটামুটি আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। তাহাদের রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য ও যুগবিবর্তনের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক বিষয়েও আমাদের ধারণা অনেকটা নিশ্চয়তা লাভ করিয়াছে। তথাপি ইহাদের সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর আলোচনা ও সামগ্রিক যুগ-পরিচয়ে ইহাদের স্থান-নির্ণয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। শ্রীমান্ তারাপদ-র গ্রন্থে যুগপরিপ্রেক্ষিতে ও কাব্য-বিচারের চরম মানদণ্ডে এই সমস্ত সুপরিচিত কবির পুনরালোচনা হইয়াছে। এ কার্য যে দুরূহ ও পরিণত-বিচারবুদ্ধি-সাপেক্ষ তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। মধ্যযুগের কোন অনাবিষ্কৃত বা স্বল্পপরিচিত কবি সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ। যতদিন কাব্যরচনা গোষ্ঠীভাব-নিয়ন্ত্রিত, ততদিন গোষ্ঠী-পরিচয়েই কবির স্থান-নির্দেশ সূচিত হয়। কিন্তু যে যুগে কবির ব্যক্তিসত্তা গোষ্ঠী-অন্তর্ভুক্তিকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশে উন্মুখ, সে যুগের কবি সম্বন্ধে চূড়ান্ত অভিমত-প্রকাশ সূক্ষ্মতর বিচারবুদ্ধি ও স্থিরতর রসবোধের উপর নির্ভরশীল।

আলোচ্য গ্রন্থে তরুণ গ্রন্থকারের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-রীতির সহিত দীর্ঘ পরিচয়ের দ্বারা অনুশীলিত রসগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগের কবিদের সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদগুলি লেখক কোথাও নির্বিচারে মানিয়া লন নাই—প্রত্যেকটিকে তীক্ষ্ণ মনীষা ও সতর্ক বিচারবুদ্ধির সাহায্যে পুনঃ-পরীক্ষা করিয়া তাহার গ্রহণীয়তা নির্ধারণ করিয়াছেন। প্রত্যেক কবির আলোচনায় এই স্বাধীন-

বুদ্ধির দীপ্তি অনুভব করা যায়। কবিগান বৈষ্ণব পদাবলীর রুচি-আদর্শের ক্রমাবরোহণশীলতার শেষ ধাপ, ভাটার টানে উদ্ঘাটিত শেষ পঙ্কস্তর, না ইহার কোন স্বতন্ত্র, মানবিক বা কাব্যিক মূল্য আছে, ঈশ্বরগুপ্ত যুগসমাপ্তির কবি না যুগসূচনার কবি, রঙ্গলালের কাব্যের যথার্থ ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি, বিহারীলালের কবিতা কতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ, কতটাই বা উজ্জ্বলতর সম্ভাবনার পূর্বাভাস—ইত্যাদি যে সমস্ত জটিল প্রশ্ন আমরা মানসিক ঔদাস্য ও শিথিলতার জন্য পাশ কাটাইয়া যাইতে অভ্যস্ত, এই অতি-প্রয়োজনীয়, অথচ অস্পষ্টতামণ্ডিত প্রশ্নগুলির সহিত লেখক মল্লযুদ্ধ করিয়া তাহাদের অন্তরের সত্য রহস্যটিকে নিষ্কাশিত করিয়া লইয়াছেন। সময় সময় মনে হয় যে, লেখকের অনুসন্ধিৎসার তীব্রতা যেন তরুণ-সুলভ অত্যুৎসাহ-চালিত হইয়া মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে। তরুণ লেখকের পক্ষে এই সাহসিকতা, লক্ষ্যভেদের এই দুর্জয় সঙ্কল্প সত্যই প্রশংসনীয়।

(২)

এই যুগের তিনজন প্রধান কবি - মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র - অতি বিস্তারিত আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছেন। বিশেষত মধুসূদনের আলোচনায় লেখকের মনস্বিতা ও মৌলিক চিন্তাধারার প্রশংসনীয় নিদর্শন মিলে। মধুসূদন যুগের সমস্ত কবির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচিত কবি। তাঁহার কাব্যকে নানা দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করা হইয়াছে। স্বর্গত প্রখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় মধুসূদন সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা প্রায় প্রামাণ্যরূপেই গৃহীত হইয়াছে। তথাপি এই বহু-প্রশংসিত, বহু-আলোচিত কবি সম্বন্ধেও তরুণ লেখক যে অনেক নূতন কথা বলিতে পারিয়াছেন ইহাতেই তাঁহার ধীশক্তির পরিচয় পরিস্ফুট। মোহিত-বাবুর সমালোচনার একটি নিরূপণ—মধুসূদনের কাব্য বীররসপ্রধান না হইয়া করুণরসপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও কবির অনভিপ্রেতভাবে—কিছুটা সংশয় ও প্রতিবাদ-স্পৃহার উদ্রেক করে এবং শ্রীমান্ তারাপদ সাহসিকতার সহিত এই সংশয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। মোহিতবাবু বীর ও করুণরসের মধ্যে একটি স্বাভাবিক বিরোধ ও বৈপরীত্যের কল্পনা করিয়া লইয়াছেন এবং

এই বিরোধের ভিত্তিতেই তাঁহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু সত্যিকার মহাকাব্যে এই দুই আপাতবিরোধী ভাব একত্র-সন্নিবিষ্ট ও পরস্পরের পরিপূরক। বীরত্ব জিনিসটা শূন্যে আস্ফালন মাত্র নহে, একাধিক প্রতিযোদ্ধার পরাজয় ও হননের উপরই ইহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। করুণরসের অপরিহার্য স্ফুরণ ব্যতীত বীররসের অভিব্যক্তি অসম্ভব। মহাকাব্যীয় বীররস যেন শোক-পারাবারের মধ্যে অর্ধনিমগ্ন, ইন্দ্র-বজ্রাহত মৈনাক। ক্ষীরোদ-সমুদ্রশায়ী, অনন্তশয্যাশ্রয়ী নারায়ণের মতই ইহার অঙ্গ হইতে দিব্যজ্যোতি নিঃসৃত; মৃত্যুর ঝটিকা-বিধ্বস্ত, অশ্রুপ্লাবিত আকাশে ইহার বিদ্যুৎ-স্ফুরণ। সুতরাং মহাকাব্যে শোক-বিয়োগবেদনা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলিকে অনধিকার-প্রবেশের অভিযোগে বিতাড়িত করিবার উপায় নাই। লৌহবর্মের সঙ্গে সঙ্গে কোমল, বেপথুমান হৃদয়, অস্ত্র-ঝনৎকারের সঙ্গে অলঙ্কার-শিঞ্জিত, নির্মম অনমনীয় সঙ্কল্পের সঙ্গে করুণ, অশ্রুসিক্ত বিলাপ-মহাকাব্যের উদার প্রাঙ্গণে ইহারা সদাবিচরণশীল নিত্যসহচর। সকল মহাকাব্যেই 'শোকের ঝড়' বহিয়া যায়; ইহার পরিসমাপ্তিতে 'বিসর্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে' শোক-স্তম্ভিত বীরবৃন্দ শিবিরে ফিরিয়া আইসে। সুতরাং বীর ও করুণরসের অঙ্গাঙ্গী সমন্বয়েই মহাকাব্যের ভাব-সংশ্লেষ গঠিত হয়। রণাঙ্গনের শবাকীর্ণ বীভৎসতার মধ্যে ব্যথাদীর্ণ অন্তরের শোকোচ্ছ্বাস স্মৃতিদীপহস্তে হারানো প্রিয়জনকে খুঁজিয়া বেড়ায়।

এখানে একমাত্র প্রশ্ন, এই অবশ্যম্ভাবী শোকের মাত্রা ও অভিব্যক্তির রীতি-বিষয়ক। হোমারের মহাকাব্যে হেক্টর যখন তাহার প্রিয়তমার নিকট শেষ বিদায় লয়, বা বৃদ্ধ রাজা প্রিয়াম হতপুত্রের শবদেহের জন্য পুত্রহন্তা একিলিসের জানুস্পর্শ করিয়া করুণ আবেদন জানায় তখন কি আমরা একমুহূর্তে যুদ্ধের নৃশংসতা ও বীরধর্মের বজ্রকঠোর আদর্শের কথা ভুলিয়া গিয়া অসহায় মানবের দৈবনির্যাতিত দুর্ভাগ্যের জন্য করুণ সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠি না? এই করুণরসের জন্য বীররস ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং এই অশ্রুধৌত, বেদনা-শোধিত বীরত্ব আরও উজ্জ্বল ও মর্মস্পর্শী হইয়া উঠে, বর্ষাজলভরা মেঘের সান্নিধ্যে পর্বতশৃঙ্গ আরও উত্তুঙ্গ ও মহিমান্বিত দেখায়। ভার্জিল ও মিলটনের মহাকাব্যে করুণরসের ততটা অবকাশ নাই; কেননা ইহাদের মধ্যে প্রথমটির বিষয় সাম্রাজ্য-সংস্থাপন ও দ্বিতীয়টির বিষয় ধর্মতত্ত্ব।

রামায়ণ-মহাভারত ও মধুসূদনের মহাকাব্যে আবার পারিবারিক জীবনের প্রাধান্য—স্নেহমায়ামমতার মন্থনে বীররসের ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি। অবশ্য হোমারের শোক ও মধুসূদনের শোকের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য আছে। সমাজ-বিন্যাসের আদিম যুগে আকস্মিক মৃত্যু নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল—বহুলোকের মৃত্যুবরণই গোষ্ঠীজীবনের অক্ষুণ্ণ অস্তিত্বের অপরিহার্য সর্ত ছিল। সুতরাং সে যুগের কাব্যে শোক-প্রকাশের মধ্যে একটা সহজ ক্ষণিক দুঃখানুভূতি, একটা সংযত, বিষণ্ণ গাম্ভীর্য প্রধান সুররূপে ধ্বনিত হইত। কোন গভীরতর অনুরণন, বিশেষ শিল্পরীতি-প্রয়োগে ইহাকে আরও তীব্র ও মর্মভেদী করার প্রয়াস, ইহার করুণরসকে ব্যঞ্জনা ও কল্পনা-রোমন্থনের সাহায্যে, সূক্ষ্মতা ও অন্তর্মুখী, নীরন্ধ্র ব্যাপকতা দিবার চেষ্টা ইহাদের রচনায় দেখা যায় না। যে অশ্রুপ্রবাহ ক্ষীণ নির্ঝররূপে মানব অস্তিত্বের আদিম যুগ হইতে বহিতে সুরু করিয়াছে তাহাই যুগে যুগে নূতন নূতন ধারার সংযোজনে ক্রমশ স্ফীতকায় ও উদ্বেল হইয়া ক্রমবর্ধমান গতিবেগে ও তরঙ্গকল্লোলে আধুনিক যুগের দুঃখ-সমুদ্রের মোহানার কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে। উদ্ভবমুহূর্তে ইহার যে যাত্রাপথ প্রায় সমতলভূমির সঙ্গে একই স্তরের ছিল, তাহা ক্রমশ গভীরতর প্রণালী খনন করিয়া আজ প্রায় অতলস্পর্শ খাদে পরিণতি লাভ করিয়াছে। আজ মানবনেত্রক্ষরিত একটি অশ্রুবিন্দুতে সপ্তসিন্ধুর লবণস্বাদ ও পাতালস্পর্শী অপরিমেয়তা সঞ্চারিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও পার্থক্যের আরও নিগূঢ় কারণ আছে। হোমার বা বাল্মীকির শোক-গাথায় কবির নিজ মানস স্পর্শ কতটা ছিল তাহা বলা শক্ত। ইহা বড় জোর কবির উদার সমবেদনা-প্রসূত, কিন্তু কবিচিত্তের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ইহার মধ্যে জটিল তন্তু বয়ন করে নাই। রাম-সীতার দুঃখের মধ্যে বাল্মীকির নিজের দুঃখ, প্রিয়ামের করুণ মিনতির মধ্যে হোমারের ব্যক্তিগত বেদনা আমরা শুনিতে পাই না। কিন্তু মেঘনাদবধের বিলাপের মধ্যে মধুসূদনের জীবন-বেদনা, বঞ্চিত, ব্যর্থ আশার রুদ্ধ রোদনাবেগ, বিশ্ব-বিধানের প্রতি সার্বভৌম ক্ষোভ ও বিদ্রোহের রেশটি স্পষ্ট শোনা যায়। যে কবি আত্ম-বিলাপে আশার ছলনার নিদারুণ আঘাতের কথা লিখিয়াছেন, তাঁহারই প্রচ্ছন্ন অশ্রু, শোক-কম্পিত কণ্ঠস্বর, তাঁহারই ভাগ্যহত জীবনের বিষণ্ণ বিড়ম্বনাবোধ চিত্রাঙ্গদা-রাবণের খেদোক্তির ভিতর নিজ ছদ্মপ্রকাশের

চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। ইহা মধুসূদনের দোষ নহে, আধুনিক কালেরই অনিবার্য পরিণতি। আধুনিক কবি যে মন লইয়া কাব্য লেখেন তাহা প্রাচীন কবির মনের সহিত ঠিক সমধর্মী নয়। এ যুগের আকাশ-বাতাসই যে বেদনার করুণ গুঞ্জনে মুখর; শতেক যুগের কবিদল, অতীত বংশ-পরম্পরার শোকাবহ অভিজ্ঞতা, জটিল আত্মদ্বন্দ্ব-পীড়িত, সংশয়ক্ষুব্ধ চিত্তের অন্তর্গূঢ় অস্বস্তি ও অকারণ ক্ষোভ যে কবির শোকানুভূতিকে আবিষ্ট করিয়াছে—এই যুগ-যুগ-সঞ্চিত মানস উত্তরাধি॰ার হইতে কবির নিষ্কৃতি কোথায়? কাজেই মহাকাব্যের সমুদ্রগর্জনের মধ্যে যদিই বা কপোতাক্ষ নদের শান্ত বিষণ্ণ কুলুকুলু-ধ্বনি শ্রুত হয়, তাহা মধুসূদনের মহাকাব্য-রচনার অক্ষমতার পরিচয় নহে, তাহা মহাকাব্য-রচয়িতা মনের অনিবার্য অভিব্যক্তি-রূপেই গ্রহণ করিতে হইবে।

মধুসূদনের সমসাময়িক কবিগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁহারই মন ছিল সর্বাপেক্ষা আবেগধর্মী ও আত্মপ্রকাশপ্রবণ। কাজেই তাঁহার রচনায় মহাকাব্যের নৈর্ব্যক্তিকতা যে বিশেষ করিয়া ব্যক্তিমানসের রং-এ অনুরঞ্জিত হইবে, আত্ম-প্রকাশের আবেগে দোলায়িত হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে? মধুসূদনের ব্যক্তিমানস ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যও করুণরস-প্রসারের অনুকূল ছিল। বাংলা কাব্য তাহার জন্ম হইতেই শোক-সাধনা করিয়া আসিতেছে। তাহার প্রতি পত্রের মর্মরধ্বনি হইতে করুণ সুরের মূর্ছনা উত্থিত হইতেছে। সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্য ত এই গভীর হৃদয়-আর্তির দীর্ঘশ্বাসে প্রতিধ্বনিময়। চৈতন্যদেব ত অবিরল অশ্রু-নিষেকে জাতির চিত্তকে বর্ষণোন্মুখ নবনীরদমালার ন্যায় রোদনাতুর করিয়া তুলিয়াছেন। সমস্ত বাংলা কাব্য কালিদাসের শোকবিহ্বলা মদনপ্রিয়ার ন্যায়—

"বহুধালিঙ্গনধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা।"

কাজেই মধুসূদনের মহাকাব্যে যে করুণরস বীররসের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবে, বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি ও আচরণের মধ্যে অন্তরশায়ী বেদনার ফল্গুধারা বহিয়া যাইবে, শক্তিমত্তা ও দম্ভের পারুষ্য যে কারুণ্যের ব্যঞ্জনায় স্নিগ্ধ-কোমল হইবে, ইহা সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক। প্রশ্ন এই হওয়া উচিত যে, মধুসূদন কি কোথাও করুণরস-প্রকাশে মহাকাব্যোচিত সংযম ও

মর্যাদাবোধের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন? তাহা না করিয়া থাকিলে তাঁহার মহাকাব্যের ভাবাবহ-সৃষ্টিক্ষমতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবসর নাই। তাঁহার বীরের গণ্ড বাহিয়া দুই-এক ফোঁটা অশ্রুজল গড়াইয়া পড়ে, তাঁহার মাতৃ-হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাসে নারীসুলভ উচ্চ রোদনধ্বনির মধ্যে রাজকর্তব্যচ্যুতির জন্য অনুযোগ, শাশ্বত নীতি-লংঘনের জন্য তিরস্কার শোনা যায়। কোথাও হৃদয়-দৌর্বল্যের অযথা প্রশ্রয় ও অনুচিত প্রসার নাই। চিতাশয্যাশায়িত পুত্র-পুত্রবধূর সম্মুখে রাবণের খেদোক্তি বাঙালী মায়ের হাহাকারে ফাটিয়া পড়া, আত্মসংবরণে অনিচ্ছুক ভাবাতিশয্য নয়, আগ্নেয়গিরির প্রতিরোধ-বিদারী অগ্ন্যুৎক্ষেপ, অসহ্য চিত্তদাহের প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে কয়েকটি স্ফুলিঙ্গের অদম্য বহিঃনিষ্ক্রমণ।

মধুসূদনের মহাকাব্য সম্বন্ধে কোন সংশয়-পোষণের পূর্বে যুগধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বর্তমান সময়ে বীরত্ব নৈর্ব্যক্তিকতায় ম্লান ও কারুণ্য আত্যন্তিক অনুশীলনে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বতন যুগের গৌরবরশ্মি আর বীরমুকুটকে বেষ্টন করিয়া নাই—ইহার প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে নাটকীয় উজ্জ্বলতা আজ অনেকটা স্তিমিত। অধুনাতন কালে বীর শিবিরের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। রণক্ষেত্রের অনাবৃত মহিমায় তাঁহার আত্মপ্রকাশের পথ অবরুদ্ধ। সময় সময় তিনি আবার আত্মগোপন করিয়া গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের সাধারণ ভূমিতে নামিয়া আসেন, লোকে তাঁহাকে সহজে চিনিতেই পারে না। পক্ষান্তরে করুণরস আজ উহার ভূগর্ভস্থ অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া সমস্ত জীবনকে প্লাবিত করিয়াছে। আজ ভূগোলের অনুবর্তনে মানবের মানস সংস্থিতিতে এক ভাগ বীরত্বের শুষ্ক ভূমি, আর তিন ভাগ কারুণ্য-রস-প্রবাহের বিশাল সমুদ্র। যাহা অতিমাত্রায় প্রকট ছিল তাহা এখন প্রায় অপ্রকট হইয়াছে; আর যাহা অন্তঃরুদ্ধ ছিল তাহা আজ সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া বিপুল জলকল্লোলে, সীমাহীন বিস্তারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আজ এই প্রত্যক্ষ সত্যকে কে অস্বীকার করিবে? আজ বীররসের বর্ণনায় করুণরসের গভীর অনুপ্রবেশ কোন যুগচেতনাসম্পন্ন কবি ঠেকাইয়া রাখিবেন? আজ হিমালয় কুহেলিকার আবরণে অস্পষ্টভাবে অর্ধপ্রকাশিত; আর হিমালয়ের পাদদেশ-নিঃসৃত জাহ্নবীধারা সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাণধারারূপে প্রবহমান। তাই 'গাইব মা বীররসে ভাসি'

বলিয়াও মধুসূদন "নেত্রজলে তিতিয়াছেন"। ইহা প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের অপরাধ নয়, অভ্রান্ত কবি-সংস্কার-প্রবর্তিত যুগোচিত রূপান্তরসাধন।

(৩)

রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের কাব্য—আলোচনায় লেখক অনুরূপ স্বাধীনচিত্ততার ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ বৃত্রসংহার সম্বন্ধে তিনি অতি নির্মম ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইহার কাব্যোৎকর্ষের দাবিকে একেবারে খণ্ড-বিখণ্ড ও ধূলিসাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিচার বিশুদ্ধ কাব্যাদর্শের দিক দিয়া যথার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি মনে হয় যে ঐতিহাসিক তাৎপর্যের দিক দিয়া ইহাদের যে মূল্য তাহা যথোপযুক্তভাবে স্বীকৃত হয় নাই। লেখক রঙ্গলালের বিচার প্রসঙ্গে মধ্যবিত্ত কবির মূল্য-নির্ধারণ সম্বন্ধে সমালোচকের যে কর্তব্যনির্দেশ করিয়াছেন তাহা theory-র দিক দিয়া সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু অস্ত্রাঘাতের অত্যুৎসাহ এই উদার নীতির বাস্তব প্রয়োগকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে—লেখক নিজের নীতি-নির্দেশ নিজেই অনুসরণ করেন নাই। বস্তুত, সাহিত্যবিচারে যেমন একটা absolute মূল্যপরীক্ষা আছে, তেমনি একটা ঐতিহাসিক স্থান-নির্ণয়ও আছে। অনেক দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি কবিত্বশক্তিতে অপেক্ষাকৃত-হীন হইয়াও ইতিহাসের বাহন ও নূতন কাব্য-চেতনার প্রবর্তকরূপে সাহিত্যের ইতিহাসে সম্মানিত আসন গ্রহণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরেজী সাহিত্যে Cowper, Crabbe প্রভৃতি যুগসন্ধিক্ষণের কবির নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের কাব্যধারা ক্ষীণ স্তিমিত প্রবাহে, কোথাও বা সরল, অকৃত্রিম অথচ সাধারণ অনুভূতির পাল খাটাইয়া, কোথাও বা অতিরূঢ় বাস্তবতার চড়া ঠেলিয়া যুগান্তরের অলক্ষিত-সম্ভাবনাপূর্ণ পথে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাদের বিচারে যদি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা শেলীর উন্নততম মান অনুসৃত হয়, তবে সাহিত্য-বিচার ক্ষতের উপর অস্ত্রোপচারের বীভৎস আকার ধারণ করিবে। এই জাতীয় সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পূর্বাভাসের আবিষ্কার। ইঁহাদের দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতা লইয়া পাতার পর পাতা পূর্ণ করা যায়। ইহাদের প্রতি উপর্যুপরি আঘাত-পরম্পরা হানিয়া অস্ত্রপরীক্ষায়

উত্তরণ ও লক্ষ্যভেদের তৃপ্তি অনুভব করা যায়। কিন্তু উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে এই অসামঞ্জস্য, ক্ষুদ্র-জন্তু-শিকারে গুলি-বারুদের অযথা অপব্যয় যে পরিমিতি ও ঔচিত্যবোধের কিছুটা অভাব সূচিত করে ইহাও সত্য।

রঙ্গলালের প্রকৃত কৃতিত্ব হইল যে, তিনি সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে বীরযুগের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। এই দ্বার খুলিতে গিয়া তিনি কোদালি, শাবল প্রভৃতি স্থূলজাতীয় অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন; দ্বারদেশে কপাটের উপর ক্ষোদিত সূক্ষ্ম কারুকার্যের উপর ভোঁতা অস্ত্রপ্রয়োগের ক্ষতচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন; কাঁচা রংএর স্থূল প্রলেপের দ্বারা তুলির মোটা মোটা টানে কতকগুলি বীরত্বের রংচঙে পুতুল সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারা জয়ঢাকের পরিবর্তে আম-আঁটির ভেঁপু বাজাইয়া রণসঙ্গীতের কৃত্রিম উন্মাদনার স্বর তুলিয়াছে; বীরদর্পের সহিত কান্না মিশাইয়া এক অদ্ভুত সঙ্করজাতীয় বীর-ভাষণের প্রবর্তন করিয়াছে। ইহা সবই সত্য, তথাপি রঙ্গলাল যে যুগসন্ধিক্ষণের কবি, তিনি যে বাংলা কাব্যের এক নূতন মোড় ফিরাইয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। রাজপুতানার শৌর্যবীর্যমণ্ডিত ইতিহাস-কাহিনীর প্রতি গতানুগতিকতা-ক্লিষ্ট, ভক্তি-রোমন্থনস্তিমিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, বঙ্গসরস্বতীর বীণায় নূতন তার সংযোজন করিয়াই তিনি ইতিহাসে চিরন্তন স্থান অধিকার করিয়াছেন। খনির তিমিরগর্ভ হইতে হয়ত তিনি মণি উত্তোলন করিতে পারেন নাই, নূতন তার বাজাইবার পূর্ণ কৌশল তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই—তথাপি প্রথম আবিষ্কারকের গৌরব তাঁহার প্রাপ্য। শঙ্খের কন্দরে প্রথম ফুৎকার-বায়ুপ্রেরণের ফলে যে ধ্বনি উত্থিত হয় তাহা প্রায়ই অস্পষ্ট ও ক্ষীণ হয়; কিন্তু বায়ুপ্রবাহ স্থিরতর ও ফুৎকার-কৌশল আয়ত্ত হইলে সেই অর্ধস্ফুট শব্দ-ভ্রূণ মধুর ও গম্ভীরনাদী হইয়া উঠে। রঙ্গলালের কৃত্রিম বীরত্ব মধুসূদনের সত্যিকার বীররসস্ফুরণের অগ্রদূত ও উদ্বোধক। বাংলা সাহিত্যে বীরযুগের ক্ষণস্থায়িত্বের ফলে রঙ্গলাল-প্রবর্তিত ধারা বিশেষ পুষ্টিলাভ করে নাই; তাঁহার কাব্যে যে সত্যিকার উৎকর্ষ-সম্ভাবনা ছিল তাহাও পরিণত রূপে বিকশিত হয় নাই। তাঁহার গাঢ়বদ্ধ অর্থ-গৌরবভূয়িষ্ঠ পয়ার-গ্রন্থন, তাঁহার প্রকৃতি-অঙ্কনের চিত্রল-তা (picturesqueness) প্রাচীন ভূগোল ও ইতিহাসের সূত্র অবলম্বনে দেশের ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যের সামগ্রিক রূপায়ণ, তাঁহার নীতিমূলক কবিতার সরল ও

অকৃত্রিম ভাব-সংস্থাপন—এগুলির প্রতি আমরা এক প্রকারের উন্নাসিক অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি। কিন্তু ইহাদের অভাব আমাদের কাব্যকে যে অতিমাত্রায় ভাববিলাসী ও কল্পনাপ্রবণ করিয়াছে তাহা বুঝিতে চাহি না। রঙ্গলালকে তুলনা করিতে হইবে রোমান্টিক আখ্যায়িকার স্রষ্টা স্কট ও বায়রনের ও আধুনিক যুগের মেস্‌ফিল্ডের সঙ্গে। ইহাদের কাহারও কাব্যশিল্প অনবদ্য নহে, অথচ আখ্যান-কৌতূহলের জন্য ইহাদের অমার্জিত রীতি ক্ষমার্হ ও উপেক্ষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

(৪)

হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার সম্বন্ধেও লেখক যে প্রতিকূল মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও তাঁহার মনীষা ও তীক্ষ্ণ সাহিত্য-বিচারের নিদর্শন। প্রত্যেকটিই মর্মান্তিকরূপে সত্য। যে কবি সম্বন্ধে এত বিরূপ সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিতে হয়, মনে হয়, যেন তাঁহাকে আলোচনার বাহিরে রাখাই ভাল। শুধু প্রমাদ-তালিকা দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করিয়া কাহারও কোন লাভ নাই। সমালোচনা পড়িয়া মনে হয় যে, হেমচন্দ্রের সমস্ত কাব্য-সাধনা যেন প্রাংশুলভ্য ফলে বামনের উদ্বাহুতার মত নিছক একটা মূঢ়, অক্ষম উচ্চাকাঙ্ক্ষার পর্যায়ভুক্ত। অথচ লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে, স্থানে স্থানে তাঁহার রচনা উচ্চ কাব্যগুণের অধিকারী। প্রশান্ত-গম্ভীর রস সৃষ্টিতে তাঁহার নৈপুণ্য অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার কাব্যে দোষ-গুণের, শক্তি-দুর্বলতার এমন অস্বাভাবিক সমন্বয় কেমন করিয়া সম্ভব হইল? মনে হয় যে, ইহা কবিকে অযথার্থ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখারই ফল। এককালে হেমচন্দ্রকে মধুসূদনের সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠতর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উপস্থাপিত করার প্রয়াস করা হইয়াছিল। কালচক্রের আবর্তনে এই কৃত্রিম সম্মানের আরোপ ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়ার হেতু হইয়াছে। যাহাকে এক সময় আকাশে তোলা হইয়াছিল—কোন কোন সমালোচনায় হেমচন্দ্রকে নভোলোকের কবি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—আজ রুচির পরিবর্তনে তাহাকে রসাতলে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। আসল কথা এই যে, হেমচন্দ্র আকাশেরও কবি নহেন, পাতালেরও অধম কবিযশঃপ্রার্থী নহেন, তিনি মধ্যলোকের, এই স্থূল ও স্থির

পৃথিবীর কবি। তিনি রাজমুকুটের দাবীদার নন, কণ্টক-মুকুটও তাঁহার শিরোদেশে ঘটা করিয়া পরানোর প্রয়োজন নাই।

হেমচন্দ্র সম্বন্ধে এই কথাটাই সত্য যে, তিনি কোনদিন মহাকাব্য-রচনায় ব্রতী হন নাই, বা মহাকাব্যের আদর্শকে গ্রহণ করেন নাই। বৃত্র-সংহার মেঘনাদবধের মত এক অখণ্ড রসের অভিব্যক্তি, এক সুসংহত ভাব-কল্পনার বিকাশ, এক আগু-মধ্য-অন্ত-সংবলিত অনবদ্য গঠন-সুষমার নিদর্শন নহে। ইহার ঘটনা-বিন্যাসের অন্তরালে কোন নবানুভূত সাংকেতিক তাৎপর্য, কোন তীব্র, একমুখীন হৃদয়াবেগ গভীরতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে নাই। ইহার তথ্য-সমাবেশ কোন নবারুণদ্যুতির আভাসে ভাস্বর হইয়া উঠে নাই। ইহার ধনুকের ছিলা এত টান করিয়া বাঁধা হয় নাই যে, ইহার জ্যানির্ঘোষ-টঙ্কার শরক্ষেপের পূর্বেই গতিবেগ ও অভ্রান্ত লক্ষ্যের পূর্বঘোষণারূপে আমাদের অনুভূতিকে বিদ্ধ করে। বৃত্রসংহার মহাকাব্যের বাহ্যলক্ষণ-সমন্বিত পৌরাণিক কাহিনী-কাব্য—ইহার ঘটনাবলী শিথিল আকস্মিকতা-সূত্রে গ্রথিত। যাহা ঘটিয়াছে তাহারই একটু সমুন্নত কাব্যরূপ দিয়াই ইহা সন্তুষ্ট, কোন নূতন তাৎপর্য-আরোপ, কোন সার্বভৌম ব্যঞ্জনার আভাস ইহার উদ্দেশ্য-বহির্ভূত। ইহার অন্তর্নিহিত নীতিকথাটি অত্যন্ত পুরাতন—নারীর লাঞ্ছনায় দেবরোষ-উদ্দীপন ও দেবানুগ্রহ-প্রত্যাহার। দেবতার স্বর্গোদ্ধার ও অসুরের আধিপত্য-রক্ষা—এ উভয়ই একস্তরের জৈব কামনা হইতে উ্ভূত। যুধ্যমান উভয় পক্ষের মধ্যে বিশেষ কোন আদর্শ-তারতম্য বা পাঠকের সহানুভূতির কোন ইতর-বিশেষ নাই। মধুসূদনের ইন্দ্রজিতের মত হেমচন্দ্রের কোন favourite বা প্রিয়পাত্র নাই—ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে মধুসূদন যে অজস্র অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন (cost me many a tear), রুদ্রপীড়-নিধনে হেমচন্দ্রের অনুরূপ কোন শোকোচ্ছ্বাসের পরিচয় মিলে না। মধুসূদনের বলিষ্ঠ জীবনবাদ ও গভীর রহস্যময় নিয়তি-বিধান হেমচন্দ্রে দৈবের প্রতি দুর্বল নির্ভরশীলতা ও ভাগ্যের খামখেয়ালি পরিবর্তনে পর্যবসিত হইয়াছে। পুরাণ-কাহিনীর চরিত্র-সংশ্রবহীন, দৈবপ্রধান আকস্মিকতা, সাধারণ নীতিবাদের মৃদু-আকর্ষণ-নিয়ন্ত্রিত জীবন-ধারা আধুনিক কাব্যের রীতি-সমুন্নতি ও কল্পনা-প্রসারের ছদ্মগৌরবমণ্ডিত হইয়া যুগ-রুচির নিকট ইহার শঙ্কিত আবেদন জানাইয়াছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বৃত্র-সংহার-এর বিচার করিলে ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি আর ততটা ভয়াবহ বলিয়া মনে হইবে না। যাহা মনে হইতেছিল আদর্শ-চ্যুতির স্খলন, তাহা প্রকৃতপক্ষে নিম্নগামী অভিপ্রায়ের অনুবর্তন। বৃত্র-সংহারের কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে বৃত্রের চরম সৌভাগ্যের ক্ষণে, তাহার মেদস্ফীত আত্মতৃপ্তির স্থূলতম পরিণতির মুহূর্তে। পুরাণে ত স্বর্গরাজ্য উপভোগের ইন্দ্রালয়রূপেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং হেমচন্দ্রের স্বর্গ নিছক পৌরাণিক আদর্শেই পরিকল্পিত। রাবণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহার ভাগ্যবিপর্যয়ের ভূমিকম্পের মধ্যে, তাহার তপঃক্লিষ্ট, শোকানলদগ্ধ চরিত্র-মহিমার জ্যোতির্ময়তায়। লঙ্কার ঐশ্বর্য-দীপ্তির উপর আসন্ন সর্বনাশের পাণ্ডুর ছায়া পড়িয়াছে। তাহার মণিময় স্তম্ভের স্ফটিকপ্রভা যেন শোকাবহ পরিণতির পূর্বাভাসে ম্লান হইয়া আমাদের সম্মুখে বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে দাঁড়াইয়া আছে, রাবণের রাজসভার মণিমুক্তা-খচিত শিল্পসৌন্দর্য যেন মৃতের সমাধি-মন্দিরের ছদ্মাবরণ মাত্র। রাবণের প্রতিটি উক্তি ও অঙ্গভঙ্গী, প্রত্যেক আচরণ যেন অন্তরাত্মার অবারিত আলোকচ্ছটায় ভাস্বর। পক্ষান্তরে বৃত্রের স্বর্গ স্থূল বস্তুপুঞ্জে, ভোগবিলাসের উপকরণ-প্রাচুর্যে ভারাক্রান্ত, আত্মতৃপ্তি ও দম্ভের নিঃশ্বাসবায়ুতে আবিল। সুতরাং বৃত্র ও রাবণ, তাহাদের অবস্থা-সাম্য সত্ত্বেও, একজাতীয় নহে। রাবণের আত্মিক জ্যোতির ক্ষীণতম স্পর্শও বৃত্রে দৃষ্ট হয় না।

তারপর পতনের কারণও উভয়ের বিভিন্ন। রাবণের পাপের বীজ দীর্ঘ অপেক্ষার পর অঙ্কুরিত ও শাখা-পল্লবে প্রসারিত হইয়াছে। বীরবাহুর মৃত্যু ইহার ফল-পরিণতির প্রথম নিদর্শন, ইন্দ্রজিতের পতনে ইহার তিক্ত রস পরিপূর্ণভাবে প্রকট। ইহার পর রাবণের মৃত্যু যেন anti-climax বা চরম পরিণতি হইতে অবরোহণ বলিয়াই মনে হয়—এ যেন শাখাপত্রবর্জিত শুষ্ক কাণ্ডের অগ্নিদাহের জন্য উদাস প্রতীক্ষা। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতেই কবি যেন কাব্যের সমস্ত সম্ভাবনা, নিয়তি-নির্যাতনের সমস্ত দুর্জ্ঞেয় দুর্বিষহতা নিঃশেষ করিয়া দিয়াছেন—রাবণের জীবন্মৃত্যু, তাহার অন্তর-প্রজ্বলিত শোকানল যেন তাহার মৃত্যু অপেক্ষা আরও মর্মন্তুদ। রাবণের শেষ দৃশ্য আমরা কবির সাহায্য ব্যতিরেকে কল্পনাতেই প্রত্যক্ষ করি—তিনি আমাদের কানে যে সুর ঢালিয়াছেন তাহার দীর্ঘায়িত অনুরণনের মধ্যেই রাবণের দৈবাহত জীবনের

পরিসমাপ্তি প্রচ্ছন্নভাবে বাজিতে থাকে। 'মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে' —লক্ষ্মণের এই নিয়তি-রহস্যদ্যোতক উক্তিটি যেন মহাকাব্যের সমস্ত বায়ুমণ্ডলে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়।

বৃত্রের পাপ ও শাস্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। প্রথমতঃ, তাহার শাস্তি তাহার পাপের হাতে হাতে, অব্যবহিত পরে আসিয়াছে। সুতরাং পাপ ও শাস্তির মধ্যে সুদীর্ঘ ব্যবধানে নিয়তির অলক্ষ্য, গোপনচারী ক্রিয়া যে ঘন রহস্যবোধের, যে সংশয় কণ্টকিত অনিশ্চয়ের উদ্রেক করে এখানে তাহার একান্ত অভাব। বৃত্রের শাস্তি যেন অঙ্কের যোগফলের মত সুনির্দিষ্ট, এখানে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কোন অনুমেয় শক্তির রহস্যলীলা, কোন বহুগুণিত প্রতিক্রিয়ার দুর্বোধ্যতা অনুভব করা যায় না। এখানে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ হইতে সর্বধ্বংসী বহ্নিবিস্তারের আভাস মিলে না। এ শাস্তি বৃত্রের মৃত্যুর সহিত পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে, কেবল ঐন্দ্রিলাকে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত দিগ্‌বিদিকে ঘুরাইয়াছে। রাবণ-মন্দোদরী-চিত্রাঙ্গদা বা ইন্দ্রজিত-প্রমীলার সুখে-দুঃখে, জীবনে-মরণে সুনিবিড়, অচ্ছেদ্য ঐক্যের পরিবর্তে আমরা পাই ঐন্দ্রিলার পরিবারের বাঁধন-কাটা স্বাতন্ত্র্য। ঐন্দ্রিলা স্পর্ধায় ও আত্মগৌরব-লোলুপতায় যেমন পারিবারিক সামঞ্জস্যকে খণ্ডিত করিয়াছিল, তেমনি পরিণামেও সে নিঃসঙ্গ বেদনার উন্মাদ ঘূর্ণীবাত্যায় আবর্তিত হইয়াছে।

বৃত্রের অপরাধের স্থূলতাটিও স্বপ্রকাশ। রাবণের সীতাহরণ ও বৃত্রের শচীহরণ নারী-নির্যাতনের দিক দিয়া এক, কিন্তু উদ্দেশ্য-প্রেরণার দিক দিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শচীহরণের উদ্দেশ্য নিছক ঈর্ষ্যা ও আধিপত্যগর্ব ; সীতাহরণ হয় রাজনৈতিক প্রতিশোধ না হয় রূপমোহের পর্যায়ভুক্ত। পৌরাণিকযুগে নারীহরণ রাজধর্ম-বিরোধী ছিল না—বসুন্ধরা ও রূপসী নারী উভয়েই বীরের ভোগ্যা ছিল। রাক্ষসসমাজপ্রচলিত নীতিবোধ রাবণের এই অপকর্মকে ক্ষাত্রশৌর্যের একটু অসাধারণ, উদ্ভট বিকাশরূপেই দেখিয়াছিল। হেলেন-অপহরণে ট্রয়বাসীর মাথা স্কন্ধচ্যুত হইয়াছিল, কিন্তু হেঁট হয় নাই। কিন্তু স্ত্রীর একটা খেয়াল পূর্ণ করিবার জন্য নিঃসহায়া নারীর বিরুদ্ধে অভিযান দৈত্যকুলের মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করে নাই। বৃত্রের শচীহরণ নিছক স্ত্রৈণতা হইতে উদ্ভূত, ইহার মধ্যে শক্তিমত্তার কোন পরিচয় নাই। কাজেই উভয় ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া যে ভাব-পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছে, কবি-

কল্পনার যে গতিপথ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্। মেঘনাদবধের ভাবগভীরতা ও কবি-কল্পনা ও পাঠক চিত্তের প্রগাঢ় আলোড়ন আমরা বৃত্র-সংহারে আশা করিতে পারি না।

(৫)

হেমচন্দ্র মহাকাব্য রচনা করিতে চাহেন নাই, কাজেই মহাকাব্যের উপযোগী এক অখণ্ড ভাবমণ্ডল রচনা করাও তাঁহার পরিকল্পনায় ছিল না। ইহা অক্ষমতা-প্রসূত হইতে পারে, কিন্তু যেখানে কবির বিষয়-নির্বাচনে স্বাধীনতা আছে, সেখানে অক্ষমতার উপরই বেশী জোর দেওয়া সমীচীন নহে। তিনি আখ্যায়িকা-কাব্যে প্রথা-অনুযায়ী নানা ছন্দোবৈচিত্র্যের মাধ্যমে নূতন নূতন রস উদ্বোধন করিয়াছেন। কোথাও গীতি-কবিতার উচ্ছ্বাস, কোথাও বিবৃতির নিরুত্তাপ, সমতলীয় তথ্যনিষ্ঠা, কোথাও দার্শনিক তত্ত্ববিচার, কোথাও বা উদাত্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাব ও পরিবেশ-রচনা -লেখক নির্বিচারে এই প্রতিটি ধারারই অনুসরণ করিয়াছেন। সব মিলিয়া একটা ঐকতান বাদ্যের সৃষ্টি হইবে ইহাই ছিল তাহার আশা ও ধারণা। এই যোজনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে যদি কোন অসঙ্গতি থাকে কবি নিশ্চয়ই তাহার জন্য নিন্দনীয়। কিন্তু ইহা মহাকাব্যের আদর্শানুযায়ী নহে বলিয়া তিনি অভিযুক্ত হইতে পারেন না। হেমচন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনা পরিবেশ-গাম্ভীর্য-সৃষ্টির জন্য নহে, যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত ও রণকৌশলের আনন্দ-উত্তেজনা-অনুভবের জন্য। রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনা কোন ভয়াবহ সঙ্কেত বহন করে না, বা কোন ভাব-সমুন্নতির উদ্বোধক নহে—নিছক মারামারি-কাটাকাটির আনন্দ দেয়। হেমচন্দ্র আর একটু উন্নত প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি যুদ্ধের সাধারণ উত্তেজনাকে উপমাপ্রয়োগে, আবেগ-সঞ্চারে ও ছন্দদ্রুতির সাহায্যে একটু অসাধারণ কাব্যিক পর্যায়ে উন্নীত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মধুসূদনের যুদ্ধ কাব্য-গৌরব-সৃষ্টির উপায় মাত্র; ইহার ছন্দের ভেরীনিনাদ ও শব্দের শঙ্খধ্বনি আমাদের কল্পনাকে স্ফীত করিয়া মহাকাব্যের আবহ রচনা করে। হেমচন্দ্রের যুদ্ধ ঘটনাবহুল ও ঘাত-প্রতিঘাত-সঙ্কুল—ইহা কোন বিশেষ ভাবের পরিপোষক নহে। কাব্যে উভয় প্রকার যুদ্ধবর্ণনারই স্থান আছে।

মধুসূদনের দেব-চরিত্র-চিত্রণের সঙ্গে হেমচন্দ্রের অনুরূপ প্রচেষ্টার রুচি ও কাব্যগত প্রভেদ আছে। মধুসূদনের দেব-দেবী মানবিক প্রাণসত্তায় পূর্ণ, জীবনের বিদ্যুৎ-প্রবাহ তাহাদের শিরা-ধমনীতে দ্রুত সঞ্চারশীল। দেবোচিত চরিত্র মহিমা ও উন্নত ভাবাদর্শ তাহাদের মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় নহে। তাহাদের বর্ণোজ্জ্বলতা ও চিত্রসৌন্দর্যই আমাদিগকে প্রধানভাবে আকৃষ্ট করে। তাহাদের চারিদিকে যে একটা ক্ষীণ ভক্তিরসের পরিমণ্ডল রচনার চেষ্টা হইয়াছে তাহা মুখ্যত তাহাদের শক্তিমত্তার স্বীকৃতি, তাহাদের ভাব-গরিমার প্রতি প্রণতিজ্ঞাপন নহে। এখানে মধুসূদন প্রধানত হোমারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন; প্রাচীনতর বৈদিক দেবতার সহিত আদি মানবের যে ভক্তি-ও-হৃদ্যতা-প্রীতিমিশ্রিত সম্পর্ক ছিল এখানে যেন তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখি। মধুসূদনের হিন্দুধর্মতত্ত্বের দার্শনিক দিকটা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ছিল না—তাঁহার প্রেতলোকের বর্ণনা কেবল চিত্রসমষ্টি ও মানবিক রসের উৎসার। তাঁহার নরক ও পিতৃলোক যথাক্রমে বীভৎস ও শান্তরসের দ্যোতক। তিনি হিন্দুর অধ্যাত্মতত্ত্বকে কবির দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, দার্শনিক তাৎপর্যবোধের দিক দিয়া নহে। হেমচন্দ্রের মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বই প্রধান; তিনি ব্রহ্মলোক, শিবলোক, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে বাহিরের দিক হইতে ভিতরের দিকটাই বড় হইয়াছে। পৌরাণিক বাহ্যরূপের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্মতর অধ্যাত্ম তাৎপর্য বিদ্যমান তাহাকেই তিনি আধুনিক কল্পনা ও বৈজ্ঞানিক ও প্রজ্ঞামূলক মতবাদের সমর্থনে কাব্যরূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীমান্ তারাপদ ইহাকে নীরস বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে। হয়ত মধুসূদনের বর্ণোজ্জ্বলতার সহিত তুলনায় হেমচন্দ্রের পরলোকের চিত্র তত্ত্বধূলি-সমাচ্ছন্ন ও নিষ্প্রভ। কিন্তু বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ, নিরবয়ব ভাবময়তার কথা চিন্তা করিলে ইহাতে হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প নহে। ভাষার যে পরিমাণ গাম্ভীর্য ও ব্যঞ্জনাশক্তি থাকিলে দার্শনিক বিষয়কে কাব্যে রূপ দেওয়া যায়, তাহা হেমচন্দ্রের ছিল। ইহার সহিত উদাত্ত-ভাবব্যঞ্জক ছন্দধ্বনির উপর তাঁহার সমান অধিকার থাকিলে তিনি অবিমিশ্র প্রশংসাভাজন হইতে পারিতেন। সমালোচক যে সমস্ত গুণের জন্য কবির বিশ্বকর্মার অস্ত্রশালা-বর্ণনার প্রশংসা করিয়াছেন সেই সমস্ত গুণই তাঁহার অধ্যাত্মতত্ত্ব-উপস্থাপনের মধ্যেও পাওয়া যায়। আর এই উপস্থাপনা দীর্ঘ হইলেও

ইহা তাঁহার দেবলোকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের একটা প্রধান উপায়। সুতরাং ইহার নীরসতা আপেক্ষিকভাবে সত্য ও ইহার ক্লান্তিকরতা পাঠকের তত্ত্বগ্রাহী রুচির উপর নির্ভর করে। মোটামুটি এটুকু বলা যাইতে পারে যে, কোন অলৌকিক ও জাতির ধর্মসংস্কৃতিমূলক আখ্যায়িকা পাঠ করিতে হইলে কিছু পরিমাণ গুরুপাক দার্শনিক তত্ত্ব হজম করিতে হইবে—শুধু অঞ্জলি ভরিয়া বিশুদ্ধ কাব্যরসপান হয়ত এই জাতীয় কাব্য-আস্বাদনের মধ্যে সম্ভব হইবে না।

মহাকাব্যের পরিবেশে ইন্দুবালার অনুপযোগিতা বহুদিন হইতেই স্বীকৃত ও নিন্দিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বৃত্রসংহার ঠিক মহাকাব্য নহে, মহাকাব্যের গার্হস্থ্য সংস্করণ। এখানে যেমন ঐন্দ্রিলার দম্ভ ও আত্মপ্রাধান্য-বিস্তার ও বৃত্রের ব্যক্তিত্বহীন স্ত্রৈণতা, সেইরূপই ইন্দুবালার কুসুমপেলব কমনীয়তা। হেমচন্দ্র ইন্দুবালা-চরিত্র কল্পনার সময় গার্হস্থ্য চিত্রেই নিজ দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, মহাকাব্যের বৃহত্তর পটভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। ইন্দুবালা ঐন্দ্রিলার বিপরীত, মহাকাব্যে উভয়েই প্রায় সমভাবে বেমানান। একের পরুষতার আধিক্য অপরের কোমলতার আতিশয্য দ্বারা সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইন্দুবালাকে বিচার করিতে হইবে তাহার বর্ণনায় কাব্যকলার সুকুমারত্ব ও চরিত্র-চিত্রণে অন্তঃসঙ্গতির মানদণ্ডে। এমন কি এই পরিবার-চরিত্রের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ছবি—রুদ্রপীড়ও ঠিক বীর নহে, প্রমাদমুক্ত সাধারণ সুস্থ মানবের প্রতিনিধি। ইন্দ্রজিতের ক্ষেত্রে যে যশোলিপ্সা সার্থকভাবে জীবনের অঙ্গীভূত ও খানিকটা আত্মশ্লাঘাপুষ্ট হইয়া উচ্চকণ্ঠে বিঘোষিত, রুদ্রপীড়ের ক্ষেত্রে তাহা উৎসুক-কুণ্ঠিত অনুসরণের বিষয়। যে খ্যাতিরশ্মি ইন্দ্রজিতের কিরীটে স্থির-ভাস্বর তাহা রুদ্রপীড়ের অনায়ত্ত, অথচ একান্তভাবে কাম্য তরুণ স্বপ্নের চঞ্চল বিদ্যুৎ-দীপ্তি। এই তরুণসুলভ আগ্রহ ও দুষ্প্রাপ্য গৌরবের প্রতি উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল কর-প্রসারণই তাহার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। বৃত্রের চরিত্রেও এই অকারণ যুদ্ধপ্রীতি ও নিষ্ক্রিয়তার জন্য ক্ষোভ একটা সূক্ষ্ম, অনির্দেশ্য অতৃপ্তির হেতু হইয়াছে।

শ্রীমান্ তারাপদর মতে বৃত্রসংহার হেমচন্দ্রের কাব্যসাধনার ক্রমবিবর্তনে একটি ব্যতিক্রম। এই মতবাদ শুধু উল্লেখ করিলে চলিবে না, ইহাকে আলোচনা-সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। হেমচন্দ্রের রোমান্টিক আখ্যান-

কাব্যের দিকে গোড়া হইতেই প্রবণতা ছিল। তাঁহার 'চিন্তা-তরঙ্গিনী' ও 'বীরবাহু কাব্য', নানা উপাদানে গঠিত হইলেও, মোটের উপর আখ্যান-প্রধান। ইহার পর 'আশা-কানন' ও 'ছায়াময়ী'তে তিনি রূপক ও পরলোকতত্ত্বাশ্রয়ী কাব্যরচনায় ব্রতী হন। ইতিমধ্যে মধুসূদনের প্রভাব ও উভয়বিধ কাব্যরীতির সংমিশ্রণের ফলেই 'বৃত্রসংহার'-এর উদ্ভব। সুতরাং ইহা যে হেমচন্দ্রের কাব্যজীবনে একটা আকস্মিক প্রক্ষেপ এই মত বোধ হয় তথ্যসমর্থিত নহে। আমার মনে হয় শ্রীমান্ তারাপদ হেমচন্দ্রের গীতি-কবিতাকেই তাঁহার প্রতিভার সর্বোৎকৃষ্ট স্বাভাবিক বিকাশরূপে গ্রহণ করিয়াছে ও ইহার জন্য প্রস্তুতিই তাঁহার কাব্যজীবনের প্রধান ধারা এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছে। কিন্তু হেমচন্দ্রের যে ভাবদুর্বলতা ও শক্তির অসমতা 'বৃত্রসংহার'-এ ক্ষমার্হ তাহা তাঁহার কবিতাবলীতে আরও তীব্রতর সমালোচনার যোগ্য। বৃহৎ আখ্যান-কাব্যে খুঁত থাকিতে পারে, কিন্তু গীতিকবিতার স্বল্পপরিসর ও পরিপাটি বিন্যাসের মধ্যে কোনও খুঁত আরও পীড়াদায়ক। তবে হয়ত দশমহাবিদ্যাকে তাঁহার কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যাইতে পারে। এখানে মহাকাব্যের সংযমহীন, পৌরাণিক কল্পনা ও ধর্মতত্ত্ববিলাস কবির স্বাভাবিক প্রবণতার সহিত আরও সহজ-সম্পর্কান্বিত হইয়াছে।

(৬)

ভূমিকা দীর্ঘতর করিয়া লাভ নাই। নবীনচন্দ্র সম্বন্ধেও হেমচন্দ্রের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের উপর প্রায় পঞ্চাশ-পৃষ্ঠা-ব্যাপী সমালোচনায় মাত্র একটি ছোট অনুচ্ছেদে তাহার সম্বন্ধে কিছু প্রশংসাসূচক কথা বলা হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের বিরাট পরিকল্পনার গঠনগত ত্রুটি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার যাথার্থ্য ও সূক্ষ্মদর্শিতা মানিয়া লইলেও ইহাতে যে পরিমিতিজ্ঞানের অভাব দৃষ্ট হয় তাহা নিঃসন্দেহ। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা ঠিক প্রথম শ্রেণীর না হইলেও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উচ্চ আসন তাঁহাদের অবিসংবাদিত। ইহাদের তুল্য কবিসম্বন্ধে যদি বিরূপ সমালোচনার একাধিপত্য ঘটে, তবে বাংলা কাব্যের সমালোচনা ত্রুটিনির্দেশেরই এক

বিরাট অধ্যায়ে পর্যবসিত হইবে। দুই চারিটি ব্যতিক্রম ছাড়া সকলের ভাগ্যে নিন্দাই জুটিবে। ইহা যেমন কবিদের পক্ষে অসম্মানজনক, তেমনি সমালোচকের পক্ষেও নেতিবাচক মনোবৃত্তিরই পরিপোষক হইবে ও সৌন্দর্য-অনুভূতি অপেক্ষা ছিদ্রান্বেষণের দিকেই তাহাদিগকে প্রণোদিত করিবে।

আর একটা বিষয়ও এই প্রসঙ্গে চিন্তনীয়। পরিকল্পনার ত্রুটি ও গঠন-পারিপাট্যের অভাব আখ্যান-কাব্যের অপকর্ষের হেতু তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু ইহাই কি কাব্যবিচারে একমাত্র নিয়ামক নীতি? নাটকের নিবিড় ঐক্য ও ঘটনাবিন্যাস-কুশলতার আদর্শ আখ্যানকাব্য ও উপন্যাসে ঠিক প্রযোজ্য নহে। ইংরেজী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কবিসমূহ প্রায় কেহই এইজাতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থের The Prelude ও Excursion শেলীর Revolt of Islam, কীটসের Endymion, টেনিসনের Idylls of the King, ব্রাউনিং-এর The Ring and the Book—এই সবগুলি দীর্ঘ কাব্যেই গঠন-সুষমার পরিপূর্ণ মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। কল্পনার অজস্রতা, সৌন্দর্যের প্লাবন, মননশক্তির উৎকর্ষ, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নিবিড়তা পরিকল্পনার সুস্পষ্ট ক্রমানুবর্তনকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। সমালোচক ইহাদের আঙ্গিক শিথিলতার কথা দুই-একটি মন্তব্যেই শেষ করিয়া ইহাদের সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আবেদনের স্বরূপটির উপরেই তাঁহার দৃষ্টিকে ন্যস্ত করেন। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র সম্বন্ধেও আমাদের অনুরূপ পদ্ধতি-অবলম্বনই বিধেয়। আখ্যান কাব্যের আদর্শ হইতে তাঁহারা যে বিচ্যুত হইয়াছেন, মধুসূদনের উন্নত মান যে তাঁহাদের অনায়ত্ত রহিয়াছে ইহা এতই স্বপ্রকাশ যে, ইহার সুবিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় তাঁহাদের উৎকর্ষ, বাংলা কাব্যে কি তাঁহাদের স্থায়ী অবদান, কাব্যধারায় গতিবেগ সঞ্চার করিয়া, ক্রম-উপচীয়মান শক্তির পরিচয় দিয়া ইহার অগ্রগমনকে ইঁহারা কিরূপে ত্বরান্বিত করিয়াছেন, অনুভূতি-রাজ্যের কোন্ নূতন নূতন খণ্ডাংশের উপর ইঁহারা কাব্যের জয়-পতাকা উড়াইয়াছেন—এই সমস্ত বিষয়ই ইঁহাদের সম্বন্ধে প্রধানতঃ আলোচ্য। বৃত্রসংহারের কোন্ কোন্ অংশে ভাব-সমুন্নতি, দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় অর্থগাঢ় ভাষাপ্রয়োগ, গীতিঝঙ্কারের ভিতর দিয়া যুদ্ধের উত্তেজনা, প্রেমের মাদকতা ও চরিত্রের সুকুমার চারুতার প্রকাশ, বিশ্বকর্মার অস্ত্রশালা ও বজ্র-নির্মাণবর্ণনায় পিণ্ডীকৃত জড় উপাদানকে দ্রবীভূত করিবার মত কল্পনার উত্তাপ

উদাহৃত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা ও তাহার কাব্যমূল্য-নির্ধারণ সমালোচকের প্রধান কর্তব্য। নবীনচন্দ্রের ভাষার অসংযম ও মাঝে মধ্যে অপপ্রয়োগ সত্ত্বেও যেখানে যেখানে বর্ণনার শান্ত মহিমা, প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় আবেদনের সূক্ষ্ম উপলব্ধি, গীতি-উচ্ছ্বাসের দ্বারা মানবিক আবেগের দুর্দমনীয় গতিবেগের ব্যঞ্জনা, দুরূহ অধ্যাত্মতত্ত্বের কাব্যময়, সাবলীল প্রকাশ, আত্ম-উদঘাটনের (self-revelation) অদম্য প্রেরণা প্রভৃতি উৎকর্ষ-লক্ষণ পরিস্ফুট, সেগুলির যথাযোগ্য বিচার ও রসাস্বাদন সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আলোচনার ধারা উপরি-উক্ত প্রণালীতে প্রবাহিত হইলে কবির কাব্যোৎকর্ষ ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য উভয়ই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তথাপি এই নবীন সমালোচক যেরূপ গুরু দায়িত্ববোধ ও গভীর অনুপ্রবেশশীলতা লইয়া তাঁহার কার্যে ব্রতী হইয়াছেন ও ইহার মধ্যে নিজ অনুভব ও প্রকাশ-শক্তির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা সর্বথা প্রশংসনীয় ও প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। সমালোচনা-ক্ষেত্রে গতানুগতিকতা ও বাঁধাধরা মতবাদের প্রভাবমুক্ত হওয়া ও বিচারের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদ ও নির্ভীক আত্মনির্ভরশীলতার সমর্থন উপস্থাপিত করা যথেষ্ট কৃতিত্বের নিদর্শন এবং এই গুণের প্রাচুর্যের জন্য আমি গ্রন্থখানিকে ও গ্রন্থকারকে আমার সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। তরুণের সাধনা যেমন অন্য অন্য ক্ষেত্রে, সেইরূপ সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও, নবাবিষ্কারের গৌরবমণ্ডিত হউক ইহাই একান্তভাবে কামনা করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সমাজ-চেতনা

(১)

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব-তিথির প্রকৃত সার্থকতা হইতেছে কবি সম্বন্ধে আমাদের বিহ্বল, আতিশয্য-বিড়ম্বিত মনোভাবকে আত্মসমীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সহায়তা করা। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর সহিত কবির যোগসূত্র কি, অতীতের কোন্ ঐতিহ্য আমাদের জন্য প্রাণরস-বাহী, বর্তমানের জটিল

সূত্রজালের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি আমাদের মর্মমূল-সংযুক্ত ও ভবিষ্যতের কোন্ অস্পষ্ট ইঙ্গিত আমাদের নূতন জীবনাদর্শের পূর্বাভাস, এই সম্বন্ধে তাঁহা কাব্য হইতে আমরা কিরূপ নির্দেশ পাই, ইহাই তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ও অনুভবের বিষয়। আমরা যে কবিকে মহাকবি সংজ্ঞা দিই তাহা কেবলমাত্র তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠতা ও উৎকর্ষ দেখিয়াই নহে—তিনি আমাদের মধ্যে কতটা অখণ্ড ও সুসমঞ্জস জীবনবোধ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তাহার উপরেই তাঁহার এই গৌরবময় অভিধান নির্ভরশীল। আমাদের দেশে বরাবরই কাব্য ও জীবন-সাধনা পাশাপাশি পথের পথিক। কাব্যে যে আদর্শ রূপ লাভ করে, জীবনে তাহাকেই অনুশীলন করার একটা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলে। রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী সর্বত্রই কবির কাব্য ও জনসাধারণের জীবন-চেতনা ঘনিষ্ঠভাবে সংপৃক্ত ও পরস্পরাপেক্ষী। রামায়ণ-মহাভারতের জীবনাদর্শ ব্যাপকভাবে আমাদের সমাজ ও পরিবার-জীবনে অনুসৃত হইয়াছে; বৈষ্ণব কবিতার মধুর রস ও শাক্ত কবিতার মাতৃশক্তির নিকট একান্ত-নির্ভর আত্মসমর্পণ সাধক গৃহস্থের সাধনাক্রমের মধ্যে কাব্যনিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ অনুভূতি-রূপে স্ফুরিত হইয়াছে। কাজেই আমাদের কাব্য সম্পূর্ণ কল্পনা-জগতের বিষয় ছিল না; ইহার অলৌকিকত্ব ও অনির্বচনীয়তা জীবনের অভিজ্ঞতা-সমর্থিত। ইহার ফলে কাব্য যেমন একদিকে জীবনরসে পুষ্ট, অন্যদিকে ইহা তেমনি জীবন-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও মর্যাদায়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাব্য কোনদিনই জীবনকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া নিঃসঙ্গ যাত্রার অভিযানে উধাও হয় নাই। আমাদের আকাশ ও পৃথিবী, দেব ও মানব, ভগবান ও ভক্ত এত নিকট প্রতিবেশী ছিল যে, কবিকল্পনা কখনই বাস্তবের মাধ্যাকর্ষণের ঊর্ধ্বে নিছক নভোবিহারেই আপনাকে নিয়োজিত ও নিঃশেষিত করে নাই।

রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে এই সাধারণ নিয়ম ও চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম দেখা যায়। রবীন্দ্র-জীবনদর্শনকে জীবনসাধনার অঙ্গীভূত করিয়া লইবার কোন ব্যাপক উদ্যম বাঙালী সমাজে দেখা যায় নাই। আধুনিক যুগে কবির প্রতি আমাদের সাধারণ মনোভাবেরই একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আমরা মুখে যাহাই বলি না কেন, যতই ভক্তিবিহ্বল ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত রবীন্দ্রনাথকে কবিগুরু আখ্যা দিই না কেন, কার্যতঃ কবিকে আমাদের জীবন-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে রাজি নই। কবি এখন আর সৃষ্টি-সহকারী প্রজাপতি

নহেন, কাব্যাস্বাদ আর ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর-ধর্মী নহে। কাব্য আমাদের জীবন-বেদ নয়, অবসর-বিনোদনের উপায়, বড় জোর মনে সৌন্দর্যবোধ-উন্মেষের, ছন্দ ও সুরের আবেশ-সৃষ্টির রঙ্গীন পানপাত্র। কবির তত্ত্বানুভূতিকে আমরা দূরে রাখিয়া কেবল তাহায় প্রকাশ-সুষমার ফাঁদে ধরা দিই।

অবশ্য এই পরিবর্তন যে পাঠকের স্বেচ্ছাকৃত শিথিলতা তাহা ঠিক নয়, সমাজ-চেতনার রূপান্তরের অনেকটা অনিবার্য ফল। মধ্যযুগীয় কাব্যের সমাজ-প্রভাবের একটা বড় কারণ ছিল ইহার সমাজ-প্রচলিত ধর্মবোধের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, কাব্য-সৌন্দর্যের মধ্যে সর্ব-স্বীকৃত ধর্মচেতনা ও জীবনাদর্শের মনোজ্ঞ ও চিত্তদ্রাবী প্রতিবিম্বন। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা কাব্যরসকে ধর্মমাহাত্ম্য-প্রতিষ্ঠা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন না—কাব্যের মধুকে ভবরোগের ধর্মৌষধির অনুপানরূপে আস্বাদনেই তাঁহাদের বিশেষ রুচি ছিল। ভক্তিরসের স্বত-উৎসার কাব্যমাধুর্যের সঙ্গে মিশিয়া এমন একপ্রকার স্বাদুতার সৃষ্টি করিত যাহা পণ্ডিত-মূর্খ-নির্বিশেষে সকলেরই পরম তৃপ্তিবিধান করিত। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এ হরিকথার সরসতা ও বিলাসকলাকৌতূহলের যে যুগ্ম আকর্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা প্রাক্-আধুনিক যুগের পাঠকের রুচিবৈশিষ্ট্যেরই সঠিক পরিচয় দেয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও কৃষ্ণ-চরিতকে শুকমুখ-উদ্গীরিত সুমিষ্ট রসাল ফলের সহিত তুলনা করার মধ্যেও সেই একই মানস প্রবণতার স্বাক্ষর মিলে। দেবচরিত্রের অলৌকিক মহিমা-আস্বাদনে নিবিষ্ট-চিত্ত, ধর্মপ্রাণ, ভক্তিরসবিভোর জাতির অনুভূতিতে কোথায় যে কাব্য-মাধুর্যের পদ্মদীঘি অসীম তত্ত্বের মহাসমুদ্রের সহিত মিশিয়া গিয়াছে সেই সীমারেখা সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট সচেতনতা ছিল না।

এখন কবিচিত্তের সহিত রসিকচিত্তের এই একান্ত নিবিড় সাধর্ম্য নাই, কবি আর আমাদের সমগ্র মানস-চেতনাকে আবিষ্ট করিতে পারেন না। তিনি আমাদের মনের যে খণ্ডাংশের উপর তাঁহার যাদুদণ্ড স্পর্শ করান, তাহা আমাদের সামগ্রিক জীবনবোধের একটা ক্ষুদ্র ও হয়ত গৌণ বিভাগ। এখন আমরা আমাদের জীবনের ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যকে নিছক ধর্মানুভূতির একেশ্বরতার অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রস্তুত নই—ধর্মের ছাতাতে আমাদের গোটা মাথা ঢাকে না। তার উপর আমাদের নানা বিরুদ্ধ উপাদানে গঠিত, নানা নূতন নূতন প্রশ্নে মথিত, নানা ক্ষণিক ভাব-ভাবনার দমকা হাওয়ায় দোলায়মান

মনটিও এখন কেন্দ্রভ্রষ্ট ও আত্মসম্বিৎহারা—কবির বাঁশিতে উহার ফণার অধীর আন্দোলন আর মন্ত্রশান্ত হয় না। অতীত যুগের ধর্মবিশ্বাস, জীবনের পরম সার্থকতা বিষয়ে ঐকমত্য আর আমাদের প্রত্যেকের মনকে একলক্ষ্যাভিমুখী করে না। তাই কবিকে আমরা গ্রহণ করি সমস্ত মন দিয়া নহে, আমাদের সমস্ত জীবনটা তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিতে আমাদের মনের ভিতর হইতেই একটা বাধা আসে।

(২)

রবীন্দ্র-কাব্যের সম্যক উপলব্ধির পক্ষে দ্বিতীয় বাধা উহার অফুরন্ত বৈচিত্র্য, অপরিমেয় প্রসার ও দুরূহ সমন্বয়-সাধনা। আমাদের কাব্যধারার পূর্বতন ঐতিহ্য গৌরবময় সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার মধ্যে বৈচিত্র্যের বিশেষ নিদর্শন নাই; আর প্রসার যাহা আছে তাহা যতটা পরিমাণগত, ততটা বিষয়গত নহে। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে মধুসূদনের কবিতায় মৌলিকতা অনস্বীকার্য, কিন্তু বৈচিত্র্য সুর অপেক্ষা রূপকল্পেই বেশী। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রে বিষয়-বৈচিত্র্য থাকিলেও রচনারীতির অভিন্নতা এই বৈচিত্র্য-সম্ভাবনাকে অনেকখানি ব্যাহত করিয়াছে। তারপর জীবন-চেতনার যেরূপ বিচিত্রতা ও ব্যাপ্তি থাকিলে রবীন্দ্রকাব্য-প্রেরণার মর্মমূলে প্রবেশের অধিকার জন্মে সংকীর্ণ বাঙালী জীবনে তাহার অবসর অতি বিরল. সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাই আমাদের জীবন-অভিজ্ঞতার সমর্থন-বঞ্চিত বলিয়া আমাদের মনে গভীর জীবন-প্রত্যয় অপেক্ষা আবেশময় ভাবমুগ্ধতারই সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতায় যে সুদূরাভিসার-ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়, যে দেহাতিক্রমণের দুঃসাহস ও তীক্ষ্ণ জীবন-জিজ্ঞাসার আর্তি ফুটিয়া উঠে তাহা আমাদের জীবনযাত্রার সহজ ছন্দের মধ্যে কতটুকু ধরা দেয়? প্রেম ইন্দ্রিয়াতীত ও বাস্তবাতিশায়ী হইলেও উহার মূলে সমাজ-চেতনার কিছুটা স্পর্শ থাকা চাই। বাস্তবের সহিত দুরতিক্রম্য ব্যবধান থাকিলে কাব্যিক প্রেম যেমন জীবনরস-পুষ্ট হয় না, তেমনি জীবনে প্রেমের বিকাশকেও অনুরঞ্জিত করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতার রসনির্ঝরে আপাদমস্তক অভিষিক্ত হইয়াও আমাদের সমাজ ও ব্যক্তি-মনে প্রেমের সাধনা যে উচ্চতর ভাবপর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে এরূপ দাবী কি আমরা সত্যই করিতে পারি?

রবীন্দ্রনাথের কবি-আত্মার ঘনিষ্ঠ নিকটবর্তিতার পথে পাঠকের প্রধান অন্তরায় তাঁহার সমন্বয়-সাধনার দুরূহতা। দেশ ও কালে পরিব্যাপ্ত নানা বিচিত্র ভাবানুভূতির মধ্যে স্বচ্ছন্দ লীলা-বিহার ও অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে কবি-চেতনার মধ্যে অঙ্গীকরণের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোন কবির তুলনা হয় না। এত বিরাট পরিধির মধ্যে আর কোন কবির কল্পনার পক্ষবিস্তার হইয়াছে কি না সন্দেহ। আর শুধু ব্যাপ্তির দিক দিয়া নয়, প্রতিটি যুগসংস্কৃতির মর্মানুপ্রবেশেও তাঁহার সমকক্ষ মেলা কঠিন। বৈদিক উষার প্রথম প্রকৃতিবোধ ও দেব-কল্পনা, উপনিষদের চরাচরব্যাপ্ত পারমাত্মিক চেতনা, পুরাণ, মহাকাব্য ও বৌদ্ধসংস্কৃতির ঘটনাবলীর মধ্যে আধুনিক জীবন-বোধের আবিষ্কার, ইতিহাস-দ্বন্দ্বের মধ্যে মানবাত্মার পরম প্রকাশ, মোগল যুগের ঐশ্বর্যবিলাস ও প্রেমাদর্শের স্বপ্নসুষমা হইতে অতি-আধুনিক যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির বিপর্যয়ের পাথায় ভর করিয়া যে সমস্ত সমস্যা আমাদের দেশে সদ্য-আগন্তুক সেই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ভাবদৃষ্টি সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সহিত প্রসারিত। তাঁহার কল্পনার বামনদেব পদপ্রসারের দ্বারা ত্রিভুবনের চিন্তা ও অনুভূতির রাজ্য অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান। তাঁহার কাব্য আমাদের যে এই বিরাট মনোভূমিতে অবাধ সঞ্চরণের ছাড়পত্র দেয় তাহাতে আমরা অনেকটা দিশাহারা না হইয়া পারি না। আমাদের আধুনিক প্রগতিশীলতা অনেকটা নদী-প্রবাহের মত, ইহা এক কূল না ভাঙ্গিয়া অপর কূল গড়িতে পারে না। এই তথা-কথিত আধুনিকতা অর্জন করিতে আমরা প্রায় সমস্ত অতীত উত্তরাধিকারকে ত্যাগ করিয়াছি। প্রাচীন যুগের ধর্মচেতনা, ঔপনিষদিক আত্মজিজ্ঞাসা, পৌরাণিক যুগের একান্ত-নির্ভর ভক্তিবাদ, রামায়ণ-মহাভারতের সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শ, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর মধুর-রসাপ্লুত অধ্যাত্ম সাধনা প্রভৃতি অতীতের সমস্ত সম্পদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাঁচা বিস্ময়, যুক্তিবাদ ও জৈব প্রকৃতির হালকা মালপত্র সম্বল করিয়া আমরা আধুনিকতার খরস্রোত নদীকে আত্মকেন্দ্রিকতার ক্ষণভঙ্গুর ভেলায় পার হইবার জন্য নদীকূলে ভিড় করিয়াছি। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ যে সমস্ত মনীষী সাহিত্যিক পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সামঞ্জস্য-বিধানে তাঁহাদের শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সেকেলে নীতি-বাগীশ আখ্যা দিয়া অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান

করিতেছি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই আশ্চর্য সমন্বয়-প্রচেষ্টা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিলেও আমাদের অন্তর স্পর্শ করে না। তাঁহার সমন্বিত জীবন-দর্শনের বাণীর মধ্যে যেটুকু আমাদের রুচির সমর্থন পায়, সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই অংশটুকুই গ্রহণ করিয়া আমরা রবীন্দ্রভক্তির পরিচয় দিয়া থাকি।

(৩)

রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক চেতনা ও প্রকৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যে ছড়ানো ভগবদনুভূতির ইঙ্গিত তাঁহার সহিত আধুনিক পাঠকের আর একটি দুরতিক্রম্য ব্যবধান রচনা করে। ইন্দ্রপ্রস্থ সভাগৃহে স্ফটিকদ্বারের দ্বারা প্রতিহত রাজা দুর্যোধনের মত আমরা রবীন্দ্র-কাব্যে অসীম ব্যঞ্জনার মায়ামুকুর-বিড়ম্বিত হইয়া উহার আক্ষরিক অর্থ হইতেই ফিরিয়া আসি। রবীন্দ্র-কাব্যে বহু-ব্যবহৃত ও রবীন্দ্রদর্শনের ভিত্তিস্বরূপ 'অসীম', 'অনন্ত', 'ভূমা' প্রভৃতি শব্দজাল আমাদিগকে এক অতীত সংস্কৃতির অস্পষ্ট স্মৃতিবাহিনী ভাব-কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করে। এই শব্দগুলি যে ভগবৎস্বরূপের দ্যোতনা, ও জীবন-সাধনার মধ্য দিয়া যাহারা ঐশী রহস্য অনুভব করিতে আগ্রহশীল নহে তাহাদের নিকট যে ইহাদের নিগূঢ় মর্মবাণীটি অপ্রকাশিতই থাকে এই সত্য আমরা সহজে স্বীকার করি না। ইহাদের শেষ অর্থটি জীবন-প্রসঙ্গের সহিত সম্পৃক্ত হইয়াই, অনুকূল ভাব-পরিবেশের সহযোগিতার দ্বারাই আমাদের বোধশক্তির নিকট আবরণ উন্মোচন করে। যাহাদের জীবন সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়সম্মোহ ও বুদ্ধিচটুলতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ, যাহারা কোনদিনই অসীমের অনুধ্যান করিল না, যাহারা বস্তুসঞ্চয়ের লৌহপ্রাচীর তুলিয়া অনন্তের দিকে উন্মুক্ত সব কয়টা জানালাকেই বন্ধ করিয়া দিল, তাহারা কবির অধ্যাত্ম অনুভূতিমূলক কবিতাগুলির কাব্যরস আস্বাদন করিতে পারিলেও ইহাদের মধ্যে কোন জীবন-প্রেরণা লাভ করিতে পারে না।

কাব্যে আবেগের সঙ্গত মাত্রা নির্ভর করে জীবনের সহজ ভাবোচ্ছ্বাসের ঈষৎ অতিরঞ্জিত অনুসরণে; সেইজন্য ভাব-বিলাসের সংজ্ঞা সকল সমাজে এক নহে। আমরা একটু বেশী মাত্রায় ভাবপ্রবণ বলিয়া আমাদের কাব্য-সাহিত্যেও ভাবের প্রকাশ গাঢ় বর্ণে ও চড়া সুরে। এই প্রবণতা সত্ত্বেও আমরা জীবনে যাহা অনুভব করি না, কাব্যে তাহা ফলাও করিয়া প্রকাশ করিতে গেলে ভাষায় একটু কৃত্রিম ভাবস্ফীতি, একটু শূন্যগর্ভ

উচ্চভাষণের সুর লাগে। উপনিষদের যে অধ্যাত্ম-অনুভূতিদ্যোতক দার্শনিক পরিভাষা দীর্ঘ অপরিচয়ের ফলে আমাদের মনে ও ভাবসংস্কারলোকে বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া আসিয়াছিল, রবীন্দ্রকাব্যের রসোচ্ছলতার স্পর্শে উহাদের পুনর্জীবনলাভে আমরা আবার আমাদের পুরাতন অভ্যাসকে নূতন করিয়া ঝালাইয়া লইতে সাহসী হইয়াছি। ফল যাহা হইয়াছে তাহা যে সর্বাংশে স্পৃহনীয় এমন কথা বলা যায় না। রবীন্দ্র-সাহিত্য-অধ্যয়নকারী ছাত্রছাত্রীর দল রবীন্দ্রদর্শন-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রপূত শব্দগুলির যেরূপ নির্বিচার সুপ্রচুর প্রয়োগ করে যেরূপ অটল গাম্ভীর্যের সহিত তাহাদের জীবনের সহিত সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্পর্ক এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লইয়া বাজীকরের বল লোফার মত এক ভাবলেশহীন শিল্প-কুশলতার পরিচয় দেয়, তাহাতে গভীর বিষয়ের আলোচনার মধ্যেও একটা কৌতুকরসের সঞ্চার হয়। আর শুধু তরুণ শিক্ষার্থীর মধ্যেই এই প্রবণতা সীমাবদ্ধ থাকিলে বিশেষ দূষণীয় কিছু হইত না তরুণের অনুকরণপ্রবৃত্তি ও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সময় সময় হাস্যাস্পদ হইলেও মোটের উপর প্রশংসনীয়। কিন্তু পরিণতবুদ্ধিসম্পন্ন লেখকদের মধ্যেও যদি এই আতিশয্যপ্রবণতা, নিছক শব্দক্রীড়াসক্তি দেখা যায়, তবে ভাবিবার কিছু সঙ্গত কারণ আছে বৈকি! নববর্ষ-আবাহন, শারদীয় পূজা-প্রশস্তি, মৃত্যু উপলক্ষে শোকোচ্ছ্বাস প্রভৃতি কতগুলি নিয়মিত ঘটনা আমাদের সাহিত্যে যে দুকূলপ্লাবী কাব্যোচ্ছ্বাস বহাইয়া দেয় তাহাতে আমাদের সত্যনিষ্ঠা ও সঙ্গতি-বোধ কোথায় যে তলাইয়া যায় তাহার খোঁজ মিলে না। অনুভূতিহীন ও অনুকরণাত্মক শব্দযোজনার পাল টাঙ্গাইয়া দুস্তর ভাবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিলে আমাদের নৌকা হয় মাঝখানের চড়ায় আটকাইয়া যায়, না হয় আঘাটায় গিয়া ঠেকে। যাহারা মৃত্যুর হাতে ক্রীড়নক, প্রবৃত্তির দাস, সাংসারিকতার রুদ্ধ খাঁচায় বন্দী তাহাদিগকে হঠাৎ ভাবোচ্ছ্বাসে রবীন্দ্রদৃষ্টিভঙ্গীর অনুকরণে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলিলেই কি মর্ত্যে অমৃতলোক নামিয়া আসিবে ও জীবন মহনীয় হইয়া উঠিবে?

রবীন্দ্র-কাব্যের দিব্যচেতনার সহিত আমাদের জীবনানুভূতির যে ঘনিষ্ঠ যোগ হয় নাই, তাহার আরও একটি কারণ এই যে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধ কোন নির্দিষ্ট সাধনক্রমের অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। কবি পৃথিবীর সৌন্দর্যের মধ্যে ঈশ্বরের লীলাবিলাস যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ইহা বারবার

আমাদিগকে জানাইয়াছেন। কিন্তু এই দিব্যদৃষ্টি তাঁহার মধ্যে কি করিয়া উদ্বুদ্ধ হইল, কোন্ সাধন-প্রক্রিয়ার ইহা পরিণত ফল সে সম্বন্ধে কোন অনুসরণযোগ্য ইঙ্গিত দেন নাই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ধর্ম-সম্প্রদায়-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কবিসাধকের এইখানেই পার্থক্য। বৈষ্ণব ভক্ত যেমন একদিকে চৈতন্যচরিতামৃত হইতে বৈষ্ণব দর্শনতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন ও পদাবলীর মধ্যে মধুর প্রেম-সাধনার কাব্যশোধিত, আদর্শ রূপটি আস্বাদন করিয়াছেন, তেমনি সুনির্দিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতির অনুসরণে মন্দিরে স্বর্ণসিংহাসনে অধিষ্ঠিত যুগলমূর্তির সম্মুখে নিবেদিত ভক্তি-অর্ঘ্যের মধ্য দিয়া এই কাব্যলোকের ভাবসম্পদকে নিজ অনুভূতিগম্য করিয়া জীবনছন্দে গাঁথিয়া লইয়াছেন। শাক্ত পদাবলীর পাঠক তন্ত্রসাধনার মধ্য দিয়া মাতৃপূজার মহিমা ও ভক্ত কবির একান্ত আত্মনিবেদনকে নিজ অন্তরে স্বাধীনভাবে অনুভব করিয়াছেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ভক্ত ও পাঠক অভিন্ন; কাব্যরস-আস্বাদন ও ভক্তিরস-অনুশীলন একত্র মিশিয়া পরস্পরের শক্তি বর্ধন করিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যে কিন্তু রবীন্দ্র-জীবনদর্শন বুঝিবার একমাত্র অবলম্বন ক্ষণিক ও অনিশ্চিত কাব্যপ্রেরণা—এই ভাবের চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তিকে জীবনের অচঞ্চল দীপশিখায় পরিণত করিবার কোন সুপরিকল্পিত আয়োজন নাই। উপনিষদের যুগে সুদীর্ঘ একনিষ্ঠ ধ্যান-ধারণার সাহায্যে যে ব্রহ্মানুভূতিকে স্ফুরিত করিতে হইত এই চিত্তবিক্ষেপ ও জড়বাদের যুগে কেবল কাব্যসৌন্দর্যপিপাসু মন লইয়া সেই দুর্লভ সিদ্ধি কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী পাঠকগোষ্ঠী আছেন নিশ্চয়ই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনাকে গ্রহণ করিবার উপযোগী কোন ভক্তমণ্ডলী যে গঠিত হয় নাই ইহা সুনিশ্চিত। রবীন্দ্র-কবি গানে মন ভোলান; রবীন্দ্র-গুরু কোন কঠোর অনুশাসনে বাঁধেন না। সুতরাং অনুরাগী পাঠক দীক্ষিত শিষ্যে পরিণত হইবার সুযোগ পায় না। তাঁহার কাব্যজগতে আসা-যাওয়া দু-দিককার দরজাই সমান খোলা থাকে।

(৪)

রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে যে দিকে আমরা এখনও প্রবেশাধিকার পাই নাই তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। এখন যে সমস্ত দিকে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্পর্শ আমরা অন্তরে কিছুটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

সূর্য আকাশে উঠিলে অন্ধতম ব্যক্তিরও চোখের মণিতে তাহার রশ্মির কিছুটা ছায়াবৎ প্রতিফলন হয়। আমাদেরও চেতনলোকে রবিছায়া যে কিয়ৎ পরিমাণে ক্রিয়াশীল, তাহা অনস্বীকার্য। সর্বপ্রথম, রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাংলা কাব্য আমাদের গৌরবের বস্তু। রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত না হইলে আমাদের কাব্যে কল্পনার এত প্রসার ও বৈচিত্র্য, অনুভূতির এত নিবিড়তা, ছন্দোপ্রবাহের এত উচ্ছলতা ও রূপকল্পের এত চমৎকারিত্ব দেখা যাইত না। রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন প্রভাব বাঙলার সামগ্রিক কবি-চিত্তকে এক গভীর ভাব-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে ও কাব্যের মান যে একটা নিদিষ্ট স্তরের নীচে নামিবে না এই নিশ্চিত আশ্বাস জাগাইয়াছে। তাহার পর সবচেয়ে লাভবান হইয়াছে আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য। পাশ্চাত্ত্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইতে আমরা যে বিচারের মূলসূত্র ও মানদণ্ড আহরণ করিয়াছি, রবীন্দ্র কাব্য তাহার সার্থক প্রয়োগের ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে। বিদেশী কবির কাব্যে কাব্যোৎকর্ষের রস আস্বাদন করা কতকটা দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর মত ; ইহাতে আমরা যে আনন্দ পাই, তাহার সঙ্গে খানিকটা অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। সমালোচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, বিশেষতঃ শব্দ-যাদু ও ছন্দোসঙ্গীতের মূল্যমান —অনুভূতির পূর্ণ সমর্থন ব্যতিরেকে যেন খানিকটা আপ্তবাক্যের মতই, আমরা গ্রহণ করি। কিন্তু আমাদের ঘরের কবির মধ্যেই যখন সমালোচনার চরম প্রশস্তি উপযুক্ত আশ্রয় খুঁজিয়া পায়, ঘরোয়া কথার মধ্যেই যখন অনির্বচনীয়তার পরম রহস্য প্রতিধ্বনিত হয়, তখন আমাদের অনুভূতির একটা নূতন দিক খুলিয়া যায় ও কাব্য-পাঠের শ্রেষ্ঠ আনন্দে আমাদের চিত্ত কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়। প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের শ্রেষ্ঠ সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত কাব্য ও ঈশ্বরগুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র ও দীনবন্ধু মিত্রের মত প্রথমেতর শ্রেণীর আধুনিক লেখকের রচনা—আলোচনায় যে আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি ও রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে প্রশ্ন জাগে যে, যদি তিনি রবীন্দ্র-কাব্যাস্বাদনের অবসর পাইতেন, তাহা হইলে কোন্ নূতন, অভাবনীয় আলোকে ইহা আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত! অথবা রবীন্দ্রনাথ যদি নিজেই নিজের গ্রন্থ-সমালোচনা করিতেন (যেমন বহু ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার বিভিন্ন কাব্যের ভূমিকায় ও জীবন-স্মৃতি-পর্যালোচনা উপলক্ষ্যে করিয়াছেন), তবে 'প্রাচীন সাহিত্য'-এর সন্দর্ভসম্ভারের ন্যায় তিনি আমাদের কি অপূর্ব বস্তু

উপহার দিতে পারিতেন, তাহা কল্পনা করিতেও মন অসম্ভব প্রত্যাশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। যদিও রবীন্দ্র-স্থষ্টির সহিত তুলনায় রবীন্দ্র-সমালোচনা বহু পিছাইয়া আছে, তথাপি রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোকমণ্ডলে বিধৃত হইয়া ইহার মধ্যেও যে খানিকটা দীপ্তশ্রী, দিব্য বিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

কবি ও সমালোচক ছাড়া বিদগ্ধমণ্ডলী ও অবিদগ্ধ জনসাধারণ—ইহাদের উপর রবীন্দ্র-সাহিত্য কিরূপ ছাপ রাখিয়া যায়? কবি বলিয়াছেন "সুন্দর পদার্থ আনন্দের চিরপ্রস্রবণ"। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনায় যে বিচিত্র ও অনুপম সৌন্দর্যের স্থষ্টি করিয়াছেন, মানবজীবন ও উহার স্থূল প্রতিবেশের মধ্যে যে সূক্ষ্ম রূপব্যঞ্জনা ও ঊর্ধ্বলোকচারী অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ধীরে ধীরে যে সকলের চিত্তকেই আকর্ষণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের মানস দিগন্তকে প্রসারিত, আমাদের সৌন্দর্যবোধকে উদ্দীপ্ত, আমাদের রুচির মানকে উন্নত ও আমাদের কর্মপ্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ না করিয়াই পারে না। তবে প্রতিকূল অবস্থা ও নানা প্রয়োজনগত সমস্যায় উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের জড়তার জন্য রবীন্দ্র-প্রভাবের প্রত্যক্ষ নিদর্শন সমাজ-চেতনায় এখনও পরিস্ফুট হয় নাই। আমাদের তরুণেরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি, নাটক অভিনয় করে ও নৃত্যগীতের মধ্য দিয়া কবির জীবনোল্লাস ও জীবনে ছন্দোময়তার উপলব্ধিটি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টা তাহাদের নিজের জীবনে এখনও সার্থক হইয়াছে কি না সন্দেহ। দস্যু রত্নাকর মরা মরা উচ্চারণ করিতে করিতে রামনাম-কীর্তনের অধিকার লাভ করিয়াছিল। আমরাও হয়ত কোনদিন রবীন্দ্র-রচনা আওড়াইতে আওড়াইতেই তাঁহার নিগূঢ় ভাবসত্যের মর্মবাণীটি অন্তরে অনুভব করিতে পারিব। তবে ইহার জন্য খানিকটা মানস প্রস্তুতি প্রয়োজন। ধর্মভাবাশ্রিত যে কোন রকমের গান গাহিতে হইলে শুধু সুরের কারুকার্য বা কণ্ঠের স্বভাবমাধুর্যই আমাদের পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না—সঙ্গে সঙ্গে চাই ভাবাবিষ্টতা, ভিতরের ভাবটি ফুটাইয়া তোলার ক্ষমতা। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বেলা শুধু স্বরলিপিতে বন্দী সুরের অনুসরণই যথেষ্ট বিবেচিত হইবে কেন? ঋতু-বিষয়ক, ভগবদনুভূতি-বিষয়ক, মনে একটি বিশিষ্ট ভাবগুঞ্জনদ্যোতক প্রভৃতি যে কোন বিষয়েরই গান হউক না কেন, শুধু সুরের দ্বারা নয়, ভাবটিকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া সমগ্র ভাবপরিমণ্ডল ও

গানের রসাবেদনটিকে শ্রোতার মনের গভীরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে, তাহার মধ্যেও কবির মানসতন্ত্রীর ঝঙ্কার অনুরণিত করিতে হইবে। এই আদর্শ হয়ত সূত্র হিসাবে স্বীকৃত হয় প্রয়োগের সময় সর্বদা অনুসৃত হয় কি না জানি না। রবীন্দ্র-কবিতা-পাঠে ও নাটক-অভিনয়েও অন্তত; যাহাতে সৌন্দর্যের সূক্ষ্মতম ইঙ্গিত, ভাবসমুন্নতির সবটুকু মহিমা ফুটিয়া উঠে ও রুচির শোভনতা ও মর্যাদা যাহাতে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রসের অঞ্জলি ছাপাইয়া দিলেই হয়ত তৃষ্ণা মিটিতে পারে।

আর যাহারা সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ—যাহাদের আমরা জনতা নামে অভিহিত করি—তাহারা রবীন্দ্র-সংস্কৃতির বিরাট ভোজ হইতে এখন পর্যন্ত ·ঞ্চিত আছে। কবি নিজে জনসাধারণের জন্য কবিতা লিখিতে পারেন নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন ও অনাগত জনমনের কবিকে পূর্বাহ্লেই অভিনন্দন জানাইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হওয়া উচিত কি না, তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখা দরকার। যে সাহিত্যের আস্বাদন হইতে জাতির একটা বিরাট অংশ বাদ থাকিল, যে সঞ্জীবনী ভাবধারা কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সমাজের উচ্চ-নীচ সমস্ত শ্রেণীর লোকই একটা গভীর সাংস্কৃতিক ঐক্য, ভাবসাধনার একটা অন্তরঙ্গ সহযোগিতা গড়িয়া তুলিতে পারিল না তাহার যে পূর্ণ সদ্ব্যবহার হইল না তাহা সুনিশ্চিত। তাই আজ চাষী কৃষক, পল্লী-শ্রমিক ও কলকারখানার মজুর, ছোট ছোট ব্যবসায়ী প্রভৃতি অভাবক্লিষ্ট মানুষের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের ও বেদনার উপর দেবতার আশীর্বাদের মত কোন ঊর্ধ্বতন ভাবসত্যের স্নিগ্ধ সান্ত্বনা নামিয়া আসে নাই। আমরা এই অসন্তোষ প্রশমনের জন্য কেবল বৈষয়িক বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে ব্যস্ত; মনের সাম্যবিধানের জন্য আর কোন উৎকৃষ্টতর উপায়ের কথা চিন্তা করিতে পারিতেছি না। আমরা দরিদ্রদিগকে ধনীর ঐশ্বর্যের অংশ লইবার জন্য আহ্বান করিতেছি, কিন্তু তাহাদিগকে আমাদের শ্রেষ্ঠতম সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অংশীদার করিবার জন্য কোন আগ্রহ দেখাইতেছি না। সমুদ্রমন্থন হইতে উদ্ভূত রত্নরাজি-বণ্টনের ন্যায় আমরা তাহাদিগকে ঈর্ষ্যাদিগ্ধ মনের বিষজ্বালা অনুভব করাইতেছি, কিন্তু অমৃতের অংশ হইতে বঞ্চিত রাখিতেছি। আজ অতীত যুগের ভক্তিবাদ, ধর্মের নানাবিধ বিশ্বাস ও সংস্কার তাহাদের মনোভূমি হইতে উন্মূলিত হইয়াছে, কিন্তু

নূতন কোন আধুনিক যুগের ভাববীজ তাহাদের মধ্যে অঙ্কুরিত হয় নাই। অতীতের বাণী স্তব্ধ হইয়াছে, বর্তমানের কোন বাণী তাহাদের চিত্তের বিরাট শূন্যতার মধ্যে পথের নিশানা দেয় নাই। এইখানেই শিক্ষিত শ্রেণী ও রবীন্দ্র অনুরাগী গোষ্ঠীর প্রধান কর্তব্য আছে। তাহাদিগকেই রবীন্দ্রবাণী-প্রচারের ভার লইতে হইবে। আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ কোন দিনই উচ্চ-ভাব-গ্রহণে অযোগ্যতা বা অনিচ্ছা দেখায় নাই। উপনিষদ ও গীতার দুরূহ অধ্যাত্মতত্ত্ব, পৌরাণিক পূজার্চনা, বৈষ্ণব-শাক্ত সম্প্রদায়ের আত্মনিবেদন-মধুর, ভাব-বিগলিত ভক্তিবাদ, বাউল সঙ্গীতের উদাস, আত্মভোলা বৈরাগ্য – সবই তাহারা অতি সহজে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। রবীন্দ্র-জীবনবাদ তাহাদের এই অধ্যাত্মভাবনাপুষ্ট চিত্তে নিশ্চয়ই আতিথেয়তা লাভ করিবে এরূপ আশা অসম্ভব কল্পনাবিলাস নহে। রবীন্দ্র-উৎসবে জনসাধারণের জন্য প্রবেশদ্বার প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হউক, কবি জীবনে যে সর্বব্যাপী আনন্দলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার কিছুটা অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে প্রতিভাত হউক, যে ভগবান তাহাদের নাগালের বাহিরে আত্মগোপন করিয়াছেন, কবির অনুভূতির বিদ্যুচ্চমকে আবার তাঁহার চকিত উপলব্ধি তাহাদের অন্তরলোক উদ্ভাসিত করুক—ইহাই হইবে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের প্রধান সার্থকতা ও রবীন্দ্র-ভাবসাধনায় অগ্রগতির অবিসংবাদিত নিদর্শন।

বাংলা সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধধর্ম

(১)

এবার বর্ষারম্ভেই বাঙালীর অন্তর্নিহিত রসতৃষ্ণার পরিতৃপ্তি-সাধনের অভূত-পূর্ব উপলক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ত শিক্ষিত বাঙালীর বার্ষিক অনুষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। প্রতি বৎসরেই ইহার স্থান-ব্যাপকতা ও কাল-প্রসার বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহার উপর এবার ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২৫০০তম বর্ষাতিক্রমণের জন্য একটা আন্তর্জাতিক উৎসব ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ বৌদ্ধ পুণ্যতীর্থসমূহে অনুষ্ঠিত হইয়া

বাঙালী চিত্তকে একটা রসপ্লাবনের জোয়ারে অভিষিক্ত করিয়াছে। অতীত যুগে ভগবান তথাগত ও আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ যে শ্রেষ্ঠ মনন ও অধ্যাত্ম সাধনা দেশবাসীর সম্মুখে আদর্শরূপে ধরিয়াছেন তাহাই নূতন করিয়া অনুভব করিবার সুযোগ পাইয়া বাঙালী ধন্য হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করিয়া যে উৎসবের আসর পূর্ব হইতেই জমিয়াছিল বুদ্ধজয়ন্তী তাহাতে নূতন সুর যোজনা করিয়া, পূত ভক্তিরসের নূতন ধারা প্রবাহিত করিয়া উহাকে আরও হৃদয়গ্রাহী ও গভীররসাশ্রয়ী করিয়া তুলিয়াছে। পঁচিশে বৈশাখ কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে যে চিত্তবৃত্তির পরিমার্জনা ও উর্দ্ধায়নের আরম্ভ; তাহা বৈশাখী পূর্ণিমার বুদ্ধ মহানির্বাণ-তিথিতে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। বাঙালী চিত্তাকাশে রবির উদয় যে আলোক সঞ্চার করিয়াছিল, বুদ্ধ-পূর্ণিমার করুণা-ঘন কৌমুদীপ্লাবনে তাহা এক অনির্বচনীয় শান্তিরসে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সমস্যাসঙ্কুল, আধুনিক যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ও যুগচেতনার বিশিষ্ট রসে পরিপুষ্ট হইয়া তাঁহার কাব্যে জীবনাদর্শের যে রূপ দিয়াছেন তাহা আন্তর্জাতিকতার বিরাট পরিধিকে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করিলেও উহার মূলতত্ত্ব ও প্রত্যয়ের দিক দিয়া ভারতীয় ধর্মসাধনাকে প্রাণবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ভগবানকে উপলব্ধি করিবার, ভগবানের লীলা-সহচররূপে বিশ্বরহস্যের ছন্দটি অন্তরে অনুভব করিবার, অধ্যাত্মবোধ ও জীবন-দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্বের আলোকে জীবনের বাস্তব পরিস্থিতির মর্ম গ্রহণ করিবার যে বিশিষ্ট প্রণালী ও সাধনা ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে অবলম্বিত হইয়াছে, তাঁহার কবিতায় তাহারই রসোচ্ছল, আবেগময়, কল্পনা-কুহকে অপরূপ ছন্দোরূপটি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তাঁহার কাব্যে ও ভগবৎ-বিষয়ক গীতি-কবিতায় ঔপনিষদিক প্রজ্ঞা ও বৈষ্ণব রসতত্ত্বের এক অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে। ভগবানের সহিত কবি-চিত্তের বিরহ-মিলনের আর্তি-আনন্দ ঔপনিষদিক লীলা-রহস্যের ব্যঞ্জনায়, ব্রহ্মানুসন্ধানের "ধরি-ধরি হারাই-হারাই" অনিশ্চয়তায় ও সদা-সঞ্চরণশীল গতি-সংবেগে বৈষ্ণবীয় রসঘনতায় জমাট বাঁধিবার অবসর পায় নাই। বৈষ্ণব কবিরা পরমতত্ত্বে পূর্ব হইতে মানবিক রসের রূপনিবদ্ধ কায়া আরোপ করিয়া তাঁহাদের কবিতায় উহার এই ছদ্ম মানবিকতাটারই আরতি করিয়াছেন। কেবল রূপবর্ণনার ঐকান্তিকতা,

আবেগের নিঃসীম ব্যাকুলতা ও আত্মনিবেদনের নিঃশেষ আত্মবিলুপ্তি মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগায় যে, এই হৃদয়-উজাড় করা অর্ঘ্য কোন মানবিক সম্বন্ধের চরণে উৎসর্গিত হইতে পারে না। যখন কবি গাহেন "দুহুঁ কোলে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া" বা যখন প্রেমিক প্রেমিকাকে 'তুমি বেদমাতা গায়ত্রী' এই নামে সম্বোধন করেন, তখনই প্রেমের অন্তরালস্থিত অধ্যাত্ম আকৃতি, মূর্তির পিছনকার তত্ত্বচেতনা, কাব্যরসের গভীরে আত্মগোপনশীল ভূমানন্দ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথ কখনই তত্ত্বরূপকে ভুলিয়া রসসাধনায় আপনাকে নিমজ্জিত করেন নাই। তিনি রূপ-সাগরে ডুব দিয়াছেন, কিন্তু অরূপের দ্যুতি তাঁহার কাব্যচেতনায় সর্বদা দীপ্যমান। ভগবানের প্রতি কবির মনোভাব কোন মানবিক সম্পর্কের স্থিরতার মধ্যে আবদ্ধ নহে—তিনি একাধারে কান্ত, সখা ও প্রভু। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে যে বুকে-চাপিয়া-ধরা নিবিড় আশ্লেষ-আনন্দের শিহরণ সর্বত্র অনুভূত হয়, রবীন্দ্রনাথে তাহার অনুরূপ কিছু নাই। ভগবান তাঁহার বাহুবন্ধনে মানব-দয়িতের ন্যায় ধরা দেন না। তিনি চকিতের স্পর্শে, ক্ষণিক অনুভূতিতে, লুকোচুরির লীলা-চঞ্চল আবির্ভাব ও অন্তর্ধানে কবির মধ্যে মিলনৌৎসুক্য জাগান। তিনি যুগযুগান্তর ধরিয়া আসিতেছেন কিন্তু কোন মিলনকুঞ্জে তাঁহার যাত্রা-বিরতি ও পরিপূর্ণ প্রাপ্তি ঘটে নাই। প্রকৃতি-সৌন্দর্য, আবর্তনশীল ঋতুচক্র ও ইন্দ্রিয়ের রূপানুভূতির মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব ও স্পর্শ আকস্মিকভাবে দ্যোতিত হয়, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় রবীন্দ্র-কাব্যে স্থান ও কালের সহিত কোন নিত্য, অব্যভিচারী ভাবাসঙ্গ সৃষ্ট হয় না। নবীন মেঘের ঘটা শ্রীরাধাকে তাঁহার বল্লভের শ্যামকান্তি স্মরণ করাইয়া দিবেই দিবে, প্রকৃতির শোভায় তাঁহার অঙ্গদ্যুতি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন চির-নির্ধারিত ভাব-চক্রে পরিভ্রমণ করেন না—তাঁহার শ্রাবণঘনরচিত মোহান্তরাল ভগবানের অলক্ষ্য অভিসারের ইঙ্গিত, অনিবার্যভাবে নয়, সাময়িকভাবে উত্তেজিত অনুভূতির নিকট বহন করে। এই রহস্যগহন অনির্দেশ্যতাই বৈষ্ণব কবিতার সহিত তুলনায় রবীন্দ্র-কাব্যে তাঁহার ভগবদনুভূতির বৈশিষ্ট্য-নির্দেশক।

(হিন্দুধর্মের গহন তত্ত্বের সহিত তুলনায় বৌদ্ধধর্মের সরল, অলৌকিকতা-বর্জিত, সুকুমার মানবিক বৃত্তির অনুশীলনে স্নিগ্ধ আবেদন রবীন্দ্রনাথকে

অন্তরূপে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহার কবিতায় বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব ও মতবাদের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের মহান জীবনাদর্শ, বৌদ্ধ ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল, আত্মোৎসর্গপূত অধ্যায়সমূহ, বুদ্ধের প্রতি ভক্তির একাগ্রতার উদাহরণগুলি ও বুদ্ধ-মহিমা তাঁহার কাব্যের বিষয়রূপে তাঁহার কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। 'কথা ও কাহিনী'র অনেকগুলি কাব্য-আখ্যান বৌদ্ধ যুগের ঘটনা লইয়া রচিত। বৌদ্ধধর্মের শুচিশুভ্র পূজাবিধি, বুদ্ধের প্রতি তাঁহার শিষ্য-ভক্তদের একান্ত আত্মনিবেদন, ঐ ধর্মের প্রভাবে বিকশিত মানব-মনের অনুপম সুষমা-মাধুর্য কবির গভীর সহানুভূতি ও রসনিষ্পত্তির স্বচ্ছ মুকুরে চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে আদর্শ জগৎকে হিংসাদ্বেষহীন, পূত-নির্মল ও মানবচরিত্রকে শান্ত আত্মবিচার ও একনিষ্ঠ ধর্মসাধনার সাহায্যে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত দেখিবার আশা পোষণ করিত তাহা বৌদ্ধ-ধর্মের জীবনচর্চার মধ্যে পরিপূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল। তাই তাঁহার 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা'য় ভিখারিনী নারী তাহার একমাত্র পার্থিব সম্পদ জীর্ণ চীরবস্ত্রখানি বিলাইয়া দিয়া যে চরম আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়াছিল, বা তাঁহার শ্রীমতী নামেতে দাসী রাজরোষকে তুচ্ছ করিয়া স্তূপপাদমূলে শেষ আরতির শিখা জ্বালিয়া যে মৃত্যুদণ্ড বরণ করিয়াছিল, তাহা বৌদ্ধধর্মের অবিস্মরণীয় কীর্তিরূপে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা ও মানবিক বোধকে তুল্যরূপে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। তাঁহার 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে বৌদ্ধধর্মের দুইটি মূল তত্ত্ব—মানব-সমাজের হীনবর্ণের প্রতি মর্যাদাদান ও ধর্মের কঠোর অনুশাসনে অসংবরণীয় হৃদয়াবেগের নিরোধ—নাটকের অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া সুগভীর করুণরস ও বিধিবিড়ম্বিত জীবনের প্রতি স্নিগ্ধ-মমতা-উদ্বোধনের হেতু হইয়াছে। তা ছাড়া, বুদ্ধের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে রচিত প্রশস্তিমূলক কবিতাতেও কবি হিংসায় উন্মত্ত, নিষ্ঠুরদ্বন্দ্বমথিত পৃথিবীতে ভগবান তথাগতের করুণা, মৈত্রী ও প্রেমের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, বৌদ্ধ আদর্শই যে এই হিংস্র তাণ্ডবলীলার একমাত্র প্রতিষেধক তাহা মর্মস্পর্শী আন্তরিকতা ও ও সংযত-গভীর, ভক্তিনম্র মনোভাবের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করিয়া শান্তরসের কবি বলিয়াই বুদ্ধের শান্তিমন্ত্র ও অহিংসানীতি তাঁহার অনুভূতির গভীরতম স্তরে অনুরণন তুলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মকে তাঁহার কাব্যে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া জাতীয় জীবনে উহাদের প্রভাব সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। কবি ও ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা ঠিক এক পর্যায়ের নহেন। যিনি ধর্ম-সংস্থাপক তিনি ধর্মের অন্তর্নিহিত অর্থ ও সাধনাক্রম ও দৈনন্দিন জীবনে উহাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ দেন। তাঁহার ধর্ম একটি বিশিষ্ট মতবাদের বিধিবদ্ধ রূপ গ্রহণ করে—শিষ্য-প্রশিষ্য-ব্যাখ্যাতা-প্রচারক পরম্পরায় ইহা জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত হয় ও একটা বিরাট সমাজ-সংহতি গড়িয়া তোলে। এই ধর্মের অনুভূতি প্রথম স্থাপয়িতার মনে যেরূপ তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল থাকে পরবর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা ক্রমশ আপ্তবাক্যে বিশ্বাসে পরিণত হয়। ইহার শিখা ক্রমশ ম্লান হইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আচার নিষ্ঠা ও অর্ধ-সচেতন প্রথাবদ্ধতায় পর্যবসান লাভ করে। কবির ধর্মচেতনা কোন বিশেষ ধর্মকে আশ্রয় করিয়া স্ফুরিত হইতে পারে কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভতির বিষয়। তাঁহার উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার নহে, তাঁহার অনুভূতির কাব্যময় অভিব্যক্তি। তাঁহার একমাত্র আশা যে, তাঁহার অনুভূতির এই ভাবে-ভাষায়-ছন্দে সুন্দর প্রকাশ অনুরূপ-মানসিকতাসম্পন্ন পাঠকের মনে অনুরণন তুলিবে ও এইরূপে ইহা রসানুভবশীল ও ধর্মের প্রতি আগ্রহান্বিত পাঠকগোষ্ঠীর ভিতর দিয়া সমগ্র জাতীয় জীবনে একটি অক্ষয় ভাবসম্পদরূপে সঞ্চিত হইবে। রবীন্দ্রনাথ কোন ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন করেন নাই, বা আচরণ ও সাধনা সম্বন্ধে কোন বিধিবদ্ধ নির্দেশ দেন নাই। তাঁহার কবিতা হইতে হয়ত একটা দার্শনিক মতবাদ সঙ্কলিত হইতে পারে, কিন্তু উহা তাঁহার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও ভগবদুপলব্ধির একটা বিশেষ আবেগ-ছন্দের পরোক্ষ ফল মাত্র। বৈষ্ণব-শাক্ত পদাবলী অবশ্য চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেমধর্ম ও তন্ত্রশাস্ত্রনির্দিষ্ট শক্তিপূজা-পদ্ধতির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত, কিন্তু এই সমস্ত কবিতা ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠান ও অনুশাসনের দিকটা গৌণ করিয়া ইহার রসনির্যাস ও ভাবমাধুর্যের দিকটাকেই অপরূপ সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়া বড় করিয়া তুলিয়াছে। জগতে প্রচলিত কোন ধর্মই উহার বিশুদ্ধ আদিম রূপটিকে অবিকৃত রাখিতে পারে নাই; মানবচিত্তে ঐশী মহিমার স্ফুরণ, মানবকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট ও মানবের জীবনযাত্রাকে উচ্চতর আদর্শের দিকে পরিচালিত করিবার যে মহান উদ্দেশ্য লইয়া ইহা

যাত্রারম্ভ করিয়াছিল, কিছুদিনের সতেজ ও সক্রিয় অস্তিত্বের পর ইহার সেই সঙ্কল্প ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিয়াছে। কবির ধর্ম কোন সংঘশক্তির সাহায্যে বিরাট আয়তন ও প্রসার লাভ করিবে না; উহার অনুরাগী ভক্তদের মধ্যেও ধর্মোন্মাদনার মত বিপুল ভাবপ্লাবনের সৃষ্টি করিবে না; কিন্তু স্বল্পসংখ্যক সমধর্মী ও রসিকের মনে উহা চির-উজ্জ্বল থাকিবে, উহার শাশ্বত প্রভাব কোন দিনই ক্ষুণ্ণ হইবে না।

(২)

বৌদ্ধধর্ম ভারতে কোন স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে কি না এই প্রশ্নের আলোচনা-প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে ইহার বিস্তৃতি ও বিলুপ্তির ইতিহাসটি অনুধাবন করা কর্তব্য। এই ধ একদা সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রায় একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল; সমুদ্র পার হইয়া সিংহল ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও পর্বত অতিক্রম করিয়া তিব্বত, চীন, জাপান ও মধ্য-এশিয়ায় ইহা পৃথিবীর জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশকে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। শুধু বিস্তারের দিক দিয়া নহে, জাতিসমূহের মনমূল ও প্রাণকেন্দ্র পর্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট প্রেরণার গভীরতায় ইহা নিজ অপরিমেয় শক্তির পরিচয় দিয়াছিল। ধর্ম যখন মানবচেতনায় সত্যভাবে উপলব্ধ হয়, তখন ইহার কল্যাণকর প্রভাব জাতীয় জীবনের সবক্ষেত্রে বিকশিত হইয়া উঠে। সমগ্র গণমানসে এক বিপুল, বহুমুখী প্রাণহিল্লোল-ধারা প্রবাহিত হয়, জাতির রক্তধারার প্রতি কণিকায় এক অভাবনীয় স্পন্দচাঞ্চল্য উদ্দাম হইয়া উঠে, জীবনের দিকে দিকে নূতন উন্মেষ ও সম্ভাবনার দ্বারগুলি উন্মুক্ত হইয়া যায়। সাহিত্যে, শিল্পে, মননক্রিয়ায়, সমাজ-বিন্যাসে, রাষ্ট্রসংগঠনে, অধ্যাত্মরহস্যোদ্ভেদে এই নববিকশিত শক্তি এক অপরূপ, সর্বাঙ্গীণ আত্মবিকাশে ইহার অস্তিত্ব-গৌরব ঘোষণা করে। বুদ্ধের আবির্ভাব ও বৌদ্ধধর্ম-প্রতিষ্ঠার কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ভারত ও বহির্ভারতের বৌদ্ধ অঞ্চলসমূহ এক বিরাট ও বিচিত্র প্রাণলীলার রঙ্গভূমি হইয়া উঠিল। ভগবান তথাগতের বাণী জনসাধারণের ব্যবহৃত পালি ভাষায় অনূদিত হইয়া এক সমৃদ্ধিশালী, সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্য গড়িয়া তুলিল। উহার ভিতর দিয়া নবজাত ধর্মের হৃদয়াবেগ, পারত্রিক নির্বাণলাভের আকূতি, নবপ্রবুদ্ধ অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার উন্মুখতা, সংসারত্যাগ ও প্রব্রজ্যাগ্রহণের দ্বিধাদ্বন্দ্বক্ষুব্ধ মানস আলোড়ন, সমাজ-

চিত্রণের উদ্দীপ্ত বাস্তববোধ, প্রাক্তন জন্মরহস্যের অনুসন্ধান-কৌতূহল বাঙ্ময় রূপ লাভ করিল। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র-প্রণয়ন ও বৌদ্ধদর্শনের প্রতিষ্ঠা এই ভাষাকে তত্ত্বালোচনার উপযোগী আভিজাত্য-মহিমায় মণ্ডিত করিল। বৌদ্ধজাতক-সমূহে সমসাময়িক ব্যবসায়ী ও নিম্নশ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রা সরস বস্তুনিষ্ঠার সহিত বর্ণিত হইয়াছে ও সমস্ত সমাজের একটি বস্তুরসপুষ্ট, উপভোগ্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

শিল্পের ক্ষেত্রেও এই নব-উদ্বুদ্ধ জীবনোল্লাস অধ্যাত্মসত্যের নিগূঢ় ভাব-সাধনা ও কল্পনার অসীম অভিযানকে রূপসুষমার মেখলায় বাঁধিয়া পাষাণ-স্তূপের স্থূলতা ও জড়ত্বের মধ্যে এক অপরূপ, মায়াময় সৌন্দর্য-স্বপ্নকে মূর্ত করিয়াছে। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পের এমন মহিমান্বিত বিকাশ জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। ধ্যানসমাহিত বুদ্ধমূর্তির কত বিচিত্র ভাবব্যঞ্জনা ও ভঙ্গীসৌষ্ঠব, শান্ত, মৌন মুখশ্রীর উপর নিবিড় অধ্যাত্ম অনুভূতির কত সূক্ষ্ম প্রকারভেদের ইঙ্গিতময় ছাপ, বেদনাক্লিষ্ট মানব-জীবনের প্রতি ক্ষমাস্নিগ্ধ, করুণাঘন সহানুভূতির কি প্রসন্ন-নীরব অভিব্যক্তি যে শিল্পরূপের অমরতা ও শিল্পীমনের অভিষেক লাভ করিয়াছে তাহার নিদর্শন সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত আছে। মঠ, মন্দির, বিহার, চৈত্য-সংঘারাম প্রভৃতি নানাবিধ বিপুলায়তন নির্মিতির মধ্যে বৌদ্ধযুগের স্থাপত্যশিল্প মানবকল্পনার উত্তুঙ্গতম সীমারেখা স্পর্শ করিয়াছে। পরিকল্পনার বিরাট মহিমা রূপায়ণের সূক্ষ্ম-কারুকার্যমণ্ডিত অনবদ্য মণ্ডনকলার সহিত এক অপূর্ব মিলনে সমন্বিত হইয়াছে। অজন্তা-এলোরার গুহাশিল্প, ললিতগিরি-খণ্ডগিরির ভগ্নাবশেষ, নালন্দা-তক্ষশীলা-মহাস্থানগড়ের বিরাটকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অগণিত-কক্ষসমন্বিত পাঠাগার ও আবাসিক গৃহ—এ সমস্তই বৌদ্ধশিল্পের কালজয়ী মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

বাহিরের এই ঐশ্বর্যের সঙ্গে অন্তরের ঐশ্বর্য তুল্যভাবে প্রকটিত হইয়াছে। সমস্ত শিল্পসাধনার মূলে যে ধর্মানুভূতি ও অধ্যাত্ম প্রেরণা ক্রিয়াশীল তাহা রেখার প্রতি টানে, ভিত্তিগাত্রে ক্ষোদিত মূর্তিসমূহের দেবভাবে ও বুদ্ধ-মহিমাপ্রচারে একাগ্রতায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, বৌদ্ধযুগের ভারতে এত শিল্পপ্রতিভার প্রাচুর্য সঞ্চিত ছিল ও শিল্পী-সংঘের প্রত্যেকটি ব্যক্তি গভীর ধর্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার প্রতিভার

অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বৌদ্ধ আচার্য, ভিক্ষু, শ্রমণ ও দেশ-বিদেশ হইতে আগত শিক্ষার্থী আজীবন ধর্মসাধনা ও জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দশহাজারে পৌঁছিয়াছিল। এই বিরাট সংখ্যার পাঠক্রম কিরূপে নিরূপিত হইত, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কিরূপ ব্যবস্থা ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আলোচনার জন্য কি বিপুল বিশেষজ্ঞ-গোষ্ঠীকে সমবেত করা হইয়াছিল এবং শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত অন্তেবাসী দল কিরূপে সমাজের মধ্যে জ্ঞানের আলোক-বিকিরণে ব্রতী হইত—এসমস্ত প্রশ্ন বর্তমান শিক্ষাসমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে বিশেষ কৌতূহল জাগায়। মোট কথা, বৌদ্ধ-ধর্মের প্রাদুর্ভাব-যুগে সমগ্র উত্তর-ভারতে, বিশেষতঃ বিহার ও বঙ্গদেশে এক বিরাট মনীষার আলোড়ন এক বিপুল প্রাণচাঞ্চল্য, কর্মোদ্যম ও শিল্পসাধনার ইতিহাস রচনা করিয়াছিল।

(৩)

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় জাতীয় জীবনে বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। বৌদ্ধধর্মের অসাধারণ মৌলিকতা ছিল ইহার বৈপ্লবিক দুঃসাহসিকতায়, সাধারণ মানুষের প্রতি আস্থার আতিশয্যে। ভগবানের অন্বেষণ ও তাঁহার প্রতি প্রেমের আকূতি যে দেশে ধর্মের মূলসূত্র, সেই ঈশ্বর-সর্বস্ব দেশে বুদ্ধদেব ধর্ম হইতে ভগবানকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়াছিলেন। ধর্মসাধনা তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবাদনির্ভর মানবিক গুণের অনুশীলনে পরিণত হইল। পঞ্চশীল-নিয়ন্ত্রিত, ত্যাগ ও সংযমে মহীয়ান, বাসনা-জয়ে প্রশান্ত জীবনযাত্রাই মানুষের পরম সিদ্ধিরূপে নির্দিষ্ট হইল। কোন স্বর্গের মোহ, কোন পুরস্কারের প্রলোভন, ভক্তিবিহ্বলতার কোন জ্ঞানবিরোধী মাদকতা, কোন রস ও রংএর প্রক্ষেপ ইহাকে সাধারণ দুর্বলচিত্ত ও কল্পনাবিলাসী মানুষের নিকট লোভনীয় করিয়া তোলে নাই। সকল ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম অতি কঠোর, ভাবলেশহীন জ্ঞানচর্চা ও জীবন-সাধনাকেই, আত্মোপলব্ধির শুভ্র, নিরঞ্জন আলোককেই, শূন্যবাদ ও নির্বাণের বস্তুসত্তাহীন, নিবাত-নিষ্কম্প প্রশান্তিকেই জীবনের কাম্যতম পরিণতিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ইহার মধ্যে সাধারণ মানুষের আকর্ষণীয় কি থাকিতে পারে, তাহার কোন্ প্রবৃত্তির

ঊর্ধ্বায়ন- চরিতার্থতা হইতে পারে? নিছক বৈরাগ্য, আত্মসংযম ও আত্মোৎসর্গের চড়াসুরে মনোবীণা কতদিন বাঁধা থাকিতে পারে? উহার তন্ত্রী শিথিল হইয়া পড়িবেই। যে ধূলিধূসর মধ্যপথে স্বর্গীয় বিমান কোন দিন অবতরণ করিবে না, যাহা সহজ-উৎসারিত ভক্তিবাদের তরুচ্ছায়ায় শীতল নহে, যেখানে কল্পনার প্রস্রবণ ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত শীকরজালে ইন্দ্রধনু রচনা করে না, ও যেখানে ধূলিজালকে অবিরত চেষ্টায় সরাইয়া কেবলমাত্র এক প্র্তর-বিকীর্ণ ধ্যানাসন বিছান হইয়াছে সেখানে সাধকের যে বিশেষ ভিড় লাগিবে না ইহা সহজেই বোঝা যায়। এতৎসত্ত্বেও যে বৌদ্ধধর্মের জগৎ-ব্যাপী বিপুল প্রসার সম্ভব হইয়াছিল তাহা বুদ্ধদেবের অসামান্য চরিত্র-প্রভাব ও বৌদ্ধসংঘের আশ্চর্য নিয়মানুবর্তিতা ও গঠনশক্তির জন্য। বুদ্ধের বাণী ও উপদেশাবলী এরূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও লোকচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় বহন করে, তিনি ধর্মপ্রতিষ্ঠার উচ্চ মঞ্চ হইতে নামিয়া সহজবোধ্যতার সমভূমিতে সকলের সহিত এমন মিশিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার করুণা ও সমস্যা-সমাধানের উপায় নির্দেশ জনসাধারণের মধ্যে এরূপ বাস্তব আবেদনের সহিত উপস্থাপিত হইয়াছিল যে, তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র-মাধুর্য ও জনপ্রিয়তা তাঁহার ধর্মে নির্মম শুষ্কতার উপর একটা স্নিগ্ধ শ্যামশ্রীর আস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম-প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বুদ্ধদেব নিজে গ্রহণ করেন নাই—বুদ্ধ, সংঘ এবং ধর্ম এই তিন মিলিয়া তাহার সম্পূর্ণতা। বৌদ্ধ সংঘগুলির অদ্ভুত আদর্শনিষ্ঠা ও বুদ্ধবাণীপ্রচারে অপরিসীম উৎসাহ ও কর্মকুশলতাই প্রধানতঃ এই ধর্মের জগদ্ব্যাপী প্রসারের কারণ। সংঘজীবনের অস্খলিত নিয়ম-সংযম-পালন তপশ্চর্যা ও জীবনের সর্ব সুখ বিসর্জন দিয়া সন্ন্যাসের অনুশীলনের দ্বারা যে অধ্যাত্মশক্তি সঞ্চিত হইয়াছিল তাহাই জনসাধারণকে বুদ্ধের আদর্শে স্থির রাখিয়াছিল ইহার সহিত রাষ্ট্রশক্তির অকুণ্ঠ সহযোগিতা ইহার মর্যাদা ও সংহতি-বৃদ্ধির আর একটি হেতু। বুদ্ধের যে বাণী মুখে মুখে উচ্চারিত হইত, সংঘের যে প্রভাব আঞ্চলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, প্রজাবর্গের যে স্বীকৃতি স্বেচ্ছাবরণের শিথিলতার মধ্যে ইহাকে মন্থর অগ্রগতির পথে চালিত করিতেছিল, মহারাজ অশোকের সুপরিকল্পিত আনুকূল্যে, রাজ্যশাসনযন্ত্রের অমোঘ কার্যকারিতায়, তাঁহার একাগ্র ইচ্ছাশক্তি ও ভক্তির অনুপ্রেরণায় তাহা একটি রাষ্ট্রসমকক্ষ শক্তিতে পরিণত হইল।

মানুষের কোমল, বিস্মৃতিপ্রবণ ও নানা ভাব-তরঙ্গের আন্দোলনে অস্থির মনোবৃত্তির আশ্রয় হইতে এই ধর্ম শিলালিপিতে উৎকীর্ণ ও স্তূপরচনায় ঊর্দ্ধাকাশের প্রশান্তিতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পাষাণের দৃঢ়তা ও স্তম্ভের ভারবহতার অ-ক্ষয়িষ্ণু অবলম্বনে স্থির হইয়াছিল।

বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবের সহিত বৌদ্ধধর্মের একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বাঙলা দেশ হইতে উহার বিলোপের পরেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বাংলায় প্রথম রচনা চর্যাপদ ও দোহাগুলিতে বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও নির্বাণ-মুক্তির উল্লসিত ও প্রত্যয়-দৃঢ় জয়গান ধ্বনিত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাঙলাদেশে শৈব ও বৈষ্ণব-ধর্ম বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত থাকিলেও শিব ও বিষ্ণুর মহিমা তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে নৃপতি-প্রশস্তির সহিত জড়িত হইয়া দেবভাষায় উদ্‌গাত হইলেও জনসাধারণের ভাষায় তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ধাত্রীর লালন-চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া সূতিকাগার হইতে সদ্যো-নিষ্ক্রান্ত, অর্ধস্ফুটবাক্ বাংলা ভাষা বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ভাবসত্যের মধ্যেই ইহার প্রথম আবেগের অনুভূতি, ইহার রূপক-মায়ার প্রথম রহস্য-দ্যুতি ও সন্ধ্যা ভাষার প্রথম গোধূলি-অস্পষ্টতা, ইহার যৌন-জীবনের প্রথম রসোল্লাস, ইহার অধ্যাত্ম চেতনার প্রথম বিদ্যুৎ-স্ফুরণ লাভ করিয়াছিল মনে হয় যেন শিব, বিষ্ণু ইহারা উপরিস্তরের অভিজাত দেবতা অভ্রভেদী মন্দিরে আড়ম্বরপূর্ণ পূজা বিধির মধ্যে, রাজৈশ্বর্যের রাজসিকতার সম্ভারে, জনচিত্ত হইতে সুদূর নির্বাসনে বিবিক্ত। কিন্তু বুদ্ধের করুণাস্নিগ্ধ প্রশান্তি, সৃষ্টিব্যাপী সর্বশূন্যতার গহ্বরের উপর নির্বাণ-কামনার সেতুরচনা, দৃশ্যমান প্রপঞ্চ-জগৎ হইতে অদৃশ্য সত্যলোকে পৌছিবার আকুতি জনসাধারণের অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছিল। তাই বাংলার বেদমন্ত্রমুখর, হোমধূমাচ্ছন্ন আকাশে এই অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়াই ভাষা কাকলীর প্রথম সঙ্গীতোচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিল বৌদ্ধ মতবাদ বাঙালীর প্রাণের রুদ্ধ ভাব-উৎসকে প্রথম মুক্তি দিয়া উহার কাব্য-ইতিহাসের আদি অধ্যায় রচনা করিয়াছে। তাই বাহিরে বিলুপ্ত হইলেও অন্তরে ইহা বাঙালীর প্রাণ-তন্তুর সহিত জড়াইয়া আছে। বৌদ্ধ মুমুক্ষুর নৈরাত্মা দেবীর কণ্ঠালিঙ্গন, তাহার সহিত মিলন-মধুর রজনী-যাপনের পুলক-রোমাঞ্চ বৈষ্ণব পদাবলীর ভিতর দিয়া বাঙালীর রসচেতনায় অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

(৪)

যে বৌদ্ধধর্ম বাঙালীর অন্তর-দ্বারকে প্রথম উন্মুক্ত করিয়াছিল, দেশ হইতে তাহার সামগ্রিক বিলোপ বাঙলার ঐতিহাসিক বিবর্তনের একটি প্রধান সূত্র পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভগবান বুদ্ধ মানুষকে যে দুরূহ সাধনায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাহা মানবিক দুর্বলতার অনায়ত্ত। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সংঘসমূহের কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রণে ও জীবন চর্চার দৃষ্টান্ত-প্রভাবে জনসাধারণের নিষ্ঠা মোটামুটি টিকিয়াছিল। কিন্তু সংঘে যখন ভাঙ্গন ধরিল তখন মানুষের অবদমিত কামনাস্রোত আবার সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া উদ্দাম হইয়া উঠিল। সমাজে দুর্নীতি ও অনাচার প্রবল হইয়া উঠিল—কপট ধর্মাচরণের বিলাস-ব্যসন ব্যভিচার গোপন প্রশ্রয়ের অন্তরাল রচনা করিল। শঙ্করাচার্য কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্মের সহিত উহার বিরোধ ক্রমশ তীব্র হইতে তীব্রতর পর্যায়ে উন্নীত হইল। যে রাষ্ট্রবিপ্লবে বাঙলার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল, উহাতে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কতটা সহযোগিতা ছিল তাহা ঐতিহাসিক নির্ধারণের বিষয়।

কিন্তু মনে হয় যে, বাংলার ধর্মগত অন্তর্বিরোধ না থাকিলে উহার পতন এত শীঘ্র ঘটিত না। এই বিরোধের সঙ্গে সঙ্গে মিলনেরও একটা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলিতেছিল। মুসলমান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে জয়দেব কবি তাঁহার 'গীতগোবিন্দ'-এ বুদ্ধদেবকে দশ অবতারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাঁহাকে হিন্দুদেবমণ্ডলে অভিষিক্ত করিয়া লইলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা ও হিন্দু তান্ত্রিকতা পরস্পরের নিকটবর্তী হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই এক মিশ্র অভিন্ন রূপ ধারণ করিল। বুদ্ধের ধ্যানমূর্তির সহিত মহাদেবের ধ্যানতন্ময় মুখভাব ক্রমশ অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া গেল। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের দেবীরা বৌদ্ধ যোগিনীদের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গেলেন। এইরূপে হিন্দুধর্ম যেমন একদিকে উহার নূতন পৌরাণিক রসোচ্ছলতার আকর্ষণে বুদ্ধি ও অনুভূতি-প্রধান বৌদ্ধধর্মকে স্থানচ্যুত করিতে লাগিল, তেমনি অপরদিকে সংমিশ্রণ-প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া উহাকে আত্মসাৎ করিয়া লইল। শ্রীক্ষেত্রস্থিত জগন্নাথ বুদ্ধের রূপান্তর হউন বা না হউন, সেখানে কতকগুলি বৌদ্ধ আচার ও সংস্কার হিন্দুধর্মের সমর্থন লাভ করিয়া স্থান-মাহাত্ম্যের নিদর্শনরূপ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। বুদ্ধপূজা ধর্মঠাকুরের বেনামীতে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এখনও নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে দেখি চৈতন্যদেব

কাশীধামে "পাষণ্ডী"দের মত খণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে প্রেমধর্ম-নির্ঝরিণীর উৎস নিজ চরণযুগলে প্রণত করাইয়াছেন ও শ্রীনিত্যানন্দ বৌদ্ধ নেড়া-নেড়ীর দলকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া বাংলার মাটি হইতে বৌদ্ধধর্মের শেষ দৃশ্যমান চিহ্নকে বিলুপ্ত করিয়াছেন। শাখা-নদী ঘুরিয়া-ফিরিয়া, হাজিয়া-মজিয়া, মূল স্রোতোধারায় আসিয়া বিলীন হইয়াছে।

কিন্তু এইরূপে বাঙলায় হিন্দুধর্মের গ্রাসশক্তির নিকট বৌদ্ধধর্ম আত্মসত্তাকে বিসর্জন দিলেও বাঙালীর অন্তরের মধ্যে ইহার অস্থিমজ্জাগত সংস্কার অদৃশ্য মহিমায় বিরাজিত আছে। চৈতন্য-প্রশস্তির মধ্য দিয়া বুদ্ধ-মহিমার ক্ষীণ সুর যেন কানে আসে—চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম যেন বুদ্ধদেবের কারুণ্যঘন মানব-প্রীতির এক অজস্রধারায় উৎসারিত দ্রবীভূত রূপ। ভগবৎ-প্রেমের অপরিমিত উচ্ছ্বাস, দিব্যোন্মাদ, অন্তরের অনুভূতি কেন্দ্রে যুগলমাধুরীর সর্বকালীন উপলব্ধি—এগুলি যেন বৌদ্ধধর্মের পাষাণের তলে প্রচ্ছন্ন অশ্রু-প্রবাহের বহিঃনিষ্ক্রমণ। যে জীবে দয়া বৈষ্ণব-বৌদ্ধধর্মের সাধারণ লক্ষণ চৈতন্যদেব তাহার সহিত নামে রুচির সংযোজনা করিলেন। বুদ্ধদেবের ধ্যানপ্রশান্ত ওষ্ঠাধরের পিছনে যে আবেগপ্রবাহ জমাট বরফের ন্যায় রুদ্ধ ও স্তম্ভিত ছিল, চৈতন্যের ভাবাতিশয্যে বেতসলতার ন্যায় কম্পমান সর্ব-দেহে তাহাই যেন সমস্ত সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া শতধারায় বন্যার দুর্বার শক্তিতে বাহির হইয়া আসিল। তা ছাড়া হিন্দুধর্মের মধ্যে যে শান্তি, নির্বেদ, বৈরাগ্যের আদর্শ এত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল তাহা বৌদ্ধসাধনার পরিণত ফলরূপেই একটা নূতন অর্থগৌরব ও অত্যাজ্য জীবনসত্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। হিন্দুর শান্তি-প্রবৃত্তির বৈধ প্রয়োগ ও নির্দেশানুযায়ী উপভোগ হইতে সঞ্জাত—বৌদ্ধের শান্তি প্রবৃত্তির সামগ্রিক উৎসাদনের উপর প্রতিষ্ঠিত। গীতার নিষ্কাম ধর্ম মানবের কর্মশক্তির ভগবদভিমুখীনতা ও কর্মফল ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে সমর্পণ; বৌদ্ধধর্মে ভগবান নাই বলিয়া প্রবৃত্তির কোন ঊর্ধ্বায়ন-নির্দেশ নাই, শরীর-রক্ষার ন্যূনতম প্রয়োজনেই ইহার সীমা এবং শেষ পর্যন্ত ইহার সম্পূর্ণ উন্মূলনই কাম্য। কিন্তু শাস্ত্রমর্ম যাহাই হউক, আমরা শান্তির অন্বেষণকে অনেকটা বৌদ্ধ অর্থেই গ্রহণ করিয়া থাকি। মোট কথা, আমাদের ধর্মানুভূতি ও জীবনাদর্শ-নির্ধারণে হিন্দু ও বৌদ্ধ চিন্তাধারা এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে, পরস্পরের সূক্ষ্ম ভাবতন্তুজাল এমন-

ভাবে টানা-পোড়েনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, আমাদের আচার-অনুষ্ঠান-পূজাবিধির মূলে উভয়বিধ ধর্মসংস্কারের এরূপ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে যে, আমরা কতটা হিন্দু ও কতটা বৌদ্ধ তাহার সীমানির্দেশ অত্যন্ত দুরূহ। আজ বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের আড়াই হাজার বৎসর পরে যে বুদ্ধপূজার প্রতি নূতন আগ্রহ জাগিয়াছে, বুদ্ধধর্মের বাণী ও অনুশাসনগুলিকে নূতন করিয়া অনুভব করিবার উপলক্ষ্য আসিয়াছে, আধুনিক রাষ্ট্রনীতির মধ্যে পঞ্চশীলের অবশ্য-পালনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার সুযোগ লইয়া বুদ্ধধর্মের সমগ্র ইতিহাস-আলোচনা ও হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে বৌদ্ধ উপাদানের অস্তিত্ব ও স্বরূপ নির্ণয় আমাদের বিশেষভাবে করণীয় বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধধর্মের ভাবপ্লাবন আজ বিলুপ্তির মহাসাগরে বিলীন হইয়াছে; ইহাকে ফিরাইয়া আনা সম্ভব নহে। কিন্তু বাংলা ও ভারতের মনোভূমিতে ইহা যে পলিমাটি রাখিয়া গিয়াছে তাহার সন্ধান লইলে আমরা যে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইব তাহা নিঃসন্দেহ।

বাংলা উপন্যাস

১৯০১-'২৫

(১)

কালস্রোত শতাব্দীর তটের বাঁকে মোড় ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই যে মানবের চিন্তাস্রোত অনুরূপ দিক্ পরিবর্তন করিবেই করিবে, এরূপ কোন অমোঘ বিধান নাই। তবে মানব-মন দীর্ঘকাল ধরিয়া ভাব ও ভাবনার নূতন নূতন উপাদান আত্মসাৎ করে ও নব-ভাবধারা-স্বীকৃতির ফলে উহার জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়নেরও একটা উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটে। এই পরিবর্তন-প্রস্তুতিকালের দীর্ঘতা ও গতিবেগ অনেক পরিমাণে পারিপার্শ্বিক বাতাবরণের উপর নির্ভর করে। কখনও বা গৃহীত বস্তুর স্বীকরণ, পরিপাক ও উৎকর্ষসাধনই প্রধান হইয়া দেখা দেয়; কখনও বা অস্থির, অশান্ত নব-পরীক্ষণের ছন্দ সাহিত্য-রূপরেখাকে মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনের দোলায় আন্দোলিত করে। কখনও যুগন্ধর প্রতিভার কেন্দ্র-শাসনে দৃঢ়-উপলব্ধ আদর্শ ও জীবনবোধের স্থির দীপ্তিতে সাহিত্যের সমস্ত শাখা দিগ্বিজয়ী সম্রাটের অধীনে করদ রাজ্যের ন্যায় শান্ত নিয়মানুবর্তিতায় শৃঙ্খলার মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলে। কখনও কখনও বা নূতনত্বের মোহ, অপরীক্ষিত সত্য ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ উদ্দাম হইয়া সৃষ্টির উৎকট মৌলিকতাকে অভিনন্দন জানায়। কোথাও বা ধীর-মন্থর বিবর্তন, কোথাও বা বৈপ্লবিক রূপান্তরের উগ্র উন্মাদনার প্রাধান্য অনুভূত হয়।

বিংশ শতকের প্রারম্ভিক পাদে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে কি জাতীয় পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস-ক্ষেত্রে একটা রাজ-পরিবর্তনের যুগ সূচিত হইয়াছে। উনবিংশ শতকের শেষে বঙ্কিম-যুগের অবসান ও বিংশ শতকের প্রারম্ভে রবীন্দ্র-যুগের অভ্যুদয়। কিন্তু এই রাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির চিন্তাধারায় ও জীবনায়নে যে দ্রুত রূপান্তর ঘটিতেছিল, তাহাও বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাবাদর্শ ও রসানুভূতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা

একটি বিশেষ জাতীয়তাবাদের আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সীমায়িত ছিল। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের যতটুকু ভাবধারা বাঙালীর জীবনের অবিকৃত রূপ ও চিরন্তন ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে, তিনি তত দূরই তাহার সীমা নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি বিদেশী প্রভাবে সম্পূর্ণ কক্ষচ্যুত, কেবল সর্বদেশ—সাধারণ মানবিকতার পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত, অদম্য প্রবৃত্তির তরঙ্গাভিঘাতে বিধ্বস্ত বাঙালী সমাজ ও পরিবার-জীবনের কথা ভাবিতে পারেন নাই। তিনি আশা করিতেন যে, ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পুষ্ট হইয়াও বাঙালী নিজ শাশ্বত নীতিবোধের মর্যাদা রক্ষা করিবে, হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির আদর্শ সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত হইয়া আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, নূতন বিপদ ও প্রলোভনের সম্মুখীন হইয়া প্রাচীন সমাজ নিজ অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির নব-পরিচয় দিতে পারিবে। তাঁহার সামাজিক উপন্যাসে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিদেশীয় ভাবাদর্শের কোন ছাপ দেখা যায় না। তাঁহার নগেন্দ্রনাথ বা গোবিন্দলাল ইংরেজী-ভাবাপন্ন নব্যযুবক নহেন। কোন নূতন আদর্শ-প্রতিষ্ঠার কৃচ্ছ্রসাধনও তাঁহাদের অসামাজিক প্রেমের দুরন্ত আকর্ষণের মূলে নাই। ইঁহাদের পদস্খলন ইঁহাদের অন্তরশায়ী রূপমোহেরই ফল। নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে বিবাহ করিবার ইচ্ছার সমর্থনে বিধবা-বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র কিন্তু বিধবার প্রতি সমবেদনা ইহার প্রেরণা জোগাইয়াছে কি না সন্দেহ। নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা ও ইহার ফলে সঞ্জাত মানসিক সূক্ষ্ম অতৃপ্তির প্রতীক নহেন। বরঞ্চ ইঁহারা প্রাচীন অভিজাতবর্গের বহু-বিবাহ-লোলুপ, অসংযত ভোগপ্রবৃত্তি ও স্বেচ্ছাচারেরই নিদর্শন।

এমন কি নূতন দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতবাদের সূত্রগুলিও বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বাঙালী জীবনাদর্শের অঙ্গীভূত করিবার উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন। কোঁতের ধ্রুববাদ (পজিটিভিজম্) গীতার নিষ্কামতত্ত্বের ন্যায় বাঙালী মেয়ে প্রফুল্লর মানস বিকাশে সহায়তা করিয়াছে। কোঁৎ তাহার দর্শনকে নিশ্চয়ই এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পরিবেশে চিনিতে পারিতেন না। পশ্চিমের দেশপ্রেম আনন্দমঠের বাঙালী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের ইষ্টসাধনা ও অধ্যাত্ম অনুশীলনের সঙ্গে নিশ্চিহ্নভাবে মিশিয়া গিয়াছে—'হরে মুরারে মধুকৈটভারে'র ভক্তিবিগলিত সুরে ও ছন্দে দেশোদ্ধারব্রতী তরবারি সঞ্চালিত

হইয়াছে। এ যেন কৃত্তিবাসের 'তরণীর কাটা মুণ্ড রাম রাম বলে'র আধুনিক রাজনৈতিক সংস্করণ। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার নিমচাঁদে ইংরেজী শিক্ষার যে রূপ আঁকিয়াছেন, তাহাতে প্রশংসার অলক্ষ্যপ্রায় ইঙ্গিতগুলি চরিত্র-কালিমার অতল গহ্বরে ডুবিয়া গিয়াছে। গিরিশ ঘোষ, অমৃত বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি নাট্যকারগণও ইংরেজী-শিক্ষিত নব্যযুবকের কিম্ভূতকিমাকার, উপহাসাস্পদ মূর্তিটিই তুলিয়া ধরিয়াছেন। মোট কথা, ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত আমাদের কথাসাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব যেভাবে দেখা দিয়াছে তাহাতে ইহা আমাদের জাতীয় জীবনাদর্শের প্রয়োজনানুযায়ী এক নিম্নস্থান অধিকার করিয়াছে। আমরা যে সত্যসত্যই একদিন বিদেশী জীবনযাত্রা, রীতি নীতি ও পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিব, উহার ভাব-পরিমণ্ডল ও চিন্তা-পটভূমিকা যে আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির অবলম্বনভূমি হইবে, বাঙালী সার্বজনীনতার মুখোস পরিয়া যে জীবনক্ষেত্রে বিচরণ করিবে, এ সম্ভাবনাও বোধ হয় ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মনে উদিত হয় নাই।

(২)

নূতন শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের প্রতি আমাদের মনোভাবকে আমূল পরিবর্তিত করিয়া দিল। এই আদর্শ নিজ অসংস্কৃত স্বরূপেই আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া উঠিল। বাঙালী জীবনে এত নূতন ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইল, এত নূতন রসধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল যে, প্রাচীন কাঠামোর মধ্যে তাহাদিগকে আর ধরিয়া রাখা গেল না। পশ্চিমের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি আর বাঙালী জীবনের ঐতিহ্যানুসারী না হইয়া উহাকেই গভীরভাবে রূপান্তরিত করিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও প্রবন্ধাদিতে ভারত-সংস্কৃতির বিশুদ্ধ রূপটি নিজ পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিশ্বসভ্যতার শ্রেষ্ঠ উপাদানের সহিত উহার কোন মৌলিক বিরোধ তিনি স্বীকার করেন নাই। ইউরোপীয় সভ্যতার পরস্বাপহারী ভোগবাদপ্রধান বিকৃতিকে তিনি ধিক্কার দিয়াছেন, কিন্তু ইহার প্রাণশক্তির লীলা, ইহার অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়, নূতন সত্য আবিষ্কারের পথে ইহার দুঃসাহসিক অভিযানকে তিনি শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বীকৃতিই জানাইয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসে কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জীবনছন্দ

আমাদের মধ্যে কত দৃঢ়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহারই নিদর্শন মিলে। তাঁহার প্রথম যুগের উপন্যাসেও রমেশ-কমলার মধ্যে ভ্রমাত্মক সম্পর্ক-জটিলতা, তাঁহার গোরা সুচরিতা ও বিনয়-ললিতার মধ্যে সামাজিক-বাধা-উল্লংঘী প্রণয়-সঞ্চার ও উহার শেষ পর্যন্ত মিলনান্ত পরিণতি এক নূতন রকমের সমাজ-চেতনার পরিচয় বহন করে। রবীন্দ্রনাথ ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, এই যৌবন-জলতরঙ্গ রোধ করা যাইবে না; সমাজজীবনে এই নূতন হৃদয়াবেগের আনন্দ-বেদনার ঢেউকে স্থান দিতেই হইবে। মহেন্দ্র-বিনোদিনীর বহুবিসর্পিত প্রণয়কলানুশীলনের পিছনে যে মনোভাব প্রকটিত, তাহাতে শাশ্বত সমাজ-নীতির অপেক্ষা ব্যক্তিগত কামনার উদ্দামতাই বেশী পরিস্ফুট। এই সমস্ত চরিত্র নবযুগের সৃষ্টি, ইহাদের স্নায়ুশিরায় যে প্রাণের বৈদ্যুতীশক্তি সঞ্চারিত, তাহার উৎস প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আদর্শের অচ্ছেদ্যভাবে মিলিত জীবনবোধ। অবশ্য এই বিক্ষুব্ধ কামনা-লোকের তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র উভয়েই ত্যাগ-বৈরাগ্য, প্রবৃত্তি-নিরোধের সনাতন মহিমা কীর্তন করিয়া তাঁহাদের উপর প্রাচ্য সংস্কারের প্রভাবের পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু মোটের উপর এই আত্মোৎসর্গে গরীয়ান উপসংহারের উপর তাঁহাদের গভীরতম সত্তানুভূতির সমর্থন নাই এ সন্দেহ একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সমস্ত উপন্যাস ধরিয়া ইঁদুর বিড়ালের খেলা খেলিয়া বিনোদিনী যে পরিশেষে ধ্যান-তন্ময়তার তুরীয়লোকে আত্মসংহরণ করিল, ইহাতে লেখকের অধ্যাত্ম-চেতনার যতটা পরিচয় আছে, চরিত্রের স্বরূপ-বর্ণনার ততটা নাই ইহা মনে করা অস্বাভাবিক নহে।

তাহার পর 'ঘরে-বাইরে' হইতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের যে নূতন পর্যায় আরম্ভ হইল তাহাতে বাঙালীর বিশিষ্ট পরিচয় সার্বভৌম মানবিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বেশ অনুভব করি যে, বাঙালীর জীবনছন্দ ধীরে ধীরে বিশ্ব জীবনের বৃহত্তর ছন্দের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে। বাঙালীর চেষ্টা-চিন্তা ক্রমশ ধর্মপ্রাণ ভক্তিবাদ ও প্রথানুগত্যের নিস্তরঙ্গ খাল অতিক্রম করিয়া ঝটিকাবিক্ষুব্ধ, তরঙ্গোচ্ছ্বাসমত্ত রাজনৈতিক চেতনা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহানদীতে প্রবেশোদ্যম করিয়াছে। এতদিন হৃদয়াবেগের যে গভীর স্তরের উপর শাস্ত্রানুশাসন ও সমাজ-নির্দেশের আবরণ ছিল, তাহা ছিন্ন

হইয়া সেখানে সমুদ্র-মন্থনের পালা শুরু হইয়াছে। এই অনবগুণ্ঠিত প্রবৃত্তির অবিরত ঘর্ষণে যে অমৃত-গরল উঠিয়াছে, সাহিত্য পাত্রে তাহাই পরিবেশিত হইতে চলিয়াছে। অভিজাত-কুলবধূ বিমলা যে ভঙ্গীতে আত্মবিশ্লেষণ করিয়াছে, নিজের মোহ ও মোহভঙ্গের যে কাহিনী বিবৃত করিয়াছে, তাহাতে বাঙালীর ঘরের ও মনের কথা এক অতলান্ত মহাসাগরের উর্মি-কোলাহলের মধ্যে চাপা পড়িয়াছে। আততায়ী বাহির হইতে আসিয়া ঘরকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে ও মনকে ঘরের সুরক্ষিত বেষ্টনী হইতে এক অজানা জগতের দিকে উধাও করিয়া দিয়াছে। সমস্যার তীক্ষ্ণতা বাংলার পারিবারিক শান্তিকে দংশন করিয়া উহার সমস্ত অঙ্গে বিষজালা ছড়াইয়াছে। তাহার রুচি, সমস্যা ও সমস্যা-সমাধানের প্রণালী, তাহার জীবনের কাম্য বস্তু ও সার্থকতাবোধ, তাহার অতৃপ্তি ও হাহাকার সমস্তই অভাবনীয়রূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিংশ শতকে পদার্পণ করিয়া বাংলা উপন্যাস জীবনের এক নূতন অধ্যায়-রচনায় মনোযোগী হইয়াছে।

এই আধুনিকতার সুর শরৎচন্দ্রে আসিয়া আরও সুপ্রতিষ্ঠিত ও মর্মভেদী হইয়াছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় শরৎচন্দ্র বাংলা পল্লীজীবনের বাহ্য কাঠামোটি আরও সত্যনিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার বৈপ্লবিক চরিত্রগুলিও, এমন কি সর্ব-আদর্শবর্জনকারিণী কমল পর্যন্ত কথায়-বার্তায়, ভাবে-ভঙ্গীতে বাঙালীসুলভ ভাবপ্রবণতা ও অন্তর সৌকুমার্যের পরিচয় দেয়। তাঁহার লৌহমানব সব্যসাচীর অন্তরেও স্নেহ ভালবাসার ফল্গুধারা প্রবাহিত—মনে হয় যেন তাঁহার মারণাস্ত্রের বিস্ফোরক শক্তি ভাবাবেগের গোলাপ-জলে সিক্ত। তাহার নাস্তিক, প্রবৃত্তিসর্বস্ব কিরণ-ময়ীতেও মনীষার অপরূপ দ্যুতির ফাঁকে ফাঁকে বাঙালী মেয়ের কোমল রমণীয়তা, গার্হস্থ্য ধর্ম ও আচারের কমনীয় প্রভাব দেখা দেয়। কিন্তু ইহারা বাঙালী জীবনে অপেক্ষাকৃত সুলভ বলিয়াই ইহাদের মনোভঙ্গীর নূতন ছন্দটি, জীবন-রস-পিপাসার নূতন আগ্রহটি আরও সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সমস্ত চরিত্র হইতে ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাঙালী জীবনের ভিত্তিভূমি সরিয়া গিয়াছে; ইহাদিগকে আর শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা, ইহাদের প্রতি শ্রেণীগত গুণ আরোপ করা চলিবে না। খুব সূক্ষ্ম তুলিকায় লঘু বর্ণ-প্রক্ষেপ, মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চঞ্চলতা ও ভাবের পৌনপুনিক আবর্তনের সাহায্যে

ইহাদের ব্যক্তিরহস্যটি অনুভব ও পরিস্ফুট করিতে হইবে। শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব এইখানেই যে, তিনি তাঁহার চরিত্রগুলিকে বাঙালী রাখিয়াই তাহাদের মধ্যে সার্বভৌমতার সুসঙ্গত প্রবর্তন করিয়াছেন—আধুনিক জীবনের সমস্যা-বিকীর্ণ পথে তাহাদের স্বচ্ছন্দবিচরণের ছাড়পত্র দিয়াছেন। উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত যাহা অভাবনীয় ছিল, বিংশ শতকের প্রারম্ভেই তাহা অনিবার্য হইয়া উঠিল। পরবর্তী ঔপন্যাসিকের হাতে এই আধুনিকতার মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে ও বাঙালীর গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন উহার সুসংহত ভাবসত্তা হারাইয়া প্রায় নিছক বস্তুগত পরিবেশ-রচনাতেই পর্যবসিত হইয়াছে।

(৩)

এইবার আমাদের আলোচ্য কাল-পরিধির মধ্যে উপন্যাস-রীতির কিরূপ অভিনব বৈচিত্র্য বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এই যুগে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৩) হইতে 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) পর্যন্ত উপন্যাসগুলি ও তাঁহার ছোট গল্পের একটা বৃহৎ অংশ লিখিত হইয়াছিল। যদিও রবীন্দ্র-রচনার মধ্যে উপন্যাসের নূতন প্রেরণা ও ক্রমবর্ধমান প্রসার রূপ পাইয়াছিল, তথাপি এখনও প্রাচীন ধরনের উপন্যাসের যথেষ্ট অনুশীলন হইতেছিল। ইহাদের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'রাজলক্ষ্মী' (১৯০২) হইতে প্রভাতকুমারের 'রমাসুন্দরী' (১৯০৭), 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২), 'রত্নদীপ' ও ছোট গল্পগুলি উপন্যাসের পূর্বতন রূপ ও প্রকৃতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব ও তাঁহার বিশিষ্ট গুণদ্যোতক উপন্যাসাবলীর রচনা এই যুগেই ঘটে। তাঁহার প্রতিভার যে মৌলিকতা ও জীবনবীক্ষণের যে বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি বাংলা উপন্যাসকে আধুনিকতার পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, সেই গুণগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ এই যুগের রচনার মধ্যেই উদাহৃত। বরং ইহার পরবর্তী যুগে তাঁহার প্রতিভার মধ্যে কিছুটা অবসাদের লক্ষণ ও পরিকল্পনার পুনরাবৃত্তি-প্রবণতা দেখা দিয়াছে। প্রমথ চৌধুরীর 'চারইয়ারী কথা' (১৯১৬) ও ছোট গল্প উপন্যাসের আঙ্গিক ও রচনারীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, ব্যঙ্গ-রসিকতার বাগ্‌বিভূতি ও epigram-এর তীক্ষ্ণতার প্রবর্তন করিয়াছে। অবশ্য এই অবান্তর-বাহুল্যে, তীক্ষ্ণধার মন্তব্যের প্রতি অতি-পক্ষপাতে ইহার

প্রকৃতিধর্ম যে খানিকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই সময় মহিলা ঔপন্যাসিকগণ তাঁহাদের বিশিষ্ট অনুভূতি ও জীবনালোচনাভঙ্গী লইয়া উপন্যাসক্ষেত্রে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। একদিকে নিরুপমা ও অনুরূপা দেবী প্রাচীন আদর্শ ও সংস্কৃতির, দ্রুত-বিলীয়মান পারিবারিক কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মানুরাগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, অন্য দিকে সীতা ও শান্তা দেবী আধুনিক যুগের জীবনসংগ্রামক্লিষ্ট ও অন্তরের শূন্যতা-পূরণের জন্য ভালবাসার আদান-প্রদানে উন্মুখ শিক্ষিত নারীর চিত্র আঁকিয়া নূতন যুগকে আহ্বান করিয়াছেন। পূর্ব যুগের মহিলা ঔপন্যাসিক—যথা, স্বর্ণকুমারী দেবী—ছিলেন বিস্ময়কর ব্যতিক্রম; এ যুগের লেখিকারা কিন্তু দল বাঁধিয়া পুরুষের সঙ্গে জীবনভাষ্য-রচনায় সমান অধিকারের দাবী করিয়াছেন। পরবর্তী যুগে মহিলা ঔপন্যাসিকের ধারা যেন অবিচ্ছিন্নতা হারাইয়াছে। যে কয়েকজন লেখিকা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একক স্বাতন্ত্র্য কোন গোষ্ঠী-বন্ধনের দ্বারা মিলিত হয় নাই। শিক্ষা-দীক্ষা, অধিকার-প্রয়োগের সাম্য ও জীবন-অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য নারী-রচয়িতার বিশিষ্ট স্বরটিকে অবলুপ্ত করিয়াছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেশ সেনগুপ্তের রচনায় পরবর্তী যুগের কিছুটা পূর্বাভাস মিলে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেকগুলি উপন্যাস বিদেশী ভাবের ছায়াবলম্বনে রচিত। অবশ্য বৈদেশিক আচার-ব্যবহার ও সংঘটনগুলিকে তিনি যথাসম্ভব বাঙালী জীবনের ছাঁচে ঢালিয়াছেন, তথাপি বৈদেশিকতার উগ্র গন্ধ সময় সময় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। নরেশ সেনগুপ্তের উপন্যাসে প্রধানতঃ যৌন অসংযম, দৈহিক সম্বন্ধ বিষয়ে স্বেচ্ছাচার-প্রবণতা ও অপরাধতত্ত্ব বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছে। এগুলি পাশ্চাত্ত্য দেশের সমাজ-শিথিলতা ও নর-নারীর মিলনে নীতিশাসন-হীন কৌতূহল ও পরীক্ষামূলক মনোভাব হইতে এদেশের মনোলোকে স্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাঙালী জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও চিত্তগহনের অলিতে-গলিতে সঞ্চরণ-প্রবণতা উদাহৃত হইয়াছে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কতকগুলি উপন্যাসও এই যুগের বাঙালী জীবনের দোলায়মান ছন্দটিকে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছে।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি হাস্যরস-প্রধান কাহিনী ও ছোট-

গল্প-সংগ্রহ—'চীনা যাত্রী' (১৯১৮), 'আমরা কি ও কে' (১৯২৭) ও 'কবুলতি' (১৯২৮) মোটামুটি এই যুগের মধ্যে পড়ে। তাঁহার পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসগুলি পরবর্তী যুগের রচনা। উপন্যাসে হাস্যরস ও ব্যঙ্গকৌতুক যে ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছে ও নানা বিচিত্র রসের উপাদানকে অঙ্গীভূত করিয়া উপন্যাস যে নূতন রূপে বিকশিত হইতেছে এই রচনাগুলি তাহারই নিদর্শন। চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনা-বিন্যাস অপেক্ষা নানা হাস্যকর অসঙ্গতি ও বাস্তবাশ্রিত উদ্ভট কল্পনার সাহায্যে কৌতুকরস-পরিবেশনই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরবর্তী যুগে রাজশেখর বসু ও শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ইহারই সূত্রানুসরণে। হাসির দীপ্তির নানা বিচিত্র ঝিলিক ইহাদের মেজাজ ও জীবনরসিকতার প্রকারভেদ-অনুযায়ী ইহাদের রচিত উপন্যাসের মধ্য দিয় বিকীর্ণ হইয়াছে।

( )

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ বাঙালী জীবন এবং তদনুসারী বাংলা উপন্যাসে এক বৈপ্লবিক রূপান্তরের সূচনা করিয়াছে। বাঙালীর মন এবং জীবনাদর্শ সমস্ত অতীত নিশ্চয়তাকে পিছনে ফেলিয়া এক বিরাট, সর্বব্যাপী পরীক্ষার অস্থির আবর্তে ঝাঁপ দিয়াছে। তাহার যৌথ পারিবারিক জীবন বহুমুখী ও সুনির্দিষ্ট কর্তব্যভারমুক্ত হইয়া, ঐতিহ্য-শাসনের শুভ ও অশুভ উভয়বিধ কলকে অতিক্রম করিয়া, ব্যক্তিগ খেয়াল ও নিঃসঙ্গ আত্মানুসন্ধানের পদ-চিহ্নহীন পথের যাত্রী হইয়াছে। তাহার সমাজ-জীবন পূর্বতন অখণ্ড সত্তা ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণাধিকার হারাইয়া, ব্যক্তির রুচি ও মর্জি অনুসারে স্বেচ্ছানির্বাচিত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে—আমোদের আড্ডা, সাহিত্য-সভা, ধর্ম-সম্প্রদায়-সম্মেলন প্রভৃতি স্বল্পায়তন সংস্থাই এখন বিষ্ণুচক্রবিচ্ছিন্ন সতীদেহের ন্যায় বহুবিভক্ত সমাজ-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। এই খান-খান হইয়া ভাঙ্গিয়া-পড়া সমাজে রাজনীতির ঝাঁঝাল প্রভাবই কেবল একটা নূতন সংগঠনের প্রেরণা যোগাইতেছে। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ রাজনৈতিক সমস্যা ও আন্দোলন সমগ্র মানবিকতার পরিবর্তে উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু হইয়া উঠিতেছে। মানুষের মূল্য এখন তাহার সুস্থ স্বাভাবিকতায় নহে, তাহার তীক্ষ্ণ-কোণ-বিশিষ্ট, একপেশে বিকৃতিতে তাহার মৌলিক বৃত্তিগুলির সহজ, সরল বিকাশে

নহে, তাহার অতিরঞ্জিত উৎকেন্দ্রিকতায়। এই বিশিষ্ট লক্ষণগুলি বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে আরও পরিস্ফুট পরিণতি লাভ করিয়াছে—শতকের প্রথম পাদে উহাদের প্রথম সূচনা মাত্র লক্ষিত হয়। মাণিক-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-অচিন্ত্যের যুগ এখনও পুরাপুরি আসিয়া পৌছায় নাই, তবে তাঁহাদের আবির্ভাবের পূর্বগামিনী ছায়া এখন হইতেই অনুভব করা যায়।

তবে যে যুগে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি রচিত হইয়াছিল, সে যুগে ইহার অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। এই সমৃদ্ধি উপন্যাসের কাব্যময়তায়, চরিত্র-রহস্য-উদ্‌ঘাটনে ও জীবন-সমস্যার মননশীল আলোচনায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ এই যুগ ছোটগল্পের রূপকল্প-নির্ধারণ ও ভাব-বৈচিত্র্য-সম্পাদনে গৌরবমণ্ডিত হইয়াছে। বঙ্কিম-যুগে ছোটগল্পের আঙ্গিক অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট ছিল—ইহা যেন উপন্যাসেরই একটা সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র। বিশেষতঃ বাঙালীর জীবনের ঘটনা-বিরলতা ও রসোচ্ছলতার সহিত ছোটগল্পের যে একটা আশ্চর্য রকমের সুসঙ্গতি আছে ইহা পূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদেরও কল্পনায় আসে নাই। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্র কথা-সাহিত্যের মধ্যে ছোট-গল্পকেই গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার পরের যুগে ছোট-গল্পের অভাবনীয় প্রসার ও রূপ-বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল বিংশ শতকের প্রারম্ভে। নারী ঔপন্যাসিকদের জীবন-সমীক্ষার বিশিষ্টতা ও রসানুভূতির সুকুমার সূক্ষ্মতা এই যুগেই সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই বিশিষ্ট সুরটি আর পরের যুগে সেরূপ স্পষ্টতার সহিত শোনা যায় না—নর-নারীর অধিকার-সাম্য-প্রতিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতার অভিন্নতার জন্য, যে জীবন-পরিবেশের যবনিকান্তরাল হইতে নারী-প্রকৃতির আত্ম-প্রকাশভীরু মাধুর্য আমাদিগকে দূর-শ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় মুগ্ধ করিত, তাহার রূপান্তরের ফলে, আজ উপন্যাসক্ষেত্রে একটা নির্বিশেষ কণ্ঠ-কাকলীই ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। জীবন-নদীতে সমস্যা-সঙ্কুলতার চড়া এই যুগেই প্রথম চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেশ সেনগুপ্তের রচনায় মাথা তুলিয়াছে, তবে পরের যুগেই এই চড়ার বালির উপর আগন্তুক মানুষের ভিড় জমিয়াছে ও ইহার চোরা ভিতের উপর আশ্চর্য শিল্পকলামণ্ডিত বড় বড় বাড়িও উঠিয়া পড়িয়াছে। প্রমথ চৌধুরী ও কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় উপাদান-

সাংকর্যে গঠিত বাঙালী জীবনের কৌতূকাবহ অসঙ্গতির ফাঁকে ফাঁকে হাসির ধারা প্রবাহিত হইয়াছে—নৈরাশ্যবাদ ও সমস্যার অতিরিক্ত চাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই এই হাস্যরস কোথাও বা করুণ, কোথাও বা উত্তরোল হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙালী চিত্ত যে এই জীবন-মন্থনের আতিশয্য ও বুদ্ধিবাদের অস্বস্তিকর পেষণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ও সহজ, সমস্যাহীন আদর্শবাদে ফিরিবার জন্য অন্তরে অন্তরে উৎকন্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার অপ্রত্যাশিত নিদর্শন মিলে তারাশঙ্কর ও বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে। ইঁহাদের দুইজনেরই আবির্ভাব ঘটে বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে; বিভূতিভূষণের যুগান্তকারী উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র রচনা কাল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ। ইঁহাদের আবির্ভাব অনেকটা আকস্মিক বলিয়াই মনে হয়। কেননা ১৯০০—১৯২৫ যুগের রচনায় ইঁহাদের কোন পূর্বাভাস আবিষ্কার করা দুরূহ। এই অতর্কিত আত্মপ্রকাশ এই সত্য প্রমাণ করে যে, বাঙালীর যুগ-যুগ-সঞ্চিত জীবন-সাধনা ও ধ্যানকল্পনার দিব্য দীপ আধুনিকতার ক্ষুব্ধ ফুৎকারে নির্বাপিত হইবার নহে, তাহার গভীর-অন্তরশায়ী অধ্যাত্ম আকূতি প্রতিকূল প্রভাবের বাধা অতিক্রম করিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিবেই করিবে। তারাশঙ্করের অতীতমুখী কল্পনা ক্ষয়জর্জর সামন্ততন্ত্রের যুগ-পরিবর্তনজনিত ব্যর্থতাবোধকে ভাষা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; ইহা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ও 'আরোগ্য-নিকেতন'-এ বাঙলার অধ্যাত্মতত্ত্বাশ্রয়ী সমাজচেতনার মর্ম-রহস্যটি উদ্ঘাটিত করিয়াছে। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'তে অতীত যুগের ভাব-কল্পনা ও জীবনবোধ বর্তমানের প্রকৃতি-প্রেম ও ইতিহাস-চেতনার দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া প্রাচীন সংস্কৃতির এক অভিনব রূপায়ন সাধিত করিয়াছে। এই জাতীয় রচনার মধ্যে বাংলা উপন্যাস পাশ্চাত্ত্য অনুসৃতির পথ ছাড়িয়া দেশের প্রাণ-সত্তার এক নিগূঢ় রহস্যলোকে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। পশ্চিমের ভাব-ধারাস্রোতে যে জাতি গা ভাসাইয়াছে, পাশ্চাত্ত্য ভাব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ যাহার একান্ত অভীষ্টরূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহার পক্ষে উহার শাশ্বত প্রাণকেন্দ্রে আকস্মিক প্রত্যাবর্তন শুধু যে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া কৌতূ-হলোদ্দীপক তাহা নহে, উহা ভবিষ্যতে অনেক অপ্রত্যাশিত বিকাশের জন্যও আমাদের প্রতীক্ষাকে উন্মুখ করিয়া রাখে।

শিশু-মনের রহস্য

(১)

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে শিশুর বিশেষ প্রাধান্য নাই। অবশ্য বৈষ্ণব ও শাক্ত গীতিকবিতায় বাৎসল্য-রসের মর্ম্মস্পর্শী চিত্র আছে, কিন্তু সেগুলিতে শিশুর ও অপত্যের প্রতি মাতার স্বাভাবিক স্নেহ উৎসারিত হইয়াছে, শিশু-মনের বিশেষত্বের কোন ছাপ নাই! বৈষ্ণব কবিতায় শ্রীকৃষ্ণের শৈশব দুরন্তপনায় যশোদার ব্যতিব্যস্তের ভাব, তাহার আবদার মিটাইতে ও খাওয়াইতে মায়ের আগ্রহ, কানাইকে গোষ্ঠে পাঠাইয়া তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য উৎকণ্ঠিত, শঙ্কা-ব্যাকুল প্রতীক্ষা, তাহাকে নিরাপদে রাখিবার জন্য সঙ্গীদিগকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ—এই সমস্তের মধ্য দিয়া মাতৃ-হৃদয়ের চিরন্তন স্নেহোদ্বেল প্রকাশটি স্মরণীয় কাব্যাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। শাক্ত কবিতায় বিবাহিতা দুহিতাকে লইয়া বিচ্ছেদ-কাতরা মাতার ক্ষোভ, অনুযোগ—অভিমান, অতন্দ্র কল্যাণ-কামনা ও স্নেহস্পর্শের অশান্ত লালসা আমাদের পারিবারিক জীবনের একটি মধুরতম অধ্যায়। কিন্তু এই সমস্ত গানের মধ্য দিয়া শিশুর মানস বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোন কৌতুকপূর্ণ অনুসন্ধিৎসা প্রকটিত হয় নাই। শিশু ভগবানের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপহার, সংসার-বৃক্ষের মিষ্টতম ফল, বাৎসল্য-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার প্রকৃষ্টতম উপায়, বুকে চাপিয়া ধরিয়া অজস্র স্নেহরসে অভিসিঞ্চিত করিবার জীবন্ত পুত্তলি—এই সাধারণ ধারণার উপরই এই কাব্য প্রতিষ্ঠিত। উহার কল্পনা-জগৎকে সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করিয়া উহার প্রকৃতি-রহস্যের মূল অনুসন্ধান করার দায়িত্ব সাহিত্যে বা জীবনে কোথাও স্বীকৃত হয় নাই। হয়ত বাস্তব জীবনের কোন কোন সূক্ষ্মদর্শিনী মাতা নিজ সন্তানের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি লাভ করিয়া ব্যবহার-ক্ষেত্রে উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন—দুরন্ত ছেলের দুষ্টামিকে কি করিয়া পারিবারিক সামঞ্জস্যের অনুগামী করা যায় তাহার কৌশলটি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতি-হিসাবে শিশুর স্বাতন্ত্র্যের

কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। শিশু যে কেবলমাত্র অপরিণত মানব নহে, সে যে সমধর্মী হইয়াও খানিকটা ভিন্নজাতীয় জীব এইরূপ সন্দেহ অতি অল্পদিন মাত্র আমাদের মনে ছায়াপাত করিয়াছে।

এই ধারণা বদ্ধমূল হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মুখের উপর মাতার স্নেহাবনত কোমল দৃষ্টিক্ষেপের সহিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সন্ধানী আলোক যুগপৎ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। শিশু আদরের সামগ্রী হইতে গবেষণার বিষয়ে উন্নীত হইয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে যে সত্যটুকু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। শিশু রহস্যময় প্রদেশ হইতে মানব-সমাজে অবতীর্ণ হয়, সেখান হইতে খানিকটা বিসদৃশ মনোভাব সঙ্গে লইয়া আসে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা আহরণ করিবার সময় এই মানস অসঙ্গতি কৌতুকজনক-রূপে প্রকাশ পায়—জীবন সম্বন্ধে যে দুই এক টুকরা খণ্ডতথ্য সে অর্জন করে তাহা তাহার মনে এক অদ্ভুত রকমের বিকৃতি ও অতিরঞ্জনের বাষ্পের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত হয়। সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যবোধ, সমগ্রতার অনুভূতি বহু বিলম্বে, নানা বাধা-বিঘ্নে প্রতিহত হইয়া তাহার মনে প্রতিভাত হয়। তাহার সমস্ত মন-জোড়া কল্পনা-বিলাসের মধ্যে খণ্ডিত, নিঃসম্পর্ক সত্যের উপলব্ধি দিগন্তব্যাপী কুহেলিকাজালের মধ্যে বিচ্ছিন্ন সূর্যরশ্মিবিকিরণের ন্যায় এক অদ্ভুত বিভ্রান্তকারী মানস পরিস্থিতি ব্যক্ত করে। সৌরকিরণ-বিদ্ধ বাষ্পরাশির মধ্যে যেমন শুভ্র দিবালোক ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণে বিশ্লিষ্ট হয়, তেমনি বাস্তবসত্য-স্পৃষ্ট শৈশব কল্পনা শতবর্ণে বিচ্ছুরিত হইয়া ময়ূরকলাপের শোভা ধারণ করে। বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতি এই তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীই শিশু-মনের বৈশিষ্ট্য। শিশু যেটুকু আহরণ করে সেটুকু আত্মসাৎ করিতে গিয়া ইহার অদ্ভুত রূপান্তর সাধন করে। বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ও সাম্যের মধ্যে বৈষম্য আবিষ্কার, পরস্পর-অসংলগ্ন তথ্যের যোগসাধন, কল্পনায় ও বাস্তবে মেশান সাংকর্য-সৃষ্টি-প্রবণতা, পরিমিতিবোধের একান্ত অভাব, সম্ভব-অসম্ভবের সীমানির্ধারণে অক্ষমতা—এই সমস্তই শিশুর মনের সংস্থিতির উপাদান ও তাহার বিবর্তনের অঙ্করেখা।

বয়স্কলোক শিশুচিত্তের যে ধারণা করে তাহাতে বাঁকা-চোরা খণ্ডিত অনুভূতি, সুষমাহীন বিশৃঙ্খলতারই প্রাধান্য। কিন্তু এই অভাবাত্মক পরিচয়ই

শিশু-মনের সত্য নির্দেশ নহে। শিশু বয়স্কদের সম্বন্ধে যে অভিমত পোষণ ও মাঝে মাঝে প্রকাশ করে তাহাতেও অনুরূপ বিহ্বলতা ও বিস্ময়ের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়েই উভয়ের চোখে দুর্বোধ্য প্রহেলিকা, কিন্তু শিশুচিত্তের একটা স্বভাবাত্মক পরিচয় আছে; ইহাতে কেবল শূন্যতার ফাঁক নাই, পূর্ণতার স্ববিরোধহীন সমাবেশ আছে, কেবল রিক্ততার বিরাম-চিহ্ন নাই, আছে ঐশ্বর্যের উচ্ছলতা। আমরা শিশুকে আমাদের সাংসারিক অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু শিশুর নিকটও যে আমাদের শিক্ষা করিবার আছে তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। শৈশব মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, শিশু স্বভাব-কবি। তাহার মন যে কল্পনা-বিলাসে মাতোয়ারা তাহা কবিত্বেরই সমধর্মী। বয়োবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শৈশব-কল্পনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। তাহার মনে যে অপরূপ আলোর রংমশাল জ্বলিতে থাকে তাহা ক্রমশঃ সাধারণ জ্ঞানের ধূসর দিবালোকে পর্যবসিত হয়। ইহাতে সংসারের কবি-কল্পনা-ভাণ্ডারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। সব ক্ষেত্রেই যে শিশু-গুটিপোকা হইতে কবি-প্রজাপতির উদ্ভব হয় তাহা অবশ্য ঠিক নহে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের আত্মজীবনকাহিনীতে যে শিশুর জয়গান গীত হইয়াছে, সে সাধারণ নিয়ম নহে, অসাধারণ ব্যতিক্রম। তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, শিশু-মনোভাব যদি সমাজে আরও ব্যাপকতা ও স্থায়িত্ব লাভ করিত তবে কবিত্ব-বিকাশের যে আরও অনুকূল প্রতিবেশ রচিত হইত তাহা নিঃসন্দেহ। যীশুখ্রীষ্ট শিশুদের জন্য স্বর্গ-রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত ঘোষণা করিয়া তাহাদের অধ্যাত্ম উৎকর্ষ প্রচার করিয়াছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শিশুকে আদর্শ দার্শনিক ও কবি আখ্যায় অভিহিত করিয়া বিশ্বরহস্যজ্ঞতার দিক দিয়াও তাহার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী উপস্থাপিত করিয়াছেন। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি হয় জীবন-রহস্য-ভেদ, তবে প্রাপ্তবয়স্কের সহিত তুলনায় শিশু প্রকৃত পথের পথিক।

(২)

আদর্শবাদীরা শিশুকে দেবদূতের নিকটতম আত্মীয় বলিয়া মনে করেন; আবার বৈজ্ঞানিক ও সমাজতত্ত্ববিদেরা তাহাকে বর্বরতার আদিম

পর্যায়ভুক্ত বিবেচনা করিয়া থাকেন। শেষোক্তদের মতে শিশু আধুনিক সভ্যসমাজে প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার প্রতীক—তাহাকে শিক্ষিত ও সংস্কৃত করিয়া যুগোপযোগী করিয়া লইতে হয়। ঐতিহাসিক বিবর্তন-ধারার সুদীর্ঘ যুগগুলি, ক্রমারোহণের প্রত্যেকটি স্তর প্রতি শিশুর জীবনে শৈশব হইতে কৈশোরে পরিণতির মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে পুনরাবৃত্ত হয়। হিংসা, দ্বন্দ্ব-প্রিয়তা, সংকীর্ণ, অনুদার, অসামাজিক মনোবৃত্তি—এই মানবশিশুর স্বভাব-ধর্ম। শৈশবক্রীড়ার কৌতূহলী দর্শকের নিকট এই সমস্ত অপকর্ষ সহজেই ধরা পড়ে। আবার তাহার ক্রীড়ার বিষয়গুলি বয়স্কদের বৈষয়িক কর্মপদ্ধতির একটু কল্পনার ছিটে-ফোঁটা-দেওয়া, অসঙ্গতি-স্পৃষ্ট অনুকরণ মাত্র। তাহার নিজস্ব মৌলিকতার বড় একটা পরিচয় মিলে না। ঘটনাগুলি সমস্তই সাংসারিক জীবন-যাত্রা হইতে আহরিত; তাহাদের সংযোগ-সূত্রটি কেবল তাহার বাস্তবনিয়মশৃঙ্খলার সহিত অপরিচিত কল্পনার অবদান। শিশু-চরিত্রের তথা-কথিত মাধুর্য কেবল তাহাদের বাস্তব অনভিজ্ঞতার মনোজ্ঞ অভিব্যক্তি মাত্র। কার্যকারণ-শৃঙ্খলার অমোঘ প্রভাবের অধীনতা-স্বীকারে মানবমন ভিতরে ভিতরে আত্মাবমাননার গ্লানি অনুভব করে; কাজেই শিশুর এই যে অধীনতাপাশ-মোচনের প্রয়াস ও এই প্রয়াসে প্রায় পূর্ণ সিদ্ধি তাহাকে শিশুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও তাহার শ্রেষ্ঠত্ব-আবিষ্কারে উন্মুখ করিয়া তোলে। ইহাই মানব-কাব্যে শৈশবের স্তবগীতি-রচনার মূল কারণ। স্বপ্নের স্বচ্ছন্দ বিহারের মত শিশুর স্বৈরাচারও নিয়মের অত্যাচার-পীড়িত মানুষের স্পৃহনীয়, সুতরাং বরণীয়। সুতরাং এই শ্রেণীর ভাবুকদের মতে শিশুকে লইয়া বাড়াবাড়ি উচ্ছ্বাসের কোন ন্যায়সঙ্গত হেতু নাই।

শিশু সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য যদি কোনদিন আবিষ্কার হয়, তবে সেটা হইবে এই উভয় প্রকার আতিশয্যের কোন মধ্যবর্তী মতবাদে। শিশু হয়ত দেবদূতও নয়, বর্বরও নয়। সে মানুষই বটে, অপরিণত ও মানুষের সাধারণ জীবনে অপ্রয়োজনীয় কিছু কিছু অসাধারণ-গুণ-সংবলিত। তাহার সম্বন্ধে আসল সমস্যা হইতেছে তাহার বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণ পরিণতির সুযোগ-প্রদান, কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার চাপে তাহার অসাধারণত্বকে পিষ্ট-দলিত না করা। সব শিশুকে সমাজ-প্রয়োজনের অনুরোধে এক ছাঁচে ঢালিতে গিয়া আমরা অনেকের ভবিষ্যৎ ও সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া ফেলি। এই অপচয়ে শেষ

পর্যন্ত সমাজের ক্ষতি, সমাজ-জীবনের বৈচিত্র্যহানি। সেইজন্য এখন শিশুর কল্পনা-বিলাসকে উচ্ছেদ না করিয়া উহার সুস্থ, পরিমিত বিকাশ-সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুমনের স্বাধীনতা ও উদ্দাম গতিবেগকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার সামাজিক বৃত্তির অনুশীলন সম্ভব কিনা তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। নায়াগ্রার জলপ্রপাতকে বিদ্যুৎ-শক্তি-উৎপাদনের কাজে লাগানতে সমাজের উপকার আছে তাহা অবিসংবাদিত; কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তির এই বিশিষ্ট-প্রণালীতে সঞ্চালনে একটা অস্বীকৃত ক্ষতির দিকও আছে। সেইরূপ শিশুকে কেজো নাগরিক করিয়া তোলা সমাজ-কল্যাণের পরিপোষক হইলেও ইহাতে ব্যক্তিত্ব-সম্ভাবনার তীক্ষ্ণতা কুণ্ঠিত হইয়া সমাজকে কেবল গড়-পড়তার সমষ্টি করিয়া তোলে। এই বিষয়ে গবেষণা এই পর্যন্ত বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া দাবী করা যায় না—শিশুর জন্য যে প্রণালীর শিক্ষাই অবলম্বিত হউক না কেন, সমাজের কেন্দ্রানুগ শক্তির প্রবল আকর্ষণ প্রায় অপ্রতিরোধনীয়। হয়ত ভবিষ্যতে কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ শক্তির মধ্যে অধিকতর শোভন সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তখন হয়ত শিশুর মধ্যে যে দুর্বার বন্য প্রাণশক্তি সুপ্ত আছে তাহা সমাজ-জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া তাহার গতিবেগ ও অগ্রসর-প্রবণতাকে বর্ধিত করিবে। শিশুর মধ্যে এই সম্ভাবনা নিহিত আছে বলিয়াই সে কেবল পিতামাতার স্নেহদুলাল নহে, ভবিষ্যৎ যুগের অপ্রত্যাশিত বিবর্তনের পথিকৃৎ ও প্রেরণাশক্তি।

আধুনিক শিশুসাহিত্য

(১)

মানবের বাঁধা-ধরা জীবনে শিশুই নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময়, অজ্ঞাত প্রহেলিকা। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই মানবের আদিম জীবন খানিকটা পুনরাবৃত্ত হয়। সূতিকাগৃহে জন্মগ্রহণের সঙ্গেই শিশু প্রাগৈতিহাসিক যুগের খানিকটা রহস্যঘেরা অন্ধকার সূর্যালোকিত আধুনিক যুগে বহন করিয়া আনে। বর্তমান যুগে ভূমিষ্ঠ

শিশুর সঙ্গে মানব সভ্যতার প্রারম্ভজাত শিশুর কিছু সাধারণ সাদৃশ্য-লক্ষণ আছে। বয়স্থ মানুষে মানুষে কত পার্থক্য, কিন্তু পুরাযুগের শিশুর সঙ্গে বিংশ শতকের শিশুর অতি নিকট আত্মীয়তা। সদ্যোজাত শিশুর জন্মমুহূর্তে যে আবহ তাহাকে বেষ্টন করে তাহার উপর মানব প্রগতির প্রভাব খুব অল্প। যে রহস্যময় জগতের বার্তা সে আনে, সেখানে হাজার হাজার বৎসরের বিবর্তন বিশেষ কোন রেখাপাত করে না। কাজেই শিশুর সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয় হইল এই যে, বর্তমানেও যে সুদূর, অনধিগম্য অতীতের চিহ্নাঙ্কিত; তাহার মধ্যে বহুদিন পূর্বে বিলুপ্ত অতীত ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হইয়া মানব-জীবন সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা-লব্ধ ধারণা, যে বৈজ্ঞানিক বোধের অহমিকা তাহা বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে কত সামান্য, উহার মূল রহস্য যে আমাদের বোধ-শক্তিকে ছাড়াইয়া কোনও অজ্ঞাত ভাব-রাজ্যে প্রসারিত, প্রত্যেক নবজাত শিশুই তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য।

কিন্তু শিশুর চিত্তে এই যে বিস্ময়-বোধ তাহা অল্পদিনের মধ্যেই মানব-সমাজের সাহচর্যে ফিকে হইয়া আসে। প্রতিবেশ-প্রভাব তাহার মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া জন্মপূর্বের রহস্যকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। তাহার চোখের গভীর অবোধ জিজ্ঞাসা, নূতন জগতে তাহার যে অপরিচয়ের বিভ্রান্তি তাহা কিছুদিনের মধ্যেই পরিচিতির নিশ্চয়তায় শান্ত হইয়া আসে। সে যে পরিমাণে বর্তমানকে চেনে ও ভবিষ্যতের কল্পনা করে, সেই পরিমাণে অতীত তাহার দূরবর্তী হইয়া যায়। যে ওপারের আলো তাহার বিস্ময়-স্ফারিত চোখে ঝিলিক দিত, যে স্বপ্নাবেশ তাহাকে দৃশ্য জগতের প্রতি উদাসীন ও অন্যমনস্ক করিত, যে অস্ফুট ধ্বনি ও মানবের কাব্য-রচনায় অজ্ঞাত ছন্দ তাহার ভাব-রহস্য-প্রকাশের আকৃতি বুঝাইত, তাহা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া পরিচিত আবেষ্টনের প্রতিচ্ছবিই তাহার ইন্দ্রিয়গ্রামে আভাসিত হইতে থাকে। তাহার কৌতূহল তীক্ষ্ণ থাকে, কিন্তু উহা তাহার নূতন সংসারকে চিনিয়া লইবার আগ্রহেরই নিদর্শন।

তাহার অসংখ্য প্রশ্নবাণ স্থূল বস্তু-জগতের সপ্ততাল ভেদ করিবার উদ্দেশ্যেই নিক্ষিপ্ত হয়। সময় সময় তাহার কোন কোন জিজ্ঞাসা মানবের সুপ্রচলিত ব্যবহারিক সত্যকে উপহাস করে, তাহার বিচারের নির্ধারিত মানদণ্ডের অপূর্ণতা কৌতুকাবহরূপে প্রকটিত করে। কিন্তু মোটের উপর এই সমস্ত

ছটফটানি হাঁড়ির চাল সিদ্ধ হইবার পূর্বে বুদ্‌বুদ্‌-উচ্ছ্বাসের মতই তাহার রূপান্তরের সূচনা। যে নিয়মে হাঁড়ির একটি ভাত টিপিলেই সমস্ত অন্নরাশির অন্তর-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়, শিশু সেই নিয়মের বাঁধনেই ধরা পড়িয়া লক্ষ-কোটি মানুষের একতম হইতে চলিয়াছে। তাহার সমস্ত কায়িক, বাচনিক ও মানসিক প্রচেষ্টা নিজের রহস্যের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া, বাহিরের রহস্য-উন্মোচনে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে। ফল হয় এই যে, মানুষ শিশুকে চিনিতে শিখিল না, শিশু মানুষকে চিনিয়া ফেলিল। শিশু ও বয়স্থ মানবের এই প্রাথমিক দ্বন্দ্ব এইরূপ একটা একতরফা মীমাংসার অবসান লাভ করিল।

শিশুচিত্তের এই পরিবর্তন-প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করিবার জন্যই আধুনিক শিশু-সাহিত্যের উদ্ভব। মুক্ত শিশু আত্মাকে যখন বয়স্ক সাংসারিকতার খাঁচায় আবদ্ধ হইতেই হইবে, তখন বুলিটা যত শীঘ্র আয়ত্ত করা যায় ততই ভাল। হাঁড়িতে সিদ্ধ ভাতের পদবীতে যাহার উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী, উনুনের জ্বালটা তাহার জন্য খরতর করাই বিধেয়। এই শিশু-সাহিত্যে শিশুকে জ্ঞান-পরিবেশনের নানা উপায়—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—অবলম্বিত হইয়াছে। শিশু-মনের অসম, অনির্ধারিত ছন্দ যাহাতে বয়স্ক চিত্তের মাপা-জোকা, ছক-কাটা গতির ঋজুতার সঙ্গে নিশ্চিহ্নভাবে মিশিয়া যায়, তাহার জন্য সুকৌশলে কত মোড় ফেরার না ব্যবস্থা রহিয়াছে! শিশুর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া, তাহার সামনে একটা-আধটা, অনিয়ন্ত্রিত আকাশ-বিহারের ছদ্ম মানচিত্র প্রসারিত করিয়া, তাহাকে জ্ঞান-রাজ্যের হাওয়া-অফিসগুলিতে পর্যায়ক্রমে নামাইবার গোপন ষড়যন্ত্র ইহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। শিশু রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার খোঁজে বাহির হইল, কত নদ-নদী, সমুদ্র-পর্বত উত্তীর্ণ হইয়া তাহার মনোরথে উড়িয়া চলিল, কত রাক্ষস-খোক্কস, জীন-পরীর মায়াজালে ক্ষণিকের জন্য জড়িত হইয়া পড়িল, কিন্তু শেষে যখন সে রাজকন্যাকে লাভ করিয়া ঘরে ফিরিল, তখন দেখা গেল রাজকন্যার সঙ্গে যৌতুক-স্বরূপ সে কতকগুলি ব্যবহারিক জগতের নীতিসত্যও আহরণ করিয়া ফিরিয়াছে। মেকী-ভ্রমণের লোভ দেখাইয়া তাহাকে স্থিতিশীল জীবনের সহিত পরিচিত করার ফন্দি-ফিকিরের ফাঁদে পা দেওয়ান হইল—ঘরের কাছের অভিজ্ঞতাগুলি কল্পনা-বিহারের সুদূর-মোহমণ্ডিত হইয়া তাহার মনে স্থানলাভ করিল,

সংসার-বৃক্ষের পাকা ফলগুলি হীরা-মণি-মাণিক্যের দ্যুতিতে আত্মগোপন করিয়া তাহার রসনায় স্বাদু হইয়া উঠিল। কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়া স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ঘুরিয়া তাহাকে শেষ পর্যন্ত পরিচিত জীবনের অঙ্গনেই আনিয়া হাজির করিল। জ্ঞানের তিক্ত বটিকা কল্পনার শর্করাবৃত করিয়া তাহাকে গলাধঃকরণ করান হইল।

অবশ্য শিশুর জন্ম মানবিক পরিণতি লাভের জন্যই। সে চিরকাল শিশু থাকিতে পারে না, শিশু থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়। জ্ঞানার্জন তাহাকে করিতেই হইবে এবং ইহারই মাপকাঠিতে শুধু ব্যক্তিগতভাবে তাহারই নয়, তাহার সমগ্র জাতিরই বিচার হইবে। যে দেশের শিশু যতটা তথ্যপুষ্ট, যতটা জানিবার জন্য আগ্রহশীল, পৃথিবী ও মানব-জীবনের সহিত পরিচয়ের পথে যতটা অগ্রসর হইয়াছে, সেই দেশই এই প্রতিযোগিতার যুগে ততই উন্নত ও প্রগতিশীল হইবে। কাজেই শিশু-শিক্ষার আয়োজন যত ব্যাপক ও বিচিত্র হয়, তাহার মুখের স্বাদ নষ্ট না করিয়া তাহার পাকস্থলীতে যতটা পুষ্টিকর খাদ্য প্যাক করা চলে, তাহার জিজ্ঞাসা ও জ্ঞানস্পৃহা যত বহুমুখী হয়, ততই ভাল। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার ফলে তাহার কল্পনা-শক্তি উহার সজীবতা ও স্বচ্ছন্দতা অনেকটা হারাইয়া ফেলে। কল্পনার সঙ্গে জ্ঞানের রাসায়নিক সংযোগ ঠিক কল্পনার পক্ষে অনুকূল হয় না।

বিশেষতঃ শিশু-কল্পনা বিশেষভাবে প্রতিবেশ ও স্নেহশীল সাহচর্যের উপর নির্ভরশীল। এই কল্পনার উন্মেষ ও বিকাশের জন্য চাই পল্লী-প্রতিবেশের স্নিগ্ধ স্পর্শ ও উদার বিস্তার এবং মা-ঠাকুরমার স্নেহসিক্ত কণ্ঠস্বর ও সহানুভূতি। ছাপার হরফে ও শহরের প্রতিবেশে রূপকথার মায়াবরণ এত পাতলা হইয়া যায় যে, উহার পিছন হইতে যুক্তিবাদ ও তথ্যনিষ্ঠার কঙ্কাল উঁকি মারে। শিশু-শ্রোতার মনে রোমাঞ্চ জাগাইতে হইলে শুধু শব্দ ও তাহার আক্ষরিক অর্থ যথেষ্ট নহে—চাই অর্থের পিছনে অনির্দিষ্টের ব্যঞ্জনা, চাই কণ্ঠস্বরের ভাব-দ্যোতনা, চাই অন্ধকারের ইন্দ্রজাল ও বর্ষার বস্তুকে-আড়াল-করা অনুভূতি-নিবিড়তা। শিশু-যদি শিশুপাঠ্য পত্রিকার সম্পাদককে ঠাকুরমার স্থলাভিষিক্ত কল্পনা করিতে পারে তবেই সে তাহার প্রত্যক্ষ পরিবেশকে ভুলিয়া মায়া-কাননে প্রবেশ করিবে।

(২)

আধুনিক যুগের শিশুর সঙ্গে অতীত যুগের শিশুর কোন মনোভঙ্গীগত পার্থক্য আছে কি না, তাহাও জিজ্ঞাসার বিষয়। শিশু-মন সমাজকে চিনিবার আগেই যে অদৃশ্য বায়ুমণ্ডল সমাজকে ঘিরিয়া আছে, তাহার প্রবাহ অজ্ঞাতসারে নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানিয়া লয়। যে সমাজে মোহ যত নিবিড়, রহস্যের অনুভূতি যত প্রখর, সে-সমাজের শিশুও ততটা কল্পনা-বিভোর। কেমন করিয়া জানি না, পরিবারের মেয়েদের চাপা ফিসফিসানি, অসম্ভব-প্রত্যাশী মন, ভৌতিক আবির্ভাব সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত সাবধানতা শিশুচিত্তে একটা অনুরূপ আতঙ্ক-শিহরণ জাগায়। এই প্রতিবেশে শিশুর মনের উপর রহস্যের কুহেলিকা স্বতঃই ঘন হইয়া আসে। অতি স্বল্প উপকরণেই তাহার খেলাঘর নির্মিত হয়। বিজ্ঞান-শাসিত বর্তমানকালে সমাজ হইতে শিশু বিশেষ কল্পনার যোগান পায় না। সমগ্র জীবন যেখানে রূপকথা-ধর্মী, সেখানে রূপকথা-রোমাঞ্চ শিশুকে যেরূপ অভিভূত করে, জানা-সত্যের চারি-দেওয়ালে আঁটা জীবনে রূপকথার রূপটা মুছিয়া গিয়া কথাটাই যাহা কিছু বড় হইয়া উঠে। এখন অনুসন্ধিৎসাই আমাদের প্রবলতম প্রবৃত্তি। সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে যে কল্পনা-বিলাস জড়িত ছিল, এখন তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া সৌরজগতের ভৌগোলিক সংস্থান ও দূরত্ব-নির্ণয় সম্বন্ধে খাঁটি খবরকেই অভ্যর্থিত করা হইতেছে। বৈজ্ঞানিক যুগের কোন স্ফুটবাক শিশু সূর্য-চন্দ্রের সঙ্গে মাতুল সম্পর্ক পাতাইবার বিরাট অজ্ঞতাকে স্বীকার করিবে না। কোন মাতা যদি দুর্বল, স্নেহ-বিগলিত মুহূর্তে এরূপ অবাস্তব কল্পনার প্রশ্রয় দেন, তবে তিনিও পরমুহূর্তেই জিব কাটিয়া তাঁহার উক্তির প্রত্যাহার করিবেন ও ছেলেকে বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠায় দীক্ষিত করিবেন। তখনকার খেলাঘর পাতার কুটির ছিল। এখন সেখানে পাকা ইমারত বানাইবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার মাল-মসলা-উপকরণ সংগ্রহ করিতে ইতিহাস, ভূগোল, নবতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতির নিকট অঞ্জলি পাতা হইতেছে। শিশু যাহাতে জগৎকে সত্য করিয়া চেনে, যাহাতে কোন রন্ধ্রপথ দিয়া ভ্রান্তির কোন কুহক তাহার মনে প্রবেশ করিতে না পারে, যাহাতে সে তাড়াতাড়ি কাজের মানুষ ও তথ্য-সংগ্রহে পণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে তাহার জন্য কি সতর্কতা ও শ্রম-স্বীকার! এ যেন ভুল কল্পনার সর্পদংশন হইতে তাহাকে বাঁচাইবার

জন্য বৈজ্ঞানিক চাঁদ সদাগরের লোহার নিশ্ছিদ্র বাসর নির্মাণ। শিশুর স্বল্প-স্থায়ী শৈশবকাল অকাল প্রৌঢ়ত্বের অভিমানে যেন আরও শীর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে।

শেষে আর একটি প্রশ্ন তুলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দেশ-বিভাগের পর বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম খণ্ডে যে-সমস্ত শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহারা এক খণ্ডিত উত্তরাধিকার লইয়াই জীবন আরম্ভ করিতেছে। ইহারা যেন মাতার এক স্তনের দুগ্ধে পুষ্ট, এক হাতের আদরে লালিত। সমগ্র বাংলাদেশের রূপকথার লৌকিক কাহিনী, প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাস, বহু প্রাচীন যুগ হইতে আগত কিংবদন্তী, ছড়া, গান, গণগীতি প্রভৃতি মিলিয়া যে একটি অখণ্ড রসভাণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা বর্তমান শিশুদের ভাগ্যদোষে দু'খণ্ডে ভাগ হইয়া গিয়াছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে বৈচিত্র্যের মধ্যে যে অখণ্ডতা ছিল তাহার পূর্ণভাবে গ্রহণ ও উপভোগের সৌভাগ্য হইতে আধুনিক শিশু বঞ্চিত। পশ্চিমবঙ্গের কোন ছেলে পদ্মার উন্মত্ত তরঙ্গবেগ, উহার দিগন্ত-বিস্তৃত বালুচর ও কাশবন, সুন্দরবনের রহস্যময় অরণ্য-পরিবেশ, দুর্গম হাউর-ঝিলের নির্জনতা এবং ইহাদের মধ্যে স্বতঃউদ্ভূত আদিম কল্পনার উন্মেষগুলির পরিচয়লাভের সুযোগ পাইবে না। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গের শিশুরা রাঢ় অঞ্চলের কঙ্করময়, শুষ্ক গেরুয়া রঙের মাটি, ইহার শালবন ও রৌদ্রতপ্ত খাঁ খাঁ প্রান্তরের মধ্যে যে অতিপ্রাকৃত কল্পনা রূপ পরিগ্রহ করে তাহার প্রেরণা অন্তরে অনুভব করিতে পারিবে না। সুতরাং উভয়ত্রই শিশু-কল্পনা অতৃপ্ত ও অপরিণত থাকিয়া যাইবে। আউল-বাউল-ফকিরের গান, সারি গান, সত্যনারায়ণের পাঁচালি, কেচ্ছা-কাহিনী প্রভৃতি লোক-সাহিত্যের যে বিভিন্ন অঙ্গ শিশু-কল্পনারই পরিণত সংস্করণ সেগুলিও এখন লুপ্ত হইয়া যাইবে। জনসাধারণের মানস সরসতা ও সৃষ্টি-প্রেরণা আর নূতন বিকাশের পথ খুঁজিয়া পাইবে না। আজকাল ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, বন ধ্বংস হইলে বর্ষণও কমিয়া যায়—বনানীর যে ঘনশ্যাম নিবিড়তা মর্ত্য মেঘের প্রতিরূপ তাহা আকাশের মেঘকে আকর্ষণ করিয়া প্রচুর বৃষ্টিধারা নামাইয়া আনে। সেইরূপ কোন সমাজে সুস্থ ও সবল শিশু-কল্পনার প্রাদুর্ভাব জনসাধারণের চিত্তে একটি স্নিগ্ধ-সজল মায়া সংক্রামিত করিয়া গণমানসের সুকুমার বিকাশের পটভূমিকা রচনা করে। কাজেই শিশুর অকালপকতা কেবল

যে শিশুরই ক্ষতি করে তাহা নয়, বয়স্ক চিত্তের উপরও ইহার একটা অবাঞ্ছিত প্রভাব আছে। তথ্যব্যূহ হইতে নিষ্ক্রমণের মন্ত্র আয়ত্ত না করিয়াই উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে শিশু-অভিমন্যুর শোচনীয় অপমৃত্যু না ঘটুক সে চিরজীবনই বাস্তবের গোলক-ধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া মরিতে বাধ্য হয়।

যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন যে স্বর্গরাজ্য শিশুদের। তাঁহার এই উক্তিকে আরও একটু সম্প্রসারিত করিয়া বলা চলে যে, সাহিত্যরাজ্যও শিশু-সুলভ মানস প্রবণতার উপর নির্ভরশীল। তাই শিশুর হৃত স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করিলে শুধু শিশুই যে আনন্দলোকে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা নয়, সমগ্র জাতীয় শিল্প-সাহিত্যই রসোচ্ছল ও আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

নবযুগের বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সূচনা

(১)

বিংশ শতকের প্রথম পাদের সহিত দ্বিতীয় পাদের তুলনামূলক আলোচনা করিলে বাংলা-সাহিত্য মোটের উপর অগ্রগামী কি পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, তাহা নির্ধারণ করা একটু দুরূহ হইয়া পড়ে। অবশ্য এই হিসাব-নিকাশ হইতে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিতে হইবে। তাঁহার বিরাট প্রতিভা শতাব্দীর উভয় পাদকেই তুল্যরূপে অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান, তাঁহার পক্ষচ্ছায়া উভয়ের উপরেই সমভাবে প্রসারিত। তথাপি মনে হয়, তাঁহার দৃষ্টির সরসতা ও সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকাশ পূর্ব যুগেরই সহিত সংশ্লিষ্ট। বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হইবার পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র লোকান্তরিত হইয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার প্রভাব ও প্রেরণা সাহিত্যের সর্ব বিভাগেই প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল। প্রথম শ্রেণীর কবিদের মধ্যে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তাঁহাদের সৃষ্টিশক্তির চরম উৎকর্ষ নূতন শতাব্দী

আরম্ভ হইবার পূর্বেই লাভ করিয়াছিলেন; এবং রবীন্দ্রনাথের ক্রমশঃ বর্ধমান একাধিপত্যে কাব্যের উপর ইঁহাদের প্রভাব লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। অধুনা খ্যাতনামা অনেক জীবিত কবি শতকের প্রথম পাদেই নিজ নিজ কবিত্ব-শক্তির অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিলেন ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-অর্জনের পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও নব-জাগরণের যুগের প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা তখনও নিঃশেষিত হয় নাই। পাণ্ডিত্য ও গবেষণা বিশেষজ্ঞতার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না হইয়া সৃজন-ধর্মী সাহিত্যের মর্যাদা ও প্রাণশক্তির প্রতি অভীপ্সাশীল ছিল। জীবন-চরিত, সমালোচনা, ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উল্লেখ-যোগ্য উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সমস্ত সাহিত্য-ক্ষেত্রের উপর এক উচ্চ আদর্শবাদ ও সুবৃহৎ পরিকল্পনার বৈদ্যুতীশক্তি পরিব্যাপ্ত ছিল।

মোটের উপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ একটি সম্প্রসারণের যুগ। ইহার প্রকৃতি বুঝিতে হইলে আমাদিগকে আরও পিছু হটিয়া উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, বাংলা সাহিত্যের নব-জাগরণের সূচনা পর্যন্ত যাইতে হইবে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর প্রকাশ হইতেই এই নব যুগের আরম্ভ। তৎপূর্বে প্রস্তুতির উদ্যম, জ্ঞান-বিজ্ঞান-আহরণের পর্যাপ্ত আয়োজন, বিদেশী ভাবধারার আত্মসাৎকরণের প্রচেষ্টা পূর্ণবেগে চলিয়াছিল, কিন্তু ইহার ফলে মৌলিক সৃষ্টিশক্তির বিকাশ হয় নাই। সংস্কৃতির ভাণ্ডার অর্জিত দ্রব্য-সম্ভারে পূর্ণ হইতেছিল, কিন্তু ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা-মূর্তিতে তখনও প্রকট হন নাই। 'পদ্মিনী-উপাখ্যান'-এই এই দেবীর প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারপর তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, দীনবন্ধুর নাটক ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী, বিহারীলালের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা, সমস্তই যেন বাণীর আসন-শতদলের এক একটি রক্তিম পাপড়ির রসে ও গন্ধে পূর্ণবিকশিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

এই সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হইতেছে বিদেশের অন্ধ আক্ষরিক অনুকরণ নহে, বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রাণশক্তির সন্ধান পাইয়া স্বদেশীয় ভাবধারা ও বিষয়-বস্তুর মধ্যে উহার প্রতিষ্ঠা। এ যেন বিদেশীর বাগানে শুধু পুষ্পচয়ন বা সেখান হইতে চারা আনিয়া নিজের উদ্যানে রোপণ নহে, এ যেন নবোন্মেষের পরাগ-পূর্ণ বসন্ত-পবনের মধ্যে দক্ষিণের

যে রহস্যপূর্ণ মন্ত্র-গুঞ্জরণ ধ্বনিত হয়, তাহার গোপন ছন্দটি আয়ত্ত করার প্রয়াস। 'পদ্মিনী'র উপর স্কট ও বাইরণের পদ্য-আখ্যায়িকার প্রভাব অনুভূত হয়। কিন্তু ইহা কোন পাশ্চাত্ত্য কবির অনুকৃতি মাত্র নহে। যে স্বদেশপ্রীতি, দৃপ্তশক্তির আদর্শীভূত ক্ষাত্র শৌর্য ও দুঃসাহসিকতার আকর্ষণ স্কট ও বাইরণের কাব্যের প্রেরণা, রঙ্গলাল তাহাকেই স্বাধীনভাবে, দেশীয় রীতি-নীতি ও আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, রাজপুত-ইতিহাসের এক মহিমান্বিত কাহিনীর উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। বহুশতাব্দীব্যাপী প্রথানুগত্যের প্রভাব, ভারতচন্দ্রে মঙ্গলকাব্যের কপট অনুসরণ, ঈশ্বরগুপ্তের উন্নত-ভাবাবেগ-বিরোধী শ্লেষ-কটাক্ষ, কবিওয়ালাদের প্রেমের আদর্শকে মুখ-ভ্যাংচানো রুচি-বিকৃতি—এই জাতীয় ঊষর, কণ্টকাকীর্ণ উত্তরাধিকারকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়া রঙ্গলাল যে নূতন পথে পদক্ষেপ করিলেন, সেই পথ ধরিয়াই দেখিতে দেখিতে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের জয়যাত্রা-সমারোহ জমিয়া উঠিল। রঙ্গলালের প্রতিভার পরিমাপ ও বিশুদ্ধি হয়তো প্রথম শ্রেণীর কবির উপযুক্ত নহে, কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও সম্ভাবনা অনস্বীকার্য।

সে যুগের সমস্ত সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মধ্যেই এই প্রবণতার স্ফুরণ দেখা যায়। লেখকদের মধ্যে মধুসূদন বিজাতীয়ভাবাপন্ন বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন—তাঁহার 'মেঘনাদবধ'-এ সনাতন আদর্শের বিকৃতি, রাম-লক্ষ্মণের চারিত্রিক পরিকল্পনায় নিম্নগামিতা প্রতিকূল মন্তব্যের বিষয় হইয়াছে। তথাপি মোটের উপর তিনি যে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাহা তাঁহার আখ্যায়িকার উদ্দেশ্যে, এমন কি উপমা-নির্বাচন ও খণ্ড কাহিনীর সশ্রদ্ধ উল্লেখ ও বিবৃতিতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। মহাকাব্য-রচনায় রাম-লক্ষ্মণের প্রতি যে তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল তাহা নহে; তবে তাঁহার প্রধান প্রেরণা ছিল তাঁহাদের অলৌকিক মাহাত্ম্যের গুণকীর্তনে বা ভক্তি-প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় নহে, যে দেশাত্মবোধ প্রবল প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে আসন্ন অপ্রতিবিধেয় পরাভবের ও আত্মীয়-বিয়োগের নৈরাশ্যপূর্ণ, শোক-জীর্ণ প্রতিবেশে অক্ষুণ্ণ মহিমায় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারই অভিনন্দনে। এই নবলব্ধ, তীব্রভাবে অনুভূত দেশাত্মবোধই তাঁহাকে রাবণ ও মেঘনাদের প্রতি সমবেদনা-সম্পন্ন ও পক্ষপাতী করিয়াছিল। রাম-লক্ষ্মণের আদর্শ-মাহাত্ম্য

ও অসাধারণত্ব সহস্র বৎসরের অনুচিকীর্ষায়, শত শত ভক্তকবির স্তব-স্তুতির বহুধা-আবর্তিত পৌনঃপুনিকতায় অনেকটা বিশেষত্ব-বর্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ মধুসূদনের ন্যায় তরুণ, বিদ্রোহী কবিকে আকর্ষণ করিবার মত দীপ্তি ও দাহ এই গতানুগতিকতার ভস্মাবৃত আদর্শ-বহ্নিতে ছিল না। তিনি রাবণ-মেঘনাদের জলন্ত স্বাদেশিকতা ও দৈববলের বিরুদ্ধে প্রাণপণ, শৌর্যদৃপ্ত প্রতিরোধে তাঁহার কাঙ্ক্ষিত আবেদনের সন্ধান পাইয়াছিলেন। একদিকে জীর্ণ অভ্যাস-বশে জড়, যুগধর্মের অনুপযোগী নৈতিক আদর্শ, অপরদিকে তরুণ বাঙলার প্রবলতম আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়—নিয়তি ও প্রাচীন অনুশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীলতার উন্মাদনা, জীবনকে পূর্ণভাবে উপভোগ করার, আত্মসার্থকতা-অনুভবের তীব্র স্পৃহা—এই দুই-এর মধ্যে মধুসূদন কোন্‌টি বাছিয়া লইবেন সে বিষয়ে পাঠকের অণুমাত্র সংশয় থাকে না। যে কবি পিতামাতার অশ্রুজলকে উপেক্ষা করিয়া নূতন অনাস্বাদিত স্বাধীনতার মোহে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি যে রাম-লক্ষ্মণ অপেক্ষা রাবণ-মেঘনাদকে মনুষ্যত্বের পূর্ণতর বিকাশ বলিয়া মানিয়া লইবেন তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় বিশেষ নাই।

'মেঘনাদ'-এর বিজাতীয়তার প্রাধান্য সত্ত্বেও ইহা সত্য যে, মধুসূদন ইহার বিদেশী ভাবকে স্বদেশের ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয় করিয়া লইতে প্রয়াসী হইয়াছেন, ইহাকে স্বচ্ছন্দ বিহারের অবসর না দিয়া স্বাদেশিকতার রশ্মি-নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে করুণরসের প্রবাহ তাঁহাকে কৃত্তিবাস-কাশীরামের সমগোত্রীয় উত্তরাধিকারীরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছে—হোমারের অনুকরণ বাল্মীকি-ব্যাসের সর্বব্যাপী প্রভাবের সহিত একাঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ 'বীরাঙ্গনা-কাব্য'-এ অভিমানিনী, অনুযোগ-পরায়ণা নায়িকারাও তাহাদের ভাবাবেগের আগ্নেয়স্রাব সত্ত্বেও স্বদেশীয় আদর্শের অনুবর্তন করিয়াছে। 'ব্রজাঙ্গনা'য় নিঃশেষিত-প্রাণশক্তি বৈষ্ণব ভাবধারা রসগাঢ়তা হারাইয়াও কবির প্রাচীন সংস্কৃতি-প্রীতির সাক্ষ্যরূপে বর্তমান—যে নিগূঢ় সাধনার অন্তর-দেশে তিনি প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই, তাহার বহিরঙ্গ পূজানুষ্ঠান ও নিরাশ প্রণয়ের আত্ম-কেন্দ্রিক করুণ আকৃতি তাঁহার কবি-প্রকৃতিকে মুগ্ধ করিয়াছে। এমন কি যে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বিদেশ হইতে আমদানি সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি,

সেখানেও কবির সমস্ত আঙ্গিক-নির্মাণ-কৌশল ও ভাবঘন প্রকাশ-সংক্ষিপ্তির মধ্যেও তাঁহার স্বদেশ-প্রীতির পূর্ণ পরিচয় প্রকটিত—তাঁহার বিষয়-বৈচিত্র্যের মধ্যে স্বদেশের কবি ও কাব্যালংকার-পদ্ধতি, তাহার বহিঃপ্রকৃতি ও উৎসব-অনুষ্ঠান, বাল্যস্মৃতির মাধুর্য ও স্বাদেশিক আদর্শচ্যুতির জন্য গভীর আত্মধিক্কার প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির থাকিয়া পরিধি-বিস্তার—ইহাই মধুসূদনের কাব্যরীতির ও কবি-প্রেরণার সুষ্ঠু পরিচয়রূপে গৃহীত হইতে পারে।

(২)

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি অতিপক্ষপাতিত্বের জন্য সময় সময় কাব্যোৎকর্ষের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনে এতই নিবিষ্টচিত্ত যে, এই তত্ত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সকল সময় কাব্যানুমোদিত রচনারীতি অবলম্বন করেন নাই। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ'-এ যে-পরিমাণ বিজাতীয় চিন্তাধারা তাঁহার জাতীয়তার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' সম্পূর্ণরূপে তাহা হইতে মুক্ত। মনে হয় যে, মহাকাব্যের আধুনিক আদর্শ ছাড়া আর কোন বিষয়েই হেমচন্দ্র বিদেশের মুখাপেক্ষী হন নাই। বিশ্বকর্মার বিশ্ব-নির্মাণের বিরাট শিল্পগৃহ কতকটা হোমারের প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে, কিন্তু ইহার সমস্ত আবহাওয়া, পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ও কর্ম-কাণ্ডের পরিধি হিন্দু-শাস্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া গ্রন্থ-মধ্যে যে সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব ও সৃষ্টি-রহস্যের, পাতাল-মর্ত্য-স্বর্গ-সুমেরু-ব্রহ্মালয়-কৈলাস-গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতির ভৌগোলিক সংস্থিতির আলোচনা হইয়াছে—তাহার উপরে আধুনিক-যুক্তিবাদ-সমর্থিত প্রাচীন কল্পনার প্রভাবচিহ্ন সুপরিস্ফুট। 'দশমহাবিদ্যা'য় কবি একদিকে সরল, নির্বিচার, তথ্যরূপে গৃহীত ধর্ম-বিশ্বাস ও অপরদিকে রূপক-ব্যঞ্জনা-সন্ধানী কবি-কল্পনা—এই উভয়ের মধ্যে চলচ্চিত্ততা হেতু অসম, অস্থির পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছেন। 'আশাকানন' ও 'ছায়াময়ী'তে বৈদেশিক ঋণ স্বীকৃত হইয়াছে; কবি কিন্তু মুখ্যতঃ পুরাণ-বর্ণিত স্বর্গ-নরকের অতিরিক্ত স্থূল, বস্তুতান্ত্রিক পরিকল্পনার

উপর নিজ কাব্য-শক্তির অপব্যবহার করিয়াছেন। এই ঘনবদ্ধ বাস্তব স্তরের অস্বচ্ছতা তাঁহার কবি-কল্পনা-রশ্মিকে প্রতিহত করিয়াছে।

নবীনচন্দ্র ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে মহাভারতীয় আখ্যান ও কৃষ্ণচরিত্রের উপর নূতন, সুদূর-প্রসারী তাৎপর্য আরোপ করিয়া যে সুবৃহৎ পটভূমিকা রচনা করিয়াছেন, তাঁহার কবিত্বশক্তি তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই। বিশাল মহাসমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্মিভঙ্গের ক্রীড়া-চাঞ্চল্য লক্ষ্য করায় যেরূপ অসঙ্গতি আছে, সেইরূপ ধর্ম-রাজ্য-প্রতিষ্ঠানের বিরাট যজ্ঞক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া পারিবারিক জীবনের ছোট-খাট হাসি-কান্না, মান-অভিমান, ঈর্ষ্যা-প্রেমের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিলে সাধনার একাগ্রতা ও তদুপযোগী কল্পনার গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয়। নবীনচন্দ্রের কল্পনায় উদাত্ত মহিমার অভাব নাই ইহা ঠিক; কিন্তু তথাপি এই কল্পনা ঊর্ধ্ব-গগনের বায়ুস্তরে আপনাকে স্থির রাখিতে পারে না, বারে বারে মাটির আকর্ষণে সমতলভূমিতে নামিয়া আসে। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যে বিশুদ্ধ সঙ্গীত-ধর্মিতার প্রাচুর্য নাই; বিষয়-গৌরবের দৃঢ় অবলম্বন না পাইলে তাঁহাদের কবিতা-লতা আপন শক্তিতে ঊর্ধ্বচারী হইতে পারে না। অনেক সময় তাঁহারা যাহা গ্রাস করিয়াছেন, তাহা পরিপাক করিবার উপযুক্ত জারক রস তাঁহাদের কাব্য-দেহের পাকস্থলী হইতে ক্ষরিত হয় নাই। তথাপি তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে সংশ্লেষনাত্মক (synthetic), তাঁহাদের কবিত্ব যে একটা বৃহৎ সমন্বয়-সাধনের কার্যে নিয়োজিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৩)

গত শতাব্দীর কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অনন্যসাধারণ স্বকীয়তা বিহারীলালের। কবি, সাধক ও প্রেমিকের যে দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে আমরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে শুনিয়া আসিতেছি, বাংলাদেশে বিহারীলালের জীবনেই তাহা সর্বপ্রথম মূর্ত হইয়াছে। বাংলার অতীত যুগের কবিদের কাহারও মধ্যে কবি-প্রকৃতির এই সুকুমার সংবেদনশীলতা, এই আত্মকেন্দ্রিক ভাব-তন্ময়তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বৈষ্ণব কবি-গোষ্ঠীর এই প্রবণতার সাক্ষ্য তাঁহাদের কবিতায় মিলে; কিন্তু ইহা কতটা ধর্ম-সাধনার

পূর্ব-নির্ধারিত অনুশাসন, কতটাই বা ব্যক্তি-জীবনের বিশেষ অনুভূতি, তাহা তাঁহাদের জীবনীর সহিত অপরিচয়ের জন্য সুনিশ্চিত মীমাংসা করা যায় না। পুরাণ-অনুবাদক ও মঙ্গলকাব্যধারার অনুসরণকারী কবিবৃন্দ প্রচলিত ভাবপ্রবাহে এমন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের ব্যক্তিগত পরিচয় বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সিন্ধবাদের ন্যায় চির-প্রথানুগত বিষয়ের গুরুভার বহন করিয়া বহু-পদাঙ্ক-চিহ্নিত পথে চলিতে চলিতে ইঁহারা স্বাধীন রুচির ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিবার বিশেষ অবসর পাইতেন না। কোথাও একটু সমাজ-চিত্রণ ও বাস্তব-পর্যবেক্ষণের আভাস, কোথাও একটু ব্যঙ্গ-রসিকতার চটুলতা, কোথাও বা ভক্তি ও করুণরসের ভাবার্দ্রতার ঈষৎ মাত্রাভেদ তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমানকে ক্ষীণভাবে উদ্রিক্ত করে। এক ভারতচন্দ্রে পৌঁছিয়া এই অবরুদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজসভার প্রখর আলোকে, বিদগ্ধ মনের রসসৃষ্টি ও শ্লেষকুশলতায়, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার স্বপ্ন-জড়িমা-টুটানো তীক্ষ্ণ খোঁচায়, পূর্ণ আত্মোপলব্ধিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে—মুকুন্দরামের অর্ধাবগুণ্ঠিত আত্মপরিচয় বহুশতাব্দীব্যাপী বিবর্তনের ফলে পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই আত্ম-পরিচয়-প্রতিষ্ঠার মূল্য দিতে হইয়াছে ভক্তিবিহ্বলতার মোহজালচ্ছেদে—দেবীর কথায় তন্ময়তা হারাইয়াই কবি নিজ অন্তর-লোকটি উদ্ঘাটিত করিতে পারিয়াছেন।

এই চর্বিত-চর্বন, অর্ধভুক্ত-রোমন্থনের ঐতিহ্যে বিহারীলাল একমাত্র কবি, যিনি নিজেই নিজের আহার সংগ্রহ করিয়া নিজ রসনাতে তাহার পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে তিনি স্বীয় কাব্যের বিষয়রূপে নির্বাচন করিয়াছেন। তাঁহার এই বলিষ্ঠ আত্ম-নির্ভরশীলতা ও প্রকাশের নির্ভীক, চিরাগত-প্রথা-বর্জনকারী মৌলিকতা তাঁহার জীবনের বাস্তব কাহিনী ও নিগূঢ় ভাবোন্মাদ এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম বয়সের রচনাগুলিতে—'বন্ধু-বিয়োগ' ও 'প্রেম-কাহিনী'তে তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গের যে চরিত্র-বিশ্লেষণ ও প্রথম স্ত্রী-বিয়োগের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার উদগ্র বস্তুতন্ত্রতা কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত দ্বিসহস্রবর্ষব্যাপী কাব্যতন্ত্রের স্পর্ধিত ব্যতিক্রম। নিজ জীবনের উপাদান-সমূহকে, কবিকল্পনার দ্বারা রূপান্তরিত না করিয়াই, নগ্ন অসংস্কৃত বাস্তবতায়, কাব্যে প্রয়োগের দুঃসাহস তাঁহার পূর্বে কোন

কবিরই হয় নাই। এমন কি, কাব্যোৎকর্ষের মানদণ্ডেও তিনি তাঁহার বাস্তব বিবৃতির মূল্য যাচাই করেন নাই—কবিতা ভাল হইল কি মন্দ হইল, সে দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া নিজ প্রাণে সঞ্চিত ভাবধারা অনিবার্য আন্তরিকতার সহিত উদ্‌গীরণ করিয়াছেন। তাঁহার গীতি-কবিতার মধ্যেও এই অকুণ্ঠ আত্মনিষ্ঠতা পরিস্ফুট। নিমতলার শ্মশানবাহিনী গঙ্গা, ১৮৬৭ সনের ঘূর্ণিবাত্যা, সমুদ্র ও নভোমণ্ডল এই সমস্ত বিষয়ই তিনি নিজের চোখে দেখিয়া, নিজ রক্তধারা ও হৃৎস্পন্দনের মধ্যে অনুভব করিয়া, উদ্ভট উপমা ও শিশুসুলভ, অসংযত ভাবোচ্ছ্বাসের সহায়তায়, প্রকাশভঙ্গীর অমসৃণ মৌলিকতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। ঝটিকার কোন কাব্য-রীতির অনুমোদিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি তাহার ছবি আঁকেন নাই—উহার সমস্ত উদ্দাম কলরোল, উন্মত্ত বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তকারী বিভীষিকা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট ছাপ লইয়া ছন্দোবদ্ধ ভাষার উৎকট ব্যঞ্জনা-শক্তিতে মূর্ত হইয়াছে। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের মরমী দৃষ্টির ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াছেন—তাঁহার অবিমিশ্র বাস্তব-বিলাসের দিকটা বোধহয় এক সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছে।

আধুনিক কাব্য

(১)

সাহিত্যে জীবনের যেটুকু প্রতিবিম্বন হয় সেই মানদণ্ডে বিচার করিলে বাঙালীর জীবন-ধর্মে যে একটা বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাহা সহজেই চোখে পড়ে। বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব হইতে প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া সাহিত্য যে খাতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল, আজ ২০।২৫ বৎসর হইতে তাহার একটা অতর্কিত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তনের কারণ-স্বরূপ যুদ্ধোত্তর নৈরাশ্যবাদ ও জীবন-সংগ্রামের অসহনীয় তীব্রতার কথা উল্লিখিত হয়।

পরিবেশের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রকৃতিরও যে কতকটা পরিবর্তন হইবে, ইহা শুধু স্বাভাবিক নহে, অপরিহার্যও। চারিদিকের আবহাওয়ায়, প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রায় যদি ক্ষোভ, অতৃপ্তি ও ব্যর্থতা-বোধের বীজ ছড়ানো থাকে, সাহিত্য-প্রতিভার বারিনিষেকে যে তাহার অঙ্কুরোদ্গম ঘটিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। অতি-আধুনিক সাহিত্যিক-গোষ্ঠী বাস্তব যন্ত্রের উদ্গাতারূপেই নিজেদের দাবি উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহাদের কৈফিয়ৎ এই যে, যে ঐতিহ্য ও আদর্শবাদ তাঁহারা অন্তরে অনুভব করেন না, সাহিত্যে তাহারই জয়গান গাহিলে কেবল-মাত্র শূন্যগর্ভ ভাববিলাসেরই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। কবির চিত্তে যদি মধু সঞ্চয় না থাকে, তবে ধার-করা মাধুর্য-পরিবেশনে, না হইবে কবির মর্যাদারক্ষা, না হইবে পাঠকের তৃপ্তিবিধান। কাজেই যে তিক্ততায় তাহার মনের পাত্র কানায় কানায় পরিপূর্ণ তাহাই তাহার কাব্যে উপচাইয়া পড়িবে ইহা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ জীবন-সত্যের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাই ত সত্যিকার কাব্য-প্রেরণার বিশুদ্ধ উৎস, স্থতরাং এই দিক দিয়া আধুনিক কবি অধিকতর সত্যনিষ্ঠার দাবি করিতে পারেন। ইহা যদি অতিরিক্ত মিষ্টান্নভোজী পাঠকের রসনার তৃপ্তিকর না হয়, ভাবাবেশের ঘুমপাড়ানিয়া গানে যাহারা অভ্যস্ত তাহাদের কানে যদি জীবনের রূঢ় সংঘর্ষ কর্কশ ও বেসুরো ঠেকে, তবে ইহা পাঠকেরই রুচিসংকীর্ণতার পরিচয়। যে অতীত জীবন হইতে নির্বাসিত হইয়াছে, শুধু প্রাচীনত্ব ও অভ্যাসের খাতিরে তাহার অবাস্তব মোহকে কাব্যের জারকরসে জীয়াইয়া রাখার প্রচেষ্টা মিশরের পিরামিডের ভূগর্ভস্থ কক্ষে সুবাসিত আবরণে মৃতদেহকে আচ্ছাদন করিয়া রাখার মত ব্যর্থ ও হাস্যাস্পদ নহে কি ?

এই সমস্ত যুক্তিতর্ক একেবারে উপেক্ষণীয় নহে ; কিন্তু উহাদের মধ্যে যে চরম সত্য নিহিত আছে তাহাও মানিয়া লওয়া কঠিন। সমসাময়িক জীবনের সহিত কবির অন্তরঙ্গ সংযোগ ও অন্তরের অনুভূতির প্রতি বিশ্বস্ততা সর্বথা স্বীকার্য। কিন্তু কাব্যের মূল কথা হইল সৌন্দর্য-সৃষ্টি—সৌন্দর্য-সৃষ্টির অলিখিত চুক্তিপত্রে মানস স্বাক্ষর করিয়াই কবি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হন। তাঁহার ছন্দবদ্ধ বাণী-প্রয়োগ, তাঁহার প্রচলিত ভাষণ-রীতির উল্লঙ্ঘন, তাঁহার শব্দবিন্যাসে অসাধারণত্ব, ধ্বনিপ্রবাহের ভিতর দিয়া অন্তঃনিরুদ্ধ

আবেগের বহিঃপ্রকাশ যদি এক অখণ্ড সৌন্দর্যের মূর্তি গড়িয়া না তোলে তবে এ সমস্তই অহেতুক আড়ম্বর ও বিকৃতরুচি ধনীর ঐশ্বর্যমত্ততার মত বিড়ম্বনায় পর্যবসিত হয়। অবশ্য সৌন্দর্যের প্রকার সম্বন্ধে কবির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা,—তিনি পূর্বতন রীতির গতানুগতিক অনুবর্তন সর্বথা পরিহার করিয়া চলিবেন। তাঁহার উপাদান যতই বিকৃত, অঙ্গহীন ও বিশৃঙ্খল হউক না কেন কবিমনের বিচ্ছুরিত আলোকে উহাকে সৌন্দর্যের অঙ্গীভূত করিতে হইবে। শুধু জীবন-সমালোচনা, তা সে যতই তীক্ষ্ণ ও মননসমৃদ্ধ হউক না কেন, কাব্য হইতে পারে না। তাহার জন্য গদ্যের বিভিন্ন বিভাগের সব কয়টি সদর দরজার উদারতা উন্মুক্ত আছে। সেইজন্য ম্যাথু আর্নল্ড যখন কবিতাকে জীবন-সমালোচনা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তখন তিনি সৌন্দর্যের নিগূঢ় নিয়মানুবর্তিতার শর্ত ইহার সহিত সংযোজনা করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য-সৃষ্টির শাশ্বত বিধানসমূহের দ্বারা রচিত পরিমণ্ডলেই কাব্যের মধ্যে যে গভীর জীবনবিষয়ক অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহাকে স্ফূর্ত হইতে হইবে। গানের সুরের মত কবিতার ছন্দ ঘরোয়া কথা বলিলেও সেই অতি-তুচ্ছ, অতি-পরিচিত বিষয়ের মধ্যে ঊর্ধ্বলোকবিহারের আমন্ত্রণ বহন করে। রবীন্দ্রনাথের 'কিনু গোয়ালার গলি' গলির সমস্ত বীভৎসতা ও জঞ্জাল—সমাবেশকে কারুণ্যক্লিষ্ট কল্পনার ঊর্ধ্বজগৎ হইতে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কোথাও যেন একটা সুষমার সুপ্ত সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই পরীক্ষায় সমস্ত কাব্যকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

(২)

সত্যকথা বলিতে কি কাব্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন অবাঞ্ছিত ও অসম্ভব। আমাদের স্থূল প্রয়োজনের জগতে যে বিপ্লব প্রার্থনীয় ও সময় সময় অপরিহার্য হইয়া পড়ে, কাব্য-লোকে তাহার স্থান অত্যন্ত গৌণ। মর্ত্যলোকে যে যমদূত সংহারের গদাহস্তে বিভীষিকার উদ্রেক করে, কাব্যের বৈকুণ্ঠলোকে সে বিষ্ণু-দূতরূপে সমস্ত অমরতা-প্রার্থীকে সৌন্দর্যদেবতার চরণপ্রান্তে পৌঁছিবার নূতন পথ বাতলাইয়া দেয়। বিপ্লবের প্রলয়ঝটিকা সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থার পুঞ্জীভূত আবর্জনারাশিকে এক মুহূর্তেই উড়াইয়া দেয়। কিন্তু কাব্যের বেলা বিপ্লব আসে মন্থরগতিতে, নিঃশব্দপদসঞ্চারে—হাতে বিস্মরণীর ধূসর আবরণ লইয়া।

বিপ্লব কাব্যের প্রাণহীন, প্রস্তরীভূত প্রথাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে না, ইহাকে উপেক্ষা ও বিস্মৃতির বল্মীকস্তূপের মধ্যে প্রোথিত করে। প্রাচীন কাব্যের উপরিভাগের জন্ম-মসৃণতার অন্তরালে যে প্রাণশক্তি বন্দী থাকে, সেই মসৃণতার আবরণ ভাঙ্গিয়া অর্ধ-অচেতন প্রাণশক্তিকে আবার মুক্তি দেওয়া, জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের ব্যবধান ঘুচাইয়া উহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা—ইহাই হইল সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিপ্লবের আত্মপ্রকাশ-রীতি। অতীতকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া কেবল বর্তমানের অগভীর, অকস্মাৎ-উত্তেজিত আবেগকে সম্বল করিয়া কোন মহৎ সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। কেননা, যে ভাষায় সাহিত্য রচিত হয় তাহাই বহুযুগব্যাপী অতীত সাধনার ক্রমপরিণতি; উহার চারিদিকে বহু আবেগ সঞ্চিত থাকে, বহু স্মৃতি গুঞ্জরণ করিয়া ফিরে, বহু সৌন্দর্যানুভূতির ঘনীভূত সৌরভ উহার রন্ধ্রপথে অনুপ্রবিষ্ট থাকে, সূক্ষ্ম অশরীরী মায়া-লোক উহার স্থুল বস্তু-তাৎপর্যের চারিদিকে প্রসারিত হয়। পিতৃপুরুষের সুকৃতি ও সুনামের মত, বহুপুণ্যলব্ধ বংশ-গৌরবের মত, ইহা বর্তমান কালের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার শিরোদেশে আশীর্বাদ-ধারার মত বর্ষিত হয়। যে মূর্খ মাটি কাটিয়া কোহিনুর লাভ করিয়াছিল, কিন্তু সেই কোহিনুর ফেলিয়া ও অঙ্গে প্রচুর ধূলি মাখিয়া গৃহে ফিরিয়াছিল তাহার মূঢ়তার সহিত এই ঐতিহ্য-গৌরব-ভ্রষ্ট সাহিত্যের মূঢ়তা তুলনীয়। অতীতের সাহায্যবঞ্চিত সম্পূর্ণ নূতন ভাষা, নূতন চিত্র, নূতন ভাবাসঙ্গ পাঠকের চিত্তের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতেই উহাদের শক্তির অনেকটা অপব্যয় করে। যেমন মানবের দেহলাবণ্য সেই সৃষ্টির আদিকাল হইতে অপরিবর্তিত অঙ্গসংস্থানকে আশ্রয় করিয়া নব নব রূপে স্ফুরিত হয়, তেমনি কাব্যের সনাতন আঙ্গিকের অবলম্বনেই উহার যুগে যুগে পরিবর্তনশীল সৌন্দর্য-ব্যঞ্জনা রূপ পরিগ্রহ করে। বহিরঙ্গের যেটুকু পরিবর্তন ঘটে—তাহা অন্তর-প্রেরণার স্বচ্ছতর ও সুষ্টুতর প্রতিবিম্বনের প্রয়োজনে। সুদীর্ঘ অনুশীলনের ফলে প্রতিষ্ঠিত আঙ্গিককে টুকরো টুকরো করিয়া বা নানা উদ্ভট সমাবেশ-ভঙ্গীতে উহার কৃত্রিম বৈচিত্র্য-বিধানের দ্বারা কাব্যের অন্তর-প্রচ্ছন্ন রূপ-রহস্যটিকে উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা শব-ব্যবচ্ছেদের দ্বারা শিরাস্নায়ুসংস্থানের আবরণ হইতে সৌন্দর্যের মূলতত্ত্ব নিষ্কাশন করার মতই ব্যর্থ। গুণীর হাতে বীণার চিরনির্দিষ্ট তারসংঘের মধ্যে নিহিত

সঙ্গীত-রহস্য অভিনব মূর্ছনা-মাধুর্যে আত্মপ্রকাশ করে; তারকে নূতন মাত্রায় বাঁধিয়া তার মধ্যে নূতন স্বর ধ্বনিত করিয়া তোলার আশা যিনি পোষণ করেন তিনি সঙ্গীতে অনধিকারী।

ইংলণ্ডে আধুনিক কবিগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি টি. এস. ইলিয়ট নূতন আঙ্গিকের মধ্যে যুগসঞ্চিত গভীর ও সর্বব্যাপী নৈরাশ্যবাদকে সার্থক ব্যঞ্জনার সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বহু আধুনিক বাংলা কবি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহারই অবলম্বিত কাব্যরীতির অনুসরণ করিয়াছেন। ইলিয়টের কাব্যের চরম মূল্য সম্বন্ধে মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু তাঁহার অনুভূতির তীব্রতা ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ অবসর নাই। সমস্ত সভ্যতা-সংস্কৃতি, মানবের সমস্ত কীর্তি, রাষ্ট্র-সমাজের সমস্ত সংহতি, জীবনযাত্রার সমস্ত অগ্রগতি তাঁহার চক্ষে যে সব তাৎপর্য হারাইয়া এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে, পৃথিবীর প্রাণশক্তি যে নিঃশেষে শোষিত হইয়া এক দিগন্তবিস্তারী মরুভূমির ধূসরতায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, এই বোধ তাঁহার বিকলাঙ্গ, গুরুভার-শ্রান্ত ছন্দের প্রতি পদক্ষেপে ও দীর্ঘশ্বাস-বিক্ষুব্ধ বাগ্‌ভঙ্গীর প্রতিটি ধ্বনিতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রে যাহা আন্তরিক অনুভূতি, তাঁহার বাঙালী অনুসরণকারী কবিদের ক্ষেত্রে তাহা প্রায়ই একটা pose বা কৃত্রিম মনোভঙ্গী।

সে যাহা হউক, এই ইলিয়টই যখন সমালোচনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন তখন তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যের সমর্থকরূপেই সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ড নির্ধারণ করিলেন। Tradition, প্রথানুবর্তন ও experiment, নব-পরীক্ষণ এই উভয় উপাদানই কাব্য-সৃষ্টিতে তুল্যরূপে প্রয়োজনীয়। যাহাকে প্রথা বলি তাহা জাতির দীর্ঘ অনুশীলনের ফলে অর্জিত মানস প্রবণতার স্থির ও অনপনেয় রেখাঙ্কন—ইহাকে সম্পূর্ণ বাতিল করিলে কাব্যধারার যে বেগবান প্রবাহ অতীতের গিরিশিখর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বর্তমানের রচনার মধ্যে স্রোতোবেগ ও কল্লোল-ধ্বনির সঞ্চার করিতেছে তাহার সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে উদ্ভূত গঙ্গাকে যদি কেবল বাঙলার সমতল-বাহিনী নদীরূপে দেখা যায়, যদি আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত ইহার যে সুদীর্ঘ যাত্রাপথ ইহাকে বর্ধিত গতিবেগ ও উচ্ছল তরঙ্গোচ্ছ্বাস দিয়াছে তাহাকে অস্বীকার করিয়া, কেবল

বর্তমানের ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী ক্ষোভের ফুৎকার ইহার বক্ষে যে চাঞ্চল্য জাগায় তাহারই উপর কাব্যতরণী ভাসান হয়, তবে এই তরণীর গতি মধ্যপথে স্তব্ধ হইবে এবং ইহা কোনদিনই কালজয়ী কীর্তির বন্দরে পৌছাইবে না তাহা সুনিশ্চিত।

এই বিষয়ে পাঠকগোষ্ঠীর দিক্‌টাও বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। কাব্য-সাহিত্য ঠিক এক-তরফা ব্যাপার নয়। পাঠকের সঙ্গে কবির স্বতঃস্ফূর্ত সমপ্রাণতা ও রুচি-সাম্যও ইহার একটা প্রধান অঙ্গ। অবশ্য কবির সহজ অন্তর-প্রেরণাই কাব্যের মুখ্য উপাদান; কবি নিজস্ব অনুভূতিকে বিসর্জন দিয়া প্রাকৃতজনের রুচির অনুবর্তন করিতে বাধ্য নহেন। তথাপি পাঠকের সহিত কবির হৃদ্য, বিরোধমুক্ত সম্পর্ক, সাধারণ, সুস্থ মনোভাব ও সৌন্দর্য-স্পৃহার দিক দিয়া কবির পক্ষে পাঠক-সমাজের প্রতিনিধিত্ব যে প্রতিভাশালী কবির রচনার উৎকর্ষ-বৃদ্ধির ও আকর্ষণীয়তার হেতু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাঠকের চিন্তাধারা ও হৃদয়াবেগ বহুযুগ হইতে যে খাতে প্রবাহিত, তাহার ভালমন্দ যে নিগূঢ় সূত্র ধরিয়া ভাব হইতে ভাবান্তর, চিত্র হইতে চিত্রান্তরে সঞ্চরণশীল, যে পূর্ব সংস্কারের অনুরণন কাব্যের ভাষা ও ছন্দের ফাঁক পূরণ করিয়া তাহার অনুভূতিতে ধ্বনিত হয়, তাহাদের আকস্মিক উন্মূলন কাব্যের ইন্দ্রজালকে বহু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করে। একমাত্র বোধশক্তির সাহায্যে কবিতার নিগূঢ় মর্ম অনুধাবন সম্ভব নহে—বহুতন্ত্রী-বিশিষ্ট যন্ত্রের মত একটা তারের ঝংকার পার্শ্ববর্তীর তারসমূহের সুরকম্পনে মিশিয়া যে বিচিত্র ঐকতানের সৃষ্টি করে, কাব্যের আবেদন তাহারই মত ও তাহার রসগ্রহণ করিতে গেলে একাধিক চিত্তবৃত্তির যুগপৎ ক্রিয়ার প্রয়োজন। আধুনিক কবিতায় অবশ্য ভাব-পরিমণ্ডল-সৃষ্টির চেষ্টা আছে, কিন্তু ইহার উপাদানসমূহ এত বিভিন্ন স্তর হইতে আহরিত, বাঙালী পাঠকের অপরিচিত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের উল্লেখ (allusion) ও স্মৃতিতে এরূপভাবে ভারাক্রান্ত যে, তাহারা পাঠকের মনে একটি অখণ্ড রস-ব্যঞ্জনারূপে প্রতিভাত হয় না।

(৩)

সর্বশেষ আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা প্রয়োজন। আধুনিক কবি যখন কবিতা রচনা করেন, তখন কি তিনি কবিজনোচিত মনোবৃত্তিকেই প্রাধান্য

দেন? কাব্যপ্রেরণার পিছনে নিছক সৌন্দর্য-সৃষ্টির সহিত আরও নানা মিশ্র উপাদান সংযুক্ত আছে। দেশপ্রীতি, সংস্কারস্পৃহা, জনহিতৈষণা, উন্নত জীবনাদর্শ-প্রতিষ্ঠা, মতবাদ-প্রচার, বৈষম্য-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্য কবিকে কাব্যরচনায় প্রণোদিত করে। উদ্দেশ্যমূলক কবিতা যে নিকৃষ্ট হইতে বাধ্য—এইরূপ সিদ্ধান্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা সব সময় সমর্থিত নহে। মিলটন, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ এক সুন্দরতর, উন্নততর জীবনাদর্শ-প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। আধুনিক কবিগোষ্ঠীও বর্তমানের জীর্ণ, ক্ষয়গ্রস্ত জীবনের আমূল সংস্কার কামনা করেন। কিন্তু সমস্ত উদ্দেশ্য তখনই কাব্য-সার্থকতা লাভ করে, যখন ইহা অনবদ্য ও সর্বজনস্বীকৃত সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে পরিণত হয়। উদ্দেশ্যের মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করিয়া কাব্যের লাবণ্য আরও দৃঢ় সংহতি, সুষমামণ্ডিত গঠন-সৌষ্ঠব ও প্রাণৈশ্বর্য লাভ করে। কবি জীবনের সর্বক্ষেত্রে অবাধে বিচরণ করিতে পারেন, সর্বসমস্যার জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন। কিন্তু কবিচিত্তের সনাতন সৌন্দর্যপ্রবণতা, কবিদৃষ্টির অলৌকিক স্বচ্ছতাই কেবল তাঁহাকে এই অস্বাচ্ছন্দ্যকর, উপল-বন্ধুর পথে ভ্রমণের অধিকার দিতে পারে। তিনি যদি পাতাল-পথে সুড়ঙ্গ-প্রয়াণের অভিলাষী হন, তবে তাঁহাকে সেই অন্ধকার পথে চলিতে হইবে যুক্তিতর্কমতবাদের প্রচুরধূমাঙ্কিত, কালিমাসমাচ্ছন্ন চিমনির অস্বচ্ছ আলোকের সাহায্যে নহে, তাঁহার কবি-কল্পনার মণিদীপের স্থির-প্রোজ্জ্বল দিব্য বিভার অনুসরণে। বর্তমান জীবনের ভাঙ্গা-চোরা, বাঁকা-টেরা খণ্ডগুলি, উহার মাত্রাহীন, আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন ভাবোচ্ছ্বাসসমূহ তাঁহার অন্তরে যদি একটা অখণ্ড রসরূপ গ্রহণ না করে, যদি একটি গভীর ভাবানুভূতির বা স্পষ্ট তাৎপর্যের স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত না হয়, তবে কবিতার বিষয়রূপে সেগুলি বর্জনীয়। মননশীল, আবেগপ্রধান গদ্য প্রবন্ধে সেগুলির আলোচনা চলিতে পারে, সমস্যাবিশ্লেষণ ও সমাধানের নানা মৌলিক উপায় নির্দিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু কাব্যে "নৈব চ নৈব চ"।

অবশ্য আধুনিক কবিগোষ্ঠীর মধ্যে কাহারও কাহারও যে এইরূপ স্বচ্ছদৃষ্টি, এইরূপ অখণ্ড তাৎপর্য-আরোপের শক্তি একেবারেই নাই তাহা বলিতেছি না। যাঁহার আছে তিনি বর্তমানের সমাদর না পাইলেও মহাকালের অনুমোদন

পাইবেন। কিন্তু কবিমাত্রের নিকটেই পাঠকের স্বাভাবিক প্রত্যাশা হইবে তাঁহার বিশুদ্ধ কাব্যগুণসমৃদ্ধি, জীবন-সমস্যাকে কাব্য-সৌন্দর্যে অভিষিক্ত করিবার প্রবণতা ও শক্তি। জীবনের কুৎসিত ও বীভৎস সত্য যদি কবি-কল্পনাকে আবিষ্ট করে তবে তাহাকেও একটা গভীরতর তাৎপর্যের বাহনরূপে, একটা ব্যাপকতর বিশ্ব-বিধানের অঙ্গীভুত করিয়া, একটা নবতর ছন্দসুষমার উপায়-স্বরূপ দেখাইতে হইবে। শেকস্‌পিয়ারের নাটকে ইয়াগো একজন অবিমিশ্র দুর্বৃত্ত; তাহার মনোভাব ও সংলাপের মধ্যেও তাহার এই অস্থি-মজ্জাগত চিত্তবিকৃতি অশ্লীলতা ও অসংযমের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তথাপি তাহার চরিত্রের মধ্যে একটা অন্তঃসঙ্গতিপূর্ণ সুষমা সহজেই অনুভব করা যায়। তাঁহার বিয়োগান্ত নাটকগুলির মধ্যে কোন কোনটিতে সমস্ত নীতি-বিধানের উন্মূলন ও যুগবিপর্যয়ের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। কিন্তু সেখানেও পুরাতন জীবননীতির ধ্বংসের মধ্য দিয়া এক নবযুগ-প্রবর্তনের, এক নিগূঢ়রহস্যমণ্ডিত উন্নততর ধর্মবোধ-স্ফুরণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত অনুভব করা যায়। ভাঙ্গনের যুগ হইলেই সেখানে যে ভগ্নস্তূপের ধূলা-বালি আকাশ-বাতাসকে চির-প্রদোষান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে, নৈরাশ্যবাদের চাপা-ক্রন্দন ও ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস দিক্‌মণ্ডলের বুকে পাষাণভারের মত চাপিয়া থাকিবে, অসংলগ্ন ভাষণ ও যোগ-সূত্রহীন অকস্মাৎ-প্রক্ষিপ্ত ভাব ও চিত্র-পরম্পরা উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের অ-শালীন পরিচয় বহন করিবে এ অবস্থা অপরিহার্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অমানিশার গাঢ় অন্ধকারই যদি কবিমনকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তবে তাহার মধ্যেও নক্ষত্রদীপ্তির ঝলক যেন তাহাকে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও জীবনাদর্শের দিকে পরিচালিত করে। মনের বোঝা লাঘব করার জন্য, সমস্যার অসহনীয়-ভার-প্রপীড়িত চিত্তের উৎকট অস্বস্তি ও বিমূঢ়তার অভিব্যক্তির জন্য, কুজ্ঝটিকার মধ্যে পথ-খোঁজার আঁকা-বাঁকা, উদ্দেশ্যহীন গতিভঙ্গীর রেখাঙ্কনের জন্য গদ্যের অসংখ্য প্রকারভেদের মধ্যে উপযোগিতা অনুসারে যে-কোনটিকে বাছিয়া লইলে চলিবে। কিন্তু কাব্যছন্দের নিয়মিত পুনরাবৃত্তির মধ্যে কবিমনের নিশ্চিন্ত আত্মপ্রত্যয়ের যে পরোক্ষ নিদর্শন নিহিত আছে, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও তাহারই প্রতিরূপ থাকার প্রয়োজন; অন্যথা কাব্যের শিল্পরূপের কোন সার্থকতা থাকে না। মহাদেবের জটাজালবিধৃত বেগবান জাহ্নবীতরঙ্গের ন্যায় সমসাময়িক বিক্ষোভের সমস্ত উচ্ছলতা কবিমনের অক্ষুণ্ণ

আত্মপ্রতিষ্ঠা ও কাব্যরীতির অপরাজিত সুষমাবোধের তটবেষ্টনীর মধ্যে সংযমিত হইলেই কাব্যের সত্য মর্যাদা রক্ষিত হয়।

কারা-সাহিত্য

(১)

সকল দেশেই সন্ত্রাসবাদ অনিবার্য ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদেই আবির্ভূত হয়। স্বাধীনতা-অপহরণকারী প্রবল বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে দাঁড়াইবার অসম্ভাব্যতাই এই সুড়ঙ্গপথচারী আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ; এই অবস্থা-সংকটের মধ্যেই ইহার নৈতিক সমর্থন নিহিত আছে। উদ্দেশ্যের মহনীয়তা উপায়ের নিন্দনীয়তাকে শুধু ক্ষমার্হ নহে, বরণীয়ও করিয়াছে। বিধিসম্মত আন্দোলনের ব্যর্থতা, দুই বিরোধী পক্ষের শক্তির আকাশ-পাতাল অসামঞ্জস্যই দেশের অনেক আদর্শবাদী স্বদেশ-প্রেমিককে এই অন্ধকার পথের যাত্রী করিয়াছে। গায়ের জোরে পরকে বাঁধা যদি পাপ না হয়, তবে যে কোন উপায়ে বন্ধন-মুক্তির প্রচেষ্টাও সেই বিচারের মানদণ্ডে নিন্দনীয় হইতে পারে না। উলঙ্গ পশুশক্তির নির্যাতনের প্রতিরোধ-স্বরূপ গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্রকে সম্পূর্ণ অবৈধ বলিয় উড়াইয়া দেওয়া যায় না। উপরিকার স্তরের সাংঘাতিক ভারসাম্য-বিপর্যয়ই ভূগর্ভস্থ ভূমিকম্পের ধ্বংস-শক্তিকে আবাহন করিয়া আনে। যে অমোঘ নিয়মে প্রকৃতির রাজ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাম্য-সংস্থাপন ঘটে, তাহারই প্রভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার ও সন্ত্রাসবাদ একই নিয়ম-শৃঙ্খলার অচ্ছেদ্যতায় পরস্পরের সহিত আবদ্ধ।

বাঙলাদেশে এই সন্ত্রাসবাদের সর্বদেশসাধারণ রূপটি একটু নূতন বৈচিত্র্য ও বিস্ময়মণ্ডিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহা সাহিত্যক্ষেত্রে একটি প্রবল প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, এই আন্দোলন সাহিত্যিক প্রতিবেশে উদ্ভূত হইয়া সেখান হইতে বাস্তব জীবনে সংক্রামিত

হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ইহার আদিম উৎস—এই সাহিত্যালোকে জন্মের বৈশিষ্ট্যটি ইহার ভবিষ্যৎ ইতিহাসকেও প্রভাবিত করিয়াছে। যে স্বদেশপ্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাস ও আদর্শবাদের রমণীয়তার মধ্যে ইহার জন্ম, তাহাই নব নব সৃষ্টির প্রেরণারূপে সাহিত্যিক ক্রমবিবর্তনের পথে ইহাকে পরিচালনা করিয়াছে। অন্যান্য দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যে যে মুক্তির উন্মাদনা ও মহান্-ব্রত-উদ্‌যাপনের উদাত্ত গৌরব থাকে, তাহা প্রায় কর্মক্ষেত্রেই নিঃশেষিত হয়—এই ভাবোচ্ছ্বাসের জোয়ারকে সাহিত্যের শাখানদীর খাতে প্রবাহিত হইতে দেখা যায় না। গ্যারিবল্ডি-পরিচালিত ইতালীর নব-জাগরণ-আন্দোলন আদর্শবাদের বিশুদ্ধি ও আত্মোৎসর্গের গৌরবে কোন স্বাধীনতা-সংগ্রাম অপেক্ষা ন্যূন নহে—তথাপি ইহার সাহিত্য-সৃষ্টি-প্রেরণা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অভিযানরত সৈনিকবৃন্দের কণ্ঠে দুই একটি স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসমূলক গানই ইহার একমাত্র সাহিত্যিক অভিব্যক্তি। পরবর্তী যুগে মেরিডিথের দুই একটি উপন্যাসে এই কাহিনীর যে রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা মুখ্যতঃ ঐতিহাসিক-বিদ্রোহের দুর্দমনীয় আবেগ, বিপ্লবীর অসাধারণ মনস্তত্ত্ব তাহাতে বিশেষ সুপ্রকট হয় নাই।

তা ছাড়া, বাঙলা দেশের সাহিত্যে বৈপ্লবিক আন্দোলন আর একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। ইহার কারণ ইংরাজের কারাব্যবস্থা। এখানে বৈপ্লবিকতা প্রায়ই চরম-হিংসামূলক কর্মপদ্ধতির পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই—মানস-কল্পনার রক্তচ্ছবি কার্যে রূপ পরিগ্রহ করার পূর্বে ইংরেজের সদা-সতর্ক প্রতিরোধ-ব্যবস্থা তাহাকে জেলখানার লৌহ-গবাদের অন্তরালে বন্দী করিয়াছে। বিপ্লবীর উগ্র মনোভাব নির্জন কারা-প্রকোষ্ঠে বিভীষিকার কল্পনাজাল বয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। বিপ্লববাদের অনিবার্য গৌণফল (bye-product) হইয়াছে কারাবরণ। প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সব কয়টি স্বপ্নবিভোর তরুণ প্রাণ জেলখানার নিরাপদ আশ্রয়ে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই নূতন প্রতিবেশের সাহচর্য ও আত্মকেন্দ্রিকতা, ইহার নিদারুণ অভিজ্ঞতা ও যান্ত্রিকতার সহিত সংঘর্ষ ইহাদের চিন্তাধারাকে নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত করিয়াছে, ইহাদের রক্তের নেশাকে সাহিত্যরচনার পথে আত্মনিষ্ক্রমণের অবসর দিয়াছে।

সাধারণ জীবনের সঙ্গে জেলখানার জীবনের একটা প্রধান পার্থক্য এই যে, এখানে বাছিয়া বাছিয়া সমস্ত উৎকেন্দ্রিক, অসাধারণ, ভালো বা মন্দের দিক দিয়া তীক্ষ্ণ-বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত চরিত্রের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। সংসারে যে গড়পড়তার প্রাদুর্ভাব, যে সুনির্দিষ্ট ছন্দের প্রচলন, এখানে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সমাজে যে সমস্ত ব্যক্তির অসামাজিক মনোবৃত্তি, যাহারা দশের মধ্যে আপনাকে নিশ্চিহ্নভাবে মিলাইতে অক্ষম, যাহারা আকাঙ্ক্ষার প্রবলতায় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উগ্রতায় সর্বদা সমাজনির্দিষ্ট সীমা-লঙ্ঘনে প্রবণ, তাহারাই এক অনতিক্রম্য মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রভাবে কারাগৃহের আতিথেয়তার বন্ধনে ধরা দেয়—জেলখানার চুম্বক-শক্তি এই লৌহকণাগুলিকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করে। কাজেই এখানে চিন্তাশীল, মানবের প্রকৃতি-রহস্যভেদে আগ্রহশীল ব্যক্তি তাঁহার কৌতূহল-নিবৃত্তির বিচিত্র ও প্রচুর উপাদান একত্র সংগৃহীত দেখিতে পান। আর যাঁহারা প্রকৃত পরার্থপর ও স্বদেশপ্রেমিক, যাঁহারা চিত্তের আদর্শবাদের প্রেরণায় অত্যাচারী-শক্তিপ্রণীত আইন ভঙ্গ করিয়া কারাগারে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহাদের অন্তরের সমবেত ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা যেন ইহার নিরানন্দ, অন্ধকার আবহাওয়ার মধ্যে আত্মার অবিকল্প দেয়ালী উৎসব রচনা করে। যে অগ্নিশিখা জঞ্জালস্তূপ পোড়াইতে বা প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইল না, তাহাই যেন প্রাণের আরতি জ্বালাইয়া অপরাজেয় আদর্শের বেদীমূলে অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হয়। কারাগারের নিরবচ্ছিন্ন অবসর আত্মানুশীলনের সুযোগ দিয়া অনেক আত্মবিস্মৃত সাহিত্যিকের লুপ্ত শক্তি স্ফুরিত করিয়াছে। মনে হয় যে জেলের কর্মবিক্ষেপ-হীন, প্রশান্ত বিরতিটুকু না পাইলে অনেকেই নিজ সাহিত্য-রচনার শক্তি সম্বন্ধে চিরকাল অচেতনই রহিয়া যাইতেন। কাজেই বাঙলাদেশে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে জেলখানা সাহিত্য-সাধনার পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে। অখণ্ড অবসর, গভীর আত্মবিশ্লেষণ, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার সহিত পরিচয়, জীবনের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া দার্শনিক নিরাসক্তির সহিত জীবন-পর্যবেক্ষণ, মতবাদ—সংঘর্ষের অনুচিত প্রভাব হইতে মুক্ত সত্যানুসন্ধিৎসা—এই সমস্ত বাহিরের ও অন্তরের উপাদান-সমবায়ে, কারা-প্রাচীরের অন্তরালে, ইহার লৌহ-কঠোর বিধিনিষেধের রন্ধ্রপথে এক নূতন ধরনের সাহিত্য রচিত হইয়াছে। আত্মাবমাননার ভস্মশয্যা হইতে

আত্মবিকাশ ও আত্মসম্প্রসারণের এক অভিনব জীবনীশক্তি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

অন্যান্য দেশে কারাবরোধ ঠিক এই রকমের সাহিত্য-ফলপ্রসূ হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। জানি না মধ্যযুগে যখন গ্যালিলিও-প্রমুখ মনীষী-দিগকে ধর্মযাজকদের অননুমোদিত মতবাদ-প্রচারের জন্য কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল, তখন তাঁহারা তাঁহাদের সুপ্রচুর অবসরকে নূতন জ্ঞান-অনুশীলনের কার্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন কিনা। হয়ত সেই ক্ষমাহীন যুগে জেলখানায় যে অবিরত যন্ত্রণা তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হইত, তাহার উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসার সম্পূর্ণ উৎসাদন—এই অত্যাচার দৈহিক সীমা ছাড়াইয়া অন্তরকে পর্যন্ত অভিভূত করিত। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে যথেচ্ছাচারমূলক রাজশক্তি বিদ্রোহের প্রতি যে শাস্তির ব্যবস্থা করিত, তাহাতে দেহ, মন, উভয়ই পঙ্গু ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইত—মানবিক সহিষ্ণুতার সীমা-অতিক্রমকারী দণ্ডবিধি অনেক সময়ই অপরাধীকে উন্মাদ মনোবিকারের বিভীষিকাময় অন্ধ গহ্বরে নিক্ষেপ করিত। অপেক্ষাকৃত সভ্য আধুনিক যুগে রাজনৈতিক মতবাদের জন্য কারাবরণ বিরল ব্যতিক্রম দাঁড়াইয়াছে। কাজেই বাঙলাদেশের মত অন্য কোনও দেশে রাজদণ্ডে অন্যায়ভাবে দণ্ডিত দেশ-প্রেমিক চিত্তের এইরূপ অপরিসীম বেদনা, ব্যর্থতাবোধের এইরূপ মর্মান্তিক জ্বালা ও আদর্শবাদের এইরূপ অনির্বাণ হোমানল কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে কিনা সন্দেহ। হিট্‌লার ও মুসোলিনীর আমলে দেশমধ্যে অরাজকতার যে ব্যাপক বিভীষিকা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে সাহিত্যানুশীলনের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবার সুযোগ পায় নাই—প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন পরিস্থিতিতে চিত্তের যে বিমূঢ়তা স্থায়ী হয় তাহা মোটেই সাহিত্যচর্চার অনুকূল নহে।

বাঙলাদেশে কারা-ব্যবস্থার মধ্যে যান্ত্রিকতার নির্মম ঔদাসীন্য ছিল, কিন্তু ক্রূর জিঘাংসা ছিল না; কাজেই এই শাসন বিরক্তিকর ও মাঝে মাঝে অসহনীয় হইলেও ইহাতে মানবাত্মাকে পিষিয়া মারিবার কোন সুপরিকল্পিত প্রয়াস লক্ষিত হয় না। জেলের অশেষবিধ জটিল বাধানিষেধ-জালের মধ্যেও মানবের সনাতন অধিকার-স্বীকৃতির খানিকটা খোলা জায়গা, উন্মুক্ত অবকাশ ছিল, এবং এই ফাঁকা জায়গাটিই মননশীলতা আপন কর্ষণযোগ্য

ভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। কারাকক্ষের ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে সঞ্চরণশীল দক্ষিণা-বায়ুর ন্যায় জেল আইনের সংকীর্ণ অবকাশ-পথে স্বাধীন চিন্তা ও হৃদয়া-বেগের ছোট ছোট উচ্ছ্বাসগুলি হিল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে। মুক্ত জীবনের সহস্ররকমের বিক্ষেপে যে সমস্ত সূক্ষ্ম, দার্শনিক চিন্তা মনে উদিত হইত না বা হইলেও বুদ্বুদের মত বিলীন হইয়া যাইত, জেলের বহির্বিক্ষোভ হইতে সুরক্ষিত, অথচ অন্তর্বিক্ষোভের আবেগে উষ্ণ আবহাওয়ায় তাহারা দানা বাঁধিয়া উঠিবার অবসর পাইয়াছে ও সুদীর্ঘ রোমন্থনের ফলে অন্তঃসঙ্গতি ও সার্থক সাহিত্যিক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং একদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই বাধ্যতামূলক কারাজীবন-যাপন সাহিত্যিক পরিপুষ্টির হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে—অভিশাপ আশীর্বাদে পরিণত হইয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত শুভ পরিণতির জন্য কৃতিত্ব যে মুখ্যতঃ বাঙালীর আবেগপ্রবণ, সংবেদনশীল, সৃষ্টিধর্মী চিত্তের তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শয়তানকেও যদি তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত না করা ন্যায়নীতির আদর্শ হয়, তবে ইংরেজ গবর্নমেণ্টের শয়তানী শাসন-ব্যবস্থাও ইহার সামান্য একটু অংশ ন্যায়তঃ দাবী করিতে পারে। যাহারা পীড়নের অঙ্কুশ দিয়া হৃদয়কে উত্তেজিত করে, অথচ অত্যাচারের আতিশয্যে তাহাকে নিঃসাড় করিয়া দেয় না, আবেগের উৎসমুখ খুলিয়া দেয় অথচ তাহার প্রবাহকে তুষারস্তূপে অবরুদ্ধ করে না, তাহারা অজ্ঞাতসারে বিধাতার কল্যাণময় উদ্দেশ্যেরই সহযোগিতা করে।

আমি কারাসাহিত্য অর্থে কারাগারে রচিত সমস্ত সাহিত্যকে নির্দেশ করিতেছি না—কারাজীবনের অভিজ্ঞতাকে উপাদানস্বরূপ ব্যবহার করিয়া যে সাহিত্য রচিত তাহাকেই উক্ত নামে অভিহিত করিতেছি। কারাগারের প্রচুর অবসরে কেহ যদি কবিতা বা দর্শনগ্রন্থ বা কারাগারের সহিত অসংশ্লিষ্ট উপন্যাস রচনা করেন, তাহার সহিত জেলের সম্পর্ক—কেবল ভৌগোলিক প্রতিবেশ-মূলক, অন্তরঙ্গ নহে ;—তাহার উপর জেলজীবনের ছাপটি মুদ্রিত হয় নাই। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসবাদ-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত সাহিত্য কারাগারের বাহিরে, বিপ্লব-বাদীর স্বাধীন, অথচ অনিশ্চিত ও আশঙ্কা-কণ্টকিত জীবনের আশ্রয়ে রচিত হইয়াছে, সেগুলিকেও ঠিক কারাসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করিতে পারি না। আসন্ন সর্বনাশের অশ্রান্ত অনুসরণ হইতে আত্মগোপন-চেষ্টায় উদ্‌ভ্রান্ত, শিকারের পশুর ন্যায় সমস্ত আশ্রয়স্থল হইতে মুহুর্মুহুঃ উৎক্ষিপ্ত, জীবনমৃত্যুর

সীমারেখায় সর্বদা অস্থির চরণে দণ্ডায়মান অস্তিত্ব কয়েকটি জরাতুর, বিভীষিকাগ্রস্ত, দুঃস্বপ্নতাড়িত মুহূর্তের সমষ্টিতে সংকুচিত হয়—ইহার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাগুলি সাধারণ প্রবাহ ও পরিণতি হারাইয়া একপ্রকার অস্বাভাবিকরূপে তীক্ষ্ণ, আত্মকেন্দ্রিক বিকারের মত প্রতিভাত হয়। যেন নদীর সহজ, বিসর্পিত প্রবাহ জলপ্রপাতের দুর্বার বেগ ও ফেনিল বিক্ষোভের ব্যর্থ চক্রাবর্তনে আপনাকে নিঃশেষিত করিয়াছে—যেন মুহূর্তের দুঃসাহসিকতা সমগ্র জীবনের বিস্তৃতি ও প্রসারকে আপনার মধ্যে সংহরণ করিয়া লইয়াছে। বিপ্লবীর যে জীবনে বাহিরের অভিভব স্বাধীন ইচ্ছাকে পর্যুদস্ত করিয়াছে, যাহা আকস্মিকের তাড়নায় অসম ছন্দে ছুটিয়া চলে, যাহার প্রাণশক্তি স্বল্প রন্ধ্রপথের ভিতর দিয়া অবরোধমুক্ত ফোয়ারার ন্যায় শতধারে অজস্র অমিতব্যয়িতায় আপনাকে ফুরাইয়া দেয় তাহারও কাহিনী লইয়া সাহিত্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ঠিক কারা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। কারাজীবনের প্রচুর, বাধাহীন অবসর, ইহার মন্থর মননশীলতা, ইহার ঈষৎ-মোহভঙ্গ-স্পৃষ্ট অতীত-পর্যালোচনা, ইহার নিরাসক্ত অন্তর্দৃষ্টি, জীবনের নানা অপ্রত্যাশিত বিকাশের বিস্মিত উপলব্ধি—কারা-প্রাচীরের বাহিরে অতিবাহিত সন্ত্রাসবাদীর জীবনযাত্রার মধ্যে মিলে না।

(২)

এই কারা-সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নিদর্শন পাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পাষাণপুরী"তে। কারাকক্ষে কিরূপ অদ্ভুত চরিত্রের একত্র সমাবেশ হয়, জেলের নিয়মকানুনের ফাঁকে ফাঁকে তাহাদের জীবনধারা কিরূপ আঁকাবাঁকা পথে, আইন ফাঁকি দিবার কিরূপ নূতন নূতন উপায়-উদ্ভাবন-কৌশলের সহায়তায়, জেলের নিম্নশ্রেণীর খবরদারীওয়ালার সঙ্গে কেমন সুনিপুণ বোঝাপড়ার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, তাহার প্রথম চিত্র পাই ঐ উপন্যাসটিতে। বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক স্তরের মানুষ জেল-শৃঙ্খলার একটি মাত্র খুঁটিতে বাঁধা পড়ে। প্রথমতঃ, সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্ত সাধারণ কয়েদীর দল জেলের মধ্যেই একটা নূতন সমাজ ও জীবনপ্রবাহ গড়িয়া তোলে—তাহাদের ঈর্ষ্যা-দ্বেষ-দলাদলি-প্রবণতা, স্থূল, অমার্জিত, ইতর আমোদ-প্রমোদ, ভবিষ্যৎ-চিন্তাহীন, দায়িত্বজ্ঞান-বর্জিত, বেপরোয়া ভাব, কচিৎ দীর্ঘকালনিরুদ্ধ সুকুমার বৃত্তির

অতর্কিত উচ্ছ্বাস, স্ত্রীপুত্র-পরিজনের স্মৃতিতে উদ্বেগ ও আত্মগ্লানি, বিরল সমবেদনা, আনন্দময় পরিবেশ-সৃষ্টির কৃত্রিম প্রয়াস--এই সমস্ত মিলিয়া একরকম নূতন গোষ্ঠীমনোভাব কারাজীবনকে অবলম্বন করিয়া দানা বাঁধে। জেলের জগৎ বাহিরের জগতেরই একটু রূপান্তরিত প্রতিচ্ছবি। এখানে পূর্বের সেই আধিপত্যস্পৃহা, সেই স্থূল স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদ, সেই শাঠ্যনীতি ও ষড়যন্ত্র-প্রবণতা পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীল। তাহাদের মধ্যে যে ন্যায়নীতির প্রতি মৌখিক আনুগত্য, যে চক্ষুলজ্জা ও সংকোচ বাহিরের সমাজের লোকে একেবারে এড়াইতে পারে না, জেলে তাহার উলঙ্গ, অকুণ্ঠিত অস্বীকৃতি। বাহিরে ভালোর দুর্বল প্রতিরোধে মন্দর গতি একটু বিসর্পিত হয় মাত্র; এখানে সে সরল, নিকটতম, সংক্ষিপ্ততম পথ ধরিয়া চলে। কয়েদীদের মধ্যে নবাগতের কুণ্ঠিত, অপ্রতিভভাব, "বাস্তু-ঘুঘু"দের পাকা বদমায়েসী, মেটওয়ার্ডারদের চালবাজী মুরুব্বিয়ানা, উপরিওয়ালাদের আইন-বাঁচানো, স্বেচ্ছাকৃত অন্ধতা—এই জগতের আবর্তনের অক্ষরেখা। এই লৌহনিয়মের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে-বাঁধা জীবনেও মাঝে মধ্যে অতিশৃঙ্খলিত প্রবৃত্তির অসাধারণ উচ্ছ্বাস স্ফুরিত হয়। সাধারণ অপরাধীদের মধ্যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত খুনী আসামীর উন্মাদ মনোবিকার ভয়াবহ স্তব্ধতার অন্তরালে নরক-বিভীষিকার দুই একটি উৎক্ষিপ্ত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহিরে ছড়াইয়াছে।

ভদ্রলোক কয়েদীর শ্রেণী তাহাদের মানস আভিজাত্য বজায় রাখিয়া অন্যান্য কয়েদীর সহিত তুলনায় একটু স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। তাহাদের মনোবিকার ও নৈতিক অধঃপতনের প্রকৃতি নূতন ধারায় আত্ম-প্রকাশ করে। ইহাদের উপরে আছে রাজনৈতিক বন্দীসম্প্রদায়—ইহারা একদিকে যেমন সর্বদা জেল-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া জেল-কর্তৃপক্ষের অস্বস্তির কারণ হয়, অপরদিকে সেইরূপ ইহাদের উচ্ছল জীবনীশক্তি ও অপরাজেয় আদর্শবাদ সমস্ত বাধানিষেধের উপলখণ্ডের চারিদিকে এক ক্ষুব্ধ কল্লোলমুখর আবর্ত রচনা করিতে থাকে। ইহাদের প্রাণধারা জেলের বাঁধা প্রণালীকে ছাপাইয়া পড়ে, ইহারা ইহার সুকঠিন নিয়মের মধ্যে অনিয়মের ঝোড়ো আবহাওয়া বহাইয়া ইহার আকাশ-বাতাসে এক অনভ্যস্ত কম্পন ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। সর্বশেষে, এই রাজনৈতিক বন্দীদলের মধ্যে অনশনব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে দৃঢ়সংকল্প এক মহামানব তাহার ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া জেলের গ্লানি ও

অবমাননার মধ্যে মানব আত্মার উন্নততম মহিমার জয় ঘোষণা করে। এইরূপে বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে বিন্যস্ত জেলের জীবন আমাদের সাধারণ জীবনের অপেক্ষা বৈচিত্র্য ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে ও মানবমনের নানা অপ্রত্যাশিত স্ফুরণের জন্য এক অসাধারণ রস-আবেদনের উপাদান যোগায়।

(৩)

শ্রীযুক্ত সতীনাথ ভাদুড়ীর "জাগরী" উপন্যাসটি কারা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। জেল-জীবনের এমন পূর্ণাঙ্গ, তথ্যবহুল ও মননশীলতা-সমৃদ্ধ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। এক পরিবারের চারিটি ব্যক্তি এই উপন্যাসের চারিটি অধ্যায়ে নিজ নিজ পূর্বস্মৃতি-রোমন্থন ও জীবন-দর্শনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র বিলু—১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনে নেতৃত্বের জন্য অভিযুক্ত ও চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তাহার পিতামাতাও ঐ জেলের বিভিন্ন অংশে বন্দী-জীবন যাপন করিতেছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলু কমিউনিস্ট দলের লোক, সে তাহার রাজনৈতিক আদর্শবাদের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্যের জন্য সমস্ত পারিবারিক স্নেহ-মমতার কণ্ঠরোধ করিয়া তাহার দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের হেতু হইয়াছে। ফাঁসির নির্দিষ্ট দিনের ঠিক পূর্ববর্তী চব্বিশ ঘণ্টা এই কাহিনীর কালগত প্রতিবেশ। এই একটি দিনের মধ্যেই সমস্ত পূর্ব জীবনের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা, জীবন-সমালোচনা ও তাহার আদর্শ-বিচার আসন্ন মৃত্যু-চিন্তাকে অবলম্বন করিয়া পল্লবিত ও বিন্যস্ত হইয়াছে। যেমন মন্থন-দণ্ড-তাড়িত হইয়া দুগ্ধ হইতে নবনীত উত্থিত হয়, তেমনি আসন্ন মৃত্যুর নিদারুণ অভিঘাতে পরিবারভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন-স্মৃতি মন্থিত ও আলোড়িত হইয়া ইহার সারাংশটুকু সচেতন চিন্তা ও আলোচনার মধ্যে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এই সারাংশ-নিষ্কাশন-ব্যাপারে মৃত্যুভীতি ছাড়া আর একটি প্রভাব ক্রিয়াশীল হইয়াছে—তাহা হইতেছে কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলুর বিশ্বাসঘাতকতার চিন্তা। এই চিন্তা কখনও সচেতনভাবে, কখনও অজ্ঞাতসারে, সমস্ত জীবন-পর্যালোচনার ভিতর ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহারই রাসায়নিক সংযোগে অতীতের স্মৃতি তীক্ষ্ণ ও ঝাঁঝালো-স্বাদযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রোথিত শবদেহের উপর বুদ্‌বুদের

মত চেতনার গভীর স্তরে নিমগ্ন এই দুঃস্বপ্ন সমস্ত অতীত স্মৃতিকে ভেদ করিয়া ফেনাইয়া উঠিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া ইহার টিপ্‌টিপে বেদনা দুর্নিবার হইয়া উঠিয়া নিরাসক্ত দার্শনিক মননশীলতার শান্তি ও সুষমা বিধ্বস্ত করিতেছে—অতীত-তন্ময়তার স্বপ্নবিভোর, সকরুণ স্নিগ্ধতা যেন এই ভয়াবহ অনুভূতির স্পর্শে সংশয়ক্লিষ্ট ও আতঙ্ক-কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে।

এই চারিজনের বিবৃত আখ্যান পরস্পরের পরিপূরক—সব কয়টি মিলিয়া একটি কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কাহিনীর ভিতরে বিহারের গ্রাম্য জীবনযাত্রার একটি পরিপূর্ণ ছবি, রাজনৈতিক আন্দোলনের সংঘাতসৃষ্ট উন্মাদনা, বক্তাদের পারিবারিক সমষ্টিগত জীবন ও প্রত্যেকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে ফুটিয়াছে। বিহারের জনসাধারণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার, তাহাদের জীবনযাত্রার মানের শোচনীয় নিম্নতা, আগস্ট আন্দোলনের মাদকতা কেমন করিয়া তাহাদের বিচারবুদ্ধিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া রক্তে নেশা জাগাইয়াছিল, তাহাদের মূঢ়, অভিজ্ঞতাহীন কল্পনা কেমন করিয়া মাধ্যাকর্ষণের ভারমুক্ত হইয়া ভাবলোকের কুহেলিকারাশির মধ্যে আপনাকে নিরঙ্কুশভাবে ছাড়িয়া দিয়াছিল তাহার অতি সুন্দর চিত্র ইহা হইতে আমরা সংকলন করিতে পারি। আবার এই মুক্তিসংগ্রামের চরম আত্মত্যাগের মধ্যে বিহারের গ্রাম্য সমাজের নেতৃবৃন্দের শাঠ্য ও পাটোয়ারি বুদ্ধি, ইহার আদর্শবাদের ভোগবতীপ্রবাহের মধ্যে স্বার্থবুদ্ধির পঙ্কিলতার স্তরটি আন্দোলনের ভালোয়-মন্দে মেশানো বাস্তবরূপটি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। গ্রন্থ মধ্যে বিহারী-বাঙালীর রুচি ও আচারগত বৈষম্য, মাস্টারমহাশয় ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তিশ্রদ্ধার ভাব ও একই বিরাট গণ-আন্দোলনে সহযোগিতার সমীকরণ-প্রভাবের মধ্যেও প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধির জন্য তাহাদের পারস্পরিক রেষারেষি-ভাবটি মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। জেলে পুরুষ ও মেয়ে বিভাগে কয়েদীদের আলাপ-আলোচনা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালীর পার্থক্যটিও সুন্দররূপে ফুটিয়াছে। পুরুষ-মহলে আলোচনা অধিকাংশই রাজনীতি ও ধর্মসংক্রান্ত; বিশুদ্ধ-গান্ধীবাদের সহিত বামপন্থী দলসমূহের মতবাদ-পার্থক্য ইহার মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। মেয়ে-মহলে কিন্তু ব্যক্তিত্বের সংঘাত উগ্রতর, ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ঈর্ষ্যা-সন্দেহ-মনকষাকষি আরও ঝাঁঝালোরকম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। তাহাদের

পারিবারিক জীবনের বক্র মনোভাব, কুটিল কটাক্ষপ্রবণতা রাজনীতির চাপেও সমতা-প্রাপ্ত না হইয়া কারাজীবন পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। কারাগারের ক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা ও অনভ্যস্ত পরিবেশের মধ্যেও স্ত্রীজাতিসুলভ পরনিন্দা, পরচর্চা প্রভৃতি মুখরোচক বৃত্তিগুলি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। পূর্বস্মৃতির সরল প্রণালী বাহিয়া যে সমস্ত অতীত জীবনের খণ্ড চিত্র মনের প্রাঙ্গণে ভিড় করিয়া দাঁড়াইতেছে এবং বর্তমানের চিন্তাধারা ও আচরণ সকলে মিলিয়া বিহার প্রদেশের সমাজজীবনের বিশিষ্ট রূপটিকে, ইহার মানস সংকীর্ণতার মধ্যে বিপুল, কূলপ্লাবী ভাবপ্রবাহের ধারাটিকে উজ্জ্বল বর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

শুধু সাধারণ সমাজ-জীবন নহে, ব্যক্তিত্বের অসাধারণত্ব এই আত্মস্মৃতি-রোমন্থনের সাহায্যে প্রকটিত হইয়াছে। বিভিন্ন বক্তার ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গীর ভিতর দিয়া তাহাদের মনোভাব ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটতা লাভ করিয়াছে। একের উক্তির মধ্যে যে চরিত্র-ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই আবার অন্যান্য বক্তাদের ভাবপ্রকাশের দ্বারা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বিলু ও নীলু এই দুই ভ্রাতার চরিত্র ও আচরণের পার্থক্য তাহাদের নিজেদের এবং পিতামাতার পর্যালোচনা দ্বারা অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বড় ভাই-এর কোমল, স্নেহশীল ও ক্ষমাপ্রবণ প্রবৃত্তিটি সম্বন্ধে তাহার সুদীর্ঘ আত্মবিশ্লেষণ হইতে যেরূপ অনুমান করা যায়, তাহার পিতামাতার অভিজ্ঞতাপ্রসূত সাক্ষ্য হইতে তাহা নিশ্চিততার পর্যায়ে পৌঁছে। ছোট ভাই-এর দুরন্তপনা, একরোখামি ও নিজ স্বাধীন মত-প্রকাশের ব্যপদেশে আচরণের অসংযম, এমন কি পরিবারস্থ সকলের মনোবেদনার প্রতি উদ্ধত উপেক্ষা, বড় ভাই-এর সমস্ত ক্ষমাস্নিগ্ধ, ব্যথাকুণ্ঠিত আচ্ছাদন-প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া তাহার পিতামাতার অপক্ষপাত তুলনার ভিতর দিয়া নিঃসন্দিগ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। একই আদর্শবাদের আবহাওয়ায় লালিত-পালিত, একই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে পুষ্ট, একই বিপদসংকুল কর্মপন্থার অনুসরণে ঐক্যবদ্ধ, শৈশব-যৌবনের সহস্র সুখদুঃখময় স্মৃতিজালে পরস্পরের প্রতি দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন এই দুই ভ্রাতার মধ্যে কেমন করিয়া এই মর্মান্তিক ব্যবধান সৃষ্টি হইল, তাহা মানব-প্রকৃতির একটি চিরন্তন রহস্য।

তারপর উহাদের পিতামাতার দাম্পত্য জীবন ও উভয় সন্তানের প্রতি

মনোভাবও চমৎকারভাবে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। মাস্টার মহাশয়ের দেব-সেবায় ও গান্ধীর প্রতি দেবোচিত শ্রদ্ধাভক্তিতে উৎসর্গীকৃত, সর্বত্যাগী জীবনে পারিবারিক স্নেহ-ভালবাসার উৎসমুখটি এক বিরাট উদ্দেশ্যের অনমনীয় গাম্ভীর্যের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল, কাজেই ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার একটি সহজ, সহৃদয় আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই। এমন কি তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে আচরণেও অকুণ্ঠিত, স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা, কর্মে ও চিন্তায় স্বতঃস্ফূর্ত সমপ্রাণতার অভাব দেখা যায়। মনে হয় যেন পিতার আদর্শবাদ পরিবারস্থ অন্য সকলের সোৎসাহ সমর্থনের অপেক্ষা না করিয়া অনেকটা কৃত্রিমভাবে তাহাদের উপর চাপানো হইয়াছিল। অন্য সকলে এই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছে অস্বাভাবিক, সর্বগ্রাসী তীব্রতার সহিত; ইহাতে যেন প্রাণধর্মের সাড়ার পরিবর্তে আছে যান্ত্রিক আতিশয্য। বাহিরের এই আকর্ষণে পরিবারের অন্তঃসংহতি যেন কতকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে—রাজনীতির চাপে পারিবারিক জীবনের সুকুমার বিকাশগুলি কতকটা শীর্ণ হইয়াছে, ঝড়ে অস্থিরভাবে আন্দোলিত বৃক্ষে নীড়-রচনার প্রয়াস ঠিক সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। পিতার স্বীকারোক্তি ও মাতার ক্ষুব্ধ অনুযোগ এই সত্যকেই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। পথিক-জীবনের যাযাবরত্ব গৃহের আশ্রয়কে বিধ্বস্ত করিয়াছে, মতবাদের উগ্র পার্থক্য ইহার কেন্দ্রানুগ শক্তিকে অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে আপন আপন স্বৈরাচারের স্বতন্ত্র কক্ষপথে ছুটাইয়াছে। গৃহ আশ্রমে দাঁড়াইয়াছে, গৃহিণী আশ্রম-পরিচালিকার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন; দেশসেবীদের ভিড়ে পারিবারিক অন্তরঙ্গতা উঠিয়া গিয়াছে। ইহার নীতিগত প্রতিষ্ঠানভূমি বিচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অধ্যাত্ম প্রভাবও লুপ্ত হইয়াছে। আশ্রম হোটেলে পরিণত হইয়াছে; ঘরের সহিত আত্মার সূক্ষ্মতর সংযোগ ছিন্ন হইয়া ইহা কেবলমাত্র দেহধর্মের জড় আশ্রয় ও পরিপূর্তির উপায়মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। গার্হস্থ্য পরিবেশের এই ক্রমাবনতি ও বিকারটি অনুভব না করিলে পরিবার-ধর্মের প্রতি এরূপ নিদারুণ আঘাত ও চরম বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাব্যতার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উপন্যাসের প্রত্যেকটি পাত্র-পাত্রী তাহার উক্তি ও জীবন-পর্যালোচনার ভিতর দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব ব্যক্ত করিয়াছে। বিলুর

আলোচনার মধ্যে একটি উদার, দার্শনিক নিরাসক্তি ও নিরপেক্ষতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার শৈশব-স্মৃতি-রোমন্থনের মধ্যে তাহার ছোট ভাই-এর সহিত সম্বন্ধটিই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই দুরন্ত ভাইটির সমস্ত অবিনয়, অসংযম ও উৎকট আত্মপ্রীতি সে নিজের স্নেহচ্ছায়ায় আবৃত করিয়া যতদিন সম্ভব তাহাকে লইয়া একপথে চলিয়াছে। যেদিন মতবাদের স্বাতন্ত্র্য ভ্রাতৃস্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে, সেদিনও সে কোন ক্ষোভ বা অনুযোগ প্রকাশ না করিয়া প্রসন্ন ধৈর্যের সহিত নিজ স্নেহদীপে অনির্বাণ শিখাটি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। তাহার মনে হয়ত গোপন আশা ছিল যে, পলাতক পাখীটি ঐ আলোকরেখার শান্ত ইঙ্গিতটির অনুসরণ করিয়া আবার স্নেহনীড়ে ফিরিয়া আসিবে। তাহার পরিবর্তে যখন আসিল নিদারুণ আঘাত তখনও সে অপরিসীম সহিষ্ণুতার সহিত তাহার বেদনাকে অন্তরমধ্যে নিরুদ্ধ করিয়াছে—ক্বচিৎ অসংবরণীয় মর্মজ্বালা ভুলিবার সমস্ত আয়োজনকে ব্যর্থ করিয়া, পূর্বস্মৃতির শীতলজলে অবগাহনের প্রতিষেধক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া, ইহা অনিবার্য তীব্রতার সহিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আসন্ন মৃত্যুকে সে বীরোচিত ঔদাসীন্যের সহিত বরণ করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু এই লৌহবর্মের কপট দুর্ভেদ্যতার অন্তরালে গোপন দুর্বলতার স্বীকৃতি তাহার সত্যসন্ধতার পরিচয় বহন করিয়াছে। দেশবাসী তাহার তরুণ, অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার, উদ্বেলিত প্রাণের আত্মোৎসর্গের উপযুক্ত মর্যাদা দিবে কি না এই বিষয়ে অনিশ্চয়তা তাহার মনকে নিষ্কাম ধর্মের উচ্চ আদর্শ হইতে মুহুর্মুহুঃ স্খলিত করিতেছে। বিহারের মেয়ে সরস্বতীর প্রতি তাহার মনোভাব, বাল্যসাহচর্য, সহকর্মিতা ও প্রেম এই সমধর্মী ভাবসমূহের মধ্যে এক অনিশ্চিত পর্যায়ে দাঁড়াইয়া দ্বিধায় দোদুল্যমান হইয়াছে। পিতার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা আদর্শ-পরিবর্তনের পরেও অক্ষুণ্ণ আছে; কিন্তু উভয়ের মধ্যে সসম্ভ্রম ব্যবধান কোনদিনই ভালবাসার সেতুবন্ধনে অতিক্রান্ত হয় নাই। মাতার প্রতি তাহার ছেলেমানুষী আবদার ও স্নেহাতিশয্য বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শান্ত-সংযত হইয়াছে, কিন্তু এখানে মাতার প্রভাব তাহার মনে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রতিবেশিনী জেঠাইমা তাহার মাতৃস্নেহের প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে তাহার স্নেহবুভুক্ষাকে অনেকটা মিটাইয়াছে। সবসুদ্ধ মিলিয়া চরিত্রটি পূর্ণমাত্রায় সজীব হইয়াছে।

(৪)

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বক্তা বিলুর পিতা, মাস্টারমহাশয়। তিনি মহাত্মাজীকে নিজ জীবনের আদর্শ ও নিয়ামকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই আদর্শবাদের লৌহ-নিয়ন্ত্রণ তাঁহার জীবনযাত্রাকে যে পরিমাণে গভীর ও একনিষ্ঠ, ঠিক সেই পরিমাণে সংকীর্ণ করিয়াছে। গান্ধীবাদের উদারতা তাঁহাকে বিরোধী মতবাদের প্রতি সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ করিয়াছে। আহার সম্বন্ধে কৃচ্ছ্রসাধন, ধ্যান-উপাসনা ও গীতাপাঠের দ্বারা তিনি দুর্বিষহ পুত্রশোকের জন্য মনকে প্রস্তুত করিতেছেন। জেলের সহধর্মিবৃন্দ তাঁহার পরিচর্যা ও সান্ত্বনা-বিধানের জন্য উৎকণ্ঠিত আগ্রহের সহিত তাঁহাকে ঘিরিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের আজীবনলব্ধ স্থৈর্য ও দৃঢ়তা, তাঁহার অনুরাগী ভক্তদের শুশ্রূষা ও গীতার মহাবাণী তাঁহার এই চরম পরীক্ষার দিনে তাঁহার স্নেহদুর্বল পিতৃহৃদয়ে ব্যাকুলতার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আজ তাঁহার সাধনার দ্বারা অনুশীলিত চিত্ত সংযমের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুহুর্মুহুঃ অতীতে ছুটিয়া যাইতেছে, ও তাঁহার পারিবারিক জীবনের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণ দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহাকে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন করিতেছে। যে স্নেহের সহায়তায় পিতৃত্বের অধিকার সন্তানের জীবনে কার্যকরী হয়, তাহারই অভাব তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনায় তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে পদ্ধতির পার্থক্য সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। বাপের দৃষ্টি কয়েকটি স্থুল বাহিরের ঘটনায় সীমাবদ্ধ; মায়ের পর্যবেক্ষণে অনেক বেশি অন্তর-রহস্যভেদী সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় মিলে। সাধারণতঃ কর্মব্যস্ত, ও এ ক্ষেত্রে আদর্শবাদের নেশায় মশ্‌গুল পিতার জ্ঞান বিশেষ গভীরতার ধার ধারে না; কিন্তু মাতার দৃষ্টি অনুসন্ধিৎসায় তীক্ষ্ণ ও স্নেহে মর্মভেদী। পিতার স্মৃতিতে ছেলেদের কৈশোর-যৌবনের কাহিনীই প্রধান; মাতার স্মৃতি প্রধানতঃ শৈশব কাহিনীগুলিকেই নিজ ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রীর সংবরণশীলতা ও নিজের অন্যমনস্কতার মধ্যে বাধা অতিক্রম করিয়া যে কয়েকটি ঘটনা পিতার দৃষ্টিতে আঘাত করিয়াছে তাহাই পুত্রদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণার সীমারেখা। কোল লইয়া কাড়াকাড়িতে ভবিষ্যতের যে বীজ অন্তর্গূঢ়, সেই অনাগতের গভীর স্তর পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি পৌঁছিবে

কিরূপে? মাস্টারমহাশয়ের চরিত্রটিতে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য নাই; আছে আত্মসংবৃতির বেড়া-ডিঙ্গানো অনিবার্য চিত্তচাঞ্চল্য ও স্বল্পভাষী গভীরতার সহজ মহিমা।

তৃতীয় অধ্যায়ে মাতার জবানী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মাতার চরিত্রটি একটু জটিলতর ও ইহার বিভিন্ন দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য অনিশ্চিত। অতীত পর্যালোচনায় পুত্রদের শৈশব-স্মৃতির উদ্‌ঘাটনে তাঁহার মাতৃপ্রকৃতির একদিক্‌কার সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দিক্‌ দিয়া তাঁহার যে পরিচয় পাই তাহা তাঁহার সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল, স্নেহকোমল মাতৃপ্রকৃতির সহিত ঠিক একাত্মভাবে মিশিয়া যায় না। প্রথমতঃ, ছেলের আসন্ন ফাঁসির ঠিক পূর্বক্ষণে মাতৃহৃদয়ের যে অসাড়তা ও একাভিমুখীনতা স্বাভাবিক এখানে তাহা ঘটে নাই। এই সর্বগ্রাসী সম্ভাবনার ছায়াতলেও তাঁহার মন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, নানা ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় আপনাকে শিথিলভাবে ছড়াইয়া দিয়াছে। রোগযন্ত্রণা, রুক্ষ মেজাজ, ছোটখাট বিষয়ে অভিমান, এমন কি ঈর্ষ্যা ও কলহপ্রিয়তা তাঁহার প্রত্যাশিত মানস একাগ্রতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। যাহার সম্মুখে সর্বনাশের অতলস্পর্শ গহ্বর মুখ-ব্যাদান করিয়াছে, এইরূপ তুচ্ছ অসংলগ্নতা তাহার চিন্তাকে অধিকার করিতে পারে কিনা এ বিষয়ে সংশয় জাগে। অবশ্য লেখক হয়ত একটি অত্যন্ত সাধারণ প্রকৃতির স্ত্রীলোকের চিত্র আঁকিতে চাহিয়াছেন, যাঁহার মুখমণ্ডলে আদর্শ মাতৃমূর্তির স্বর্গীয় জ্যোতির আভাস নাই। কিন্তু যেমন মদের দোকানে সুরাপানোন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল জনতার মধ্যে শিশু-মুখের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি মাতার চক্ষু স্নেহার্দ্র ও স্বর্গীয় আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, সেইরূপ এই পরিস্থিতিতে অতিসাধারণ মাতাও অসাধারণত্ব অর্জন করিতে সক্ষম।

মাতার এই প্রকৃতি-বিকারের আরও একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকিতে পারে। কৃত্রিম আদর্শবাদের চাপে তাহার সমুদয় প্রকৃতিটি যেন বাঁকিয়া-চুরিয়া গিয়াছে—জীবনব্যাপী আত্মদমনের ফলে তাঁহার স্বাভাবিক চরিত্র-মাধুর্যে যেন ঝাঁঝালো উত্তাপের সঞ্চার হইয়াছে। মুখ বুজিয়া প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ করিতে করিতে তাঁহার মানস অবস্থায় যে বিপর্যয় ঘটিয়াছে, রোগজীর্ণ স্নায়ুবিকার তাহার বহির্লক্ষণ ও মনের অন্তররুদ্ধ-বাষ্প-নিষ্কাশন তাহার আভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তি। তাহার জীবনের তিক্ত ব্যর্থতাবোধ কৃচ্ছ্রসাধনের

সমস্ত আত্মপ্রসাদকে বিদীর্ণ করিয়া, জেলের এই অবাধ স্বাধীনতা ও প্রচুর অবসরে, প্রতিবেশের প্রতি ক্ষুব্ধ আক্রোশে, উগ্র, ঝাঁঝালো কথাবার্তায়, সমবেদনার রূঢ় প্রত্যাখ্যানে ও সেবাগ্রহণের তীব্র অস্বীকৃতিতে উদ্‌গীর্ণ হইয়াছে। আজীবন স্বামীর নির্বিকার আজ্ঞা-প্রতিপালনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাঁহার বিরুদ্ধে গূঢ় অভিমান উথলিয়া উঠিয়াছে। নীড়রচনার নারীসুলভ আগ্রহ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে তাঁহার মনকে বিষাইয়া তুলিয়াছে। সরস্বতীর সহিত বিলুর বিবাহে আপত্তি প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক উন্মাদনা তাঁহার পারিবারিক ঔচিত্যবোধ ও সংস্কৃতিগত শ্রেষ্ঠত্বাভিমানকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে পারে নাই। জেঠাইমার প্রতি তাঁহার অহেতুক ঈর্ষ্যার উচ্ছ্বাস এই পারিবারিক আশাভঙ্গের জন্য গূঢ় অতৃপ্তিরই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং মনে হয় যে, এই সংকট-মুহূর্তে তাঁহার মনের অস্থির ছুটাছুটি, বিপদের কেন্দ্রবিন্দুর প্রতি অবিচল মনঃসংযোগে অক্ষমতা তাঁহার অসুস্থ বিকারেরই নিদর্শনরূপে লেখক কর্তৃক পরিকল্পিত হইয়া থাকিবে।

এখানে আরও দ্রষ্টব্য এই যে, নীলুর বিশ্বাসঘাতকতার কথা কেবল অসমর্থিত গুজবরূপে তাঁহার কানে পৌঁছিয়াছে—ইহাকে অসন্দিগ্ধ সত্য বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এই নিদারুণ সংবাদের সত্যতা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইলে তাঁহার মানসবিপর্যয় আরও কি অভাবিতপূর্ব বিকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিত তাহা অনুমানের পর্যায়েই রহিয়া যায়। মাতার সমস্ত চিন্তাধারা ও আচরণ আলোচনা করিলে, এই সমস্ত সত্ত্বেও, যেন খানিকটা সঙ্গতির অভাব লক্ষ্য হয়। অন্তরে যে সমস্ত প্রভাবে মাতৃহৃদয় তাহার শাশ্বত গৌরব হইতে অংশতঃ বঞ্চিত হইয়াছে, সেগুলির সম্ভাব্যতা আমাদের নিকট সেরূপ পরিস্ফুট হয় নাই। লক্ষ্যভেদের পূর্বে অর্জুনের ন্যায়, পুত্রের মরণের জন্য প্রতীক্ষমান জননীহৃদয় সর্বনাশের সেই একটি কৃষ্ণবিন্দুর উপর তাঁহার লক্ষ্য অবিকল্পভাবে স্থির রাখিতে পারেন নাই; এবং ইহাতেই মাতৃত্বের মর্যাদা-হানি ঘটিয়াছে।

ছোট ভাই নীলুর জবানীটি সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য। অন্যান্য বক্তার মুখ হইতে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মায়, তাহার নিজের উক্তিতে তাহার সমর্থন হয় না। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, যে প্রেরণার বলে সে বড়

ভাই-এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া তাহাকে মৃত্যুপথযাত্রী করিয়াছে তাহা কত দুর্দমনীয় ও সহজ ভ্রাতৃস্নেহের সঙ্গে তাহার দ্বন্দ্ব কত তীব্র তাহার একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তাহার উক্তির মধ্যে মিলিবে। কিন্তু আমাদের এই প্রত্যাশা সফল হয় নাই। নীলুর আত্মগত উক্তির মধ্যে কোন তীব্র অনুশোচনা বা অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় মিলে না। সে ভাই-এর ছোটখাট সুবিধা-আরামের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু তাহার মৃত্যুর জন্য নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন বলিয়া মনে হয় না। সে ভাই-এর তাহার সম্বন্ধে ধারণা জানিবার জন্য কৌতূহলী, তাহার মৃত্যুকালীন চিন্তা অনুমান করিতে সচেষ্ট, কিন্তু যে রহস্যের উপর আলোকপাত কেবল সেই করিতে পারে, তাহাকে সে যেন পাশ কাটাইয়া গিয়াছে। তাহার অন্তরের কোন্ জটিল শিরা-স্নায়ু-সংস্থিতির বিস্ফারিত ধনুর্গুণ হইতে এই মৃত্যুবাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার রহস্য আমরা ভেদ করিতে পারি না। সে জেলতোরণে ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে করিতে বেশির ভাগ সময়ই বাহিরের রক্ষিবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করিয়াই কাটাইয়াছে। তাহার এই মন্থর, স্তিমিত প্রতীক্ষা কোন অন্তঃরুদ্ধ আবেগের ও মর্মভেদী আত্মগ্লানির চাপে দুঃসহ ও শ্বাসরোধকারী হইয়া উঠে নাই। ফাঁসির অপ্রত্যাশিত মুলতবী সংবাদও তাহার মনে এক অনির্দিষ্ট আশা ছাড়া আর কোনও প্রবলতর আলোড়ন জাগায় নাই। লেখকের ধীরগামী, যদৃচ্ছ বিশ্লেষণ-পদ্ধতি কেবল একবারমাত্র, বিলুর শেষ মুহূর্তের মৃত্যুভীতিগ্রস্ত বিকারের উদ্দাম গতিবেগ ও অনুভূতি-বৈক্লব্যের মধ্যে আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছে; কিন্তু অন্য কোথায়ও ইহার কোন ছন্দপাত হয় নাই, অলস স্মৃতি-রোমন্থন নাটকীয় পরিণতির দুরারোহ তুঙ্গতায় উন্নীত হয় নাই। নীলুর উক্তির মধ্যে এই ত্রুটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আখ্যায়িকার মূলে আছে ট্রাজেডির প্রেরণা, কিন্তু বর্ণনাভঙ্গীতে ইহা অতীত ঘটনার বহুধাবিভক্ত বিষাদময় স্মৃতির সঞ্চরণ-পথে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ট্রাজেডির রস কোথাও ঘনীভূত নির্যাসে সংহত হইয়া উঠে নাই।

মনে রাখিতে হইবে যে, এই উপন্যাসের বিষয় কেবলমাত্র সাধারণ কারা-জীবনের বা মুক্তিসংগ্রামের ভাবোন্মাদের বর্ণনামাত্র নহে, ইহা ভ্রাতৃস্নেহের বিরুদ্ধে দেশের প্রতি কর্তব্যবোধের দুরূহ, দ্বিধাখণ্ডিত আত্মপ্রতিষ্ঠা।

আখ্যায়িকার সমস্ত মর্মন্তুদ আর্তি এই মূল বিষামৃতের মিশ্র প্রস্রবণ হইতে উদ্ভূত। সুতরাং ইহার মধ্যে পূর্বস্মৃতির উদ্বোধন, অতীত ইতিহাসের পুনর্গঠন এই উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে যে স্মৃতিগুলি পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে তাহারা যেন প্রতিবেশ-সংগঠনের উদ্দেশ্যে অনেকটা যদৃচ্ছাক্রমে সংকলিত। অবশ্য মনস্তাত্ত্বিকদের মতে, মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষমান সুস্থ ব্যক্তির মনে সমস্ত অতীত জীবন দ্রুতসঞ্চারী ছায়াচিত্রাবলীর ন্যায় পুনরভিনীত হয়; ইহাদের মধ্যে গুরু-লঘু, সাধারণ-অসাধারণের বিশেষ কোন পার্থক্য অনুভূত হয় না। স্বতঃস্ফূর্ত আকস্মিকতা শাশ্বত মূল্যবোধকে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়; সুবর্ণ অপেক্ষা পিত্তলই অনেক সময় বেশি ভাস্বর দেখায়। এই দিক্ দিয়া স্মৃতিবাহিনী-সন্নিবেশের শিথিল নিয়মহীনতার একটা মনস্তাত্ত্বিক সমর্থন আছে। কিন্তু যে নিরঙ্কুশ কল্পনা মূল্যবোধের নির্দেশকে অস্বীকার করিতে পারে, তাহার পক্ষে ট্রাজেডির নিগূঢ়তর অনুশাসন উপেক্ষা করা কঠিন। শুধু সরকারী ফাঁসির বন্ধনরজ্জু হয়ত অতীতের অন্ধ গহ্বর হইতে উৎসারিত জীবনবুভুক্ষাকে নিয়মতান্ত্রিকতার পাশে সংযত করিতে পারে না; কিন্তু যেখানে ভ্রাতার স্নেহময় হস্ত এই উদ্বন্ধন-পাশের গ্রন্থনে সহায়তা করিয়াছে, সেখানে এইরূপ স্বেচ্ছাভ্রমণকে এই বিপর্যয়মূলক অনুভূতির নিয়ন্ত্রণাধিকার মানিতেই হইবে। মনে হয় যে, লেখক এই ট্রাজেডির তাৎপর্যটি যথেষ্ট একাগ্রতার সহিত গ্রহণ করেন নাই; মাঝে মধ্যে ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ইহাকে অবচেতন মনের গভীরতায় প্রোথিত করিয়াছেন। এই অনবধানতার জন্যই এই অনবদ্য কারাকাহিনীটি ঠিক ট্রাজেডির মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই মনে হয়।

(৫)

কারা-সাহিত্যে অতীন্দ্রনাথ বসুর "বি-কেলাস" আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এটি ঠিক উপন্যাস নয়, গভীর মননশীলতার ফ্রেমে বাঁধা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমষ্টি। লেখকের উদ্দেশ্য কারাজীবনের একটা তথ্যগত বিবৃতি নহে, ইহার কঠোর আইন-বিধানে আবদ্ধ দৈনন্দিন জীবনধারার একটা নিখুঁত প্রতিলিপিকরণ নহে। তাঁহার মনোভাব ঐতিহাসিকের বা

স্বদেশপ্রেমিকের নহে, মানবপ্রকৃতির অফুরন্ত বৈচিত্র্যপিয়াসী কৌতূহলী দার্শনিকের। তারাশঙ্করের কারাচিত্রে একদিকে আছে রাজনৈতিক আদর্শবাদের উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে জেলজীবনের বিভিন্ন স্তরের বাস্তবচিত্রণ—বিশেষ কোন চরিত্রের প্রতি অসাধারণ কৌতূহল নাই, আছে সমস্ত কয়েদী মিলিয়া কারাজীবনযাত্রার যে বিচিত্র, বেস্থরো ঐকতান-বাদন সৃষ্টি করিতেছে তাহার ছন্দটি ধরিবার শিল্পীজনোচিত আগ্রহ। এখানে যেন একটা গাজনের ভিড় বা কবির গানের মত সম্মিলিত জনসংঘের দ্বারা একটা কৌতুকনাট্যের অভিনয় চলিতেছে। এই কৌতুকের ফাঁকে ফাঁকে করুণরসের ছিটেফোঁটা আছে, কিন্তু সবশুদ্ধ মিলিয়া যেন একটা উদ্দাম-উতরোল স্ফূর্তির প্রাধান্য। সতীনাথ ভাদুড়ীর গ্রন্থে আছে একটি অবিমিশ্র রাজনৈতিক প্রতিবেশের মধ্যে একই পরিবারের চারিটি ব্যক্তির জীবন-পর্যালোচনা এবং ইহারই সহিত অনিবার্যভাবে সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক জেল-প্রতিবেশ। এখানে অতীতের স্মৃতি বর্তমানের অভিজ্ঞতাকে অভিভূত করিয়াছে, জেলের একদিনকার জীবন যেন বহুবর্ষব্যাপী অতীত-সঞ্চরণের প্রবৃত্তি ও প্রেরণা দিয়াছে; দেহের শৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়া মানসবিহারের অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা স্ফূর্ত হইয়াছে। এখানে সাধারণ কয়েদীদের উল্লেখ মাত্র নাই; অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীরাও কেবল প্রতিবেশ-পূরণের উদ্দেশ্যে, প্রধান চরিত্র চারিটির অনুপূরক হিসাবে নিতান্ত গৌণ অংশ অধিকার করিতেছেন, লেখক তাঁহাদের কোন স্বতন্ত্র মানবিক মর্যাদা দেন নাই। তাঁহার আসল উদ্দেশ্য হইল জেলের অখণ্ড অবসরে মৃত্যুর হিমশীতল আতঙ্কের আঁকশির সাহায্যে সুদূর অতীতের দুরারোহ শাখা হইতে স্মৃতির কুসুমচয়ন; এবং এই স্মৃতির উপাদান লইয়া বক্তাদের প্রাক্‌-কারাজীবনের পূর্ণাঙ্গ পুনর্গঠন।

অতীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জেলপ্রাচীরের অভ্যন্তরে মানব-মনের যে বিচিত্র স্ফুরণ হয়, যে অসাধারণ ব্যতিক্রমের সমাবেশ হয়, তাহাই প্রধানতঃ তাঁহার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। জেলখানার মৌচাকে সঞ্চিত এই মধু-বৈচিত্র্যই বিশেষভাবে তাঁহার আস্বাদনের বিষয়। এখানে কয়েদীদের ঠিক চরিত্রচিত্রণ নাই, আছে তাহাদের অন্তর-রহস্যের অদ্ভুতত্বের খানিকটা উদ্‌ঘাটন ও ইহাকে কেন্দ্র করিয়া সূক্ষ্ম মননশীলতার জালবয়ন। বইখানিতে আখ্যায়িকার ধারাবাহিকতা বা জেলজীবন-বর্ণনার তথ্যবহুল সম্পূর্ণতা নাই;

বৈচিত্র্যের রস-আস্বাদনের ফাঁকে ফাঁকে উহাদের কিঞ্চিৎ গৌণ আভাস মাত্র পাওয়া যায়। রাজনৈতিক আদর্শবাদ বা সন্ত্রাসবাদের সংগঠন-নৈপুণ্য ও কর্মনিষ্ঠা লেখকের কর্মবিমুখ ও চিন্তাশীল মনে কোন সোৎসাহ সমর্থন পায় না। নিরাপত্তা-বিধানের ধারায় অবরুদ্ধ বন্দিগণের চিত্র খুব সুস্পষ্ট নয়—কিন্তু তাহাদের প্রাণশক্তির রহস্য, তাহাদের হৃদয়ে অনির্বাণ বহ্নিদাহের উদগ্র প্রেরণা তাঁহার মনীষাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাহাদিগকে তিনি দেখিয়াছেন ততটা মানুষ হিসাবে নয়, যতটা এই দুর্জ্ঞেয়, দুর্জয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আধার ও বাহনরূপে। তেমনি জেলের যান্ত্রিক জীবনের যাহারা কলকব্জার পর্যায়ভুক্ত সেই মেট, ওয়ার্ডার, পাহারা প্রভৃতি শ্রেণীর লোক—মামু, ভিখন, গণি, জেলডাক্তার, রসরাজ—ইহারা স্বমহিমায় নহে, ক্ষুদ্র কৌতুক-নাট্যের অভিনেতারূপে, জীবনের আকস্মিক ঝলকানির ঠিকরানো আলোকরূপে লেখকের কৌতূহলের বিষয়ীভূত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক আড্ডা-জটলায়, কৌশল ও শক্তির প্রতিযোগিতায়, সমবেদনামূলক অভিজ্ঞতা-বিনিময়ের ভিতর দিয়া, চোখরাঙ্গানিতে, উপহাসকৌতুকে, দরদের স্পর্শে যে একটি উপভোগ্য প্রতিবেশ রচিত হইয়াছে, মানবপ্রকৃতির যে একটি অভিনব পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইতেছে—লেখকের দার্শনিক সমীক্ষণের তাহাই উপজীব্য। কোন মুসলমানের ছেলে জেলের অবসরের সুবিধা লইয়া লেখাপড়া শিখিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে ব্যগ্র; কোন ডাকাত-সর্দার জেলের অবমাননা ও উৎপীড়নের মধ্যেও নিজ মর্যাদা ও সংকল্প অক্ষুণ্ণ রাখে; কোন গুণ্ডার উপকার করিয়া হাতে হাতে বিড়ির পুরস্কার লইতে আত্মসম্মানে বাধে; কোন কয়েদী গান গাহিয়া রোগক্লিষ্ট বন্দীর বেদনাকে ঘুম পাড়াইতে চাহে; কোন স্বভাব-অপরাধী স্ত্রীকে খুন করিয়া ও মেয়েদের বিক্রী করিয়া সংসারের হাঙ্গামা চুকাইয়া ফেলিয়া জেলের ভিতর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ফিরিয়া আইসে; আবার কোন একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমিক দ্বিতীয় বিবাহের কপট প্রস্তাবে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়। কোন ময়মনসিংহের চাষী যুবক প্রহরীর উৎপীড়নের পরিবর্তে রোজার উপবাসের পর তাহাকে নিজের খাদ্যাংশের অর্ধেক দিয়া প্রকৃত পুণ্য পালন করে ও শিক্ষাভিমানীর নীতিবোধের শ্রেষ্ঠতাকে লজ্জা দেয়। কোথায় কোন নিরক্ষর চাষীর পারিবারিক মায়ামমতা ও কর্তব্যবোধ শিক্ষিত অধ্যাপকের বন্দী পিতার প্রতি উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের বিসদৃশতাকে কলঙ্কলাঞ্ছিত করে—

জীবনের এই সমস্ত অপ্রত্যাশিত স্ফুরণের টুকরো টুকরো মণিমাণিক্যগুলিকে লেখক নিজ সহানুভূতির সূত্রে বিদ্ধ করিয়া রং-এ বিচিত্র ও সাংকেতিকতায় ভাস্বর একটি রত্নহারে গাঁথিয়াছেন। বন্দিশালার কালো নিকষে মানবচরিত্রের যাচাই-এ এইরূপ সোনা ও গিল্‌টির যে বিভেদ ফুটিয়া উঠিতেছে, মুক্তজীবনের শিথিল স্বচ্ছন্দতার মানদণ্ডে তাহা বোধ হয় কোন কালেই ধরা পড়িত না।

দার্শনিকতার বিচিত্র-রেখাকীর্ণ ভাবজালের অন্তরাল হইতে যে সমস্ত খণ্ডদৃশ্য কতকটা অস্পষ্টভাবে উঁকি মারিতেছে, তাহাদের সংকেতে একটি পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকা তাহার বীভৎস প্রতিবেশ, তীক্ষ্ণ বাস্তবতা ও রোমাঞ্চকর অখণ্ড পরিণতি লইয়া ইহাদের বিপরীতধর্মী এক চোখধাঁধানো সুস্পষ্টতায় আমাদের নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। "পাতালের মানুষ" সুনীলের অসাধারণ অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবনকাহিনী, ইহার দুর্দমনীয়, বিকৃত প্রাণশক্তি, ইহার পাপ-কলুষ ক্লেদ, ইহার আকস্মিক অপত্যস্নেহের স্ফুরণ ও অন্তরদীর্ণ আত্মগ্লানির নবজন্মবেদনা লইয়া, সাধারণ ও প্রত্যাশিত পথের পথিক আমাদের মনে এক বিপর্যয়কারী বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এই আখ্যানের সঙ্গে সংযোজিত দার্শনিক মন্তব্য ও জীবনসমালোচনা ইহার আরণ্য হিংস্রতার উপর কোন সহজবোধ্য মতবাদের ছদ্মবেশ পরায় নাই, বরং ইহার অতিকায় বর্বরতার দুঃসহ চমককে তীব্রতর করিয়াছে। ইহার প্রতিবেশের অভিনবত্ব বাংলা সাহিত্যের সুদূরপ্রসারিত ভৌগোলিক মানচিত্রের মধ্যে এ যাবৎ অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। কালিঘাটের মন্দিরের পাশে বস্তি ও ভদ্রজীবনের এই উদ্ভট সন্ধি, গণিকা ও গার্হস্থ্যবিধির এরূপ অদ্ভুত সংমিশ্রণ, একনিষ্ঠতা ও বহুচারিণীত্বের রফা-নিষ্পত্তিমূলক মিতালি, বাস্তব কদর্যতা হইতে সাহিত্যের সৌন্দর্যাভাস-বিচ্ছুরিত মায়ালোকে ইতিপূর্বে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এখানে বাড়ীওয়ালী মাসীর সতর্ক অভিভাবকত্ব, উপগৃহিণীদের আপাত-দৃষ্টিতে শান্ত, সংযত জীবনযাত্রা ও গার্হস্থ্য শালীনতার ত্রুটিহীন অনুবর্তন, ইহাদের অনুপস্থিত গৃহপতির জন্য ধৈর্যমধুর প্রতীক্ষা, কোন এক বিহ্বল মুহূর্তে সম্ভ্রমের মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া, অতৃপ্ত কামনা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়-ভাঙ্গানো সঞ্চয়-স্পৃহার যুগ্ম নেশায় মাতাল হইয়া পাতালের দিকে ঢলিয়া পড়ে। এ যেন দুঃসাহসিকতার অপব্যয় ও সাবধানীর অতিসঞ্চয়ের এক অস্বাভাবিক যৌথমিলন। এই জীবনে কখন কখন দাম্পত্য-সম্পর্কের

অতিরিক্ত বৃহত্তর পারিবারিক জীবনের স্নেহ-মায়া-মমতার জন্য একটা ক্ষুব্ধ আকৃতির দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা যায়; স্নেহভাজন কোন কনিষ্ঠ আত্মীয়ের জন্য গার্হস্থ্যের ছদ্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতা এই নারীগণের মন আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে। কলের ক্ষুব্ধ জল আত্মপ্রসারের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় হিল্লোলিত সরোবরের দিকে চাহিয়া শূন্যতা অনুভব করে।

এই সমাজবিধির বিধান-ছাড়া স্নেহের প্রশ্রয়েই সন্ত্রাসবাদী মোহিতের এই প্রমীলার রাজ্যে পদার্পণ ও অবস্থিতি। তারপর প্রমত্ত বাসনা ও কাঞ্চনমোহের রন্ধ্রপথ দিয়া প্রবেশ করে রক্তাক্ত সর্বনাশ; নাগরবেশে বাসরে আবির্ভূত হয় মৃত্যু, চুম্বনে বিষ, মদির কটাক্ষে শাণিত ছুরিকার দীপ্তি, আলিঙ্গনে শ্বাসরোধ-কারী পেষণ লইয়া। উদ্‌ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ সম্ভোগ-স্পৃহার মাঝখানেই এই হতভাগিনীদের জীবন-নাট্যের উপর যবনিকা-পাত হয়। লেখক দুই একটি গীতিধর্মী উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়া এই ছদ্মবেশের অমর্যাদায় বিব্রত, নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের অভাবে টলমল, ক্ষণিকতায় শীর্ণ জীবনধারার অন্তর্নিহিত করুণ আবেদনটি চমৎকারভাবে ফুটাইয়াছেন—"এক একটা রাত আসে কেমন যেন নেশায় ছোপানো, আকাশের চাঁদিনী জানালা দিয়ে চুপিসাড়ে ঘরে ঢোকে, নিশুতি নীরবতার মধ্যে গঙ্গার কুলুকুলু আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। এমন রাতে একা থাকা যায় না। আকাশের জ্যোছনা চোর, নদীর কুলুধ্বনি চোর, ঝরণাও চোর হয়। কাদুমাসী ইসারায় সম্মতি দেন। বস্তির ঝি দৌত্য করতে বেরোয়। অতিথি আসে, রাত আর নেশা একসঙ্গে কাটে।"

লেখক জেলের জীবনব্যবস্থায় আর এক প্রবৃত্তির গোপন ফল্গু-প্রবাহ লক্ষ্য করিয়াছেন—অতৃপ্ত যৌনবুভুক্ষা। এই অবদমিত আকাঙ্ক্ষার কুৎসিত বাস্তব দিকটার কথা বিশেষ কিছু না বলিয়া তিনি আদিরসাশ্রিত অশ্লীল লোকগাথার ভিতর দিয়া ইহার নিষ্ক্রমণ-প্রয়াস সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য এই গানের উদ্ভব জেলের বদ্ধ আবহাওয়ায় নয়, বাহিরের মুক্ত জীবনের অচরিতার্থ লালসার প্রেরণায়; জেলে ইহার ব্যবহারটি বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, কামপ্রবৃত্তির প্রতিষেধকরূপে। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকেরাই—হিন্দু ও মুসলমান—এই সব গানের রচয়িতা ও উপভোক্তা। মনে হয় যেন কঠোর বিধিনিষেধের জালে শৃঙ্খলিত, নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণপিষ্ট জীবনের উদ্বৃত্ত ভোগস্পৃহা বৈধ সমাজ-ব্যবস্থাকে ছাপাইয়া এই

সমস্ত রসের গানে নিজ অদম্য উচ্ছৃঙ্খলতার সাক্ষ্য দেয়। ভদ্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কুরুচিপূর্ণ সাহিত্যপাঠ, নাটক-ছায়াচিত্র-দর্শন ও ভোগের অন্যান্য উপকরণ-প্রাচুর্যের ভিতর দিয়া এই মানস ব্যভিচার তৃপ্তির পথ খুঁজিয়া পায়—তাহাদিগকে অন্তঃসঞ্চিত আবিলতাকে মুক্তি দিতে নিজের হাতে কলম ধরিতে হয় না। আমাদের ধর্মসাহিত্যের মধ্যেও এই প্রাকৃত, অসংস্কৃত কামনা নিজ উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শ রাখিয়া গিয়াছে—শোধন ও আদর্শীকরণের সমস্ত প্রচেষ্টার ভিতরও ইহার আদিম রূপটি সম্পূর্ণ চাপা পড়ে নাই। বিদ্যাপতির পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের ঐশী, অলৌকিক প্রেমবর্ণনার মধ্যে এই প্রাকৃত উদ্দামতার মেঠো সুরটি সমস্ত ভক্তিরসপ্লাবন ও সাহিত্যিক অলঙ্করণের মাঝে মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। সে যাহা হউক, গ্রাম্য কৃষকের মনে এই আদিরসের ঢেউ ইতরগানের পলিমাটিতে যে ইহার প্রসারসীমার চিহ্ন আঁকিয়া গিয়াছে, তাহা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। পাহারার মধ্যে, ধরা পড়িবার ভয়ের উদ্বেগ ও অস্বস্তির পিছুটানে, অন্তরঙ্গ-গোষ্ঠী-পরিবৃত হইয়া এই নিষিদ্ধ বিলাসের চর্চা যেন বাস্তবজীবনের অবৈধ উপভোগের মতই কয়েদীদের স্নায়ু-শিরাতে একটা পুলকের উত্তেজনা বহাইয়া দেয়।

শুধু অশ্লীল গান নহে, সব রকম গানই জেলের সঙ্গীন-বন্দুকের ছলঘেরা মধুচক্রে ভ্রমর-গুঞ্জনের মতই ধ্বনিত হইয়া উঠে। জেলব্যবস্থার ব্যঙ্গাত্মক বা স্পর্ধিত, উল্লসিত অভিনন্দন বেপরোয়া, স্থিতিস্থাপক মনের ছাপ লইয়া গানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। দৈনন্দিন কর্মজাল হইতে মুক্ত কৃষকের সুপ্ত শিল্পবোধ অবসরের অনুকূল প্রভাবে, অনভ্যস্ত প্রতিবেশের উত্তেজনায়, আপনাকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করে। তাই বন্দী মকবুল জেলের প্রশস্তি রচনা করিয়া নিজ কবিধর্মের পরিচয় দেয়। রাজনৈতিক সংগ্রামের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনী জনসাধারণের মনে পুরাণোচিত অলৌকিকতার বিস্ময়-মণ্ডিত হইয়া গানের অভিষেক লাভ করে। কিন্তু অধিকাংশ গানই নাগরালীর নিঃসংকোচ মহিমাকীর্তন। মালদর ছিরুমণ্ডল, বীরভূমের সোনা বাউড়ী, ইয়াকুব মসলদার, রাখহরি মোদক, নিধু বৈরাগী, হিন্দুস্থানী দ্বারপাল, শৌখীন আধুনিকপন্থী রাজবন্দী—সকলেই নানা ভাব-ভঙ্গীতে, আপন আপন জেলার বিশিষ্ট সুর ও রুচির মাধ্যমে, কেহ বা দেহতত্ত্বের উপমায়, কেহ বা পারিবারিক কলহের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে, কেহ বা যৌন মিলনের পরোক্ষ আমন্ত্রণে, কেহ বা

বন্দিজীবনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেশে ফিরিবার ভাবার্দ্র ব্যাকুলতায়—মানবমনের এই প্রবলতম প্রবৃত্তি ও আদিম রিপুটির অনতিক্রম্য আকর্ষণের নিকট আনুগত্য জ্ঞাপন করিতেছে। বিদগ্ধ শ্রোতা ও ইতর গায়কের মধ্যে লজ্জা ও সামাজিক স্তরের ব্যবধান জেলখানার নিগূঢ় সমীকরণ-প্রভাবে, সম্পূর্ণ না হউক, অনেকটা লুপ্ত হইয়া যায় ও ইহারই ফলে পথিপার্শ্বের ঘাসের ফুল সাহিত্যের রাজকীয় উদ্যানে সংগৃহীত হইবার মর্যাদা লাভ করে।

কিন্তু "লাভ যে শুধু একতরফা অশিক্ষিত, রুচিহীন পল্লীকবির তাহা নহে, শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ লেখক এই পাঁক ঘাটিয়া যে রত্ন আহরণ করিয়া আনিয়াছেন তাহা সমস্ত শিক্ষাভিমানীর দম্ভ-টুটানো সুকৃতি-সঞ্চয়। এই কামায়নসাধনার পিচ্ছিল পথ ধরিয়া লেখক একেবারে বাংলার গণসংস্কৃতির সুরভি মর্মকোষে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। দেহতত্ত্বঘটিত সংগীতের মধ্যে যে কামনার পঙ্কস্তর বুদ্‌বুদে ফাটিয়া পড়িতেছে তাহারই উপরে নিরক্ষর গ্রাম্য কবির অনুভূতি মরমীসাধনার শতদল পদ্মের অনুপম সৌরভ ও শ্রীর সন্ধান পাইয়াছে। দক্ষিণ সমুদ্রে শ্রীমন্তের কালীমূর্তি-দর্শনের ন্যায় যৌন লালসার আকুল তরঙ্গবিক্ষোভের মধ্যে রূপাতীত পরম পুরুষের যোগাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করিয়া নহে, বিষয়-বাসনার উৎসাদনে নহে, গুরুমন্ত্রে ও সাধনায় তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া তাহাদের সাহায্যে আদর্শ লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে—শোধিত বিষেই অমৃতের আস্বাদন মিলিবে।

জ্ঞান-লগিতে দিয়া ঠেলা
কাম-আদি ছয় দাঁড়কি ফেলা
অনুরাগ-পালেতে চালা
ওরে আমার মন-ব্যাপারী।

এই লোকাতীতের জন্য সহজিয়া সাধনা, শাস্ত্রবিধির বিপরীত দিকে সহজ অনুভূতির পথে অভিযান, বাহির ছাড়িয়া অন্তরে অনুপ্রবেশ, বস্তুতন্ত্রতার শাসন কাটাইয়া রূপনগরের রংমহলের অন্বেষণ—বাঙলাদেশের বহু মঠ-আখড়ায়, আউল-বাউল-ফকির-দরবেশের গোষ্ঠী-পরম্পরার নিকট গচ্ছিত বহুযুগের অধ্যাত্ম সম্পদ। আজ আমরা সেই বৈভব হইতে বঞ্চিত। এই রিক্ততার জন্যই আজ বাংলার লোকচেতনার উৎস শুকাইয়া গিয়াছে। কোন্ নিগূঢ় অনুশীলনের ফলে বাংলাদেশের নিম্নস্তরের লোকের মধ্যে অধ্যাত্ম

অনুভূতি জাগিয়াছিল, কোন্ ভাবমত্ততার পরিমণ্ডলে ইহা গানরূপে বিকশিত হইয়াছিল, কোন্ অদৃশ্য রসসিঞ্চনে ইহার মূল বহু শতাব্দী ধরিয়া সজীব ছিল, কেমন করিয়া ইহা পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতাকে জয় করিয়াছিল—এই সব তথ্য বোধ হয় আর কোন দিনই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অন্তরলীন উপলব্ধিরহস্য তথ্যসঞ্চয়ী ইতিহাসের ভাণ্ডারে কোন দিনই জমা হইবে না। সে যাহাই হউক, শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞানে হীন এই পল্লীসাধকগোষ্ঠী কোন এক অলৌকিক উপায়ে যে নিখিল বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত অনুরাগ-ছন্দটি ধরিয়াছিল, নিজেদের জীবনবংশীকে অসীমের ফুৎকার-বায়ুতে পূর্ণ করিয়াছিল, এই ভেদবিচ্ছিন্ন জগতে সমস্ত ধর্মমতের সমন্বয়কে সাধনার মধ্যে মূর্ত করিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যেমন ফুলের কৌলীন্য গন্ধে, তেমনি অন্তর-অনুভূতির অকৃত্রিমতা তাহার প্রকাশভঙ্গীতে। মরমীসাধনার অঙ্গীভূত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সংগীতগুলিই ইহার অধ্যাত্ম উৎকর্ষের অখণ্ডনীয় নিদর্শন।

(৬)

লেখকের দার্শনিক উপলব্ধি এই লোকসংস্কৃতির সূত্র ধরিয়া কারাপ্রাচীরের বাহিরে কোন এক অসীমের রাজ্যে উধাও হইয়া গিয়াছে ও পাঠককেও তাহার সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। দার্শনিকতায় "বি-কেলাস" গ্রন্থের আরম্ভ ও এই একই সুরে ইহার পরিসমাপ্তি। মনে হয় যেন কারাগার নিতান্ত আকস্মিকভাবে লেখকের দার্শনিক অনুশীলনের ক্ষেত্র ও উপাদান যোগাইয়াছে। অতি সামান্য উত্তেজনাতেই তাঁহার মননশীলতা পক্ষবিস্তার করিয়াছে। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কারাকক্ষের নিঃসঙ্গতার মধ্যে শোনা কাকের ডাকে তাঁহার মনে পূর্বস্মৃতিরোমন্থন ও জীবনপর্যালোচনার ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে। এই প্রতিবেশের মধ্যে ইহার সাংকেতিক তাৎপর্যটি ইহার ধ্বনিরূপের আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার মনের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। রোমান্টিসিজমের স্বর্ণযুগের সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কোকিলের পঞ্চম স্বর লইয়া অনেক কাব্য-সৌন্দর্য ও আবেগধর্মী আলোচনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাংলাসাহিত্যের এখন আর সে তারুণ্য, সেই কাব্যপ্রবণতা নাই। বাস্তবাভিভূত কল্পনা আজ পঞ্চম সুরে থাকুক, কড়িমধ্যম পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না—আজ যে সংগীত ধ্বনিত হয় তাহা

কিন্তু মাঝের খানিকটা দৃপ্ত অগ্নিরেখার ন্যায় অনুভূতিকে বিঁধিয়া দিয়া গেল। 'লৌহকপাট' গ্রন্থে জরাসন্ধের কৃতিত্ব হইতেছে যে, মনের যেটুকু খেলা লেখকের ক্ষুদ্র পশ্চাৎপটে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মানবিকতা ও শিল্পায়নে কোনো খুঁত নাই, তাহার সবটুকু রসনির্যাস লেখকের লেখনীমুখে উঠিয়া আসিয়াছে। প্রকাশভঙ্গীর চারুতা, মন্তব্য ও জীবন-সমালোচনার করুণ, সমবেদনাস্নিগ্ধ যাথার্থ্যই জেলের ক্ষুদ্র পরিসরে লেখককে মানবমনের দরদী-পাঠক ও ভাবশিল্পীরূপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

সামান্য চিন্তা করিলেই এ-সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, কারাকক্ষের নির্জনতায় মানব-প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক অভিব্যক্তি ঘটে, উহার বিস্ফোরক বারুদের উপাদানটুকু বিকাশক্ষেত্র খুঁজিয়া পায়। ভাগ্যহত মানুষের ব্যতিক্রমধর্মী অসামাজিকতাই জেল-প্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করে। মানুষের মনের কত বিকার, কত অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, কত চমকপ্রদ অসঙ্গতি, কত পাকানো জট ও লুকানো ক্ষত, আত্মরতির কত অদ্ভুত বিলাস কয়েদীদের জীবনে দেখা দেয়। সুতরাং যাঁহারা মনস্তাত্ত্বিক সত্য আবিষ্কার করিতে বিশেষ আগ্রহশীল তাঁহারা এই বন্দীদের মধ্যে খুব অনুকূল পর্যবেক্ষণক্ষেত্র পান। মানুষের জীবন সমতলভূমিতে প্রশান্ত ধারায় চলিতে চলিতে যখনই একটি বড় বাঁক ফিরে, যখনই একটি বড় রকমের বাধার সম্মুখীন হয়, যখনই অন্ধকার পাতাল-গুহায় প্রবেশোন্মুখ হয়, তখনই তাহার চরিত্রে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয় তাহাই হয়ত তাহাকে শেষ পর্যন্ত জেলখানার আতিথ্য-স্বীকারে প্রণোদিত করে। তাই ইহারা শুধু জেল কোডের শাসন মানে না, ইহাদের উপর সারস্বত শাসনেরও একটি সম্ভাবনা দেখা দেয়। 'জরাসন্ধ' এই জেলখানার কয়েদী-গোষ্ঠীকে সারস্বত প্রয়োগের বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এখানেই তাঁহার কৃতিত্ব।

ইহাদের জীবন অনেকক্ষেত্রে মিথ্যার বিড়ম্বনায় ধিক্কৃত হইয়া করুণরস জাগায় ও নিয়তিরহস্যের দুর্জ্ঞেয়তায় মনকে অভিভূত করিয়া তোলে। বিচারের প্রহসনে যে কত সত্য চাপা পড়ে, কত মিথ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা আবিষ্কার করায় বর্তমান লেখকের (কারাশাসক) যে সুবিধা আছে তাহা খুব কম গ্রন্থকারের ভাগ্যেই জোটে। 'জরাসন্ধ' সাহিত্যসাধনার দিক হইতে এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। কত নিরীহ অভাগা আইনের জাঁতাকলে

পিষ্ট হইয়া, পুলিশী সাজানো সাক্ষ্যের জালে জড়াইয়া পড়িয়া, কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তাহাদের ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের কথা ভাবিবার অবসর পায়। ন্যায়বিচারের মালিক, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা কত বিচারক যে না জানিয়া নির্দোষ ব্যক্তির নরকবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা ভাবিলে মানবজীবনের অহেতুক ট্রাজেডি আমাদের অনুভূতিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। সরকারী যান্ত্রিক ব্যবস্থা, জেলের কঠিন নিয়মশৃঙ্খলা ও দরদী মানুষের সহানুভূতি এবং তাহারই আলোকে সত্য-আবিষ্কারের শক্তির পার্থক্য 'লৌহকপাটের' কাহিনীগুলির মধ্যে চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুর্দান্ত দস্যুর ও নরহন্তার পাষাণ চিত্তের আড়ালে যে অনুতাপের দুঃসহ জ্বালা জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে তাহা জজ ও উকিল কাহারও চোখে পড়ে না, পড়ে জেল-কর্মচারীর সমবেদনা-স্বচ্ছ দৃষ্টিতে। বিচারালয়ে একটি অভিনয় চলে, সকলেই আপন আপন মুখস্থ-করা পাঠ আবৃত্তি করিয়া যায়, অপরাধীও এই অভিনয়ের নির্বাক দ্রষ্টারূপে ও ইহারই স্পর্শ-প্রভাবে নিজের অন্তরকে রুদ্ধ করে, কোন্ সুরে কথা বলিলে তাহার নির্দোষিতা ফুটিয়া উঠিবে তাহা তাহার বিমূঢ় অবস্থায় সে খুঁজিয়া পায় না। কাজেই তাহার চতুর্দিকে যে সরব অভিনয় চলিয়াছে তাহারই সঙ্গে তাহার নীরব স্বীকৃতি সে যোগ করিয়া দেয়। তাহার অন্তর-দ্বার উন্মুক্ত হয় জেলের অখণ্ড অবসরে ও সহানুভূতিশীল শ্রোতার কাছে। কোর্টের অগ্নিবেষ্টনে যে হৃদয় দ্রব হয় না, তাহা জেলের শীতল পরিবেশে অশ্রু হইয়া গলিয়া পড়ে। 'লৌহকপাটে'র নাতিবৃহৎ পেয়ালায় এরূপ অনেক হৃদয়-চোঁয়ানো অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত রহিয়াছে। নদীমাতৃক অশ্রুপ্লাবিত বাংলা দেশের অন্তঃকরণ ভেদ করিয়া যে ক্ষুদ্র ঝরণা উত্তপ্ত বালির ভিতর দিয়া শীর্ণধারায় প্রবাহিত হইতেছে, সাহিত্য-কমণ্ডলুতে তাহার কিছুটা 'জরাসন্ধ' ধরিয়া রাখিয়াছেন। ইহার আস্বাদ জীবনপিয়াসী পাঠককে চিরদিনই মুগ্ধ করিবে।

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসুর 'বি-কেলাস' ও শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'র সহিত জরাসন্ধ-রচিত 'লৌহকপাট'-এর কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে যে কারা-জীবনের বর্ণনা তাহা বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক বন্দীদের কাহিনী ও মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষমাণ ফাঁসির আসামীর অস্থির স্মৃতিচারণার বিবরণ। রাজনীতি জীবনের সবটুকু নহে এবং রাজনৈতিক বন্দীরা কারাকক্ষে আসিয়াও অভিনয়প্রবণতা ছাড়ে না। কাজেই তাহাদের মধ্যে হয়ত জীবনের শাশ্বত

সত্য পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহারা সংসারের সহজ পথে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ দৈবদুর্বিপাকে জড়াইয়া পড়ে, তাহাদের মানস-প্রতিক্রিয়ায় মানবমনের অনেক অজানা রহস্য প্রকাশিত হয় ও মানুষকে নূতন আলোকে পরিচিত করে। 'জরাসন্ধ'-রচিত 'লৌহকপাট'-এ মানবপ্রকৃতির নবপরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; এখানেই এই গ্রন্থের সার্থকতা।

আধুনিক ও অতি-আধুনিক সাহিত্যে জীবনবোধের তারতম্য

(১)

অতি-আধুনিক যুগে যখন বাঙলার সাহিত্য-সমাজ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বিরুদ্ধ-ভাবাদর্শসম্পন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন সাহিত্য-সম্মেলনের যে পূর্বের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য নাই তাহা সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হয়। এখন যে কোন উৎসব বা সামান্য উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া বহু সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে বটে, কিন্তু সেগুলির মধ্য দিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবল গোষ্ঠীগত মতবাদের প্রচার হইতে দেখা যায়, নূতন সাহিত্যিক প্রেরণা-নির্দেশ বা সমাজের সহিত সাহিত্যের ব্যাপক পরিচয়-সংঘটনের কোন সার্থক প্রয়াস লক্ষিত হয় না। সারা বৎসর ধরিয়া যদি বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য-সম্মেলন চলিতে থাকে, তবে উহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয় না বা উহাদের ভিতর দিয়া আমাদের সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য বা চূড়ান্ত অভিমত-গঠনেরও সহায়তা হয় না। বোধ হয় এই বাস্তব সত্যের স্বীকৃতিরূপেই দেশের প্রাচীনতম সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে সমগ্রপ্রদেশব্যাপী কোন সভার আয়োজন-প্রয়াস পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ অবসাদজনক পরিস্থিতিতেও যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখা একটি সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে উদ্যোগী

হইয়াছেন, ইহা একদিকে যেমন উদ্যোক্তাদের সাহিত্য-প্রীতির নিদর্শন, অন্যদিকে তেমনি আমাদের বিক্ষিপ্ত প্রয়াসগুলিকে এক দুর্লভ কেন্দ্র-সংহতি দিবার প্রশংসনীয় উদ্যমেরও সূচনা। এই কারণেই তাঁহারা সমস্ত সাহিত্যানুরাগীর ধন্যবাদ-ভাজন।

বঙ্কিমচন্দ্র হইতে যে বাংলা আধুনিক সাহিত্যের আরম্ভ তাহার পর প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইতে চলিয়াছে। এই শতাব্দীর মধ্যে বাংলা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য-প্রাচুর্যের প্রবর্তন হইয়াছে, সাহিত্যে নূতন পথ-সন্ধানের ও অগ্রগতির যে প্রেরণা লক্ষিত হইয়াছে তাহা পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের পক্ষেই অভাবনীয় কৃতিত্বের নিদর্শন। কিন্তু এই যুগের মধ্যে সাহিত্যের প্রকৃতির ও উহার প্রতি আমাদের মনোভাবের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাও সমভাবে বিস্ময়কর। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এক সংশ্লেষণী আদর্শের প্রভাব দেখা যায়—তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ও শিল্পরূপ গ্রহণ করিয়াছেন উদ্দেশ্যরূপে নয়, উপায়রূপে। পাশ্চাত্ত্যে সাহিত্যের নূতন কল্পনা-অনুভূতির আলোকে তাঁহারা আমাদের সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের মর্ম-বাণীটিকে স্ফুটতর ও উজ্জ্বলতর করিতে চাহিয়াছেন; প্রথাবন্ধনের মধ্যে আমাদের দুরন্ত হৃদয়াবেগের ছন্দটি যথাসম্ভব যাথার্থ্য ও মাত্রাজ্ঞানের সহিত আঁকিয়াছেন। মধুসূদন সমাজ ও ধর্মবিদ্রোহী হইয়াও উহাদের শাশ্বত আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই। তিনি রাবণের মধ্যে সদ্যজাত স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণা আরোপ করিয়া ও ইন্দ্রজিতের কর্তব্যনিষ্ঠা ও পত্নীপ্রেমের চিত্র আঁকিয়া রাক্ষসকুলকে মহনীয় করিয়াছেন, কিন্তু এই সহানুভূতির ইঙ্গিত তিনি বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রামের বিশেষত্ব দেখান নাই বটে, কিন্তু ইহার কারণ রামের মধ্যে যে সাত্ত্বিক, শান্তিপ্রধান আদর্শের বিকাশ ঘটিয়াছে তাহার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু তিনি যে প্রাচীন জীবনাদর্শের মাধুর্য পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পঞ্চবটী-বনে সীতার আরণ্য জীবনের অপরূপ আলেখ্য। সীতা-চরিত্রের এই যে সুকুমার, সৌন্দর্যানুভূতিময় ক্রীড়াশীলতা, রাজকুলবধূর এই যে কৃত্রিম-বন্ধনমুক্ত রূপমুগ্ধতা, আরণ্য প্রতিবেশের সহিত সহজ আত্মীয়তার অনুভূতি ইহা যেন তাঁহার সতীত্বের দীপ্ত তেজস্বিতার চারিদিকে একটি শ্যামস্নিগ্ধ বেষ্টনী-রেখা টানিয়া দিয়াছে। আধুনিক কবির হাতে সীতা-চরিত্রের

রমনীয়তার এই নূতন অনুভূতি ও নবসৃষ্টি নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ করে যে, তাঁহার কল্পনা ও সৌন্দর্যবোধ যতই অভিনব হউক না কেন, তাঁহার কবি-মনোভাব সনাতন আদর্শেরই অনুকূল ছিল। বীরাঙ্গনা কাব্যে "সোমের প্রতি তারা" পত্রে যে উন্মার্গগামী প্রেমের আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহার রূপাঙ্কনে আর্যধর্ম-শাসিত আচারশীলতারই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই কলঙ্ক-লাঞ্ছিত প্রেম-নিবেদনের রীতিটি সলজ্জ-মধুর, উদ্ধত বিদ্রোহের উচ্চকণ্ঠ অশালীনতা ইহার কোথাও নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি অতি-পক্ষপাত পরবর্তী যুগে বিরূপ সমালোচনাকে উদ্রিক্ত করিয়াছে। নীতিবাদের খাতিরে তিনি কলাসম্মত স্বাভাবিকতাকে বলি দিয়াছেন এই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ। কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচক-গোষ্ঠী হয়ত স্মরণ করেন না যে, বঙ্কিম হিন্দু জীবনের বৈশিষ্ট্য, ধর্ম যে জাতির অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে তাহারই মানস প্রতিক্রিয়া তাঁহার উপন্যাসে দেখাইতে চাহিয়াছেন। সার্বভৌম মানব-প্রকৃতি হিন্দু জীবনরীতি ও ধর্মসংস্কারের সুচিরব্যাপী প্রভাবে যে বিশেষ রূপটি গ্রহণ করিয়াছে তাহাই ফুটাইয়া তোলা তাঁহার উদ্দেশ্য। সূর্যমুখীর প্রেমসমৃদ্ধ দাম্পত্যজীবনের ছবি আঁকিতে তিনি যে পৌরাণিক স্মৃতি-ময়, ভাবৈশ্বর্যপূর্ণ অলঙ্করণ-রীতি প্রয়োগ করিয়াছেন, আর কোন দেশের ঔপন্যাসিক সে কথা ভাবিতেও পারেন না। কুন্দের ভীরু, আত্মপ্রকাশকুণ্ঠ প্রথম প্রেমোন্মেষের বর্ণনা সার্বদেশিক সাহিত্যরীতির অনুরূপ, কিন্তু ইহার বিশেষত্ব হইল ইহাতে বালবিধবার অপরাধবোধ, সমাজবিধি-লংঘনের অর্ধ-অনুভূত অস্বস্তি তরুণীর স্বভাব-সঙ্কোচকে ঘনীভূত করিয়াছে। সে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহে, আভাসে ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করে, শুধু প্রথম প্রণয়ভীতার লজ্জায় নহে, অন্তরের গূঢ়তর বাধা কর্তৃক কণ্ঠরোধের জন্যও বটে। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের অসহনীয় জ্বালাময় চিত্তবিকার, তাহার নরক-যন্ত্রণা-ভোগের বীভৎস কল্পনা অন্য কোনও দেশের সাহিত্যে অতিরঞ্জিত ও অবাস্তব বলিয়া গণ্য হইতে পারিত, কিন্তু হিন্দুনারীর পৌরাণিক-বিশ্বাসপুষ্ট অন্তরে অসতীত্বের ভয়াবহ শাস্তির যে বদ্ধমূল সংস্কার নিহিত আছে, তাহাই তাহার অনুতাপ-বহ্নিকে এরূপ সর্বধ্বংসী, চেতনাবিলোপী শিখায় প্রজ্বলিত করিয়াছে। যোগবলে চিত্তবৃত্তির আকস্মিক পরিবর্তন মনস্তত্ত্ব-বিচারের সাধারণ মানদণ্ডে

অবিশ্বাস্য। কিন্তু ভারতীয় নরনারীর অভিজ্ঞতায় ইহা একটি পরীক্ষিত, সন্দেহাতীত সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অতিপ্রাকৃতের বহুল প্রয়োগ হিন্দুর এই সহজ সংস্কারের দ্বারাই সমর্থিত। বঙ্কিমের দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁহার সময়ের কিছুকাল পরেই বাঙালীর মনোজগতে এমন একটি বিপর্যয় ঘটিয়া গেল, যাহাতে তাহার জীবনের ধর্মবিশ্বাসমূলক ভিত্তিভূমিই সরিয়া গেল ও তাহার অধ্যাত্ম সংস্কার-বিশ্বাসসমূহ ক্রমশ দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া শেষ পর্যন্ত সর্বগ্রাসী যুক্তিবাদ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনবোধের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গেল।

বঙ্কিমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সর্বাপেক্ষা মুখর হইয়া উঠিয়াছে রোহিণী চরিত্রের পরিণতি লইয়া। বঙ্কিম-যুগের সদ্যোজাগ্রত মানবতা-বোধ বালিকা ও যুবতী বিধবার বঞ্চিত জীবনের প্রতি কতকটা সহানুভূতি না দেখাইয়া পারে নাই, কিন্তু সমাজ-জীবনের পরস্পর-বিরোধী জটিল দাবি-পরম্পরার মধ্যে ভাগ্যহত বৈধব্যের প্রতি করুণা তাহাকে কোন স্থায়ী পুনর্বাসনে অধিষ্ঠিত করিতে অক্ষম হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল-এ বঙ্কিমের প্রধান লক্ষ্য দাম্পত্য সমস্যা, অবৈধ-প্রেম-সমস্যা নহে; কুন্দ ও রোহিণী উপন্যাসের প্রধান নহে, পার্শ্ব-চরিত্র মাত্র। উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষণিক বিভ্রান্তির পর পুরাতন দাম্পত্য প্রেমের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠতা ও প্রবলতর আকর্ষণ উচ্ছ্বসিত অবৈধ মোহের উপর জয়লাভ করিয়াছে। ইহা নীতির কথা নহে, মনস্তত্ত্বের ও শ্রেষ্ঠতর কল্যাণের কথা। রোহিণীর আকস্মিক জীবনান্তের যথার্থ বিচার করিতে হইলে সমস্ত উপন্যাসের সম্পর্ক-জটিলতার পটভূমিকায় উহাকে স্থাপন করিতে হইবে। রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের মনোভাব কোন দিনই সমবেদনা ও ভ্রমরের অকারণ অভিমানের পাল্টা জবাবের উপরের পর্যায়ে পৌঁছে নাই—ভ্রমরের বিস্মৃতির উপায়রূপেই স্বাদে আপাতমিষ্ট কিন্তু ক্রিয়ায় বিষ এই ঘুমপাড়ানো নির্যাস সে পান করিয়াছিল। রোহিণীর রূপমোহ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য সে ভূলুণ্ঠিত হইয়া ভগবানের নিকট শক্তি প্রার্থনা করিয়াছিল, এই কলঙ্কিত প্রেমের উপভোগের জন্য স্বেচ্ছা-নির্বাসন বরণ করিয়াছিল, ইহাকে গণিকা-বিলাসের ঘৃণ্য গোপনতায় আবৃত করিয়াছিল। রোহিণীর দিক হইতেও এই প্রেমের একনিষ্ঠতা ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন দুরাশা ছিল না, তাই গোবিন্দ-লালের অনুযোগে সে গণিকা-সুলভ উত্তরই দিয়াছিল। নিতান্ত ভাব-

বিলাসান্ধ, আশাবাদী পাঠক ছাড়া এই সম্পর্কের শুভ পরিণাম কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। রোহিণীর অপমৃত্যু রোহিণীর দিক হইতে দেখিবার নয়, লেখক গোবিন্দলালের দিক হইতে ইহা দেখিয়াছেন। গোবিন্দলালের পূর্ব-প্রেমস্মৃতি-বিহ্বল, অনুতাপের কশাঘাত-জর্জর, নৈরাশ্যক্লিষ্ট মনের মধ্যেই ইহার বীজ নিহিত। যে গোবিন্দলাল ভ্রমরের মৃত্যুর পর স্মৃতিরোমন্থনের তন্ময়তায় সমস্ত প্রতিবেশকে ভ্রমর-রোহিণীময় প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, সেই অতি-মাত্রায় কল্পনাপ্রবণ, উদ্বেলিত আবেগস্রোতে আত্মনিয়ন্ত্রণে অসমর্থ ব্যক্তি-চরিত্রের নিগূঢ়তার মধ্যে রোহিণী-ঘাতক বিস্ফোরক শক্তি সঞ্চিত ছিল। গোবিন্দলাল রোহিণী-প্রসঙ্গে হরিৎ-নীল-চিত্রিত প্রজাপতির কথা ভাবিয়াছিল, আর রোহিণী নিশাকরকে দেখা মাত্রই তাহার পটল-চেরা চোখের সঙ্গে গোবিন্দলালের দেহ-সৌন্দর্যের তুলনা করিয়াছিল, কোথায়ও গুণানুরাগের এক কণা স্পর্শ নাই। এ প্রেম যদি স্বল্পায়ু ও আত্মঘাতী না হয়, তবে বিশ্ব-বিধানই মিথ্যা।

(২)

বঙ্কিম-রচনার এই বিশেষত্বটুকুর বিস্তারিত আলোচনা করিলাম এই সত্যটি বুঝাইবার জন্য যে, তিনি বাঙালীর ঐতিহ্যসংস্কার ও ধর্মবোধ-নিয়ন্ত্রিত জীবনে উত্তেজিত হৃদয়বৃত্তি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাব্য ফলাফলই চিত্রিত করিয়াছেন, ইউরোপীয় মানবতার আদর্শ ইহাতে সম্পূর্ণ অনুসৃত হইল কি না সে দিকে প্রধান লক্ষ্য দেন নাই। তাঁহার পরে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা কাব্য ও সাহিত্যে বিশ্বমানবতাবোধের প্রবর্তন করিলেন। ততদিনে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার পরিণত ফল বাঙালী জীবনে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার কাব্যে তিনি প্রেম ও নিসর্গকবিতায় মোটামুটি ইউরোপীয় ভাব-কল্পনা ও জীবনছন্দের অনুবর্তী হইলেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও জীবনসত্যানুভূতি ইহাদিগকে বাঙালী মানসিকতার সহিত মিলাইয়া লইয়াছে। তাঁহার ধর্মমূলক ও জীবনদর্শননিষ্ঠ কাব্যে তিনি সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকেই নবরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার মনন ও কল্পনা-বিহার প্রাচীন গণ্ডীকে বহুদূর ছাড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার ভাব-জগতে সমস্ত সুদূর সঞ্চরণের মধ্যেও তিনি ভারতীয়

জীবনবেদকে একনিষ্ঠভাবে আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহার শেষ বয়সের মৃত্যু-রহস্যগহন কবিতাগুচ্ছের মধ্যে ঔপনিষদিক ঋষিদৃষ্টি ও দিব্যচেতনা জ্যোতির্ময়-রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা তাঁহার অনুপম কাব্য-সৌন্দর্য ও কল্পনালীলায় মুগ্ধ হইয়া যে স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় ইহাদের মূল প্রেরণা তাহাকে আমাদের রসানুভূতির অন্তর্ভুক্ত করি নাই। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, রবীন্দ্র-কাব্যকে অবলম্বন করিয়া আমরা পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের অধিকতর সন্নিহিত হইয়াছি, যেখানে পশ্চিমের সঙ্গে তাঁহার অপ্রশমিত বিরোধ, যেখানে প্রাচ্য অধ্যাত্মবোধকে তিনি অবিচলিত-ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন সেখানে আমরা তাঁহার সহযাত্রী হইতে কুণ্ঠিত হইয়াছি। তিনি যেখানে হাজার হাজার পাঠককে সুন্দরের মন্ত্রে দীক্ষিত ও মানবতা-বোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, সেখানে অতি অল্পসংখ্যককেই ঐশ্বরিক চেতনায় ও প্রেমে অনুপ্রাণিত করিতে পারিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে আমরা মুক্তির দিশারীরূপে গ্রহণ করিয়াছি, ভগবৎ-প্রেম-সাধনার দীক্ষা-গুরু রূপে গ্রহণ করি নাই। যিনি আমাদিগকে আত্মস্থতার কেন্দ্রে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্রত লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি আমাদের চিত্ত-বিক্ষেপের নূতন নূতন উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া আমাদের মনকে বিশ্বচেতনার প্রান্তে প্রান্তে দূরোৎক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের মধ্য বয়স পর্যন্ত লেখা ছোটগল্প-উপন্যাসে বাঙালী জীবনধারা ও মানস সংস্কারকেই লেখক প্রাধান্য দিয়াছেন। ছোটগল্প-গুলিতে আমাদের অতি-পরিচিত জীবনেরই এক অপরূপ রসঘন ও রূপ-বিচিত্র প্রকাশ ঘটিয়াছে। এই ছোট-খাট শান্তির নীড়গুলিতে হৃদয়ের অসংযত উচ্ছ্বাস, অন্তর্দ্বন্দ্বের মৃদু কম্পন যে ক্ষণিক তরঙ্গবিক্ষোভ জাগাইয়াছে তাহার অভিঘাত অন্তরে গভীর হইলেও বাহিরে উত্তেজনাহীন। সেখানে বিশ্বের সমস্যা ভিড় করিয়া দাঁড়ায় নাই, বাহির সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ উহার আত্মসমাহিত জীবন-যাত্রার কোন তুমুল বিপর্যয় ঘটায় নাই, রাজনৈতিক ঝটিকা-কেন্দ্র হইতে উৎক্ষিপ্ত কোন বেগবান বায়ুপ্রবাহ ইহাকে মথিত করে নাই। হৃদয় হইতে উত্থিত ভাবরাশি অন্তর্জীবনে গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া আবার অন্তরমধ্যেই আত্মসংহরণ করিয়াছে। এখানে নিবারণ-হরসুন্দরীর জীবনে দ্বন্দ্বের কাহিনী কোন বহির্বিকাশের দৃশ্যরূপে

প্রকটিত হয় না, অন্তরের নীরব আবর্তনে ঘনীভূত হয়—প্রৌঢ়ার নবজাগ্রত প্রেম-পিপাসা নিঃশব্দ আত্মদহনে নিজ পরিচয় ঘোষণা করে। আবার বাধা অপসারিত হইলে উভয়ে পাশাপাশি শুইয়াও দাম্পত্য নিবিড়তায় পুনর্মিলিত হইতে পারে না—এক মধ্যবর্তিনী ছায়ামূর্তির চিরজাগ্রত স্মৃতি অতীত বিদারণ-রেখার আ-মরণ সাক্ষ্য বহন করে। তাহার দাদাবাবু তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার পর অনাথা বালিকা রতনের অন্তরে যে নিঃসঙ্গতার বিষাদ সমুদ্রবৎ উদ্বেলিত হইয়াছে, তাহার একটি তরঙ্গও বাহিরে আসিবার পথ পায় নাই—সর্বংসহা ধরিত্রীর নীরব বেদনার মত এই মূক শোকাভিনয়ের একমাত্র দ্রষ্টা ও বোদ্ধা লেখকের অন্তর্যামিত্ব। এই জাতীয় গল্পে বাঙালী জীবনের চিরন্তন, অথচ বহিঃপ্রকাশবিমুখ সত্যটি লেখকের অন্তররসসিঞ্চনে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইয়াছে—বাঙালী জীবন ছাড়া আর কোথাও ঠিক এই ধরণের ভাবের উদ্গম ও পরিণতি ঘটিত কিনা সন্দেহ। এই স্বল্পপরিধি ও ঘটনাবিরল জীবনযাত্রা হইতে নিঃসারিত রসধারার সহিত আধুনিক জীবনের চটুলতা-জটিলতার ও বিপুল ব্যাপ্তি-বিস্তারের কি দুস্তর ব্যবধান! দুঃখের বিষয় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পদ্মাবক্ষে নৌকাবাসের আত্মসমাহিত নির্জনতা হইতে ছায়া-স্নিগ্ধ পল্লী-জীবনের যে রূপরেখা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহার যে রহস্যময় সৌন্দর্যের ইঙ্গিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, মহানগরী কলিকাতার জনতার মধ্যে যে আত্ম-কেন্দ্রিক, প্রতিবেশ-নিরপেক্ষ জীবনস্বপ্নবিভোরতার সন্ধান পাইয়াছিলেন, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই কালের নির্মম হস্তক্ষেপে সেই পটভূমিকার ছবিটি মায়া-মরীচিকার ন্যায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আজ পল্লীতে পল্লীতে উৎখাত জীবন-যাত্রার গভীর খাদ, আর সহরে সহরে ক্ষুধাশীর্ণ, মর্যাদাহীন জনতার ফেনিল উন্মত্ততা—আজ কি পল্লীর, কি সহরের মানুষ কেহই ব্যক্তি-পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত নহে, সকলেই এক সমস্যাপীড়িত জনসংঘের অংশ মাত্র। সুতরাং আধুনিক গল্প-উপন্যাসেও এই কঙ্কালাবশিষ্ট, জৈবপ্রয়োজন-সর্বস্ব প্রেতমূর্তির প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে। শুধু করুণার প্লাবনে এ কলঙ্ক মুছিবার নহে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসেও এই বাঙালী জীবনচিত্রের অস্খলিত অনুসরণই লক্ষণীয়। তাঁহার 'চোখের বালি'তে আধুনিক যুগের

হৃদয়-সমস্যার ভিত্তি-স্থাপন হইয়াছে—বিনোদিনী ঈর্ষ্যাবিকৃত মনোভাব লইয়া মহেন্দ্রকে না ভালবাসিয়াও তাহার উদাসীনতা জয় করিবার উদ্দেশ্যে নিজ ছলা-কলার জাল বিস্তার করিয়াছে। বিনোদিনী অসহায়া বাল-বিধবা নহে, আত্মশক্তিতে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত, জীবন-অভিজ্ঞতার পূর্ণ অধিকারিণী যুবতী। সে আমাদের সমবেদনার জন্য প্রতীক্ষা করে না, বঞ্চিত জীবনের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় সে নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর। সে কুন্দনন্দিনীর সগোত্রীয়া নয়, রোহিণীর সগোত্রীয়া, রোহিণীর একটি উন্নততর, মার্জিততর প্রতিরূপ। তাহার আচরণ সম্পূর্ণ বাঙালী-ঐতিহ্য-বহির্ভূত হইলেও শেষ পর্যন্ত লেখক তাহাকে মুগ্ধা, আত্মবিস্মৃতা ভাবসাধিকাতে রূপান্তরিত করিয়াছেন, প্রেম লইয়া খেলা করিতে করিতে সে প্রেমের ইন্দ্রজালে বন্দিনী হইয়াছে। বিনোদিনীর শেষ পরিণতি-সাধনে লেখক ভারতীয় ভাবাদর্শের প্রভাবকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। 'নৌকাডুবি'তেও কমলার সতীত্ব-সংস্কার ঘটনার সমস্ত চক্রান্তের উপর জয়ী হইয়াছে। রমেশের প্রতি তাহার প্রথম প্রণয়-অর্ঘ্য নিবেদিত হইলেও যে মুহূর্তে সে নলিনাক্ষকে স্বামী বলিয়া জানিয়াছে সেই মুহূর্তেই তাহার সমস্ত উদ্যত হৃদয়াবেগ অতীত মোহকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া পাত্রান্তরে ন্যস্ত হইয়াছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ কোন মনস্তাত্ত্বিক জটিল প্রশ্ন না তুলিয়া সম্পূর্ণ-ভাবে ভারতীয় আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন ও এইরূপ আকস্মিক পরিবর্তন অন্য সমাজে অস্বাভাবিক হইলেও পাতিব্রত্য-সংস্কার-প্রভাবিত হিন্দু নারীতে সম্ভব তাহা পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন। সাধারণ মনস্তত্ত্ব যে যুগ যুগ অনুশীলিত সংস্কৃতির নিকট পরাজিত হইতে পারে তাহা অবিশ্বাস্য নহে। 'গোরা'তে নারী-চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়াছে ও তাহারা উপন্যাসের ঘটনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে ইহা ঠিক। পরেশবাবুর ধর্মনিষ্ঠা ব্রাহ্মসমাজের নূতন ধর্মান্দোলন ও স্বাধীন-চিন্তা-প্রসূত ধর্মবোধের উদাহরণ। তথাপি সুচরিতার চরিত্রে বাঙালী হিন্দুনারীর কোমল আত্মবিসর্জনশীলতা ও অন্তঃরুদ্ধ বেদনার নীরব সহিষ্ণুতা মূর্ত হইয়াছে। গোরার জীবনে হিন্দু সংস্কারের উন্মূলন ও তাহার বিশ্বমানবতার আদর্শ-গ্রহণে রবীন্দ্রনাথের নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর সম্প্রসারণই সূচিত। তাঁহার পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে তিনি নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন—সাতকোটি বাঙালীকে মানুষ করিবার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই তিনি লেখনী ধরিয়াছেন। তথাপি তিনি যে প্রাক্তন সংস্কারের মোহ

কাটাইতে পারেন নাই, কুমুদিনী-চরিত্রই তাহার নিদর্শন। তাঁহার এই সমস্ত উপন্যাসে মননের তীক্ষ্ণতা ও প্রসার যেরূপ পরিস্ফুট, চরিত্র-পরিকল্পনার গভীরতা তদনুরূপ নহে।

(৩)

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্য দিয়া বাঙালী সমাজ-চেতনা ও সাহিত্য-রস-আস্বাদনে উন্নতির এক নূতন পর্যায়ে পৌছিল। তিনি আমাদিগকে আধুনিকত্বের আর এক ধাপে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করেন নাই। অর্থাৎ আমরা স্বাভাবিকভাবে বিশ্বসংস্কৃতির সহিত পরিচয়ের ফলে যে পরিমাণে আধুনিকভাবাপন্ন হইয়াছি তাহাই তাঁহার উপন্যাসে রসরূপ ও মানবিক আবেদন লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে যেমন বাঙালী জীবনের সংকীর্ণ ও আচার-শাসিত বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে রসচেতনার নিবিড়তা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, শরৎচন্দ্রে তেমনি অনুরূপ পটভূমিকায় সমাজশাসনপিষ্ট, অবরুদ্ধ ব্যক্তিত্বের মর্মভেদী বেদনা অভিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র যদিও প্রচলিত সমাজপ্রথার আত্মঘাতী মূঢ়তা ও অপচয়শীল বিকৃতি দেখাইয়াছেন, তথাপি তিনি বাঙালী জীবনবোধের শাশ্বত মূল্যের কোন রূপান্তর করিতে চাহেন নাই। তাঁহার উপন্যাসের বিপুলসংখ্যক পাত্র-পাত্রীর মধ্যে দুই একজন ছাড়া কেহই বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা পাশ্চাত্য ভাবধারার ব্যাপক প্রবর্তনের পক্ষপাতী নহেন। মোটের উপর সমাজের হৃদয়হীনতা ও অন্ধ আচারনিষ্ঠতার জন্য যে মানবিক কোমলতা ও সমবেদনার ধারা লুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে সমস্ত প্রতিবন্ধক সরাইয়া তিনি তাহাতে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ও গতিবেগ সংযোজনা করিবার অভিলাষী। তাঁহার কল্পনা-নেত্রে ও অনুভূতির গভীরে বাঙলার শুদ্ধ, শান্ত, ধর্মনিষ্ঠ সমাজ ও স্নেহ-প্রেমের সুকোমল নীড়-স্বরূপ পরিবারের চিত্র সর্বদাই উদ্ভাসিত। সমাজের বজ্রমুষ্টি ব্যক্তিস্বাধীনতার কণ্ঠ নিপীড়ন না করিলেই তিনি সন্তুষ্ট, কিন্তু এই বাধামুক্ত, স্বচ্ছন্দ-বিকশিত ব্যক্তিজীবন কোন নূতন ছাঁচে ঢালা নয়, বা কোন নূতন আদর্শের প্রেরণায় নূতন-সমাজ-গঠনের প্রতি আগ্রহশীল নয়। তাঁহার অভয়া ও রোহিণী স্বাধীন প্রেমের দীপ জ্বালাইয়া যে সংসার রচনা করিয়াছে তাহাতে কোন বৈদেশিক অনুকরণের

ধূমাঙ্কিত কালি লিপ্ত হয় নাই। সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মী এত মহৎ প্রকৃতির যে অপরিহার্য আনুষঙ্গিক-নিরুপায় অন্তর-বেদনা—তাহাতে তিলে তিলে দগ্ধ হইয়াছে, তবু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কল্পনা করে নাই। অচলার দ্বিচারিণীত্বের কাল আবরণের ভিতর দিয়া সতীত্ব-সংস্কারের দীপ্ত আভা বিচ্ছুরিত। কিরণময়ীর ক্ষুরধার ও সর্বত্রগামী যুক্তিবাদ মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ সর্পের ন্যায় এক অত্যাজ্য ধর্ম ও ঔচিত্যবোধের নিকট মাথা নত করিয়াছে। এমন কি সর্বসংস্কারবর্জিতা, ক্ষণিকবাদিনী কমলও এক শাশ্বত সত্যের ছায়ারূপ কৃচ্ছ্রসাধনের সংযম-শুচিতাকে স্বীকৃতি জানাইয়াছে। তাঁহার ভারতী মাদ্রাজী খ্রীষ্টান পরিবারে বাস করিয়াও বাঙালীর সুকুমারত্ব হারায় নাই; তাঁহার লৌহ-মানব সব্যসাচী দক্ষিণ হস্তের উদ্যত দণ্ডকে বাম হস্তের বাঙালীসুলভ স্নিগ্ধ নিষেধে চাপিয়া ধরিয়াছে। যে সুমিত্রার সঙ্গে বাঙালী সংস্কৃতির কোন সম্বন্ধ নাই, যে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের চঞ্চল তরঙ্গাঘাতে কোথাও কোন স্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ হয় নাই, যে চোরাকারবারীদলের নেত্রী, তাহার মধ্যেও লেখকের অনিবার্য মানস সংস্কারের ফলে বাঙালী পরিবার-জীবনের মাতৃত্ব-মহিমা আরোপিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র আগামী যুগের বাঙালী সমাজের যে রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দু সংস্কৃতির আদর্শই সমস্ত বিকারমুক্ত হইয়া নিজ বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতায় দেদীপ্যমান—তাহাতে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা হইতে কোন ঋণ-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় নাই। তিনি সমাজ-চেতনাকে নূতন প্রাণশক্তি ও মানবিকতা-বোধে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, ইহার উপর কোন বৈদেশিক প্রভাব আরোপ করিতে চাহেন নাই।

শরৎচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বাংলা কাব্যের যে ধারা প্রবাহিত হইয়াছে তাহাতেও অনুরূপ মানস প্রবণতা পরিস্ফুট। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র প্রাচীন ধর্মকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করিতেই তাঁহাদের সমগ্র কবিত্ব-শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন—হিন্দু জীবনদর্শন ও ভক্তিবাদই তাঁহাদের কাব্যে নূতন কল্পনা-গৌরব ও ভাবাবেগসমৃদ্ধ হইয়া যুগচেতনাকে প্রভাবিত করিয়াছে। যদিও তাঁহাদের প্রতিভা ঠিক গীতিকবিতার অনুকূল ছিল না, যদিও ইহা মননভারাক্রান্ত কিংবা ভাবোচ্ছ্বাসপ্লাবিত হইয়া নিটোল রূপ ও সার্বভৌম ব্যঞ্জনা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তথাপি ইহার মধ্যেও আধুনিক মন্ময়তার সুরটি শোনা যায়। বিহারীলালের সম্পূর্ণ আত্মগত কবিতাও সারদার

পৌরাণিক ভাব-কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াই উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। অক্ষয় বড়াল, দেবেন সেন প্রভৃতি রবীন্দ্র-পূর্বগামী কবিরাও হিন্দুদর্শন ও ভাবানুভূতির তরঙ্গেই নিজ কাব্য-তরণীকে ভাসাইয়াছেন—তাঁহাদের কবিতা সনাতন ভাবাদর্শের ঘাটেই ভিড়িয়াছে। ইহার পরবর্তী যুগের কবিগোষ্ঠীও—যতীন্দ্র-মোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ও শ্রীকালিদাস রায়—তাঁহাদের কাব্যমালঞ্চে ভক্তি-অর্ঘ্যে নিয়োজিত, দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত পুরাতন পুষ্পসম্ভারই বিকশিত করিয়াছেন। বাঙলার অতীতস্মৃতি-সুরভিত অধুনা-বিলুপ্ত দিনগুলির জন্যই, উহার গার্হস্থ্যাশ্রমের স্নেহ-প্রেম-ভক্তি-চন্দন-চর্চিত জীবনাবেগের জন্যই তাঁহাদের কবি-প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। গোবিন্দচন্দ্র দাস, নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেন ও মোহিতলাল মজুমদার ঠিক প্রাচীনপন্থী ছিলেন না; তাঁহাদের রচনায় নূতন জীবন-জিজ্ঞাসা, যুগ-চেতনা-সঞ্চিত নূতন ধরণের অতৃপ্তি ও বেদনা-বোধ, প্রাচীন-আদর্শ-বহির্ভূত সংশয়বাদ ও ক্রোধ ও শ্লেষজড়িত বিদ্রোহ-ঘোষণা কাব্যের শান্ত, একটানা প্রবাহে এক বিপরীতমুখী তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস সঞ্চারিত করিয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু তথাপি ইঁহাদের ক্ষোভ ঠিক আদর্শের বিরুদ্ধে নহে, আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে জীবনে পাওয়া যায় না বলিয়াই ইঁহাদের অভিমান; ইঁহারা নিন্দার ছলে স্তুতিই জানাইয়াছেন। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ তাঁহার অতিরিক্ত আদর্শ-প্রীতিরই উল্টা দিক; বিশ্বের ছলনার জন্য তিনি বিশ্বনিয়ন্তার নিকট অভিমানভরা অনুযোগ জানান। মোহিতলালের দেহাত্মবোধ ও ভোগবাদ তান্ত্রিক-পূজাপদ্ধতি ও কৃচ্ছ্রসাধনের রূপকের মধ্য দিয়াই নিজ রূপ-পিপাসার চরিতার্থতা খোঁজে। নজরুলের উচ্চকণ্ঠ, উতরোল প্রতিবাদ, বৈষম্য-পীড়িত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহার উন্মত্ত রোষোচ্ছ্বাস ঈশ্বরের চরণ-প্রান্ত হইতেই প্রতিহত হইয়া আসে। ইঁহারা বিপ্লবী নহেন, বিরুদ্ধ সমালোচনার দ্বারা পুরাতনের রাজত্বকেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও সকলের নিকট আরও গ্রহণীয় করিতে চাহেন। আর কাব্যাদর্শের দিক দিয়া তাঁহারা যে রীতি-স্বাতন্ত্র্যের প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাতে অতীত প্রথার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না হইয়া দৃঢ়তরই হইয়াছে—তাঁহারা নূতন ডোরে পুরাতনকেই বাঁধিয়াছেন।

(৪)

এইবার আমরা অতি-আধুনিক সমকালীন কাব্য-সাহিত্যের তোরণদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই যুগে কাব্য-সাহিত্যের প্রেরণা ও পাঠকগোষ্ঠীর সহিত উহার মানস সম্পর্ক এমন একটি জটিল অনিশ্চয়তায় আবৃত যাহাতে কাব্য-সাহিত্যের মূলপ্রকৃতি ও উহার সামাজিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন হইয়াছে। এখন কাব্যের দিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রায় সম্পূর্ণ উন্মূলন ও গল্প-উপন্যাসে জীবনের সাধারণ আদর্শ-প্রধান রূপের পরিবর্তে অতি সূক্ষ্ম, ভাবাবেশবর্জিত ও মনস্তত্ত্বপ্রধান বাস্তব পর্যবেক্ষণের প্রবর্তন ঘটিয়াছে। প্রথম ক্ষেত্রে এক সর্বগ্রাসী সমাজ-চেতনা ও প্রকাশের এক তীক্ষ্ণ, তির্যক, মনন-কুশল বাগ্‌ভঙ্গী প্রাচীন ভক্তিবাদ ও সৌন্দর্য-সৃষ্টি-প্রেরণাকে অপসারিত করিয়াছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, জীবনের এক কটু-কষায় স্বাদ, ভাঙ্গিয়া-পড়া আদর্শবাদের টুকরা টুকরা খণ্ড লইয়া জীবন-অর্ঘ্য-রচনার এক অদ্ভুত প্রয়াস, চারিদিকের শূন্যতাবোধের মধ্যে অতি-আত্মসচেতন মনের আত্মরতির অসুস্থ অভিনয় এক ক্রমোন্নতিশীল শিল্পবোধ ও বিশ্লেষণ-কুশলতার সহিত অভিব্যক্ত হইতেছে। বাংলা সাহিত্য উহার মনোবিবর্তনের দ্রুত পরিণতির ফলে বিশ্ব-সাহিত্যের এত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিশ্ব-সাহিত্যের ছন্দই উহার মধ্যে পুনরাবৃত্ত হইতেছে। বিগত দুই মহাযুদ্ধের ভয়াবহ বিপর্যয়ের ফলে বিশ্ব উহার মারণাস্ত্র, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিশৃঙ্খলতা, উদ্‌ভ্রান্ত পথ-খোঁজার অনিশ্চয়তা লইয়া শুধু আমাদের বাহির দুয়ারে নয়, অন্তর অনুভূতির গভীরতায় পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করিয়াছে।

এই অভাবনীয় রূপান্তর আমাদের সাহিত্য-জিজ্ঞাসা ও সাহিত্য-প্রত্যাশার মূল ধরিয়াই নাড়া দিয়াছে। কবি ও ঔপন্যাসিক আর পুরাতন, অভ্যাস-মসৃণ, ভাবুকতা-স্নিগ্ধ, পরিচিত আদর্শবাদের স্বপ্নাশ্রয়ী জীবন-পথে বিচরণশীল নহেন। জীবনের যে রুক্ষ, মর্যাদাহীন, কণ্টক-বিকীর্ণ রূপ তাঁহাদের চোখের সামনে খোলা তাহাকে তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অতীত জীবনবাদের নিশ্চিন্ত নির্ভর ও সুবলয়িত সম্পূর্ণতা বাস্তবে অপ্রাপনীয় বলিয়াই সাহিত্যে সুদুর্লভ। সাহিত্য-বিপণিতে এখন আর রসনারুচিকর রসে নিমজ্জিত মিষ্টান্ন মিলিবে না, সেখানে তেলে-ভাজা, লবণাক্ত ঝাল-চানাচুর-জাতীয়

খাবার তৈয়ারি আছে। উপকরণের তারতম্য ও ভিয়ানরীতির পার্থক্যের জন্যই খাদ্যসম্ভারের এইরূপ পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। পাঠক যদি পূর্বের ন্যায় সাহিত্যিকের নিকট মধুর ও শান্ত রসের প্রত্যাশা করে, তবে এই প্রত্যাশা পূর্ণ হইবার নহে। যদি কল্পনার খাঁটি, সুরভি ঘৃত কাব্যের বাজার হইতে উধাও হইতে থাকে, অন্তরে মিষ্টত্বের একান্ত অভাব ঘটিয়া থাকে, তবে শুধু পাঠকের মন ভুলাইবার জন্য ভেজাল উপকরণে মেকি মাধুর্যের সৃষ্টি করিলে তাহাতে আত্মপ্রবঞ্চনাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে ও কাব্যের সঙ্গে জীবনের বিচ্ছেদ আরও মর্মান্তিক হইয়া উঠিবে। কবি-সাহিত্যিকের আনুগত্য কেবল অন্তর-অনুভূতির প্রতি, কোন কৃত্রিম আদর্শ বা চিরাভ্যস্ত, কিন্তু অধুনা বাস্তবসমর্থনহীন জীবনবাদের প্রতি নহে।

এ সবই সত্য এবং হয়ত অখণ্ডনীয় সত্য। কিন্তু তথাপি ইহাকে চরম মীমাংসা বলিয়া মানিয়া লওয়া একটু দুরূহ। কাব্যের রূপ ও সাহিত্যের প্রেরণার পিছনে একটা সুদীর্ঘ অনুশীলন ও তাহা হইতে জাত একটি বিশিষ্ট প্রথার প্রভাব অনস্বীকার্য। কাব্যরীতি কোনও একক প্রতিভার সৃষ্টি নহে; প্রতিভার নিজস্ব অনুভূতিকে যতদূর সম্ভব এই প্রথানুগত্যের মধ্যেই সঙ্কুলান করিতে হইবে। সৌন্দর্যের আদর্শ যুগে যুগে মানস রুচি ও লেখকের বিশিষ্ট মেজাজ ও জীবনদর্শনের দ্বারা কিছু কিছু পরিবর্তিত হইলেও মোটের উপর এক স্থির, শাশ্বত মানদণ্ডের উপরই নির্ভরশীল। গ্রীক ভাস্কর্যক্ষোদিত সুঠাম অঙ্গবিন্যাসসমন্বিত মূর্তি, ধ্যানী বুদ্ধের প্রশান্ত, জ্যোতির্ময় মূর্তি, আর চৈতন্যদেবের ভক্তি-বিহ্বল, ভাববিগলিত, আত্মভোলা মূর্তি—সবই বিভিন্ন প্রকারের হইলেও একই সৌন্দর্যের রাজমুদ্রাঙ্কিত। কালিদাস, বৈষ্ণব কবি, রামপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ—ইঁহাদের কবি-কল্পনা ও প্রকাশ-সুষমার মধ্যে রী ও প্রকরণগত পার্থক্য থাকিলেও ইঁহারা এক অভিন্ন সৌন্দর্যেরই বিচিত্ররূপী বিগ্রহ। অতি-আধুনিক কবির জীবনবোধ যতই মৌলিক ও অতীত-ধারাবিচ্ছিন্ন হউক না কেন, তিনি যখন কাব্যকে নিজ মনোভাব-প্রকাশের বাহনরূপে বাছিয়া লইয়াছেন তখন ইহার চির-প্রচলিত সৌন্দর্যরীতি অনুসরণের দায়িত্বও তাঁহার উপর পড়িয়াছে। অবশ্য কবি বা তাঁহার অনুরাগী-গোষ্ঠীর মতে আধুনিক কবিতার মধ্যে এই সৌন্দর্যের শাশ্বত আদর্শের কোন ব্যত্যয় হয় নাই। কিন্তু এই অভিমত রসগ্রাহী পাঠক

বর্গের রুচি দ্বারা সমর্থিত না হইলে কবিতা পাঠকচিত্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিবার শক্তি হারাইবে। আমরা কবির নিকট তীক্ষ্ণ মননশীলতা বা সমাজ-সমালোচনা মুখ্যভাবে দাবী করি না—এই উপাদানগুলি যখন সৌন্দর্যমণ্ডিত, কবি-কল্পনার দ্বারা রূপান্তরিত ও গভীর ভাবাবেগের আলম্বন হইয়া উপস্থাপিত হয়, তখনই ইহারা আমাদের আস্বাদনীয় হইয়া উঠে। সমাজ-চিত্তের সহিত কবি-চিত্তের ব্যবধান ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে, কবিতা সমাজ-চেতনাকে উচ্চতর ভাবানুভূতি ও আবেগময়তার স্তরে উন্নীত করিতে পারিতেছে না, উহার লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তি ও আকুল পথানুসন্ধানকে আরও দুর্জ্ঞেয় ও অস্বস্তিপূর্ণ করিতেছে মাত্র—ইহাই আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আক্ষেপের বিষয়।

গল্প-উপন্যাসে বাস্তবানুবর্তিতা কাব্যের তুলনায় অধিকতর সমর্থনীয় ইহা সত্য। তথাপি ইহাদের মধ্যেও আদর্শানুসৃতির প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। আমাদের বস্তুগত, প্রয়োজনাত্মক বা মননপ্রধান সংসার-যাত্রায় মানব-মনের উজ্জ্বলতম পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় না। বাস্তব জীবনে আমাদের মনে যে সমস্ত উন্নত আদর্শবাদমূলক ভাব-কল্পনা মধ্যে মধ্যে স্ফুরিত হয়, জীবন-পরিধির সঙ্কীর্ণতা ও আকস্মিক ঘটনা-সংস্থানের প্রভাবে তাহারা পূর্ণ পরিণতি লাভের সুযোগ পায় না। আমাদের মহৎ ভাবের ঊর্ধ্বায়ন বা গৌরবময় অন্তর্দ্বন্দ্বের চরম নাটকীয়তা বাস্তব ক্ষেত্রে অর্ধপথে ব্যাহত হইয়া নভোবিহার-অভীপ্সু ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গমের মত ধূলিলুণ্ঠিত হইতে বাধ্য হয়। এইখানেই সাহিত্য জীবন-সত্যের লংঘন না করিয়াও উহার অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে, উহার অর্ধ-গীত রাগিনীকে পূর্ণ সঙ্গীত-মূর্ছনায় ধ্বনিত করে ও জীবনের পরম সম্ভাবনাকে সুপরিণত বিকাশের প্রত্যক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত করে। কাজেই সাহিত্য হইতে আদর্শবাদ বর্জিত হইলে জীবনের খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ রূপটিই উহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। আমরা ধূলার মাটিতে বিচরণ করিতে করিতেও নক্ষত্রখচিত নীলাকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করি—উহার প্রশান্তি ও রহস্যময় গভীরতা আমাদের মনের কোন এক ফাঁক দিয়া আমাদের বস্তু-বিড়ম্বিত, অতৃপ্তি-লাঞ্ছিত জীবনের উপর আসিয়া পড়ে। সেরূপ সাহিত্যও শুধু জীবনের বাঁকাচোরা বিকৃতি, উহার তথ্যমূলক পাশবিকতা, উহার নিগূঢ়সঞ্চারী রসাতল-প্রবণতা, উহার আত্মপরিচয়হীন বিভ্রান্তির ছবি

দিলে উহার পূর্ণ কর্তব্য পালন করিবে না; সঙ্গে সঙ্গে উহার ঊর্ধ্বলোকের অভীপ্সা, উহার নিম্নগামিতার প্রতিরোধ-শক্তি, উহার নবসংগঠনের আকুতি, উহার বলিষ্ঠ, অপরাজেয় আশাবাদের প্রেরণারও পরিচয় দিতে হইবে। মানুষ যে নিম্নসত্তা-ঊর্ধ্বসত্তা, স্বর্গ-নরকের মধ্যে দোদুল্যমান ও তাহার যে আসল অভিপ্রায় হইল সুন্দরতর প্রতিবেশ-রচনা ও পূর্ণতর আত্মবিকাশ তাহার নিদর্শন যদি সাহিত্যে না পাই, তবে আর কোথায় পাইব ?

(৫)

আমাদের দেশে সাহিত্য চিরদিনই লোকশিক্ষার উপায় ও কল্যাণবোধের উদ্দীপনা রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। হইতে পারে অতীতে জীবনের সার্থকতার যে সুলভ ও সর্বস্বীকৃত আদর্শ সাহিত্যের প্রেরণা জোগাইয়াছে বর্তমানে তদনুরূপ সর্বজনীন প্রত্যয়ের অভাব ঘটিয়াছে। আমরা এখনও সকলে ভাল হইতে চাই, কিন্তু কি উপায়ে ভাল হইব সে সম্বন্ধে সংশয়াকুল। অতীতের কল্যাণ-বিরোধী শক্তিগুলি এখন নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে; অকল্যাণের ভূত তাড়াইবার মন্ত্রও ঠিক পূর্বনির্দিষ্ট অক্ষর-সমাবেশে রচিত হইবে না। আধুনিক সাহিত্যিক মানব-কল্যাণ-সাধনে কোন অমোঘ ও আশুফলপ্রদ ব্যবস্থাপত্রে আস্থাবান নহেন। হয়ত তাঁহারা মনে করেন যে অপূর্ণতার সত্য চিত্র হইতে মানুষ পূর্ণতা-লাভের প্রেরণা পাইবে, মানুষের মনে সৌন্দর্যবোধ ও সমবেদনা জাগ্রত করিতে পারিলেই সে আপনার শ্রেয়ের পথ আপনি খুঁজিয়া লইবে। কিন্তু কোন বিশেষ দেশে সামাজিক মানুষের চিত্তদ্বার খুলিতে হইলে যে চাবির প্রয়োজন তাহা বহুলাংশে ঐতিহ্যের শিল্পশালাতেই তৈয়ারি। আমরা সাধারণ সত্য হিসাবে মানব-প্রকৃতির সার্বভৌমতায় বিশ্বাসী; কিন্তু দেশভেদে ও রুচিভেদে প্রত্যেক দেশেরই একটা নিজস্ব অনুভূতি-বৈশিষ্ট্য ও সংবেদনশীলতা থাকে। আমাদের দেশে মিষ্টান্ন না হইলে ভোজ সমাপ্ত হয় না—পাশ্চাত্য দেশের ভোজে যে সমাপ্তিসূচক পানপাত্র পরিবেশিত হয় তাহাতে মিষ্টত্বের পরিমাণ অনেক কম। এ পর্যন্ত আধিভৌতিক বিষয়ে যদি সর্বদেশীয় মানুষের মিল না হইয়া থাকে আধিমানসিক ক্ষেত্রে তাহার সম্ভাব্যতা আরও কম। সারস ও শৃগাল পরস্পরকে নিমন্ত্রণ-উপলক্ষ্যে যে ভোজ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহাকে উপকরণ ও স্বাদুতার

দিক হইতে নিতান্ত মন্দ বলা যায় না; কিন্তু পাত্রের অনুপযোগিতার জন্য উভয়কেই বঞ্চিত ও অতৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের দেশের লোক চিরদিন সাহিত্যে যে চিত্ত-শান্তি, কল্যাণের ইঙ্গিত ও সৌন্দর্য-পিপাসার পরিতৃপ্তি পাইয়াছিল, কাল-পরিবর্তন ও বাস্তব প্রেরণার আধিক্যের প্রতি সমুচিত দৃষ্টি রাখিয়াও তাহাদের জন্য তদনুরূপ কিছু দান করিতে হইবে।

আমরা সাহিত্য সম্বন্ধে কাব্যোচ্ছ্বাসময় বড় বড় কথা বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি; কিন্তু কার্যতঃ জীবনের উপর সাহিত্যের প্রভাব অতি সামান্যই দেখা যায়। সাহিত্য আমাদিগকে জীবন-তত্ত্বের দুর্জ্ঞেয়তা সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে, জীবন-কৌতূহলকে সম্প্রসারিত করিয়াছে, মনের উদার গ্রহণশীলতা ও স্থিতিস্থাপকতা কিছুটা বাড়াইয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগের সাহিত্যপাঠের আনন্দ ব্রহ্মানন্দ-সহোদর ত নহেই, চিত্তশুদ্ধিকর অথবা মনঃসংহতি-বিধায়ক কিনা তাহাও সন্দেহ। বিশ্বের মনীষিবৃন্দের পারস্পরিক ভাব-বিনিময় কিছুটা সুগম হইতে পারে, আন্তর্জাতিক মেলা-মেশার ঘটা, হয়ত আন্তরিকতাও কিছু বাড়িয়াছে, বিদেশ-ভ্রমণে নিমন্ত্রিত ভারতবাসীদের ভ্রমণ-কাহিনী বিস্ময়সূচক ভাবোচ্ছ্বাসে কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে—কিন্তু এহ বাহ্য। যে উৎসমুখ হইতে জাতির সৃষ্টিপ্রতিভা ও জীবন-দর্শনের বৈশিষ্ট্য উৎসারিত সেখানে আমরা গিয়া পৌঁছিতেছি না। ভাগীরথী-বক্ষে প্রমোদ-বিহারে মিলিতেছি, কিন্তু দুর্গম গঙ্গোত্রীমুখ এখনও অনাবিষ্কৃত। শুধু উচ্চকোটিক চিন্তা-নায়ক ও রাজনীতি-বিদেরা বড় বড় ভ্রাতৃভাবমূলক আদর্শবাদের কথা বলিলেই বিশ্বমানবের হৃদয়তন্ত্রীতে ঐ ঐক্যের সুর ধ্বনিত হইবে না। ভাবধারা সর্বসাধারণের মধ্যে নামিয়া আসার প্রতীক্ষা করিতে হইবে। কাব্যরসে ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে যে মনের মাটি আর্দ্র, সেখানে পারমাণবিক মারণাস্ত্রের বিষবৃক্ষ ডালপালা মেলিতেছে কি করিয়া? এই মারণাস্ত্রের প্রতিষেধক অস্ত্র সাহিত্যকেই আবিষ্কার করিতে হইবে, এই আক্ষরিক অর্থে সংসার-রূপ বিষবৃক্ষে যাহাতে বিষনাশী অমৃতফল ফলে তাহার জন্য সাহিত্যকেই তপস্যা করিতে হইবে। আজ কবি-সাহিত্যিককে বৈজ্ঞানিকের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া অমৃতলোকে অভিযাত্রী হইতে হইবে, সপ্তস্বর্গপ্রদক্ষিণকারী, সুরলোকের রহস্যভেদী ভাব-বিমানকে মানবমনোলোকে উড্ডীন করিয়া দিতে হইবে, হিংসা-দ্বেষ-প্রতিযোগিতার

ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর স্বর্ণসেতু নির্মাণ করিতে হইবে, মানব মনের গভীরতম অনুভূতিকেন্দ্র পর্যন্ত সাহিত্যের স্নিগ্ধ দাক্ষিণ্য প্রসারিত করিতে হইবে। উহাকে শুধু বর্ণ ও ভাববিলাসী হইয়া অস্তগোধূলির উদাসব্যঞ্জনাময়, দ্রুত-বিলীয়মান স্বর্ণচ্ছটামণ্ডিত হইলে চলিবে না। মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে, যেখানে জীবিকার জন্য কঠোর, ঘর্মাপ্লুত সংগ্রাম চলিতেছে, যেখানে হৃদয়-কন্দরে বিষনাগিনীর দীর্ঘশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইতেছে, যেখানে রক্তাক্ত ও হিংসা কলুষিত বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব অভিনীত হইতেছে, যে পৈশাচিক মন্ত্রণালয়ের নিভৃত কক্ষে বিশ্বধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন ধীরে ধীরে আপনার জটিল জাল বিকীর্ণ করিতেছে, সমাজের সেই বিষপ্রস্রবণগুলির উৎসমুখেই সাহিত্যকে নিজ অভয়মন্ত্র লইয়া অবতীর্ণ হইতে হইবে। আজ ধর্ম যেখানে নিস্তেজ, শক্তিহীন বাণীমাত্রে পর্যবসিত, সেখানে সাহিত্যের রসসিঞ্চনে ধর্মবোধের শুষ্ক তরুকে মঞ্জরিত করিতে হইবে। একদিন বাংলা কাব্যের মধ্যেই এই প্রেমমন্ত্র, এই দিব্য অনুভূতি উচ্চারিত হইয়া দেশবাসীর চিত্তে অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়াছিল—চৈতন্যের প্রেমধর্ম, তান্ত্রিকের মাতৃ-উপাসনাতত্ত্বের রসসমুদ্র, পদাবলী-সাহিত্যের দেশব্যাপী পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া জাতির সর্বসাধারণের চিত্তকে সরস ও সুধাসিঞ্চিত করিয়াছিল। আজ যখন সমগ্র সমাজ আসন্ন দুর্দৈবের জন্য অসহায়ভাবে প্রতীক্ষমাণ, যখন আকাশে আকাশে প্রলয়সংকেত, যখন মেঘে মেঘে ডমরু-নিনাদ, যখন অন্তরে অন্তরে তাহার শঙ্কা-দুঃসহ প্রতিধ্বনি, তখন বাংলা সাহিত্যই তাহার পূর্ব ঐতিহ্য-গৌরবে প্রবুদ্ধ হইয়া এক নূতন তিমির-বিদারী, জ্যোতির্ময় অভ্যুদয়ে আত্মপ্রকাশ করিবে এরূপ আশা কি একেবারেই অবাস্তব কল্পনা-বিলাস? রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকাসত্ত্বেও কি আমাদের কবি-গোষ্ঠী এইরূপ দৃঢ়প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন না!

সমাজ ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক

(১)

কালচক্রের আবর্তনে আবার নিখিল-ভারত-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের বহু-ঈপ্সিত মিলন-লগ্নটি ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং সুদীর্ঘ এক বৎসরের অদর্শনের পরে আমরা ইহারই উৎসব-মণ্ডপে আবার পরমাত্মীয় প্রিয় সুহৃদবর্গের স্নিগ্ধ সাহচর্য-লাভের সুযোগ পাইয়াছি। এবার কিন্তু আমার পক্ষে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত মন লইয়া বন্ধু-বান্ধবের সহিত প্রীতি-বিনিময় করার সৌভাগ্য হইল না; এবার নিতান্ত আকস্মিকভাবে গুরুভার দায়িত্বের উচ্চমঞ্চ হইতেই তাঁহাদের সম্ভাষণ করিতে হইল। এখানকার অভ্যর্থনা-সমিতি এবার সাহিত্য-শাখা-পরিচালনার দুরূহ সম্মান আমার এই অযোগ্য স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া আমাকে বিব্রত করিয়াছেন। ঘরের লোককে যদি হঠাৎ নিমন্ত্রিত অতিথির তিলক পরান হয়, তবে যে খানিকটা কৌতুককর অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়, এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে—আমি নিজ গৃহে আতিথ্য-লাভের অস্বস্তিকর আনন্দ অনুভব করিতেছি। যাহাই হউক এই একান্ত পরিচিত প্রিয় পরিবেশে আমার অযোগ্যতার জন্য কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। নিশ্চিত জানি যে, আপনাদের নিকট এতকাল ধরিয়া যে প্রীতিপূর্ণ প্রশ্রয় লাভ করিয়া আসিতেছি তাহাই আমার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিতে উপেক্ষা করিয়া আমার অযোগ্য প্রয়াসকেও প্রসন্ন অভিনন্দনে ধন্য করিয়া তুলিবে। সেই প্রসন্ন দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমার এই গুরু দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইতেছি।

পূর্ব-পূর্ব বৎসরে যে সমস্ত মনীষী এই গৌরবময় আসনকে অলংকৃত করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমার বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও প্রতিভাবান মৌলিক স্রষ্টা ছিলেন—বাংলা সাহিত্যে তাঁহারা চিরন্তন প্রতিষ্ঠার অধিকারী। সে হিসাবে আমি তাঁহাদের সমপর্যায়ে আসনলাভের অনুপযুক্ত। সাহিত্যের যে অন্দর-মহলে সৃষ্টি-কার্যের অপরূপ বিস্ময় অভিনীত হয়, আমার সেখানে প্রবেশাধিকার

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের জব্বলপুর অধিবেশনে সাহিত্যশাখার সভাপতির ভাষণ।

নাই। আমি কেবল দুই একটা অর্ধরুদ্ধ ক্ষুদ্র গবাক্ষের ভিতর দিয়া সেই রহস্য-নিকেতনে উঁকিঝুঁকি মারি ও সেখানকার নিগূঢ় ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার এক-আধটু বার্তা বাহিরে বহন করিয়া আনিয়া সারস্বত গোষ্ঠীর সকলের সহিত উপভোগ করি। সুতরাং আমার কাছে আপনারা ভিতরের আর বিশেষ কিছু পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারেন না; বাহিরের টুকি-টাকি খবরেই আপনাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত সুধা কিছুক্ষণের জন্য ঘাসের উপর রক্ষিত হইয়াছিল; পরে সেখান হইতে উহা অপসারিত হইলে আস্বাদনে অনধিকারী কোন প্রাণী ঐ তৃণখণ্ডকেই লেহন করিতে গিয়া নিজ জিহ্বা দ্বি-খণ্ডিত করিয়াছিল। সাহিত্য-সমালোচকের অবস্থা অনেকটা এই খণ্ডিত-জিহ্ব প্রাণীর ন্যায়; যে রসনায় সে প্রকাশাতীত রহস্যের স্বাদ অনুভব করে, সেই রসনার সাহায্যেই তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না; লাভের মধ্যে তাহার স্বাদের রসনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের রসনা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া উহার বাক্-শক্তি ক্ষুণ্ণ করে।

তথাপি ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে সাহিত্য প্রধানত সামাজিকের জন্য, উহার স্রষ্টার সংখ্যা মুষ্টিমেয়, কিন্তু উহার রসাস্বাদন-পিপাসু পাঠক অসংখ্য। বিশেষত আমাদের সাহিত্য-সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য সাহিত্য-সৃষ্টির রহস্যোদ্ভেদ নহে, সমাজচিত্তে সাহিত্যের প্রভাব-নির্ণয় ও সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে সহজ অনুকূল সম্বন্ধ-স্থাপন। স্রষ্টার আসন সভা-সমিতির জনাকীর্ণতায় নহে, প্রগাঢ় উপলব্ধি ও আত্মসমীক্ষার নিঃসঙ্গতায়। সম্মিলিত সমাজচিত্ত হইতে যে ভাব-প্রেরণা শতধারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, সাহিত্যিক তাহা পান করিবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু নিজ অন্তরানুভূতির উত্তপ্ত কটাহে উহাকে বারবার আবর্তিত করিয়া, উহার সমস্ত রূঢ়, স্থূল ও আকস্মিক অংশকে বর্জন করিয়া উহার শাশ্বত রূপ ও নিগূঢ় রস-নির্যাসটিকেই তাঁহার রচনায় সুন্দর ও স্মরণীয় অভিব্যক্তি দিবেন। সুতরাং স্রষ্টা সামাজিক হইয়াও একক; তাঁহার কণ্ঠধ্বনি কেবল সমাজ-কোলাহলের প্রতিধ্বনি নহে। মনুমেণ্টের পাদদেশে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভার তীব্র, উচ্চকণ্ঠ চীৎকার তাঁহার রচনায় পুনরাবৃত্ত হইবে না। হিমালয়ে আরণ্য-জটিল, দুর্বার প্রবৃত্তি-গুচ্ছ হইতে উদ্ভূত খরবেগা গঙ্গা কবি-জহ্নুর প্রশান্ত স্বীকরণের সংযম-শাসিতা হইয়া, অভিশপ্ত, আধি-ব্যাধি-জর্জর মানবের মোক্ষদায়িনী ভাগীরথী রূপে পরম কল্যাণের

সাগরসঙ্গমে যাত্রা শেষ করিবেন। মানবের উদ্দাম, বাধাবন্ধনহীন কামনার আতিশয্যে যাহার জন্ম, কবি নিজ অনুভূতির আত্মস্থতায় তাহাকে মার্জিত ও সংশোধিত করিয়া সমাজের উন্নততম শ্রেয়সাধনে তাহাকে নিয়োগ করিবেন—গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় সাহিত্য-ধারারও এই বিধি-নির্দিষ্ট গতিপথ ও জীবন-পরিণতি। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যিকের যোগসূত্র নিশ্চয়ই থাকিবে, কিন্তু সেই যোগ বস্তুপুঞ্জের ভার-বহনের জন্য নহে, উহার পেছনে যে ভাবসত্য বর্তমান তাহাকেই আবিষ্কার ও প্রকটিত করিবার জন্য। তিনি যেন একাধারে পার্থিব জগৎ ও সৌরমণ্ডলের অধিবাসী; তিনি জগৎকে প্রদক্ষিণ করিবেন শুধু উহার সঙ্কীর্ণ কক্ষপথে নহে, উহার উদার-বিস্তৃত, সৃষ্টিসীমা-প্রসারিত, বৃহত্তর আবর্তন-বৃত্তানুসরণে। লাবণ্য যেমন অমিতকে বলিয়াছে, তেমনি সমাজও কবি-সাহিত্যিককে বলিবে, "গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমারে"। স্রষ্টা একসঙ্গে জীবনানুসারী ও জীবনাতিগ।

(২)

এই পর্যন্ত কবিস্রষ্টার দিকের কথা বলা হইল। কিন্তু আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সমাজ-জীবনের উপর সাহিত্যের প্রভাব। সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে পরস্পর-নির্ভর সম্পর্ক; সমাজ হইতে সাহিত্য প্রেরণা পায়; কিন্তু ইহার সাহায্যে সাহিত্য যে ছন্দ-সুষমা, যে উন্নততর জীবনবোধ, জীবন-প্রক্রিয়ার যে আদর্শান্বিত প্রতিরূপ সৃষ্টি করে তাহার প্রভাব কতটুকু আমাদের সমাজ-চেতনায় সংক্রামিত হইতেছে, তাহাই সাহিত্যরসিক সামাজিকের আসল জিজ্ঞাস্য। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকগোষ্ঠী সাহিত্যকে উচ্চতম মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। "কবিরেব প্রজাপতিঃ ও কাব্যাস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদাসহোদর" এইরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি-বাক্যের মধ্যেই তাঁহারা কাব্যের প্রতি কি অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিত মিলে। যে সমাজ-ব্যবস্থায় ভগবানের লীলাবিলাস-অনুভব, সৃষ্টিরহস্যের আবিষ্কার ও ব্রহ্মানুভূতি মানবজীবনের প্রধান কাম্য ছিল ও কবি এই দিব্যচেতনাস্ফুরণের প্রধান সহায়ক ছিলেন, সেই অতীত যুগের স্মৃতিই এই বিচারের মধ্যে প্রতিবিম্বিত। পাশ্চাত্য সমালোচকদের মধ্যে প্লেটো, আরিস্ততল, সিডনি ও শেলি এই অতীন্দ্রিয়রহস্যদ্যোতক কবিকৃতির প্রতি পূজা-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। বাংলার বৈষ্ণব কবিতার

সমস্ত কাব্যসৌন্দর্য ও আবেগের আন্তরিকতা চিরসুন্দরের আরতিরূপে সেই মূলীভূত সৌন্দর্য-বিগ্রহের চারিদিকে আবর্তিত হইয়াছে; শাক্ত পদাবলীর সরল, নিরাভরণ আকৃতি আত্মবিস্মৃত শিশুর ন্যায় স্নেহময়ী বিশ্বজননীর অঞ্চলতলে আশ্রয় লইয়াছে। এমন কি মঙ্গলকাব্যের আপেক্ষিকভাবে উৎকর্ষবিহীন রচনাও মানবের হীন প্রবৃত্তির সঙ্গে দেবনির্ভর ভক্তিবাদের একটা আপোষ-নিষ্পত্তির প্রয়াস পাইয়াছে। কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ প্রাচীন যুগের ক্ষাত্রধর্মকঠোর, তত্ত্বপ্রধান আখ্যানের মধ্যে ভক্তিবিহ্বলতার কোমল প্রলেপ পুরিয়া এই মহাকাব্যদ্বয়ের কাব্যৈশ্বর্যকে বাঙালীর সমাজচেতনা ও ভাবাদর্শের সহিত মিশাইয়া দিয়াছে—শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ বাঙালীর মনোলোকে নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বাংলা সাহিত্য শুধু নিজ সৌন্দর্যকল্পনা-লোকেই স্বপ্নরোমন্থনরত ছিল না, সমাজচিত্তের বিশুদ্ধিসাধন, উচ্চতম আদর্শের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা ও অনুরাগ-সঞ্চারও উহার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল।

এমন কি যখন ধর্মভাবসর্বস্ব সাহিত্যধারার অবসান ঘটিয়া সাহিত্যে আধুনিক মানবিকতা ও সংস্কারমুক্তির সূত্রপাত হইল, তখনও ইহার কল্যাণধর্মিতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রহিল। উনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যের যে নবজাগরণ ঘটিল তাহাতেও স্বাধীন যুক্তিবাদ, বিষয়-বৈচিত্র্য ও কল্পনার মৌলিকতার সঙ্গে সঙ্গে প্রবুদ্ধ ধর্মচেতনার সূক্ষ্মতর অনুভূতিও বিকশিত হইল। প্রথম আধুনিক লেখক রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদ বেদান্তধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ও বিকৃত ধর্ম-সংস্কারের মূলোচ্ছেদে নিয়োজিত হইল—আপন ধর্ম ও সমাজকে কলুষমুক্ত করিবার কার্যেই তিনি নিজ জ্ঞানচর্চার প্রয়োগ করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের সূক্ষ্ম মানস অনুভূতি ও প্রকৃতি-প্রেম অধ্যাত্মসাধনার স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপশিখায় তৈলনিষেক করিল—তাঁহার হিমালয়-ভ্রমণে তীর্থযাত্রার মহিমা প্রকটিত হইল। নবরীতির বাংলা কাব্যের উপর ঐতিহ্যবাহিত সমাজ-বোধের অনিবার্য প্রভাবের আশ্চর্যতম নিদর্শন পাই বিপ্লবী কবি মধুসূদন দত্তের রচনায়। যে শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে তিনি দৃঢ়সংকল্প, যে অতীতকে মুছিয়া ফেলিতে তিনি বদ্ধপরিকর, যে উত্তরাধিকারকে তিনি অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত, কেমন করিয়া জানি না তাহাই তাঁহার জীবনব্যাপী বিরোধিতাকে

পরিহাস করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার কবিচিত্তের মর্মমূলে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে—বিদ্রোহের উদ্ধত স্পর্ধার সঙ্গে করুণ আত্মনিবেদনের সুর মিশিয়া গিয়াছে। এই অস্বীকৃত ঐতিহ্যানুরাগের পরশপাথরের স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাগল-সন্ন্যাসীর ন্যায় মধুসূদনেরও কটিনিবদ্ধ লৌহশৃঙ্খল কখন যে সোনায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে তাহা কবি জানিতে পারেন নাই। যে রাবণ স্বেচ্ছাচারের প্রতিমূর্তি, যে লঙ্কারাজত্ব অসংস্কৃত ঐশ্বর্যসমারোহের প্রলয়বহ্নিদীপ্ত, তাহার মধ্যেও শাশ্বত কল্যাণের আদর্শ অনুপ্রবেশ করিয়াছে—এই দম্ভস্তূপের উপরেও তুলসীতলার শান্ত দেউটি জ্বলিয়াছে, সীতা-সরমার কারুণ্যরসসিক্ত পূর্বকথাস্মরণ রণকোলাহলের কাণে শান্তিমন্ত্র গুঞ্জরিত করিয়াছে, ইন্দ্রজিতের রণক্ষেত্রে মৃত্যু ও প্রমীলার চিতারোহণ দশমীতে প্রতিমা-বিসর্জনের ভক্তিপ্লুত শোকোচ্ছ্বাসের অশ্রুপ্রবাহ ঝরাইয়াছে। মধুসূদনের মহাকাব্যে আমরা সমস্ত পাশ্চাত্য ভূভাগের সাহিত্যশিল্প-পরিক্রমা শেষ করিয়া সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছি। জ্বলন্ত ধুপ সমস্ত ভাবাকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া শেষে একটি স্নিগ্ধ দীপশিখার অচঞ্চল, অনির্বাণ উজ্জ্বলতায় উহার জ্বালাময় অশান্ত আবেগ সংহরণ করিয়াছে।

মধুসূদনের অব্যবহিত পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সাহিত্যেও এই নূতন-পুরাতনের সমন্বয় ও সমীকরণ-প্রয়াসের আর একটি স্তরপরিণতি প্রত্যক্ষ করি। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস পাশ্চাত্যপ্রভাবসঞ্জাত এক সম্পূর্ণ নূতন শিল্পরূপ। পাশ্চাত্য জীবন-পর্যবেক্ষণরীতি-অনুসারে বাঙালী জীবনের তাৎপর্য-উদ্‌ঘাটন-ব্যাপারে লেখকের স্বাধীনতা কোন পূর্বনির্ধারিত শিল্পবিন্যাসের আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। বঙ্কিমের কল্পনানেত্রে এই নবজাত সাহিত্য-শিল্পের যে রূপ উদ্ভাসিত হইয়াছিল তাহা আখ্যান-কাব্যের নিকট-আত্মীয়-কল্প ও গীতিকবিতাধর্মী। বাঙালীর ঘরের কথাকে মনস্তত্ত্বের সূত্রে গাঁথিতে হইবে, তাহার স্বপ্ন-কল্পনা এই ঘরের কথার পার্থিব জগতের উপর নীলাকাশের মায়া বিস্তার করিবে, তাহার প্রাত্যহিক ঘটনাজালের ফাঁকে ফাঁকে বাঙালীর সহজ-অনুভব-বেদ্য কল্পলোকের দিব্যদ্যুতি উদ্ভাসিত হইবে, তাহার সনাতন জীবননীতি এই পরীক্ষার আগুনে পুড়িয়া খাঁটি সোনার মত উজ্জ্বল হইবে—এই ছিল তাঁহার মোটামুটি ধারণা। আঘাত ও আলোড়ন আসিবে পাশ্চাত্য

ভাবতরঙ্গ হইতে, কিন্তু ইহা প্রতিহত হইবে হিন্দুজীবনের চিরন্তন ধর্মসংস্কৃতি ও জীবনচর্যার সুরক্ষিত তটভূমির উপর। যে উপনিষদ-গীতা-পুরাণরসে হিন্দুর জীবনধারা পুষ্ট হইয়াছে, চরম সংঘাত ও সঙ্কট-মুহূর্তে উহাদের প্রভাব যে অনিবার্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে ইহাকে তিনি স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে ধরিয়া লইয়াছিলেন। কাজেই তিনি এই জীবনকাহিনী হইতে অতিপ্রাকৃতকে বাদ দেন নাই, ধর্মতত্ত্বের উপর বহিষ্কারের হুকুমজারি করেন নাই, সমাজকল্যাণের আদর্শকে জীবনসত্যবিরোধী প্রক্ষেপ রূপে দেখেন নাই। ধর্ম ও সমাজনীতি-নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক অনুসরণকে বঙ্কিম জীবনের কেন্দ্রশক্তিরূপে স্বীকার করেন নাই, কেননা বাঙালীর বাস্তব জীবনে এই প্রবৃত্তি-নিরোধের প্রেরণাও অবিসংবাদিত সত্য। বাঙালী জীবনে অধ্যাত্মলোক জীবলোকের উপর এমন নিবিড় একান্তভাবে ঝুঁকিয়াছিল যে, উভয়ের মধ্যে অতিনৈকট্যজনিত স্পর্শ এড়ান যায় না। যেখানে সামগ্রিক কল্যাণবোধ জীবনের সহজগতিতে অবরুদ্ধ না করিয়া উহার ছন্দকে নিরূপিত করে, যেখানে সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শের অনুসরণে সমাজ ব্যক্তিত্বের সম্পূরক ও পূর্ণতা-বিধায়ক, সেখানে জীবনের চিত্র হইতে উহাকে বাদ দিলে চিত্র অবাস্তব ও অসম্পূর্ণ হইবে। যতদিন মানুষের বাড়ী থাকে, ততদিন তাহার গৃহস্থ জীবনই তাহার সত্যজীবন, তাহার জীবনবিকাশকে এই সামগ্রিক জীবন-যাত্রার আদর্শেই নিয়মিত করিতে হয়। বঙ্কিমের যুগে অন্তত এই গৃহ রক্ষা করাই সাহিত্যের একটা প্রধান কর্তব্য ছিল। সে যুগে সমাজ যে ধূলিসাৎ হইবে ও সমাজবন্ধনমুক্ত আত্মরতিবিলাসী মানবাত্মা যে নিজ আনন্দ-বেদনার স্বতন্ত্র উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিবে, প্রবৃত্তি-চালিত পথে চরিতার্থতা খুঁজিবে ইহা পূর্ব হইতে কল্পনা করা সহজ ছিল না। "পথে বেঁধে দিল চলতি হাওয়ার গ্রন্থি"—এই কবিকল্পনা তখনও সামাজিক সত্যে পরিণত হয় নাই। কাজেই বঙ্কিমের যাঁহারা বিরুদ্ধবাদী, তাঁহারা বঙ্কিম-সাহিত্যকে পরবর্তী কালের পরিবর্তিত মানদণ্ডে বিচার করিতে গিয়া তাঁহার সৃষ্টি-প্রেরণার আসল তাৎপর্যটিই ভুল বোঝেন। বঙ্কিমের ঊর্ধ্বচারী শিথিলমূল কল্পনা 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রে সমগ্র দেশে যে গভীর দেশাত্মবোধ ও ভাবসমুন্নতি জাগ্রত করিয়াছে, কোন অনবদ্য-শিল্পাধিকারী মৃত্তিকারসপায়ী ঔপন্যাসিকের রচনায় তাহার অনুরূপ কিছু মিলে কি?

(৩)

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবিরূপে আমাদের নিকট পরিচিত, কিন্তু তাঁহার সার্বভৌম বিশ্বানুভূতি ভারতীয় সংস্কৃতির আধারের মধ্যেই রক্ষিত। তাঁহার কল্পনার বিচিত্র প্রসার, তাঁহার মনের সর্বতোমুখী বিস্তার, তাঁহার বিষয় ও ভাবের অফুরন্ত অভিনবত্ব—সবই ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কার ও জীবনাদর্শের স্থির আশ্রয়ভূমির উপরই অধিষ্ঠিত। ঔপনিষদিক তত্ত্বচেতনা, নিখিল-পরিব্যাপ্ত ঐশী লীলার নিঃসংশয় উপলব্ধি, পার্থিব জীবনের পটভূমিকায় যুগযুগান্ত-প্রসারিত অনন্ত জীবনের বিস্তার, জড় প্রকৃতির ও মানবচিত্তের মধ্যে আনন্দময় প্রীতি-বন্ধন, অতলস্পর্শ রহস্যের মধ্যে মানবাত্মার সত্য পরিচয়ের সন্ধান—এই সবই শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রথাগত ধর্মসংস্কারমাত্র নহে, তাঁহার কাব্য-প্রেরণার জীবন্ত উৎস, তাঁহার কবি-চেতনার মর্মগত প্রত্যয়। সুতরাং তাঁহার কাব্য কেবল সুন্দরের রূপসজ্জা নহে, কেবল ললিতকলার প্রয়োগ-কুশলতা নহে, ইহা জীবনের রহস্য-উদঘাটন ও স্বরূপ-নির্ণয়ের গভীরতাৎপর্যপূর্ণ প্রয়াস। জীবন-সত্য যে মায়াজালে আবৃত এবং এই মায়াবরণকে অপসারিত না করিলে ইহা অননুভবনীয়—এই বিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথের সহিত উপনিষদের কোন পার্থক্য নাই। তবে তাঁহাদের এই আবরণ-উন্মোচনের পদ্ধতি পৃথক। উপনিষদ্‌কার ধ্যান-ধারণা-তপস্যার মধ্য দিয়া যে সত্য-উপলব্ধির প্রয়াসী, রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে গভীর অনুপ্রবেশের দ্বারা, মুহূর্তের চকিত আভাসসমূহের সাংকেতিকতায়, মানবিক প্রেমের লীলাবিলাসের মাধ্যমে সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছিতে চাহেন। অর্থাৎ অসীমের সন্ধান, অনন্তের প্রতি আকুতিই যে এই মানবজীবনের আসল কাজ ইহা রবীন্দ্রনাথের কেবল কবি-কল্পনা বা দর্শন-বিলাস নহে; ইহা তাঁহার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়া অনুভূত সত্য। বাংলা কবিতার সুপ্রাচীন ভক্তিবাদ, ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন আবার এই আধুনিক যুগের তীক্ষ্ণমননসম্পন্ন, নিখিল বিশ্বের ভাবধারায় অভিস্নাত, জড়বাদ ও বিজ্ঞানের নেতিমূলক সংশয়ের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত কবির মধ্যে, তাঁহার গভীর ও বিচিত্র কল্পনার মাধ্যমে আশ্চর্য পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে।

আর এই জীবনাদর্শের কথা কেবল তাঁহার কবিতাতেই রূপ পায় নাই, তাঁহার সমস্ত গদ্যরচনাতেও পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হইয়াছে। তিনি

যে ধনতান্ত্রিক ও ভোগলোলুপ প্রতীচ্য সভ্যতার বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন তাহা নিতান্ত শূন্যগর্ভ আস্ফালন নহে, তাহা নিজের দেশের ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রীতি-স্নিগ্ধ ও ধর্মকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থা পুনঃ-প্রবর্তনের নিশ্চিত-আশ্বাস-প্রণোদিত। ভগবানকে বাদ দিয়া শুধু নীতি-বোধের উপর নির্ভরশীল সমাজ উহার উচ্চ আদর্শে কখনই স্থির থাকিতে পারিবে না ইহা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে তিনি আধুনিক মননশীলতার সঙ্গে প্রাচীন ধর্মসাধনাকে মিশাইয়া যুগ-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-মনকে নূতন করিয়া গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। উপনিষদের তত্ত্বচেতনা যে আধুনিক কালের অনুপযোগী, ইহা যে সক্রিয় জীবনবোধের অঙ্গীভূত না হইয়া কেবল নিঃসঙ্গ অধ্যাত্ম সাধনার বিষয়, ইহা তিনি কোনদিনই স্বীকার করেন নাই। পাশ্চাত্য শিল্প-বিজ্ঞানকে ধর্মবোধের দ্বারা সংশোধন না করিয়া একান্তভাবে গ্রহণ করিলে, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ-নির্ভর ব্যক্তিজীবনবাদকে সম্পূর্ণভাবে অবলম্বন করিলে, পাশ্চাত্য নিরঙ্কুশ আত্মপ্রসারকে চরম মর্যাদা দিলে যে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার ব্যাধিজর্জর পরিণামকে বরণ করিতে হইবে, শক্তিমত্ততার দম্ভ ও ভোগ-মত্ততার মোহের অনিবার্য ফল যে মহতী বিনষ্টি, ইহা তিনি সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার সমস্ত সৌন্দর্য-সুষমা ও ছন্দ-লালিত্যের পিছনে এই অখণ্ডনীয় বিধিলিপি আগ্নেয় অক্ষরে প্রজ্বলন্ত।

রবীন্দ্রনাথই শেষ কবি যিনি আমাদের বিপর্যস্ত জীবনবোধকে ছিন্ন-সূত্র সংযোজনের দ্বারা সামগ্রিকতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে, ছন্দোভ্রষ্ট জীবনযাত্রার ছন্দসুষমা পুনঃপ্রবর্তন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমরা তাঁহার কাব্যের এই জীবন-নিয়ামক মর্যাদা কার্যত স্বীকার করি নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অনুরাগী অনেকেই আছেন, তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় কেহই তাঁহার জীবনসাধনার নির্দেশ মানিয়া লন নাই। কবির কাব্য আমাদিগকে আনন্দ দিবে, আমাদের সৌন্দর্যবোধকে উদ্দীপ্ত করিবে, আমাদের কল্পনাকে প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত করিয়া দূরাভি-সারের প্রেরণা যোগাইবে, আমাদের ক্ষণিক ভাবানুভূতিকে বিলীন হইতে না দিয়া চিরন্তনত্বের বেষ্টনীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবে—কবির সহিত আমাদের সম্পর্ক এই পর্যন্তই; কিন্তু আমাদের ব্যক্তিত্ববোধের আতিশয্য তাঁহাকে

সমগ্র জীবন-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে মোটেই প্রস্তুত নহে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর মনে এক অদ্ভুত, স্ববিরোধপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি আমাদের কাব্য-চেতনাকে প্রভাবিত করিয়াছেন, কিন্তু জীবন-চেতনাকে ক্ষীণভাবে স্পর্শ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও অসীম-সাধনার যে আমাদের জীবনের প্রতি কোন আবেদন থাকিতে পারে তাহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। সুতরাং আমরা অন্য কোন পূর্বতন কবির সম্বন্ধে যাহা করি নাই, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহাই করিতেছি—তাঁহার কাব্য-শিল্পকে তাঁহার সত্যানুভূতি হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া শুধু তাঁহার সত্তার একাংশের প্রতি প্রতিভার প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। যে প্রাণবায়ু নিষ্কাশিত করিলে কাব্যের জ্যোতির্গোলক শূন্যগর্ভ রঙ্গীন ফানুসে পর্যবসিত হয়, আমরা তাহাই লইয়া লোফালুফি করিয়া পরম আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি; শুক্তির গর্ভ হইতে মুক্তা বাহির করিয়া দিয়া উহার উপরের চিত্রিত খোলসটিকেই সযত্নে গৃহসজ্জার মহামূল্য উপকরণরূপে ব্যবহার করিতেছি। রবীন্দ্রনাথের নামে উদ্যান, রাস্তা, শিল্পশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশের নূতন নূতন উপায় খুঁজিয়া সারা হইতেছি। যে কবির সত্য আসন আমাদের অন্তরের সিংহাসনে, তাঁহাকে যাত্রার দলের রাজার রাজমুকুট পরাইয়া ভক্তির আড়ম্বরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছি। যে কবি আমাদের জীবনরথের সারথি হইবেন, তাঁহাকে রথের চাকায় বাঁধিয়া, বর্ণ-বিচিত্র পতাকা উড়াইয়া, তাঁহার নামের জয়ধ্বনি তুলিয়া, জীবন-শোভাযাত্রায় বাহির হইয়াছি। এইরূপে অতি-স্তুতি ও আংশিক গ্রহণের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সামাজিক তাৎপর্যটি আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিতে চলিয়াছি। মোহনিদ্রাভিভূত জাতির ঘুম ভাঙ্গাইতে যে ভাস্বর সূর্য আমাদের আকাশে উদিত হইয়াছিল, আমরা সেই জ্যোতির্ময় আবির্ভাবকে দিয়া আমাদের স্বপ্নাবেশ নিবিড়তর করিয়া তুলিতেছি —বিধাতার বিধানের সঙ্গে আমরা এইভাবেই সহযোগিতা করিতেছি।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সমাজ-চেতনা সর্বজনস্বীকৃত ও সমাজ-মনের উপর তাঁহার প্রভাবও অনস্বীকার্য। সমাজের অনুদার রক্ষণশীলতা ও অযৌক্তিক সংস্কার হইতে তিনি আমাদের যতটা মুক্ত করিয়াছেন এমন আর কোন লেখক করেন নাই। আধুনিক জীবনযাত্রার মোটামুটি রূপ ও উহার পিছনকার

ভাবপ্রেরণার মূলে আছে তাঁহার উপন্যাসের জীবন-মূল্যায়ন। তবে তিনি যতটা অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন, আমরা তাহার অপেক্ষা অনেকদূর বেশী আগাইয়া গিয়াছি ও তাঁহার জীবনাদর্শের গঠনমূলক দিকের পরিবর্তে তাঁহার সমর্থিত বন্ধন-শিথিলতাকেই চূড়ান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছি। তিনি সমাজকে উদার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমরা সমাজকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। তিনি যে উন্নততর আদর্শ ও ব্যক্তিজীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশের প্রয়োজনে সংস্কারমূঢ় সমাজ-নিয়ন্ত্রণে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন আমরা তাহার পরিবর্তে নিছক প্রবৃত্তি বা খেয়ালের দাবীতেই সমাজ-শাসন ছিন্ন করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেছি না। অতি আধুনিক যুগের দুই একজন অসাধারণ ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে, বোধ হয় শরৎচন্দ্রই শেষ লেখক যাঁহার রচনায় যৌথ পরিবারের চিত্র অঙ্কিত ও সমাজনীতির শাশ্বত মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে। সমাজের সংস্কার করিতে গিয়া যাহাতে উহাকে সংহার না করি সে দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সমাজবিধি-উল্লঙ্ঘনের যে গুরুতর কারণ থাকা দরকার, ও ইহার জন্য যে মানুষের আজন্মপোষিত সংস্কারে টান পড়ে, গভীর ও রক্তস্রাবী অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগে—এই জীবন-সত্য তাঁহার সমস্ত উপন্যাসে পরিস্ফুট। যুগযুগব্যাপী সমাজাদর্শ ও ধর্মসংস্কারের প্রবল প্রভাব যে কত দুরতিক্রম্য, ইহার জন্য ওষ্ঠসংলগ্ন জীবন-চরিতার্থতার সুধাপাত্রও যে হস্তস্খলিত হয়, প্রবৃত্তিপূরণের সুখের মধ্যেও যে অন্তরাত্মার অপ্রশমিত অতৃপ্তি মিশাইয়া থাকে, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, অচলার চরিত্রে তাহা উদাহৃত। সমাজের মূঢ় শাসন অতিক্রম করিয়া আবার সমাজেই ফিরিব, উহার বিকারের প্রতিষেধকরূপে উহার মধ্যে নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার করিব, সংশোধিত সমাজে যুগোপযোগী উন্নততর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিব ইহাই ছিল তাঁহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। বঙ্কিম কোন অবস্থাতেই প্রতাপ-শৈবলিনীর মিলন কামনা করিতে পারেন নাই; তিনি প্রতাপকে অবৈধ আকর্ষণের অতীত, মোহহীন স্বর্গে পাঠাইয়াছেন। শরৎচন্দ্র বর্তমান পল্লীসমাজে রমা ও রমেশের মিলন সাধন করিতে পারেন নাই, কিন্তু ভবিষ্যতের সমাজে এ মিলনে যে কোন বাধা থাকিবে না তাহা সর্বান্তঃকরণে আশা করিয়াছেন। তিনি এই তরুণ-তরুণীকে অসামাজিক প্রেমের নির্জন, আত্মকেন্দ্রিক নির্বাসনে প্রেরণ করেন নাই; যে দিন নবপ্রবুদ্ধ সমাজে তাহাদের অনুমোদিত আসন

সুদৃঢ় হইবে তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ-সন্তান মৃত্যুঞ্জয় অন্ত্যজজাতীয়া নারী বিলাসীর ভালবাসা প্রকাশ্য সমাজেই স্বীকার করিয়াছে—পলায়নে নিরাপত্তা খোঁজে নাই বা কলিকাতার অ-কৌতূহলী জনসমুদ্রে আত্মগোপন করে নাই। সমাজের ক্রূর জিঘাংসা যে মহাপ্রাণের বলির রক্তেই একদিন নির্বাপিত হইবে, এই আত্মবিসর্জনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজ যে সুস্থ আত্মচৈতন্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এ ভরসা শরৎচন্দ্র কোন দিন ত্যাগ করেন নাই। শরৎচন্দ্রের পরবর্তী যুগে ব্যক্তিজীবন হইতে সমাজ-প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। আজকাল সমাজের হয়ত একটা ভৌগোলিক পরিচয় আছে, কিন্তু উহার আত্মিক সত্তা, কতকগুলি স্বেচ্ছাকৃত খণ্ড-সংস্থায় বিভক্ত হইয়া, অনুপরমাণুতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন ব্যক্তিমানব ও তাহার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার মধ্যে, তাহার রুচি ও বিবেকবুদ্ধি ছাড়া আর কোন মধ্যবর্তী নিয়ামক সংস্থার অস্তিত্ব নাই।

(৪)

শরৎচন্দ্রের পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের সাহিত্য ও সমাজ-চেতনায় একটা যুগান্তর আনিয়াছে। এই প্রলয়ের মহাঝটিকায় বাঙালী জাতির জীবন-মহীরুহ উহার যুগযুগান্তরের সাংস্কৃতিক ভূমি হইতে উৎপাটিত হইয়া নিখিল বিশ্বের সাধারণ মৃত্তিকায় নূতন রসাশ্রয় খুঁজিতেছে। অকস্মাৎ এক নিদারুণ বিপর্যয়ে সমস্ত অতীত উহার তাৎপর্য-গৌরব হারাইয়াছে। জীবনের মূল্য ও মর্যাদা অভাবনীয়রূপে বদলাইয়া গিয়াছে। বস্তুজগতের ভূমিকম্প মনোজগতে ফাটল ধরাইয়াছে। ধর্মের সান্ত্বনা, সংস্কৃতির আশ্বাস, আদর্শ-বাদের আশ্রয়, পুরুষপরম্পরাগত জীবনচর্চার অভ্রান্ত সংস্কার ও নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞতা সব এক মুহূর্তে মায়া-মরীচিকার ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমরা যেন এক নূতন জগতের অজ্ঞাত নিয়ম-কানুনের জটিলতা-জালের মধ্যে প্রথম পথিকের বিভ্রান্তি ও বিমূঢ়তা লইয়া পথ খুঁজিয়া মরিতেছি। আমাদের পারিবারিক জীবনের চিরদিনের নিশ্চিন্ত নির্ভর আজ বিভীষিকার মুখব্যাদান করিয়াছে; মাতৃস্নেহ আর অমৃত-নির্ঝর নহে, ছদ্মবেশী কামায়নের কলুষ-প্রবাহ; দাম্পত্য প্রেম মর্মান্তিক ব্যক্তিত্ব-সংঘর্ষের রণাঙ্গন, ভূগর্ভস্থ আগ্নেয়গিরির শ্যামল তৃণাচ্ছাদন। জীবনের সমস্ত সক্রিয়তার মূলে

এক উৎকট আত্মপ্রসারের বিকৃত প্রেরণা। সমাজ-বিন্যাস আগাগোড়া ভুল; ইহার শ্রেণী-বিভাগ সাম্যনীতির বিপর্যয়; ইহার স্থায়িত্ব অবিমিশ্র অশুভের হেতু; ইহার আশু উচ্ছেদই ইহার সম্বন্ধে একমাত্র করণীয়। মানুষের সমস্ত সম্পর্কের মূলে যেমন প্রচ্ছন্ন কাম-প্রবৃত্তির সর্বব্যাপিতা, তেমনি উহার শিল্প-সাহিত্য ও সুকুমার গুণের বিকাশের মূলে আছে অর্থনীতির নিগূঢ় প্রভাব। আমাদের প্রাচীন কাব্যসাহিত্য হঠাৎ আমাদের কাণে বেসুরো বাজিয়া উঠিল, বিমুখ মনের দ্বারদেশ হইতে অভিনন্দনহীন হইয়া ফিরিয়া গেল। উহার ছন্দ ঘুম-পাড়ানি গান, উহার ললিত শব্দ-সংযোজনা বর্বরোচিত অলঙ্কারপ্রিয়তা, উহার ভাবসত্য অবাস্তব কল্পনাবিলাস, উহার আদর্শবাদ ছেলেভুলানো স্তোকবাক্যরূপে প্রতিভাত হইল। আমাদের সমস্ত চিত্ত এক বিরাট বিতৃষ্ণা ও তিক্ত নৈরাশ্য-বোধে কানায় কানায় পূর্ণ হইল। স্বাধীনতার অনুষঙ্গী সাম্প্রতিক দুর্যোগ-পরম্পরা—দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম, আশ্রয়ার্থীর দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর মিছিল, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ধনী-দরিদ্রের নিদারুণ অবস্থা-বৈষম্য, সামাজিক ক্লীবত্ব ও সংহতির অভাব—আমাদের মন হইতে পূর্বযুগের আশা ও আনন্দের উজ্জ্বল চিত্র একেবারে মুছিয়া দিল। আমরা জগৎব্যাপী কোলাহলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া, সমাজের উপর দারুণ আঘাত হানিয়া, মানবের উচ্চ সম্ভাবনায় সমস্ত আস্থা হারাইয়া আমাদের অস্তিত্বের মূল সূত্রকেই ছিন্ন করিতে লাগিয়া গেলাম। আমাদের কবিগোষ্ঠী বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে বর্ণিত হৃতসর্বস্বা, নগ্নিকা মাতার রূপহীনতা অঙ্কনে সর্বশক্তি নিয়োগ করিলেন।

আপাতত ইউরোপের বহু-বিস্তৃত, নানা বিরোধী শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জটিল পরিস্থিতি বাদ দিয়া বাঙ্‌লা দেশের স্বল্পায়তন ও সমউপাদান-গঠিত পটভূমিকার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাউক। ইউরোপের মানস প্রতিক্রিয়া দুঃখকর হইলেও সহজবোধ্য। যে জাতিসংঘ আজ প্রায় চারি শতাব্দী ধরিয়া রাষ্ট্রশাসনে, মানবিক কল্যাণবোধে, উন্নত মননের, সৃষ্টি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশে সমগ্র মানব সমাজে অগ্রণী ও আদর্শস্থানীয় ছিল, তাহাদের এই কল্পনাতীত অধোগতি, সভ্যতার পালিশের নীচে জঘন্য পাশবিকতার লুকানো বীভৎসতা সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে

এমন একটা স্তম্ভিত বিস্ময় ও বেদনার সৃষ্টি করিল যাহাতে তাহাদের চারি শত বৎসরের ইতিহাস, ক্রমোন্নতিবাদের আশ্বাস সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া গেল। কোটিপতি হঠাৎ পথের ভিখারীতে পরিণত হইলে উহার চোখে মুখে যে নিরুপায় নৈরাশ্য ফুটিয়া উঠে, ইউরোপের মানস চেতনায় তাহারই কৃষ্ণচ্ছায়া গভীর রেখায় অঙ্কিত হইল। উহাদের রাষ্ট্রনীতি হয়ত ভুলপথে চলিয়াছে, কিন্তু উহাদের শিল্প-সাহিত্যের মধ্যেও কি অমৃতের সঞ্চয় কিছু ছিল না—এই ভয়াবহ সংশয় উহাদের আত্মপ্রত্যয়কে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিল। কবির অমর সঙ্গীত, দার্শনিকের গভীর মনন, শিল্পীর সৌন্দর্যপূজা, আদর্শবাদীর আত্মদান, ধার্মিকের ভগবদনুভূতি—সবই কি অবিমিশ্র ব্যর্থতারই সাক্ষ্য বহন করিল, রাষ্ট্রনেতা ও সামাজিকের চিত্তে ইহার কি কোনও প্রভাব অবশিষ্ট রহিল না?—এই আর্ত প্রশ্ন ইউরোপের প্রতি রাজধানীতে, প্রতি সংস্কৃতি-কেন্দ্রে, প্রতিটি ধর্মমন্দিরে অসহায় প্রতিধ্বনি তুলিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তাহারা অর্জন করিয়াছে কিন্তু সঞ্চয় ও আত্মসাৎ করে নাই—এই নিদারুণ সত্যই তাহাদের মানসপটে ফুটিয়া উঠিল।

যুদ্ধোত্তর বাঙলা দেশের অবস্থা অবশ্য খানিকটা ইউরোপের অনুরূপ, কিন্তু এখানে ইউরোপের মত সার্বিক বিপর্যয় ঘটে নাই। যুদ্ধ-ধূমকেতুর জ্বলন্ত পুচ্ছ বাঙলা দেশের আকাশকে স্পর্শ করিয়া গিয়াছিল, উহার ভূমি-সংস্থানকে উৎখাত করে নাই। শূন্যে বোমার গর্জন শুনা গিয়াছিল, বিধ্বংসকারী বর্ষণ ঘটে নাই। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য প্রধানত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল; সমাজনীতিতে ও জীবনবোধে যে ফাটল দেখা গিয়াছিল তাহা অর্থনৈতিক বিপর্যয়েরই পরোক্ষ ফল। কিন্তু বাঙালীর মনে যাহা প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল, তাহা শুধু আর্থিক অভাব ও অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিদারুণ অপ্রাচুর্য নহে, এই অভাবের পিছনে চোরাকারবারী ও কালো-বাজারী বণিক-সংঘের ঐশ্বর্যলোলুপ চক্রান্ত ও রাষ্ট্রের ঔদাসীন্য ও গোপন প্রশ্রয়। বাঙালীর মানস আকাশে সচ্ছলতা-সূর্যের দীপ্তি যে নিভিয়া গেল শুধু তাহাই নহে, সেখানে মাংসাশী শকুনের পক্ষবিস্তার অন্ধকারকে আরও ঘোরালো ও প্রেতলোকের বিভীষিকাময় করিয়া তুলিল। ইহাতেই তাহার মানুষের উপর আস্থা চলিয়া গেল, প্রচলিত

সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মনীতির অন্তঃসারশূন্যতা তাহার নিকট ভয়াবহরূপে প্রকটিত হইল। এই সর্বব্যাপী শূন্যতার নিরালম্ব পরিপ্রেক্ষিতেই আধুনিক বাংলা কবি-সাহিত্যিকগোষ্ঠী নবযুগের অভিনন্দন-স্তোত্র রচনা করিলেন।

হয়ত এই অবিমিশ্র, নীরন্ধ্র নৈরাশ্যবাদের মধ্যে খানিকটা আতিশয্য, খানিকটা পাশ্চাত্যের অনুকরণ-প্রবণতা আছে। আমাদের কণ্ঠে সর্বহারার বিলাপ কতটা সঙ্গত সে সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে; আমাদের জীবনে ঘনঘটা, দুর্যোগ-বর্ষণ নামিয়া আসিলেও সূর্য যে চির-অস্তমিত হইয়াছেন এই প্রতীতি স্থির বিচারে হয়ত সমর্থিত হইবে না। অতীতের সংস্কৃতি-সঞ্চয় যে একেবারেই রিক্ত, উহা যে বর্তমান সঙ্কট-মুহূর্তে আমাদের কোন কাজে আসিবে না এরূপ ধারণাও হয়ত ভ্রান্ত। কিন্তু এই মনোভাবের মধ্যে গভীর আন্তরিকতার অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত, স্বাধীনতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে যে সীমাহীন প্রত্যাশা জাগিয়াছিল, তাহা কতকটা বাস্তবের রূঢ় সংঘাতে, কতকটা আমাদের অযোগ্য ও সময় সময় অসাধু পরিচালনা-ব্যবস্থার ত্রুটিতে যখন কুণ্ঠিত ও বিপর্যস্ত হইয়া গেল, তখন আমরা একবারে নিরাশার অন্ধতম গভীরে নিমগ্ন হইয়া গেলাম ও আমাদের চারিপাশে ঘনায়মান অন্ধকার ক্ষীণতম আলোকবিন্দুরও প্রবেশপথ রুদ্ধ করিয়া দিল। ইহার উপর পূর্ববঙ্গ হইতে আগত লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার অবর্ণনীয় দুর্গতি ও লাঞ্ছনা, তাহাদের মানবাত্মার কল্পনাতীত অপমান আমাদের বাস্তব পরিবেশকে অসহনীয় ধূম্রজ্বালায় শ্বাসরোধী করিয়া তুলিল। এই পরিপ্রেক্ষিতকে সম্মুখে রাখিয়াই আমাদিগকে আধুনিক কাব্যসাহিত্যের অভাবনীয় রূপান্তরের কথা ভাবিতে হইবে।

(৫)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিচার ও মূল্যায়ন আমার উদ্দেশ্য নহে—কেবল ইহার সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেই বলার অভিপ্রায়। ইহাতে যে নূতন অনুভূতি রূপ পাইয়াছে তাহার প্রকাশভঙ্গী ও উপস্থাপনারীতিও পূর্বতন কাব্যের তুলনায় সম্পূর্ণ অভিনব। হৃদয়ের মর্মদাহী জ্বালা, সর্বব্যাপী সংশয় ও অবিশ্বাস বৈষ্ণব কবিতার সরল, মধুর গুঞ্জনে বা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-

সারময়, কল্পনার ঐশ্বর্যে মহীয়ান ভাষণভঙ্গীতে প্রকাশ হইবার নহে—ইহার জন্য চাই ভাষার তীক্ষ্ণ খোঁচা, বক্র-কুটিল ব্যঞ্জনা, বার বার হোঁচট-খাওয়া, চমক-লাগানো অসম ছন্দ, মুহুর্মুহু ছিন্নসূত্র অর্থের আপাত-অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতা। বিশেষত, রবীন্দ্র-অনুকারী গোষ্ঠীর হাতে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যাভিসার ও ছন্দ-সুষমা যেন অর্থক্ষীণ, উদ্দেশ্য-শিথিল, সুরবিহ্বল ভঙ্গী-সর্বস্বতায় পর্যবসিত হইবার পথে চলিতেছিল। কাব্যের সুর ও বাস্তব অনুভূতির মাত্রাছন্দের মধ্যে যদি গুরুতর ব্যবধান গড়িয়া উঠে, তবে কাব্য-জীবনের সার্থক প্রতিবিম্ব হয় না। আধুনিক হৃদয়-সমস্যা বৈষ্ণব কবিতার আত্মনিবেদন এমন কি রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম আকুতির সুরে অভিব্যক্ত হইলে একটা কৃত্রিম ভাবালুতারই সৃষ্টি হয়। সেই দিক দিয়া আধুনিক কবিতার ভাবানুগ, বাহুল্য-বর্জিত, উচ্ছ্বাসহীন ভাষা কাব্যপ্রাণে নূতন রক্ত সঞ্চার করিয়াছে ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার্য। আরও দুইটি দিক দিয়া এই কবিতা পূর্বযুগের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। প্রথম, আন্তর্জাতিক পট-ভূমিকায় ইহার বিস্তার ও দ্বিতীয়, ইহার তীক্ষ্ণ ও মননশীল জীবন-জিজ্ঞাসা। ইহার এই দ্বিবিধ উৎকর্ষের দাবী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিকতা মননের প্রসার নির্দেশ করিলেও নিছক কাব্যের উৎকর্ষের নিদর্শনরূপে কতটা গ্রহণীয় তাহা বিচার্য। কাব্যে প্রগতিশীল চিন্তাই যে শ্রেষ্ঠ গুণ তাহা ঠিক যথার্থ নহে। এই চিন্তা আমাদের অন্তরের কত গভীরে প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের আবেগকে কতখানি উদ্রিক্ত করিয়াছে, সৌন্দর্যবোধের অন্যান্য উপাদানের সহিত নিবিড়ভাবে মিশ্রিত হইয়া ভাবে, ছন্দে, রূপে এক অখণ্ড সত্তায় পরিণত হইয়াছে কিনা ইহাই বিচারের প্রকৃত মানদণ্ড। জ্ঞানের প্রসার বাড়িলেই যে কাব্যানু-ভূতির গভীরতা বাড়িবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। আমাদের আন্তর্জাতিক মিলন এখনও প্রধানতঃ রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, সুতরাং মূলত প্রয়োজনাত্মক। এই মেলামেশার ফলে কিছুটা সামাজিক সৌজন্য ও শিষ্টাচারের গণ্ডী বিস্তৃত হইয়াছে ও সর্বমানবিকতার একটা বোধ সবেমাত্র জাগিয়াছে। অন্যদেশের রীতি-নীতি, সমাজ-বিন্যাস ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর সহিত পরিচিত হইয়া কিছুটা কৌতূহল ও বিস্ময়-

বোধও উদ্রিক্ত হইয়াছে। কিন্তু অনুভূতির যে গভীর স্তরে সাহিত্য-প্রেরণার উৎস, এই বৈঠক, খানা-পিনা, দেশভ্রমণ, কৌতূহল-পরিতৃপ্তি সেই স্তরে পৌঁছিতে পারিয়াছে কি? আমাদের বহু-বিজ্ঞাপিত বিশ্ব-লেখক-সম্মেলন, এশিয়া-লেখক-গোষ্ঠীর জল্‌সা, এমন কি সর্বভারতীয় সাহিত্য-সভা আমাদের সামাজিকতার সম্প্রসারণ ঘটাইতে পারে, কিন্তু নিগূঢ়-অন্তর-শায়ী সৃষ্টি-প্রেরণাকে কি সত্যই উদ্দীপ্ত করিয়াছে? আমাদের চিন্তা, মনন ও অনুভূতি কি সত্যই উহাদের চিরাভ্যস্ত রসাকর্ষণের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া আন্তর্জাতিকতার বৃহত্তর কক্ষপথে স্বচ্ছন্দ-বিচরণের শক্তি অর্জন করিয়াছে? বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্ক্রিয়াসমূহ যে পরিমাণে বিস্ময়-রোমাঞ্চ জাগাইতেছে সেই পরিমাণে কি মানস স্বীকৃতি ও অন্তরঙ্গতা লাভ করিয়াছে?

আমরা চন্দ্রলোকে রকেট পাঠাইতেছি, যাওয়ার জন্য টিকিট কাটিবার আয়োজন করিতেছি, কিন্তু সেখানকার মরমের বার্তা লইয়া কি কোন আলোক-দূত আমাদের অন্তরের নিকট আমন্ত্রণ জানাইয়াছে, চন্দ্রলোকের চন্দ্রালোক কি আমাদের মনের শূন্য গহ্বরে উহার স্নিগ্ধ স্পর্শ পাঠাইয়াছে? সৌরমণ্ডলের শেষ প্রান্তে যাইতে পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়াছি, কিন্তু যাত্রার উপকরণস্বরূপ চিড়া-মুড়ি সঞ্চিত হইয়াছে কি, না সেই সুদূর সৃষ্টি-সীমান্ত হইতে কেবল ভাব-বিলাসের বায়ু ভক্ষণ করিয়াই ফিরিতে হইবে? কাজেই আমাদের জ্ঞান ও বৈষয়িক সম্পর্কের সীমা-প্রসারণে আপাততঃ কবি-সাহিত্যিকের উল্লসিত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। হয়ত কিছু-সংখ্যক দূরগামী পথিকের যাতায়াতে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের একটা পথের চিহ্ন পড়িয়াছে মাত্র; কিন্তু যে বহুপদচিহ্নাঙ্কিত, বহু তীর্থ-যাত্রীর আনন্দ-বেদনার স্মৃতি-সুরভিত রাজপথের উপর দিয়া সাহিত্যের বিজয়-রথ অগ্রসর হইয়া যায়, তাহার নির্মাণে এখনও অনেক দেরী আছে।

আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের জীবন-জিজ্ঞাসা একটা প্রধান সুর ও বিশিষ্ট গৌরব—এই দাবীও শোনা যায়। জীবন-জিজ্ঞাসা কথাটি ম্যাথিউ আর্নল্‌ডের 'criticism of life'-এর বাংলা প্রতিশব্দ। কিন্তু ম্যাথিউ আর্নল্‌ড কাব্যে জীবন-সমালোচনার সঙ্গে আর একটি অতি প্রয়োজনীয় সর্ত জুড়িয়া দিয়াছিলেন—তাহা হইল কাব্যে সুপ্রতিষ্ঠিত সৌন্দর্য-রীতির সহিত ইহার সামঞ্জস্য-সাধন। কবির জীবন-বীক্ষণ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক,

সমাজতাত্ত্বিক, ঔপন্যাসিক প্রভৃতির সহিত বিভিন্ন এই জন্য যে ইহাতে সৌন্দর্যের দাবি আগে মিটাইতে হইবে। বাস্তবিক কাব্যে সমালোচনাটা গৌণ; সমালোচনার সূত্র ধরিয়া একটি সৌন্দর্যময় অনুভূতি, একটা সুষমাময় পরিবেশ, একটা ছন্দোময় জীবন-চর্যাকে রূপ দেওয়াই কবির প্রধান কাজ। কবি যদি জীবন-জিজ্ঞাসার কণ্টকবৃক্ষে সৌন্দর্যের ফুল ফুটাইতে পারেন তবেই তাঁহার কাঁটাবনে পদক্ষেপ সার্থক। আমরা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা চাহি না, চাহি উত্তর বা উত্তরের আভাস; জিজ্ঞাসার আবেগজাত ধ্যানদৃষ্টির উন্মোচন, অনাগতের অঙ্কুর-উন্মেষ। নেতিবাচক নৈরাশ্য-কূপে নিমজ্জনই যদি কবির ধর্ম হয়, তবে কবির সঙ্গে গদ্যলেখকের পার্থক্য কোথায়? এই নৈরাশ্যের অন্ধকূপ হইতে আশার আলো, পুনর্গঠনের ইঙ্গিত, ছন্দভ্রষ্ট, কেন্দ্রচ্যুত জীবনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নবজীবনের সূচনা—ইহাই আমরা কবির নিকট প্রত্যাশা করি। পলায়নী-মনোবৃত্তি নহে, আকাশ-কুসুম-চয়ন নহে, মহামায়ার ত্রিশূল-ভিন্ন অসুর-বক্ষের রক্তধারার ন্যায় প্রজ্ঞাদৃষ্টি দ্বারা পুঞ্জীভূত অশুভরাশির মর্মভেদ ও ক্লেদ-নিঃসারণ। কবি যদি মহত্তর ভবিষ্যতের স্বপ্ন না দেখিবেন ও সেই দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত স্বর্গরাজ্যের জন্য মানবমনে তীব্র আকূতি না জাগাইবেন তবে মানুষ চিরতরে স্বর্গচ্যুত হইবে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলীর কাব্যে ফরাসী বিপ্লবের রক্তবৃষ্টি মানব-এষণার সুধা-বর্ষণে পরিণত হইয়াছিল; বর্তমানের কালো ছায়ার মধ্যে জ্যোতিরুৎসবের পূর্বাভাস ও প্রতিশ্রুতি কি কোন ভবিষ্যৎ কবির ধ্যান-দৃষ্টির নিকট উদ্ভাসিত হইবে না?

(৬)

এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে আজ আমরা বিশ্বসভ্যতার এক চরম সঙ্কট-মুহূর্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি; ইতিহাস এক বিরাট প্রশ্ন-চিহ্ন লইয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। বিশ্বমানবের সমস্ত সভ্যতার অহঙ্কার ও সংস্কৃতির গৌরব আজ এক সর্বগ্রাসী ধ্বংসগহ্বরের প্রান্তদেশে পৌছিয়া প্রাণপণ শক্তিতে হেলিয়া নিজ আসন্ন পতনকে নিরোধ করিতেছে। মানব-মনীষার শ্রেষ্ঠতম কীর্তি আজ হিংসা-দ্বেষে অন্ধ, পাশবিকতায় বিমূঢ় মানুষের অন্তরলোকে প্রবেশের পথ পাইতেছে না, সংস্কৃতির সঞ্জীবনী সুধা বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তাহার

ওষ্ঠাধর অতিক্রম করিয়া রসনা পর্যন্ত পৌছিতেছে না। রাজনীতি অর্থনীতির সমস্ত ব্যবস্থাপত্র উল্টা ফল প্রসব করিতেছে। নিরাপত্তার সন্ধান বিপদ বাড়াইতেছে; শান্তির অন্বেষণ অশান্তির পথ প্রশস্ত করিতেছে; বাণিজ্যনীতির পিছন দ্বার দিয়া যুদ্ধের প্রেতমূর্তি উঁকি মারিতেছে। সাধারণ মানুষ অসহায়ভাবে এই প্রলয়ের মেঘাড়ম্বর দেখিতেছে; ধর্ম নীরবতার গুহাতলে নিজ লজ্জা-ক্লিন্ন মুখ লুকাইয়াছে। সর্বাপেক্ষা অশুভ লক্ষণ এই যে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য নিদাঘক্লিষ্ট বৃক্ষপত্রের ন্যায় এক ম্লান, বিবর্ণ ছায়ারূপে উহার বর্ণোচ্ছলতা ও প্রাণপ্রাচুর্যকে সংহরণ করিয়াছে। সভ্য জগতের কোথায়ও প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্ট হইতেছে না—ভাবিলে ইহার ভয়াবহ তাৎপর্যটি আমাদের নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যে কবি-সাহিত্যিক কিছুদিন পূর্বেও জীবন-নিয়ামক ছিলেন, তাঁহার আজ মানব-চিত্ত-নিয়ন্ত্রণে কোন বিশেষ সক্রিয় অংশ নাই; তিনি আজ রাস্তার কোণে, চৌরাস্তার মোড়ে ফিরিওয়ালার ন্যায় নিজের কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহার উৎকর্ষ বিজ্ঞাপন করেন। কখনও বা রাজনীতিকের ভাব-ভঙ্গীর অনুকরণে, বক্তৃতার চড়া সুরে, ব্যঙ্গ-রসিকের অতিরঞ্জিত অঙ্গসঞ্চালনে তিনি মানব-চিত্ত-আকর্ষণে ব্যর্থ-করুণ চেষ্টা করিতেছেন। মানুষের হৃদয়বৃত্তি স্ফুরিত করিবার, তাহার সুকুমার অনুভূতি জাগাইবার, তাহার মধ্যে সুস্থ ও সুন্দর জীবন-বোধ উদ্বুদ্ধ করিবার, পরিচিত পরিবেশ ও অজ্ঞাত রহস্যের সহিত তাহার সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার যে প্রধান উপায় ছিল, তাহার ব্যর্থতা আজ ফলের দ্বারাই প্রমাণিত। কবির মর্যাদা-লোপই কি তাঁহার শক্তি-হ্রাসের কারণ? তাঁহার আত্মপ্রত্যয়ের অভাবই হয়ত তাঁহার কল্পনা-লীলার স্বচ্ছন্দতায় বাধা দিতেছে। কিন্তু কবিতার মধুর রস জনসমাজের চিত্তে সঞ্চারিত করিতে না পারিলে মানব-জাতির অপমৃত্যু-প্রতিরোধ দুঃসাধ্য হইবে।

এই মর্মান্তিক সত্যটাই আজ এই সম্মেলনের সভামণ্ডপে আপনাদিগকে বিশেষ করিয়া ভাবিবার জন্য আবেদন জানাইতেছি; [সুকুমার শিল্প-সাহিত্যের সত্যিকার কাজ হইল সুস্থ জীবনচর্যায় দীক্ষিত করা—যাহাকে বলে art of right living তাহাই শেখানো।] কাব্যের এই পরম ফলশ্রুতি। তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে ইহা নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কাব্য নিজ একক শক্তিতে মনুষ্যচিত্তের এই বিশুদ্ধীকরণ, মানব-জীবনের এই সুষ্ঠু

ও শোভন প্রয়োগ-কলা-সাধনে অসমর্থ। শেকস্‌পিয়র মিল্‌টনের জাতি পরস্বাপহরণে উন্মুখ, গ্যেটের জাতি মারণাস্ত্র-প্রয়োগে তৎপর, রুশো-ভলটেয়ার-হিউগোর জাতি ঔপনিবেশিক শোষণে কুণ্ঠাহীন। কাব্য-রসাস্বাদনের সহিত জীবন-সাধনার, উচ্চ তত্ত্বচিন্তার সহিত ব্যবহারিক প্রয়োগ মিলাইতে না পারিলে কাব্যের রসার্দ্রতা মরুভূমিতে বারিবিন্দুবৎ শুকাইয়া যাইবে। বাস্তব অভাবের সূর্যতাপ যত প্রখর, মাথার উপর স্নিগ্ধ আচ্ছাদনের যত অভাব এই বিশোষণ-প্রক্রিয়া ততই দ্রুততর হইবে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ কবিতা ও সাহিত্য সৃষ্টির যত প্রয়োজন, জনগণের মধ্যে উহার গ্রহণশীলতা, উহার প্রতি অনুকূল মনোভাব-বৃদ্ধিরও ঠিক ততটাই প্রয়োজন। কাব্য-মেঘের অকৃপণ দাক্ষিণ্যকে রসিক চিত্তের গভীর জলাশয়ে ধরিয়া রাখিতে না পারিলে উহাতে মনোকর্ষণের বিশেষ সুবিধা হইবে না। এই চিত্ত-প্রস্তুতির অভাবের জন্যই রবীন্দ্র-প্রতিভা আমাদের সামাজিক জীবনবোধকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অতি-আধুনিক কাব্যের দুর্বোধ্যতা যেমন উহাকে সম্প্রদায়-সীমাবদ্ধ করিয়াছে, তেমনি উহার নৈরাশ্যবাদও ইহাকে সাধারণের রসস্বীকৃতি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। তথা-কথিত বিদগ্ধ রুচির দোহাই দিয়া কবিতাকে সর্বজন-আস্বাদ্যতা হইতে দূরে রাখিলে উহার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ইহা হইবে ঘিঞ্জি সহরের মধ্যে সাধারণ পার্কের মত—ধূমধূলিরুদ্ধ শ্বাসযন্ত্রে নূতন সতেজ হাওয়া-সঞ্চারের পথ। রামায়ণ-মহাভারত, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর যুগে আজ হয়ত ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তাহার বিকল্প ব্যবস্থা না করিলেও নয়। সেকালে সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম তত্ত্বসমূহ সর্বসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য যে ব্যাপক ব্যাখ্যা ও প্রচারের আয়োজন হইয়াছিল, একালেও আধুনিক কবিতার ভাববস্তু ও রস-আবেদন কি সেই ভাবে প্রাকৃত জনের গোচরীভূত করা যায় না?

যাহাহউক, অতীতে ফেরা যদি বা অসম্ভব হয়, উহার তুলনা-মূলক পর্যালোচনায় ত কোন আপত্তি নাই। যখন দেখি যে, ধর্মসহচর সাহিত্য জীবন-চর্চার অঙ্গীভূত হইয়া অত্যাজ্য সহজ সংস্কারের উদ্দীপন করিয়াছে, তখন অনুভব করি যে, উহা জীবন-সার্থকতার সহায়ক হইয়াছে। ধর্মসাধনার দৃঢ় পাত্রে কাব্যরস বিধৃত হইয়া দেহে-মনে সর্বসঞ্চারী হইয়াছে, ইহা প্রাণের নিগূঢ় উৎসমুখে গিয়া পৌছিয়াছে। তখন কাব্যরসিক ও ভক্তসাধকের মধ্যে

কোন কৃত্রিম ব্যবধান ছিল না ; সৌন্দর্যানুভূতি অধ্যাত্মবোধের মূর্ত প্রকাশ-রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। আজ যখন দেখি আয়ু-সীমান্তে উপনীত বৃদ্ধ অস্তগামী সূর্যের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া সান্ত্বনাহীন চিত্তে শেষ দিনটির প্রতীক্ষা করিতেছে, তখন একশত বর্ষ পূর্বেকার যে মৃত্যুপথযাত্রী স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয়ে বলীয়ান হইয়া মরণকে স্পর্ধিত আমন্ত্রণ জানাইয়াছে ও অন্তিম মুহূর্তে কালী-নাম-স্মরণের সহিত গঙ্গাজলে দেহ-বিসর্জনের কল্পনা করিয়াছে, তাহার কাব্যপাঠ যে তাহার জীবনায়নের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংযুক্ত হইয়াছে অন্ততঃ এটুকু অনুভব করি। তখন পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যে আকণ্ঠপীত তরুণ-তরুণীকে উদ্দেশ্যহীন, আদর্শহীন জীবন অসার আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করিতে দেখি, যখন তাহাদের অসংযম ও শৃঙ্খলাবোধ ও শ্রদ্ধার অভাব সমাজে ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দারুণ নীতিবিপর্যয় ঘটায়, তখন এই চিন্তা অনিবার্যভাবে মনে জাগে যে, কাব্যরস ও উচ্চতম চিন্তা উহাদের অন্তরকে বিন্দুমাত্র সরস করিতে পারিল না কেন ? তখন যাঁহারা বিদ্যামন্দিরে শান্ত আশ্রমের আবহ সৃষ্টি করিতেন, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানকে কর্মসাধনার দ্বারা দৃঢ়ীভূত করিতেন, যাঁহারা গুরুগৃহবাসকে গার্হস্থ্যাশ্রমের ভূমিকারূপে পরিকল্পনা করিতেন, যাঁহারা সংসারের শত-প্রলোভন ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে তরুণ শিক্ষার্থীকে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সর্বভূতহিতের মহাব্রতে অটল রাখিতেন, তাঁহাদের পাঠক্রম যতই সঙ্কীর্ণ ও একপেশে হউক না কেন তাহারা যে সুষ্ঠু জীবনচর্যার রহস্য আয়ত্ত করিয়াছিলেন এ কথা কে অস্বীকার করিবে ? যখন আমাদের শিশুকুল উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্বে মাথা বোঝাই করিয়া সর্ববিদ্যা-বিশারদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে, তখন তাহাদের শিশুসুলভ আনন্দ, শৈশব কল্পনার মাধুর্য, সরল মনের স্বতঃস্ফূর্ত সেবাপ্রবৃত্তি, ভক্তিপ্রবণতা যে কোথায় কেমন করিয়া উপিয়া যায় তাহা কি কি আমরা লক্ষ্য করি ও এই অমূল্য মানবিক সম্ভাবনার অপচয়ের কোন প্রতিরোধ-ব্যবস্থার কথা ভাবি ? যখন আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের শান্ত প্রসন্ন মুখশ্রীর উপর একটা গূঢ় অতৃপ্তির ছায়াপাত লক্ষ্য করি, যখন বুঝি যে, তাহাদের সমস্ত প্রসাধন-সজ্জা ও চটুল আমোদপ্রিয়তা তাহাদের নির্বাপিত আন্তর দীপ্তির মলিনতাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, তখন অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারই যে শূন্য হইয়া আসিল, জীবন-সরোবরের প্রস্ফুটিত পদ্ম যে শুকাইয়া গেল এই মর্মান্তিক প্রতীতিই কি

মনে সুদৃঢ় হয় না? এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমাদের সমাজ-উন্নয়ন ও মানস প্রকর্ষসাধনের সর্ববিধ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। বাঙালীর কাব্য-প্রীতি তাহার যুগযুগান্ত হইতে আগত, অত্যাজ্য মানস সংস্কার—সে অশেষ দুর্গতির মধ্যেও কাব্যচর্চা ভোলে নাই। সে ভগবানকে ভুলিয়াছে, নিজ অতীত সংস্কৃতি ও সাধনাকে ভুলিতে বসিয়াছে, কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে এক সরস্বতীরই কিছুটা মান রাখিয়াছে; ইহাই তাহার মানস মুক্তি, তাহার প্রবৃত্তি-উর্ধ্বায়নের একমাত্র খোলা পথ। এই পথ বাহিয়াই তাহার মস্তকে দিব্যের আশীর্বাদ বর্ষিত হইবে ইহাই একমাত্র আশা। এক রুচিবান, অনুশীলিত, আদর্শে দৃঢ় সমাজ গড়িয়া উঠুক এবং এই সমাজই আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মনন ও উন্নততম কাব্যানুভূতিকে বাস্তব জীবনচর্যার মাধ্যমে জীয়াইয়া রাখুক। ধর্মের পরিত্যক্ত সিংহাসন সাহিত্যের দ্বারা অধিকৃত হউক, জাতির ভাগ্যনিয়ন্তার প্রতি এই প্রার্থনা জানাইয়া এবং এই প্রার্থনা পূরণের জন্য বাংলার বিদগ্ধ মনীষী-সমাজের আনুকূল্য ও সহযোগিতার সবিনয় আবেদন জানাইয়া এবং আপনাদের ধৈর্যের প্রতি অত্যাচারের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিয়া আমার এই দীন ভাষণের উপসংহার করিলাম।

ছোটগল্প

(১)

ছোটগল্প ঘটনা-শুক্তিতে নিহিত একটি ক্ষুদ্র, নিটোল মুক্তা, ছোট ঝিনুকে পরিবেশিত এক বিন্দু জীবন-রসনির্যাস, ললাটলিপিতে উৎকীর্ণ একবাক্যাত্মক একটি গাঢ়বদ্ধ জীবনানুশাসন। মানুষের জীবনে কত এলোমেলো, বহু-বিস্তৃত, অসংবদ্ধ অভিজ্ঞতার সমাবেশ। ঔপন্যাসিক সেই ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল উপাদানরাশিকে তাৎপর্য-সূত্রে গাঁথিয়া এক বৃহৎ পরিণতির দিকে লইয়া যান। ছোটগল্প-রচয়িতা সেগুলিকে নিজ ক্ষুদ্র অঞ্জলিতে তুলিয়া লইয়া উহার দ্বারা অঙ্গুলি-পরিমিত বেদীতে জীবনদেবতার অর্ঘ্য রচনা করেন। ছোটগল্পে জীবন-

অভিজ্ঞতার যেটুকু তুলিয়া লওয়া হয় আর যে বৃহৎ অংশ ফেলিয়া রাখা হয় উভয়ে উভয়ের পরিপূরকরূপে প্রতিভাত হয়। যাহা চোখের বাহিরে থাকিল তাহা ব্যঞ্জনার রঞ্জনরশ্মিতে বোধশক্তির বিষয়ীভূত হয়। একটি ক্ষুদ্র আখ্যানখণ্ডে সমগ্র জীবন-তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত করাই ইহার উদ্দেশ্য ও শিল্পরূপের প্রেরণা। এ যেন কথাশিল্পের কারুকার্য-খচিত একটি ছোট পাত্রে সমগ্র জীবন-প্রবাহের গতিবেগ ও সমুদ্রাভিসারের ইঙ্গিতটুকু ধরিয়া রাখা; বৃহদাকার ঘটনা-ইক্ষুদণ্ডের অন্তর্নিহিত সুমিষ্ট রসসারটুকুকে নিষ্কাশন করিয়া বস্তুভার-অসহিষ্ণু অথচ রসপিপাসু ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া ধরা। ছোটর মধ্যে যে বড়র বীজ প্রচ্ছন্ন, সমগ্র জীবনের অভিপ্রায় যে দুই একটি ঘটনার রেখাবেষ্টনীর মধ্যে সংহত থাকে, অনেক জল জমিয়া যে এক টুকরা স্ফটিকস্বচ্ছ বরফ আমাদের পিপাসা-তৃপ্তি ঘটায়—এই নিগূঢ় জীবন-সত্যটি ছোটগল্পে বিধৃত।)

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রথম সার্থক প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ একাধারে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি ও ছোটগল্প-রচয়িতা ছিলেন। এই অসাধারণ ও সৌভাগ্যসূচক গুণসমবায় আমাদের ছোটগল্পের রূপকল্প ও শিল্পরীতি—নির্ধারণে অনেকটা সহায়তা করিয়াছে। অন্য দেশের সহিত তুলনায় বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প যে বেশী কাব্যধর্মী ও ব্যঞ্জনাগর্ভ ইহা অনেকটা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কল্পনাদৃষ্টির প্রভাব-প্রসূত। তিনি ছোটগল্পের ঘটনা-খোলসে গীতকবিতার রসব্যঞ্জনাপূর্ণ শাঁস পুরিয়া ইহাকে একটি বিশিষ্ট স্বাদ ও আবেদনধর্ম দান করিয়াছেন। ছোটগল্প অনেকটা গীতি-কবিতার সুরসমন্বিত ও উহার গদ্য প্রতিরূপবেশেই আমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছে। মনস্তত্ত্ব যেটুকু আছে তাহা উগ্রভাবে প্রকট না হইয়া রসসরোবরে প্রস্ফুটিত শতদলের অবলম্বন, জলতলে অদৃশ্য মৃণালরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ঔৎসুক্য প্রধানতঃ চরিত্র-সৃষ্টিতে ও জীবনপর্যবেক্ষণে নহে, জীবনের মধুর, কাব্যময় পরিবেশে চারিত্রিক লীলার স্ফূর্তি ও বিকাশে। তত্ত্বের দ্রবীভূত রস ও সৌন্দর্যরূপেই তাঁহার প্রধান আকর্ষণ। অনেক সময় গল্পের ছোট খাপে সাঙ্কেতিকতার তরবারি-দীপ্তি ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। 'সমাপ্তি', 'মধ্যবর্তিনী', 'দৃষ্টিদান', প্রভৃতি গল্প যেন এক একটি গীতি-কবিতার রেশে অণুরণিত, জীবনসত্যের এক একটি লীলারহস্য যেন ঘটনার পত্রাবরণে পদ্মের ন্যায় বিকশিত। (বাঙালীজীবনের ছোটখাট আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব,

আনন্দ-বেদনার মৃদু সঞ্চরণ, মধুর স্বপ্নকল্পনা ও সুকোমল বাস্তব স্পর্শ, অন্তরের সুকুমার কাব্যনির্যাস যেন এই গল্পগুলিতে কখনও কৌতুকস্নিগ্ধ কখনও অশ্রু-করুণ পরিণতিতে কান্ত অঙ্গসৌষ্ঠব লাভ করিয়াছে।)

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ছোটগল্পগুলিতে কবিদৃষ্টির পরিবর্তে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-দৃষ্টিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সমাজ-সমস্যা, আদর্শবৈষম্যমূলক মতবাদ, অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সহিত পারিপার্শ্বিকের অসামঞ্জস্য ও সংঘর্ষ যুদ্ধোদ্যত সঙ্গিনের ন্যায় মাথা উঁচাইয়া দাঁড়াইয়াছে ও তাঁহার পূর্ববর্তী পর্যায়ের ছোটগল্পের ভাব-সুষমা ও আঙ্গিক-পারিপাট্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। সমস্যা-কণ্টকিত, বাদ-প্রতিবাদে উষ্ণ, সংগ্রামী আবহাওয়ায় ঝটিকাসংক্ষুব্ধ পটভূমিকায় সন্নিবিষ্ট এই ছোটগল্পগুলি যুগচিত্তের উত্তেজিত অসঙ্গতিবোধের যথাযোগ্য প্রকাশ। এখানে সৌন্দর্যতন্ময়তার পরিবর্তে আছে আঘাত-তৎপরতা, ভাবাদর্শের পরিবর্তে আছে উগ্র বাস্তবচেতনা, আত্মার গভীরে অনুপ্রবেশের পরিবর্তে আছে উপরিভাগের রেখাবৈচিত্র্যের মধ্যে বিচরণ-কুশলতা। ছোটগল্প যে কাব্যপরিবেশভ্রষ্ট হইয়া ক্রমশ জটিল বস্তুসংস্থান ও তীক্ষ্ণ সমস্যাসঙ্কুলতার দিকে ঝুঁকিতেছে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের গল্পগুলি তাহারই নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমকালীন আর একজন ছোটগল্প-লেখক—প্রভাতকুমার—ইহার অপর একটি রূপ বিকশিত করিয়াছেন। উনবিংশ শতকের শেষ দশক ও বিংশের প্রারম্ভে বাঙালী জীবনের প্রসন্ন-নির্মল প্রবাহ, উহার সমস্যামুক্ত, আনন্দময় ছন্দ ও কৌতুকসিক্ত হাস্যরসের লীলাচপল গতিভঙ্গী তাঁহার গল্পে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তাঁহার গল্পের উৎকর্ষ উহার হৃদয়-বিশ্লেষণের গভীরতায় নহে, উহার সুষ্ঠু আঙ্গিক-গঠনে ও বিন্যাসরীতিতে। আমাদের মেয়েদের দ্রুতহস্তে ও লঘু রং ও রেখায় আলপনা আঁকার সহজ পটুত্বের ন্যায় প্রভাতকুমারের ছোটগল্পে ঘটনাবৈচিত্র্যপ্রসূত জীবনের হালকা বিচিত্র রস ফুটাইয়া তোলার একপ্রকার অনায়াসলব্ধ পারদর্শিতা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্যের জীবনের হাস্যপরিহাসমুখর, খেয়ালবিলাসী, লঘু-চঞ্চল সুরছন্দটির অবিকল প্রতিধ্বনি প্রভাতকুমারের গল্পে শোনা যায়। তখন বাঙালীর বাস্তব জীবনে প্রথম প্রণয়াবেশমুগ্ধতা, কল্পনাবিলাসের প্রথম উচ্ছ্বাস, প্রাণোচ্ছলতার প্রথম বীচিবিক্ষেপ, খেয়ালখুশীমত চলিবার

প্রথম স্বাধীনতা, রীতিনির্ধারিত গণ্ডী-অতিক্রমের প্রথম দুঃসাহস, জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদনের প্রথম মাদকতা। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের যে বেদনাময়, আশাভঙ্গে বিস্বাদ অভিজ্ঞতা, তাহা তখনও বাঙালীর সাধারণ জীবনে পৌছায় নাই। সেখানে বিপদ সহজেই কাটে, অদৃষ্টের বিড়ম্বনা হাস্যকৌতুকে অবসিত হয়, প্রেমের বাধা মিলনকে মধুরতর করে, এমন কি বিয়োগান্ত, করুণ পরিণতিও হৃদয়বিদারক যন্ত্রণায় দগ্ধ না করিয়া স্নিগ্ধ অশ্রুজলে অভিষিক্ত করে। প্রভাতকুমারের গল্প বাঙালী জীবনের কৈশোর সরলতা ও আনন্দের একটি উজ্জ্বল চিত্র, সে যুগের ভারমুক্ত জীবন-যাত্রার একটি স্বচ্ছ দর্পণ। সে জীবন আর ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু এই গল্পগুলি উহাদের সুরসঙ্গতি ও সুবলয়িত গঠনসুষমার জন্য উহার স্মৃতিকে চিরকাল উজ্জ্বল রাখিবে।

ব্যক্তি ও সমাজ-চেতনার মধ্যে যে ক্ষণস্থায়ী সৌহার্দ্যমিলন প্রভাতকুমারের ছোটগল্পে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে তাহা পরবর্তী যুগে বিপর্যস্ত হইল। এই বিরোধের সূচনা রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের গল্পে দেখা গিয়াছে। শরৎচন্দ্র আরও তীক্ষ্ণ ও ব্যাপকভাবে সমাজ-সচেতন ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প তাঁহার গৌণ রচনা। তাঁহার অনেকগুলি ছোটগল্পকে সংক্ষিপ্ত উপন্যাস বলাই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। কেন না সে সমস্ত রচনা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও প্রকৃতিতে ছোটগল্পের এককেন্দ্রিকতার অনুবর্তন করে নাই। ঘটনার বাহুল্যে ও মানবিক দ্বন্দ্বের বহু-বিস্তৃত প্রসারে ইহারা অনেকটা উপন্যাসধর্মী। যে কয়েকটি বিশুদ্ধ ছোটগল্প তিনি লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রধানতঃ পারিবারিক জীবনের স্বার্থ ও স্নেহসংঘাতধারাই স্বল্প পরিসরে একটি দ্রুত অথচ প্রত্যাশিত পরিণতিতে পৌছিয়াছে। ছোটগল্পের আঙ্গিক ও বিষয়-বিন্যাসে শরৎচন্দ্র খুব বেশী সচেতন ছিলেন বলিয়া মনে হয় না—উপন্যাস-রীতির প্রয়োগই তাঁহার উভয়বিধ রচনাতেই পরিস্ফুট।

(২)

শরৎচন্দ্রের পর যে যুদ্ধোত্তর সমাজ-বিপ্লব ও নীতিবিপর্যয় ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে, তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতম প্রকাশ ঘটিয়াছে ছোটগল্পে ও তাহার পর গীতি-কবিতায়। গীতি-কবিতার শিল্পসার্থকতা সম্বন্ধে

সন্দেহের অবসর আছে, কিন্তু ছোটগল্প তাহার বিষয়বস্তুর গ্লানিকরতা ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর নির্মম বস্তুতন্ত্রতা সত্ত্বেও যে শিল্পরসোত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। যাহা পূর্বযুগে কাব্যসৌন্দর্যে রমণীয় ছিল ও লঘু ভাবোচ্ছ্বাসে মনকে খুশি রাখিত ও অবসরকে উপভোগ্য করিত, তাহা এখন সমগ্র জীবনযাত্রার দুর্বহ চাপে, গ্লানিকর অভিজ্ঞতার ও নিরানন্দ মনোভাবের প্রচণ্ড পীড়নে ভারী ও শ্বাসরোধকারী হইয়া উঠিয়াছে। ভাঙ্গিয়া-পড়া জীবন-ব্যবস্থার প্রতিটি ধূলিকণা, বিপর্যস্ত সমাজবোধের পুঞ্জীভূত আবর্জনা, উদ্‌ভ্রান্ত, উদ্দেশ্যহীন চিত্তের অস্থির, অস্বস্তিকর আত্মরতি, দৃশ্যতঃ সুস্থ মানবজীবনে দুর্নিরীক্ষ্য ব্যাধি-বীজাণুর আনাগোনা— এই সবই পরিণত কলাকুশলতার সহিত ও মূল উদ্দেশ্যের অস্খলিত অনুসরণে ছোটগল্পের ক্ষুদ্র দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কার, অর্থনৈতিক শোষণের সূক্ষ্মতম প্রক্রিয়া, সমাজ ও ব্যক্তিমনে সবচেয়ে ঘুণধরা অবক্ষয়ের পচনশীলতা, উন্নততম আদর্শ-বাদের মধ্যে নিম্নতম দুষ্প্রবৃত্তির গোপন সঞ্চার ছোটগল্পের স্বল্পসংখ্যক পাত্র কয়টিতে এক বিভীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি করিতেছে। অতি-আধুনিক ছোটগল্পে জীবনের যে রূপ উদ্‌ঘাটিত হইতেছে তাহা সত্য হইলেও বীভৎস ও ন্যক্কারজনক; আর যদি সত্য না হয়, তবে ইহা জীবনের সবটুকু মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া জীবনধারণের উদ্দেশ্যেরই মূলোচ্ছেদ করিতেছে। ইহার শিল্পকুশলতা ইহার বীভৎসতাকে আরও অসহনীয় করিয়া তুলিতেছে। বিষপাত্রের উপর অপরূপ কারুকার্যের ন্যায় ইহার বাহিরের রূপ ইহার অন্তরের বিকৃতিকে যেন আরও অতিরঞ্জিত করিতেছে। সংসারের পবিত্রতম সম্পর্ক দাম্পত্য প্রেম—উহার সুস্থ, স্বাভাবিক শ্রী হারাইয়া ফেলিয়াছে; পূর্বপ্রেমের তিক্তস্মৃতি, পূর্ব আকর্ষণের চলচ্চিত্ততা উহার স্বভাবমাধুর্যকে পলে পলে বিস্বাদ, উহার বন্ধনদৃঢ়তাকে মুহূর্তে মুহূর্তে ক্ষয় করিয়া আনিতেছে। আধুনিক ছোটগল্পের সাক্ষ্যে আস্থা স্থাপন করিলে এই সিদ্ধান্তেই পৌছিতে হয় যে, আমাদের জীবনের আর কোনও স্থির আশ্রয়ভূমি নাই। প্রতি মুহূর্তে বিপরীত প্রবৃত্তির ধাক্কা সামলাইতে সামলাইতে, পায়ের তলার মাটির ভূমিকম্প-বিপর্যয়ে ইতস্ততঃ তাড়িত হইতে হইতে কোন নির্ভরযোগ্য আদর্শের অবলম্বন ব্যতিরেকে আমরা

মাতালের ন্যায় অস্থির চরণে এক অনির্দিষ্ট জীবনসীমার দিকে অগ্রসর হইতেছি। শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প এখন একটা নেতিবাচক, ধ্বংসাত্মক জীবনবেদের ভাষ্যরূপে শুধু আমাদের রসগ্রাহিতার উপর দাবী জানাইতেছে না, আমাদের সামগ্রিক জীবননিয়ন্ত্রণেরও অধিকার ঘোষণা করিতেছে। সাহিত্যের লঘুতর বিভাগ হইতে ইহা এখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যবিশিষ্ট বিভাগে উন্নীত হইতে চলিয়াছে।

অবশ্য আধুনিক গল্পের সমগ্র ধারা সম্বন্ধে এই চিত্র হয়ত প্রযোজ্য নহে। ছোটগল্পের সব ধারাই যে একই প্রণালীতে প্রবাহিত বা একই উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত তাহা বলা ঠিক হইবে না। ছোটগল্পের বিষয়ানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করিলে দেখা যাইবে যে কেহ কেহ—যথা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্রভৃতি—পূর্ব ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করেন নাই। বিভূতিভূষণ অতীত যুগের পল্লীজীবনের সরলতা, ধর্মবিশ্বাস ও অলৌকিক সংস্কারের মনস্তাত্ত্বিক-জটিলতাহীন ছবি আঁকিয়াছেন; মনোজ বসু অনেকটা তাঁহারই সহধর্মী, তবে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের দিকে তাঁহার ঝোঁক বেশী। তারাশঙ্কর পল্লীজীবনের জমিদারশ্রেণীর প্রাণদুর্মদ স্বেচ্ছাচারিতা ও উহার প্রত্যন্তবাসী—বেদে, রাজমিস্ত্রী, সাঁওতাল প্রভৃতি—মানবগোষ্ঠীর পরিচয় দিয়াছেন। একদল হাস্যরসিক লেখক—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, প্রমথ বিশী প্রভৃতি—জীবনের খুব গভীরে প্রবেশ না করিয়া উহার বহিরঙ্গ ঘটনা ও আচরণের মধ্যে যে বিচিত্র অসঙ্গতি লক্ষিত হয় বা মানুষের যে উদ্ভট উৎকেন্দ্রিক খেয়াল বাঁকা পথে উঁকি মারে তাহাদিগকেই হাস্যরসসৃষ্টির উপাদানরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। সুবোধ ঘোষ অনেকটা শ্রেণীনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। তিনি ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের অনেক অভিনব অপরিজ্ঞাত দিককে ছোটগল্পের বিষয়ীভূত করিয়া উহার বৈচিত্র্য ও প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার বিষয়-বিন্যাস ধারাবাহিকতার পরিবর্তে সাঙ্কেতিক রীতির অনুসরণ করিয়াছে। ঘটনাবিবৃতির ফাঁকগুলি তিনি ইঙ্গিতময়তার সার্থক প্রয়োগে একাধারে তথ্যানুগ ও কল্পনাভাস্বর করিয়া তুলিয়াছেন। গল্পের বস্তুনির্ভরতা অনেক স্থলে রূপকদ্যুতিদীপ্ত হইয়াছে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোট গল্পের অন্তঃপ্রকৃতির রূপান্তর-সাধনে সবচেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করিয়াছেন। মাণিকের বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধিৎসা ও মার্কসবাদ-আনুগত্য আমাদের প্রচলিত জীবন-ধারণার প্রতি কঠোর আঘাত হানিয়াছে ও জীবনের অভাবনীয়তাকে চমকপ্রদভাবে অবারিত করিয়াছে। তাঁহার অনেক শ্রেষ্ঠ গল্প আছে; কিন্তু মনে হয় যেন গল্প-রচনা অপেক্ষা জীবনের নূতনতত্ত্ব-উদ্ঘাটনের দিকেই তাঁহার অধিক অভিরুচি। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটগল্পলেখকদের মধ্যে সর্বাধিক কুশলী শিল্পী ও একনিষ্ঠ জীবনদর্শনের উদগাতা। সমস্ত রোমান্সের আতিশয্য, আবেগ-বিহ্বলতা, মধুর রসের বাস্তববিস্মৃত মাদকতা এই সমস্ত জীবনোচ্ছ্বাসকে তিনি সূক্ষ্ম-সংযত, অথচ মর্মভেদী ব্যঙ্গে বিদ্ধ করিয়া উহাদিগকে এক বর্ণহীন, ধূসর মোহভঙ্গের ঈষৎ-বিষণ্ণ স্বরে নামাইয়া আনিয়াছেন ও সমস্ত জীবনের উপর এক অবিচ্ছিন্ন গোধূলি-ম্লান, করুণ-স্তিমিত অনুভূতির আস্তরণ বিছাইয়াছেন। তাঁহার লেখার মধ্যে উদ্ভট, অসম্ভব বা অতিরঞ্জিত কিছু নাই—আধুনিক জীবন যেন উহার সমস্ত নৈরাশ্যক্ষুব্ধ, সংশয়মন্থর, বিকারজীর্ণ মনোভাব লইয়া তাঁহার ছোটগল্পে মৃদু-কুণ্ঠিতস্বরে কথা কহিয়া উঠিয়াছে। অপেক্ষাকৃত তরুণ লেখকদের উপর মাণিক ও প্রেমেন্দ্রেরই প্রভাব বেশী দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অপেক্ষাকৃত প্রবীণ লেখক হইলেও তাঁহাদের সাধনাক্রমের বহুমুখিতার মধ্যে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁহাদের উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের তীক্ষ্ণাগ্র মনীষার বঁড়শিতে ছোটগল্পের যে মাছটি গাঁথা গিয়াছিল তাহাকে খেলাইয়া ডাঙ্গায় তুলিতে বা কোন বিশিষ্ট জীবনদর্শনের চার দিয়া এই বঁড়শি-বেঁধা মাছকে প্রলুব্ধ করিয়া বশীভূত করিতেও তাঁহারা সম্পূর্ণ সিদ্ধকাম হন নাই। আরও অনেক তরুণ লেখক এই বিভাগে তাঁহাদের শিল্পকুশলতা ও উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট জীবনবোধ হয়ত এখনও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই।

প্রমথ চৌধুরী আধুনিক সাহিত্যের বিচারপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে এখন আর সাহিত্যে নবসূর্যোদয় সম্ভব নয়, তবে অসংখ্য সূর্যকিরণের স্বর্ণসূত্র-অবলম্বনে ষাট হাজার বালখিল্য সাহিত্যিকের আবির্ভাবই প্রত্যাশিত। এক্ষেত্রে 'বালখিল্য' শব্দটি সাহিত্যিকের অবয়ব-নির্দেশক না হইয়া,

সাহিত্যকৃতির ক্ষুদ্রতা নির্দেশ করিলেই এই মন্তব্যটি ছোটগল্প সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে। লেখকগণ বামনাবতার নহেন; তবে তাঁহাদের নির্মিত বাণীশিল্প অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, কারুকার্যখচিত পানপাত্রের ন্যায়। বর্তমান যুগের আদর্শবিভ্রান্তি ও চিত্তচাঞ্চল্যের মধ্যে কোন মহৎ সৃষ্টি, জীবনবোধের কোন সার্বভৌম রূপায়ন সম্ভব হইতেছে না। এখন জীবন লইয়া নানা পরীক্ষা চলিতেছে, ইহার মধ্যে নানা অপ্রত্যাশিত মনোবৃত্তির স্ফুরণ দেখা যাইতেছে, মানবিক সম্পর্কের উপরকার পালিশ উঠিয়া গিয়া ইহাতে নানা ফাটল ও জোড়াতালির চিহ্ন লক্ষ্যগোচর হইতেছে, অভ্যস্ত বাঁধনগুলি জীর্ণ হইয়া গিয়া, নূতন মিলন-বিচ্ছেদ-নীতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ চলিতেছে। ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পরিধিতে এই পরিবর্তনছন্দের সবটুকু স্পন্দন বিধৃত হইতেছে, জীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানগুলিকে আবার নূতন করিয়া জুড়িবার চেষ্টা হইতেছে ও ইহার ভাঙা টুকরাগুলি লইয়া আবার একটি সত্যতর, পূর্ণতর জীবনদর্শন—রচনার আয়োজন চলিতেছে। আমাদের চাউলে যেমন তুষ, ক্ষুদ, কাঁকর প্রভৃতি নানা ভেজাল মিশিয়া আমাদের খাদ্যদ্রব্যকে বিস্বাদ ও পুষ্টিগুণহীন করিতেছে, আমাদের জীবনেও তেমনি নানাবিধ মেকি উপাদান, অসত্য সংস্কার মিশ্রিত হইয়া উহার শক্তি ও আনন্দহ্রাসের কারণ হইতেছে। ছোটগল্পের কুলা-য় এই অবিশুদ্ধ উপাদানগুলিকে ঝাড়িয়া-বাছিয়া সুস্থ জীবন-কণিকাগুলিকে আবার পৃথক করিতে হইবে ও উহাদের প্রাণোচ্ছলতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। যদি কোনদিন আধুনিক জীবনের মহাকাব্য আবার রচিত হয়, তবে এই ছোটগল্পগুলিই তাহার উপকরণ যোগাইবে। প্রাচীন যুগের বিশালকায় মহাকাব্যগোষ্ঠীর পিছনে যেমন বিচ্ছিন্ন বীরগাথাগুলি ক্রমোপচীয়মান জাতীয়তাবোধের আকর্ষণে একীভূত হইয়া উহাদের মেরুদণ্ড ও অস্থি-সংস্থান গঠন করিয়াছিল, তেমনি বর্তমান যুগে হয়তো ছোটগল্পের জীবন-নিরীক্ষাই এক ব্যাপকতর জীবন-সংশ্লেষের প্রেরণা সঞ্চার করিবে। ইহাই হয়তো ইহার যথার্থ তাৎপর্য ও মহাকাল-নির্দিষ্ট ভূমিকা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবালকীটের একত্র সমাবেশে মহাকায় প্রবালদ্বীপের নির্মাণের ন্যায়, এই 'অণোঃ অণীয়ান' হইতে 'মহতো মহীয়ানে'র উদ্ভব-কল্পনা নিতান্ত অবাস্তব না হইতেও পারে।

কাব্যে ও অনুভূতিতে ঋতুচক্র

(১)

ঋতুচক্রের পারম্পর্য কম-বেশী সকল দেশেই, সকল রকমের আবহাওয়ায় প্রচলিত আছে। তবে দেশ-ভেদে কোথাও কোন ঋতুর অতি-প্রাধান্য কোথাও বা কাহারও নামমাত্র আবির্ভাব। মেরুপ্রদেশে শীতের চির-রাজত্ব, অন্যান্য ঋতু সেখানে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই তিরোহিত। মরুভূমি-অঞ্চলে ও বিষুবরেখার সন্নিহিত প্রদেশে গ্রীষ্মেরই একাধিপত্য, গভীর রাত্রে শৈত্য অনুভূত হয় ও অন্যান্য ঋতু কেবল ঈষৎ লঘু স্পর্শের দ্বারা নিজ অস্তিত্ব ঘোষণা করে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে শীতের প্রখরতা ও দীর্ঘস্থায়িত্বই স্বাভাবিক নিয়ম; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও বসন্ত স্থায়ী সুরের মধ্যে সঞ্চারী সুরের ন্যায় সূক্ষ্মতর মীড়-মূর্ছনায় ও চকিত আবির্ভাবের দ্বারাই ঋতুচক্রের ঐকতান-সঙ্গীতকে রক্ষা করে।

ইংলণ্ডের আবহাওয়ায় শীতের সুদীর্ঘ জড়তা ও অবসাদের পর বসন্তের আগমন সত্য সত্যই একটা নূতন উল্লাস ও প্রাণোন্মাদনার সঞ্চার করে— হিমানীরিক্ত গাছে গাছে নূতন পল্লবোদ্গম ও নানা ফুলের বর্ণসমারোহের ন্যায় অন্তরলোকেও এক নূতন রূপানুভূতির তরঙ্গ হিল্লোলিত হয়। কাব্যজগতে কিন্তু ইহার বিশেষ প্রতিফলন দেখা যায় না। ইংরাজ কবিগোষ্ঠী যুদ্ধোত্তর যুগে আর যৌবনের রূপমুগ্ধতার প্রতি বিশেষ প্রবণতা দেখান না; প্রৌঢ়ত্বের অতিরিক্ত চিন্তাশীলতা ও জটিল, অসুস্থ কল্পনাজাল তাঁহাদের যৌবনদীপ্তিকে প্রায় নির্বাপিত করিয়াছে। সুতরাং বহির্জগতে বসন্ত দেখা দিলেও অন্তর্জগতে তাঁহাদের শীতের কুহেলিকা ও মানস অবসাদ প্রায় চিরস্থায়ী। বসন্ত ঋতু যে ভাবোচ্ছলতার উদ্রেক করে, তাহা পৃথিবীর তরুণ যুগেরই ব্যাপার, সমস্যাজর্জর বর্তমান যুগে তাহার বিশেষ স্থান নাই। আধুনিক যুগের মানব যে প্রেম অনুভব করে তাহাও অতীতের মত আদিরসপ্রধান নহে। তাহাতে প্রেমের বঞ্চনাময় প্রকৃতি, না-পাওয়ার বেদনা ও বিভ্রান্তি এবং জীবন-জিজ্ঞাসার রহস্যকণ্টকিত অস্বস্তিই প্রধান উপাদানরূপে দেখা দিয়াছে। সুতরাং ঋতু হিসাবে বসন্তের রমণীয়তা থাকিলেও কাব্যের

বিষয়রূপে ইহার মর্যাদা ও আকর্ষণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। বরং শরতের স্নিগ্ধ প্রশান্তি ও হেমন্তের কুয়াশা-যবনিকার অন্তরালে এক নূতন পরিবর্তনের সূচনা কবিচিত্তের কাব্যপ্রেরণা যোগায়। সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যে বসন্তের আবেদন আজ গৌণ হইয়া গিয়াছে; মনের যে সরসতা ও উল্লাস বসন্তের আবির্ভাবকে প্রত্যুদ্‌গমন জানায় তাহাদের আপেক্ষিক অভাবই বসন্তের প্রতি ঔদাসীন্যের হেতু।

বাঙলা দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে বসন্তের অস্তিত্ব নিতান্তই স্বল্পকালীন—উহার পার্শ্ববর্তী শীত ও গ্রীষ্মের বিপরীতধর্মী অভিভবের মধ্যে পড়িয়া ইহার আত্মপ্রকাশ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। যে দক্ষিণা বাতাস বসন্তের নিঃশ্বাস-বায়ু, তাহার প্রবাহ দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া আসে—শীতের হাড়-কাঁপানো তীক্ষ্ণতার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে গ্রীষ্মের উগ্র তপ্ততা ইহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। ইহার সম্বন্ধে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রেমিকের ন্যায় আমরা বলিয়া উঠি—'সজনি, ভাল করি পেখন না ভেল'। শীতের রাহু ও গ্রীষ্মের কেতুর মধ্যে অবস্থিত শীর্ণ, বিলুপ্তকলা চন্দ্রমার মতই ইহার ক্ষণস্থায়ী স্নিগ্ধতা আমাদিগকে যতটা আরাম দেয়, তার চেয়ে পীড়িত করে বেশী। গাছে গাছে নবীন কিশলয় কিছুদিনের জন্য বর্ণের অগ্নিশিখাবৎ চমক জাগাইয়া দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত বায়ুতে ম্লান ও ধূলিধূসর হইয়া উঠে, আবির্ভাবের বিস্ময় অভ্যাসের আস্তরণে ঢাকা পড়িয়া যায়। ফুলের বর্ণ-সমারোহ কয়েকদিনের আতসবাজি জ্বালাইয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়—উহার পেলব সুষমা বৃন্তসর্বস্বতার কণ্টক-কাঠিন্যে আপনাকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। কোকিল-কণ্ঠের মিষ্টত্ব স্বরভঙ্গের কর্কশতায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, উহার নিরবচ্ছিন্ন গীতিপ্রবাহ যেন চড়ায়-আটকান নদীর স্রোতের ন্যায় থামিয়া থামিয়া শ্রান্তগতিতে আগাইয়া চলে। এইরূপে বসন্তের ক্ষণস্থায়িত্বই মানব-মনে ইহার প্রভাবকে খর্ব করিয়াছে। ইহাকে আমরা ঠিক পার্থিব পদার্থের পর্যায়ে দেখিতে পারি না—এ যেন কোন্ সুদূর, অনধিগম্য সৌন্দর্য-রাজ্য হইতে হঠাৎ আগন্তুক এক ঝলক বিস্ময়-পুলক।

সুতরাং বসন্ত কাব্যে যেরূপ অভিনন্দন লাভ করিয়াছে, বাস্তব জীবনে ততটা প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে নাই। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বসন্ত তাহার রঙ্গীন বিজয়-কেতন আবার সগৌরবে উড়াইয়াছে;

তাঁহার গানের অজস্রতা ও বৈচিত্র্য যেন ঋতুরই অফুরন্ত সৃষ্টির সহিত তাল রাখিয়া চলিয়াছে ও যে জীবনোল্লাসের অসংবরণীয় উচ্ছ্বাস পৃথিবীর পুরাতন আবরণকে বিদীর্ণ করিয়া এক নবীন উন্মেষের সার্বভৌম তেজস্ক্রিয়তায় আত্মপ্রকাশ করে সেই প্রাণ-হিল্লোলের উন্মাদনাকে ছন্দ ও বাণীরূপে অভিব্যক্তি দিয়াছে। তিনি শুধু কবিতায় নয়, জীবনেও অতীত যুগের বিলুপ্ত বসন্তোৎসবের পুনঃপ্রবর্তন করিয়া তরুণের মনে বসন্তের সাড়া জাগাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যুগের স্বাভাবিক প্রবণতা, বর্তমান জীবনের অশান্ত উৎক্ষেপ ও সৌন্দর্যস্বর্গচ্যুত অতৃপ্তি বসন্তের উদ্বেলিত রূপোচ্ছ্বাসকে প্রসন্ন স্বীকৃতি দিতে পারে নাই। মানুষের সম্মুখে ও পিছনে প্রসারিত দৃষ্টি বর্তমান মুহূর্তের আনন্দকে একান্তভাবে উপভোগ করার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, সংশয়-দোলায় দোদুল চিত্ত ক্ষণ-বিকশিত সৌন্দর্য-পুষ্পে স্থির হইয়া বসিবার শক্তি হারাইয়াছে। তাই আজ ফাল্গুন বনে বনে জাগিলেও, মানুষের মনে এই জাগরণ সংক্রামিত হয় নাই। বসন্তের গান গাহিতে গাহিতে আজ সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। পুষ্প-পল্লবের অন্তরাল হইতে রিক্ততার কঙ্কাল উঁকি মারে, মিলনের মধ্যে বিরহের পূর্বাভাসের মত বসন্ত-সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতার মাঝে 'ফাল্গুন ফুরায় ফুল ঝরে যায়' এই আক্ষেপ তাহার অবচেতন মন হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠে। পরিপূর্ণ উপভোগের জন্য যে অস্খলিত ভাব-তন্ময়তার প্রয়োজন, বর্তমান কালের কবি ও কাব্যরসপিপাসু পাঠক উভয়েই সেই চিত্তবিক্ষেপহীন স্থিরতার আদর্শচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন।

(২)

বর্ষা ও বসন্ত বাদ দিলে বাকী যে কয়েকটি ঋতু থাকে তাহারা গৌণ পর্যায়ে পড়ে। গ্রীষ্ম ও শীত এই দুইটি ঋতুর বাস্তব প্রখরতা তাহাদের কাব্যোচিত ভাব-ব্যঞ্জনাকে অভিভূত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ঈশ্বর গুপ্ত ইহাদের উপর কবিতা-রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই-বিষয়ক কবিতাতে দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বস্তিই বিশুদ্ধ কাব্য-প্রেরণা অপেক্ষা ব্যঙ্গাতিরঞ্জনের অধিক উদ্রেক করিয়াছে। কবি সেখানে গরমে আই-ঢাই ও শীতে হি-হি করিয়াই নিজ কল্পনা-ভাণ্ডারকে নিঃশেষিত

করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরবর্তীদের মধ্যে কেহ কেহ—যথা সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল প্রভৃতি—নিদাঘের দুঃসহ উত্তাপকে কাব্যানুভূতির সূক্ষ্মতর রসরূপের মধ্যে পরিণতি দিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার তপস্যার কৃচ্ছ্রসাধন ও নবসৃষ্টির প্রস্তুতিরূপী রুদ্রের বহ্নিজ্বালা-বিকিরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু মনে হয় যে এখানে কবির অধ্যাত্মতত্ত্বপ্রিয়তা ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের সাধারণ অনুভূতিকে ছাড়াইয়া উহার অনধিগম্য ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মকে স্বয়ংসম্পূর্ণ-ভাবে দেখেন নাই, সমগ্র ঋতুচক্রের অঙ্গীভূত করিয়া দেখিয়াছেন, নিগূঢ়-সঞ্চারী বিশ্বনিয়মের একটি স্তর হিসাবেই ইহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। সাধারণ মানুষ এই কবি-কল্পনার বৈচিত্র্য ও ঊর্ধ্বগামিতায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়। কিন্তু ঋতু সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং গ্রীষ্মকে রবীন্দ্রসৃষ্ট ভাবাসঙ্গের মধ্যে ফেলিয়া, তাঁহার ভাবকল্পনার দ্বারা অনুরঞ্জিতরূপে দেখিতে কোন কাব্যরসিক পাঠক অভ্যস্ত হন নাই।

নিদাঘের আর একটি রূপ আছে—ইহার মধ্যাহ্নকালীন তাপাতিশয্যে সমস্ত প্রকৃতি নিঝুম হইয়া এক অলস ভাবরোমন্থনে, এক শিথিল, বাস্তব-বিমুখ স্বপ্নাবেশে, অবচেতন মনের নানা সুপ্ত, অর্ধস্ফুট কল্পনাজালের মায়াগুঞ্জনে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। রবীন্দ্র-পরবর্তী কোন কোন কবির কবিতাতে গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের এই আত্মবিস্মৃত মরীচিকা-বিভ্রমের রূপটি ব্যঞ্জিত হইয়াছে, উহার বহিরবয়ব হইতে বিকীর্ণ এক সূক্ষ্ম ভাবতন্তুজাল কবির বর্ণালিম্পনে চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টি-বিধানের একটি অবিচ্ছেদ্য শৃঙ্খলরূপে ও উধাও, উদাস কল্পনার রশ্মিজালবদ্ধ হইয়া গ্রীষ্ম ঋতু কাব্যরাজ্যে একটি সঙ্কীর্ণ হইলেও স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে।

শীত কিন্তু কবি-কল্পনার ফাঁদে কোন ছলেই ধরা দেয় নাই। ইহাকে আমরা বরাবরই অবাঞ্ছিত আগন্তুকরূপেই দেখিয়াছি, ইহাকে ঘিরিয়া আমাদের ভাবানুভূতির কোন কবোষ্ণ আবেশ পরিমণ্ডল রচনা করে নাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ইহাকে কাব্য-কৌলীন্য দান করিতে পারেন নাই। কোন কোন কবিতায় ইহা অপ্রাকৃত, অশরীরী উপস্থিতির পটভূমিকারূপে কল্পিত হইয়াছে, ইহার হিমজর্জর রিক্ততাও সময় সময় কবি-চিত্তে ভাব-

শিহরণ জাগাইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর কবি-কল্পনায় বা সাধারণ মানুষের মানস সংস্কারে ইহার কোন সামগ্রিক সত্তা রূপ পরিগ্রহ করে নাই। পাশ্চাত্য কাব্যে শীতের মধ্যেই জনগণের প্রধান উৎসব খ্রীষ্ট-জন্মদিন অনুষ্ঠিত হয়; দুরন্ত, হাড়-কাঁপানো শীতে অগ্নিস্থলীর চারি পাশে বসিয়া আগুন পোহানোর আরাম উপভোগ করিতে করিতে পারিবারিক ঐক্যবোধ, গোষ্ঠীগত মিলনের নিবিড়তা, প্রেম ও সামাজিকতার উষ্ণ আবেশ চুল্লীর মধ্যে বহ্নিদীপ্তির মতই উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠে। সেইজন্য শীতের বর্ণনায়ও ভাবব্যঞ্জনা-প্রকাশে পাশ্চাত্য সাহিত্য পরিপূর্ণ। বিশেষত ইংরেজের মন শীতের এই আগুনের উত্তাপে উহার বরফ-জমান সঙ্কোচ ও আত্মনিরোধ-প্রবণতাকে গলাইয়া দিয়া আপনাকে সহজ, অবাধ ধারায় প্রবাহিত করিয়া দেয়। আমাদের কাব্যে ও সমাজ-জীবনে শীতের এরূপ কোন আন্তর প্রভাব লক্ষিত হয় না। শীতের সায়াহ্নে এক চায়ের আসর ছাড়া আর কোন গভীরতর মানস স্ফূর্তি জমিয়া উঠে না।

(৩)

শরৎ আমাদের সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু উহার আবেদন শুধু কাব্যগুণোপেত নহে, দিব্যানুভূতিদ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত কাব্যে, বাল্মীকির রামায়ণ ও ভট্টিকাব্যে, যে শরৎ-বর্ণনা পাই, তাহাতে কবি-চিত্তের উপলব্ধির সরসতা, উল্লাস ও প্রসন্নতার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ দেখা যায়। হিন্দুযুগে শরৎকালই দিগ্বিজয় ও দেশভ্রমণের প্রশস্ত কাল ছিল। কাজেই এই ঋতুর চিত্রে পথিক মনের দায়িত্বভারমুক্ত আনন্দ, উহার বৈচিত্র্যপিয়াসী, কৌতূহলী দৃষ্টিপাত, উহার নীতিজ্ঞানের বাঁধন-ছেঁড়া রূপ-মুগ্ধতা আমাদিগকে অনুভূতির এক নূতন রাজ্যে লইয়া গিয়াছে। শরতের স্বচ্ছ নির্মল আবেশহীন সৌন্দর্যের মধ্যে ভারতীয় কবি-মন উহার সত্যান্বেষণ ও ধ্যান-প্রশান্তির অনুরূপ একটা অনুভব লাভ করিত। যে পদ্ম শরৎ-সরসীর নীল জলে বিকশিত হইয়া বহিঃপ্রকৃতিকে শ্রীসম্পন্ন করিত, তাহাই ভক্তের দেবপূজার ও দেবসৌন্দর্য-পরিকল্পনার প্রধান উপাদান ও প্রতীকরূপে অন্তরলোকের এক নূতন মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। উহার শুচি-শুভ্র, রসোচ্ছল, পেলব সৌন্দর্য যেন একটা অন্তর্নিহিত

সৌষম্য-সূত্রেই নিকষ-কাল দীঘির জল হইতে অতল রহস্তের ছায়াভরা প্রেয়সীর নয়ন-যুগলে ও আরাধ্যা দেবীর শ্রীচরণে সোজাসুজি গিয়া পৌঁছিয়াছে। শরৎশ্রীর প্রতীক এই পদ্ম যেন সৃষ্টি-রহস্তের ও জ্ঞানের জ্যোতির্ময়তারও প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছে—ব্রহ্মা ও সরস্বতীর আসনরূপে ইহা পার্থিব সৌন্দর্য হইতে ভাবরাজ্যের ব্যঞ্জনা-লোকে উন্নীত হইয়াছে। শরৎ-সৌন্দর্যের অন্যান্য বিকাশগুলিও—যথা, কাশপুষ্প, শঙ্খ-ধবল জ্যোৎস্নাধারা ও উহার আকাশে ভাসমান মন্থরগতি লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডসমূহ—যেন দেবতার আশীষের মত ধরাতলে নামিয়া আসিয়াছে ও উহারা আমাদের মনের নিকট পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া এক সুদূর উর্ধ্বলোকের আমন্ত্রণ বহন করে। বসন্ত মর্ত্যমাধুর্য হইতে উপচিত বিহ্বল মদিরার পাত্র, শরৎ দিব্য-সুষমা-মথিত স্নিগ্ধ সুধার আধার।

বাঙলাদেশে শারদীয় পূজা শরৎ ঋতুর এই স্বর্গলোক-বিহারকে দুর্গোৎসবের মধ্যে এক পরিপূর্ণ রূপ দিয়াছে—উহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে স্বর্গাভিমুখীনতার যে বিচিত্র, বহুমুখী ইঙ্গিতগুলি ছড়ান ছিল, তাহাদিগকে সংহত করিয়া সর্ব সৌন্দর্যের উৎসরূপিণী দেবীর চরণতলে অর্ঘ্য-মাল্য রচনা করিয়াছে। শরতের কর্পূরের ন্যায় সাদা জ্যোৎস্নাও কোজাগরী পূর্ণিমার লক্ষ্মীপুজার মধ্যে দিব্য রূপান্তর ও সার্থকতায় পরিণত হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যে শরৎ যে রূপ পাইয়াছে তাহাতে স্বর্গীয় আভাস ও ছুটির আনন্দ এক অপূর্ব সংমিশ্রণে মিলিত হইয়াছে। ইহার শেফালি-ফুলের অঞ্জলি অনাদরে ও অবহেলায় উঠানে ছড়ানো থাকিলেও যেন এক সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবাসঙ্গসূত্রে দেবমন্দিরের স্মৃতি-সুরভিত। ইহার কূলে কূলে ভরা নদীর জল সমুদ্রের শেষ আশ্রয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহার মৃদুসঞ্চারী শুভ্র মেঘমালা সর্বরিক্ত বৈরাগ্যের অন্তর্বাস-পরিহিত—সাদার পিছনে গেরুয়ার রং উঁকি মারে। ইহার মানসযাত্রী মরালদল যেন মমত্বহীন, মুমুক্ষু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মত অসীমের অভিসারে উন্মুখ। আবার সঙ্গে সঙ্গে দিকে দিকে, ইহার আলোঝলমল আকাশে, শিশির-স্নিগ্ধ তৃণদলে, ইহার বাতাসে-দোলা সবুজ ধানের চারায় এক মুক্তির আনন্দ, এক অবাধ কল্পনা-লীলার ও জীবনোৎসবের আমন্ত্রণ প্রসারিত। আর এত সৌন্দর্য-সম্ভারের মধ্যেও ক্ষণস্থায়িত্বের এক করুণ আবেদন জড়াইয়া আছে। কেন

জানি না মনের প্রশান্তির মধ্যেও একটা আশঙ্কা জাগ্রত থাকে যে স্বর্গের দ্যুতিভরা এই সৌন্দর্য পার্থিব আবেষ্টনের মধ্যে বেশীদিন ধরা থাকিবে না—অমরলোকের ইন্দ্রজাল ধরার সমস্ত বন্ধন বিদীর্ণ করিয়া হঠাৎ একদিন অন্তর্হিত হইবে, উর্বশী চিরকাল পুরুরবার প্রেমালিঙ্গন মানিয়া লইবে না। শিশিরের স্নিগ্ধতা একদিন বিরহ-বেদনার অশ্রুজলে লবণাক্ত হইবে, উজ্জ্বল শ্যামল দিকচক্রবাল আবার স্মৃতির বাষ্পকুহেলিকায় ম্লান হইয়া উঠিবে, আবার নূতন সমস্যা চিত্তের ক্ষণিক প্রসন্নতাকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া তুলিবে। শরতের হাসি ও অশ্রুর মধ্যে যে নিখুঁত সামঞ্জস্য বিদ্যমান তাহা শীঘ্রই বিপর্যস্ত হইয়া বিষাদের দিকেই দাঁড়িপাল্লা ঝুঁকিয়া পড়িবে। শরৎ-রাজের অমাত্য ও অনুচর হেমন্ত কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্তে উহাকে সরাইয়া নিজেই সিংহাসন অধিকার করিয়া রাজা হইয়া বসিবে ও শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল জীবন-নাট্যের উপর অতর্কিতভাবে মেঘযবনিকা নামিয়া আসিবে—এই চিন্তাই উহার সমস্ত অম্লান দেহ-কান্তির মধ্যে এক গোপন ব্যাধির বীজাণুর মত অনুস্যূত হইয়া বিরাজমান।

ঋতুচক্রের মধ্যে হেমন্তের ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষাকৃত অনির্দেশ্য—উহার দিগন্তসঞ্চিত বাষ্পাবগুণ্ঠন উহার আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়কেই কতকটা সংশয়াচ্ছন্ন করিয়াছে। শরৎ ও শীতের সঙ্গে উহার সীমান্তরেখা অপরিস্ফুট—উহা যেমন অলক্ষিতভাবে শরৎকে অপসারিত করে, তেমনি অলক্ষিতভাবে শীতের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া দেয়। উহার কোন সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক লক্ষণ আবিষ্কার করা দুরূহ। মাঠে মাঠে পাকা ধান ও রবিশস্যের সবুজ উন্মেষ ইহার মধ্যে যুগপৎ উদ্ভিন্নমান যৌবন ও পরিণত প্রৌঢ়ত্বের ছবিকে মিলাইয়া দিয়াছে, কিন্তু এই রূপসাঙ্কর্যের মধ্যে ঋতুর প্রাণরহস্য ধরা দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইংরেজ কবি কীট্‌স তাঁহার Autumn কবিতায় প্রকৃতির যে আত্মসমাহিত, নিটোল পূর্ণতার রসে নিস্তরঙ্গ, মানস তৃপ্তিতে স্বপ্নালু, ঈষৎ বিষাদের স্পর্শে উদাসীন জীবন-লীলাটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা যেন আমাদের দেশের শরৎ ও হেমন্ত উভয়েরই প্রাণরসের এক যৌগিক সংমিশ্রণ। মোট কথা, হেমন্ত ঋতু প্রকৃতির রাজ্য হইতে উঠিয়া আসিয়া আমাদের মানসলোকে কোন নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করে নাই, ইহার বাহিরের রূপ অন্তরে কোন ভাব-নিবিড়তা লাভ করে নাই,

ইন্দ্রিয়ের গবাক্ষপথে রস আকর্ষণ করিয়া আমাদের মনোগহনে যে রূপসৃষ্টির রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতেছে তাহাতে কোন নূতন রং এর প্রলেপ মাখায় নাই। হেমন্ত কোন স্বতন্ত্র ঋতু-মহাদেশের অবিচ্ছিন্নতা পায় নাই, ইহা দুই প্রতিবেশী মহাদেশের মধ্যে সংযোজক প্রণালী মাত্র।

(৪)

সমগ্র ঋতুচক্রের মধ্যে বর্ষার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যত নিবিড় ও অন্তরঙ্গ এমন আর কাহারও সঙ্গে নহে। বর্ষার আবির্ভাব কেবল বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে নহে, আমাদের অন্তরের গভীরেও। তাহার যে মেঘ-সমারোহ, তাহার যে আসারধারাসিক্ত আর্দ্রতা, তাহা যেন আমাদের অন্তরের একটি স্থায়ী ভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। নিদাঘের অসহনীয় উত্তাপের পর বর্ষা যে স্নিগ্ধ স্পর্শ, যে শারীরিক ক্লেশনিবারক শৈত্য লইয়া আসে তাহার প্রভাব দেহের সীমা ছাড়াইয়া মনের সর্বস্তরে, এমন কি মন ছাড়াইয়া আমাদের সত্তা-রহস্যের মূল পর্যন্ত সংক্রামিত হয়। বর্ষার যে মেঘ দিগন্তে ঘনাইয়া আসে তাহা মনের উপরও ছায়াপাত করিয়া ঘনতর ভাব-সম্মোহের সৃষ্টি করে; যে বিদ্যুৎ-শিখা তীক্ষ্ম আলোকে চোখে ধাঁধা লাগায় তাহা অনুভূতিতেও চমকপ্রদ শিহরণ জাগাইয়া তাহাকে অভ্যাসের জড়তা হইতে মুক্তি দেয় ও নূতনত্বের অতর্কিত বিস্ময়ের সহিত পরিচিত করে। যে দমকা হাওয়া রহিয়া রহিয়া গাছ-পালা, ঘর-দুয়ারকে কাঁপাইয়া বহিয়া যায়, তাহা যেন একটা অদম্য হৃদয়োচ্ছ্বাসের মত মনের নিভৃত প্রকোষ্ঠের বদ্ধ বাতায়নগুলিকে খুলিয়া দিয়া মনের মধ্যে মুক্ত বায়ুসঞ্চালন করে। বর্ষার মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানবচিত্তও নূতন নেপথ্য-বিধান করিয়া নব নব অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হয়।

বাঙ্‌লা দেশে সচরাচর মানবপ্রকৃতি যেরূপ অনড় ও অভ্যাস-শৃঙ্খলে বদ্ধ, অন্যান্য ঋতুতে উহার বহিঃপ্রকৃতিও প্রায় সেইরূপ স্থাবর ও একরঙা। মাঠে ফসল কাটা হইয়া গেলে উহার দিগন্তবিস্তৃত ধূসর শূন্যতা আকাশের নিশ্চল প্রজ্বলন্ত নীলে ও গাছ-পালার শীর্ণ-শুষ্ক পীত পাণ্ডুরতায় পুনরাবৃত্ত হয়। মানুষের মনের উদ্যমহীন অবসাদ যেন সমস্ত প্রতিবেশে ছড়াইয়া পড়ে। দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী এক নির্মম বিধানের লৌহজাল যেন সমস্ত সৃষ্টিকে

বজ্রবাঁধনে বাঁধিয়াছে। বর্ষা ঋতু এই দুর্নিবার শ্বাসরোধী নিয়মাভিভবের এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। বাঙ্‌লা দেশের সমস্ত প্রাণচাঞ্চল্য সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, স্থাবরের সকল নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাহ্য করিয়া এই ঋতুতে অপরিমিত অজস্রতায় আত্মপ্রকাশ করে। যে আকাশ সারা বৎসর ধরিয়া জগৎনাট্যের নিশ্চল দ্রষ্টারূপে, অনন্তের উদাসীনতার প্রতিচ্ছবিরূপে, ধ্যানমগ্ন থাকে, বর্ষায় সে অকস্মাৎ পৃথিবীর উচ্ছল প্রাণলীলায় দুরন্ত শিশুর মতই ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাহার উষর, অপরিবর্তনীয় নীলে হঠাৎ কি প্রাণবন্যার জোয়ার জাগিয়া উঠে! তাহার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ জুড়িয়া কি অপরূপ বর্ণবৈচিত্র্য পরিবর্তনের কি বেগবান প্রবাহ মুহূর্তে মুহূর্তে বিচ্ছুরিত হয়! ধ্যানের নিস্তব্ধ আসন জনতার কল-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। মনে হয় যেন তাহার নির্জন বীথিকাসমূহে মেঘের দল স্বর্গের সেনাবাহিনীর ন্যায় ডমরু বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া অভিযানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আকাশের দৃশ্যপট ক্ষণে ক্ষণে বদলাইয়া যাইতেছে—নানা বর্ণের মেঘ—ধূসর, কপিশ, ঘনকৃষ্ণ, নীলাভ, সাদার ছিটে-লাগা—এক দুর্বোধ্য উন্মত্ততায় পরস্পরকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। মেঘ ও রৌদ্রের কখনও যুগপৎ আর্বিভাব, কখনও লুকোচুরি খেলা এই বাস্তব-কঠিন জগৎকে এক স্বপ্নময় মায়ালোকে রঙীন করিয়া দিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টির ঝাপটা নামিয়া দিগন্তকে অস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছে ও পরিচিত প্রতিবেশের উপর এক মায়াযবনিকা বিস্তার করিতেছে। যেন বিশ্বনাথ তাঁহার নিয়মবদ্ধ নিরপেক্ষতার মুখোশ খুলিয়া ফেলিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির এই লীলাভিনয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, জগতের অন্তরালবর্তী নিগূঢ় বিধান সৌরমণ্ডলনিয়ন্ত্রী মাধ্যাকর্ষণশক্তির ন্যায় কোন এক অদ্ভুত প্রেরণায় মানুষের দৃষ্টি-পথে আপনাকে উদঘাটিত করিয়া দিয়াছে।

ঊর্ধ্বাকাশের ন্যায় নীচের পৃথিবীতেও সবুজের বর্ণ-হিল্লোল এক অভিনব রূপের প্লাবন বহাইয়া দিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে এই হরিতের বন্যা চোখে রংএর নেশা ধরাইয়া দিতেছে। উষর, প্রস্তর-কঠোর পৃথিবীর নীচে যত প্রাণের অঙ্কুর সুপ্ত ছিল, আজ তাহারা সকলে নিদমহলের দ্বার খুলিয়া বাহিরে চোখ মেলিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে যে এত অপর্যাপ্ত সৌন্দর্য-সম্ভাবনা আত্মগোপন করিয়াছিল তাহা তাহার কিছু পূর্বের রুক্ষ, নীরস আকৃতি দেখিয়া কে অনুমান করিতে পারিত? বর্ষাবিধৌত বৃক্ষলতা হইতে এক শ্যাম-চিক্কণ,

তৈল-মসৃণ সবুজ দীপ্তি বিকীর্ণ হইয়া বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব স্তরকে নীচের হরিৎ আভার সহিত মিলাইয়া দিতেছে। উপরের মেঘবিদীর্ণ, সজল আকাশ, মধ্যস্তরের ঘন সবুজশ্রীমণ্ডিত তরুলতা, দূরদিগন্তে নীরন্ধ্র হরিৎ প্রাকারের ঘনবদ্ধ বিন্যাস, পায়ের তলে তৃণ-শস্যের যোজনব্যাপী হিল্লোলিত শ্যামল সম্ভার ও সকলের মধ্যে এক অবর্ণনীয় প্রাণচঞ্চল সজীবতা, এ সমস্ত মিলিয়া কি অপূর্ব বর্ণসঙ্গতি, চিত্রকলার কি অপরূপ বর্ণযোজনা-কৌশল! বিপরীত বর্ণসমাবেশের ফলে প্রত্যেকটিরই রং কি আশ্চর্য রকম খুলিয়াছে! সবুজের পূর্ণ সৌন্দর্য এই মেঘাবৃত আকাশের তলে, এই ম্লান স্তিমিত, সীসারং-এর ঘেরাটোপ-দেওয়া চন্দ্রাতপের নীচে, এই দ্রুত-পরিবর্তনশীল বর্ণমালার বিচ্ছুরণ পরিধির মধ্যে, কখনও ধারাবর্ষণের ঝাপ্‌সা আবরণের ভিতর দিয়া, কখনও বা মেঘ-ভাঙ্গা রৌদ্রের ঈষৎ-কম্পিত ঝলকে শুধু আমাদের বাইরের দৃষ্টিতে নয়, অন্তরের অনুভূতিতেও প্রকাশিত হয়—সবুজের শুধু বাহিরের রূপ নয়, তাহার পিছনের অন্তরশায়ী ভাবনির্যাসটুকুও এই অনুকূল প্রতিবেশে চেতনায় ধরা পড়ে। আবার, সবুজ তরঙ্গে দৃষ্টিকে অবগাহন করাইয়া সেই পরিস্নাত দৃষ্টি লইয়া আকাশকে নিরীক্ষণ করিলে উহার মেঘাবরণ এক অননুভূত-পূর্ব সুষমায় প্রতিভাত হয়। দ্যুলোক-ভূলোক—মধ্যলোক সব মিলাইয়া এক অপূর্ব বর্ণ-তূলিকায় অনুরঞ্জিত, পরস্পরের পরিপূরক-রূপে এক অখণ্ড সংহতিতে বিধৃত চিত্ররূপ আমাদিগকে সৃষ্টিকলার এক নূতন রহস্যলোকে পৌঁছাইয়া দেয়।

(৫)

আমাদের দেশে বর্ষা শুধু প্রকৃতির দান নহে, কবি ও ভাবুকেরও সৃষ্টি। বর্ষার মেঘগর্জন, বিদ্যুৎস্ফুরণ ও ধারাবর্ষণের মধ্যে যে নিবিড় নিঃসঙ্গতা ঘনাইয়া আসে, যে আত্মনিমজ্জনের অবসর সৃষ্ট হয়, কবিরা তাহাকে এক গভীর হৃদয়াকূতি, বিরহের এক একান্ত রোমন্থনের আবেশ দিয়া পরিপূর্ণ করিয়াছেন। কালিদাসের মেঘদূত বর্ষার এই ভাবঘন, প্রেমিক হৃদয়ে বিশ্বব্যাপী বিরহার্তির রূপটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহার পর কবি জয়দেব এই মেঘমেদুর আকাশ ও তমালশ্যাম বনভূমিকে ঐশী প্রণয়লীলার পটভূমিকা-রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। জয়দেবের উত্তরাধিকারী বৈষ্ণব-পদাবলী-

রচয়িতারা শ্রীরাধার অন্তরের শূন্যতাবোধ ও প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণে তাঁহার অভিসার-ব্যাকুলতার মধ্যে মানবচিত্তের উপর বর্ষার আন্তর প্রভাবটিকে চিরন্তন প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। অশনির ঝনঝনি, বিদ্যুতের অন্ধকার-বিদারী তরবারি-আস্ফালন, ঝটিকাবেগ-তাড়িত বর্ষণের মাতামাতি, নীরন্ধ্র মেঘসঙ্কুল আঁধারের বিভীষিকা—এসবই মানবের অন্তরলোকে প্রবেশ করিয়া সেখানেও এক অনুরূপ ভাবোন্মত্ততার আলোড়ন জাগাইয়াছে। বিরহী মনের খেদোচ্ছ্বাস প্রকৃতির দুর্যোগের সহিত যোগ দিয়া উহার এক সূক্ষ্মতর রূপান্তর সাধন করিয়াছে। সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও বিরহবোধের সহিত বর্ষার নিবিড় ভাবাসঙ্গ-সূত্র অবলম্বন করিয়া এই অন্তরবেদনাকে এক সার্বভৌম বিস্তার ও রহস্যব্যঞ্জনা দিয়াছেন। তিনি বর্ষার শোক-সমারোহের মধ্য দিয়া নিখিল মানবাত্মাকে এক অপ্রাপনীয় আদর্শের দিকে নিরুদ্দেশ অভিসার-যাত্রায় পাঠাইয়াছেন। বর্ষা এখন আর নিছক বৈষ্ণব ভাবাদর্শের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে—সে সকল মানুষের অনুভূতির মধ্যে জড়াইয়া আছে। বর্ষা প্রতিটি মানুষের অন্তরশায়ী আদর্শৈষণাকে জাগাইয়া দেয়—যাহা পাই নাই তাহার জন্য ক্ষোভ, যাহা আশা করি তাহার জন্য আকুতি, স্বপ্নের বাস্তব রূপায়নের জন্য আকাঙ্ক্ষা, অব্যবহৃত মানস প্রকোষ্ঠের দ্বার-উন্মোচন, কল্পলোকবিহারের উধাও কল্পনা—উদাস স্মৃতির অতর্কিত উদ্বোধন—সবই বর্ষণমুখর শ্রাবণ রজনীর ইন্দ্রজাল প্রভাবে মনের আকাশে ভিড় করিয়া দেখা দেয়। আজ বর্ষা কেবল তাহার প্রাকৃতিক লক্ষণের দ্বারাই চিহ্নিত নয়, তাহার ভাবরূপেই এখন তাহার প্রধান পরিচয়। প্রকৃতি-রাজ্যের আগন্তুক যে মানুষের অন্তরে এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, পরিবেশের স্থূলতা যে ভাবে বিগলিত হইয়া অনুভূতির গৌরবে আপনাকে এরূপ নিশ্চিহ্নভাবে মিশাইয়া দিতে পারে বর্ষা ঋতুই তাহার একমাত্র নিদর্শন। আজ তাহাকে খুঁজিতে হইলে শুধু উপর পানে আকাশের দিকে তাকাইলেই হয় না, তাহাকে অন্তরের নিগূঢ়েও অবলোকন করিতে হইবে। এখন সমগ্র বাঙলাদেশ আত্মবিস্মৃত, যোগিনী রাধার ন্যায় "সজল নয়নে চাহে মেঘপানে না চলে নয়নতারা"—তাহার ধ্যানচক্ষু কিন্তু অন্তরের "শ্যামরূপের" উপরই সন্নিবিষ্ট। মানুষের এই ধ্যান যে সহজে ভঙ্গ হইবে, অন্য কোন আকর্ষণ যে বর্ষার মোহকে ক্ষীণতর করিয়া দিবে, মানবপ্রকৃতির এরূপ পরিবর্তনও সহসা কল্পনা করা যায় না। বর্ষা

মানুষের অন্তর রহস্যের চির প্রতীকরূপে কাব্য ও অনুভূতি-জগতে শাশ্বত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এরূপ আশা করা যায়।

বাংলা মুসলিম সাহিত্য

হিন্দু-মুসলমান যে ঠিক এক জাতি হইয়া গড়িয়া উঠিল না, তাহার একটা কারণ বোধ হয় মুসলমানের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্বন্ধে হিন্দুদের আপেক্ষিক অজ্ঞতা। হিন্দু যেমন গান, কথকতা, সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়া নিজ সংস্কৃতি ও ধর্মজীবনের নিবিড় পরিচয়টি দিকে দিকে প্রচারিত করিয়াছে, মুসলমানী সাহিত্যে আমরা তদনুরূপ বিশেষ কোন প্রচেষ্টার লক্ষণ দেখিতে পাই না। মধ্যযুগের আলাওল কবি ও অপেক্ষাকৃত আধুনিকযুগে ফকির-দরবেশ-জাতীয় কয়েকজন মরমী কবি ছাড়া মুসলমানের অন্তর্জীবনের পরিচয় দিতে কোন মুসলমান সাহিত্যিক অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। হয়ত মসজিদে প্রার্থনার সময় বা পর্বাহে মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে ঘরাও আলোচনা চলে ও তাহাদের ব্যবহারিক জীবন এই আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইস্‌লাম আদর্শ ও জীবনদর্শন অ-মুসলমানের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় নাই। তাহার এই ফল হইয়াছে যে, হিন্দু-মুসলমানে পরস্পরের অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশী হইয়াও পরস্পরের উৎসবে সহযোগিতা করিতে পারে নাই, পরস্পরের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রবেশাধিকার পায় নাই ও অন্তরের যে নিগূঢ় স্তরে সমীকরণের কাজ চলে সেইখানে এক নাড়ীর বন্ধনে সংযুক্ত হইতে পারে নাই। বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ হিন্দুর রচিত, ও হিন্দু আদর্শে অনুপ্রাণিত সাহিত্য বলিয়া মুসলমান তাহাকে ঠিক আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। কাজী নজরুল ইস্‌লামের মত আরও কবি জন্মিলে ও তাঁর ভাব-সমন্বয়ের চেষ্টা রাজনৈতিক প্রতিকূলতার দ্বারা প্রতিহত না হইলে মাতৃভূমির বক্ষে আজকার এই রক্তরঞ্জিত ও কলঙ্ক-কলুষিত বিদারণ রেখা হয়ত অঙ্কিত

হইত না। আজ বাংলার দ্বিখণ্ডীকরণ মনের মধ্যে যে ফাটল ছিল তাহারই নিদারুণ বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই দিক দিয়া মুসলমান সাহিত্যিকদের যথেষ্ট করিবার আছে; বাংলা-সাহিত্যের অলিখিত অধ্যায়টি ভাবীকালের মুসলমান সাহিত্যিকের লেখনীর প্রতীক্ষা করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে একজন আধুনিক মুসলমান সাহিত্যিকের (আবুল ফজল) রচনাভঙ্গী সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করিতেছি। আবুল ফজলের প্রকাশ-ভঙ্গী জোরালো, ভাষার উপরও যথেষ্ট অধিকার আছে এবং তথাকথিত মুসলমানী বাংলার চিহ্ন খুবই কম। তাঁহার চরিত্র-পরিকল্পনা খুব গভীর না হইলেও অন্তঃসঙ্গতিবিশিষ্ট, কোথাও অস্বাভাবিক ঠেকে না। তরুণ লেখকের পক্ষে ইহা যথেষ্ট কৃতিত্বের কথা। মনে হয় জীবনের সহিত আরও নিবিড় ও অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটিলে চরিত্রচিত্রণে গভীরতার উৎসের সন্ধান লেখকের আয়ত্তাধীন হইবে। তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে 'চৌচির'-এ মুসলমানের অন্তর্জীবন আঁকিবার খানিকটা প্রয়াস আছে। কিন্তু মোটের উপর উহাকে কাঁচাহাতের লেখা বলিয়া মনে হয়। বাকী দুইখানা উপন্যাস 'সাহসিকা' ও 'জীবনপথের যাত্রী'তে মুসলমান নামের ছদ্মবেশী একটি cosmopolitan বা সর্বদেশ-সাধারণ সমাজেরই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। রাশিয়ার সাম্যবাদ বা সাধারণ সমাজতন্ত্রবাদ সমস্ত সমাজেরই শিক্ষিত যুবকদের মনে মায়া বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু ইহার গভীরতা বা স্থায়িত্ব কতটুকু? ইহারা কি ফ্যাশানের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মর্মমূল পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারিয়াছে; মতবাদের সীমা ছাড়াইয়া কি জীবনদর্শনের মর্যাদায় উন্নীত হইতে পারিয়াছে? ক্লাবে-হোটেলে, ভোজনাগারে বা শিক্ষায়তনে এগুলি বিচার-বিতর্ক-আলোচনার বিষয়। কিন্তু সাধারণ মনে ইহারা কি গভীর রেখাপাত করিতে পারিয়াছে? ইহারা সময় সময় ঝড় তোলে, বিপর্যয় আনে, সংঘর্ষ জাগায়, কিন্তু যে শান্ত, নিয়মিত বায়ুপ্রবাহ আমাদের নিঃশ্বাস-গ্রহণের পটভূমিকা, আমাদের গভীরতম হৃদ্‌স্পন্দনের নিয়ামক, ইহারা কি সেই পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে? হয়ত আমাদের অনেকের মনের গতি ক্রমশঃ ইহাদেরই অভিমুখী হইতেছে, কিন্তু এই দোলায়িত চিত্তবৃত্তি কি সমাজ-মনের খাঁটি প্রতিচ্ছবি?

উপন্যাসে এই জাতীয় সমস্যা-আলোচনায় আর একটা বিপদ আছে—ইহাতে আমাদের মননশক্তি সৃষ্টিশক্তির ছদ্মবেশ পরিয়া আত্মপ্রতারণা করে।

আমাদের যে বুদ্ধি তর্ক করে, আর যে নিগূঢ়তর শক্তি সৃষ্টি করে,—উভয়ের মধ্যে সীমারেখা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। উচ্চমঞ্চে চড়িয়া ভাবি গৌরীশংকরের শৃঙ্গে উঠিলাম; মননশীলতার কোদালি দ্বারা মানবজীবনের উপরিভাগে দুইফুট জমি খনন করিয়া মনে করি মানবচিত্তের গহন তলে অবতরণ করিলাম। কাজেই মানবজীবন লইয়া আলোচনা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহার অন্তর-রহস্য অনাবিষ্কৃতই থাকে।

আজ স্বাধীনতা-লাভের পর আমাদের সাহিত্যের উপর নূতন দায়িত্ব পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য ভাবানুসরণের বাইরের পালিশের নীচে হিন্দু-মুসলমানের সত্যিকার কোন অন্তর-সত্তা আছে কিনা তাহার খোঁজ লইতে হইবে। মতবাদ ও রাজনৈতিক সংঘাতই কি আমাদের সত্য ও সম্পূর্ণ পরিচয়? জলের টগ্‌বগে, বুদ্বুদকণ্টকিত অবস্থাই কি তাহার চিরন্তন সত্তা? এই ধাতব-পদার্থ-মিশ্র উষ্ণ প্রস্রবণই কি হৃদয়কুম্ভ ভরিয়া লইবার একমাত্র উৎস? সাময়িক ভাবোন্মাদনাই কি হৃদয়স্পন্দনের সত্য পরিমাপক? আজ অসুচিত-বৈদেশিক-প্রভাবমুক্ত সাহিত্যকে এই সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে।

'চৌচির' ছাড়া আবুল ফজলের আর দুইখানি উপন্যাসে ঠিক মুসলমান চিত্তের ছবিটি পাই না। মুসলমান সমাজের রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, সমাজ ও পরিবার জীবনের বৈশিষ্ট্য, ইহার সাধারণ জীবনের গতিছন্দ; ইহার সুস্থ মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উৎসব-পর্বদিনের আনন্দ-সমারোহ, অধ্যাত্ম-আদর্শের উৎকর্ষ ও আকর্ষণীয়তা—আজ এই সমস্তই শক্তিশালী মানব-চরিত্রাভিজ্ঞ মুসলমান লেখকের বিষয় হইবার আবেদন জানাইতেছে। এই আবেদন যদি মুসলমানী সাহিত্যে স্থান পায় তাহা হইলে এক নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে। বর্তমান লেখকের মামুন, হাসিম, হেনা ও 'সাহসিকার' যৌবন-রসমত্ত তরুণ ছাত্রবৃন্দ—ইহাদের উপর কোন দেশের বা সমাজ-সংস্থিতির ছাপ নাই; ইহাদের জীবনে চরিত্রের যেটুকু উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা একটা অহেতুক চিত্ত-চাঞ্চল্য, একটা অজানা উন্মাদনা, একটা বস্তুর আশ্রয়হীন বায়ব্য উচ্ছ্বাস।

লেখকের কৈফিয়ৎ হয়ত এই যে মানব-প্রকৃতি সব দেশেই এক এবং অধুনা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে এই একত্ব আরও দৃঢ়ীভূত হইতেছে; কিন্তু কাব্য-সাহিত্যে মানব-প্রকৃতির যে রসরূপ তাহা জাতীয় ও সাংস্কৃতিক

বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়াই সার্বভৌমত্বে উন্নীত হয়। লেখক নিজের দেশের ছবি আঁকেন; তাহা যদি যথার্থ সৃষ্টি হয় তবে তাহার মধ্যে এমন একটা চিরন্তনতা থাকে যে সকল দেশের লোকই সেই ছবিকে আপন দেশের বলিয়া চিনিতে পারেন। ডিমের খোলার শক্ত আশ্রয়ে অণ্ডজ প্রাণীর প্রাণ-শক্তির স্ফুরণ বা রুক্ষ-কর্কশ বৃক্ষশাখার মধ্যে পুষ্পোদ্‌গমের ন্যায় জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দৃঢ় আবেষ্টন-রেখার মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টির সার্বভৌম আবেদনের রহস্য নিহিত থাকে। জাতির মর্মকথার মধ্যেই সার্বজনীনতার সুর ধ্বনিত হয়। যেমন শূন্যে ফুল ফোটে না, তেমনি জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে অসম্পর্কিত, সদ্যজাত ভাবরাশির অস্পষ্ট বাষ্প-বেষ্টনীর মধ্যে উচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি হইতে পারে না। ভবিষ্যতের সাহিত্যিককে জাতির প্রাণ-শক্তির উৎসমূলে, ইহার জীবন-দর্শনের গভীর অবচেতন স্তরে নামিয়া তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইবে। শক্তিশালী মুসলমান লেখক সত্যিকার যুগপ্রয়োজন নির্ধারিত করিয়া মুসলমান জীবনের এমন সমস্ত দিকের সাহিত্যিক রূপায়ণ করিবেন যে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক অপূর্ণতা সংশোধিত হইবে ও হিন্দু-মুসলমান উভয়ের অবদানে সমভাবে পুষ্ট, উভয়ের অর্ঘ্যসম্ভারে পূজিত হইয়া সাহিত্য-জননী উভয়কেই সন্তান বলিয়া নিজ ক্রোড়ে টানিয়া লইবেন এবং যে দুই ভাই আজ বৈষয়িক স্বার্থে পৃথক হইয়াছে তাহারা ভাব ও চিন্তা-রাজ্যে আবার এক হইবে। এই সাহিত্যিক-সংযোগের স্বর্ণ-সূত্রই দেশ-ব্যবচ্ছেদের পরেও আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উত্তরাধিকারকে এক ও অবিভক্ত রাখিবে।

জীবনরসিক বিভূতিভূষণ

(১)

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে দুইজন বিভূতিভূষণ—বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়—স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করিবার কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিভার বিভূতি এই সাহিত্যের ভূষণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতিকে এক নূতন চোখে দেখিয়া জীবনের

সহিত প্রকৃতিকে একাত্ম করিয়াছেন ও আমাদের ক্লান্ত, জ্বরতপ্ত জীবনে এক নূতন শান্তি ও তৃপ্তির আস্বাদন দিয়াছেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রধানতঃ হাস্যরসের স্রষ্টারূপে পরিচিত। কিন্তু তাঁহার শক্তি শুধু হাসির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে। পারিবারিক জীবনে এক গভীর অনুভূতির সুর, মানবিক সম্পর্কে এক নূতন দরদ-ভরা আবেদন, মননের এক উদাস-করুণ স্নিগ্ধতা তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য। জীবন-ছন্দের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাসির ধারাও বদলাইয়া যাইতেছে। এমন কি ঠিক অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগের হাস্যরসিক কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসুর রচনায় হাসির যে রূপ, কৌতুকের যে অনুভূতি দেখা যায় তাহা আজকাল যেন খানিকটা কল্পনা-প্রধান ও বাস্তবনিবিড়তাহীন হইয়া পড়িয়াছে। অসঙ্গতিবোধ হাসির মূল কথা, কিন্তু প্রতি যুগের এই অসঙ্গতির নূতন মাত্রা ও বিষয়-প্রকরণ নির্দিষ্ট হয়। সমাজের সাম্যাবস্থা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যদি পাল্টায় তবে উহার ব্যতিক্রমও নূতন আলোকে প্রতিভাত হইবে। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর মডেল ভগিনী বা চিনিবাস চরিতামৃতে, অথবা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভলাণ্টিয়ারি-কাব্যে যে সমস্ত বিসদৃশ অসঙ্গতি হাস্যরস ও শ্লেষের কারণ ছিল, এখন তাহারাই অনেকটা সমাজজীবনের সহজ রূপ। মেয়েদের শিক্ষা আজকাল উচ্ছৃঙ্খলতার নিত্য সহচর নয়, বা স্বাধীনতা-প্রীতিকে এখন আর শূন্যগর্ভ ভাববিলাসরূপেও অভিহিত করা চলে না। অতীতের অনেক উৎকেন্দ্রিকতা, অনেক অসামাজিক মনোভাব, অনেক বিশৃঙ্খল উপাদান এখন সমাজের স্বাভাবিক ছন্দের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, এবং সমাজের এই নূতন-ছন্দ-সামঞ্জস্য আবার সূক্ষ্মতর অসঙ্গতিবোধকে উদ্রিক্ত করিতেছে। কাজেই এখনকার সমাজের সঙ্গতি-আদর্শের পটভূমিকায় হাসির নূতন নূতন রূপ, অভিনব প্রকরণ অভিব্যক্ত হইতেছে।

বিভূতিভূষণের হাসি প্রধানতঃ পারিবারিক জীবনের রসসম্ভূত। পরিবারস্থ কোন একজন ব্যক্তির একটু বিশেষ খেয়াল বা রুচিবিকার বা অদ্ভুত আচরণ পরিবার-জীবনে যে একটা স্নেহকৌতুকমিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহাই তাঁহার রসিকতার প্রধান উপজীব্য। তাঁহার রাণু-বিষয়ক গল্পগুলিতে ছোট মেয়ের অকাল-গৃহিণীত্বের নকল, তাহার গাম্ভীর্যের আড়ম্বর ও অতিরিক্ত

হিসাবী মনোভাব তাঁহার রসিকতার একটি প্রধান উপাদান। ছোট রাণু একদিন বিবাহের বানারসী পরিয়া নকল হইতে আসল গৃহিণীতে উন্নীত হইয়া তাহার স্রষ্টার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; তাহার বিদায়দৃশ্যে তাহার ছেলেখেলার সব অভিনয়গুলি স্মৃতিতে উদ্বেলিত হইয়া হাস্যরসকে করুণরসে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু রাণু হইতে যে ধারার সূত্রপাত রাণুর বিদায়ের পরও সেই পারিবারিক জীবনের স্নেহনির্ঝর-বিকীর্ণ হাস্যের শীকর-বিন্দু শুষ্ক হইয়া যায় নাই। তাঁহার স্বনির্বাচিত, সুতরাং তাঁহার বিচারবুদ্ধি ও স্নেহপক্ষপাত দ্বারা অনুমোদিত গল্পসমষ্টির মধ্যে 'রণরঙ্গিণী', 'শ্বশুরমন্দিরম্', 'ঘৃততত্ত্ব' ও 'জালিয়াত' পরিবারজীবনে হাস্যরসের যে অবসর বিদ্যমান তাহারই সুযোগ লইয়াছে। আড্ডাধারী স্বামীর প্রতি উগ্রচণ্ডা স্ত্রীর যে রোষবিস্ফোরণ তাহা সুপরিচিত হাস্যরসের বিষয়, এখানে বিভূতিভূষণ মজলিসের সাথীদের সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়া ও বেচারা স্বামীর আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগকে আঁকড়াইয়া ধরিবার ব্যর্থ-করুণ প্রয়াস দেখাইয়া রসটাকে একটু গাঢ় করিয়াছেন মাত্র। 'শ্বশুর-মন্দিরম্'-এ নিকট প্রতিবেশীর ছেলে-মেয়ে দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের শ্বশুরবাড়ীর দিকে অতি-পক্ষপাত দেখাইয়া ব্যতিক্রমমূলক হাস্যরস ফুটাইয়াছে। পুকুরঘাটে বাসন মাজার ব্যপদেশে বেয়াই বাড়ীর উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করার দৃশ্যটি খুবই উপভোগ্য। শেষকালে জামাই শ্বশুরবাড়ীর তত্ত্বের দোষ সারিবার জন্য নিজের ভাণ্ডার হইতেই অভাব মোচন করিয়াছে ও পুত্রবধূ শ্বশুরের কাছে সে গোপন রহস্য ফাঁক করিয়া তাঁহার কুটুম্ববাড়ীর মিষ্টান্ন-ভোজনের আত্মপ্রসাদকে ম্লান করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছে। 'ঘৃততত্ত্ব'-এ যে ব্যক্তি হবু-বেয়াইকে ফাঁকির ব্যবসায়ে ব্রতী করিতে চাহিয়াছিল ও টাকা বাহির করার উপায়-স্বরূপ ছেলের বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহার উপর বোবা মেয়ে গছান হইয়া তাহার কুমতলবের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। 'জালিয়াত' গল্পটিতে এক পাড়াগেঁয়ে ও শহর-বিমুখ নববধূ বাপের বাড়ী যাইবার অনুমতি-আদায়ের জন্য বাপের হস্তাক্ষর নকল করিয়া মায়ের মিথ্যা অসুখের সংবাদ পত্রটিতে সংযোজনা করিয়াছে। এই সমস্ত গল্পে হাস্যরসটি সব সময় স্বতঃস্ফূর্ত হয় নাই, কোথাও কোথাও সচেষ্ট প্রয়াস ও ঘটনা-সংযোজনার কৃত্রিমতার সন্দেহ জাগে।

(২)

আধুনিক জীবনযাত্রা ও সমাজরীতির জটিলতা যে নূতন রকমের হাস্য-রসের ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে বিভূতিভূষণ তাহার প্রতি যথোচিত মাত্রায় সচেতন। 'আলট্রা' গল্পে একই কলেজের পড়ুয়া ছেলে-মেয়ের বিবাহ-সম্বন্ধ চলিতেছে এবং ছেলে নিজে পাত্রী দেখিতে গিয়া স্টেশনে সহসা পূর্বপরিচিত বান্ধবীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে ও দুজনে একই গরুর গাড়ীতে কলেজজীবনের কথা আলোচনা করিতে করিতে যখন বাড়ীর খুব কাছাকাছি পৌছিয়াছে তখনই পরস্পরের উদ্দেশ্য ও সম্ভাবিত সম্পর্কের কথাটি ফাঁস হইয়া গিয়াছে। গল্পটি উপভোগ্য, বিশেষতঃ মেয়েটির উগ্র আধুনিকত্ব বেশ খানিকটা কৌতুকের সৃষ্টি করে। কিন্তু ঘটনা-বিন্যাসের মধ্যে যেন খানিকটা অবাস্তবতা আসিয়া গিয়াছে। ছেলে ও মেয়ে এক কলেজে পড়িয়াও কি তাহাদের মধ্যে বিবাহের কথাবার্তা-সম্বন্ধ ও পাত্র ও পাত্রীর পরিচয় সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিল? উহারা যেন একদিকে অতি-আধুনিক ও অপরদিকে অত্যন্ত সেকেলে। দ্বিতীয়তঃ ছেলে এক ট্রেনে আসিবে আর যাহাকে দেখিতে আসা সেই মেয়ে পরবর্তী ট্রেনে পৌছিবে এরূপ ব্যবস্থা অন্ততঃ অভিভাবকদের কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় বহন করে না। মনে হয় যেন হাসির রস-নিষ্কাশনের জন্য লেখক ঘটনার প্যাঁচ একটু বেশি করিয়া কষিয়াছেন। 'গ্রামসংস্কার' গল্পে শৈল পণ্ডিতের গ্রাম্য মোড়লি ও নব্য যুবকদের চিত্রতারকাদের লইয়া মাতামাতি—উভয় আখ্যানই স্বতন্ত্রভাবে বেশ স্বাভাবিক ও হাস্যরসের উদ্দীপক। কিন্তু মনে হয় যে, ঐ দুই ঘটনার মিল ঘটাইয়া লেখক একটু অসুচিত রকমের ঘটকালি করিয়াছেন। চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য-বিচারের পিছনে যতই উত্তেজনা সঞ্চিত থাকুক না কেন, উহা যে এক গ্রাম্য পণ্ডিতের পণ্ডিতলীলার অকাল অবসান ঘটাইবে ইহা একটু অবিশ্বাস্য বলিয়াই ঠেকে। মঙ্গলগ্রহে আগুন লাগিলে পৃথিবীর কুঁড়েঘর সেই অগ্নিকাণ্ডে না পোড়াই সম্ভব। 'ফিট-অব-প্রিসেপট্যার' গল্পটি যেমন মৌলিকতায় উজ্জ্বল, তেমনি স্বাভাবিক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্বন্ধে আমেরিকার সৈনিকগোষ্ঠীর অসম্ভব রকমের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসপ্রবণতা একটু অতিরঞ্জন-স্ফীত হইলেও অনেকটা বাস্তবতথ্য-সমর্থিত। মহাযুদ্ধের সময় অনেকে আমেরিকান সৈনিকদের ঠকাইয়া বেশ-কিছু উপার্জন করিয়াছিলেন। বিভূতিভূষণ প্রকৃত হাস্যরসিকের সুযোগ-

সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া এই ব্যাপারটিকে হাস্যরস-সৃষ্টির কাছে লাগাইয়াছেন। 'গড়ের বাদ্যি' গল্পে মধ্যযুগীয় জমিদার-গোষ্ঠীর খেয়ালও যেমন যথাযথ ও সরসভাবে বর্ণিত হইয়াছে, উহার অতর্কিত পরিবর্তনের নাটকীয়তার চমকও তেমনি সুন্দর ফুটিয়াছে। স্বরূপ মণ্ডলের বর্ণনাভঙ্গীও অনবদ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক। তবে তাহার মত অশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর পাড়াগেঁয়ে লোকের পক্ষে সে একটু বেশী চতুর ও মনস্তত্ত্ববিদ্। সে শুধু গল্প বলে না, তাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করে; আধুনিক গল্প-লেখকের ন্যায় ঘটনার পশ্চাৎপট উদ্‌ঘাটিত করে ও উহার সঙ্গে বেশ তীক্ষ্ণ সরস মন্তব্যও জুড়িয়া দেয়। সুতরাং তাহার গ্রাম্য বাগ্‌রীতি ও অশিক্ষিতজনোচিত শব্দপ্রয়োগের অন্তরালে তাহার লেখকের বেনামদারিত্ব ধরা পড়িয়া যায়।

'ওরা ও আমরা' ও 'গোবিন্দ মাসী' গল্পে পল্লীজীবনের কুঁদুলে দিকটা চমৎকার ফুটিয়াছে। ইহা একটু আশ্চর্যের বিষয় যে গ্রাম্য কোন্দলে বিবদমান নারীদের মুখ হইতে যে অজস্র ও বিচিত্রশব্দাত্মক গালাগালির স্রোত নির্গত হয়, তাহা শ্রোতাদের মনে হাসিরই উদ্রেক করে। এ যেন বিষ-প্রস্রবণ হইতে রসনাতৃপ্তিকর আস্বাদনের অনুভূতি। ইহার কারণ বোধ হয় ঝগড়ায় উভয় পক্ষেরই বেসামাল অবস্থা, উত্তেজনার আতিশয্যে সুস্থ আত্মনিয়ন্ত্রণের আদর্শ হইতে সাময়িক বিচ্যুতি। তাছাড়া, সচরাচর, জীবনের শান্ত অবস্থায় যে সমস্ত শব্দ শোনা যায় না, সেই তেজস্ক্রিয় ও সময় সময় অর্থহীন শব্দপ্রয়োগের অনর্গলতা ও স্বভাবনৈপুণ্য মনে একটা পুলকমিশ্রিত বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বালুকণার ন্যায় যে সমস্ত নিরীহ শব্দ গতানুগতিক প্রয়োজনের পদতলপিষ্ট হইয়া ভূমিশয্যায় গড়াগড়ি দেয় তাহারাই যখন আতপ-তপ্ত ও প্রবল ঝড়ে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পথিকের অঙ্গে সূচিবোধের জ্বালা অনুভব করায়, তখন নিরাপদ আশ্রয়ের অন্তরালবর্তী দর্শকের মনে যে নিশ্চিত কৌতুকবোধ জাগে ইহা যেন অনেকটা তাহারই অনুরূপ। অনেক সময় উপলক্ষ্যের তুচ্ছতা ও বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশ-অভিযোগের উর্ধ্বে একপ্রকার দার্শনিক নির্লিপ্ততার আভাস কৌতুকরসকে আরও ঘনীভূত করে। 'ওরা ও আমরা' গল্পে ছেলেখেলার ঝগড়া যখন বয়স্ক অভিভাবকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে তখন মাত্রাজ্ঞানহীন প্রচণ্ড জিদের জন্য যে কৌতুকাবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়

তাহারই সরস বর্ণনা আছে। ইতিমধ্যে যাহাদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত তাহারা কিন্তু সমস্ত মিটমাট করিয়া আবার খেলায় মাতিয়াছে। এ যেন ঝটিকার উদ্ভব-কেন্দ্র মৃদু-পবন-ব্যজিত, কিন্তু যে প্রত্যন্ত প্রদেশে উহার গতিবেগ ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা তাণ্ডবলীলায় বিপর্যস্ত। আর 'গোবিন্দ মাসী'-তে কলহের একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ দার্শনিক নির্লিপ্ততা ফুটিয়া উঠিয়াছে—ঝড়ের বেগে উচ্চারিত অভিশাপ ও কটুভাষণগুলি নিরবলম্ব ব্রহ্মের ন্যায় নিছক উদ্দেশ্যহীনভাবে বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

বিভূতিভূষণ মাঝে মাঝে পরশুরামের প্রভাবে উদ্ভট কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়াছেন—যেমন 'নারায়ণী সেনা'-য়। কিন্তু এ জিনিসটা ঠিক তাঁহার প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। কল্পনায় মশগুল হইয়া তিনি বাস্তবকে ভুলিতে পারেন না—কাল্পনিকতার ধূম্রলোক নিবিড় নিশ্ছিদ্র হইয়া বস্তুজগৎকে আবৃত করে না। 'দন্ত-কাব্য'-এ তিনি চীনা সমাজ-রীতি ও আদব-কায়দার একটি চমৎকার ব্যঙ্গাতিরঞ্জিত চিত্র আঁকিয়াছেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁহার হাস্যরস-প্রবণতা পল্লীজীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়াইয়া এক বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়াছে।

(৩)

বিভূতিভূষণের ইদানীন্তন রচনাগুলি কিন্তু ঠিক হাস্যরসপ্রধান নহে। হাস্যরসিকের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত এক পরিণত প্রজ্ঞা ও জীবনদর্শন ইহাদের মধ্যে সমন্বিত হইয়াছে। এখানে যেন কৌতুকরস বাহিরের উতরোল প্রকাশ হইতে প্রতিহত হইয়া অন্তরে ফল্গুধারার ন্যায় প্রচ্ছন্ন আছে ও ইহার পরোক্ষ প্রভাবে সমস্ত জীবন-পর্যালোচনাকে স্নিগ্ধমননমণ্ডিত ও রুচির উদারতায় বিচিত্র অভিজ্ঞতার রসগ্রাহী করিয়াছে। হাস্যরসিক যখন দার্শনিকতার পর্যায়ে ওঠেন, তখন তাঁহার মধ্যে একটা সংস্কারমুক্তি, একটা নিস্পৃহতা, ছোট-বড়, ভাল-মন্দের ভেদোত্তীর্ণ, সর্বক্ষেত্র-প্রসারিত একটি রসানুভবশীলতা দেখা দেয়। বিভূতিভূষণের সাম্প্রতিক রচনা 'দুয়ার হ'তে অদূরে' (ভাদ্র, ১৩৫৯) ও 'কুশীপ্রাঙ্গণের চিঠি' (আশ্বিন, ১৩৬০)-তে এই প্রবণতাটি পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থটি কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে লেখকের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত। ঘটা করিয়া লেখা,

অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার সমাবেশে রোমাঞ্চকর ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে ইহার একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। ফলতো মেলে চাপা রেলগাড়ীতে ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মন্থর জীবন-রোমন্থন, অবাধ পর্যবেক্ষণ, এমন কি পায়ে হাঁটিয়া স্বেচ্ছাবিচরণেরও প্রচুর অবসর দেয়। লেখক ভ্রমণ-ব্যপদেশে এই সমস্ত সুবিধার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। সুদূর পল্লীঅঞ্চলে, ঘনবিন্যস্ত শ্যামল বনানীর ফাঁকে ফাঁকে বাঙালীর খাঁটি পরিচয়ের, অবিকৃত জীবন-ধারার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা লেখক দুই চক্ষু দিয়া গ্রহণ ও সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছেন। এখানে যেটুকু কৌতুকরস আছে তাহা অতি-প্রকট নহে, লেখকের মনের অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছে। অবিমিশ্র হাসির চাটনি ক্লান্ত মনো-রসনায় নূতন স্বাদ আনে; কিন্তু ইহাতে পরিপূর্ণ ভোজনের তৃপ্তি আসে না। হাসির হাল্‌কা হাওয়ায় যে ধূলা ওড়ে, তাহাতে জীবনের সমগ্র রূপ যে খানিকটা আড়াল পড়িয়া যায় তাহা অস্বীকার করা যায় না।

জীবন-বিধাতা হয়ত জীবনকে হাস্য-কেন্দ্রিক করিয়া গড়েন নাই, কাজেই হাস্যরসিকের তির্যক্ দৃষ্টিতে জীবনের সত্যরূপ প্রতিভাত হয় না। কিন্তু হাস্যরস যদি জীবনদর্শনের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া যায়, যদি ইহাকে একচ্ছত্র প্রাধান্য না দিয়া ইহাকে জীবন-তাৎপর্য-নির্ধারণের একটি সহায়ক শক্তিরূপে প্রয়োগ করা হয়, যদি ইহা জীবন-বিচারের কঠোরতাকে মোলায়েম করে ও উৎকট নীতিবাদ বা আদর্শবাদের অত্যুৎসাহকে সংযত করে, যদি ইহা জীবনের নিকট বেশী আশা না করিয়া যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকার মনোভাবকে পুষ্ট করে, তবে হয়-ত ইহা জীবন-রহস্যের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত পৌছিতে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে। জলে ভিজাইলে যেমন শক্ত নখ কাটা সহজ হয়, তেমনি জীবন-নিরীক্ষা হাস্য-রসসিক্ত হইলে জটিলতার গ্রন্থিচ্ছেদনে অনেকটা সাফল্য লাভ করে। বিভূতিভূষণ তাঁহার পরিণত বয়সের রচনাতে হাসির স্নেহরসে জীবনদর্শনের প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি ঔপন্যাসিকের কর্তৃত্ববুদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণাভিমান বর্জন করিয়া খণ্ডচিত্রের ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া জীবনের সহজ রূপটি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। জীবনরহস্যের মর্মমূলে পৌছিবার কোন সিংহদ্বার নাই; অন্তঃপুর-লীলার কিছুটা জানিতে হইলে খিড়কির দরজায় উঁকি মারিতে হইবে। বড় ঘটনার জাল ফেলিয়া ও উহাকে চরিত্রের দৃঢ় খুঁটিতে আবদ্ধ

করিয়া জীবনলীলার যে রুইকাতলা মাছগুলিকে ধরা হয়, তাহারা আয়োজনের বাহুল্য ও ফাঁদ-পাতার অতি-কৌশলের জন্য অনেকটা নিষ্প্রাণ, খাবি-খাওয়া অবস্থাতেই পাঠকের বোধশক্তির ডাঙ্গাতে উত্তীর্ণ হয়। বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও কৌতূহলের জন্যই যেন ইহারা সহজ প্রাণের ছন্দটি হারাইয়া ফেলে। অল্প জলে ও স্বল্প চেষ্টায় যে সফরী-জাতীয় মাছগুলি ধরা যায় তাহাদের জীবনীশক্তি অনেকটা অক্ষুণ্ণ থাকে। সেইজন্য এই রচনাগুলিতে লেখক জীবনের খণ্ড চিত্রেই, ইহার সহসা-উদ্ঘাটিত ও দ্রুত অন্তর্হিত বিকাশ-চমকগুলিতেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার আখ্যানগুলি আর স্বপ্রধান নহে, মননসমুদ্রে ভাসমান স্বতন্ত্র দ্বীপ; ইহারা পুরাপুরি খাদ্য-আয়োজনের পর্যায়ভুক্ত নহে, পিষ্টকে ভরিয়া দেওয়া মসলার স্বাদবর্ধক উপাদান মাত্র (Plums in the pudding)। জীবনকে গোটা গলাধঃকরণ করা যায় না। ইহার খণ্ডাংশকে চাখিয়া চাখিয়া ইহার স্বাদ বুঝিতে হইবে —লেখক যেন জীবন-পর্যালোচনের এই নীতিই গ্রহণ করিয়াছেন।

পরবর্তী গ্রন্থ 'কুশী-প্রাঙ্গণের চিঠি'-তে লেখকের অবলম্বিত এই নূতন রীতি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অবশ্য পূর্ববর্তী গ্রন্থের সহিত তুলনায় ইহার বিষয়ের গুরুত্ব অনেক বেশী। কুশী নদীর মুহুর্মুহু গতিপথ-পরিবর্তনে ও ইহার অগণিত শাখা-পথের অনুপ্রবেশে সমস্ত মিথিলার ভৌগোলিক সংস্থানের যে আশ্চর্য রূপান্তর ঘটিয়াছে ও এই দৃশ্যাবলীর প্রতি কয়েক মাইলের ব্যবধানে অভাবনীয়রূপে বদলাইয়া-যাওয়া রূপ-বৈচিত্র্যে লেখকের মনে যে জীবন-মনন জাগিয়াছে তাহাই বইখানির উপজীব্য। ইহার মধ্যে মিথিলার প্রাচীন কীর্তির অনুসন্ধান, প্রবাসী বাঙালী সমাজের জীবন-ধারার ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হওয়ার কাহিনী, লেখকের পূর্বস্মৃতি-রোমন্থন, স্থানে স্থানে প্রকৃতির এই রুদ্রলীলার সম্মুখীন মানবজীবনের কুণ্ঠিত, করুণ আবেদন ও সাময়িক রসোচ্ছলতা মিশিয়া গিয়া এক অপূর্ব ভাবুকতার সৃষ্টি হইয়াছে। দ্রুতপরিবর্তনশীল দৃশ্যাবলী—মরুভূমির দিগন্তব্যাপী বালুকাবিস্তার, দূরে দূরে শ্যামলতার একটু ক্ষীণ রেখা, ক্ষুদ্র নদীর একটু ঝিরঝিরে জলধারা, এখানে-ওখানে ছড়ান কয়েকটি কুটিরে মানব অস্তিত্বের আশ্বাসবাহী নিদর্শন, রহিয়া রহিয়া জীবন-মমতার অদম্য উচ্ছ্বাস—লেখকের সংবেদনশীল, সূক্ষ্ম-অনুভূতিসম্পন্ন মনের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া একটি অপরূপ ভাবমুগ্ধতার সুরসঙ্গতি

রচনা করিয়াছে। আবার বর্ষাস্ফীত কুশীর ধ্বংসলীলা, উহার জনপদবিধ্বংসী প্লাবনের উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাস লেখকের মনে যে রহস্যবোধ, যে বিস্ময়স্তম্ভিত অনুভূতি জাগাইয়াছে তাহাই যেন নদীর দুর্বার-শক্তি-পরিমাপের একটা মানবিক মানদণ্ডরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। প্রকৃতির বিরাট অপরিমেয় শক্তি মানুষের মনে কিরূপ ছাপ রাখিয়া গেল, উহার অনুভবশক্তির সূক্ষ্মতন্তুজালে কিরূপ আলোড়ন জাগাইল, উহার জীবনবোধের তন্ত্রীর উপর কিরূপ ভাবমূর্ছনা ঝঙ্কৃত করিল, তাহাই উহার একমাত্র সত্য পরিমাপ। হিমালয়ের উচ্চতাকে ফুট গজ দিয়া মাপিলে, ভাবনিরপেক্ষ বস্তুতান্ত্রিক বিচারের আওতায় ফেলিলে ইহা কি মানুষের মনে কোন রেখাপাত করিতে পারে? লেখক যেমন কুশীনদীর বাহিরের রুদ্ররূপের চিত্র দিয়াছেন, তেমনি তাঁহার মনের পরতে পরতে, অনুভূতির স্তরে স্তরে ইহা যে বিরাট, বোধাতীত রহস্যের কম্পন রাখিয়া গিয়াছে তাহারও ছবি আঁকিয়াছেন, এবং এই দুইয়ে মিলিয়া আমরা সমস্ত ব্যাপারটির কল্পনা করিতে পারি। এই প্রলয়পয়োধি জলের মধ্যে তিনি মানুষের শেষ আশ্রয়স্বরূপ জীবনাকৃতির নিমগ্নপ্রায় দ্বীপপুঞ্জগুলিও দেখাইয়াছেন, এবং এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ফাঁকে ফাঁকে সাধারণ জীবন-যাত্রার বর্ণনা দিয়াছেন ও তাঁহার কৈশোর জীবনের জীবনরসোচ্ছল দৃশ্যগুলিকে স্মৃতির সাহায্যে পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। বিরাট ও অসাধারণের পটভূমিকায় ছোটখাট সাধারণ জীবনের সন্নিবেশ বৈপরীত্য-রীতিতে উভয়েরই রূপ খোল্‌তাই করিয়াছে। হিমালয়ের ঝুঁকিয়া-পড়া শৃঙ্গে একটা পর্ণকুটীর, কিংবা কুতুবমিনারের মাঝামাঝি একটা পাখীর বাসা ভাবাসঙ্গগুণে যেমন বড়র উত্তুঙ্গতা চেনায়, তেমনি ছোটরও দর্শনীয়তা বাড়ায়। বর্ণনা ও বিস্ময়োক্তির ফাঁকে ফাঁকে জীবন সম্বন্ধে গভীর অর্থপূর্ণ, মননশীল মন্তব্য গ্রন্থখানিকে জীবনভাষ্যের মর্যাদা দিয়াছে। আমরা অনুভব করিতে পারি যে এই পরিণত জীবন-রসিকতার মূলে আছে হাস্যরসের নির্মল প্রসন্নতা। কুশীকে যাহারা অভিশাপ দেয়, লেখক তাহাদের দলে নহেন। বরং সে যে লোকের ক্ষতি করিতেছে তাহা স্বেচ্ছায় নহে, পৌরাণিক যুগের ঋষি-শাপের প্রভাবে—এই তাঁহার ধারণা। কুশীর যে অন্ধ সংহারলীলা, তাহার অপসরণের পিছনে সে যে দিকচিহ্নহীন মরু-প্রান্তর ফেলিয়া যায় ইহা সেই অজেয় জীবনেরই একটা নিগূঢ় সত্যের প্রকাশ। ইহা জীবনকে যেমন

উৎসাদন করে তেমনি আশ্রয়ও দেয়—জীবনমৃত্যুর ছন্দপর্যায়গ্রথিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত লেখক কুশীর সৃষ্টি-প্রলয়তত্ত্বকে অনুভূতির একই সূত্রে সমন্বিত করিয়া ইহার লীলারহস্যের প্রকৃতি ও তাৎপর্যটি আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এইখানেই গ্রন্থটির সার্থকতা। বিভূতিভূষণের রচনার এই যে নূতন পর্যায় দেখা দিয়াছে, উহা আরও কিরূপ বিবর্তনের স্তর অতিক্রম করিয়া চরম পরিণতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহা পাঠকের সাগ্রহ প্রতীক্ষার বিষয় হইবে।

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস

উপন্যাসের অতি-প্রসার ও মাত্রাতিরিক্ত জনপ্রিয়তার যুগে এমন অনেক লেখক উপন্যাসক্ষেত্রে আকৃষ্ট হন, যাঁহাদের রুচি ও মনীষা ঠিক উপন্যাসের স্বভাবধর্মের অনুবর্তী নহে। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিম-যুগে এই জাতীয় লেখক ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র। আমার মনে হয় যে প্রবোধকুমার সান্যালকেও এই শ্রেণীর লেখকের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে H. G. Wells ও G. K. Chesterton ও এই পর্যায়ে পড়েন। ইঁহাদের জীবন-কৌতূহলের মধ্যে একটু নির্লিপ্ততা, একটু কল্পনার মায়া-লীলা লক্ষ্য করা যায়। জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ উপপত্তি (theory) লইয়া, সমাজ-বিন্যাসের একটা অচিন্তিতপূর্ব রূপকল্পনার প্রেরণায় ইঁহারা জীবন-পর্যালোচনায় অগ্রসর হন। ইঁহারা জীবনকে দেখেন হয়ত সত্যানুগ দৃষ্টিতে, কিন্তু একটু তির্যক্ ভঙ্গীতে। জীবনের ভাল-মন্দ, হাসিকান্না, নিয়ম-বিশৃঙ্খলা সব লইয়া ইহার সমগ্রতা হইতে ইঁহারা রস আহরণ করেন না, জীবনের যতটুকু খণ্ডাংশে ইঁহাদের পূর্বনির্ধারিত মানস কল্পনা সমর্থিত হয়, ততটুকুর প্রতি ইঁহাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। জীবনকে ইঁহারা দেখেন, কিন্তু একটু সূক্ষ্ম ব্যবধানের অন্তরাল হইতে; নানা অপ্রত্যাশিত অবস্থার মধ্যে ইহার যে অতর্কিত বিকাশ ঘটে তাহাতেই তাঁহাদের সত্যিকার আগ্রহ। জীবন-গ্রন্থের কয়েকটি পাতা, জীবন-নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যাবলী অবলম্বন করিয়াই ইঁহাদের বিশিষ্ট জীবনদর্শন গড়িয়া ওঠে। মানবিক রসের গাঢ়তাকে

অন্তরের ভাব-কল্পনার সংযোগে কিঞ্চিৎ ফিকে করিয়া, উহার পরিচিত স্বাদে নূতন মশলার সাহায্যে কিছুটা অনাস্বাদিতপূর্ব বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিয়া, ইঁহারা এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধিত রসটিই তাঁহাদের উপন্যাসে পরিবেশন করিতে ভালবাসেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' যেমন তাঁহার মনোভঙ্গীর দর্পণ, প্রবোধকুমারের মহাপ্রস্থানের পথে'-ই তেমনি তাঁহার জীবন-রসিকতার বৈশিষ্ট্যের মূল উৎস। উভয়েই তাঁহাদের উপন্যাসে এই মানসপ্রবণতাই গল্পের মাধ্যমে সম্প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 'মহাপ্রস্থানের পথে' ভ্রমণকাহিনীই মুখ্য—ইহার দৃশ্য-পরিবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে, ইহার চলিষ্ণুতার গতিচ্ছন্দে ঔপন্যাসিক রস খানিকটা জমাট বাঁধিয়াছে। গ্রন্থটিতে লেখকের দার্শনিক অনাসক্তি, উদার মননশীলতা, বৈরাগ্যস্পৃষ্ট শিথিল জীবনানুসন্ধিৎসা পরিস্ফুট—ইহার মানবিক আবেগ বিচ্ছিন্ন ও পরিণতিহীন ক্ষণিকতায় পর্যবসিত। লেখক আসক্তির জালে জড়াইয়া পড়েন নাই, জীবনের গভীরে অবগাহন করেন নাই, জীবনস্রোতের কয়েকটি তরঙ্গকে তীরের নিরাপদ দূরত্ব হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-এ-ও এই উদাসীন জীবন-পর্যবেক্ষণের সুর শোনা যায়, কিন্তু আবেগের রহস্যময় গভীরতা যখন তাঁহার বৈরাগী চিত্তকে আহ্বান জানাইয়াছে, তখন তিনি এই ডাকে সম্পূর্ণ সাড়া দেন বা না দেন, এই গভীরতার পরিমাপ করিতে ভুলেন নাই, ইহার অতল রহস্যকে 'স্বীকৃতি' জানাইয়াছেন। প্রবোধকুমারের গ্রন্থে এই ক্ষণিক মোহাবেশ নিঃসঙ্গ-হিমালয়-শৃঙ্গে ইন্দ্রধনুরঞ্জিত কুহেলিকাজালের ন্যায় খানিকটা বর্ণমায়া সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু এই কুহক মিলাইতে বেশী সময় লাগে না। মনে ইহা কিছুটা দাগ কাটে বটে, কিন্তু অবিস্মরণীয় রেখায় অঙ্কিত হয় না। প্রবোধকুমারের রচনায় ভ্রমণের এই মায়া-কাটানো মানস মুক্তি, এই দেখিতে দেখিতে আগাইয়া যাওয়ার অশৃঙ্খলিত স্বাধীনতাই প্রধান আকর্ষণ; ইহাতে সহস্রবন্ধনে আবদ্ধ ঘন সম্মোহের আবেগ-আবিল বদ্ধ হাওয়া একেবারেই অনুভূত হয় না।

প্রবোধকুমারের মানবজীবনচর্চা অনেকটা পরীক্ষাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক মনোভাবপ্রসূত। কোন্‌টা সম্ভব, কোন্‌টা অসম্ভব, কোন্‌টা স্বাভাবিক কোন্‌টা অস্বাভাবিক ইহা লইয়া তিনি খুব বেশী মাথা ঘামান না।

মানুষকে নানা নূতন অবস্থার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া, নূতন আদর্শে তাহার চিত্তের সহজ গতিকে শাসিত করিয়া, মানব-প্রকৃতির পরিবর্তন-সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া তিনি নর-নারীর সম্বন্ধের মধ্যে নানা বিচিত্র অভাবনীয়তার ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহার মনন-কৌতূহল সময় সময় তাঁহার বাস্তবনিষ্ঠাকে অতিক্রম করিয়াছে। যৌন আকর্ষণের ভিত্তিকে অস্বীকার করিয়া তিনি নরনারীর মধ্যে সহজসৌহার্দ্যমূলক, লালসাহীন সম্বন্ধ অনুমান করিয়াছেন এবং এই অনুমানকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত সমাজব্যবস্থার রূপান্তর সাধন করিয়াছেন। H. G. Wells যেমন প্রাকৃতিক নিয়মের বৈপরীত্য, বিজ্ঞানপ্রসাদে মানবশক্তির কল্পনাতীত প্রসারের ভিত্তিতে মানবসমাজের এক অভিনব বিন্যাসের চিত্র আঁকিয়াছেন, প্রবোধকুমারও অনেকটা মানবের জৈব প্রবৃত্তি, সমাজবন্ধনের মূল তত্ত্বকে পাল্টাইয়া সমাজের সম্ভাবিত রূপটি প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আদিম প্রবৃত্তির আগ্নেয় উচ্ছ্বাস শান্ত, নিরুত্তাপ হইলে, সৌন্দর্যের লালসাময় মদিরতা সুস্থ দৃষ্টিকে ঘোরালো না করিলে, রক্তধারার বিদ্যুৎকণিকা হিমানীকণিকায় পরিণত হইলে সমস্ত পৃথিবীর চেহারা যে বদলাইয়া যাইত, মানবের কাব্য-ইতিহাস যে নূতন ধারায় প্রবাহিত হইত এই আনুমানিক সত্য তাঁহার উপন্যাসে ঘটনা-চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। তাঁহার 'প্রিয় বান্ধবী' উপন্যাসে এই কল্পনাটিই বাস্তব পরিবেশের কাঠামোতে রূপায়িত হইয়াছে।

প্রবোধকুমারের 'তুচ্ছ' উপন্যাসটিতে তিনি অনেকটা খাঁটি ঔপন্যাসিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়াছেন। এখানে অবশ্য তিনি একটি ছোটছেলের জবানীতে একটি সমগ্র কুলীন পরিবারের প্রাচীন-সংস্কার-শাসিত জীবনযাত্রার চিত্র আঁকিয়াছেন, ও এই পরিবার-জীবনের পটভূমিকা-স্বরূপ কলিকাতার গোড়াপত্তনের যুগে নাগরিক জীবনের সহিত পল্লী-সমাজের যে বিস্তৃততর প্রতিবেশ-বন্ধন, প্রতিবেশীর প্রতি সহৃদয় মনোভাবের সংমিশ্রণ ছিল তাহাও পরিস্ফুট করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা বৃহত্তর সমাজসত্তাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ঘটমান কাহিনীগুলি বালকের অস্ফুট, রহস্যের আঁধার-ঘেরা চেতনার মধ্যে এক দ্রুতসঞ্চারী, বোঝা-না-বোঝায় মিশ্রিত ছায়াছবির অপরূপত্ব-মণ্ডিত হইয়াছে। কুয়াসার মধ্যে দেখা দৃশ্যাবলীর ন্যায় ইহার মানবচরিত্রগুলি অতিমানব আয়তন লইয়া অতিরঞ্জিত মহিমায় দেখা

দিয়াছে। গৃহকর্ত্রী, বালকের দিদিমা, উহার উত্তরাধিকার-বঞ্চিত, অকর্মণ্য বাক্যবীর মাতুল, পাড়াপড়শীর সংসারের নর-নারী, আত্মীয়-কুটুম্বের যাতায়াত, অধিকার-বঞ্চিতা মেয়েদের ঈষৎ-অভিব্যক্ত মনোবেদনা, ছোটছেলের লোভ ও কাঙালপনা, ভালবাসার অলক্ষ্য আবির্ভাব এই সমস্ত মিলিয়া জীবনের যে বিচিত্র রূপ তাহা বালকের মুগ্ধ, বিস্ময়মণ্ডিত অনুভূতির অন্ধকার পটে উজ্জ্বল, বর্ণাঢ্য রেখায় প্রতিফলিত হইয়াছে। অবশ্য এই সত্যিকার উপন্যাস-গুণ-সমৃদ্ধ রচনায়ও প্রবোধকুমারের মৌলিক বৈশিষ্ট্যটি প্রায় অক্ষুণ্ণই আছে। তাঁহার দার্শনিক উদাসীনতা ও জীবনের তীক্ষ্ণ, মর্মান্তিক বিকাশগুলিকে পাশ কাটাইয়া ইহার বিসর্পিত, আকস্মিকের চমকপূর্ণ গতিচ্ছন্দটিকে অনুসরণ করার প্রবণতা এখানেও বালকের অনভিজ্ঞ, বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টির মধ্যে প্রকাশের অবসর পাইয়াছে। বালক জীবনকে অনুভব করে বিচ্ছিন্ন চিত্র-পরম্পরার যোগসূত্রহীন সমষ্টি হিসাবে; ইহাদের মধ্যে একটি কেন যায়, অপরটি কেন আসে, ইহাদের আলো-আঁধার, আনন্দ-বেদনার বিশৃঙ্খল শোভাযাত্রার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তাহার নিকট অজ্ঞাত; ইহারা তাহার বোধশক্তিকে উদ্রিক্ত না করিয়া তাহার কল্পনা, অনুভূতি, তাহার অফুরন্ত বিস্ময়রসেরই পুষ্টি সাধন করে। প্রবোধকুমারের অন্যান্য উপন্যাসে যেমন গৃহছাড়া পথিক, তেমনি এখানে সংসারবোধহীন বালক দার্শনিকের প্রতীকরূপে কল্পিত হইয়াছে।

প্রবোধকুমারের 'বনহংসী' তাঁহার ঔপন্যাসিক জীবনানুভূতির আর একটি প্রকাশ। সাধারণতঃ যুদ্ধকালীন বিপর্যয় আমাদের সমাজ ও মনোজীবনে যে ভাঙ্গন ধরাইয়াছে, বাংলা উপন্যাসে তাহার বহির্মুখীন, করুণরসাত্মক পরিচয়ই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অন্নবস্ত্রের অভাবে মানুষের কি নিদারুণ বেদনা, কত রকম ফন্দি-ফিকির করিয়া অত্যাবশ্যকীয় জিনিষগুলি সংগ্রহ করিতে হয়, চোরাকারবারী ও মুনাফাখোর সমস্ত জীবনের উপর কিরূপ ভয়াবহ কালোছায়া বিস্তার করিয়াছে, কোন্ বস্ত্রহীনা নারী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া অসহনীয় লজ্জার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে—বাংলা উপন্যাস এই বহির্মুখী লাঞ্ছনার, এই বস্তুগত অভাববোধের কাহিনীর অশ্রান্ত, করুণরসসিক্ত পুনরাবৃত্তি। প্রবোধকুমার এই বিপর্যয়ের গভীরতর অন্তর্জীবন-সম্পৃক্ত স্তরে অবতরণ করিয়াছেন—অর্থনৈতিক রিক্ততার সঙ্গে

জীবনের মর্যাদার অবলুপ্তি, শাশ্বত নীতিবোধ ও জীবনাদর্শের উন্মূলন, উৎকট আত্মস্বাতন্ত্র্য ও কলুষিত রুচির ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের মনস্তত্ত্ব-প্রধান রূপায়নে মনোনিবেশ করিয়াছেন। দারিদ্র্য অধঃপতনের গতিবেগকে দ্রুততর করিয়াছে ইহা সত্য কিন্তু ইহার বীজ অন্তরে অঙ্কুরিত না হইলে এরূপ সামগ্রিক ভাঙ্গন ঘটিত কি না সন্দেহ। মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্নিহিত স্থূল স্বার্থপরতা, রুচির অমার্জিত স্থূলতা, ভোগের উৎকট আকাঙ্ক্ষা ও পারিবারিক নিয়মবন্ধন মানিবার অনিচ্ছা, এক কথায় উচ্চ আদর্শের প্রতি আস্থাহীনতাই যাহা ঘটিয়াছে তাহার মূল কারণ। বাড়ীর প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে এই ঘূর্ণী বায়ুর দ্বারা নিজ নিজ প্রকৃতি-অনুযায়ী এক একটি বিশেষ রূপ উচ্ছৃঙ্খলতার পথে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে—অন্তরের কুৎসিত প্রবণতা বাহিরে নিরঙ্কুশ বিকটতায় প্রকটিত হইয়াছে। দীপেন উৎকট শোষণনীতি ও হীন প্রতারণার পথে নামিয়াছে, দ্বিজেন সোজাসুজি চুরি ধরিয়াছে। দুই মেয়েরয় মধ্যে যমুনা যৌন-লালসার অপূর্ণ স্বপ্নে ও নিষ্ক্রিয় ভাবরোমন্থনে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া অকাল-মৃত্যু বরণ করিয়াছে; ছোট বরুণা আত্মবিক্র করিয়া দুদিনের সখ মিটাইয়াছে। মা তরুবালা দীর্ঘকাল সংসার-পরিচালনার দায়িত্ব বহন করিয়া মুখ-মুচড়াইয়া-পড়া ভারবাহী পশুর ন্যায় মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে ও শেষ জীবনে অভাবের অসহনীয় চাপে তাহার চরিত্রের শালীনতা ও গৃহিণীর শাশ্বত আদর্শনিষ্ঠা হইতে স্খলিত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা শোচনীয় পরিবর্তন, ভাস্বতীর প্রতি তাহার উদার স্নেহশীলতা কদর্য সন্দেহ ও বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে। এক সংসারের কর্তা মৃগেন্দ্র আদর্শে স্থির থাকিয়া, বিনা প্রতিবাদে অভাব ও অক্ষমতার অন্ধতম গহ্বরে নামিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি বহু পূর্ব হইতেই তাঁহার পরিবারের উপর সমস্ত প্রভাব হারাইয়া নিষ্ফল আত্মধিক্কারে দগ্ধ হইয়াছেন। একটি পরিবারের জীবনে এই নীতি-বিপর্যয়ের করুণ কাহিনী উপন্যাসটিতে প্রশংসনীয় মনস্তত্ত্বজ্ঞানের, ব্যক্তিপ্রকৃতির সার্থক অনুবর্তনের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু এই নির্মম বাস্তব বিশ্লেষণের মধ্যেও প্রবোধকুমার আদর্শের স্বপ্নবিলাস, অভিনব উন্মেষের জন্য প্রতীক্ষা, অপরূপ জীবনানুভূতির জন্য স্পর্শোন্মুখতার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যে পঙ্ক সকলের দেহে মনে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে, তাহারি গ্লানিকর প্রতিবেশে এক অপূর্ব শুচিশুভ্র পঙ্কজ

ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাস্বতীর চরিত্র ও উহার সহিত অতনুর সম্পর্ক-পরিকল্পনায় লেখক তাঁহার পরীক্ষামূলক মনোভাবের, তাঁহার সর্বদা নূতনের অনুসন্ধিৎসু মানস কৌতূহলের পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমতঃ, মৃগেন্দ্রের পরিবারে ভাস্বতীর স্থান পাওয়াটাই এক অসম্ভবের ধার-ঘেঁসিয়া-যাওয়া কল্পনাবিলাসের পর্যায়ভুক্ত। ভাস্বতী এই পরিবারে রক্তসম্পর্কহীন, দৈবাগত আগন্তুক না হইলে উহাকে কেন্দ্র করিয়া ঝটিকার সমস্ত গতিবেগ, বিদ্বেষের পঙ্কিল প্রবাহের সমস্ত তরঙ্গভঙ্গ আবর্তিত হইত না। দীপেন যতই আত্মকেন্দ্রিক হউক, তাহার মায়ের পেটের বোনদের অন্ততঃ পরিবারে আশ্রয়-লাভের অধিকার সে অস্বীকার করে নাই। তারপর অতনুর সঙ্গে তাহার বিচিত্র সম্পর্ক, অতনুর অর্থে তাহার অবাধ অধিকার ও সেই অর্থের জোরে ঘরকে উপবাসী রাখিয়া বাহিরের অভাব-মোচনের অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা স্বভাবতই এই উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া-বসা পরগাছার বিরুদ্ধে তীব্র বিরূপতারই উদ্রেক করিয়াছে। অর্থানুকূল্য হইতে বঞ্চিত পরিবার তাহার স্বভাব-মাধুর্য, নিরলস সেবা ও নিঃস্বার্থ হিতৈষণার যে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় নাই ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অগ্নিকুণ্ডের মাঝে যদি একটুকরা বরফ রাখা হয়, তবে উহার শৈত্যগুণ ত অনুভূত হইবেই না, বরঞ্চ প্রতিটি শিখা উহার হিংস্র দাহন-শক্তি লইয়া এই ব্যতিক্রমধর্মী পদার্থের উপরই ঝাঁপাইয়া পড়িবে। অজ্ঞাত-কুলশীলা মেয়েকে ঘরে রাখিয়া ও উহাকে ঘরের মেয়ের সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়া, এই অজুহাতে অতনুর সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে অস্বীকৃতি মানব-চরিত্রের উদ্ভট স্ববিরোধপ্রবণতারই একটি নিদর্শন। প্রবোধকুমার এই উদ্ভট অসঙ্গতির মধ্যেই নিজ আদর্শধর্মী কল্পনাবিলাসের ভাবগত প্রেরণা ও ঘটনাগত আশ্রয় খুঁজিয়া পান।

সে যাহা হউক, ভাস্বতীর মধ্যে লেখক এই নানা বিরোধ-বিড়ম্বিত, অসংবৃত প্রবৃত্তির তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত, স্থির আদর্শের আশ্রয়হীন, আধুনিক কালের একটি যুগোচিত আদর্শকে রূপ দিতে চাহিয়াছেন। ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহা কোন স্থায়ী বন্ধনে বাঁধা না পড়িয়া চিরপথিক হইবে ও যৌন আকর্ষণের পরিবর্তে জনসেবার সূত্রে ইহার সমাজ-পরিমণ্ডল রচনা করিবে। প্রাচীন কোন আদর্শের সহিত ইহার মিলিবে না, কেন না অতীত বাস্তব পরিস্থিতি ও ভাবপ্রেরণার সঙ্গে বর্তমানের দূরতিক্রম্য ব্যবধান।

ইহা সর্বব্যাপী কলঙ্কের মধ্যে শুচি, নিরন্তর নির্যাতনের মধ্যে প্রসন্ন, আসক্তিক্ষ সংকীর্ণতার মধ্যে মুক্ত—উদার, নিয়মিত চক্রাবর্তনের মধ্যে অশ্রান্ত অগ্রগতিশীল। কোন বিশেষ আকর্ষণে যদি ইহা ধরা দেয়, সমদর্শিতার সমতলভূমির মধ্যে যদি ইহাকে কোন ভাব-বন্ধুর গিরিশৃঙ্গের দূরারোহ উচ্চতার দিকে পদক্ষেপ করিতে হয়, তখন যে ইহার কেমন রূপ ও ছন্দ হইবে তাহা কিন্তু অনির্ণেয়ই রহিয়া গিয়াছে। অতনু-ভাস্বতীর সমগ্র উপন্যাস-জোড়া বোঝাপড়ার চেষ্টা, তাহাদের ভাববিনিময়ের সুদীর্ঘ, ক্লান্তিকর, পুনরাবৃত্তির চক্রাবর্তন-ক্লিষ্ট ইতিহাসও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কটিকে ঘূর্ণমান নীহারিকার অস্পষ্টতাজাল হইতে উদ্ধার করিতে পারে নাই, কথার ঘন কুহেলিকা ভেদ করিয়া কোন স্পষ্ট রূপ অনুভূতিগম্য হইয়া উঠে নাই। দার্শনিক পরিভাষার সাহায্যে ঈশ্বরের স্বরূপ-নির্ণয়-প্রয়াসের ন্যায় এই ইঙ্গিত-সঙ্কেতে অভিব্যক্ত নূতন আদর্শও আমাদের ধাঁধায় ফেলিয়াছে। অতনু বেচারাও এই "ভাব হইতে রূপ ও রূপ হইতে ভাবে" অবিরাম যাওয়া-আসার লীলাভিনয়ে বিভ্রান্ত হইয়াছে কিন্তু আশা ছাড়ে নাই। সে একটা দুর্বোধ্য-অনিশ্চিত প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া মিলনের প্রতীক্ষা করিতেছে। অতনু নিজে একজন অসহায় দর্শক মাত্র, তাহার সমস্ত গতিবিধি ভাস্বতীর ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়ামাত্র; সে নিজে হইতে আগাইয়া কিছু করে নাই। এই পুরুষ-প্রকৃতিলীলায় হরিদাসের প্রবর্তনের দ্বারা ইহাকে খানিক মানবিক রূপ দিবার বৃথা চেষ্টা করা হইয়াছে—ইহার সবটাই অতিমানবিক স্তরের সূক্ষ্ম রস-বিলাসের ব্যাপার। হরিদাস-হাইফেনের দ্বারা এই অনাসক্ত নারী ও ব্যাকুল পুরুষের মধ্যে ব্যবধান বিলুপ্ত করা অসম্ভব। এই সব—বাঁধনছেঁড়া, সর্বাশ্রয়চ্যুত যুগে বাস্তবের পুঞ্জীভূত গ্লানি ও চিত্তবৈকল্যের উপর ঊর্ধ্বাকাশে যে আদর্শের দীপ্তরেখা নূতন আশা ও পরম আশ্বাসের ইঙ্গিতে ঝলসিয়া উঠে তাহা এখনও সর্বজনবোধ্য নিবিষ্টতায় স্থির রূপ লাভ করে নাই, তাহার আভাস মিলে আদর্শবাদীর স্বপ্ন-কল্পনায়, দার্শনিকের রহস্যভেদী মননে, পলাতক সৌন্দর্য-সুষমার ক্ষণিক চমকে—'বনহংসী'তে সেই অনাগত জীবনের দূরশ্রুত ছন্দই ব্যঞ্জিত হইয়াছে॥

উদ্ধারণপুরের ঘাট

(১)

বাঙলাদেশের সমাজ-চেতনা ও অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্যে শ্মশানের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ইহা কেবল অভাবাত্মক (negative) বা সর্বশূন্যতার অতল গহ্বর মাত্র নহে। হিন্দুর কর্মফলে বিশ্বাস ও জন্মান্তরবাদ শ্মশানের সব-শেষ-করা চিতাভস্মের মধ্যে নবজন্মের বীজকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করে। অতীতকে ভস্মীভূত করিলেও উহা নিঃশেষ হয় না। পার্থিব স্থূল বাসনা-কামনার সূক্ষ্মতর সত্তা লেলিহান অগ্নিশিখাকে ফাঁকি দিয়া অদৃশ্যভাবে রূপান্তরের প্রতীক্ষা করে—এই বিশ্বাসের বীজাণু শ্মশানের আকাশ-বাতাসকে সর্বদা প্রাণবেগে হিল্লোলিত করিয়া রাখে। নানারূপ অধ্যাত্ম-সংস্কার ও ধ্যানকল্পনা এই মর্ত্য-অমর্ত্যলোকের সংযোগস্থলকে রহস্যময়, অপ্রত্যক্ষ প্রাণ-লীলার রঙ্গভূমিতে পরিণত করিয়াছে। মানব-মনের উৎকট বিভীষিকা, অপ্রাকৃত উপলব্ধি, অজানা জীবন-প্রবাহের স্পর্শ এখানে মূর্তি ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়। পরলোকের যবনিকা এই শ্মশান-বিহারীদের উতলা, উত্তপ্ত নিঃশ্বাস-বায়ুতে মুহুর্মুহুঃ আন্দোলিত ও দুর্লভ মুহূর্তে অপসারিতও হয়। এখানে তন্ত্রসাধনার বীভৎস উপচার পরম রহস্যের সন্ধান দেয়; ইন্দ্রিয়-ভোগ-প্রবণতা নিগূঢ়মন্ত্র—শোধিত হইয়া ভীষণের অন্তরাল হইতে সুন্দরকে প্রকটিত করে। অন্তিম-বিলুপ্তির মর্মকোষ হইতে এক নূতন জীবনসত্য উদ্ভাসিত হইয়া, ফেলিয়া-আসা জীবনের উপর এক অভিনব তাৎপর্যের আলোক প্রসারিত করে—জীবনের শেষে পৌঁছিয়া জীবনের অর্থ পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

পাশ্চাত্ত্যদেশের সমাধিক্ষেত্রে (churchyard) অনুরূপ কোন বাতাবরণের পরিচয় মিলে না। সেখানে মৃত্যুরই নীরব, অসপত্ন একাধিপত্য—কোন জীবন-কল্লোল উহার অবিচল শান্তিকে ব্যাহত করে না। সেখানে কবি ও দার্শনিক মাঝে মধ্যে পাদচারণা করিয়া জীবনের অনিত্যতা ও পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে চিন্তা করেন ও শান্ত নির্বেদরসে নিজ চিত্তকে ভরাইয়া তোলেন। বিখ্যাত ইংরেজ-কবি গ্রে *Elegy Written in a Country Churchyard*

নামক কবিতায় এই চিন্তাশীল মনোভাবকেই অভিব্যক্তি দিয়াছেন। অষ্টাদশ-শতকের আরও কোন কোন কবি সমাধিস্থলের শবাস্থিসমাকীর্ণ, নরকঙ্কালময় ভয়াবহতার চিত্রও আঁকিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে কোনও তীক্ষ্ণতর ব্যঞ্জনাশক্তির আভাস পাওয়া যায় না। ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য জীবনচেতনা ও অধ্যাত্মবোধের যে পার্থক্য তাহা তাহাদের জীবনের শেষ আশ্রয়স্থল, শ্মশান ও সমাধি-প্রাঙ্গণের পরিকল্পনা ও উদ্দীপন-বিভাবের পার্থক্যের মধ্যেই প্রতিফলিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের গদ্য প্রবন্ধে শ্মশান-সম্বন্ধে যে ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ জীবন-পর্যালোচনার দৃষ্টান্ত দেখা যায় তাহা প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য ভাবধারারই অনুসারী।

কিন্তু শ্মশান কেবল পরলোকেরই দ্বারদেশ নহে, ইহার রঙ্গমঞ্চে কেবল যে অপ্রাকৃত ভাবনা-অনুভূতিরই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় তাহা নহে। লৌকিক জীবনযাত্রারও নানা অপ্রত্যাশিত বিকাশ, শ্মশানযাত্রী ও শ্মশানবাসী নানা মানবের বিচিত্র সম্পর্ক, সংঘাত ও কোলাহল ইহার মধ্যে মানবিক-রসসমৃদ্ধ নাটকীয়তারও রূপ ফোটাইয়া তোলে। যাহাদের জীবনের লীলাখেলা ফুরাইল তাহাদের অনুগমন করিয়া ও তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রযোজক ও সহায়করূপে একদল মানুষ জীবনের প্রত্যন্তদেশে এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কোন কোন শ্মশানে কোন তন্ত্রসিদ্ধ কাপালিক কালভৈরবরূপে শ্মশান-দেবতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকে। লোকে তাহাকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী ভাবিয়া তাহার চরণে নানা অর্ঘ্য উপহার দেয়, মনের নানা গোপন কামনা নিবেদন করে, তাহার বিভূতির সত্য বা মিথ্যা পরিচয়ে বিস্মিত, বিভ্রান্ত ও রহস্য-কণ্টকিত হইয়া উঠে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার অধ্যুষিত পীঠস্থানে অনেক তান্ত্রিক, বৈরাগী দম্পতি, বাউল প্রভৃতি পরলোকের রহস্য-আস্বাদন-উন্মুখ নরনারীর ভিড় জমিয়া যায়। কিছু কিছু বেপরোয়া, অসামাজিক জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত, অথচ অন্তরে অনাসক্ত লোকও এই দলে মিলিয়া ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের যুগপৎ মিশ্রিত আস্বাদ উপভোগ করে—শ্মশানের ভস্মস্তূপের উপর বসিয়া জীবন-আবাহনের রাগিণী ধরে। তারপর নশ্বর দেহকে ভস্মীভূত করিবার ব্যাপারে যাহাদের সহায়তা অপরিহার্য, সেই ডোম-চণ্ডালের দল শ্মশান-বৈরাগ্যের বুকে বসিয়া এক স্থূল ও ইতর জীবন-মমতার অভিনয় করে—মৃতের পরিত্যক্ত সাজ-সরঞ্জাম

কুড়াইয়া আনিয়া, সৎকার-দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য সঞ্চয় করিয়া, সুদে টাকা ধার দিয়া জীবন-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের উপকরণ-সাহায্যে সাংসারিকতার জীর্ণ কুটির নূতন করিয়া গড়িয়া তোলে। শ্মশানের ঠিক প্রান্তেই একদল বারবনিতা জীবনকে প্রলুব্ধ করিবার ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকে এবং অনেক শবদেহানুগামী নিকট বন্ধু প্রিয়পরিজনের শোক ভুলিবার জন্য এই কামনা-মদিরার আবিলতায় আত্মবিস্মৃতি খোঁজে। তা ছাড়া, শববাহীর দল দিবা-রাত্রির সব সময়ে আনাগোনা করিয়া, তুমুল হরিধ্বনিতে শ্মশানের শোক-গাম্ভীর্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়া, নেশা-ভাঙে সোরগোল তুলিয়া মরণের সিংহদ্বারে অজ্ঞ, অপরিণামদর্শী জীবনের উন্মুখর কোলাহলকে ধ্বনিত করে। আর অন্তিম পথযাত্রীকে অনুসরণ করিয়া আসে কত করুণ স্মৃতি, কত ক্ষুব্ধ অনুশোচনা, কত অতৃপ্ত কামনা, কত ক্ষণিক বৈরাগ্যের আত্মপ্রবঞ্চনা, কত নূতন বাসনার মোহ ও নব জীবনারম্ভের ব্যর্থ সংকল্প, কত অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা, কত অপ্রাকৃত সংস্কারবিশ্বাস, প্রেতলোকের কত অস্পষ্ট বিভীষিকা ও রহস্যকটাক্ষজড়িত আমন্ত্রণ! সবসুদ্ধ-মিলিয়া এই বিস্মৃতির কূলে, এই সর্ব-রিক্ততার পটভূমিকায়, এক বিরাট নাটকের খণ্ড খণ্ড অংশের অভিনয় মরণাহত অথচ মরণস্পর্ধী জীবনের আত্মপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসের বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদগুলিকে এক অখণ্ড তাৎপর্যসূত্রে গাঁথিয়া তোলে।

সম্প্রতি শ্রীঅবধূত-লিখিত সদ্যপ্রকাশিত 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' নামক উপন্যাসধর্মী রচনায় শ্মশানের এই লীলাময় রসোচ্ছ্বাস, হৃদয়াবেগের সংঘর্ষ ও উদ্বেলতা অপূর্ব ব্যঞ্জনাশক্তি ও কাব্যময়তার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই রচনাটিকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না; কেননা, উপন্যাসের দৃঢ় বাঁধুনি, চরিত্র-সৃষ্টি ও একমুখীন পরিণতি ইহাতে নাই। শ্মশানের জীবন-মেলায় যে কয়েকটি ব্যক্তি আসিয়া মিলিয়াছে তাহাদেরই অন্তর-ইতিহাসের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায়, তাহাদের অনুভূতি ও জীবন-প্রেরণার কয়েকটি বাষ্পায়িত উচ্ছ্বাস ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক উদ্ধারণপুরের গঙ্গাবিধৌত, চিতানল-দীপ্ত, অস্থি-ও-ভস্মসমাকীর্ণ, বহু মানবের বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস-ক্ষুব্ধ, নানা অশরীরী উপস্থিতির মায়াস্পর্শে রহস্যময় শ্মশানভূমি। শ্মশানচারী সমস্ত প্রাণীর উপরই ইহার প্রভাব নিগূঢ় ও সর্বব্যাপী। দমকা হাওয়ায় যেমন ইহার ভস্ম ও ধূলিরাশি দিগ্‌বিদিকে বিকীর্ণ হইয়া মানুষের

ইন্দ্রিয়ানুভূতির সহিত অলক্ষ্যে মিশিয়া যাইতেছে, তেমনি ইহার বৈরাগ্য-লালসা-মিশ্র, ইহলোক-পরলোকের বিপরীত টানের খরস্রোতে বেগবান মানস প্রভাব উপন্যাসের প্রত্যেকটি নরনারীর মনোভাবকে অনিবার্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। উদ্ধারণপুরের শ্মশানের উপর যে ভাবপরিমণ্ডল প্রসারিত আছে, তাহারই মুহুর্মুহুঃ রূপান্তরের সূত্রে, নিমেষে-নিমেষে বদ্‌লানো রঙের খেলায়, মানব-মনোবৃত্তির উন্মেষ-বিলয়ে, প্রেতায়িত বিভীষিকায় ও ইহারই ঘোর কাটাইয়া জীবননিষ্ঠার অতর্কিত স্ফুরণে, ইহার এক বিরুদ্ধ-উপাদান-গঠিত যৌগিক সত্তা আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। ইহার দিন ও রাত্রি, আকাশ ও বাতাস, আলোছায়া, অশ্রুহাসি, স্বপ্ন-কল্পনা-বাস্তব-বিস্ময়—সকলেই আপন আপন বিভিন্ন উপাদানের উপহারে, ইহাদের ইন্দ্র-জালের নব নব কুহকে এই প্রহেলিকা-রূপসীর, এই জীবনাশ্লেষ-বিমুখী মোহিনীর মায়াময় প্রাণসত্তাটি নির্মাণ করিয়াছে। ইহা একদিকে জীবনকে অস্বীকার করে, অন্যদিকে বঙ্কিম কটাক্ষে উহাকেই আমন্ত্রণ জানায়। লেখক আশ্চর্যরূপ সার্থক রূপক-ব্যঞ্জনায়, উপাদান-বিন্যাসের অদ্ভুত কুশলতায়, ইহার চতুর্দিকে হিল্লোলিত কামনা-তরঙ্গের চঞ্চল ছন্দে, প্রতিবেশের স্থূল বাস্তবতা ও সূক্ষ্ম ভাবসঙ্কেতের সাহায্যে ইহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলাসাহিত্যে সর্বপ্রথম এই উপন্যাসে শ্মশানের মহাকাব্য রচিত হইয়াছে।

(২)

এই রঙ্গভূমিতে যে সমস্ত পাত্রপাত্রী জীবনের অভিনয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে অভিনীত নাটকের পদ্ধতিটি বোধগম্য হইবে। বলা বাহুল্য, কোন চরিত্রেরই এখানে পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে নাই; তাহাদের পূর্বজীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস এখানে অনুপস্থিত ও সম্ভবতঃ লেখকের উদ্দেশ্যের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। কেবল শ্মশান-ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্বের জীবনাংশটুকুই এখানে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, চিতার আলোকে বা অর্ধ-নির্বাপিত অগ্নি হইতে নিঃসৃত ধূম্রাবরণের মধ্য দিয়া মুখের যে অংশটুকু দেখা যায় লেখক তাহাই চিত্রিত করিয়াছেন। মৃতের পিছনে যে অর্ধস্ফুট করুণ জীবন-কাহিনী তাহার শ্মশানযাত্রার গতিবেগ দিয়াছে, যে অসংবরণীয় ভাবোচ্ছ্বাস জীবিতকে শ্মশানধূলিতে লুণ্ঠিত করিয়াছে,

সদ্যপ্রাপ্ত শোকের যে নিদারুণ আঘাত আজীবন-রুদ্ধ হৃদয়-কপাটকে উন্মোচন করিয়া অপ্রত্যাশিত পরিচয়ের বিস্ময় জাগাইয়াছে, উপন্যাসের পাতাগুলিতে সেই আবেগঘন, সংঘাত-মথিত মুহূর্তগুলিই আমাদের চিত্তে দোলা দিয়াছে। আখ্যায়িকার প্রবক্তা গোঁসাইবাবার আলোচনা পরে করিব। শ্মশানভূমির পরেই তিনিই উপন্যাসের মানবিক নায়ক। সমস্ত হাসি-কান্নার ঢেউ তাঁহার দু'হাত উঁচু গদির, তাঁহার রাজোচিত, অমানুষিক ঔদাসীন্যের নিকট আসিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মৃত্যুদেবতার পরেই তাঁহার স্থান; শ্মশানচারী প্রাণীবর্গের তিনিই ভাগ্য-বিধাতা; শ্মশানের সমস্ত মহিমা ও বিস্ময়, উহার সমস্ত রহস্যময়, রং-ফেরানো সাঙ্কেতিকতা তাঁহারই উচ্ছ্বসিত ভাবানুভূতির ভিতর দিয়া বিচ্ছুরিত। মৃত্যুর আবেষ্টনে তিনি যেন ভাবলেশহীন, প্রস্তরীভূত অর্ধদেবতা। কিন্তু এই পাষাণের মধ্যেও যে ফল্গুধারা প্রবাহিত তাহা তাঁহার আত্মকাহিনীর মধ্যে আকুল গুঞ্জনধ্বনি তুলিয়াছে। তাঁহার প্রমুখাৎ বিবৃত সমস্ত খণ্ডকাহিনীগুলি তাঁহার সংবেদনশীল মন ও ব্যাকুল আত্মজিজ্ঞাসার ভিতর দিয়া একটি সামগ্রিক তাৎপর্য ও অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ লাভ করিয়াছে।

এই শ্মশান-নাট্যশালায় সবচেয়ে জোরালো ও চিত্তাকর্ষক অভিনয় নিতাই বৈষ্ণবী ও চরণদাসের যুগ্ম-অংশকে (role) আশ্রয় করিয়াছে। নিতাই উষর শ্মশানমরুতে ভালবাসার নৈরাশ্য-কীটদষ্ট রক্তিম ফুল। আধুনিক যুগে মানুষের অন্তিম আশ্রয়স্থলের কথা বলিতে গিয়াও লেখককে অনিবার্যভাবে ভালবাসার আবির্ভাব ঘটাইতে হয়—চিতাশয্যার পাশেই প্রেমের দাহ-জ্বালাময়, কাঁটাভরা কুসুমশয়ন বিছাইতে হয়। 'মহাপ্রস্থানের পথে'র লেখক তীর্থযাত্রার বৈরাগ্যধূসর, দুর্গম পথের মধ্যে পাঠককে অকস্মাৎ-উদ্ভিন্ন ভাল-বাসার ফুলের স্নিগ্ধ স্পর্শ ও মৃদু সৌরভ উপহার দিয়াছেন। শ্রীঅবধূত এই দৃষ্টান্তের অনুসরণে শ্মশানবাসী মোহান্তের সঙ্গে সমাজ-বন্ধনহীনা নিতাই-এর মন নেওয়া-দেওয়ার, প্রেমের আকুল নিবেদন ও নিঃসাড় প্রত্যাখ্যানের, নানা ভাবান্তরে দোলায়িত, নানা সুরের কাঁপন-লাগা অন্তর-রহস্যের ছবিটি আঁকিয়াছেন। ইতিপূর্বে যদি শ্মশানে প্রেমের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা হয় শববাহকদের কাঁধে চড়িয়া, না হয় শোকদীর্ণ শবানুগামীদের সহযাত্রিরূপে এই মহাবিলুপ্তির তীর্থক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। শ্মশানে প্রেম

হয় মৃত, না হয় বিয়োগবিধুর জীবিতের সঙ্গে সংসার-জীবন হইতে আগন্তুক। ইহা শ্মশানের নিজস্ব অধিবাসী নহে। মৃত্যুর চির-নীরবতার নিকট প্রেমের মুখরতা শুরু হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক কালে লেখক ও পাঠক উভয়েরই রুচি বদলাইয়াছে। 'আদাবন্তে চ মধ্যে চ' প্রেমের প্রশস্তি না গাহিলে, মধুর রসের অতিবর্ষণে আমাদের মনোভূমিকে আর্দ্র না করিলে লেখকের ভাবাতিরেকপ্রবণ শিল্পীমন তৃপ্তি পায় না ও পাঠকের সহজ প্রত্যাশা পূর্ণ হয় না। কাজেই এখানে সর্বরিক্ততার মরুদেশে নবসৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, চিতানলের পাশাপাশি অনির্বাণ কামনার বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। মৃতকে পোড়াইলে করুণ অথবা নির্বেদ রসের সৃষ্টি হয়, জীবন্ত হৃদয়কে অপ্রাপ্তির ক্ষোভানলে জ্বালাইলে নাটকীয়তা ও গভীর সমবেদনার উদ্ভব ঘটে। সুতরাং নাটকীয়তা প্রবর্তনের সুযোগ মিলে বলিয়াই বোধ হয় লেখক এই অনুপযোগী প্রতিবেশে প্রেমের অবতারণা করিয়াছেন। তবে তাঁহার কৃতিত্বের ও কলাবোধের নিদর্শন এইখানেই যে, এই আপাত-বিসদৃশ আবির্ভাবে শ্মশানের আবহাওয়ার সঙ্গতি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই প্রেম শ্মশান-ডমরুর সুরে বাঁধা—হতাশায় ক্লিষ্ট ও করুণ, ভস্মাবলেপে ধূসর, সমাধানহীন রহস্যের দুর্বোধ্যতায় নিয়তি-বিড়ম্বিত। শ্মশানপ্রান্ত-প্রবাহিনী গঙ্গার ন্যায় এই প্রেমও ভস্মাবশেষ হৃদয়ের উপর সঞ্জীবনী রসের শীকর-ধারা বর্ষণ করিতে করিতে মৃত্যুতীর্থের অন্তর ভেদ করিয়া নিরুদ্দেশের বাঁকে অন্তর্হিত হইয়াছে।

চরণদাস কাহিনীর মধ্যে অনেকটা বাড়তি চরিত্র। তাহাকে আনা হইয়াছে হতাশ প্রেমিকের আদর্শবাদ ও আত্মোৎসর্গ-প্রবণতার উদাহরণ-স্বরূপ। নিতাই-এর সহিত তাহার সম্পর্কের অস্বাভাবিক জটিলতার উপর লেখক বেশ দক্ষভাবে আলোকপাত করিয়াছেন। ইহাতে নিতাই-এর চিরন্তন অতৃপ্তি ও গোঁসাই-এর প্রতি তাহার তীব্র আকর্ষণের একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হয়তো সে চরণদাসকে সঙ্গীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ও তাহার নারী-সুলভ স্নেহপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য। তা ছাড়া, নিতাই ও চরণদাস শ্মশানের রুক্ষতার মধ্যে একটা বৈষ্ণবীয় আবহাওয়া-প্রবর্তনের হেতু হইয়াছে—উহার ধ্বংসের সর্বগ্রাসী শূন্যতার মধ্যে কীর্তনের কলি গাহিয়া, প্রেমের দুর্লভ আদর্শের স্মৃতি জাগাইয়া, ক্ষোভ ও অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া একটি উদাস-করুণ সুরের গুঞ্জন তুলিয়াছে।

কাহিনীর সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র খন্তা ঘোষ। সে এই মৃত্যুপ্রাঙ্গণে অফুরন্ত প্রাণলীলার ঐশ্বর্য ছড়াইয়াছে—সে যেন মরণ-নটিনীর পায়ে নৃত্যের নূপুর-নিক্বণ। তবে তাহার জীবনে মৃত্যুর প্রভাব দেখা দেয় উহার এলোমেলো ছন্দে ও খেয়ালী দুঃসাহসিকতায়। তাহার জীবন সুসংবদ্ধ বা সুনিয়ন্ত্রিত নহে, ইহা সর্বদা মরণের দিকে ঝুঁকিয়াই আছে। মৃত্যুর গ্রাস হইতে বিপদ-সঙ্কুল সফলতার আস্বাদ, জুয়াড়ীর অস্থির ও অনিশ্চিত আনন্দ-মাদকতা ছিনাইয়া লইতে সে সর্বদাই উৎসুক। তাহারও জীবনে প্রেম আসিয়াছে নিতান্ত আকস্মিকভাবে; শ্মশানের দ্বারপ্রান্তে তাহার আহ্বান পৌঁছিয়াছে। এই প্রেমকে তাহার বন্দীজীবন হইতে উদ্ধার করিতে গিয়াই সে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। সে তিলে তিলে শুকাইয়া মরিতে রাজী হয় নাই; তেতলার ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া শত্রুর উৎপীড়নকে উপহাস করিয়াছে ও নিজ আত্মার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সমস্ত শ্মশান-বাসীর তুমুল হরিধ্বনির মধ্যে সে বিজয়ীর গৌরবে শ্মশানে নীত হইয়াছে—তাহার মধ্যে মৃত্যুর রণাঙ্গনে জীবন-মহোৎসবের জয়যাত্রা সূচিত হইয়াছে। তাহার প্রিয়া স্বর্ণ গোঁসাই-এর নিকট প্রেমসিদ্ধির মন্ত্র লইতে আসিয়া শ্মশান-জীবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—তাহার ক্ষুদ্র জীবনের পরিচয় কেবল তাহার কৌতূহলী প্রণয়-ঔৎসুক্য ও প্রিয়-বিয়োগের ক্ষণিক শোকোচ্ছ্বাসেই সমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

(৩)

আর একটি চরিত্র মনের গভীরে দাগ কাটিয়া বসে—সে আগমবাগীশ। শ্মশানের ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে বীভৎস অনুষ্ঠান ও উপচারে তন্ত্রসাধনার যে রীতি বহুপ্রচলিত ছিল, আগমবাগীশ তাহারই দৃষ্টান্ত। যে অধ্যায়ে একজন ভীরু, দুরুদুরু-কম্পিত-বক্ষ নারীকে উত্তর-সাধিকা করিয়া আগম-বাগীশের এই উৎকট সাধনার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা কাব্যোচ্ছ্বাসময়, ব্যঞ্জনাপূর্ণ বর্ণনায় সমস্ত বইখানির মধ্যে অতুলনীয়। আগমবাগীশের মন্ত্র যেন সমস্ত আকাশ-বাতাসের মধ্যে এক বিভীষিকা ছড়াইয়াছে, গ্রহ-নক্ষত্র-মণ্ডলীর মধ্যে এক নীলাভ বিষবাষ্প বিকীর্ণ করিয়াছে। সমস্ত প্রকৃতি যেন রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে এক বিশ্ববিপর্যয়কারিণী শক্তির ফলাফল প্রতীক্ষা করিতেছে,

স্বয়ং বিশ্বের মূলীভূত কারণ সৃষ্টিদেবতা যেন ইহার চেতনা-বিলোপী প্রভাবে আচ্ছন্ন-অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। এই দারুণ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে বলিদানের জন্য উৎসর্গীকৃত, পূজার প্রধান অঙ্গ নারীটির আর্ত চীৎকারে শ্মশানে শিহরণ উঠিল। সে বেচারা তন্ত্রপূজার তাৎপর্য না বুঝিয়াই, মিথ্যা আশায় প্রবঞ্চিত হইয়া রুগ্ন স্বামীর কল্যাণার্থ আগমবাগীশের সাধনা-সঙ্গিনী হইয়াছিল। আর এক সদ্যোবিধবা নারী তাহার বিষ-দগ্ধ হৃদয়ে সর্বস্মৃতিলোপী নেশার শেষ অঞ্জলি ঢালিয়া দিবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় এই তন্ত্রপূজার সহকারিণী হইয়া অনিচ্ছুক বলিকে মুক্তি দিল। এই উভয়ের মিলনে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আরও অভাবনীয়। এই বিষকন্যার সংসর্গ স্বয়ং আগমবাগীশকে শাক্ত হইতে বৈষ্ণবে, শক্তির পূজারী হইতে প্রেমের উপাসনাকে রূপান্তরিত, তাহার কণ্ঠে উদাত্ত শক্তিমন্ত্রের পরিবর্তে মধুর কৃষ্ণ-স্তোত্র সন্নিবিষ্ট করিল। তাহার প্রখর ব্যক্তিত্ব তাহার নবলব্ধ শক্তির উগ্রতর প্রভাবের নিকট প্রতিহত হইয়া পলায়নে আত্মরক্ষা খুঁজিল। শেষে উদ্ধারণপুরে গঙ্গার ঘাটে নিয়তিরূপিণী এই প্রচণ্ডা নারী তাহার নাগাল পাইয়া বিরাট পৌরুষের আধার আগমবাগীশকে গঙ্গাগর্ভে শেষ আশ্রয়লাভের প্রেরণা যোগাইল। আগমবাগীশের মত দুর্ধর্ষ পুরুষকে যে অল্পদিনের মধ্যেই নিবিড় ও অসহনীয় বিতৃষ্ণায় জীবনবিমুখ করিতে ও আত্মহত্যার দিকে অনিবার্যভাবে ঠেলিয়া দিতে পারে, তাহার শক্তির প্রকাশ নেপথ্য-লোকেই ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহা যে কী বিপুল ও অপরিমেয় তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াও সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক এই চণ্ডপ্রকৃতি নারী। সময় সময় শ্মশানে আসিয়া মানুষের বিস্ময়জনক ও অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। গার্হস্থ্য জীবনের যে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য, লৌকিক সম্ভ্রমবোধের যে প্রয়োজন মানুষের প্রকৃত পরিচয়কে অবগুণ্ঠিত রাখে, শ্মশানের বিপুল প্রতিক্রিয়া সেই মুখোশ সরাইয়া ফেলিয়া ব্যক্তি-স্বরূপকে আশ্চর্যজনকভাবে উদ্‌ঘাটিত করে। জীবনের এক অধ্যায়-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ-নিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি অনিবার্য বেগে জাগিয়া উঠে। চিতানলে লৌকিক বন্ধনের সহিত মানুষের নিজের নিগড়বদ্ধ অতীতও নিশ্চিহ্নভাবে ভস্মীভূত হইয়া যায়। সিংহ-গিন্নীর জীবনে তাহাই ঘটিয়াছে। জমিদার-

গৃহিণীরূপে দুশ্চরিত্র, নারীহন্তা স্বামীর ন্যক্কারজনক রোগে সেবার পিছনে তাহার অন্তরে যে বিস্ফোরক বিদ্রোহ নীরবে সঞ্চিত হইতেছিল, স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনের পর তাহাই সমস্ত ছদ্মাবরণের অন্তরাল হইতে ফাটিয়া পড়িয়াছে। সে গোঁসাইবাবার নিকট মদ চাহিয়া খাইয়াছে ও স্বেচ্ছায় আগমবাগীশের তন্ত্র-সাধনার শক্তিরূপে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছে। অথচ ইহার বিদ্রোহের মধ্যে কোন উগ্র ঝাঁঝ, কোন আবেগের আতিশয্য নাই; নিতান্ত সহজভাবে ও শান্ত ছন্দে সে জীবনের দিক্-পরিবর্তন করিয়াছে। আগমবাগীশের সহচরীরূপে তাহার জীবনের ইতিহাস অলিখিত রহিয়া গিয়াছে; লেখক শ্মশানের গণ্ডীর বাহিরে পদক্ষেপ করেন নাই। সমস্ত রূপ-যৌবন খোয়াইয়া, সমস্ত শালীনতা-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়া শ্মশানে তাহার প্রেত-আবির্ভাব আমাদের মনে যে ভীতি-শিহরণ জাগায় তাহা শ্মশানোচিত অতিপ্রাকৃত অনুভূতির সহিত চমৎকার সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে।

এ ছাড়া ছোটখাট, অপ্রধান চরিত্রগুলিও শ্মশানভূমির সহিত বেশ মিশিয়া গিয়াছে। কেহ বা শোকে উদ্‌ভ্রান্ত, কেহ বা অভ্যাস-জড়তায় নির্বিকার, কেহ বা মানুষের শোক-দুঃখের সুবিধা লইয়া স্বার্থসাধনে তৎপর, কেহ বা গোপন পাপের প্রশ্রয়-প্রত্যাশী। সকলের মধ্যেই মৃত্যুর চুম্বক আকর্ষণ ক্রিয়াশীল। বিষ্টুটিকুরীর পঞ্চমবার বিপত্নীক ও ষষ্ঠদফা নূতন বিবাহে উৎসুক জয়দেব ঘোষাল, মুকুন্দপুর-মালিপাড়ার কুমার-বাহাদুর, সমদ্দার দারোগা, মড়া-খেলানো ওস্তাদ রামরতন, রামহরি—পঙ্কা—রামহরির বৌ, কৈচরের বামুনদিদি, মড়াপোড়ার দল ও অকস্মাৎ-উত্তেজিত বাগদী-বাহিনী—ইহারা সকলেই, শ্মশানের কুকুর-শেয়াল-শকুনি—ইহারা ধূলিকণা ও ভস্মরাশির সহিত মিশিয়া এক শ্মশান-গোষ্ঠী-সমবায় রচনা করিয়াছে। ইহারা শ্মশানের স্থূল বাস্তব অংশের প্রতিনিধি; ইহাদের মধ্যে জীবন-পিপাসা এক তির্যক, বিকৃত, কখনও বা স্তিমিত, কখনও বা অস্বাভাবিকরূপে উগ্র রূপ ধারণ করিয়াছে। লৌকিক বিশ্বাসে শ্মশানে যে সমস্ত ভূত-প্রেত, ডাকিনী-যোগিনীর দল বিচরণ করে ইহারা তাহাদেরই মানবিক সংস্করণ। ইহারাই শ্মশানপ্রান্তে জীবনযাত্রার সমারোহে অংশ লইয়াছে—ইহাদেরই কণ্ঠোত্থিত জীবন-কল্লোল শ্মশানের শূন্যতা হইতে অস্বাভাবিক উচ্চগ্রামে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

(৪)

সর্বশেষে এই শ্মশান-সমাজের সমাজপতি ও মধ্যমণি গোঁসাইবাবার চরিত্র আলোচনা করা প্রয়োজন। সমস্ত কাহিনীর বিশ্বাস্যতা তাঁহারই চরিত্র-সঙ্গতির উপর নির্ভর করে। তিনিই শ্মশান-বেদমন্ত্রের উদ্‌গাতা; উহার সমস্ত ভীষণতা ও রমণীয়তা, উহার সূক্ষ্ম অনুভূতি ও উৎকট কৃচ্ছ্রসাধন তাঁহার কেন্দ্র-বিন্দুতে আসিয়া মিলিয়াছে। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠার মূলে আছে তাঁহার চরিত্র-দার্ঢ্য ও অলৌকিক শক্তিপ্রকাশের বুজরুকি-কৌশল। শ্মশানের নিশীথ-নিঃসঙ্গতার মধ্যে রাত্রি কাটানো ও অপরিসীম সুরাসক্তি তাঁহার এই প্রতিষ্ঠাকে প্রাকৃত শ্মশানচরদের নিকট দৃঢ়তর করিয়াছে। উত্তেজিত জনসঙ্ঘকে তিনি কেবল ধমকেই শান্ত করিতে পারেন; দারোগাকে তিনি যে কৌশলে ঘায়েল করিলেন তাহাতে উচ্চাঙ্গের উদ্‌ভাবনী শক্তির ছাপ আছে; বিপদে তাঁহার স্থিরতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিস্ময়কর। মন্ত্রপূত ঔষধ-বিতরণ ও অসাধ্যসাধন ব্যাপারেও তাঁহার শক্তি পরীক্ষিত ও সন্দেহাতীত। তিনি সমস্ত মানবিক দুর্বলতাকে অতিক্রম করিয়াছেন; তাঁহার চোখের সামনে অনবরত যে মর্মান্তিক বিয়োগান্ত দৃশ্যের অভিনয় হইতেছে তাহাতে তিনি নির্বিকার। সুতরাং এই সমস্ত গুণের সমাবেশে তিনি লৌকিক বিশ্বাসের অনুযায়ী একজন আদর্শ শ্মশান-ভৈরব।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, এই ভৈরব-সুলভ নির্মমতার সঙ্গে তাঁহার মনের সুকুমার সংবেদনশীলতা ও রূপকধর্মী কাব্যানুভূতির সমন্বয় ঘটিল কেমন করিয়া? যাঁহার চিত্ত এত কোমল ও অন্তর্দৃষ্টিশীল, শ্মশানের দৃশ্য ও মানব-মনের অভিব্যক্তিসমূহকে যিনি এরূপ কবি-দার্শনিকের দৃষ্টিতে অনুভব করেন, নীরব বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত যাঁহার এত সুগভীর ও সমবেদনা-স্নিগ্ধ পরিচয়, তিনি মড়ার উচ্চ গদির উপর সুখাসীন কেমন করিয়া থাকেন? কোন্ অন্তর্নিহিত শক্তিতে তিনি নিতাই-এর উদ্যত প্রেমকে বার বার প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন? অবশ্য গোঁসাইবাবা একটা ব্যাখ্যা দিয়াছেন—আত্মমর্যাদা ও আত্ম-অবিশ্বাসের যুগপৎ বিপরীত প্রভাবই তাঁহার তথাকথিত ঔদাসীন্যের মূলে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা মনগড়া, জীবন-সমর্থিত নহে। যিনি মানব-মহিমা সম্বন্ধে এত অচেতন, তিনি খন্তা ও চরণদাসের মহিমা বুঝিলেন কেমন করিয়া? শ্মশানের স্থূল আবেষ্টনে বাস

করিয়া ও উহার ইতর ভোগোপকরণে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিয়া, উহার সূক্ষ্ম রূপক-তাৎপর্য, উহার ইন্দ্রিয়াতিসারী অধ্যাত্মসত্তা তাঁহার অনুভূতিতে স্ফুরিত হইল কি অলৌকিক উপায়ে? আত্মপ্রসাদ ও আত্মগ্লানির দুই বিপরীত ধারা তাঁহার মনের মধ্যে পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে কিরূপে? অভিজ্ঞতার কী বিচিত্র সংযোগে, জীবনবোধের কী দুর্বোধ্য সমীকরণ-প্রক্রিয়ায় গোঁসাইবাবার মধ্যে এই দ্বৈত সত্তার সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহা মানব-মনস্তত্ত্বের এক কৌতূহলপূর্ণ সমস্যা। যাক্‌, আমরা তাঁহার অতীত আলোচনা না করিয়া তাঁহাকে যেমন পাইয়াছি সেইভাবেই গ্রহণ করি। তাঁহার মানসিক বৃত্তিগুলি যেভাবেই স্ফুরিত হইয়া থাকুক না, তিনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া শ্মশানের রোমাঞ্চকর, সৃষ্টিরহস্য-দ্যোতক, অগণিত ভাব-বৈচিত্র্যের আসা-যাওয়ায় লীলাময় সত্তাটি অনুভব করিয়াছেন ও শব্দের ইন্দ্রজালময় সঙ্কেতে উহার নিগূঢ় রসাবেদনটি ব্যক্ত করিয়াছেন। চরিত্র হিসাবে দুর্বোধ্য থাকিয়াও ইনি অনুভূতির একটা দুষ্প্রবেশ্য রাজ্যে আমাদের প্রবেশাধিকার দিয়াছেন। এইখানেই এই চরিত্র-পরিকল্পনার সার্থকতা।

অনেকে হয়ত এই রচনাটির ঔপন্যাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন। ইহা যে খাঁটি উপন্যাসধর্মী নহে, তাহা আমিও স্বীকার করিয়াছি। তথাপি বাঙালী হিন্দু-জীবনের একটা উপেক্ষিত, এড়াইয়া-যাওয়া অংশের ছবি হিসাবে ইহা উপন্যাসের মর্যাদা পাইবার অধিকারী। বাঙলাদেশের বহু নর-নারীর অন্তরে তাহাদের অন্তিম ব্যবস্থা, সৎকারের বিধি ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা ও আগ্রহ ছিল। এই সম্বন্ধে তাহাদের মনের ইচ্ছা তাহারা আত্মীয়স্বজন, ছেলেপিলের নিকট বারংবারই প্রকাশ করিত। তাহাদের জীবনের অনেক মুহূর্ত ইহারই ধ্যানে মধুর, ও আশঙ্কায় কণ্টকিত ছিল। তাহাদের জীবন-নদীর অনেকখানি স্রোতোবেগ এই মৃত্যু-মোহনার প্রতি সচেতন লক্ষ্য রাখিয়াই প্রবাহিত হইত। কাজেই এই জীবনান্তিক জীবন-পরিচয় অন্ততঃ বাঙালী হিন্দুসমাজের একটা বাস্তব রূপায়ণ। বিশ্বমানবপ্রকৃতির সার্বভৌমতা স্বীকার করিয়াও জীবন-সাধনা ও অধ্যাত্ম সংস্কারভেদে প্রতিটি জাতির একটা বৈশিষ্ট্যও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক', তারাশঙ্করের

'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' ও 'আরোগ্য-নিকেতন' সর্বদেশ-সাধারণ বাস্তবতার আদর্শ সব সময় রক্ষা না করিলেও, জাতির বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ও ধ্যান—কল্পনার চিত্ররূপে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই কয়েকখানি হিন্দু-জীবন-দর্শনের মর্মবাণী-প্রকাশক উপন্যাসের সহিত 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'-এর এক পর্যায়ে স্থান নির্দেশ করিলে মনে হয় উহা বিশেষ অসঙ্গত হইবে না।

কুমুদরঞ্জনের কবিতা

(১)

জটিল, অসুস্থ মনোবিকারের যুগে, যখন বস্তুর অভিঘাতে, কামনার অতৃপ্তিতে, বিরুদ্ধ প্রভাবের আকর্ষণে কবির চিত্ত ভারসাম্যচ্যুত ও ছন্দোভ্রষ্ট, তখন একটি সহজ মন ও দ্বন্দ্বলেশহীন জীবনদর্শনের অধিকারী হওয়াই অভাবনীয় সৌভাগ্য। যেখানে পরস্পর-বিরোধী আদর্শ বিভ্রান্তি জাগায়, সীমাহীন দিঙমণ্ডলের সুদূর প্রান্তে মরীচিকার তাপতীক্ষ্ণ আলো কাঁপিতে থাকে, বহু পথের সংযোগস্থলে পৌঁছিয়া অগ্রগতি দ্বিধা-নিশ্চল হয়, কল্পনা মর্ত্য ও পাতালের বিপুল বস্তুসঞ্চয় ও বহুমুখী অস্বস্তি-বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন এই প্রশান্ত একনিষ্ঠতা, মনের এই অচল, অটল, সর্ব-বিক্ষেপজয়ী আত্মপ্রত্যয় কাব্যজগতে এক বিরল ব্যতিক্রম।

আধুনিক যুগের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক এই বিরল মনোভঙ্গীর সৌভাগ্যবান অধিকারী। ৺যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি, ৺কিরণধন চট্টোপাধ্যায় ও জীবিত কবিদের মধ্যে শ্রীকালিদাস রায় ও শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যেই এই অবিচল ঐতিহ্যপ্রীতি, অতীত বাঙলার মনোভাবের এই অস্খলিত অনুস্মৃতি কম-বেশী পরিস্ফুট। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের অতীতানু-বর্তিতার স্বরূপ ইঁহাদের হইতে কিছুটা পৃথক। অন্যান্য কবিরা যখন প্রাচীন সংস্কৃতির জয়গান করেন, মায়া-মমতা-স্নেহ-প্রীতি-দেবভক্তি-অধ্যাত্মআকৃতি-ভরা বাঙালী জীবনবোধের প্রতি উচ্ছ্বসিত স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে একটু বিদ্রোহের উষ্মা, একটু প্রতিবাদের অসহিষ্ণুতার

প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। মনে হয় যেন অন্যে নিন্দা করে বলিয়াই ইঁহারা ইহার বেশী করিয়া প্রশংসা করেন; অপরের বিমুখতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপই ইঁহারা সনাতন আদর্শকে আরও ব্যাকুল আবেগের সহিত জড়াইয়া ধরেন। বাইরের প্রতিকূল, তীক্ষ্ণ বাদল-হাওয়া হইতে আত্মরক্ষা করার জন্যই ইঁহারা ভক্তি ও ভাববিহ্বলতার নামাবলীতে কাব্য-অঙ্গকে আরও পরিপাটি-রূপে আচ্ছাদন করেন। ইঁহাদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে একটু আতিশয্যের স্পর্শ আছে, উচ্চ-বিঘোষিত আনুগত্য-শপথের মধ্যে অনুল্লিখিত কালাপাহাড়ী অভিযানের প্রতিরোধ-চেষ্টা প্রকাশিত। ইঁহাদের যে আন্তরিকতার অভাব আছে তাহা নহে; কিন্তু খোঁচা না পাইলে ইঁহাদের স্বজাত্যভিমান ও প্রাচীন সংস্কৃতির পোষকতা এতটা উগ্রভাবে প্রকট হইত না এরূপ ধারণাকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না।

কিন্তু কুমুদরঞ্জনের মানস গঠন ইঁহাদের সহিত তুলনায় অন্যরূপ। ইনি বাহিরের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখাইয়া নিজ অন্তরের সংস্কার-বিশ্বাসে একেবারে আত্মমগ্ন। তিনি কর্ণের মত অতীত যুগের শান্তি-সন্তোষ-ভক্তি-পরায়ণতার সহজাত কবচ-কুণ্ডলে আবৃত হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাঙলার শুচি-স্নিগ্ধ, ছায়ায় ঘেরা, নিবিড়-অনুভূতি-তন্ময় পল্লীজীবন তাঁহার কবি-মনের আকাঙ্ক্ষা-অভীপ্সাকে এমন অনায়াস বেষ্টনী-রেখায় ধরিয়া রাখিয়াছে যে ইহা তাঁহার স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র ও সহজ নিঃশ্বাস-গ্রহণের অনিবার্য পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। তাঁহার উজানি গ্রাম ও অজয়-কুনুর নদী তাঁহার দেহ ও মনের ভৌগোলিক ও আত্মিক সীমা চূড়ান্তভাবে নির্দেশ করিয়াছে। ইহাদের ছাড়িয়া তিনি এক পাও অগ্রসর হইতে চাহেন নাই; তাঁহার মনের সমস্ত প্রয়োজন, তাঁহার কবি-কল্পনার সমস্ত দাবি, তাঁহার হৃদয়বৃত্তির সমস্ত ক্ষুধা এই এক বিঘত জমির মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাইয়াছে।

যেখানে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে দূরাভিসার কবি-মনের নিয়মিত পদ-চারণার প্রেরণা যোগাইয়াছে, সেখানেও কুমুদরঞ্জন নিকটকে ভুলিয়া দূরের মোহকে স্বীকার করেন নাই। যদি বা তিনি কখনও কখনও নীড় ছাড়িয়া আকাশ-বিহারে প্রণোদিত হইয়া থাকেন, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নভোমণ্ডলের আলোক-প্রসাদ লইয়া নীড়ে প্রত্যাবর্তন। বাহিরে কি ঘটিতেছে না

ঘটিতেছে, ভাব-রাজ্যের কি বৈপ্লবিক হইতেছে, কাব্য-ভাগীরথী উহার পুরাতন প্রণালী পরিত্যাগ ন নূতন খাতে প্রবাহিত হইতেছে, সে বিষয়ে কবি যেন সম্পূর্ণ উদাসীন। ক্রীড়াবিভোর বালক যেমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নিজ ক্ষুদ্র গৃহপ্রাঙ্গণকে বার বার প্রদক্ষিণ করে, তেমনি এই আত্মভোলা কবি বৃহত্তর জগতের ডাক উপেক্ষা করিয়া, যুগের বহুধা-ঘোষিত দাবিতে কর্ণপাত না করিয়া আপনার অব্যবহিত পরিবেশ ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট স্মৃতি-পরিমণ্ডলের চারিদিকে অশ্রান্ত চক্রাবর্তন করিয়া নিজ কবি-প্রাণের সমস্ত আকৃতিকে মিটাইয়াছেন। এই যুগ-সচেতনতার দিক দিয়া তাঁহার সতীর্থ কালিদাস রায়ের সহিত তাঁহার পার্থক্য অনুভব করা যায়। আধুনিক কবিতার কক্ষচ্যুতি ও রুচি-বিপর্যয় লইয়া উভয়েই কবিতা লিখিয়াছেন; কালিদাসের কবিতায় ক্ষুব্ধ অনুযোগ ও মর্মভেদী ব্যঙ্গ, আর কুমুদরঞ্জনের কবিতায় ('কবিতার দুঃখ') প্রশান্ত অস্বীকৃতি ও নির্বিকার আত্মপ্রত্যয় উভয়ের মনোভঙ্গীর প্রভেদ সূচনা করে।

আধুনিক যুগের দূর-বিসর্পিত কক্ষ-পরিক্রমা ও ক্রমপ্রসারশীল কাব্য-কৌতূহলের পরিবেশে এই সহজ ও পরিচিতের প্রতি একান্ত-নির্ভর আত্মনিবেদন অত্যন্ত দুরূহ সাধনার পরিচয়-বাহী। যখন যুগের সকলের মনেই জট পাকাইয়াছে ও দ্বন্দ্ব মুখর হইয়া উঠিয়াছে, তখন একক কবির পক্ষে মধ্যযুগীয় নির্দ্বন্দ্ব ও প্রসন্ন মনোভাব রক্ষা করা এক অসাধারণ ব্যতিক্রম। সমস্ত প্রতিবেশ যখন চোখের সামনে বদলাইয়া যাইতেছে, তখনও কবি তাঁহার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবিধৃত ভাবকেন্দ্রকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতে দেন নাই। খানিকটা ভাষা, রচনারীতি ও কল্পনাবিন্যাসের পার্থক্য বাদ দিলে কুমুদরঞ্জন ভক্তিকেন্দ্রিক ও ভগবৎপ্রেম-বিহ্বল মনোভাবের দিক দিয়া তাঁহার স্বগ্রামের বৈষ্ণব কবি লোচনের সহধর্মী ও সমসাময়িক। মনে হয় যেন লোচনের যুগ হইতে কুমুদরঞ্জনের যুগের কোনোই ভাবগত ব্যবধান নাই; সেই সুদূর ষোড়শ শতক হইতে আজ পর্যন্ত অজয়ের খাতে যে স্রোতোধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে পরিবর্তনের কোন ছন্দ বিবর্তিত হয় নাই। লোচনের যুগে শ্রীচৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ছাড়া আর কোন বিষয় লইয়া কাব্যরচনার রীতি ছিল না; তাঁহার

কবিতায় বৈষ্ণব সাধনার মহামন্ত্র 'তৃণাদিব স্থনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুণা' শুধু চৈতন্য ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর মহিমা-প্রতিপাদনের জন্য উদ্‌গীত হইয়াছে। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় সেই মহামন্ত্রেরই আরও ব্যাপক ও সর্বজনীন প্রয়োগ—তাঁহার পরিবেশের তরুলতা ফুল মানুষ সকলের ক্ষেত্রেই এই সূত্রের মহিমানীতি বিঘোষিত।

বাস্তবিক, আর কোন কবির রচনায় সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বস্তুর এরূপ রাজকীয় একাধিপত্য দেখা যায় না। অন্যান্য কবির ক্ষেত্রে ইহা চিরাভ্যস্ত জীবনযাত্রার একঘেয়েমি হইতে উদ্ধার পাওয়ার একটা উপায় মাত্র—তাঁহাদের পল্লীপ্রীতি আন্তরিক হইলেও ঠিক স্বতঃস্ফূর্ত নহে, শহরের জীবনের সহিত বৈপরীত্য-নির্দেশেই ইহার মুখ্য প্রেরণা। ইহার মধ্যে পূর্বস্মৃতি-রোমন্থনের ভাবাতিশয্য ও অপ্রাপণীয়ের প্রতি আবেগময় আকূতিই প্রধান সুর। সকল কবিকেই যদি আজীবন পল্লীতে বাস করিতে হইত তবে বোধ হয় অতিপরিচয়ের ফলে উহার মোহস্বপ্ন অনেকটা টুটিয়া যাইত। কুমুদরঞ্জনের পল্লীপ্রীতি জীবনব্যাপী পল্লীবাসের প্রতিষেধক প্রভাবকে কাটাইয়া উঠিয়াছে ইহাই তাঁহার কবিমানস-বৈশিষ্ট্য। পল্লীসমাজ সম্বন্ধে তাঁহার মনে এতটুকু গ্লানি বা সংশয়ের ছাপ নাই—ইহার সুপ্রচুর প্রীতিরস, অখণ্ড শান্তি ও সূর্যকরোজ্জ্বল সৌন্দর্যের উপর বাস্তব মেঘাবরণের এতটুকু ছায়াপাত হয় নাই।

যে যুগে সহজ দুর্লভ ও দুর্লভই সহজ কুমুদরঞ্জন সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধাঁধায় ফেলিয়াছেন। আমরা যে সহজের রস গ্রহণ করিবার শক্তিই হারাইয়া ফেলিয়াছি। এখন কবিতা জটিল মনস্তত্ত্ব, তীক্ষ্ণ মনন, উল্লেখের (allusion) কৌশলময় প্রয়োগ ও বিশ্ব-সমস্যার সর্বব্যাপী পটভূমিকা ছাড়া আমাদের রুচিকর হয় না। অতিরিক্ত মসলা-দেওয়া ভোজ্য-দ্রব্যে আমরা এত অভ্যস্ত হইয়াছি যে শুধু ডাল-ভাতের খাদ্যোপকরণ আমাদের রসনার তৃপ্তি বিধান করিতে পারে না। আধুনিক জীবন-যন্ত্রণার কোন স্পর্শ নাই বলিয়াই আমরা কুমুদরঞ্জনের কবিতাকে সেকেলে বলিয়া উপেক্ষাভরে বর্জনেরই পক্ষপাতী। বাঙলার পল্লীজীবনের বিদেশী সার-না-দেওয়া, ভাবালুতায় ভিজে, ভক্তিরসের অবিরল ধারাবর্ষণে কর্দমাক্ত, দীনতার পিছন-উঠান-সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে যে উৎকৃষ্ট কাব্যফসল উৎপন্ন হইতে

পারে তাহা আমাদের দূরাভিসারী, বায়ুবিমানে অভ্যস্ত মন স্বীকার করিতে চায় না। বাঙলার পল্লীর অপরিচ্ছন্ন রাস্তা-ঘাট, এঁদো শ্যাওলা-ভরা পুকুর, ক্ষুদ্র খর্ব-অপ্রিয়দর্শন বাড়িগুলি ও স্থূলরুচি, রুক্ষদেহ বাসিন্দাদের ন্যায় পল্লীকবির রচনাকেও আমরা মানস-অভিনন্দন-বঞ্চিত করিয়া এক ধরনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু এইরূপ ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যেও যে স্বচ্ছ, নির্মল ভাবধারা ও প্রচুর-উৎসারিত রসনির্ঝর বহানো যায়, কুমুদরঞ্জনের কবিতাতেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। ছোট ফুল, ছোট পাখি, পল্লীগ্রামের বৈচিত্র্যহীন দৃশ্য ও জীবনযাত্রা যে বিশেষ মেজাজের কবির মনে আনন্দপ্রস্রবণ সৃষ্টি করিতে ও তাঁহার কাব্যপ্রেরণা উদ্বোধন করিতে পারে তাহাও এখানে উদাহৃত। কুমুদরঞ্জন নানারূপে এই ছোটর দাবি তাঁহার কবিতায় উপস্থাপিত করিয়াছেন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাব্যরসিকের মনে এই দাবি সুপ্রতিষ্ঠিতও করিয়াছেন।

(২)

তবে এই সহজ রসের কবির রচনায় যে ভাবগত দুর্বলতা ও বিষয়গত সংকীর্ণতা মাঝে মধ্যে দেখা দিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কবি বর্তমান যুগকে উপেক্ষা করিয়াছেন কিন্তু এই যুগের কাব্যানুরঞ্জন ও কল্পনালীলা তাঁহাকে প্রভাবিত না করিয়া পারে নাই। বর্তমানযুগ-সুলভ চড়া সুরের গান শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনেও এই চড়া সুরের প্রতি একটা প্রলোভন জাগিয়াছে। এবং তাঁহার শিল্পবোধের আপেক্ষিক অভাবের জন্যই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরলতার সহিত এই চেষ্টাকৃত কল্পনাসমুন্নতির সকল সময় সুসমঞ্জস মিলন হয় নাই। সহজ ভাব ও সুরের এই একনিষ্ঠ সাধকও মাঝে মাঝে ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস হারাইয়াছেন।

অজয়ের চরের প্রশস্তি রচনা করিতে কবি কুম্ভমেলা, হরিহরচ্ছত্র, কন্যা-কুমারী ও সেতুবন্ধ রামেশ্বরের তীর্থমহিমা উহাতে আরোপ করিতে গিয়া কবিতার ভাব-সঙ্গতি নষ্ট করিয়াছেন। পাড়াগাঁয়ের অন্ধকার রাত্রের রমণীয়তা বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি অন্ধকারকে রাজসূয় যজ্ঞের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আবার অজয়ের বন্যা তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের কোলাহলের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। এই পুরাণ-মহিমাব্যঞ্জক উল্লেখ যে কবিতার মূল

সুরের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ও উহার আবির্ভাব যে ভাবাষঙ্গের দিক হইতে অবাঞ্ছিত ও অনধিকারপ্রবেশের মত, আত্ম-চিন্তা-বিভোর কবির মনে এ সমস্ত বিচারের উদয়ই হয় নাই। এই পৌরাণিক উপমা যে পল্লীজীবনের সহজ মহিমাকে না বাড়াইয়া ক্ষুণ্ণই করিয়াছে ইহাও কবি ভাবিয়া দেখেন নাই। সহজের সঙ্গে কারবারে এই জাতীয় বিপদ এড়ানো কঠিন। যতক্ষণ কবি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে একান্তভাবে আত্মনিমগ্ন থাকেন, ততক্ষণ কবিতা ভাবে ও রূপে অনবদ্য থাকে। যে মুহূর্তে তাঁহার সচেতন চিন্তা বা সযত্ন প্রয়াস সহজের উপর রং ফলাইতে অভিলাষী হয়, তখনই কবিতা স্বধর্মচ্যুত হইয়া পড়ে। স্ব-বিরোধী, বহিরাগত ভাব-ভাবনা সহজ রসের কবিতায় যত দৃষ্টিকটুভাবে প্রকট হয়, মননশীল ও শিল্পবোধ-নিয়ন্ত্রিত কবিতায় ততটা হয় না।

কুমুদরঞ্জনের যে সমস্ত কবিতা পল্লীজীবনকে ছাড়াইয়া একটু বৃহত্তর পরিবেশে বিচরণশীল, তাহাদের মধ্যে সহজ ভাবপ্রেরণা অপেক্ষা সচেতন যুক্তিবিন্যাস ও তত্ত্বপ্রতিপাদন-প্রয়াস বেশী করিয়া চোখে পড়ে। তাঁহার অনেক কবিতাতেই এই যুক্তিধর্মী মনের প্রভাব সুপরিস্ফুট। যুক্তিশৃঙ্খলার টানে যে শুষ্ক-নীরস, গদ্যপ্রধান বাগ্‌ভঙ্গী কবিতায় ভিড় করে, সেই পাষাণে গাঁথা দেওয়াল ভেদ করিয়া কাব্যরসের স্ফুরণ ও অগ্রগতি ব্যাহত হইয়া পড়ে। এই সমস্ত চিন্তা স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির অঙ্গরূপে আসে নাই, আসিয়াছে যুক্তিবাদের কাব্য-নিরপেক্ষ আকর্ষণে। ইহারা ছন্দোবন্ধনে ধরা দিয়া কাব্যের সমগোত্রীয়ত্ব অর্জন করিতে প্রয়াসী হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের অঙ্গে কাব্যপারিজাতের সুরভি নাই। ইহারা কাব্য-প্রবাহে চলিয়াছে, নদীস্রোতে উপলখণ্ডের মত, বেগকে হ্রাস করিয়া ও সুললিত জল-কল্লোলের সহিত কিঞ্চিৎ কর্কশধ্বনি মিশাইয়া। কুমুদরঞ্জন ও তাঁহার সমধর্মী সুহৃদ কালিদাস রায়ের কবিতায় এই গদ্যপ্রবণতা একটা সাধারণ লক্ষণ। যেখানে নিবিড় ভাব-তন্ময়তা ও একাগ্র ভক্তিসাধনা মধুর রসের উৎসকে স্বাভাবিকভাবে খুলিয়া দেয় না, সেখানে ইহাদের কাব্য—স্রোতস্বতী রেবানদীর ন্যায় শীর্ণকায়া ও উপলব্যথিতগতি। হয়তো প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্মবোধের উপর একান্ত নির্ভরশীলতাই ইহাদের এই রসে-তথ্যে-মেশানো, গদ্যপদ্য-মিশ্রিত মনোভাবের জন্য দায়ী। আমরা প্রাচীন ভাবাদর্শকে বহন করি খানিকটা পুষ্পসুবাসের

ন্যায় অন্তরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, খানিকটা বোঝা বহার মত কাঁধে করিয়া। ঐতিহ্যের সবটুকু মানসরসে ও স্বাধীন অনুভূতিতে পুষ্ট হয় না—কিছুটা শুষ্ক জীর্ণ বস্তুস্তূপের মত আমাদের চিত্তকে ভারাক্রান্ত করে। ইহার মধ্যে কিছুটা হোমানলের ইন্ধন, কিছুটা ধূম্রনিঃস্রাবী ভিজে কাঠ। অতীত কীর্তির গুণগানে কবিরা সব সময় বিশুদ্ধ কাব্য-প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন না। একটা দেশাত্মবোধমূলক কর্তব্যবোধ তাঁহাদের লেখনীকে অল্পাধিক পরিমাণে প্রভাবিত করে। তাঁহারা জীবনযাত্রার যে আদর্শকে অত্যন্ত প্রিয় মনে করেন, তাহার উৎসমূলে পৌছিতে তাঁহাদের আগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু এই অভিযাত্রায় তাঁহাদিগকে যে প্রেরণা পথ দেখাইয়া লইয়া যায় তাহা ততটা কবিকল্পনা নহে, যতটা ইতিহাস-বোধ ও ভৌগোলিক কৌতূহল। কাজেই এই জাতীয় কবিতায় আমরা যতটা তাঁহাদের মানস প্রতিবেশের পরিচয় পাই, ততটা কবিত্বশক্তির পরিচয় পাই না।

কুমুদরঞ্জনের ক্ষেত্রে শুধু অতীত সংস্কৃতির ধর্মচেতনা নহে, ইতিহাসচেতনাও অতিমাত্রায় প্রকট হইয়াছে। অবশ্য ইতিহাসের জটিল পথে পরিভ্রমণ করার অনুকূল মানস প্রবণতা তাঁহার ন্যায় একমুখী কল্পনার অধিকারী কবির ছিল না। অতীত ইতিহাসের কেন্দ্রস্থলে তিনি সেই একই ধর্মচেতনা ও ভাবোল্লাসকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সোমনাথের মন্দির বিভিন্ন যুগে বৈদেশিক পর্যটকের মনে কিরূপ বিস্ময় ও সম্ভ্রমবোধ জাগাইয়াছিল তিনি তাহাই অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য ইহার পিছনে তাঁহার নিজের ভক্তিপ্রসূত বিস্ময়বোধই প্রধানভাবে কার্যকারী হইয়াছে। কিন্তু এই ইতিহাসবোধ তাঁহার কবিতার মূল সুরের বিশেষ পোষকতা করে নাই —তিনি দরিদ্রা পল্লীলক্ষ্মীকে ইতিহাসের ছিন্ন-খণ্ড মসলিনের টুকরায়, রাজবেশের এক-আধটু স্বর্ণখচিত জরির প্রান্ত দিয়া সাজাইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। ফল একটু বিসদৃশই দাঁড়াইয়াছে। আসল কথা পল্লীবাঙলার একটা কালগত ইতিহাস ছিল, কিন্তু ইহা একটা মর্মগত ইতিহাসে কোনদিনই পরিণত হয় নাই। ইহার প্রাণরহস্য নিহিত আছে স্থূল ঘটনাগত প্রতিবেশে নহে, অধ্যাত্ম-সাধনা ও স্থিরপ্রতিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনচর্চার নিগূঢ় মধুরসচক্রে। কবি এই মধুরস আস্বাদন করিতে গিয়া যদি ইতিহাসনির্ভর হইয়া পড়েন, তবে ইতিহাসের কণ্টকে ছিন্নপক্ষ

হইবেন, মধুর উৎসমূলে পৌঁছিতে পারিবেন না। যে পথ বাহিরে টানে, তাহা অন্তরলোকে প্রবেশের সহায়তা করিতে পারে না। আমরা ইতিহাসের মরুপ্রান্তরে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া প্রাণ-নির্ঝরিণীর কূলে পৌঁছিবার পথ হারাইয়াছি।

(৩)

সব দোষ-ত্রুটি ধরিয়াও কুমুদরঞ্জন সদ্যো-অতীত যুগের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি তাহা অস্বীকার করা যায় না। সহজকে তিনি এত চিত্তাকর্ষক করিয়া দেখাইয়াছেন, সরলের মধ্যে তিনি এত ভাবগভীরতা আবিষ্কার করিয়াছেন, চিরাভ্যস্ত সংস্কারের মধ্যে এমন বিশুদ্ধ রসলীলামাধুরীর পরিচয় দিয়াছেন, অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের যাযাবরত্বকে এমন একনিষ্ঠ ভাবকেন্দ্রে সংহত করিয়াছেন যে, যে সমাজ-পরিবেশ আমাদের চোখের সামনে মরীচিকার ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহাকে তিনি এক মায়ামন্দির ভাবকল্পনার মধ্যে চিরন্তন রূপের অমরতা দিয়াছেন। যাঁহারা এখনও এই দ্রুত বিলীয়মান সংস্কৃতি-সাধনাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন, এই ভাঙ্গা দেউলের দেবতার নিকট ভক্তি-অর্ঘ্য সাজাইতেছেন, কাব্যের আধারে নূতন করিয়া প্রাচীন আরতির দীপ জ্বালাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিলাভের অধিকারী। জানি না—তাঁহাদের কবিতা কি শুধু ইতিহাসের উপকরণ যোগাইবে না আমাদের রসানুভূতির জীবন্ত অভিনন্দনে ধন্য হইবে? স্তূপপাদ-মূলে শেষ আরতির শিখা কি ইঁহাদের জীবনাবসানের সঙ্গে চির-নির্বাপিত হইবে না ভবিষ্যতের কবিগোষ্ঠী উহাকে জ্বালাইয়া রাখিবেন এই সংশয়াকুল প্রশ্নের মধ্যেই আমাদের আলোচনার উপসংহার হইল।

বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবনযাত্রার কাহিনী

সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' মানভূম অঞ্চলের আদিমজাতি-অধ্যুষিত পল্লীজীবনের কাহিনী। এই কৃষিনির্ভর জীবনের মধ্যে নূতন শিল্পীকরণের খরস্রোত পরিবর্তনধারা বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিকে নূতন কল-কারখানা, রেল-লাইন, কয়লাখনি অপর দিকে খ্রীষ্টধর্মের লোভনীয় জৌলুষ,

বাহিরের চাকচিক্যময় জীবনযাত্রার মোহ আদিম বিশ্বাসসংস্কারপুষ্ট কৃষকের জীবননিষ্ঠাতে ভাঙ্গন ধরাইয়াছে। বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয়কারী ঝড়-ঝাপটা ও জীবিকার্জনের দুরূহতা এই ভাঙ্গনের গতি দ্রুততর করিতেছে। দাশু ঘরামি ও তাহার স্ত্রী মুরলী দুই বিপরীতমুখী জীবনাদর্শের প্রতীক্—দাশুর প্রাচীন জীবন-দর্শনে অবিচলিত নিষ্ঠা, সে নিজের জমিতে সোনার ফসল ফলাইবার স্বপ্নে বিভোর। পুরাতন রীতিনীতি, আমোদ-উৎসবের ও কপালবাবা ও আঞ্চলিক প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে তাহার নাড়ীর অচ্ছেদ্য যোগ। মুরলী নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছে, সিষ্টার দিদির সস্নেহ অভিভাবকত্বের মাধ্যমে সে খ্রীষ্টান জীবনের ভদ্ররুচি ও উন্নততর মানের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে ও তাহার মোহহীন বাস্তববুদ্ধি ধ্বংসোন্মুখ কৃষিজীবনের অনির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে। তাই যে দিন দাশু ঘরামি পাঁচ বৎসর জেল খাটিয়া ঘরে ফিরিয়াছে, সে দিন হইতেই উহাদের সম্বন্ধ এক দ্বন্দ্ব-জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে। সে দাশুকে ভালবাসে, তাহার যৌবনমদির আলিঙ্গনে সে ধরা দেয়। কিন্তু তাহার অবাস্তব আশা-কল্পনা, অসম্ভব জীবনস্বপ্নের প্রতি তাহার প্রখর অবজ্ঞা। সে দাশুকে পুরাতন উপায়ে জীবিকার্জনের সুযোগ দিয়াছে, কিন্তু দাশু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহার ক্ষুধার অন্ন যোগাইতে পারে নাই। সুতরাং শেষ পর্যন্ত সে মুরলীকে নিজের পথে চলিবার স্বাধীনতা দিয়াছে। মুরলী দাশুর ছেলে গর্ভে ধরিয়া দাশুর বাড়ী ছাড়িয়াছে।

মুরলীর ঘর-বাঁধার দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হইয়াছে খ্রীষ্টধর্মান্তরিত পলুশ হালদারের সহিত দাম্পত্য-সম্পর্ক-স্থাপনের মধ্য দিয়া। কিন্তু এই দ্বিতীয় পরীক্ষাও প্রথম পরীক্ষার ন্যায় ব্যর্থ হইয়াছে। পলুশের প্রতি তাহার গোড়া হইতেই একটা বিমুখতা জাগিয়াছে—তাহার আলিঙ্গন-প্রয়াস, দাম্পত্য অধিকার-প্রয়োগকে সে কোন দিনই প্রসন্ন স্বীকৃতি দেয় নাই। সে পলুশকে অলঙ্কার-অঙ্গসজ্জার বিচিত্র ফরমায়েসে বিব্রত করিয়াছে—দুরূহ হইতে দুরূহতর পরীক্ষার মানদণ্ডে তাহার স্বামিত্বের যোগ্যতা যাচাই করিয়াছে; কিন্তু স্ত্রী হিসাবে তাহার নিজেরও যে একটা কর্তব্য আছে তাহা মানিয়া লয় নাই। পলুশও তাহার পূর্বস্বামীর ঔরসজাত গর্ভস্থ সন্তানকে বরদাস্ত করিতে পারে নাই। সে অপরের ছেলেকে কখনই নিজ ঘরে স্থান দিবে না। শেষ পর্যন্ত অনাথাশ্রমে মুরলীর প্রসব হয় ও তাহার ছেলেও সেখানে মানুষ হইতে

থাকে। এই সূক্ষ্ম অতৃপ্তিকে উপলক্ষ্য করিয়াই উহাদের দাম্পত্য জীবনে আবার চিড় ধরে। মুরলী পলুশের বদলির পর তাহার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া কনভেণ্টের ঘরে আশ্রয় লয় ও পলুশের স্থূল, অবাঞ্ছিত সাহচর্য তাহার জীবন হইতে খসিয়া পড়ে।

তৃতীয় দফায় মুরলী ওরফে জোহানা উচ্চতর শাখায় নীড়-রচনার প্রতি লক্ষ্য দিয়াছে। সে খ্রীষ্টান ডাক্তার শিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন রিচার্ড সরকারের যোগ্য হইবার জন্য সাধনা করিয়াছে—লেখাপড়ায়, গানবাজনায়, শিল্পকর্মে অভিজাত সমাজে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত হইতে চাহিয়াছে। পলুশের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর রিচার্ডের সহিত তাহার খ্রীষ্টান বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পলুশের প্রধান মুরুব্বি সিষ্টার দিদি এই অনুচিত আচরণে প্রশ্রয় দিয়া তাঁহার নিকট ন্যায়নীতি অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষ-সমর্থনই যে বড়, তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু এই বিবাহ একটা প্রকাণ্ড প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। রিচার্ড যে যৌনশক্তিহীন তাহা সে নব-পরিণীতা স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়াছে, অথচ বাহিরে সুখী দাম্পত্য জীবনের ছলনা বজায় রাখা যে সামাজিক কর্তব্য তাহাই বুঝাইয়াছে। মুরলীর নানা অতৃপ্ত-কামনাপূর্ণ, উচ্চাভিলাষে অশান্ত নারীজীবনের এইভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটিল। তাহার অপত্যস্নেহ ও দাম্পত্য মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সমস্ত সুস্থ প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হইয়া সে জীবনভোর কেবল মাত্র ঐশ্বর্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার বলিরূপে এক ছদ্ম জীবনের অভিনয় করিতে বাধ্য হইল। তাহার নারীহৃদয়ের সমস্ত সরস শাঁস শুকাইয়া গিয়া সে কেবল নারীত্বের খোলস পরিয়া জীবন কাটাইল। তাহার কুষ্ঠরোগগ্রস্ত প্রথম স্বামী দাশু ঘরামিকে সে স্বচ্ছন্দে মৃত্যুর পথ দেখাইয়া দিল। বাল্য ও কৈশোরে যে সরল গ্রাম-গোষ্ঠীর রসধারায় তাহার দেহ-মনের সুস্থ বিকাশ ও লাবণ্য-সঞ্চার হইয়াছিল তাহার পরিবর্তে কেতাদুরস্ত, বহিঃসৌষ্ঠব-বিড়ম্বিত খ্রীষ্টান সমাজের আশ্রয়ে সে পুরাতনের সম্বলও হারাইল ও নূতন কিছু সঞ্চয় করিতে পারিল না।

মুরলীর প্রথম দিকের জীবনে অন্তর্দ্বন্দ্ব, দাশু ও পলুশের মধ্যে তাহার দোলায়িত চিত্ত-বিশ্লেষণে লেখক প্রশংসনীয় মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার সমস্ত দ্বন্দ্ব থামিয়া গিয়াছে—সে সমাজ-প্রতিষ্ঠাকে জীবন-সার্থকতার প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া নিজ অন্তরের সজীবতাই

হারাইয়া ফেলিয়াছে। এমন কি রিচার্ডের চরম বঞ্চনাও তাহার মনে কোন প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ জ্বালাইতে পারে নাই। তাহার চিত্তের সমস্ত অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যে ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে তাহার উপর কোন আঘাতই দাগ কাটে না। দাশু ঘরামিই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা প্রাণোচ্ছল চরিত্র—সমস্ত উপন্যাসের মর্মবাণী। উহার নিগূঢ় জীবনবোধটি তাহার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তাহার সহিত মধুকুপির সমস্ত প্রকৃতি-পরিবেশের কি অপূর্ব প্রাণময় সংযোগ! তাহার প্রতি রক্তকণায়, অনুভূতির প্রতি শিরা-উপশিরায় প্রকৃতির প্রাণলীলা সঞ্চারিত হইয়াছে। মূক প্রকৃতি তাহার কণ্ঠে মুখর হইয়া উঠিয়াছে, উহার অর্ধচেতন সংকেত-ইঙ্গিতসমূহ যেন তাহার মানবিক চেতনায় একটি অখণ্ড তাৎপর্যে সূত্রবদ্ধ হইয়াছে। কপাল-বাবার জঙ্গল, ছোটকালু, বড় কালু পাহাড়, ডরানী নদী প্রভৃতি গ্রাম্য প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য যেন তাহার অস্থিমজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে—তাহার নিঃশ্বাসবায়ুতে উহাদের অদৃশ্য সৌরভ, তাহার চিন্তা-কল্পনায় উহাদের আলো-ছায়ার কম্পন, তাহার উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ ও করুণ আক্ষেপে উহাদের সমস্ত অব্যক্ত প্রাণসত্তা ও অনির্দেশ্য আকুতি যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। দাশু ঘরামির জীবনের ব্যর্থতায় ও ট্রাজিক মৃত্যুতে যেন মধুকুপির প্রতিকূল শক্তির অভিভব-জর্জর, কল-কারখানার অভিযানে ক্লিষ্ট, নিশ্চিত ধ্বংসের প্রতীক্ষায় বিমূঢ় আত্মা আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে। একটা সমগ্র সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্তিম পরিণতি যেন দাশুর জীবনে নিবিড় ছায়া ফেলিয়াছে। এই প্রকৃতি-নির্ভর আদিম জীবন আমাদের হার্ডির উপন্যাসের কথা মনে পড়াইয়া দেয়! এমন কি বাঘিনী কানারাণী পর্যন্ত এই বনভূমির আত্মার একটি অংশ। অন্ধকার নিশীথে অরণ্যের ছায়ানিবিড়তার মধ্যে তাহার একমাত্র চোখে যে সবুজ আলো জ্বলিয়া উঠে তাহা যেন ধ্বংস-মুখীন আরণ্য জনপদের আসন্ন বিপদ-সঙ্কেত। দাশু তাহারও সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ অনুভব করে। বিধর্মী পলুশের গুলিতে তাহার রক্তাক্ত জীবনাবসান শুধু তাহারই নয়, যন্ত্রসভ্যতার চাপে আরণ্যক জীবন-সংস্কারের বিলুপ্তি ঘোষণা করে।

এই আদিম সংস্কৃতি ও জীবনবোধের বিরুদ্ধে আধুনিকতার নানামুখীন সাঁড়াশি অভিযান চালাইয়াছে। প্রথমতঃ খ্রীষ্টান ধর্মযাজক-সম্প্রদায় সিষ্টার

দিদির নেতৃত্বে ইহার বর্বর কুসংস্কারাশ্রিত জীবনকে উন্মূলিত করিতে,—ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নততর জীবনযাত্রার প্রলোভনে ইহার আত্মাকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছে। গডবাবা কপালবাবাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে। তারপর যন্ত্রসভ্যতা তাহার বিরাট আয়োজন ও সুখসম্ভার লইয়া ক্ষীয়মান কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করিয়াছে—সরল বলিষ্ঠ কৃষাণ যুবককে কয়লার খাদে, কারখানার যন্ত্রগৃহে, পুঁজিপতির জটিল ব্যবসায়-জালের অঙ্গরূপে তাহার চিরপ্রথাগত পদ্ধতিধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে। এমন কি কৃষিকার্যেও ঈশান মোক্তার, দুখনবাবু প্রভৃতি শোষণনীতির প্রতীকরূপে আবির্ভূত হইয়া আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কৃষককে দিনমজুরের অমর্যাদার মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছে। তারপর পুলিশী অত্যাচার ও জুলুম ধনীর হাতে অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া দুর্বলকে পর্যুদস্ত করিয়া তাহার ললাটে দাগী আসামীর কলঙ্কলেপন করিতেছে। দাশু ঘরামী এই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সম্মিলিত চাপে সংহত সমাজের সুবিন্যস্ত অঙ্গ হইতে একটা সর্বাশ্রয়চ্যুত, দিশাহারা জীবন-কণিকার তুচ্ছতায়, ঝড়ের মুখে উড়া ধূলিকণার অসহায়ত্বে পর্যবসিত হইয়াছে। তাহার দেহের কুষ্ঠরোগ তাহার অন্তরের অশুচি অস্পৃশ্যতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

(২)

উপন্যাসের সংলাপ ও মন্তব্য-বিশ্লেষণে মানভূম অঞ্চলের আদিম গোষ্ঠীর বাগ্‌রীতির চমৎকার ও অব্যভিচারী প্রয়োগ হইয়াছে। এই ভাষা বাংলা ভাষারই একটি আঞ্চলিক প্রতিরূপ। ইহার ভাব-প্রকাশ করার ও ছবি ফুটাইয়া তোলার শক্তি অসাধারণ। ইহা এই আদিম গোষ্ঠীর সমগ্র জীবন-দর্শন, ইহার অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার, সহজ কবিত্বময় অনুভূতি ও রসোচ্ছল জীবনবোধের নিঁখুত প্রতিচ্ছবি। ইহা চেতন মনের সীমা ছাড়াইয়া অবচেতন স্তরের অমূল ভাবস্পন্দনকে ধ্বনিত করিয়াছে। ইহাদের বাগ্‌রীতির ভিতর দিয়া মনের যে ছবি ফুটিয়াছে তাহা শুধু বুদ্ধিশাসিত, সুশৃঙ্খল সরল-রেখাঙ্কিত বৃত্তিসমাবেশ নহে। ইহার মধ্যে বস্তুজ্ঞান ও অদৃশ্য-ভীতির, মৃত্তিকা ও বায়ুস্তরের, জানা ও অজানার, ব্যবহারিক ও ঐন্দ্রজালিক উপাদানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। মানুষগুলার

প্রত্যেকটি উক্তি ও কার্যে, তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এই মিশ্র অনুভূতির পরিচয় পরিস্ফুট। সমগ্র বইখানি এই আদিম, আরণ্যক গন্ধে ভরপূর।

এখানে দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যেও অসংস্কৃত যৌন আকাঙ্ক্ষাই প্রবল—যৌন পরিতৃপ্তির স্থূল মানদণ্ডেই স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বিচার করে। আচরণ ও আদর্শ-বৈষম্যের সমস্ত সূক্ষ্মতর বোধ এই দেহভোগের উগ্রতার প্রভাবের দ্বারা অভিভূত। এখানে আনুকূল্য ও বিমুখতা প্রধানতঃ এই সহজ-সংস্কারসঞ্জাত—বিচারবুদ্ধি ও ঔচিত্যবোধ ইহারই পরবর্তী পরিণতি। মুরলীর দাশুর প্রতি অনুরাগ ও পলুশের প্রতি বিরাগ এই কামনারই দুর্বোধ্য অথচ অনিবার্য প্রতিক্রিয়া—তাই দাশুর শত অক্ষমতা ও তাহার সহিত গুরুতর মতপার্থক্য সত্ত্বেও মুরলীর তাহার প্রতি একটা রক্তকণাবাহিত প্রশ্রয়-দাক্ষিণ্য শেষ পর্যন্ত বজায় আছে। পলুশের সমস্ত অনিন্দনীয় আচরণ ও উন্নততর সংসারব্যবস্থা সত্ত্বেও তাহার প্রতি মুরলীর একটা স্বভাবসিদ্ধ বিরূপতা উভয়ের দাম্পত্যমিলনকে ছন্দভ্রষ্ট করিয়াছে। রিচার্ড সরকারের সঙ্গে যৌনসম্পর্কের অসম্ভাব্যতাই তাহার প্রতি মুরলীর মনোভাবকে একটা নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের পর্যায়ের উপরে উঠিতে দেয় নাই—বোতলের শাদা জল এক বিন্দু বর্ণপ্রক্ষেপেও রঞ্জিত হয় নাই। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই কামায়ন-নির্ভর জীবন ফ্রয়েড প্রভৃতির মনোবিকলনমূলক যৌনতত্ত্বেরই সমর্থন করে। কিন্তু আদিম জীবনযাত্রার এই যৌন প্রবৃত্তির চেতনা ও প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—আধুনিক মনস্তত্ত্বের সংস্পর্শহীন। সন্তান-কামনা ও স্পর্শাতুরতা ইহার প্রধান বহির্লক্ষণ ও ইহার প্রকাশের জন্য যে সরস, চিত্রধর্মী, ইঙ্গিতময় ভাষার প্রয়োগ হইয়াছে তাহাও আধুনিক যুগের বিজ্ঞানতত্ত্বকণ্টকিত, অমূর্ত-(abstract) ভাবনা-পরিকীর্ণ পরিভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত। রসকে তত্ত্বে পরিণত করিলে, ইক্ষুদণ্ডকে কলে দিয়া ছোবড়াসর্বস্ব করিলে জীবনের সহজ প্রেরণার যে বিকার ঘটে, আদিম প্রকৃতিনির্ভর, প্রাণধর্মী মানবগোষ্ঠীর সহিত বর্তমানের তত্ত্বনিয়ন্ত্রিত, বিশ্লেষণপ্রবণ, অতিসচেতন সমাজের অনেকটা সেইরূপ পার্থক্য। গ্রন্থখানির মধ্যে অবিকৃত জীবনরসের আস্বাদন আমাদের রসনায় এক নূতন স্বাদুতার আনন্দ দেয়।

এই উপাদেয় উপন্যাসে একটা বড় রকমের ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। মনে হয় যে লেখক সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাতত্ত্বে এতই নিবিষ্ট ছিলেন, যে একটি স্থূল শারীরতথ্য তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। উপন্যাসে ঘটনা-পরিণতি ও চরিত্র-সংঘাতের একটা মূল কারণ হইল মুরলীর গর্ভে দাশুর ঔরসজাত সন্তান-ধারণ। এই সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য মুরলী উপবাস-ক্লিষ্ট দাশুর আশ্রয় ছাড়িয়াছে, পলুশের দেওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে সে তাহার পূর্বতন সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে। আবার পলুশের সঙ্গে তাহার মনোমালিন্যের একমাত্র কারণ হইল পলুশের পরের ছেলেকে ঘরে ঠাঁই দিতে অসম্মতি। অবশ্য শেষপর্যন্ত এই ছেলে খৃষ্টান অনাথাশ্রমে মানুষ হইয়াছে ও রিচার্ডের সহিত বিবাহের পর তাহার প্রতি মুরলীর মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাস সম্পূর্ণ উপিয়া গিয়াছে। কিন্তু এত বড় একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার বাস্তব ভিত্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য। পাঁচ বৎসর জেলে থাকার পর দাশুর সঙ্গে যে রাত্রিতে মুরলীর প্রথম মিলন হইয়াছে, সেইক্ষণ হইতেই এই শিশুর আবির্ভাব-সম্ভাবনা তাহাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে অভিভূত করিয়াছে। এমন কি দেহসংসর্গের পূর্বেই মুরলীর অসতীত্বের সংশয় মিলনের আনন্দকে কিছুটা উন্মনা ও দ্বিধাগ্রস্ত করিয়াছে। এক রাত্রির সংসর্গফলে গর্ভমধ্যে ভ্রূণের সঞ্চার ও উহা লইয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমস্যা-জটিলতার সৃষ্টি—এ যেন রূপকথার অনৈসর্গিকতাকেও হার মানাইয়াছে। সুবোধ ঘোষের মত একজন শক্তিশালী ও জীবনরহস্যবিদ্ লেখক যে গল্পের সূচনাতেই এরূপ প্রমাদগ্রস্ত হইবেন তাহা অভাবনীয় মনে হয়। হয়ত ঘটনার যে দ্রুত পরিণতি ঘটিয়াছে তাহার গতিবেগ-সঞ্চারের জন্য এরূপ একটি কারণ অনুমান করা ছাড়া তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, ইহাতে যে বাস্তবতার ও বিশ্বাসযোগ্যতার বিশেষ অপহ্নব ঘটিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

এই উপন্যাসটি বিষয়ের অভিনবত্বে, সাঙ্কেতিক রীতির উপস্থাপনা-কৌশলে, প্রতিবেশ-চিত্রণের তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণাঢ্যতায় ও দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ মানবচরিত্র-রূপায়নে উপন্যাস-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনা। ইহাতে লেখকের পূর্বরচনা 'ত্রিযামা'তে অনুসৃত সাঙ্কেতিকতার সার্থকতর প্রয়োগ হইয়াছে। 'ত্রিযামা'তে ঘটনা ও চরিত্র সাধারণ ভদ্র ও শিক্ষিত শ্রেণীর জীবন-সম্পৃক্ত—ইহার সাংকেতিকতা চরিত্রাবলীর মনোভাব-প্রকাশের ও ঘটনার তাৎপর্য-

নির্দেশের একটা কল্পনাকুশল উপায় মাত্র—মানব-চরিত্রের উপর রূপকাভাসের আরোপ মাত্র। প্রাচীন শিল্পকলার উদ্ধার, সংরক্ষণ ও ইহার অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শের রহস্য-প্রকাশকে কেন্দ্র করিয়া ঘটনা ও আবেগের যে বৃত্তাংশ আবর্তিত হইয়াছে তাহারই সঙ্গে রূপকের একটা সহজ সঙ্গতি ও সংযোগ আছে। অন্যত্র ইহা বিষয়ের অঙ্গীভূত নহে, লেখক-কল্পনা-উদ্ভাবিত কলাকৌশলের সচেতন প্রয়োগ মাত্র। তুলনায় 'শতকিয়া'-য় রূপক-রীতি প্রায় সমস্ত পাত্র-পাত্রীরই স্বরূপ-দ্যোতনা, তাহাদের প্রকৃতিরই সহজধর্ম ও নিগূঢ় পরিচয়। ইহার নর-নারীর মধ্যে ব্যক্তিচেতনা ও বৃহত্তর পরিবেশমূলক গোষ্ঠী-চেতনা এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে ইহাদের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে আরও একটা প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচয় ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। দাশু ঘরামির সংকীর্ণ কর্ম ও ভাব-পরিধি, তাহার প্রতি পদক্ষেপে বিড়ম্বিত, পারিপার্শ্বিকের চক্রান্তে একান্ত বিমূঢ়, স্তম্ভিত আত্ম-প্রকাশের মধ্যে যেন আর এক জগতের স্মৃতি ও সংস্কারপুষ্ট, উদ্বাস্তু আত্মা অসহায় আত্মজিজ্ঞাসায় ও অন্ধ উদ্‌ভ্রান্তিতে বিধুর হইয়া উঠিয়াছে। মুরলীর অস্থিরতা ও অস্বস্তি, অনেকটা তাহার অজ্ঞাতসারে, এই অস্বীকৃত ঐতিহ্যপ্রভাবেরই সাক্ষ্য বহন করে। দাশু এই ঐতিহ্যের প্রতীক বলিয়াই তাহার প্রিয়; পলুশের স্বভাবগত পরুষতা তাহার পরধর্মের মুখোস পরার জন্যই আরও রুক্ষদর্শন হইয়াছে। সকালীর জীবনে এই স্বধর্মকে আঁকড়াইয়া ধরার প্রবৃত্তি আরও মর্মান্তিক করুণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। সে স্বধর্মত্যাগী পলুশকে ছাড়িয়াছে ও নিজ সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠাবান দাশুকে আশ্রয় করিতে চাহিয়াছে। মুরলী ও সকালীর মধ্যে একটা সমগ্র সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনের দুরন্ত ব্যবধান—একের যাহা বিষ, অপরের তাহা সুমিষ্ট পানীয়। অনার্য-গোষ্ঠীর নর-নারীগুলি ঘরছাড়া হইলেই কেমন সহজে অরণ্য-প্রকৃতি-পরিবেশের সহিত মিশিয়া যায়, সকালী তাহার এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। সে গার্হস্থ্য জীবন হইতে দারুণ আঘাতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া এক মুহূর্তেই মানবের আচার-বদ্ধ জীবনের খোলস ঝাড়িয়া ফেলিয়া অর্ধচেতন প্রকৃতির সুরে সুর মিলাইয়াছে। ইহাদের এক পা যেন মানবিকতায়, আর এক পা বর্বর বন্যতায়। সে দাশুকে বাঁচাইতে চাহিয়াছে, তাহার কুষ্ঠরোগ-বীভৎস আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইতে প্রস্তাব

করিয়াছে, তাহার বিকৃত দেহের অন্তরালে যে জ্যোতির্ময় আত্মা তাহার গলায় বরমাল্য পরাইতে ঔৎসুক্য দেখাইয়াছে। এইরূপে আদিম জীবন-দর্শনের চিত্ররূপে এই উপন্যাসটি স্মরণীয়তা অর্জন করিবে এরূপ আশা করা যায়।

ঐতিহাসিক উপন্যাস ঃ একালের ও সেকালের

(১)

দিবারাত্রির প্রহরে প্রহরে পরিবর্তনশীল দূর দিগন্তের মত অতীতের রূপ বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনুসারে মুহুর্মুহু বদলাইতেছে। সত্য সত্যই অতীতের কোন স্থির, সর্বজনগ্রাহ্য রূপ আছে কি না সন্দেহ; বর্তমানের মানস অভিরুচি ও প্রবণতাই আমাদিগকে অতীতের অনুসন্ধানে ও উহার রূপনির্ণয়ে প্ররোচিত করে। যে আদর্শ ও জীবন-ধারার প্রতি বর্তমানের একান্ত আকর্ষণ, অতীতের সহিত উহার সমস্ত জীবননীতিমূলক পার্থক্য সত্ত্বেও, বর্তমান তাহার অন্বেষণেই অতীতের বিশেষ যুগের দিকে দৃষ্টি ফেরায়। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের পশ্চাৎ-দৃষ্টি মূলত এই নীতি দ্বারাই প্রভাবিত। বর্তমানে যাহার অভাব ও ভবিষ্যতে যাহার প্রয়োজন আমরা অতীতে সেই সমস্ত উপাদানই খুঁজিয়া থাকি। বঙ্কিমের ও রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসাবলী এই প্রেরণা হইতেই উদ্ভূত। বঙ্কিম সত্য সত্য মুসলমান অভিযানের প্রারম্ভিক যুগ বা অপেক্ষাকৃত পরবর্তী মোগল যুগ এমন কি অব্যবহিত অতীতের ইংরাজ-আগমনের যুগের আসল মর্মরহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে বিশেষ কৌতূহলী বা তথ্যজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। রমেশচন্দ্রের হয়ত রাজপুতের অস্তমিত গৌরব ও মহারাষ্ট্রের সৌভাগ্যোদয় সম্বন্ধে তথ্যজ্ঞান একটু বেশী ছিল, কিন্তু তাহাই যে তাঁহার জীবন-চিত্রণের মুখ্য উপাদান বা মূল প্রেরণা ইহাও হয়ত যথার্থ নহে। জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও গৌরবময় ভবিষ্যতের স্বর্ণোজ্জ্বল স্বপ্ন তাঁহাদের অতীতের কীর্তি-সমাধি-প্রাঙ্গণে পদচারণার প্রেরণা দিয়াছিল। দেশাত্মবোধে

উজ্জ্বল ও স্বপ্নাবেশমুগ্ধ চক্ষু লইয়াই তাঁহারা অতীতের ভগ্নস্তূপে হারানো রত্ন খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন—অতীতের জীবনকে যথার্থভাবে বোঝা ও জানা তাঁহাদের উদ্দেশ্য থাকিলেও উহাকে গৌণ পর্যায়েই ফেলিতে হইবে। জীবনের প্রাথমিক আবেগগুলি সব যুগেই এক। মনুষ্য-চরিত্রের মধ্যে কালনিরপেক্ষ একটা সার্বভৌমতা আছে ইহা ধরিয়া লইয়া বঙ্কিম ও রমেশ বিগত দিনের জীবন-পাত্রকে সমকালীন ও অনাগত জীবনের উপযোগী সুধারসে পরিপূর্ণ-রূপে দেখাইয়াছেন; উহা হইতে বৃহৎ ভাব-প্রেরণা, মহৎ চরিত্রগৌরব, তাৎপর্যময় আদর্শকল্পনা নিষ্কাষণ করিয়া তাহা নিজের যুগমানসে সঞ্চারিত করার কার্যেই প্রধানতঃ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

বঙ্কিম-রমেশের পর ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা বাংলা সাহিত্যে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে আবাহন করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার চোখে তাঁহার নিজস্ব ধ্যানোপলব্ধির মায়াঞ্জন বুলাইয়া উহার নিদ্রাকে নিবিড়তর করিয়াছেন, অতীতের স্বতন্ত্র প্রাণসত্তাকে অস্বীকার করিয়া উহাকে কবিমানসের নিষ্ক্রিয় প্রতিবিম্বন-দর্পণের মূল্য দিয়াছেন। বঙ্কিম-রমেশের হাতে ইতিহাসের এতটা স্বাতন্ত্র্যলোপ ঘটে নাই; তাঁহারা ইতিহাসের প্রাণবেগচঞ্চল রূপটিই দেখাইয়াছেন, তবে ইহার ধারাকে বর্তমানের তটভূমিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। তাঁহাদের পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখক-লেখিকারা মুখ্যত প্রাত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনায় হাত দিয়াছেন। তাহাতে হয়ত প্রাচীনযুগের রীতি-নীতি, সমাজপ্রথা ও আচরণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি জীবন-যাত্রার বহিরঙ্গ কাঠামো সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা জ্ঞানলাভ হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর প্রাণস্পন্দনের নিগূঢ় রহস্যের বিশেষ পরিচয় পাই নাই। ইহারা ইতিহাস-প্রাসাদের বহিরঙ্গনে দাঁড়াইয়া ভিতর মহলের কিছুটা অস্পষ্ট কোলাহলধ্বনি শুনিয়াছেন, কিন্তু এই অন্দরমহলের অভ্যন্তরে প্রবেশের চাবিকাঠি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

সম্প্রতি স্বাধীনতালাভের পর ইতিহাস-চেতনার একটা নূতন ধারা আবার উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতেছে দেখা যাইতেছে। শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী' ও শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'বহ্নিবন্যা'

এই নূতন প্রবণতার নিদর্শন। কিন্তু এই অতি-আধুনিক কালে ইতিহাস যেভাবে উপন্যাসের পাতায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহা উহার প্রাক্তন রূপ হইতে অনেকটা ভিন্নধর্মী। বঙ্কিম-রমেশের নিকট ইতিহাস একটা বীর-যুগের আগ্নেয় দীপ্তিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে—সেখানে শৌর্যবীর্য-আত্মবিসর্জনের আকাশচুম্বী বহ্ন্যুৎসব, সেখানে জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, রমনীয়তম আদর্শেরই একাধিপত্য, সেখানে একটা মহনীয় সংগ্রামের সর্বস্বপণ সংকল্প-দৃঢ়তা আমাদের দৃষ্টিকে সাধারণ জীবনের তুচ্ছতা ও ধীর-মন্থর গতিচ্ছন্দ হইতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে। এই জন্যই তাঁহারা ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল, দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ অধ্যায়গুলিই তাঁহাদের উপন্যাসের বিষয়রূপে নির্বাচন করিয়াছেন। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়, মোগল-পাঠানের আধিপত্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর স্বাধীনতা-সংগ্রাম, রাজসিংহ-আওরংজেবের বিরাট-তাৎপর্যপূর্ণ শক্তি-পরীক্ষা—এইগুলিই প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রেরণা। এমন কি যখন অষ্টাদশ শতকের অচিরপূর্ব ইতিহাস উপন্যাসের বিষয় হইয়াছে, তখনও ইহার প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রা নহে, ইহার গণ-অভ্যুত্থানের ক্ষণিক উচ্ছ্বাস, ইহার ধর্মসাধনার অলৌকিক ভাবকল্পনা, ইহার অসাধারণ হৃদয়াবেগের অপরূপ কল্পব্যঞ্জনাই ইহার অতি-পরিচিত রূপকে এক ভাস্বর যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করিয়াছে। সীতারাম'-এ নবাবী আমলের অবসান-যুগের যে চিত্র পাই তাহাতে দৈনন্দিন জীবনধারা মোটামুটি যথার্থভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। রমার মুসলমান অধিকারের আতঙ্ক সীতারামের অন্তর্বিপ্লবের সহিত সহযোগিতা করিয়া তাহার অধঃপতনকে দ্রুততর করিয়াছে। তথাপি উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য ইতিহাসের সংকটময় পরিস্থিতিতে সীতারাম ও শ্রীর অন্তরবিক্ষোভে বিপর্যস্ত দাম্পত্য সম্পর্কের পরিস্ফুটন। 'চন্দ্রশেখর'-এ ইংরেজ শাসনের তখনও আনুষ্ঠানিক ভিত্তি-পত্তন হয় নাই, ইংরেজ তখন আকস্মিক দুর্দৈবের মত রাষ্ট্র ও পরিবার-জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতেছে। সে তখনও ইতিহাস-স্রষ্টা নহে, ইতিহাসের হস্ত-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রমাত্র। তথাপি এই ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস প্রতাপ-শৈবলিনী ও মীরকাশেম-দলনীর ভাগ্যহত, অনুশোচনা-দীর্ণ, উৎকট প্রতিক্রিয়ার বিভীষিকাময় প্রেমের পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী-চৌধুরাণী'-তে দুইটি ক্ষুদ্র আঞ্চলিক আন্দোলন কবি-কল্পনার দ্বারা

রূপান্তরিত হইয়া এক নিগূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ, ধর্মাদর্শ-প্রভাবিত রাষ্ট্রবিপ্লবের মহিমা লাভ করিয়াছে—ইতিহাসের ক্ষুদ্র আধারে বিরাটের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। বস্তুতন্ত্র ইতিহাস আদর্শ-রঞ্জিত কবি-কাহিনীর রূপ ধারণ করিয়াছে।

সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের রূপ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। এখনকার ঔপন্যাসিক ইতিহাসে কোন আদর্শ বা ভাবকল্পনা খোঁজেন না, অতীতের যথার্থ স্বরূপটি অঙ্কন করাই তাঁহার লক্ষ্য। স্বদেশপ্রেম, বীরত্বমণ্ডিত যুদ্ধ-বিগ্রহ, সমুন্নত ভাবাদর্শ, বিরাট ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ—ইতিহাসে এগুলি এখন আমাদের আকর্ষণ নহে। আমরা এখন সুদূর রাজস্থান, গুর্জর, দাক্ষিণাত্য বা বিস্মৃতপ্রায় অতীতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি না। বরং যে-খান ও যে-কাল হইতে সমসাময়িক বাঙালী জীবনের সূচনা, আমাদের সমস্ত কৌতূহল সেই উদ্ভববিন্দুর ও ক্ষণের প্রতি কেন্দ্রীভূত। বলিতে গেলে ইংরেজশাসনের প্রারম্ভ আধুনিক বাঙালীর নবজন্মলগ্ন; পলাসী-উত্তর যুগই তাহার নূতন সূতিকাগার। আমরা আজ যাহা হইয়াছি, কাল যাহা হইতে চাহি—সকলেরই মূল এই মধ্য-অষ্টাদশ শতকের অনিশ্চিত, ঝড়ো হাওয়ায় পর্যাকুল পরিস্থিতিতে। সমগ্র বাংলার ইতিহাসে, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাদ দিলে, পলাশীর যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা; বাঙালীর মানস গঠনের বৈশিষ্ট্য এইখানেই অঙ্কুরিত। কাজেই আত্মানুসন্ধানের স্পৃহা লইয়াই আধুনিক ঔপন্যাসিক ইতিহাসের মধ্যে ডুব দেন। ইতিহাস এখন আর আমাদের হৃদয়-সমুদ্রের মন্থনদণ্ডরূপে অতল গভীরে রত্নরাজি আবিষ্কার করে না। ইহা আমাদের মানস সংস্থিতির উপাদান-সংগ্রহের অতি-প্রয়োজনীয় আধার মাত্র। ইহা কল্পনার আকাশে রঙীন ফানুষ ওড়ায় না, মাটিতে ছড়ান শস্যকণা খুঁটিয়া খুঁটিয়া আহরণ করে।

(২)

যে দুইখানি সাম্প্রতিক গ্রন্থের আলোচনার জন্য এই দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন হইয়াছে তাহার মধ্যে পূর্ব-বিশ্লেষিত নূতন রীতি-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সুন্দর নিদর্শন মিলে। শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী' ১৭৯৩ হইতে ১৮১৩ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত ইংরেজ-বাঙালীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংমিশ্রণের ইতিহাস। ইহার মধ্যে এই ভিন্নধর্মী জীবনবোধের মিলনক্ষেত্র কলিকাতা

নগরীর প্রথম উৎপত্তি ও ইহার ভৌগোলিক প্রসারের তথ্যপূর্ণ, কৌতূহলো-দ্দীপক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য এই বিবরণ কোন গেজেটিয়ার হইতে সংকলিত হইতে পারে। কিন্তু বিশী মহাশয়ের উপন্যাস শুধু ভৌগোলিক তত্ত্ব ও বহিরঙ্গ বর্ণনায় সীমাবদ্ধ নহে। ইহা সংস্কৃতি-মিশ্রণের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া ও ফোঁসাইয়া-৩০। উত্তেজনা কয়েকটি নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়া আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছে। নানা দিক দিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটির অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী আছে। ইহার ইতিহাসের মর্মোদ্‌ঘাটন, বর্ণনা-কুশলতা, জীবনাভিজ্ঞতাদ্যোতক গভীর-অর্থপূর্ণ মন্তব্য-সন্নিবেশ, প্রেমের উন্মেষবিষয়ক সৌন্দর্যানুভূতি—এই সমস্তই তাঁহার সাহিত্যকৃতির চমৎকার নিদর্শন। অবশ্য এই ইতিহাস নভোচারী নহে, পদাতিকবৃত্তি; এখানে ঘটনার প্রাধান্য নাই, প্রাধান্য অন্তর্জীবনের ধীর-মন্থর ছন্দবদলের। এখানে উত্তেজনা ক্বচিৎ চিতার অগ্নিশয্যা হইতে সদ্যোবিধবার পলায়নে, দুই একটা ডাকাতি বা গুম-খুনের চেষ্টায়, যথেচ্ছাচারের অব্যাহত ধারায়, ডুয়েল লড়ার মেকী বীরত্বের অভিনয়ে, আর অন্তিম দৃশ্যের বহ্নিবিভাদীপ্ত, ট্র্যাজেডি-গৌরব-মণ্ডিত, দেহবোধোত্তীর্ণ আত্মার মহিমাবিকাশে। মোটের উপর জীবনস্রোত বহিয়াছে মন্থর গতিতে, নানা কৌতুককর অসঙ্গতির বাঁক ঘুরিয়া, তেলে-জলে মিশ খাওয়াইবার প্রয়াসের বঙ্কিম ঝলকে, মেঘ-রৌদ্রের শান্ত বৈপরীত্যের ছবি বুকে ধরিয়া। কে জানিত যে বাঙলার শেষ অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস উহার উন্মত্ত স্রোতোবেগ, উহার অতলে-টানা আবর্ত-সঙ্কুলতা, উহার পর্বতশিখর হইতে দ্রুত পতনের ফেনিল কলোচ্ছ্বাস সব হারাইয়া সাধারণ জীবনের নিস্তরঙ্গ জলধারার সহিত মিশিয়া যাইবে ও অন্তরের নিগূঢ়ে সকলের অলক্ষ্যে যে নূতন গতিপথের সূচনা হইতেছে তাহাকে পরিস্ফুট করিতে আপন শক্তি নিঃশেষ করিবে? শক্তির আড়ম্বরের পরিবর্তে প্রভাবের নিগূঢ়তাতেই আজ ইহার যথার্থ পরিচয়।

বিশী মহাশয় এই যুগোত্তরণের কেন্দ্রবিন্দুরূপে, কেরী সাহেবের মুন্সী এই পরিচয়ে, বাংলা গদ্যের প্রথম স্রষ্টা রামরাম বসুকে উপস্থাপিত করিয়াছেন ও স্বয়ং কেরী সাহেবকে কাহিনীর উপনায়করূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রামরাম আধুনিক যুগের প্রথম প্রতিনিধির গৌরবময় আসনে স্থাপিত হইয়াছে। কেরী ও রামরামের জীবনব্যাপী সহযোগিতা ও উদ্দেশ্যসাম্য সত্ত্বেও উহাদের

মানসিকতার সূক্ষ্ম পার্থক্য লেখক প্রশংসনীয় অন্তর্দৃষ্টির সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন। বাঙলায় কেরী মধ্যযুগের শেষ ও রামরাম আধুনিক যুগের প্রথম মানুষ। উভয়ের মধ্যে যোগাযোগে বিধাতার এক সূক্ষ্ম পরিহাস নিহিত। এ যেন মধ্যযুগের নির্বাপিত-প্রায় আদর্শ-বহ্নিতে আধুনিক যুগ নিজ হাত গরম করিয়া লইতেছে, ঈশ্বর-বিশ্বাস হইতে স্বাধীন চিন্তা, বাইবেল হইতে মানবরসপূর্ণ বিচিত্র সাহিত্য-শক্তি আহরণ করিতেছে। পাদরীর ধর্মোন্মাদ অবিশ্বাসীর মন হইতে প্রতিহত হইয়া এক অভাবনীয় মানস আলোড়নের হেতু হইয়াছে। কেরীর ধর্মান্তরীকরণের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু উহার নিষ্ঠা ও আদর্শবাদ জাতীয় জীবনে এক জ্ঞান-তপস্যা ও সাহিত্য-সৃষ্টির নূতন বীজ বপন করিয়াছে। শ্রীরামপুর মিশন নহে, মদনাবাটির নীলকুঠি নহে, ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজই এই নবসংশ্লেষের তীর্থক্ষেত্র—এইখানেই কেরী-প্রেরণা বাঙালীর জীবনে চিরন্তন হইয়াছে। বিশী মহাশয়ের গ্রন্থে কিন্তু এই প্রধান বিষয়টিই অনেকটা গৌণ হইয়াছে—ইহাকে তিনি শেষ খণ্ডে আখ্যায়িকার জাল-গুটানো তাড়াহুড়ার মধ্যে সংক্ষেপ-বিন্যস্ত করিয়াছেন। ইহার ফল হইয়াছে যে রামরাম বসুর যুগ-প্রতিনিধিত্ব—যাহার উপর উপন্যাসের নাম-সার্থকতা অনেকটা নির্ভরশীল—প্রয়োজনানুযায়ী পরিস্ফুটতা লাভ করে নাই।

রামরাম কতটা সার্থক যুগপ্রতিনিধি তাহাও বিচারসাপেক্ষ। গ্রন্থমধ্যে তাহার যে পরিচয় পাই তাহা অনেকটা নেতিবাচক। সে খ্রীষ্টান বা হিন্দুধর্ম কোনটাতেই নিষ্ঠার সহিত বিশ্বাস করে না, তাহার চতুরতার জন্য ইংরেজকেও বোকা বানায়, বাঙালী জীবন-যাত্রার সঙ্গেও তাহার সংযোগ অতি শিথিল। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খাওয়া ও দুই নৌকায় পা দেওয়া চতুরতার নিদর্শন হইতে পারে, চরিত্র-গৌরবের নহে। চিন্তার খানিকটা স্বাধীনতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সংস্কারমুক্তির সুযোগ লইয়া সে জীবনে কোন দায়িত্ব লইতে চাহে না, জীবনস্রোতের উপরিভাগের শেওলার মত ভাসিয়া বেড়ায়। তাহার দাম্পত্য জীবন ও টুসকির সহিত অবৈধ সম্পর্ক উভয়ই গভীর-জীবন-বোধহীন। প্রত্যেক ঘটনা-সঙ্কটেই সে নিষ্ক্রিয়; এমন কি তাহার প্রণয়াস্পদা রেশমী যখন শ্রীরামপুরের নৌকাঘাট হইতে অন্তর্হিত হইল, তখনও রামরাম তাহার কলিকাতায় দেশীয় সমাজের অভিজ্ঞতা সত্বেও

তাহার সন্ধান বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। রেশমীর প্রতি তাহার অতর্কিত প্রণয়োন্মেষই তাহার একমাত্র গভীর জীবনাবেগ, কিন্তু এখানেও তাহার চলচ্চিত্ততা ও সমস্যা এড়াইয়া চলার প্রবণতা তাহাকে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে রক্ষা করিয়াছে। রেশমীর শোচনীয় মৃত্যুর পর তাহার মনে একটা উদাস ভাব আসিয়াছে ও তাহার বুদ্ধির প্রখর দীপ্তি অনেকটা স্তিমিত হইয়াছে। তাহার জীবনের একেবারে অন্তিম পর্যায়ে তাহার মধ্যে একটা সমাজ-সচেতন ও আন্তরিক সংস্কার-প্রয়াস স্ফুরিত হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়েও সে একবার মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, একবার রামমোহন রায়ের সহায়তাপ্রার্থী হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত এই জীবন-বিমুখ, যুক্তিবাদ-নির্ভর মানুষটি রামমোহনের স্কন্ধে নিজ সমস্যার বোঝা চাপাইতে খুঁজিয়াছে—প্রভাতের শুকতারা যেমন অরুণোদয়ের দীপ্তির মধ্যে বিলীন হয়, তেমনি আধুনিক মনোবৃত্তির প্রথম স্পন্দন উহার পূর্ণতর বিকাশের মধ্যে আত্মসংহরণ করিয়াছে। রামরাম সংস্কৃতি-সম্মিলনের প্রথম অপক্ব ফল, রামমোহন উহার স্বাদুতর পরিণতি; রামরামের প্রাণের স্তিমিত, অস্থির আলোকবিন্দুটি রামমোহনের দীপ্ততর শিখার নিকট আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়া আড়ালে চলিয়া গিয়াছে। চরিত্র-পরিকল্পনা ও রূপায়ণে রামরাম খুবই জীবন্ত। কিন্তু উহার উপর যতটা সাংকেতিক মর্যাদা আরোপিত হইয়াছে সে ঠিক তাহার যোগ্য নহে। সে কেরী সাহেবের মুন্সী মাত্র, আধুনিক জীবনরসের পূর্ণ প্রতীক নহে।

(৩)

ইংরেজ ও বাঙালী-সমাজের মিলনের প্রথম ফল রামরাম; দ্বিতীয় ফল রেশমী। রামরাম অম্ল-রসের আর রেশমী মধুর রসের প্রতীক। রেশমী কেরীর পরিবারে ও রোজ এলমারের পরিচারিকারূপে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও সমাজ-আদর্শ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে; প্রেমের মাদকতা, ব্যক্তিসত্তার পুষ্পিত বিকাশ, মনের বিচিত্র লীলা-বিলাস, আত্মবীক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত আধুনিক মানসপ্রবণতা সে এই নূতন জীবনবোধ হইতে আহরণ করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত মনের প্রজাপতি-বৃত্তি জন-পুষ্পে আসিয়া স্থির হইয়াছে, পাশ্চাত্ত্য প্রেমের রঙীন স্বপ্ন, নিবিড় মোহাবেশ প্রথম এক হিন্দু রমণীর অন্তরে আশ্রয় পাইয়াছে। তাহার তীক্ষ্ণ মননশীলতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, আত্মপ্রসারণ—

প্রবণতার সঙ্গে পূর্বজীবনের নিয়তিশাসিত ত্বঃখবাদ মিশিয়াছে। যে চিতানলকে ফাঁকি দিয়া সে স্বাধীন জীবনের আনন্দ-বেদনামিশ্র অভিজ্ঞতা আস্বাদন করিতে চাহিয়াছে, তাহার উষ্ণ নিশ্বাস যেন তাহাকে সারাজীবন অনুসরণ করিয়াছে। স্বহস্ত-প্রজ্বলিত অগ্নিদাহ যেন সেই প্রবঞ্চিত চিতানলের বিলম্বিত, কিন্তু অনিবার্য প্রতিহিংসা। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে এই ট্রাজিক পরিসমাপ্তি ঠিক ঘটনা ও চরিত্রের অপ্রতিবিধেয় পরিণতি নহে। রেশমীর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন নারী যে অসহায়ভাবে প্রতিকূল ঘটনার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে, শ্রীরামপুর হইতে পলায়নের পর তাহার প্রণয়ীর সঙ্গে সংযোগ-স্থাপনের চেষ্টা করিবে না, মদনমোহনের প্রতি অহেতুক ভক্তি-বিহ্বলতায় তাহার যৌবনের নব-জাগ্রত দাবী প্রত্যাহার করিবে ইহা তাহার চরিত্রের সঙ্গে মোটেই সঙ্গতি-বিশিষ্ট মনে হয় না। লেখক পূর্বসিদ্ধান্ত-অনুযায়ী তাহাকে বলি দিয়াছেন, কিন্তু সে যে ইতিমধ্যে তাহার অতীতকে অতিক্রম করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছে সে বিষয়ে বিশেষ সচেতন নহেন।

ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজরীতির এই বিসদৃশ সম্মিলনে প্রচুর ব্যঙ্গ-রসের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার সহিত লেখকের স্বাভাবিক পরিহাস-রসিকতার যোগ হইয়া হাস্যরসকে আরও উদ্দাম ও ঘনীভূত করিয়াছে। উপন্যাসের প্রায় সমস্ত ঘটনাই এই হাস্যহিল্লোলে তরঙ্গায়িত। ইতিহাসের সম্ভ্রম-গম্ভীর গতিচ্ছন্দ হাসির উতলা হাওয়ায় একেবারে মাতালের টলমল পদচারণায় রূপান্তরিত হইয়াছে। কেরী, টমাস, ডরোথি, লিজা, জন, রামরাম, ফুলকি, বস্থপত্নী সকলেই এই সর্বব্যাপী হাস্যোচ্ছ্বাসের ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছে। হয়ত ইহাই সে যুগের যথার্থ পরিচয়, কিন্তু জীবনের লঘু, উদ্ভট দিকটাই ফুটাইয়া তুলিতে ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনা অন্তত প্রথাসম্মত নহে। বন্দিনী রেশমীকে উদ্ধার করিবার জন্য যে বহুবিচিত্র বাহিনীর সমাবেশ হইয়াছে, বোধহয় ডন কুইকসোটের পর এরূপ কৌতুককর জনতার শোভা-যাত্রা জীবন বা সাহিত্যে কোথাও দেখা যায় নাই। অথচ এই ঘোলা জলের চপল ঘূর্ণী অকস্মাৎ মহাসমুদ্রের রহস্যগম্ভীর লবণাম্বুবিস্তারে আসিয়া মিশিয়াছে। কমেডির বস্তুবিন্যাস ও প্রাণরস কেমন করিয়া জানি না গোত্রান্তরিত হইয়া ট্রাজেডিতে অবসান লাভ করিয়াছে। আমরা লেখকের

লিপিকুশলতা, বর্ণনাভঙ্গী ও গ্রন্থন-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হই, কিন্তু এই কেন্দ্রিক অসঙ্গতি আমাদের ঔচিত্যবোধকে পীড়িত করে। তথাপি, 'কেরী সাহেবের মুন্সী' এক নূতন রীতির পথপ্রদর্শকরূপে ও অচিরগত অতীতের সরস কৌতুকোচ্ছল মর্মানুধাবন-কাহিনীরূপে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

(৪)

এই পর্যায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'বহ্নি-বন্যা' ১৮৫৭ খ্রীঃ-এ সিপাহী-বিস্ফোরণ-অবলম্বনে লিখিত। 'কেরী সাহেবের মুন্সী'-তে ঘটনা-রোমাঞ্চ বিশেষ নাই, উহা যুগজীবনের প্রাত্যহিক প্রতিলিপি। ইহা অতীত যুগ সম্বন্ধে লেখা বলিয়াই ঐতিহাসিক; প্রকৃতপক্ষে ইহা অতীত যুগের সমাজচিত্র। 'বহ্নিবন্যা' আধুনিক ভারতের বোধ হয় সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর কাহিনী লইয়া লিখিত—একটা বিরাট রাজনৈতিক বিপ্লব ও ইহার আনুষঙ্গিক জীবন-ধারার বিপর্যয়ই ইহার উপজীব্য। সম্প্রতি সিপাহী আন্দোলনের যে শতবার্ষিকী স্মৃতি-দিবস উদযাপিত হইল, সেই উপলক্ষ্যে ইহার অন্তর-প্রকৃতি ও ঐতিহাসিক তথ্য লইয়া বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা হইয়াছে ও এই বিষয়ে একটা প্রবল, এবং এখন পর্যন্ত অমীমাংসিত মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। ইহা কি জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের অগ্রদূত না উচ্চাকাঙ্ক্ষী, প্রতিক্রিয়াশীল রাজন্যবর্গের ক্ষমতা-পুনরুদ্ধারের চেষ্টা মাত্র—এই উভয়বিধ মত লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। গজেন্দ্রকুমারের উপন্যাস এই নব-জাগ্রত কৌতূহলের তরঙ্গে ভাসান সাহিত্য-তরণী। লেখক বলিয়াছেন যে, ইহাতে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার মর্যাদা যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে। এই দাবী যথার্থ বলিয়াই মনে হয়। সিপাহী-বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য ও উহার ব্যর্থতার মুখ্য কারণ ইহার কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রণের অভাব, বলিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ ঐতিহাসিক নেতৃত্বের সহিত ইহার অ-সংযোগ। কিন্তু এই ব্যাপক ও শক্তিশালী আন্দোলনের পিছনে ঐতিহাসিক শক্তি না থাকিলেও কোন একটা ব্যক্তিসত্তার অদৃশ্য প্রভাব থাকিবেই। লেখক এই প্রভাব আমিনা, আজিজন এই দুই ভগ্নীর শোচনীয় জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত করিয়াছেন। তাহারা ব্যক্তিগত কারণে সমগ্র ইংরাজ জাতির উপর একটা বিজাতীয় বিদ্বেষ ও জিঘাংসাবৃত্তি পোষণ করিয়াছিল এবং এই সংগ্রামের

ইতিহাস-বিখ্যাত নেতৃবৃন্দকে তাহাদের নিগূঢ় উদ্দেশ্যের যন্ত্রীভূত সহায়ক রূপে ব্যবহার করিয়াছিল। যেখানে ইতিহাস নীরব, সেখানে ঐতিহাসিক উপন্যাসকারের কাল্পনিক অথচ সঙ্গত কারণ অনুমান করার অধিকার আছে। সিপাহী যুদ্ধে উভয় পক্ষেই, এবং বিশেষ করিয়া বিপ্লবীদের পক্ষে যে লোমহর্ষণ, নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যে উন্মত্ত, কাণ্ডজ্ঞানহীন শিশু ও নারীর নির্বিচার হননকার্য চলিয়াছে তাহা কখনই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত হইতে পারে না; ইহার পিছনে কোন পৈশাচিক রক্তপিপাসা সক্রিয় ছিল। লেখক প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টির সহিত কার্যকারণের এই ফাঁকটি কল্পনা-প্রয়োগে পূর্ণ করিয়াছেন এবং এই দিক দিয়া সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অবশ্য তাঁহার উদ্ভাবিত কারণ কতদূর সঙ্গত তাহা বিবেচনার বিষয়।

উপন্যাসটির গ্রন্থন-কৌশল সর্বদা প্রশংসনীয়। ইহাতে তিন শ্রেণীর চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে। প্রথমত, খাঁটি ঐতিহাসিক ব্যক্তিবৃন্দ—যথা, নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপী ও কতকগুলি নেতৃস্থানীয় সিপাহীকর্মচারী; দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ও সংগ্রাম-পরিচালনায় ব্যাপৃত কাল্পনিক চরিত্রাবলী—যথা, আমিনা, আজিজন, আজিমুল্লা খাঁ, খাঁ মহম্মদ, মৌলভি আহমেদুল্লা, ইংরেজ সৈনিক প্রভৃতি; তৃতীয়ত, যুদ্ধের ঘূর্ণীপাকের মধ্যে পরোক্ষভাবে আকৃষ্ট অথবা যুদ্ধবিপর্যয়ের ছোঁয়াচ-লাগা সাধারণ গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়—যথা, হীরালাল, নানকচাঁদ, কানাইয়ালাল, কাল্‌কাপ্রসাদ, রামচরিত সিং, নিকটস্থ অঞ্চলের অধিবাসী প্রভৃতি। এই তিনজাতীয় চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও উহাদিগকে ঘিরিয়া যে ঘটনাজাল প্রসারিত হইয়াছে তাহাদেরই টানা-পোড়েনে উপন্যাসের কায়া নির্মিত হইয়াছে। যোটামুটি কিছু শিথিল সূত্রাগ্র ঝুলিতে থাকা সত্ত্বেও, এই ত্রিবিধ সূত্রের বয়ন-কৌশল প্রশংসনীয় ও উপন্যাস-বর্ণিত ঘটনার আধার-নির্মাণে ইহাদের সঙ্গতি ও স্বাভাবিকতা সুপরিস্ফুট। ঘটনাবিন্যাস ও উহার ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়া লেখক যে সিপাহী-বিপ্লবের মত একটা বিরাট, বহুবিস্তীর্ণ, অসংখ্য ছোট-বড়-পরস্পর-অসম্পৃক্ত ধারায় প্রবাহিত গণ-অভ্যুত্থানের নির্ভরযোগ্য চিত্র আঁকিয়াছেন ও উহার যথার্থ গতিবেগ ও ভাবোত্তেজনার পরিচয় দিয়াছেন ইহা তাঁহার উচ্চাঙ্গের কৃতিত্বের নিদর্শন।

আকস্মিকতা ও অতি-নাটকীয়তা (Melodrama) হয়ত কিছুটা আছে, আমিনার সঙ্গে হীরালালের বারবার সাক্ষাৎ আকস্মিকতার সূত্রে গ্রথিত; শেষ অধ্যায়ে হোপ ও ওয়ালেশের সঙ্গে আমিনা-আজিজনের রহস্যময় সম্পর্কের উদ্‌ঘাটন হয়ত খানিকটা অতিনাটকীয়-লক্ষণাক্রান্ত, রূপকথার সমস্ত-জট-খোলা, রোমান্সসুলভ সমাধানের পর্যায়ভুক্ত। তবে ইতিহাসের উন্নত মালভূমিতে আকস্মিকতার ওলট-পালট বাতাস খানিকটা বহিবেই, তাহার অসাধারণ ঘটনার মধ্যে কিছুটা অপ্রত্যাশিতের বিস্ময়-চমক থাকিবেই।

(৫)

ঐতিহাসিক ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে নানা সাহেবই পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে। অন্যান্য নেতাদিগকে কেবল প্রয়োজনের খাতিরে ও আখ্যানের অংশরূপে আনা হইয়াছে; তাহাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা নাই। এমন কি বিপ্লবের যে মস্তিষ্ক, সেই তাঁতীয়া তোপীও পূর্ণ মানবিক সত্তাতে উপস্থাপিত হয় নাই। এক নানা সাহেবই শুধু বিপ্লবী নহে, গোটা মানুষরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র-জাতিসুলভ চতুরতা, সাবধানতা, সন্দেহপ্রবণতা ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অভাব তাহার চরিত্রে উদাহৃত। ইংরেজের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে, তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা ও খানাপিনার অভ্যাসের ভিতর দিয়া তাহার মধ্যে আধুনিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর কতকটা স্ফুরণ হইয়াছে। মধ্যযুগোচিত আত্মবঞ্চনা ও অবাস্তব আশাপোষণ তাহার মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। নিজেদের দুর্বলতা ও ইংরেজের জয় সম্বন্ধে তাহার কোন ভ্রান্ত ধারণা নাই। সে শেষ পর্যন্ত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছিতে অক্ষমতা দেখাইয়াছে; বিপদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াও নিজেকে যতদিন সম্ভব নিরাপদ দূরত্বে রাখিয়াছে। সিপাহীদের পৃষ্ঠপোষকতা ও ইংরেজের শুভানুধ্যায়িতা—এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত নীতির মধ্যে সে অস্থিরভাবে আন্দোলিত হইয়াছে। সংগ্রামের প্রধান প্রধান ঘটনার দায়িত্ব—বিদ্রোহ-ঘোষণা ও উহার নেতৃত্ব-গ্রহণ, কানপুরের সন্ধিভঙ্গ ও নিরস্ত্র ইংরেজদের নৌকার উপর গুলীবর্ষণ, বিবিঘরের ঘৃণার্হ হত্যাকাণ্ড—তাহার নিজের নহে, তাহার অধীন সেনাপতি ও আমিনা বিবির দ্বারা জোর করিয়া তাহার উপর আরোপিত। তাহার

রণনীতিও মুহুর্মুহুঃ দ্বিধাগ্রস্ত—দিল্লীতে গিয়া বাহাদুর শাহের বশ্যতা স্বীকার করিবে না, কানপুর-লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে থাকিয়া নিজ স্বাধীন নেতৃত্ব বজায় রাখিবে ও অযোধ্যা-অঞ্চলের উপর স্বতন্ত্র আধিপত্য বিস্তার করিবে—এই দুই পন্থার মধ্যে নির্বাচন তাহার পক্ষে দুরূহ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমিনা নিজ প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে, নিজ একনিষ্ঠ উদ্দেশ্যের দুর্দমনীয় আবেগে দুর্বল নানা সাহেবের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে ও যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার মূল প্রেরণা জোগাইয়াছে। নানা সাহেবের পারিবারিক জীবনেরও কিছুটা সমস্যা, তাহার ঈর্ষ্যা—সংশয়—জ্ঞাতিবিরোধ ও বিভিন্ন প্রণয়িণীর মধ্যে আস্থা ও অনুগ্রহ-বিতরণের মাত্রাভেদ প্রভৃতি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সুষ্ঠু বর্ণনার দ্বারাও তাহার চরিত্রের একটি পূর্ণ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে যে একটা বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলন-পরিচালনার পক্ষে কত অযোগ্য, ঘটনা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেওয়া ছাড়া তাহার যে আর কিছু করিবার ছিল না, সে যে তরঙ্গ-বেগ-পরিমাপের একটা নিষ্ক্রিয় যন্ত্র মাত্র—ইতিহাস ও উপন্যাস একযোগে এই সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করে। প্রখরতর ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নেতৃবৃন্দ—কুমার সিংহ ও লক্ষ্মীবাই—এই আখ্যায়িকার বহির্ভূত; তাহাদের ক্রিয়াশীলতা সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, বৃহত্তর নেতৃত্বের প্রজ্ঞাভাস্বর দূরদর্শিতার তাহারা অধিকারী নহে। নানা সাহেবের অন্তর্ধান-রহস্যও তাহার অকিঞ্চিৎকরতার পরোক্ষ প্রমাণ—পরাজিত দেশনেতার যে চরিত্র-গৌরব-দ্যোতক শেষ পুরস্কার—ফাঁসি-মঞ্চে আরোহণের সমুন্নতি—তাহাও তাহার ভাগ্যে জোটে নাই। সাগরোর্মিবাহিত তৃণখণ্ডের মত সে এক অনিশ্চিত, নামহীন অদৃষ্টগর্তে তলাইয়া গিয়াছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস-চরিত্র গৌণ; ইতিহাস-রসাশ্রিত কাল্পনিক চরিত্রই মুখ্য। বিশেষত সিপাহী-বিপ্লবের ঐতিহাসিক আখ্যান দ্বারা ইহার অসাধারণ বহ্নি-উৎসবের মর্মরহস্য ভেদ করা যায় না। এ যেন একটা সাধারণ অগ্নিকাণ্ডের স্ফুলিঙ্গের উপর দিয়া এক দৈব ঝটিকার প্রবাহ, একটা সামান্য মানবিক বিক্ষোভের উপর এক অতর্কিত নারকীয় অনলোচ্ছ্বাসের সংক্রমণ। মানুষের ক্ষুদ্র বিরোধ-তিক্ততার পাত্রে কেহ যেন অসহ্য গরল-তীব্রতা মিশাইয়া দিয়াছে। সুতরাং ইহার মূলরহস্য ভেদ করিতে হইলে ইতিহাসের সমতল স্তর অতিক্রম করিয়া মানব-হৃদয়ের অতল গহনে, রসাতলের যে গভীরে, সৃষ্টি-ধ্বংসী

ভূমিকম্পনের বেগ সঞ্চিত থাকে, সেইখানে অবতরণ করিতে হইবে। যে রণক্ষেত্রে কেবল দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রবর্ষণ হইয়াছিল তাহার নীচের সুড়ঙ্গপথে সংগোপনে রক্ষিত দাহ্য উপাদান বিস্ফোরক প্রচণ্ডতার সহিত জ্বলিয়া উঠিয়া শুধু দেহ নহে, আত্মাকেও ঝলসাইয়া দিয়াছে। কাজেই সিপাহী-বিপ্লবের সত্য ব্যাখ্যা মিলিবে ইতিহাসে নহে, ইতিহাসাশ্রিত কল্পনায়। আমিনা ও খানিকটা কম পরিমাণে আজিজন এই ইতিহাসসম্মত কাল্পনিকতার মূর্ত বিগ্রহ। এরূপ চরিত্র না থাকিলে ইতিহাসের বীভৎস, জুগুপ্সাকর পাশবিকতার কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। অবশ্য নিয়তির সহকারিণী এরূপ নারী-চরিত্রের সম্পূর্ণ মানবিক আদর্শে বিচার সম্ভব নহে—কিছু অপমানবিক স্পর্শ তাহাতে লগ্ন থাকিবেই। কিন্তু কোন কোন বিরল স্থলে অতিনাটকীয় অবিশ্বাস্যতা থাকিলেও, সামগ্রিকভাবে আমিনা চরিত্রের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ উভয়ই সঙ্গতিপূর্ণ ও অনিন্দনীয়। তাহার সর্বত্রগামী সঞ্চরণ-রহস্য, গতির অবাধ স্বাধীনতা আমাদের বিশ্বাসবোধকে খানিকটা পীড়িত করে, কিন্তু ইহা কেবল তাহার মানসিক অস্থিরতা ও অপরিমেয় উৎসাহের নিদর্শন মাত্র, অনেক ক্ষেত্রেই তাহার বস্তুগত অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা নাই। যে সব স্থানে সে নিজে গিয়াছে, সেখানে দূত বা চরের দ্বারাও কাজ চলিত। তাহার সর্বজ্ঞতাও হয়ত একটু আতিশয্য-দুষ্ট, কিন্তু ইহা আখ্যানের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ইংরাজ সেনাপতির নিকট লেখা নানা সাহেবের দুদিক-রাখা চিঠিগুলি আমিনা হস্তগত না করিলে সংগ্রামের অন্যরূপ পরিণতি ঘটিত।

সমস্ত অনিবার্য অসঙ্গতি বাদ দিলেও আমিনা একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। তাহার অন্তরের অনির্বাণ দাহ, অটুট সঙ্কল্প, আশ্চর্য দূরদর্শিতা ও মানবচরিত্রজ্ঞান, অসাধারণ উপায়-কুশলতা—সবই একটি সুসঙ্গত মানবিক চরিত্রে সংহত হইয়াছে। নারী ও শিশুহত্যার কল্পনাতীত নৃশংসতা তাহার উপর আরোপ না করিলেও চলিত। ইংরেজ সেনাপতির কন্যাকে সে যে গণিকাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করিয়াছে ইহাতেই তাহার সমুচিত প্রতিহিংসা সাধিত হইত। সে নানাসাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত সেনানীবর্গকে নিজ অঙ্গুলির অগ্রভাগে ঘুরাইয়াছে, সকলকেই নিজ অদম্য ইচ্ছাশক্তির নিকট নতি স্বীকার করাইয়াছে। আজিমুল্লা খাঁর স্পর্ধিত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা সে নির্মম

অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখান করিয়াছে। সে দেহদানের প্রলোভন দেখাইয়া, ও তাহার ভগ্নী আজিজন তুচ্ছতম সিপাহীর কামালিঙ্গনে ধরা দিয়া বিপ্লবের অগ্নিক্রীড়াকে অনির্বাণ রাখিয়াছে। এক হীরালাল ও সর্দার খাঁর নিকট তাহার প্রকৃতির কোমল দিকটা মাঝে মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধে পরাজিত হইলেও তাহার প্রতিহিংসা ছলবল-কৌশলের দ্বারা শত্রুনিধনের সংকল্পে অবিচলিত রহিয়াছে, রণাঙ্গনের বারুদ ফুরাইলেও কারখানার তলে সঞ্চিত বারুদে আগুন লাগাইয়া সমস্ত শত্রুশিবির উড়াইয়া দিতেও সে প্রস্তুত। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে শীতল জলের প্রলোভন দেখাইয়া তৃষ্ণার্ত শত্রুসৈন্যকে আমগাছের তলে আনিয়া তাহার শাখান্তরাল হইতে তাহাদিগকে গুলিবিদ্ধ করিয়াছে। প্রতিহিংসার এরূপ সর্বব্যাপী ধ্বংসলীলা, সমগ্র জীবনের এরূপ বিভীষিকাময় একলক্ষ্যমুখীনতা জীবনে ত বটেই, কাব্যসাহিত্যেও বিরল। লেখকের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় এই যে, এই দানবীয় লীলার পরেও তাহাকে পিশাচী মনে না হইয়া মানবী বলিয়াই মনে হয়, তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি একেবারে নিঃশেষ হয় না। কিন্তু এই পৈশাচিক বিকারের যে কারণ দেখান হইয়াছে তাহা কি আমাদের যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়? প্রণয়াস্পদের বন্ধুর দ্বারা ধর্ষণ তাহার ন্যায় এরূপ তেজস্বিনী রমণীর পক্ষে অসম্ভবই ঠেকে—অলীক সন্দেহে প্রণয়ীর দ্বারা অবজ্ঞাসূচক প্রত্যাখ্যান মনে প্রচণ্ড আঘাত হানিলেও কি এরূপ বিশ্বগ্রাসী জিঘাংসা-বৃত্তি উত্তেজিত করিতে পারে? আমরা উপন্যাসে প্রলয়ঙ্করী বিষকন্যাকে প্রত্যক্ষ করিলাম কিন্তু যে উৎস হইতে তাহার সর্বদেহমনে এরূপ তীব্র ও দুশ্চিকিৎস্য বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার কোন পরিচয় পাইলাম না। আমিনা চরিত্রকে মানিয়া লইতে হয়, তাহাকে বুঝিতে পারি না—ইহাই এই চরিত্রের কেন্দ্রীয় দুর্বলতা।

(৬)

তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্রগুলির প্রয়োজনীয়তা—সংস্কৃত শ্লোকে পাদপূরণের মত। তাহাদের নিজস্ব বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। তাহাদের দরকার ঘটনা-সংস্থিতিকে যথাসম্ভব নিশ্ছিদ্র ও বিশ্বাসযোগ্য করিবার জন্য। রাজনৈতিক সংগ্রামক্ষেত্রের বাহিরে যে বৃহত্তর জগৎ আছে তাহার উপর ইহার

দাহ ও উত্তাপ খানিকটা সঞ্চারিত না হইলে সমস্ত ব্যাপারটাকে কেমন অবাস্তব মনে হয়। যাহারা জাতীয় বিপ্লবে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করে তাহাদের দৃষ্টি প্রধান লক্ষ্যে নিবদ্ধ; কিন্তু আর একদল লোক আছে যাহারা এই অরাজক ও বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা বা সুবিধাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সিংহ যুদ্ধ করে; কিন্তু উহার পিছনেই শবভুক শৃগালের পাল উদর-পূরণের জন্য যুদ্ধ-সমাপ্তির প্রতীক্ষা করে। আদর্শনিষ্ঠ বীরের পিছনে লুণ্ঠনকারী বা স্বার্থান্বেষীর দল ওৎ পাতিয়া থাকে। গ্রামের মোড়ল বা ক্ষুদে জমিদার ইহার সুযোগ লইয়া নিরীহ, অজ্ঞ গ্রামবাসীদের শোষণের অবসর খোঁজে। এই উভয় উপাদান মিলিয়াই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার চিত্র সম্পূর্ণ করে। এই উপন্যাসেও তেমনি নানকচাঁদ, মুন্সী কাল্‌কাপ্রসাদ, কানহাইয়ালাল প্রভৃতি ব্যক্তি নদীর উত্তাল তরঙ্গের পিছনে যে কূলঘেঁসা ঘোলা জলের ছোট ঢেউ থাকে তাহাতে স্নান করিতে নামিয়া পড়িয়াছে, স্বাধীনতার বহ্ন্যুৎসব হইতে নিজ নিজ ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য প্রদীপটি জ্বালাইয়া লইতে ব্যস্ত হইয়াছে। এই আগুন হইতে প্রচুর-নিঃসৃত ধোঁয়াতে অনেকের চোখ-মুখ আকুল হইয়াছে। বড় বড় ঘটনার গুঞ্জন-প্রতিধ্বনি দূর প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছিয়া সত্যের এক বিকৃত, বিকলাঙ্গ রূপ জনসমাজে ছড়াইয়াছে। যেমন বড় গাছ, ছোট ঝোপ ও মৃত্তিকালগ্ন ঘাস, উঁচু পাহাড়, ছোট টিলা ও সমতলভূমি মিশিয়া প্রকৃতি-পরিবেশ রচনা করে, সেইরূপ কোন বৃহৎ রাজ-নৈতিক-আন্দোলন-সম্পর্কিত সমাজ-পরিবেশও এইরূপ নানা উপাদানে গড়িয়া উঠে। হীরালালের স্থান এই জাতীয় সাধারণ মানুষ অপেক্ষা খানিকটা উচ্চতর। সে একদিক দিয়া সে যুগের ইংরেজের প্রতি বিশ্বস্ত, নিমকহালাল বাঙালী কেরানীর প্রতিনিধি, অপর দিকে আমিনার সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গ হৃদয়-সম্পর্ক গড়িয়া ওঠায় তাহার খানিকটা মর্যাদাও আছে। যে সমস্ত কল্যাণশক্তি আমিনাকে তাহার চরম অধঃপতন হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, সে সেই ব্যর্থ প্রয়াসের অন্তিম পর্যায়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া উপন্যাসে একটা বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে। তথাপি একজন সাধারণ দুর্বল বাঙালীর পার্শ্বচর হিসাবে সে গৌণ চরিত্রেরই পর্যায়ভুক্ত। প্রধান ঘটনার সহিত এই জাতীয় পার্শ্বচিত্রের সুষ্ঠু সমাবেশে লেখকের গ্রন্থনকুশলতার আর একটা পরিচয় মিলে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 'বহ্নিবন্যা' একটি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় রচনা। কিন্তু দুই একটা গুরুতর ত্রুটি ইহাকে প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। প্রথমত, এই উপন্যাসে সমস্ত ঘটনা সিপাহী-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ইংরেজ-মহলে ইহার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ-প্রয়াসের দিকটা প্রায়ই উপেক্ষিত হইয়াছে। যোদ্ধা-প্রতিযোদ্ধা এই দুই তরফ হইতে না দেখাইলে যুদ্ধের চিত্র সম্পূর্ণ হয় না। মহাভারতকার আমাদিগকে পর্যায়ক্রমে পাণ্ডব-শিবির ও কৌরব-শিবিরের ভিতরকার দৃশ্য দেখাইয়াছেন, হোমার গ্রীক ও ট্রয়বাসী উভয়ের মনোভাব ও রণকৌশলের অপক্ষপাত বিবরণ দিয়াছেন। এখানে ইংরেজ পক্ষের কথা প্রায় পরোক্ষ উল্লেখে পর্যবসিত। নানা সাহেবের দুমুখো নীতি, সিপাহীদের মধ্যে গুজবের বিস্তার, সিপাহী-নেতাদের সৈন্যসমাবেশ ও রণনীতি প্রতিপক্ষের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছে, কিরূপ প্রতিঘাত-প্রস্তুতিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, খাঁচায় বন্দী বাঘ কিরূপ গর্জন করিয়াছে, নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিরূপ মরণস্পর্শী সাহসে দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কোন বর্ণনা পাই না। পাই অশীতিপর, স্থবির কানপুরের সেনাপতি সার হিউ হুইলারের অস্থির-মতিত্ব ও ভ্রান্ত আত্মপ্রত্যয়ের বিবরণ, পাই ইংরেজের অসহায় আত্মসমর্পণ, করুণ মৃত্যু, পরাজয়ী মনোভাবের বুদ্ধিভ্রংশ। অবশ্য লেখক মাঝে মধ্যে মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈন্যের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উল্লেখ প্রত্যক্ষ বর্ণনার স্থান লইতে পারে না। রাবণের বীরত্ব না দেখাইলে রামের শ্রেষ্ঠতর বীরত্ব খোলে না; সিপাহী আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝাইতে হইলে ইংরেজের সাহস ও রণকৌশলের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হইবে।

দ্বিতীয় ত্রুটি হইতেছে যে, এই বহুব্যাপ্ত আন্দোলনের সামগ্রিক রূপটি কোন এক ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কেন্দ্রায়িত হয় নাই। ফলে আমরা পাইয়াছি নানা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, সমস্ত ঘটনার একীভূত সারনির্যাস নহে। ইতিহাসের সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান পার্থক্য এই কেন্দ্রস্থিত মুখ্য চরিত্রের উপস্থিতি। সে ইতিহাসে থাকে ভাল, না হয় কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। আমিনা কিয়দংশে এই কেন্দ্রচরিত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু তাহার চোখ দিয়া যে দৃশ্য আমরা দেখি তাহা ব্যক্তিগত-বিদ্বেষ-কলুষিত।

নানা সাহেব কেন্দ্রস্থ চরিত্র হইতে পারিতেন, যদি তাঁহার কিছুমাত্র আদর্শবাদ, স্বদেশপ্রেম ও চরিত্রদৃঢ়তা থাকিত। কিন্তু তিনি এত দুর্বল, এত অব্যবস্থিত-চিত্ত, নিজ চিন্তাভিলাষপূরণের এত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ যে তাঁহার মধ্য দিয়া এই বিরাট আন্দোলনের সামগ্রিক তাৎপর্য পরিস্ফুট হয় না। হয়ত সিপাহী বিপ্লবের সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক দুর্ভাগ্য এই কারণেই, যে ইহার মধ্যে কোন সুমহান ব্যক্তিত্ব ছিল না। উপন্যাসে এমন কোন দৃশ্য নাই যাহা মহৎ ভাবের স্ফুরণ, যাহা আগ্নেয় অক্ষরে মনের মধ্যে অবিস্মরণীয়ভাবে মুদ্রিত হয়। সর্বত্রই হীন চক্রান্ত, ক্ষুদ্র সুবিধা, রক্তকলুষিত, দুর্মূল্য জয়, অদূরদর্শী আস্ফালন ও কাপুরুষোচিত পৃষ্ঠভঙ্গ। ইহাই হয়ত ঐতিহাসিক সত্য; কিন্তু ঔপন্যাসিক ইতিহাসের খণ্ডসত্যকে অতিক্রম করিয়া একটা মহত্তর ভাবসত্যে পৌছিবেন ইহাই তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করা যায়। 'বহ্নিবন্যা' উহার অসাধারণ ও নানামুখী উৎকর্ষ সত্ত্বেও আমাদের এই পরম প্রত্যাশা পূর্ণ করিতে পারে নাই।

বাংলা সাহিত্যে জনমানসের প্রকাশ

(১)

বাংলা সাহিত্যের একটা প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে লোক-সাহিত্যের নানা বিচিত্র ধারার প্রচুর নিদর্শন বর্তমান। বাঙলা দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ এমন সহজ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিল ও এই কবিত্বশক্তি নানা ধর্মসংস্কার, অপ্রাকৃত বিশ্বাস, পারলৌকিক কল্পনা ও জীবনদর্শনের দ্বারা এরূপ প্রভাবিত ও পুষ্ট ছিল যে, ইহা নানাবিধ কাব্য-রচনার মধ্যে অনিবার্য আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই কবিগোষ্ঠী সমাজের অত্যন্ত নিম্নশ্রেণী হইতে উদ্ভূত। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ অনগ্রসর ও স্থূলরুচিসম্পন্ন হইয়াও কবি-কল্পনা, ভক্তিরস ও পুরাণাদি হইতে প্রাপ্ত একপ্রকার উদ্ভট পরলোকতত্ত্বকে সম্বল করিয়া ইহারা যে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে আমাদের বিস্ময় ও কৌতূহলের উদ্রেক হয়।

ধর্মতত্ত্ব ও পরলোককল্পনায়, অধ্যাত্ম সাধনার বিচিত্র রসে ও অভিজ্ঞতায় তাহাদের চিত্ত এমনভাবে অভিষিক্ত ছিল, জীবনচর্যা হইতে নিজ ধর্মাদর্শের পরিপোষক এত প্রচুর উপাদান তাহারা সংগ্রহ করিয়াছিল ও লৌকিক ভাষা, বাগ্‌রীতি ও মিলযুক্ত বা অমিল পয়ার-ছন্দের উপর তাহাদের এমন অনর্গল অধিকার ছিল যে, মুখে মুখে বৃহৎ কাব্য রচনা করিতে তাহাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। মনে হয় যে, ধর্মের নানাতত্ত্ব-কণ্টকিত, বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ইহারা এমন পাকা কাণ্ডারীর মত হাল ধরিতে শিখিয়াছিল যে, কেবলমাত্র সহজ ও সাধনালব্ধ দৃঢ় প্রত্যয়ের পাল খাটাইয়া তাহারা তাহাদের কাব্যতরণীকে অনায়াসে পারে লইয়া গিয়াছে। ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গীর সূক্ষ্ম কলা-কৌশল, মার্জিত রুচির সতর্কবাণী, ধর্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যার গহন ঘূর্ণীপাক, বিদগ্ধ মনন ও সুপ্রতিষ্ঠিত কাব্যরীতির অনুশাসন—এই সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা কেবল অন্তরের স্বতঃউচ্ছ্বসিত পূর্ণতা ও বক্তব্যের সুনিশ্চিত প্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়াই কাব্যরচনার কণ্টকাকীর্ণ, দুস্তর পথে অগ্রসর হইয়াছে। আমরা তাহাদের দুঃসাহসিকতায় কেমন বিস্মিত হই, তাহাদের অশিক্ষিত-পটুত্ব ও অনায়াস-সিদ্ধিতে ততোধিক মুগ্ধ হই। পৃথিবীর আর কোন দেশে অশিক্ষিত গণ-মানসে এত সূক্ষ্ম ও বিকশিত ধর্মচেতনা, এত সহজ, অনাবিল ভক্তিরস, কবিকল্পনার এরূপ ব্যাপক প্রসার ও কাব্যধারার এরূপ বিচিত্রশাখান্বিত প্রকাশভঙ্গীর দৃষ্টান্ত নিতান্তই দুর্লভ।

বাংলা-সাহিত্যের কোন্ কোন্ শাখা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন। অধ্যাপক ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁহার 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে ইহার একটি সুষ্ঠু সংজ্ঞা-রচনা ও বিশেষ-লক্ষণ-নিরূপণের প্রশংসনীয় উদ্যম করিয়াছেন, কিন্তু হয়ত কোন কোন দিকে ইহার পুনর্বিবেচনা বাঞ্ছনীয়। রচয়িতার মানস অবস্থা ও সৃষ্টি-প্রতিবেশের দিক হইতে সাহিত্যকে ব্যক্তিস্বাক্ষরিত, গোষ্ঠী-চেতন ও সম্পূর্ণ অনামিক এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। অবশ্য এই শ্রেণী-বিভাগের সীমা-রেখা যে সব সময় সুনির্দিষ্ট তাহা বলা যায় না। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে প্রায় সমস্ত সাহিত্য-রচনাই ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত; তবুও কোন কোন যুগে ব্যক্তিকতা ও গোষ্ঠী-চেতনা প্রায়

অবিচ্ছেদ্যভাবেই মিশিয়া থাকে। ইংরেজ-সাহিত্যে এলিজাবেথীয় যুগে সনেটকার, সপ্তদশ শতকে দর্শনতাত্ত্বিক লেখকবৃন্দ (Metaphysical School) বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর রচয়িতা-গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ও গোষ্ঠীগত সাধারণ লক্ষণ প্রায় সমপরিমাণেই সংমিশ্রিত। নাম না বলিয়া দিলে কোন বৈষ্ণব বা শাক্ত পদকর্তাকে ব্যক্তিমানসের চিহ্ন-সাহায্যে খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল; পদাবলী-সাহিত্যে এই জন্যই ভণিতা-বিপর্যয়ের জন্য কবি-পরিচয় সংশয়িত হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি এই সমস্ত ক্ষেত্রে সমষ্টিগত ও সাধারণীকৃত মানস পরিস্থিতি হইতে কবির ব্যক্তিসত্তা কিছু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যধর্মী হইয়াছে। এখানে আগেকার কুলীন সন্তানের মত বংশ-পরিচয় মুখ্য ও আত্ম-পরিচয় গৌণ হইলেও ব্যক্তির স্বতন্ত্র মর্যাদা অস্বীকৃত ও অনাবিষ্কৃত নহে।

ইহার পূর্ববর্তী স্তরে কিন্তু অবস্থা ইহা হইতে অনেকটা বিভিন্ন। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে অসংখ্য কবির নাম ভণিতার মধ্যে উল্লিখিত, কিন্তু তাহাদের শ্রেণীনির্দেশকে অতিক্রম করিয়া বিশেষ কোন কবির ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট হয় নাই। যাহাদের ব্যক্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁহারা সংখ্যায় অত্যল্প, প্রায় অসাধারণ ব্যতিক্রমের পর্যায়ভুক্ত। মঙ্গলকাব্যে আমরা খুঁজি উপাদান-সাম্য ও মানস অভিন্নতা; লেখকের স্বকীয়তা আমাদের অনুসন্ধান ও প্রত্যাশার বাহিরেই থাকে। সুপরিচিত আখ্যায়িকা ও প্রথানুসারী ভাব-উদ্দীপনের অন্তরালে লেখকের ব্যক্তিমানস আমাদের কৌতূহলকে ফাঁকি দিয়া প্রায় সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করে।

কালের সোপান বাহিয়া পিছু হটিতে হটিতে অবশেষে আমরা আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ মানবসমাজের কাছাকাছি আসিয়া পড়ি। এই আদিম সমাজের আলো-আঁধারি মানসচিত্রের প্রতিফলন বাংলা-সাহিত্যে বড় একটা পাই না। তাহার কারণ যে, প্রাক্-আর্য মানবগোষ্ঠী নিজের জীবনচর্যা, সংস্কার ও বিশ্বাসকে অবিকৃত রাখিতে পারে নাই—উন্নততর আর্য সংস্কৃতির সহিত তাহার কম বেশী একটা সংমিশ্রণ, হয়ত বা সমন্বয়ও ঘটিয়াছে। প্রায়ই দেখা যাইবে যে, কোন বিশেষ কাব্য-ধারায় আদিম মানসের যে ভাব উৎসরূপে বিদ্যমান তাহা পরবর্তী সংস্কৃতির প্রভাবে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সুদীর্ঘ যুগযুগব্যাপী অনুশীলনের ফলে

জাতির সমস্ত স্তরে প্রসারিত হইয়া আর্য-অনার্য-নির্বিশেষ জাতীয় চেতনার অঙ্গীভূত হইয়াছে। তাই আদিম-চিন্তাপ্রসূত নাথধর্ম প্রভৃতি ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধন-রহস্য ও দেব-পরিকল্পনার মধ্যেও উপনিষদীয় ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের গভীর প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। যে পরিমাণে অভিজাত-মনন ও সুনির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদ এই সমস্ত জনজীবন-সম্ভব ধর্মমতের রূপ-নির্ধারণে সহায়তা করিয়াছে, সেই পরিমাণে ইহারা বিশুদ্ধ লোক-সাহিত্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অনুশীলিত জীবন-দর্শনের পর্যায়ে পৌছিয়াছে। হিন্দুধর্মের কোন-না-কোন রূপের এই সার্বভৌম, সর্বস্তর-ব্যাপী প্রসারের জন্য বাংলা-সাহিত্যে আদিম জনগোষ্ঠীর মানস পরিচয়টি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোন কোন মানবগোষ্ঠী হয়ত তাহাদের সামাজিক আচার-ব্যবহারে ও ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে অনার্য উদ্ভবের স্মৃতিচিহ্ন এখনও বহন করিতেছে। কিন্তু পৌরাণিক, বৈষ্ণব বা শাক্তচেতনার কিছু কিছু ছাপ তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদের কৌম সংহতিকে অনেকটা শিথিল ও উপাদান-বৈষম্যে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষত ইহারা যখন সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ খুঁজিয়াছে, তখন এই সাহিত্য অনিবার্যভাবে বর্ণসাঙ্কর্যের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

(২)

সেইজন্যই বাঙলা দেশে লোক-সাহিত্যের সংজ্ঞা-নির্দেশ ও সীমা-নিরূপণ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার নির্ধারণোপযোগী সুষ্ঠু মানদণ্ড-রচনাও সহজসাধ্য নহে। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী ও কবিগান নিঃসন্দিগ্ধভাবে অভিজাত-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত বলিয়া গৃহীত, যদিও ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে লোকমানসের কিছুটা স্পর্শ আছে। পক্ষান্তরে নাথগীতিকা, ময়মনসিংহ-গীতিকা ও বাউল গান সাধারণতঃ লোক-সাহিত্যের অঙ্গীভূত এই ধারণাই প্রচলিত। এই শ্রেণী-বিভেদের কারণটি বিশেষভাবে পর্যালোচ্য। মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা নাথসাহিত্য অধিকতর দার্শনিক-ভাব-সমৃদ্ধ ও সাধনাতত্ত্বসমন্বিত—গোরক্ষবিজয় বা গোপীচন্দ্রের গান যেন উচ্চতর মননশক্তির পরিচয়বাহী। তথাপি মঙ্গলকাব্য অভিজাত-সাহিত্য ও গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি লোকসাহিত্য। মনে হয় যে, মঙ্গলকাব্যের পিছনে যে

ধর্মচেতনা ও জীবনদর্শন ক্রিয়াশীল তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক ভক্তিবাদের সমর্থনপুষ্ট, ও হিন্দুধর্মের প্রধান ধারার অঙ্গীভূত। ইহার মধ্যে লোকায়ত ধর্মের যে বীজ-উপাদান বর্তমান তাহা পরবর্তী আর্য-সংস্কৃতির আরোপে প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। চণ্ডী অনার্য দেবী এই প্রশ্ন আমাদের নিকট নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মনসার গোত্র-পরিচয় সম্বন্ধে আমরা বেশী কৌতূহলী না হইয়া তাহাকে শিবপরিবারভুক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি ও তাহার হিংস্র নির্মম প্রকৃতিকেও দেবরোষের একটা অহেতুক খেয়াল, ভক্তিপিপাসু ভগবানের ভক্তের প্রতি একপ্রকার বিকৃত স্নেহাতিশয্যের নিদর্শনরূপে শুধু মার্জনাই করি নাই, অনুমোদনও করিয়াছি। ধর্মদেবতাকে বিষ্ণুর সগোত্ররূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া আমরা তাহার প্রতি না গ্রহণ-না-বর্জন-জাতীয় একটা অনিশ্চিত মনোভাব পোষণ করিয়া থাকি। ইহাদের মূলে যে জন-জীবন-সম্ভবতার একটা ক্ষীণ ছাপ ছিল, তাহার উপর অভিজাতধর্মের চক্‌চকে শীলমোহর আঁটিয়া ইহাদিগকে নূতন সাহিত্যিক কৌলীন্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। ব্যক্তিধর্মী রচনার চিহ্ন ইহাদের মধ্যে তাদৃশ সুপরিস্ফুট না হইলেও, ইহাদের ঘটনা-বিন্যাসে, আলোচনা-পদ্ধতিতে ও চরিত্রাবলীর মানস প্রতিক্রিয়ায় যে উন্নততর শিল্পবোধ ও মার্জিততর রুচি অভিব্যক্ত তাহার অনুরোধে ইহাদের রচয়িতাদিগকেও স্বতন্ত্র ব্যক্তি-মর্যাদা দিয়াছি।

মীনচেতন ও ময়নামতীর গানে এই আর্যীকরণ-প্রক্রিয়া আরব্ধ হইলেও পরিণতিতে পৌঁছায় নাই ; ইহাদের দার্শনিক পটভূমিকা ও ধর্মসংস্কারের উপর আর্যপ্রভাব খুব গভীর রেখায় অঙ্কিত নহে। ইহার সিদ্ধারা, অদ্ভুত অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইলেও, নানা অসাধ্য সাধন করিলেও, ঠিক দেব-পদবীতে আরূঢ় হন নাই। ইহার যোগসাধন-প্রক্রিয়া সাধারণতঃ হিন্দু তান্ত্রিকতার সমধর্মী হইলেও ইহার আদিম বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেয় নাই। ইহার সন্ন্যাসগ্রহণ ও ভোগসুখ-পরিত্যাগের সহিত হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বের কোন অমিল নাই ; কিন্তু যে সমস্ত যুক্তির দ্বারা এই আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব ও ভোগের অসারতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহার গ্রহণ উপলক্ষ্যে যে মানবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বঞ্চিত হৃদয়ের যে ক্ষুব্ধ, করুণ খেদোচ্ছ্বাস বায়ুস্তরকে বিদীর্ণ করিয়াছে, তাহা হিন্দুধর্মের প্রশান্ত স্বীকৃতি ও স্বেচ্ছাবৃত কৃচ্ছ্রসাধনের সম্পূর্ণ

বিপরীত-ধর্মী। রাম, বুদ্ধ বা চৈতন্য উচ্চতর কর্তব্য বা ধর্মবোধের নির্দেশে সংসার-সুখকে অবলীলাক্রমে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; তাঁহারা জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত যাহা ত্যাগ করিয়া গেলেন তাহার প্রতি আসক্তি-লোলুপ দৃষ্টি লইয়া একবারও ফিরিয়া তাকান নাই। অবশ্যম্ভাবী মরণের ভয় দেখাইয়া বা প্রচুর শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া ইহাদিগকে এই দুর্গম পথের যাত্রী হইতে প্ররোচিত করিতে হয় নাই। কিন্তু যে তরুণ রাজপুত্র বা রমণীরূপমুগ্ধ, আদর্শভ্রষ্ট সাধক নাথধর্মের যোগসাধন-প্রক্রিয়া অবলম্বনের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের অন্তর এই আবেদনে সহজে সাড়া দেয় নাই। তরুণ কুমার ও বৃদ্ধ যোগী উভয়েই ইন্দ্রিয়ভোগে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত হইয়া রূপসাগরে হাবুডুবু খাইয়াছেন; তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য যে সাধনা-তরী প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে আরোহণ করিতে তাঁহাদের কি মর্মান্তিক অসম্মতি!

বিশেষতঃ গোপীচন্দ্রকে যে সংসার ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে, তাহার পিছনে কোন উন্নত ভাবাদর্শ নাই; ইহা সম্পূর্ণরূপে সুবিধাবাদ-প্রণোদিত, মৃত্যু-প্রতিষেধক ও ভোগসুখের স্থায়িত্ব-বিধায়ক কৌশল মাত্র। নাথ-শাস্ত্রোক্ত মহাজ্ঞান ধন্বন্তরির মহাজ্ঞানের ন্যায় একপ্রকার আভিচারিক মন্ত্রমাত্র; ইহাতে কোন নূতন জ্যোতির্ময় অনুভূতি জাগে না। স্থূল প্রয়োজন-সিদ্ধির অনুকূল কিছু অলৌকিক শক্তি সঞ্চয় হয় মাত্র। সুতরাং হিন্দুসাধনার অধ্যাত্ম প্রত্যয়ের সঙ্গে, ইহার প্রক্রিয়াগত খানিকটা সাম্য থাকিলেও একটা মূলীভূত বিরোধ আছে। মনে হয় যাহারা এই সাধনায় দীক্ষিত হইয়াছে তাহাদের পিছনে কোন সুদীর্ঘ ঐতিহ্য বা ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। তাহারা সাধনাক্রম-বহির্ভূত একটা আগন্তুক জাতি হইতে উদ্ভূত; অধ্যাত্ম দীক্ষার উপযোগী একটা অস্থিমজ্জাগত সংস্কার তাহাদের মধ্যে নাই। অসুরদের সুধাপানের ন্যায় ইহাদেরও এই দুরূহ ধর্মসাধনায় প্রবিষ্ট হইবার কোন অধিকার নাই। ইহাদের কায়া-সাধনা সত্যিকার চিত্ত-সাধনায় উন্নীত হইয়াছে কি না সন্দেহ। তা ছাড়া, আদিম-গোষ্ঠী-সুলভ উদ্ভট কল্পনা, অশালীন রুচি, অনিয়ন্ত্রিত ভাবাতিশয্য, প্রাকৃতিক-নিয়ম-লঙ্ঘী অসম্ভব ঘটনার জন্য এক প্রকার উন্মুখ ঔৎসুক্য এই জাতীয় কাব্যগুলিকে খাঁটি লোক-সাহিত্যের চিহ্নাঙ্কিত করিয়াছে। গোপীচাঁদের গান যে উনবিংশ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত নাথযোগী-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মুখে মুখে সংরক্ষিত ছিল ও ইহাকে যে লিখিত

সাহিত্যের স্থির রূপের মধ্যে ধরিয়া রাখার কোন চেষ্টা হয় নাই ইহাও ইহার স্বরূপ-নির্ণয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য। পরবর্তী কালে ইহার লিখিত রূপের নমুনাও আবিষ্কৃত হইয়াছে, ও দুর্লভ মল্লিক, ভবানীদাস ও আবদুল স্কুর মহম্মদ প্রভৃতি বিভিন্ন লেখকেরও রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ব্যক্তি-রচয়িতাদের হাতে এই জনমানসকল্পিত আখ্যায়িকার যে রূপান্তর সাধিত হইয়াছে, অলৌকিকতা-সংক্ষেপ, অবাধ কাল্পনিকতার নিয়ন্ত্রণ ও ঘটনা-বিন্যাসে পারম্পর্য-রক্ষা ও উচ্চতর শিল্পবোধের দিক দিয়া যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্যের রীতি-পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তথাপিও ইহার মূল রূপটি সৌভাগ্যক্রমে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, পরবর্তী লিখিতরূপ মোটামুটি মৌখিক বর্ণনারীতির অনুবর্তী হইয়াছে ও ইহার উপর হিন্দু সংস্কৃতির মার্জনা-প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়াই এই জাতীয় কাব্যকে আমরা লোক-সাহিত্যের নিদর্শন-রূপেই গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছি।

(৩)

অনুরূপভাবে বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলী এবং কবিগানকে আমরা সাহিত্যিক পদবীতে স্থান দিয়াছি ও বাউলজাতীয় গানকে লোকরচনার পর্যায়ভুক্ত করিয়াছি। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী উভয়েই গোষ্ঠী-চেতনা-প্রসূত; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন কোন কোন কবির মধ্যে এই গোষ্ঠী-চেতনার সাধারণ আবরণ ভেদ করিয়া কিছুটা স্ফুরিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু এই গোষ্ঠীচেতনা অতি সুসংহত ও সুসম্বদ্ধ অধ্যাত্ম সাধনা ও জীবনদর্শনের ফল; ইহাতে ব্যক্তি-মানসের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবানুভূতি বড় বেশী সুপ্রকট নহে। বিশেষত বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলীতে যে ধর্মবোধ ও জীবনাকৃতির প্রকাশ তাহা কঠোরভাবে হিন্দু-শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতবাদের ঘনীভূত সারনির্যাস। সুতরাং ইহারা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইলেও যে অভিজাত-সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইবে তাহা স্বাভাবিক। ইহাদের প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে যে উচ্চাঙ্গের শিল্পবোধ, গঠন-সুষমা ও ভাব-মর্যাদার চিহ্ন সুপরিস্ফুট তাহাও ইহাদের আভিজাত্যের নিদর্শন। কবিগান অশিক্ষিত জনসাধারণের শিল্প-সংযমহীন রচনা ও স্থূল রুচি ও অমার্জিত, দ্রুতউৎসারিত

ভাবের প্রকাশ হইলেও ইহা যে কেন লোক-সাহিত্যরূপে পরিগণিত হয় নাই তাহা চিন্তার বিষয়। কবিগানের মধ্যে লোক-সাহিত্যের বহির্লক্ষণ সুস্পষ্ট; কিন্তু ইহার অন্তঃপ্রকৃতি ঠিক জনমানসের সহজ প্রবণতার অনুগামী নহে। কবিগান একান্তভাবে বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর ভাবানুসরণ; ইহার মধ্যে রচনাগত অপটুতা, প্রাকৃত-জনসুলভ রুচি-বিকার ও ভাবের অসংযম যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কিন্তু তথাপি ইহা গণচিত্ত-উদ্ভূত, জন-মনের অকৃত্রিম স্ফুরণ নহে। ইহার ভক্তিরস, ভাবপ্রেরণা ও জীবনাদর্শ উন্নত সাহিত্য হইতে ধার-করা। এই অশিক্ষিত গ্রাম্য কবিরা মাটির ভাঁড়ে যে কাব্যরস পরিবেশন করিয়াছে তাহা খাঁটি সারস্বত ভাণ্ডার হইতেই সংগৃহীত। তাহাদের রাধাকৃষ্ণ ও ভবানী-বিষয়ক পদগুলি সাহিত্যিক রচনার প্রতিধ্বনি; গ্রাম্য বৃদ্ধার মুখে সংস্কৃত স্তোত্রের যেরূপ স্খলিত, বিকৃত উচ্চারণ শোনা যায়, ইহাদের হাতেও হয়ত বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর সেইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহাদের মধ্যে রক্ত-সম্বন্ধ অস্বীকার করা যায় না। ইহাদের মধ্যে অভিজাত মর্যাদার হাস্যকর অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের নিজের মনের কথা আমরা বিশেষ শুনিতে পাই না। গোঁজলা গুঁই, কেষ্টা মুচি, ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবিয়ালগণ এই হিমালয়-শৃঙ্গ-নিঃসৃত, ভক্তি-কর্পূর-সুরভিত কাব্য-জাহ্নবী-ধারায় স্নান করিয়া যেন নিজেদের বংশ ও আত্মপরিচয় ভুলিয়া গিয়া আপনাদিগকে জ্ঞান দাস—গোবিন্দ দাস—রামপ্রসাদের সগোত্রীয়রূপেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে। হিন্দু সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাবে আমাদের নিম্নতম শ্রেণীর লোকদেরও যে ভাবোন্নয়ন ঘটিয়াছে, তাহারাও যে কাব্য-সৌন্দর্যের সুরলোকে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে এখানে তাহারই বিস্ময়কর নিদর্শন।

বাউল জাতীয় গান কবি-গানের তুলনায় আরও কবিত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম দার্শনিক মনন-চিহ্নিত। কিন্তু ইহার যে দার্শনিক ভিত্তিভূমি তাহা ঠিক পৌরাণিক হিন্দুধর্মের অনুবর্তী নহে। অবশ্য প্রেমধর্ম, ও আচার-বন্ধনমুক্তি ও স্বকীয় অনুভূতির উপর নির্ভরশীলতা বিষয়ে ইহার উপর বৈষ্ণব-প্রভাব সুস্পষ্ট। তথাপি ইহার প্রকাশ-ভঙ্গি, উপমা ও চিত্রকল্প-প্রয়োগে ও প্রচলিত হিন্দুধর্ম-সাধনার প্রতি বঙ্কিম কটাক্ষে ইহা একটি মৌলিক চিন্তাধারাই অনুসরণ করিয়াছে। ইহাও গোষ্ঠী-চেতনা-প্রসূত কিন্তু এই গোষ্ঠী একটি অপেক্ষাকৃত

ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-গঠিত; ইহা হিন্দুধর্মের প্রধান ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক শাখাপথ অবলম্বন করিয়াছে। বাউল গান অনেকটা হিন্দু-মুসলমান-মিলিত সংস্কৃতির ফল, ইহার মধ্যে বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের সহিত সুফি ধর্মের মরমিয়াবাদের একটা সুষ্ঠু সমন্বয় হইয়াছে। সুতরাং যে সমাজ ও জাতি-গঠনের সহিত হিন্দুধর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত অসামাজিক ও নির্দিষ্ট-গৃহহীন বাউলের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিকতা, উহার ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ, পূজা-উৎসব-পার্বন-ব্রত, লৌকিক ও পারলৌকিক কর্তব্য ইহারা সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছে। ইহাদের দার্শনিক ও ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে এক গুরুর প্রতি একান্ত-নির্ভর আনুগত্য ছাড়া বাঁধা-ধরা রীতি ও নিয়মের বিশেষ কড়াকড়ি নাই, মুক্তিকামী আত্মার বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বচ্ছন্দ বিলাস, প্রত্যক্ষ অনুভূতির অনুষ্ঠান-বিরল দীপ্তির ঝলকই ইহার প্রাণ-স্বরূপ।

এই গানের রচয়িতাদের নামও আমরা পাই, কিন্তু ইহাদের ব্যক্তিসত্তা বৃহত্তর গোষ্ঠী-পরিবেশের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হইয়াছে। কাজেই এই জাতীয় গানগুলি অভিজাত-সাহিত্যের প্রকোষ্ঠ-চ্যুত হইয়া লোক-সাহিত্যের ফাঁকা আঙ্গিনার এক কোণে আশ্রয় পাইয়াছে।

এই আলোচনা হইতে অভিজাত ও লোকসাহিত্যের পার্থক্যের মানদণ্ড সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হইতে পারে। যে সাহিত্যের উপর ব্যক্তিত্বের চিহ্ন যত ক্ষীণ ও সামগ্রিক অনুভূতি-কল্পনার ছাপ যত সুস্পষ্ট তাহাই কমবেশী লোক-সাহিত্যের লক্ষণযুক্ত। কিন্তু গোষ্ঠী-চেতনার প্রাধান্য ও অশিক্ষিত মানসের প্রতিফলনই এই বিষয়ে একমাত্র নিয়ামক নীতি নহে। প্রাক্-আধুনিক যুগের প্রায় সব রচনাই গোষ্ঠী-চেতনা-প্রভাবিত। কিন্তু যেখানে এই গোষ্ঠী-চেতনা প্রচলিত ধর্মমতের অনুযায়ী বা অতি-সুনির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদের দ্বারা দৃঢ়নিবদ্ধ, সেখানে রচনায় জনমানসের সুস্পষ্ট চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও ইহা অভিজাত সাহিত্যের মর্যাদা পাইয়াছে। আর যেখানে কাব্য প্রচলিত ধর্ম ও দৃঢ়বদ্ধ দার্শনিকতার দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া খানিকটা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মৌলিক অনুভূতি ও ভাবকল্পনাকে উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে, সেখানে তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও শিল্পবোধের চিহ্ন থাকিলেও উহা প্রাকৃত সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হইবে। তার উপরে আদিম কল্পনার

উদ্ভট আতিশয্য, প্রকাশভঙ্গির লঘুতা ও অমার্জিত রুচির নিদর্শন থাকিলে রচনার লোক-সাহিত্য-ধর্মের দাবী দৃঢ়তর হইবে। এই মানদণ্ডে বিচার করিলে কবি-গান ও বাউল-গান, মঙ্গল কাব্য ও নাথ-গীতিকা কেন ভিন্ন-জাতীয় সাহিত্যরূপে পরিগণিত তাহার রহস্য খানিকটা বোঝা যাইবে।

উপেন্দ্রনাথ—মানুষ ও সাহিত্যিক

সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গত ৩০শে জানুয়ারি (১৯৬০) পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাসাহিত্য-জগতে যে একটা শোকের আলোড়ন উঠিয়াছে তাহা ঠিক তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল নহে। তিনি হয়ত ঠিক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রভাব তাঁহার সাহিত্যরচনার দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। আজকাল আমরা হয়ত সাহিত্যখ্যাতির মোহে না হয় বিশুদ্ধ সাহিত্যানুরাগের জন্যই লেখকের ব্যক্তিসত্তাকে তাঁহার সাহিত্যিক উৎকর্ষের সঙ্গে তুলনায় গৌণ স্থান দিয়া থাকি। সাহিত্যিক কেমন মানুষ ছিলেন তাহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করিয়া তাঁহার লেখার উৎকর্ষের যাচাই করাই একমাত্র কর্তব্য মনে করি।

হয়ত সাহিত্য-বিচারের দিক দিয়া ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু সমাজের মনের দিক্ দিয়া এই বিচারের মানদণ্ড সর্বথা প্রযোজ্য নহে। সমালোচকেরা সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ লইয়া বিচার করুন, সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেষ্ঠত্ব-নিরূপণে আত্মনিয়োগ করুন, কিন্তু সাহিত্যানুরাগী সাধারণ পাঠক বোধ হয় সাহিত্য ও সাহিত্যিককে ভালবাসিতে পারিলে অধিকতর তৃপ্তি লাভ করেন। হিমালয়ের অভ্রভেদী শুভ্র মহিমা আমাদের শুদ্ধ বিস্ময় উৎপাদন করে, কিন্তু শ্যামশষ্প-কোমল, ছায়া-নিবিড় ধরিত্রীই আমাদের স্নেহ ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের অর্ঘ্য লাভ করে। মহৎ সাহিত্য যে সব সময় মনোহারী হয় তাহা নহে—মনোহর সাহিত্যও সব সময় মহত্ত্বের পর্যায়ে পৌঁছে না। অবশ্য কখনও কখনও সাহিত্যে মহৎ ও মনোহর উভয় প্রকার

গুণেরই একত্র সন্নিবেশ দেখা যায়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী একাধারে উন্নত-সাহিত্যিক-গুণসম্পন্ন ও জনচিত্তরঞ্জক। ইহাদের ভাব-মহত্ত্ব জনচিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়া উহাদের রুচি ও চরিত্রগঠনে সহায়ক হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ, ও বিশেষ করিয়া আধুনিক যুগে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যে এমন সূক্ষ্ম মনন-সৌন্দর্য ও দুর্লভ-শিল্পবোধজাত রূপ-সৌকুমার্য থাকে যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে উহার মর্মপ্রবেশ প্রায়ই সম্ভব হয় না। সুদর্শন-চক্রবারিত সুধাধারের ন্যায় উহা মানুষের রসনারুচির আস্বাদ্যমানতা লাভ করে না।

উপরি-উক্ত মন্তব্য উপেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রকৃতির স্বরূপ-নির্ণায়ক বলিয়া মনে হয়। তিনি মধুর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন ও সাহিত্যস্রষ্টা অপেক্ষা সাহিত্যের মধুর রসের পরিবেশক রূপেই জনমনে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্নেহশীল, সহানুভূতিস্নিগ্ধ মানবহৃদয়টি সাহিত্যিকের কঠোর বর্মতলে আবৃত হয় নাই। এমন অনেক লেখক আছেন যাঁহাদের সাহিত্যরস কোন বিশেষ আধারের ছাঁচে সীমিত নহে। সব রকম form-এর বাঁধাধরা সীমা লঙ্ঘন করিয়া উহা আপনাকে প্রকাশিত করে। অবশ্য তাঁহারা যুগের যে বিশেষ রূপকৃতি তাহার অনুবর্তন করিতে বাধ্য হন, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাঁহাদের ভাবপ্রেরণা ঠিক ছাঁচের রেখায় রেখায় বিন্যস্ত হয় না। মঙ্গলকাব্যের যুগে প্রায় সকলেই ব্যক্তিগত-রুচি-নিরপেক্ষ ভাবে উহারই বস্তু-আখ্যানের কাঠামো অবলম্বন করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর যুগে সব কবিই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা বা চৈতন্য-লীলা আশ্রয় করিয়া পদকর্তারূপে আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন। বর্তমান যুগে প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিককে উপন্যাস ও ছোট গল্পের আঙ্গিক-নিষ্ঠ হইতে হয়। সাময়িক রুচির প্রবল স্রোতে গা ভাসান ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর থাকে না। আমার মনে হয় উপেন্দ্রনাথ সেই যুগরুচি-অনুবর্তনের খাতিরেই ঔপন্যাসিক বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার অন্তরাত্মার কতদূর সায় ছিল তাহা সন্দেহের বিষয়। তাঁহার মন মধ্যে সঞ্চিত মানবিক রস কখনও বা উপন্যাসের লক্ষ্যকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, কখনও বা উপন্যাসের আদর্শে খাটো পড়িয়াছে। তাঁহার প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই দেখা যায়, চমৎকার-প্রতিশ্রুতিপূর্ণ প্রারম্ভ, উচ্চ-প্রত্যাশা-উদ্রেককারী মধ্য অংশ ও খানিকটা

আকস্মিক ও অতৃপ্তি-বিধায়ক পরিসমাপ্তি। তিনি ঔপন্যাসিক শিল্পকে সমগ্র-ভাবে অনুসরণ করেন নাই; তাঁহার মানবজীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, তাঁহার রসিকের রুচিবিলাস লইয়া জীবনাস্বাদনের প্রবণতা তাঁহাকে যে দিকে আকর্ষণ করিয়াছে তিনি শেষ পর্যন্ত সেই দিকেই চালিত হইয়াছেন। উপন্যাসের আদর্শ পথের শেষ পর্যন্ত তাঁহার অনুযাত্রী হইয়াছে কি না তাহা তিনি পেছন ফিরিয়া দেখেন নাই। জীবনের মজলিসী সরসতা, হাস্যরসে উপভোগ্য সংলাপ, অন্তরলীলার সুকুমার স্ফুরণ, মনস্তত্ত্বের ছোটখাট, টুকরো টুকরো হীরকোজ্জ্বল প্রকাশ—ইহাই তাঁহার উপন্যাসে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সমস্ত উপন্যাসেই একটা হাস্য-পরিহাস-স্নিগ্ধ সামাজিক পরিবেশ, একটি ঘরোয়া রহস্যমধুর আবহাওয়া ঘন হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার নর-নারী সকলেই একটি স্নেহ ও আরামের উত্তপ্ত স্পর্শে মোহাবিষ্ট। কিন্তু তাঁহার চরিত্রদের সামগ্রিক পরিকল্পনা কতটা মনস্তত্ত্বসম্মত, তাঁহার আখ্যান কতটা অনিবার্য পরিণতির সুত্র-বিন্যস্ত সে দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি নাই। মোট কথা তিনি জীবনকে দেখিয়াছেন জীবন-রসিকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে, উহার অকারণ, অবারিত প্রবাহ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, জীবন-সঙ্গীতমুগ্ধা কুরঙ্গিনীর ন্যায় তিনি উহার উৎসবের বাঁশীর সুরের দিকেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। জীবনের অচ্ছেদ্য-কার্যকারণ-শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মের দিক, উহার জটিল সমস্যাসঙ্কুল দুর্বোধ্যতার দিক, উহার গভীর-তাৎপর্যবাহী মহিমান্বিত পরিচয়ের দিক্ সম্বন্ধে তিনি অনেকটা উদাসীন। তাহার জীবন-কৌতূহল এতই প্রসারশীল, এতই স্বচ্ছন্দ লীলায় বিসর্পিত, এতই সরস-মধুর মননের সর্বাত্মক প্রভাবের অধীন, যে ইহা কোন বিশিষ্ট শিল্পরূপের অনুশাসন মানিয়া চলিতে নারাজ।

সেইজন্য উপেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার পূর্ণ পরিচয় লইতে গেলে তাঁহার উপন্যাস অপেক্ষা তাঁহার বিবিধ রচনার—'মায়াবতীর পথে' ও 'স্মৃতিকথা'র দিকে—দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। উপন্যাসে তিনি আড়ষ্ট ও কেন্দ্রচ্যুত; কিন্তু এই জাতীয় ভ্রমণ-কাহিনী ও আত্মজীবনীতে তাঁহার মানস-দীপ্তি পূর্ণ-বিচ্ছুরিত। তিনি যাহা দেখিয়াছেন, জীবনবোধ তাঁহার মধ্যে যে সরস চিন্তা ও কল্পনার উদ্রেক করিয়াছে তাহা উপন্যাসের নির্দিষ্ট রূপের পাত্রে ধরিয়া রাখা যায় না। তাঁহার বৈঠকী মেজাজ ও মজলিসী রসিকতাই তাঁহার সাহিত্যকৃতির উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করিয়াছে। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে

একটি অলস-বিজৃম্ভিত, বালিসে হেলান-দেওয়া, সুরভি-তাম্রকূটধূম-কুণ্ডলীতে সুবাসিত ও উহার মৃদু মাদকতায় মশ্‌গুল, আলবোলার টানে টানে হাসির লহর ও ছাড়া-ছাড়া রসিকতাপূর্ণ মন্তব্যে উপভোগ্য মজলিশের কল্পনা করিতে হইবে। তাঁহার রচনা একটি দীর্ঘ-বিস্তারিত সংলাপ ও জীবনোপভোগের আয়োজন-বহুল, সৌন্দর্যোপচারে রমণীয় পটভূমিকায় সন্নিবিষ্ট। তাঁহার এলায়িত মনোভঙ্গী কোন সুকঠোর সাধনার নাগপাশে বন্দী হইতে চাহে না। তাঁহার স্বচ্ছন্দ বিচরণ এত মনোহর, এত জীবনরসে উচ্ছল যে কোন বাঁধা-ধরা কক্ষপথে তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে যাওয়া তাঁহার প্রকৃতির উপর অত্যাচার। বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি এত সৌন্দর্যরস দুই অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়াছেন, জীবনের নানা কৌতূহলপূর্ণ তত্ত্ব ও গভীর তাৎপর্যকে এত অবলীলাক্রমে অন্তরে গ্রহণ করিয়াছেন, নিজের সহৃদয় সামাজিকতা ও সরস বাকবৈদগ্ধ্যকে এত সহজে মুক্তি দিয়াছেন যে, আমরা তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট কোন দুরূহতর তপশ্চরণের দাবী জানাই না। 'মায়াবতীর পথে'র প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার এই অসাধারণ জীবনরস-রসিকতা হিমালয়-শৈল-গাত্রে নৃত্যপরা গিরিনির্ঝরিণীর ন্যায় অজস্র ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। ইহারই ফাঁকে ফাঁকে তিনি গল্প বলিয়া, রসিকতাপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তির বিনিময়ে, হাস্য-পরিহাসের অবিরল নিঃসরণে আমাদের এরূপ কৌতুকরসে নিমজ্জিত রাখিয়াছেন যে, আমাদের কোন অভাববোধই জাগে না। যতক্ষণ তিনি বিরূপাক্ষের গল্প শোনান, বাবুগিরি ও নবাবির মধ্যে পার্থক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন, বা মিলিটারী ও সিভিল সাহেবদের আমাদের প্রতি আচরণের বৈসাদৃশ্যের কারণ নির্দেশ করেন, তখন যাত্রা থামিয়া থাকে কিন্তু এই যাত্রাবিরতি আমাদের মনে বিন্দুমাত্র বিরক্তির উৎপাদন করে না। টুরিষ্ট-কারের প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা ও উহার জন্য হতাশ প্রতীক্ষা যাত্রীদলের মনে যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করে তাহা লেখকের বর্ণনাগুণে ও হাস্যরসসিঞ্চনে একদিকে বিরাট বিস্তার ও অপর দিকে আনন্দস্রাবী হৃদয়-সংবেদ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। সমস্ত কাহিনীটির উপর লেখকের নির্মল, প্রসন্ন চিত্তের স্নিগ্ধতা গিরিশৃঙ্গে প্রথম অরুণ-রেখার ন্যায়, অপরূপ মায়াবরণের মত প্রসারিত হইয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উদাত্ত চরিত্র-গৌরবের ও মহনীয় কীর্তির নানা তথ্যসমৃদ্ধ কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ও তাঁহার প্রসন্ন চিত্তের

স্পর্শে চিত্তরঞ্জনের মানবিক সত্তা যেরূপ অতিরঞ্জন-মুক্ত হইয়া, সত্যের জ্যোতির্ময় টিকা ললাটে পরিয়া, স্বচ্ছ মহিমায় আবির্ভূত হইয়াছে তাহা কোন সরকারী বিবরণীতে দুর্লভ। উপেন্দ্রনাথের কাহিনীতে আমরা দেশবন্ধুর মহত্ত্বের প্রকৃত উৎসের সন্ধান পাই, তাঁহার উদার, মানবপ্রীতিতে অভিষিক্ত সত্তার স্পর্শ লাভ করি। তাঁহার এই জাতীয় ভ্রমণ বা পূর্বস্মৃতি-রোমন্থনের কাহিনীগুলিতে আমরা যে সৌন্দর্য-[illegible], যে জীবন-প্রজ্ঞা, যে প্রফুল্ল, প্রসন্ন, জীবনানন্দে অভিস্নাত চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাই তাহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-মানসিকতার নিদর্শন।

উপেন্দ্রনাথ কেবল যে সাহিত্যিক ছিলেন তাহা নয়; তিনি তরুণ সাহিত্যিকদের উৎসাহদাতা ও শিক্ষিত সমাজে সাহিত্যরস-প্রসারের বিশিষ্ট প্ররোচক ছিলেন। তাঁহার প্রাত্যহিক বৈঠকে যে কত সাহিত্যানুরাগী তরুণ প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, কত রসের ধারা স্বচ্ছন্দগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে, কত মনোজ্ঞ চিন্তা-কল্পনা জন্ম লাভ করিয়াছে, কত জীবনতত্ত্ব লীলাচ্ছলে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যিনি সাহিত্যিক তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয়; কিন্তু যিনি অপরকে সাহিত্যিক করিয়া তোলেন তিনি সমাজের আরও বেশী হিতকারী। ফুলের জন্ম সুকর্ষিত উদ্যান-সীমায়, কিন্তু বাতাস উহার গন্ধ দিগ্‌বিদিগে ছড়ায়। সাহিত্যক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথ শুধু যে ফুল ফুটাইয়াছেন তাহা নহে, গন্ধবহ বায়ুর কাজও করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জীবন, তাঁহার জীবনব্যাপী আচার-আচরণ, তাঁহার বন্ধুপ্রীতি, সৌজন্য-শিষ্টাচার, তাঁহার সভা-সমিতিতে উপস্থিতি ও ভাষণ, তাঁহার পারিবারিক নীতি ও সম্পর্কের চর্যা—সবই এই পুষ্পগন্ধ-সুরভিত। সাধারণ, এমন কি অসাধারণ সাহিত্যিকও যে মধুর রস সাহিত্যে সৃষ্টি করেন, জীবনকে তাহাতে অভিষিক্ত করিতে পারেন না। তাঁহারা প্রায় বহু পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিক, অভিমান-কণ্টকিত ও নিজ শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অতি-সচেতন। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত উকীলকে শিঙ-এ ও শামলায় চিনিত; আমরাও অনেক সময় সাহিত্যিককে চিনি তাঁহার উভয়বিধ শিরোভূষণে—গৌরবের উষ্ণীষ ও আক্রমণশীলতার শৃঙ্গে। উপেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ছিলেন। সৃষ্টির কেন্দ্রীভূত উত্তাপকে তিনি তাঁহার জীবনচর্যার অসংখ্য রন্ধ্রপথে মুক্তি দিয়াছেন। তিনি পূর্বযুগের মজলিসী সাহিত্যিকের শেষ নিদর্শন। তাঁহার

তিরোধানের সহিত বাঙলার সাহিত্য-সাধনার এক অধ্যায়ের উপর যবনিকাপাত হইল। তাঁহার মনে সৌন্দর্যের আকর্ষণ ও বিদগ্ধ সমাজের নিবিড় মোহ এত প্রবল ছিল যে, তিনি আসন্ন মৃত্যুভীতিকে সর্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে কোনও দিন একটি অনুযোগের বাণী, একটি উদ্বেগসূচক মন্তব্য, জীবন সম্বন্ধে নৈরাশ্যবাদের এতটুকু ইঙ্গিত শোনা যায় নাই। সে সদাহাস্যময়, নিরুদ্বেগ প্রসন্নতা তাঁহার সাহিত্যে পরিস্ফুট, তাঁহার জীবনেও তাহা সর্বদা নির্মেঘ আলোক ব্যাপ্ত করিয়াছিল। ডাঃ জনসন নিজে খুব বড় সাহিত্যিক না হইয়াও তাঁহার যুগের সাহিত্য-গুরু ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ জনসনের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াও, কেবল কান্তসম্মিত উপদেশের দ্বারা, কেবল অকপট সাহিত্য-প্রীতি ও বন্ধুবাৎসল্যের মৃদুতর উপায়ে আমাদের বহু-বিরোধকণ্টকিত যুগে সেই সাহিত্য-গুরুর আসনই অধিকার করিয়াছিলেন।

অতি-আধুনিক কাব্য ও রাজনৈতিক উপন্যাস

সাহিত্যের অন্তঃপ্রকৃতি চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু যুগ ও ব্যক্তিভেদে ইহার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক পরিবর্তিত হয়। এক এক যুগে সাহিত্যস্রষ্টার মানস সংস্থিতি একটি বিশেষ রূপের প্রতি প্রবণতা দেখায়। সেইজন্য মহাকাব্যের যুগ, অদ্ভুতরসপ্রধান আখ্যায়িকার যুগ, নাটক ও গীতিকাব্যের যুগ, উপন্যাসের ও ছোটগল্পের যুগ সাহিত্যের ইতিহাসে এক একটি বিশেষ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। অবশ্য এই সাধারণ নিয়মের যে ব্যতিক্রম নাই তাহা নয়। প্রতি যুগেই তীক্ষ্ণব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাহিত্যিক যুগ-প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া আপন অনন্যসাধারণ মানস প্রবণতাকেই সাহিত্যে রূপ দেন। তথাপি সাধারণ সত্য হিসাবে এই অনতিক্রম্য যুগ-প্রভাবই সাহিত্যের বাহিরের রূপ ও উপাদানের বৈশিষ্ট্যটি অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। এক এক যুগে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সাহিত্যিকের নিকট মানব-জীবনের একটি বিশেষ সমস্যা প্রধান বিষয়রূপে উপস্থাপিত করে; এবং প্রচলিত সৌন্দর্যবোধের মান,

যুগ-মানসের বিশেষ রুচি ও প্রয়োজন, সামাজিক আদর্শবাদের দৃঢ়বদ্ধতা বা শিথিলতা, চিত্তের প্রশান্তি-চাঞ্চল্য, জীবনানুভূতির খণ্ডিত বা অখণ্ডিত পরিমাণ—এই সমস্তই তাহার বাহিরের আঙ্গিকটি নির্ধারণ করিয়া দেয়।

অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক উপন্যাস ও গদ্য কবিতার প্রাদুর্ভাব এই সত্যেরই পরিচয় বহন করে। যুগ-প্রতিবেশের বিকৃতি ও একদেশদর্শিতার চিহ্ন-স্বরূপই এই দুই প্রকারের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক সাহিত্যে ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রথমত গদ্য বা ছন্দোহীন কবিতার কথাই ধরা যাউক। কবির কিরূপ মনোভাব হইতে ইহার উদ্ভব, পাঠকের কিরূপ রসরুচির ইহা সমর্থন-প্রত্যাশী আলোচনার সাহায্যে এই রহস্যের উপর আলোকপাত সম্ভব কি না দেখা দরকার। কাব্যচ্ছন্দে মনো-ভাব-প্রকাশে লেখকের অনিচ্ছা বা অনভিরুচির কারণ কি? অবশ্য কবি নিজে স্বীকার করেন না যে ছন্দহীন কবিতা চিরপ্রথাগত কবিতার সহিত তুলনায় কোন দিক দিয়া অপকৃষ্ট—বরং তাঁহারা যে কবিতার বহিরঙ্গমূলক ধ্বনিপ্রবাহ ও সঙ্গীতঝঙ্কারের আকর্ষণকে উপেক্ষা করিয়া ভাবের ও অনুভূতির স্বাধীন ও স্বকীয় গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন ইহার জন্য আত্মপ্রসাদই অনুভব করেন। ছন্দের ইন্দ্রজাল ও ধ্বনিমাধুর্যের মধ্যে যে মাদকতা আছে তাহা মানবের অপরিণত শৈশবেরই উপযোগী—সমস্যাপীড়িত, পরিণতবুদ্ধি মানবের বিশুদ্ধ, বলিষ্ঠ রুচি কৈশোরের এই অতিরিক্ত মিষ্টপ্রিয়তাকে দুর্বলতার মত পরিহার করে।

অবশ্য যদি ছন্দকে কেবল কাব্যের বহিরঙ্গমূলক আভরণ, তাহার নৃত্যচটুল পদক্ষেপের নূপুরশিঞ্জন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অতি-আধুনিক কবিগোষ্ঠীর এই মত কতকটা গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন যে, ছন্দ কাব্যের দেহ-লাবণ্যের তরঙ্গিত হিল্লোল, তাহার আত্মার সৌরভ, তাহার ভাবরূপের মূর্ত প্রকাশ তাঁহারা ইহাকে ছাঁটিয়া ফেলার উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন না ও ইহার বর্জনে কোন দিনই সায় দিবেন না। ছড়া শিশুর মনে আবেদন জাগায় বলিয়া সমস্ত ছন্দই যে ছেলেভুলানো ছড়ার অনুরূপ, ইহা যে পরিণত বুদ্ধিবৃত্তির অনুপযোগী এরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য নহে।

আসল কথা হইল যে আধুনিক কবি যে মনোভাব লইয়া কবিতা রচনা করেন, ধ্বনিপ্রবাহ-গ্রথিত ছন্দ তাহার সার্থক ও অনিবার্য অভিব্যক্তি নহে। কবিচিত্ত যখন একটি ভাবকে অখণ্ডরূপে উপলব্ধি করে ও মনের গভীরতম প্রদেশে আবর্তনের দ্বারা ইহার অস্থিমজ্জায় বিশুদ্ধ সৌন্দর্যরস সংক্রামিত করে, তখনই ইহার প্রকাশ ঘটে ছন্দোময়ী বাণীতে। ছন্দের স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচনী শক্তিতে ভাবের মধ্যে যাহা সাময়িক, যাহা স্থূল, সুলভ উত্তেজনা উদ্রেক করে, যাহা একটি অনবদ্য রসসত্তার অঙ্গসৌষ্ঠবের মধ্যে ধরা দেয় না, যাহা কবির ধ্যান-দৃষ্টির অঙ্গীভূত হয় না, তাহা আপনা-আপনিই বাদ পড়ে। কিন্তু এই অখণ্ড রসসত্তার উদ্বোধন করিতে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন হয়। "প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং"—উদরপরায়ণের এই নীতি কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। উত্তেজনার প্রথম মুহূর্তে কবির চিত্তে বিশুদ্ধ কাব্যরসের সঙ্গে নানা বিসদৃশ উপাদান সঞ্চিত হয়, স্বর্গীয় সুধার সহিত অনেক ফেনার ফোঁসফোঁসানি মিশ্রিত থাকে। এই ফেনোচ্ছ্বাসের কৃত্রিম আলোড়ন স্থির না হইলে ভাবসত্তার মূর্তিটি কবিকল্পনার নিকট নিজস্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে না। ভাস্কর যেমন পাথর কুঁদিয়া উপকরণের অতিপ্রাচুর্যসঞ্জাত বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করিয়া তাঁহার ধ্যান-মূর্তিটি ফুটাইয়া তোলেন, স্থূল জড়ত্বের কারাগার হইতে মানসলোকের সুস্পষ্ট দ্যোতনাটিকে উদ্ধার করেন, কবিকেও অনেকটা তাঁহার উপকরণ-বাহুল্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাঁহার অনুভূতির বিশুদ্ধ রূপটিকে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এই মার্জিত, পরিশোধিত কল্পনা-রূপটি,—বহু আয়াসে লব্ধ, বহু মননক্রিয়ার সাহায্যে স্থিরীকৃত, বহু আবেগের রোমন্থনে ঘনীভূত—ছন্দোমুকুরে, ইডেন উদ্যানের স্থির সরোবরজলে রূপসী ইভের ন্যায়, নিজ প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিয়া আত্মবিস্মৃত হয়।

অতি-আধুনিক কবিরা সাধারণতঃ যে মনোভাবের প্রেরণায় তাঁহাদের কবিতা রচনা করেন তাহা উপরি-উক্ত প্রক্রিয়ার সহিত বিভিন্ন। প্রথমতঃ, সৌন্দর্যসৃষ্টি তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সমসাময়িক জগতের উদ্‌ভ্রান্ত বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, শাশ্বত মূল্যবোধের বিপর্যয়, ভারসাম্য-চ্যুত জীবনের উদ্ভট জিজ্ঞাসা ও নেতিবাদ কবিগোষ্ঠীর চিত্ত এমনভাবে অভিভূত করিয়াছে, যে অধিকাংশ কবিতার মধ্যে এক উগ্র-তিক্ত, বিহ্বল-বিমূঢ় মনোভাবই

ব্যক্ত হয়। এই ছন্নছাড়া, উৎকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার মধ্যে যে কোন নূতন কেন্দ্রিকতা ও সুষমাবোধ আবিষ্কার করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধেই কবিরা আশা ও ঔৎসুক্য হারাইয়াছেন। যাহাদের মাথার উপর আকাশ আসন্ন বিভীষিকার ঝটিকায় রক্ত-পিঙ্গল, যাহাদের পায়ের নীচে পৃথিবী অস্থির-কম্পমান, যাহাদের মস্তিষ্কে নানা জটিল, অসুস্থ চিন্তার বীজাণু সঞ্চরণশীল, যাহাদের সুকুমার বৃত্তিগুলি অনুশীলনের অভাবে রুক্ষ-কর্কশ, তাহাদের কবিতায় ভাব-পরিমিতি ও ছন্দসুষমা আশা করা যায় না। অনুভূতির ছন্দপতন অনিবার্য প্রাকৃতিক নিয়মে, কাব্যরচনার শব্দ-সমাবেশে ছন্দপতন ঘটায়। অন্তরে সুষমা না থাকিলে বাহিরের সুষমা হয় অনায়ত্ত থাকে, না-হয় কৃত্রিম গতানুগতিকতার পর্যায়ভুক্ত হয়। জীবনের মূল্য নিজেই না বুঝিতে পারিলে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় তাহা প্রতিফলিত করা যায় কেমন করিয়া? কবিতায় বিদ্রোহের, অস্বীকৃতির, প্রতিবাদের স্থান আছে। কিন্তু ইহাদিগকে উন্নততর, গভীরতর ভাবে অনুভূত আদর্শবাদের পটভূমিকায় সন্নিবিষ্ট না করিলে ইহারা কাব্য হয় না—প্রচুর ধূম হইতে অগ্নিশিখা জাগিয়া উঠে না।

সুতরাং মনে হয় যে, অধিকাংশ আধুনিক কবিই ঠিক খাঁটি কাব্য-মনোভাব লইয়া কবিতা রচনা করিতে বসেন না। প্রতিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তাঁহাদের মনে যে উষ্ণ ভাবাবেগ সঞ্চিত হয় তাহাই তাহাদের প্রকাশ-সুষমাকে বিপর্যস্ত করে। অতিরিক্ত বাষ্পের চাপে বয়েলার যেমন থর থর কাঁপিয়া উঠে, তেমনি অন্তঃনিরুদ্ধ, অনিশ্চিত ভাবের আতিশয্যে, যে স্থির সমগ্রদৃষ্টি কাব্যের প্রাণ তাহাই প্রতি মুহূর্তে অস্পষ্ট, বাষ্পবিড়ম্বিত হইয়া উঠে। যখন সমস্ত চিত্ত একটা বিশেষ বিক্ষুব্ধভাবের দ্বারা আবিষ্ট হয়, তখন এই আবেশই বিচার-বিভ্রম উৎপাদন করে। অন্তঃসঞ্চিত ক্রোধ ও বিরক্তিই যেন কাব্যের উপাদান এইরূপ ভ্রম হয়, লাঠিবাজিকে বীণাবাদনের সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য ক্রোধে উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হইতে পারে। কিন্তু এই ক্রোধ ঠিক লৌকিক নয়, মহাদেবের তৃতীয়-নয়ন-বিচ্ছুরিত অগ্নিশিখার ন্যায় ইহাকে ভাবময়, বস্তুনিরপেক্ষ ও শাশ্বত ন্যায়নীতির প্রতীক হইতে হইবে। বাল্মীকির অভিশাপে কাব্যপ্রস্রবণের উৎসমুখ উন্মুক্ত হইয়াছিল; দুর্বাসার

অভিশাপে এক প্রণয়চিন্তাবিভোরা, কর্তব্যবিস্মৃতা শকুন্তলার ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র কেবল ব্যক্তিগত পীড়নের উদ্ভব হইয়াছে, কোন শাশ্বত নীতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

আধুনিক ছন্দোহীন কবিতায় ইহার তিক্ত উদ্গার, নৈরাশ্যক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস ও অন্ধ অনুসন্ধানের মধ্যে মাঝে মাঝে যে বিশুদ্ধ কাব্যরসের আস্বাদন মিলে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অনুভূতির তীব্রতাই স্থানে স্থানে বিরক্তিকর, জুগুপ্সিত উপাদানের রূপান্তরসাধন করিয়া তিক্ততাকে মাধুর্যরসে পরিণত করে। কিন্তু এই জাতীয় কবিতায় ভাব-সংহতির প্রভাব খুব বেশী দেখা যায় না। সুবর্ণরেখার বালুকারাশির মধ্যে ক্বচিৎ স্বর্ণরেণুর আবিষ্কার যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করে; কিন্তু মরুভূমিতে এই বিন্দুক্ষরণে পাঠকের সৌন্দর্য-তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। সমস্ত কবিতার মধ্যে নজরুল ইসলামের কোন কোন কবিতার মত যদি মরুভূমির অসহনীয় তাপ ও জ্বালা সার্থকভাবে রূপায়িত হইত, তাহা হইলেও তাহার কাব্যগত উৎকর্ষ মানিয়া লওয়া যাইত—কিন্তু কেবল অবসাদ, গ্লানি ও অসহায়তার ব্যর্থ বিক্ষোভের অতিপল্লবিত বিস্তারে চিত্ত অপ্রসন্ন অতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে। হয়ত নৈতিক ভূমিকম্পের ফলে আমাদের মানস মানচিত্রই বদলাইয়া গিয়াছে—উন্মূলিত পর্বতাংশ ও মহীরুহ প্রভৃতির চাপে যেমন চলমান নদীপ্রবাহ অবরুদ্ধ ও শুষ্ক হয়, তেমনি আমাদের সংস্কার ও জীবনদর্শনে যে বিরাট বিপর্যয় আসিয়াছে তাহাতে আমাদের আবেগ-অনুভূতির ধারাও শীর্ণ ও খণ্ডিত হইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণতা হারাইয়াছে। ইহা এখন পদে পদে বাধা কাটাইয়া, নানা অমীমাংসিত প্রশ্নের চড়া বেষ্টন করিয়া, নানা বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতার কচুরিপানায় আটকাইয়া, মন্দ-স্তিমিত গতিতে কোন মতে আগাইয়া চলিয়াছে। ছন্দ হইতেছে দুরন্ত, দুর্দম আবেগের বাহন; আবেগ শুকাইয়া গেলে তাহার বাহ্য প্রতিরূপ ছন্দ তাহার অবিচ্ছিন্ন গতি হারাইবে। কাজেই এখন আমরা ছন্দের পরিবর্তে পাই তাহার দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি, তাহার ক্ষীণ রেশ ও অস্পষ্ট স্মৃতি, তাহার প্রেতায়িত ছায়ামূর্তি। হয়ত এখন কিছুদিন ধরিয়া এই নীচু সুরেই গলা সাধা চলিবে। শরৎ-আকাশে সঞ্চরণশীল লঘু-মন্থর মেঘখণ্ডের মত কাব্যাকাশে ছন্দভারতীর বীণার দুই-একটা বিচ্ছিন্ন তান, তাঁহার দুই-একটা কণ্ঠলীন

গুঞ্জন, দুই-একটা আধ-ফোটা সুরের কাকলী ভাসিয়া বেড়াইবে। চিত্তে নূতন ভাবের জোয়ার না আসিলে প্রাচীন সংস্কারের ধ্বংসস্তূপকে অপসারিত করিবার শক্তি আসিবে না। যতদিন মন পদাতিকধর্মী থাকিবে, মাটির কাছে কাছে তাহার হারানো রত্নকে খুঁজিয়া বেড়াইবে, ব্যর্থতা-বিক্ষোভের দৃষ্টিরোধী কুহেলিকাস্তরের নীচে আপনাকে আবদ্ধ রাখিবে, ততদিন ছন্দের অসীম ব্যঞ্জনা ও উদ্বেলিত উল্লাস উহার অনধিগম্য থাকিবে। উর্ধ্বাকাশ-বিচরণের প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে পক্ষবিস্তারের শক্তিও আপনা হইতেই আসিবে। সুতরাং অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য ছন্দহীনতার রীতিই যে আমাদের মধ্যে স্থায়ী হইবে এইরূপ সিদ্ধান্তই অপরিহার্য মনে হয়।

রাজনৈতিক উপন্যাস অনেকটা ছন্দহীন কবিতার সগোত্র ও প্রতিরূপ। উভয় ক্ষেত্রেই একই রূপ মনোবৃত্তির ক্রিয়াশীলতা দেখা যায়। বর্তমানে যে বস্তুটি সর্বাপেক্ষা চোখে পড়ে ও মনের তীব্র পীড়া জাগায়, যাহাকে এড়াইবার উপায় নাই ঔপন্যাসিকবৃন্দ স্বাভাবিক কারণেই তাহাকে বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করেন। সমসাময়িক জগতের উদ্‌ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা যেমন কাব্যে তেমনি রাজনৈতিক সংগ্রামের উগ্র উত্তেজনা, বিরুদ্ধ মতবাদের তীব্র সংঘর্ষ, নূতন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা-স্থাপনের স্বপ্নবিহ্বল আকূতি ও সুকুমার আদর্শবাদ উপন্যাসে আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে। সেইজন্য স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর, ১৯৪২ এর আগষ্ট-আন্দোলন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতা, কংগ্রেস ও কমিউনিজম মতবাদের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, স্বাধীনতা-লাভের পর বৈষম্যবর্জিত নূতন সমাজ গড়িবার একাগ্র প্রচেষ্টা, দেশপ্রেমিকের আত্মোৎসর্গের প্রেরণা লইয়া আধুনিক যুগের বহু উপন্যাসই রচিত হইয়াছে। এই দেশব্যাপী উত্তেজনার মোহ যেন সাহিত্যিককে পাইয়া বসিয়াছে ও তাহার শাশ্বত মূল্যবোধকে অনেকটা আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই বিষয়ে লেখক ও পাঠকের মধ্যে এমন একটি অনায়াস-লভ্য যোগসূত্র বর্তমান, এমন একটি সুলভ আবেগপ্রবণতা ও ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশোন্মুখ, লিখিতে বসিলেই এমন একটি নিবিড় আবেশ ঘনাইয়া আসে যে এই প্রলোভন-সংবরণ অমানুষিক আত্মসংযমের ব্যাপার। দেখিতে দেখিতে নদীতে জোয়ার আসার ন্যায়, ভাবের ও ভাষার দুর্দম উচ্ছ্বাসে উপন্যাসের কলেবর কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। পাঠকের সহিত রুচিসাম্য, ভাবোচ্ছ্বাসস্ফীত নিজ অন্তরের

সমর্থন, প্রতিবেশের বৈদ্যুতীশক্তির প্রাণময়তা—জনপ্রিয়তার নিশ্চিত আশ্বাস—কোন্ লেখক এই সমস্তের সম্মোহন প্রভাব অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের প্রমাদহীন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতি নিজ লক্ষ্যকে নিবদ্ধ করিতে পারেন? রাজনৈতিক উষ্ণ প্রস্রবণে অবগাহন দেহে-মনে এমন আরাম ও তৃপ্তি আনে যে মনে হয় যে ইহাতে গা ভাসাইলেই স্রোতোবেগে চরম সিদ্ধির উপকূলে অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে।

এই রাজনৈতিক উপন্যাসের মধ্যে স্থায়িত্বের যে কোন উপাদান নাই তাহা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। দেশব্যাপী ভাবাবেগের ঘূর্ণাবর্তে, আদর্শ-বাদের দুরারোহ শিখরের দিকে যাত্রাপথে মানবপ্রকৃতির যে বিশিষ্ট রূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়, যে অসাধারণ পরিচয়টি ফুটিয়া উঠে, তাহার সার্থক রূপায়নের চিরন্তন মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু এই পরিচয়টি মানবের গভীরতম সত্তা সম্বন্ধে হওয়া চাই। মানবচিত্তের যে অংশ তর্ক করে, বক্তৃতা করে, দলে ভিড়িয়া সংগ্রাম করে, মাঝে মধ্যে আদর্শের ব্যর্থতায় ক্ষোভের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ও শেষে চরম আত্মোৎসর্গের দ্বারা অমর খ্যাতির পুষ্পকরথে আরোহণের যোগ্যতা অর্জন করে, তাহার মধ্যে ব্যক্তিত্বের সুগভীর তত্ত্বটি নিহিত থাকে না। সৈনিকের বীরত্ব, দেশপ্রেমিকের ভাবোচ্ছ্বাস, মতবাদ-প্রচারকের অমোঘ যুক্তিশৃঙ্খলা ও তেজোগর্ভ বাণী, বিদ্রোহীর অনমনীয় দৃঢ়তা ও প্রতিরোধ-শক্তি—এ সমস্তই সমষ্টিগত কর্মপ্রণালীর পূর্বনির্দিষ্ট পথ বাহিয়া প্রবাহিত হয়। ইহার মধ্যে ব্যক্তিত্বস্ফুরণের অবসর খুব বেশী নয়। যেমন ষ্টীমরোলারের চাপে রাস্তার উঁচু-নীচু সব গুঁড়াইয়া সমতল হইয়া যায় তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সমষ্টিগত উদ্দেশ্যসাধনের অন্তরালে আত্মগোপন করে। ভাবপ্রবণতার উষ্ণ বাষ্পনিষ্কাশন যে অস্পষ্ট বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করে তাহাতে অবয়ব ও অন্তঃপ্রকৃতির তীক্ষ্ণ রেখাবেষ্টনী অদৃশ্যপ্রায় হয়। প্রতিবেশচিত্র ব্যক্তিগত চরিত্র-চিত্রণকে গৌণ করিয়া প্রধান হইয়া উঠে। সুতরাং উপন্যাসের যে প্রধান লক্ষ্য চরিত্রাঙ্কন, চরিত্ররহস্যের গভীরে অন্তর্দৃষ্টি এই জাতীয় উপন্যাসে তাহা প্রায়ই সার্থক হয় না। ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে ত্রুটি তাহা রাজনৈতিক উপন্যাসে পুনরাবৃত্ত, এমন কি তীব্রতর হইয়া উঠে।

রাজনৈতিক উপন্যাসের আরও একটি বিপদের দিকে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। ইহার বিষয়বস্তু আমাদের সাধারণ চেতনার এমন অচ্ছেদ্যভাবে অঙ্গীভূত হইয়াছে যে ইহা সাহিত্যের বিশেষ গুণের অপেক্ষা রাখে না। প্রাচীন কালে মঙ্গলকাব্যের ন্যায় ইহা আমাদের চিত্তাকাশকে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে যে ইহার সাহিত্যিক রূপায়ন অনেকটা নির্বিশেষ ও সাধারণ-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। অবশ্য মধ্যযুগের সহিত তুলনায় আধুনিক যুগে সাহিত্যিকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আরও সুপ্রতিষ্ঠিত; যুগধর্মের এই অপরিহার্য লক্ষণটুকু বাদ দিলে বিভিন্ন লেখকের মধ্যে রীতি-পার্থক্য বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও রচয়িতার মানস সাম্যের অন্তরালে চাপা পড়িতেছে। লেখকের মনোভাব সম্বন্ধে আমরা পূর্ব হইতেই অনুমান করিতে পারি; তাঁহার মনন ও বর্ণনার মধ্যে অভিনবত্ব ও অভাবনীয়ত্বের চমক ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। রাজনৈতিক জোয়ালে জোড়া প্রেমিকযুগল, মুখে যতই আস্ফালন করুক, নিজ স্বাধীনতাস্পৃহা যতই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করুক, মতবাদের বৈপ্লবিকতার লঘু বাষ্পে যতই স্ফীত হইয়া উঠুক, চক্রনেমিক্ষুণ্ণ, পূর্বনির্ধারিত পথরেখাকেই অব্যভিচারীভাবে অনুসরণ করিতেছে। মানবপ্রকৃতির স্বাধীন, অব্যাহত স্ফুরণ, ইহার চরিত্রের নিগূঢ় উৎস হইতে উদ্ভূত, অথচ অতর্কিত বিবর্তন এই সমস্ত রাজনৈতিক-মতবাদ-নিয়ন্ত্রিত উপন্যাসে যথেষ্ট অবসর পায় না। সিন্ধবাদের মত আমাদের স্কন্ধে যে দৈত্য চাপিয়া বসিয়াছে তাহারই অঙ্কুশাঘাতে আমাদের প্রতি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত হয়; তাহার বজ্রমুষ্টির চাপে আমাদের শ্বাসক্রিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। আবার ভাবের নেশায় আমরা অর্ধ-সচেতন ভাবে তাহারই নির্দিষ্ট পথে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিয়া চলি। এই স্বপ্ন, কল্পনা, প্রচেষ্টা, উত্তেজনা হয়ত আমাদের অন্তরশায়ী প্রাণপুরুষকে স্পর্শই করে না।

রাজনৈতিক উপন্যাসের অতি-প্রাদুর্ভাবের আর একটি পরোক্ষ ফল দাঁড়াইতেছে যে ইহাতে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্যে সীমারেখা অস্পষ্ট ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিতেছে। উপন্যাস যেন প্রাত্যহিক ঘটনাবলীর দিনলিপিতে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভে যে আবেগময় নিবন্ধ রচিত হয়, যেরূপ আলোচনা প্রসার লাভ করে, সাহিত্যে তাহাই অকিঞ্চিৎকর পরিবর্তনের সঙ্গে ঔপন্যাসিক চরিত্রের সংলাপ ও মনোভাব-

বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশিত হইতেছে। সাংবাদিকের নৈর্ব্যক্তিকতা ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি-চরিত্রচিত্রণের অক্ষম প্রয়াসে প্রায় অপরিবর্তিতই থাকিতেছে—ঔপন্যাসিক পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া সম্পাদকের বাণী ও বাচনভঙ্গীই আমাদের নিকটে আসিয়া পৌছিতেছে। যাহা ঘটিতেছে, যাহার বাস্তব রূপ আমাদের শিরা-স্নায়ু-চিন্তাকে অভিভূত করিতেছ, যে বিতর্ক আমাদের সংশয়বুদ্ধিকে ঘোলাইয়া তুলিতেছে, যে দ্রুতসঞ্চরণশীল ছায়াপটে প্রতিটি মুহূর্ত নিজ ক্ষণিক প্রতিচ্ছবি ফেলিতেছে, তাহার ভবিষ্যৎ, চিরন্তন প্রতিকৃতিটি সাহিত্যে ধরা পড়িতেছে না। বিভ্রান্তকারী বিক্ষোভের কেন্দ্রস্থলে সত্যের যে শাশ্বত মূর্তি স্থির, অবিচলভাবে বিরাজমান সাহিত্যিকের দৃষ্টি সেই গভীরতর স্তরে পৌছিতেছে না। সমস্ত সাহিত্য উৎকটভাবে প্রচারধর্মী, তাৎপর্যহীন বস্তুপুঞ্জের ভারে পীড়িত, সাময়িক উদ্‌ভ্রান্তিতে বিহ্বল ও অস্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছে। এই প্রবণতা প্রতিরুদ্ধ না হইলে সাহিত্যিক আদর্শই বিকৃত হইয়া পড়িবে, সমস্ত সাহিত্যই সাময়িকতার মলিন, চঞ্চল আবরণে ইহার জ্যোতির্ময় সত্তাটি হারাইয়া ফেলিবে। সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টির সংরক্ষণ বর্তমান কালের একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ছন্দোহীন কবিতা ও রাজনৈতিক উপন্যাস সমসাময়িক যুগের চিত্তবিকারের তুইটি যুগ্ম প্রকাশ। ইহাদের প্রাদুর্ভাব প্রমাণ করে যে, চলমান ঘটনাপ্রবাহের গতিবেগ আমাদের ভাব-নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সাহিত্যিক আর কালের রথের সারথি নহেন ; অশ্বের রশ্মি-সংযমন তাঁহার আয়ত্তাধীন নহে ; তিনিও রথচক্রোত্থিত ধূলিজাল-সমাকীর্ণ ও আচ্ছন্নদৃষ্টি, তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে অভিনীত ছায়া-নাট্যের সবাক্‌ দ্রষ্টা মাত্র। দ্রুতসঞ্চীয়মান ঘটনাপরম্পরা কবির ধ্যানদৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, শিল্পীর রূপায়নকে ব্যঙ্গ করিতেছে, সাহিত্যের গৃহিণীপণাকে পর্যুদস্ত করিয়াছে। আজ চারিদিকে এলোমেলো, উদ্‌ভ্রান্ত বাতাসে সাহিত্যরথের জয়ধ্বজা অস্থির, কম্পমান। হয়ত ইহা পরিবর্তনযুগের অপরিহার্য পরিণতি ; ভবিষ্যতের অভিনব সংশ্লেষশক্তির পূর্বগামী অবস্থা। অনাগত কালের যে প্রতিভা এই বিচলিত ভারসাম্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে, আমরা তাহারই আগমন-প্রত্যাশী হইয়া তাহার পথের দিকে চাহিয়া থাকিব।

কয়েকটি আধুনিক উপন্যাস

(১)

আজকাল বাঙালীর জীবনায়নের যে রূপটা তাহার গল্প-সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইতেছে তাহা গোধূলি-আকাশের নক্ষত্ররোমাঞ্চিত ধূসরতার মত যেমনি রহস্যময়, তেমনি অপ্রত্যাশিত উদ্‌ঘাটনের সম্ভাবনায় স্তব্ধ। এককালে এই জীবনের রেখাচিত্র অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট-সীমায়িত ছিল—তাহার পরিধি সংকীর্ণ, কিন্তু তাহার অভীপ্সা, আদর্শ ও অন্তঃপ্রেরণা সম্বন্ধে কোন কুয়াশার ক্ষীণতম স্পর্শও ছিল না। তাহার জীবন ছিল সূর্য-কেন্দ্রিক, তাহার সুদূরতম কোণ পর্যন্ত প্রখর আলোকে ভাস্বর, তাহার প্রতিটি বাসনা-কামনা কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত ও সরল, ঋজু রেখায় প্রসারিত। জীবনের যে রহস্যময় দিক মানববুদ্ধির অগোচর তাহারও একটা সুস্পষ্ট ছবি ধর্মবিশ্বাসের প্রগাঢ়তার জন্য তাহার মনে আঁকা ছিল। অন্তর্দ্বন্দ্ব যখন জীবনে আসিত তখনও তাহার বিদারণ-রেখা একটা পূর্বনির্ধারিত আদর্শের অনুসরণ করিত। আকস্মিকতার আঘাত গ্রহণ-শক্তির স্থিরতার মধ্যে শান্তভাবে বিধৃত হইত; শাশ্বত মূল্যবোধের মানদণ্ডে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির আপেক্ষিক গুরুত্ব নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হইত। একটা বৃহৎ আদর্শের বৃন্তবন্ধনে জীবন-পদ্মের সমস্ত পাপড়িগুলি বিকশিত হইত।

আজ সমস্ত দৃশ্যটি অভাবনীয়রূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। আজ মানব চিত্তের উপাদান-সাম্য (homogenity) সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত। আজ আমাদের মনের সমতলতা উঁচু-নীচু, আবড়া-খাবড়ার অভিভবে অমসৃণ হইয়াছে; তাহার গভীর তলদেশ হইতে উত্তপ্ত দ্রবস্রোতের উৎক্ষেপ তাহার শ্যামল সরসতাকে নষ্ট করিয়াছে; তাহার প্রবাহ নানা শাখানদীর বাঁকা-চোরা পথে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া স্রোতোবেগ হারাইয়াছে। তাহার মুখমণ্ডল জীর্ণ বলিরেখায় সমাচ্ছন্ন; তাহার কোণে কোণে আবর্জনা-স্তূপ জমিয়া, অসুস্থ চিন্তা-কল্পনার সূক্ষ্ম-তন্তু-বিকীর্ণ হইয়া তাহাকে পোড়ো-বাড়ীর শ্রীহীনতা ও প্রেতায়িত বিজনতার রূপ দিয়াছে। জীবনের সূর্য-সচেতনতা ধূসর গোধূলি-রহস্য ও স্তিমিত, স্পন্দমান নক্ষত্র-দ্যুতির

অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। তাহার আত্মপ্রকাশ যেন খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ, হঠাৎ-জ্বলিয়া-ওঠা আবেগের রক্তিমচ্ছটায় ক্ষণ-উদ্ভাসিত; ফিরিয়া-আসা তিমির-স্রোতের তলে অবলুপ্ত। জীবনের প্রত্যেকটি পথ আজ চোরা-গলি; উহার প্রত্যেকটি ঘাট পিচ্ছিল, উহার প্রত্যেকটি সম্পর্ক-ভূমি সতর্ক পদক্ষেপে, সন্তর্পণে অতিক্রম করিতে হয়। পৌরাণিক কর্ণের মত আমাদের জীবন-রথ প্রতিমুহূর্তে মেদিনীগ্রাসের আশঙ্কায় নিশ্চল-প্রায়।

এই কুণ্ঠিত, আত্ম-অবিশ্বাসী জীবন-প্রচেষ্টা হইতে কোন বৃহৎ সার্বভৌম সত্য রূপ লয় না, আভাসে-ইঙ্গিতে অর্ধব্যক্ত, অস্ফুট তথ্য-ব্যঞ্জনা জীবনের দুর্জ্ঞেয়তাকে আরও ঘনীভূত করে মাত্র। যাহা জানা ছিল তাহাও ক্রমশ অজানার পর্যায়ে গিয়া পড়িতেছে। যাহা যবনিকার অন্তরালে ঠেলা ছিল তাহা গোপনতার জালকে ছিন্ন করিয়া পাদপ্রদীপের অনাবৃত উজ্জ্বলতার সামনে দাঁড়াইতেছে। যাহা চিত্রের ন্যায় সুষমামণ্ডিত ও শিল্পীর স্থির সৃষ্টি-প্রেরণার অভিব্যক্তি ছিল তাহা দুর্বোধ্য রেখা ও রং-এর সমষ্টি ও কোন খেয়ালী ব্যঙ্গচিত্র-রসিকের উদ্ভট কল্পনারূপে প্রতিভাত হইতেছে। ব্যবহারিক, অভ্যস্ত প্রয়োগের নিশ্চিন্ত নির্ভরশীলতা পরীক্ষাগারের ধূম্রাকুল অনিশ্চয়তায় পর্যবসিত হইতেছে। সমাজ-বন্ধন, পারিবারিক সংস্থিতি, দাম্পত্য সম্পর্ক সবই এক অস্থির ঘূর্ণাবর্তের টানে মুহূর্তে মুহূর্তে রূপ বদলাইতেছে। তাহাদের আপাতদৃষ্টিতে শক্ত মাটির তলায় এক চোরাবালির পঙ্কস্তর আমাদের স্বচ্ছন্দগতিকে উপরের দিকে প্রতিহত করিয়া নীচের দিকে টানিতেছে। জীবন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অনুভূতির সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ইহার অখণ্ড সমগ্রতা ভাঙ্গিয়া উহার মধ্য হইতে কতকগুলি বিশেষ মুহূর্তের উচ্ছ্বাস, চিত্তের কতকগুলি চঞ্চল আন্দোলন, কতকগুলি ক্ষণিক মনোভাবের লীলা জীবনের খণ্ডিত পরিচয় বহন করিতেছে। আমাদের উপন্যাস-ছোটগল্পে জীবনের এই রূপটিই প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

(২)

এই সাধারণ মন্তব্যগুলি কয়েকটি আধুনিক উপন্যাস ও ছোটগল্প-সমষ্টিকে অবলম্বন করিয়াই দানা বাঁধিয়াছে। সন্তোষ কুমার ঘোষের 'নানা রঙের দিন' ও রমাপদ চৌধুরীর 'তিন তারা' ও 'অভিসার রঙ্গনটী' পাঠকের

মনে এইরূপ চিন্তাই জাগায়। 'নানা রঙের দিন' উপন্যাসে এক শিশুমনের ভিতর দিয়া জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নানামুখী ঘটনা-প্রবাহ কিরূপ অস্পষ্ট আভাস ও দুর্বোধ্য প্রহেলিকার রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহারই উজ্জ্বল চিত্র-পরম্পরা আঁকা হইয়াছে। তাহার নিজ পরিবারে পিতামাতার মধ্যে অদ্ভুত সম্বন্ধ-বিপর্যয় ও প্রতিবেশিনী সরমার গোপন প্রেমলীলা ও আচরণের অসঙ্গতি—এই দুটি প্রধানত বালক শুভাশীষের অনভিজ্ঞ মনে একটি তীব্র বিস্ময়পূর্ণ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদেরই সংকীর্ণ রন্ধ্রপথ দিয়া জীবনরহস্যবোধ তাহার অন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে ও নিজ ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও জগতের সহিত পরিচয় উভয়ত্রই সহায়তা করিয়াছে। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে তাহার বড়দিদি চারুর যৌবন-সচেতন উন্মেষ বালকের সম্মুখে এক নূতন অনুভূতির দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছে; কিন্তু সে বড় হইয়াও চারুর বিবাহিত জীবনের ভিতরের আত্মনিগ্রহ ও বাহিরের স্থূল পরিতৃপ্তিতে মেশানো অস্বাভাবিক পরিস্থিতিটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই।

অবশ্য উপন্যাসের মূল কাঠামোটির বিন্যাসে যে কোন খুঁত নাই এরূপ দাবী করা চলে না। ঘটনা-প্রবাহের বিপুল-প্রসার, স্রোতোবেগ, মনস্তাত্ত্বিক সমস্ত জটিলতা, সংকীর্ণ বোতলের মুখে বিরাট দৈত্যদেহের ন্যায় স্বল্প-পরিধি বালক-চিত্তে সুষ্ঠুভাবে অনুপ্রবিষ্ট করা সম্ভব হয় নাই। বালকের মানস-পরিধি-বহির্ভূত বহু মন্তব্য ও জীবন-চিন্তন গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়া উহার আঙ্গিক সুষমাকে কতকটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। লেখক কোন কোন স্থলে এই ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে, শুভাশীষ বড় হইয়া এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু পরিণত-যৌবন শুভাশীষকে আমরা চিনি না—সে কৈশোরের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া ক্রমবিকশিত জীবনকে যেভাবে দেখিতেছে, তাহার বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতাকে যেরূপে চমকিত বিস্ময় হইতে স্থির প্রতীতির দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, বিচ্ছিন্ন অনুভূতিকে সংহত জীবন-দর্শনে পরিণত করিবার যে একটা অর্ধসচেতন প্রয়াস পাইতেছে তাহার চকিত আলোকে আমরা তাহার ব্যক্তিসত্তারহস্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইতেছি। আমার যেন মনে হয় যে, শুভাশীষ গ্রন্থমধ্যে খুব জীবন্ত নহে। সে জীবনের বিচিত্ররসস্ফুরণের একটা medium বা মধ্যবর্তী বাহন মাত্র। তাহার

পরিণতি দেখান লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য নয়—তাহার শিশু-নেত্রের বিস্ফারিত কৌতূহলের, তাহার আলোছায়ামিশ্র প্রদোষ-উপলব্ধির মধ্য দিয়া ঘটনা ও হৃদয়-সংঘাতগুলি অতিকায়ত্বের গৌরব লাভ করিতেছে মাত্র। জীবন-সমুদ্র-আলোড়নে যে সুধা-হলাহল উঠিতেছে সেই প্রক্রিয়ায় সে মন্থন-রজ্জুর ন্যায়।

উপন্যাস মধ্যে সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র বিভা। তাহার সমস্ত আচরণের মধ্যে একটা কঠোর সংগতি, জীবনের সহজ-আনন্দ-বিমুখ কৃচ্ছ্রসাধনের অনমনীয়তা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সে যেন সর্বদাই একটা গুণ-টানা ধনুকের মত টঙ্কারোন্মুখ, বৈরাগ্যের দীপ্ত অহঙ্কার তাহার দেহ-মন হইতে বিচ্ছুরিত। স্বামীর প্রতি তাহার মনোভাবের তীব্র বিরূপতা সময় সময় অসংবরণীয় উচ্ছ্বাসে ফাটিয়া পড়িয়াছে। পুত্র শুভাশীষকে পিতার প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য সে সদা-সতর্ক। তাহার প্রতিহত স্বামী-প্রেম, অতৃপ্ত নীড়-রচনার আকাঙ্ক্ষা এক জড়প্রায়, প্রস্তরীভূত উদাসীন্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাহার এই ঘৃণাস্পৃষ্ট বিমুখতার মধ্যে কোথাও স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও তাহার দেশসেবার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা লুকান ছিল। তাই শেষ মুহূর্তে তাহার চিত্তের এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ঠিক যখন তাহার পলাতক স্বামী বার্ধক্যের অবসাদে, নির্বাপিত আদর্শবাদের ভস্মীভূত অবসানে আবার ঘরে ফিরিয়া নূতন সংসার-গঠনে মনোযোগী হইয়াছে, ঠিক তখনই বিভার অবদমিত আকাঙ্ক্ষা অনিবার্য বেগে আত্মপ্রকাশ করিয়া শুভাশীষকে বিপ্লব-আন্দোলনে পাঠাইতে প্রেরণা দিয়াছে ও তাহার চিরপোষিত নীড়রচনার সাধকে উন্মূলিত করিয়াছে। বিভার এই পরিবর্তন যে কোন সাময়িক ভাবোন্মাদনা নহে, পরন্তু তাহার চরিত্রের একটা অপ্রত্যাশিত, কিন্তু অনিবার্য উদ্ঘাটন তাহা তাহার আচরণের দৃঢ়তা ও অন্তর্গূঢ় আত্মবিশ্লেষণশীলতা হইতে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়।

বিভার পর উল্লেখযোগ্য চরিত্র হইতেছে সরমা। বিভার চরিত্রের পরিবর্তন যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহা উপন্যাস-প্রারম্ভের পূর্বে। কিন্তু সরমার পরিবর্তন আমাদের চোখের সম্মুখে ঘটিয়াছে। ইহা উপন্যাসের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। সে আমাদের সম্মুখে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছে বৈধব্যের ছদ্মবেশের স্পর্ধিত প্রত্যাখ্যানে, রঙ্গীন শাড়ীর গাঢ় বর্ণাঢ্যতায় নিজ রক্তিম

কামনার, বিদ্রোহী জীবনাকাঙ্ক্ষার উদ্ধত নিশান বহন করিয়া। তাহার এই নিঃসঙ্কোচ প্রাণধর্মিতার মধ্যে কোন ছলনার আবরণ নাই—বর্ণ-রমণীয় ফুল যেমন তাহার রং-এর বাহারে ভ্রমরকে আমন্ত্রণ-লিপি পাঠায় তেমনি সে তাহার উজ্জ্বল যৌবন-লাবণ্যে পুরুষকে আকর্ষণ করিয়াছে। তাহার এই উপভোগস্পৃহার অতি-প্রাচুর্য তাহার ব্যক্তিজীবনকে অতিক্রম করিয়া অপরের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছে—চারুও তাহার প্রভাব-পরিধির মধ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই যৌবনরসলীলায় যোগ দিয়াছে। এই আগ্রহাতিশয্যের সহিত তাহার প্রেমিক সমতা রক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়া এই অসংবৃত ভোগ-লালসার অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

ইহার পর আর এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে—দেবাশীষের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সরমা সূতা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই উপলক্ষে বিভার পারিবারিক জীবনের সহিত সে কতকটা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। তাহার বঞ্চিত জীবনের প্রতি দেবাশীষের সমবেদনা বিভার মনে দারুণ সন্দেহ ও ঈর্ষ্যার উদ্রেক করিয়া তাহাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে আরও জটিল করিয়াছে, কিন্তু এই বিষবাষ্প সরমাকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে নাই। সরমার এই সূত্রবয়ন-ব্যাপারে সাদা অপেক্ষা রঙ্গীন সূতারই সংখ্যাধিক্য, ইহাতে তাহার দেশপ্রেম অপেক্ষা তাহার অতৃপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন-রোমন্থন ও আবার নূতন জীবন-যাত্রারম্ভের অনুকূল-অবসর-প্রতীক্ষাই বেশি সূচিত হয়। দেবাশীষের স্নিগ্ধ সাহচর্য ও অনাড়ম্বর আত্মভোলা মহত্বও সরমার ভবিষ্যৎ জীবনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া থাকিবে। এই অবস্থায় তাহার দাদার ভর্ৎসনা তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় তাহার অনিশ্চিত মোহাবেশকে ছিন্ন করিয়া তাহাকে আত্মনির্ভরশীল জীবনের দুর্গম পথে পদক্ষেপ করিবার প্রেরণা দিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে দেশত্যাগের সময়ে দেবাশীষের সহিত আকস্মিকভাবে জড়িত হইয়া গিয়া তাহার জীবনে একটি নূতন গ্রন্থিযোজনা হইল। দেবাশীষকে আশ্রয় করিয়াই সে রাজনৈতিক বিপ্লবের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া পড়িল ও এখান হইতে তাহার নবজীবনের সূচনা হইল। তাহার জীবন বাসনা-কেন্দ্রিকতা হইতে দেশ-প্রেম-কেন্দ্রিকতায় অধিষ্ঠিত হইল এবং এখান হইতেই ঔপন্যাসিক নিজ কর্তব্যভার রাজনৈতিক ইতিহাস-

রচয়িতার হাতে সমর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে একবার সে দেবাশীষকে আকর্ষণ ও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আর উপন্যাসের একেবারে শেষে বিভাদের শহরে ফিরিয়া গিয়া সে তাহার মত ফিরাইয়াছে ও শুভাশীষকে মায়ের আশীর্বাদ লইয়া গণ-আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িবার প্রেরণা দিয়াছে। এই দুইটি স্থল ব্যতীত অন্যত্র সে রাজনীতি-যন্ত্রের অঙ্গমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। রাজনীতির সাগর-সঙ্গমে তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নদী বিলুপ্ত হইয়াছে।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া তাহার এই নিগূঢ় পরিবর্তনটিই সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু লেখক ইহাকে ধরিয়া লইয়াছেন, বিশ্লেষণ করিয়া দেখান নাই। কি প্রবল আকর্ষণের ফলে তাহার মানস কক্ষপথের নূতন কেন্দ্রাবর্তন ঘটিল, তাহার রঙ্গীন আবেশ কেমন করিয়া শুভ্র, নৈর্ব্যক্তিক দেশাত্মবোধে রূপান্তরিত হইল, তাহার ব্যক্তিসত্তা কোন্ পথ ধরিয়া গোষ্ঠী-মনোভাবে মিশিয়া গেল, তাহার সংশয়-কুণ্ঠিত খোঁজা কিরূপে প্রাপ্তির স্থিরতায় নিশ্চল হইল—এই সমস্ত প্রশ্ন লেখক এড়াইয়া গিয়াছেন, অথচ ইহাই আমরা বিশেষভাবে জানিবার প্রত্যাশা করি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ছেলে-পিলেকে লালন-পালন করিয়া তাহাদিগকে রাক্ষসের উদর-পূরণের জন্য সমর্পণ করার বর্বর প্রথা সম্বন্ধে শুনিতে পাই। বর্তমান ঔপন্যাসিক তাঁহার মানস সন্তানদিগকে জীবনীরসে পুষ্ট করিয়া এই রাজনীতি-রাক্ষসের নিকট তাহাদের বলি দেন ও এই বলিদানের দ্বারা তাহাদের জীবনবোধ পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, এই ভ্রান্ত ধারণায় আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। শুভাশীষ, চারু ও দাদু—ইহারা সকলেই সজীব, কিন্তু কেহ প্রাণশক্তির পূর্ণ পরিচয়ে গৌরবান্বিত নহে। শুভাশীষের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঘটনা-মন্থনের সমস্ত রসপান করিয়াও তাহার নিষ্ক্রিয়ত্ব ঘোচে নাই। কিছুদিনের জন্য মায়ের দাসীবৃত্তির গ্লানি তাহাকে রূঢ় সত্যের সম্মুখীন করিয়া তাহাকে পৌরুষের দৃপ্ত পরিণতি দিয়াছে, কিন্তু এই জাগরণ সাময়িক মাত্র। চারুর বিবাহিত জীবনের ভয়াবহ অস্বাভাবিকতাও তাহার শৈশব স্বপ্নকে টুটাইতে পারে নাই; সে বোধহয় তাহার জামাইবাবুকে রূপকথায় রাক্ষস-খোক্ষসের সহিত অভিন্নরূপে কল্পনা করিয়াছে। তাহার অগ্রগতির একমাত্র লক্ষণ আপেক্ষিক যৌনসচেতনতায়। তাহার

আন্দোলনে যোগদান তরুণ মনের আকস্মিক উচ্ছ্বাস মাত্র, মানস পরিণতির নিদর্শন নহে। দেবাশীষের চিত্র যথার্থতার দাবী করিতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে গভীরতা নাই। দেশসেবার লৌহবর্মের অন্তরালে তাহার হৃদ্‌স্পন্দন ক্ষীণভাবে শোনা যায়। তাহার পারিবারিক কর্তব্যচ্যুতি তাহার মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জাগায় নাই; তাহার রাজনীতি-কবলিত জীবনের এক-মুখীনতা কোন জীবধর্ম-সুলভ বিরোধী আকর্ষণে বিচলিত হয় নাই। একবার মাত্র এই লৌহবর্ম ভেদ করিয়া যে প্রাণের ঝলক তাহাকে সরমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, লেখক তাহাকে তথ্যরূপে বিবৃত করিয়াছেন, তাহার মূল অনুসন্ধান করেন নাই। কাজেই উপন্যাসের দিক হইতে ইহা অনেকটা অবান্তর ও অসার্থক।

চারুর চরিত্র-কল্পনায় বেশ একটু মৌলিকতা আছে, কিন্তু লেখক রাজনৈতিক আন্দোলনের উচ্ছ্বসিত বর্ণনার মধ্যে ইহার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিবার অবসর পান নাই। সরমার সাহচর্যে তাহার ছলনাপ্রবণ প্রকৃতির মধ্যে প্রেমের অকালপক্বতা বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার হেতু হইয়াছে। তাহাদের সাংসারিক অসচ্ছলতা ও তাহার পিতার উপর মায়ের নিগূঢ় অভিমানের ফলে শেষ পর্যন্ত এক ইতর, দুশ্চরিত্র ও হিংস্র প্রকৃতির দারোগার গ্রানিকর পত্নীত্ব তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। তাহার দাম্পত্য জীবনের যে আভাস-ইঙ্গিত পাই চারুর মনের উপর তাহার প্রভাব লেখক সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেন নাই। কিন্তু মোটামুটি যে সাধারণ চিত্রটি আঁকিয়াছেন তাহা আমাদের মনে চমক জাগায়। চারু তাহার সমস্ত অপমান নিঃশব্দে হজম করিয়া তাহা হইতে একটা স্থূল আত্মতৃপ্তির নির্ধাস বাহির করিয়াছে। সে কাহারও নিকট অভিযোগ বা দুঃখ করে নাই, তাহার অন্তরের অপ্রকাশিত গভীরে যে ব্যথা সঞ্চিত ছিল কাহাকেও তাহার অংশীদার করে নাই, বরঞ্চ তাহার মা-ভাইএর কাছেও তাহার সুখ-সৌভাগ্যের বড়াই করিয়াছে। তাহার পুত্রের জন্ম যেন তাহার বাহ্য-সম্ভ্রম-রক্ষার একটা বিধিদত্ত উপায় মাত্র, এই দুর্গের আশ্রয় হইতে সে সারাজীবন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে। তাহার অনুভূতির এই অতিবাস্তব স্থূলত্বের মধ্যে তাহার মা ও ছোটমাসীর দাম্পত্য জীবনের একদিকে ব্যর্থ ও অপরক্ষেত্রে শোকাবহ পরিণতির পরোক্ষ প্রভাব

অনুমান করা যায়। তাহার প্রথম কৈশোরের প্রেমের লুকোচুরি ও যৌবনোত্তর তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রণয়ের সমস্ত রঙীন স্বপ্নকে নির্বাসিত করিয়া তাহার স্থলে আবেগবিমুক্ত, গৃহিণীত্বের মর্যাদাহীন, লৌকিক-সম্ভ্রমমাত্র-সম্বল সচ্ছলতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রেমের অকালনির্বাপিত দীপশিখা তাহার হৃদয়ে ধূমাঙ্কিত কালিমা লিপ্ত করিয়াছে, কিন্তু সে এই অঙ্গারকেই হীরকের মর্যাদা দিয়া বক্ষে স্থান দিয়াছে। মনে হয় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবা-রাত্রির কাব্য'-এর প্রভাব এই পরিকল্পনার উপর পড়িয়াছে।

(৩)

উপন্যাসের জীবন-আলোচনার অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও অন্যান্য দিক দিয়া ইহার উৎকর্ষের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রতিবেশ-রচনার কৌশল ও মন্তব্যের গভীরার্থক জীবনবোধ এই উৎকর্ষের প্রধান অঙ্গ। ঔপন্যাসিক যে কয়টি পাত্র-পাত্রীর কথা আলোচনা করেন তাহাদিগকে ধারণ ও বেষ্টন করিয়া একটা বৃহত্তর জগৎ আছে—এই জগতের সঙ্গে তাহারা নানা লক্ষ্য ও অলক্ষ্য সূত্রে গ্রথিত। তাহাদের আচরণ ও পারস্পরিক প্রভাবের অন্তরালে এই বৃহত্তর পরিবেশের অস্তিত্ব লেখক যে পরিমাণে ফুটাইতে পারেন, তাঁহার ঔপন্যাসিক সাফল্যও ঠিক সেই পরিমাণের হইয়া থাকে। ইহারই উপর চরিত্রের dimension বা অবয়ব-বিস্তার নির্ভর করে। ব্যক্তিবিশেষের অন্তরের কথা বহিঃপ্রতিবেশ হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিলে তবেই তাহা পাঠকের অন্তর পর্যন্ত পৌছাইবার তীক্ষ্ণতা ও শ্রাব্যতা অর্জন করে। সাধারণ মানুষের স্বচ্ছন্দ গতি যেমন নির্ভর করে সুদূরপ্রসারী মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির উপর, সেইরূপ সাহিত্যের মানুষের স্বাভাবিকতা নির্ভর করে তাহার পরিবেশের সহিত সহজ সম্পর্কে। লেখক শুভাশীষের বাসস্থান ছোট শহরটির ও তাহার পরিবার-জীবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা যেমনই তথ্যসমৃদ্ধ তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ হইয়াছে। এই আবেষ্টন-বৃত্তের মধ্যে জীবননাট্যের বিচিত্র অভিনয়, উহার জীবনযাত্রার সমস্ত আবেগ ও উত্তাপ, উহার আবছা রহস্য ও সুস্পষ্ট নির্দেশ, উহার বায়ুস্তরে সঞ্চরমান স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাব-কণিকাগুলি সবই শুভাশীষের বালকমনের কেন্দ্র-বিন্দুতে এক অদৃশ্য আকর্ষণে সংযুক্ত

হইয়াছে। শুভাশীষের পরিবারের মধ্যে যে ভারসাম্যের অস্থিরতা প্রতি মুহূর্তে উহার অস্তিত্বকে বিপন্ন করিতেছে, যে চাপা অনুযোগ ও অস্বস্তি উহার শক্তিকে দীর্ণ ও বিধ্বস্ত করিবার ভয় দেখাইতেছে, মাতৃশাসিত পারিবারিক ব্যবস্থার অসঙ্গতি ও পিতামাতার মধ্যে সম্বন্ধের বিকৃতি—এ সমস্তই তাহার মনে সঞ্চারিত হইয়া জগতের সহিত তাহার প্রথম পরিচয়কে খানিকটা সংশয়-আবিল ও বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

লেখকের মন্তব্যের মধ্যে জীবনবোধের যাথার্থ্য ও গভীরতার যে প্রকাশ হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিলেই আলোচনা শেষ হইবে। শুভাশীষের বাহ্য জগতের মধ্যে যৌন অনুভূতির প্রথম বিভ্রান্তকারী প্রবেশ (৪৩পৃঃ) ; সরমার সহিত দেবাশীষের গৃহ-ত্যাগের পর বিভার ধর্মানুরাগের পিছনে সত্যিকার কারণ-নির্দেশ (পৃঃ ১১৭) ; শুভাশীষের মনে খালি শিশি ডোবার শব্দের মধ্যে ছোট মাসির অব্যক্ত আকৃতির প্রতিধ্বনির আরোপ (পৃঃ ১৭৭) ; —এই সবই লেখকের মানব-চিত্তের গভীরে ডুব দিবার শক্তির নিদর্শন। দেবাশীষের সহিত বিভার আচরণের সমস্ত বর্ণনাই খুব সঙ্গতিপূর্ণ ও স্বাভাবিক —তাহার তীব্র বিমুখতা ও তিক্ত মোহভঙ্গের মধ্যে পূর্ব মাধুর্যের লুপ্তাবশেষ, স্নিগ্ধতার একটু করুণ স্পর্শ এখনও অনুভবে ধরা পড়ে। শুভাশীষের বিস্ময়-বিমূঢ় মন কেমন করিয়া ছোট ছোট অনুভূতির ক্ষীণ দীপ-শিখা জ্বালিয়া রহস্য-ঘেরা জীবনের অন্ধকার পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছে, কেমন করিয়া এক একটি নূতন জ্ঞানের পরিমাপক দণ্ড জীবন-সমুদ্রের গভীরতায় তল খুঁজিয়াছে, প্রতিটি অভিনব অভিজ্ঞতা কিরূপে অন্ধকার-তরঙ্গে আলোড়ন জাগাইয়া জানা-অজানার সীমারেখাকে পুনর্বিন্যাস করিয়াছে উপন্যাসে তাহার মনোজ্ঞ ও মনস্তত্ত্বসম্মত বর্ণনা মিলে। এই সমস্ত গুণের জন্য ইহা উপন্যাসের অগ্রগতির একটা উল্লেখযোগ্য নিদর্শনরূপে গৃহীত হইবে। 'নানা রঙের দিন' ঠিক একরঙার ঐক্যলাভ করে নাই, কিন্তু ইহার সমুজ্জ্বল ও সময় সময় অন্তর্মুখী বর্ণ-বৈচিত্র্য ইহার আকর্ষণের হেতু হইবে।

(৪)

রমাপদ চৌধুরীর 'তিন তারা' উপন্যাসটি চিত্রবহুল ও সংকেতধর্মী। বর্ণনাতে ছবি ফুটিয়াছে, ভাষায় নূপুর-শিঞ্জন শোনা যায় ও বিবৃতির পিছনে

সাংকেতিক তাৎপর্য উঁকি মারিতেছে। 'তিন তারা' এই নামের দ্বারা নর-নারীর আকর্ষণের তিনটি বিভিন্ন আদর্শ ব্যঞ্জিত হইয়াছে। খ্যাতি, ঐশ্বর্য, বেপরোয়া যৌন আকাঙ্ক্ষা—ভালোবাসার এই তিনটি রূপ উপন্যাসের ঘটনার অন্তরালে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কাবেরীর বিবাহ বংশগৌরবের বেনারসী শাড়ী ও অলঙ্কারের ঝলমল দীপ্তিতে মোড়া। দীপ্তেনের চোখের সামনে ঐশ্বর্যের চোখ-ধাঁধানো রোস্‌নাই প্রেমের স্নিগ্ধ দীপালোককে আড়াল করিয়া দিয়াছে। সে কাবেরী ও লখিয়া উভয়েরই প্রতি মোহাবেশ কাটাইয়া পদোন্নতির আশায় হাগিন্সের নিকট লখিয়াকে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছে—দ্রুতগামী মোটর তাহার মনের উন্মত্ত গতিবেগের প্রতীক্। আর হাগিন্স যৌন আকাঙ্ক্ষার নেশায় একেবারে মশ্‌গুল—তাহার ধমনীতে দ্রুত প্রবহমান রক্তস্রোত উত্তপ্ত নারীদেহ-স্পর্শের জন্য উন্মুখ। লখিয়ার বাঁধনকাটা, বিদ্রোহী প্রেম তাহার উদ্দাম বন্য জীবনেরই দুরন্ত উচ্ছ্বাস—ইহার মধ্যে তারার রূপক—রমণীয়তা নাই, আছে আদিম প্রাণপিণ্ডের জ্বলন্ত সূর্যতাপ। বর্ণনা-কৌশল ও তাৎপর্য-দ্যোতনার জন্য লেখকের শিল্পবোধ ও শব্দ-প্রয়োগদক্ষতা সর্বথা অভিনন্দনীয়।

কিন্তু জীবনায়ন সম্বন্ধে কিছু সংশয় থাকিয়া যায়। উপন্যাসখানি স্বল্লায়তন ও ইহার ঘটনাবিন্যাসও ফাঁক-ফাঁক কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি। ইহাদের মধ্যে আবার একটি দৃশ্য সাহেবী ক্লাবের মদির-বিহ্বল, কটাক্ষ-চটুল, ছলনা-কুটিল আবহাওয়ার বর্ণনা। এত ক্ষুদ্র একটি উপন্যাসে এই অপ্রাসঙ্গিক অধ্যায়ের সংযোজনা বাড়তি বলিয়া মনে হয়। কিরূপ নিপুণ ও স্বচ্ছ বস্তু-সমাবেশে উহার মধ্য হইতে সাংকেতিকতার ঝিলিক ফুটিয়া উঠে সে বিষয়ে ঐকমত্য হয়ত নাও হইতে পারে। এক্ষেত্রে সাংকেতিকতার বস্তু-প্রস্তুতি পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হয় না। রাজেন ডাক্তার শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালী পিতা যাহা করেন তাহাই করিয়াছে মাত্র। কাবেরী কৈশোর প্রেমস্বপ্নের বিপরীত বাস্তব পরিণতির একটি অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত। দীপ্তেনের মন কিশোরী-প্রেমের ঠাণ্ডা সরবৎ ও বন্য যুবতীর দেহলালসার উগ্র মদিরা এই উভয়ের মধ্যে প্রার্থনীয়তার তারতম্য না করিতে পারিয়া শেষে রূপের পরিবর্তে রূপোকেই বাছিয়া লইয়াছে। তাহার পরিবর্তন এতই আকস্মিক যে ইহার মধ্যে দ্বন্দ্বের কোন পরিচয় নাই। আর হাগিন্স সাহেবের কাছে

মেয়েমানুষ নিতান্তই উপসর্গ—তাহার লখিয়ার প্রতি লালসা নিছক মগ্যাসক্তিরই পর্যায়ভুক্ত। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ঘটনা এত স্থূল, সাধারণ ও গতানুগতিক যে, ইহাদের মধ্যে কোন সার্বভৌম ব্যঞ্জনার আবিষ্কার নিতান্তই লেখকের যথেচ্ছ আরোপ। এক লখিয়ার মধ্যে খানিকটা যথার্থ রূপক-দ্যোতনা অনুভব করা যায়—আরণ্যক পরিবেশে আদিম বন্যতার উদ্দাম প্রাণোচ্ছ্বাস ব্যক্তি জীবনকে অতিক্রম করিয়া গোষ্ঠীজীবনের রহস্যের ইঙ্গিত বহন করে। মানব-প্রবৃত্তির প্রবলতা তাহার ইচ্ছাশক্তির দ্বিধাগ্রস্ততা ও ছোটখাট অন্তর্দ্বন্দ্বে যে বহ্নিকণার ঝলক জ্বালায়, তাহা খুব কম ক্ষেত্রেই ভাবব্যঞ্জনার উর্ধ্বাকাশে নক্ষত্রদীপ্তির ভাস্বরতা লাভ করে। আমাদের হৃদয় হইতে উৎক্ষিপ্ত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ, অস্পষ্ট নীহারিকা-বাষ্প তারকালোক পর্যন্ত পৌছায় না। 'তিন তারা' বইখানির সাহিত্যিক উৎকর্ষ স্বীকার করিয়াও ইহার অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার সার্থকতা সম্বন্ধে সংশয় অপনোদিত হয় না।

'অভিসার রঙ্গনটী'র ছোট গল্পগুলির মধ্যে এই শব্দযাদু, সংকেত ও চিত্রের সাহায্যে আবহাওয়া ফুটাইয়া তোলার অদ্ভুত নিপুণতা, একটা অস্পষ্ট ভাবাবেশ ও মোহগুঞ্জনের মায়ালোক-বিস্তার লেখকের সৃষ্টিশক্তি ও রচনারীতির বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। গল্পগুলির বিষয় ও আলোচনা-পদ্ধতির মধ্যে এক অদ্ভুত রকমের সমাজ-সচেতনতা, শিল্পীচিত্তের এক নূতন রসানুসন্ধিৎসা, হৃদয়ানুভূতির এক অভিনব মূল্যবোধের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এ যেন পড়িয়া-যাওয়া ঐতিহ্য-প্রাসাদের ইট-কাট কুড়াইয়া মানস বিলাসের এক এক ক্ষুদ্র খেলাঘর-নির্মাণ, ঘনবর্ষার অবসানে ছিটে-ফোঁটা ইল্‌শে গুঁড়ির বৃষ্টি, আদর্শের শাসনমুক্ত মনের গোধূলি-অন্ধকারে ঘরের কোণে কোণে আপনার সহিত লুকোচুরির অভিনয়। জীবনের বৃহৎ ঐক্য বিধ্বস্ত হইয়া উহার ছোটখাট উচ্ছ্বাস, কল্পনা, খেয়াল, উহার অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস, অতর্কিত ক্ষণিক উপলব্ধি, উহার উদ্দেশ্যহীন আত্মরতি-সাধনা স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবী লইয়া প্রকাশের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যেই জীবন-রহস্যের সত্য পরিচয় নিহিত আছে; লেখকের এই নূতন জীবনবোধ তাঁহার শিল্পে রূপায়িত। জীবনে যে বৃহৎ ফাটল দেখা দিয়াছে তাহার মধ্য দিয়াই অবচেতন স্তরের এই সমস্ত বাষ্পায়িত মনোবৃত্তি উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

'অভিসার রজনটী' গল্পে নায়িকা নিজেকে দূতীরূপে কল্পনা করিয়া, কাল্পনিক দিদির বেনামীতে নিজের প্রেমাভিনয় চালাইয়া প্রেমের ছলনাময় স্বরূপটিকে আরও গভীরভাবে উপভোগের আয়োজন করিয়াছে। অতিমাত্রায় আত্মসচেতন আধুনিক মন নানা অভিনব উপায়ে প্রেমের রস আস্বাদন করিতে চাহে—তাই বাস্তব জীবনেও ইহার অভিনয় করিয়া ইহার রহস্যকে ঘনীভূত করিয়াছে ও এই লুকোচুরির খেলা হইতে এক অসুস্থ, অস্বাভাবিক তৃপ্তি খুঁজিয়াছে। এখানে উপায়-বৈচিত্র্য উদ্দেশ্য-চরিতার্থতাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। 'তমোগাহন' গল্পটি আমাদিগকে এক পূর্ব সংস্কারের বিপর্যয়কারী অজানা অন্ধকারের গভীরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। শ্যামসুন্দরের মনোজগৎ অবদমিত আকাঙ্ক্ষার তির্যক-রেখা-সমাবেশে বিকৃত—তাহার বিবাহের আশা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া সে অপরের বিবাহে ঘটকালি করিয়া ও এই উপলক্ষে বিবাহিতা তরুণীদের সহিত গায়ে-পড়া রকম আলাপের জের চালাইয়া নিজের ব্যর্থ যৌন কামনার রূপান্তরিত আবেগকে মুক্তি দিয়াছে। তথাপি তাহার মনোভাবের স্বাভাবিকতা আমরা ধরিতে পারি। কিন্তু রাঙীর আচরণের অসংগতি একেবারে প্রহেলিকা রহিয়া গিয়াছে। সে যে কেন একরাত্রির জন্য বীভৎসদর্শন শ্যামসুন্দরের শয্যাসঙ্গিনী হইয়া তাহার পর তাহাকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়াছে, কেনই বা তাহার ঔরসজাত পুত্রকে লালন-পালন করিয়া নিজের এক রাত্রির কলঙ্কের চিরন্তন প্রমাণ রাখিয়া দিয়াছে তাহার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা আমরা খুঁজিয়া পাই না। কোন্ অদ্ভুত খেয়ালের বুদ্‌বুদ্ তাহার বিকৃত চিত্তের কোন্ গভীর উৎস হইতে উঠিয়া পাথরের মত জমাট ও শক্ত হইয়া গিয়াছে, মনস্তত্ত্বের সূত্র ধরিয়া আমরা সেই ক্লেদাক্ত কেন্দ্রে পৌঁছিতে পারি না। নির্যাতিত শ্যামসুন্দরের প্রতি দয়া কি নিগূঢ় প্রক্রিয়ায় যৌন মিলনের প্রেরণায় রূপান্তরিত হইল, কেনই বা এই মিলনের আবেগ এক রাত্রির মধ্যেই নিঃশেষিত হইল, রাঙীর মাতৃত্ব-কামনা কি জন্য তৃপ্তির এই অচিন্তনীয় পথটাই খুঁজিল—এসব প্রশ্নের কোন উত্তর মিলে না। মনে হয় লেখক বিধাতা-পুরুষের মত বঞ্চিত শ্যামসুন্দরের প্রতি নিজ ন্যায়পরতা দেখাইবার জন্য এই গল্প ফাঁদিয়াছেন—তাহার সহিত বিবাহ-সম্ভাবনায় তাহার ভাবী স্ত্রীর আত্মহত্যার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপই লেখক রাঙীর এই অযাচিত বদান্যতার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

'বাসুকি বসুন্ধরা' এক বহুচারিণী নারীর তাহার ভূতপূর্ব ও বর্তমান প্রেমাস্পদের জন্য জীবনব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনের কাহিনী। বাল্যসহচরের সঙ্গে কৈশোর প্রেমের সূচনা, তাহার পর একজন সঙ্গীত-শিক্ষকের সঙ্গে গৃহত্যাগ, সঙ্গীত-শিক্ষকের যক্ষ্মারোগ হইলে তাহার চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়-বহন, সর্বশেষে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সহিত ঘরকন্না পাতা—প্রেমের এই দুঃসাহসিক অভিযান বোধ হয় নেপোলিয়নের যুদ্ধযাত্রাকেও হার মানাইতে পারে। তাহার এই মুহুর্মুহুঃ প্রেমাস্পদ-পরিবর্তনের পিছনে যে কোন্ প্রেরণা ছিল তাহা অজ্ঞাত, তবে তাহার নির্বিকার প্রসন্নতা, হাসিমুখে সমস্ত দুঃখবরণ এক স্বভাব-উদাস, সহজ-উদার, অন্তর্দ্বন্দ্বে অক্ষত হৃদয়েরই পরিচয় বহন করে। এইরূপ বাসা-বদলের মত প্রেমিক-বদল, অথচ প্রতি নূতন সম্পর্কের দায়িত্ব-স্বীকার চিত্তের এক অদ্ভুত স্থিতি-স্থাপকতা, হৃদয়-বিনিময়ের এক নূতন আদর্শের সূচনা করে। হয়ত ভবিষ্যৎযুগের প্রেম যে ছন্দের অনুবর্তন করিবে এখানে তাহারই পূর্বাভাস মিলে। এই ক্ষণিকবাদজীবী প্রেমের দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্রের কমলে পাই, তবে কমলের বিদ্রোহের তাপ এখানে জুড়াইয়া গিয়া শান্ত উদাসীন প্রফুল্লতায় পর্যবসিত হইয়াছে। সতীত্বের পূর্ব সংস্কার এখন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং কাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে?

'আড়াল' গল্পে দুই সহপাঠিনী তরুণীর মধ্যে ছদ্মসখিত্বের পিছনে প্রেম-প্রতিযোগিতার প্রচ্ছন্ন বিরূপতা অপেক্ষমান। সুকুমারের সহিত প্রেমে পড়িতে সুজাতা ইন্দ্রানীকে যে নিষেধ করিয়াছিল তাহা নিঃস্বার্থ বন্ধুপ্রীতি নহে, বন্ধুর কবল হইতে নিজ প্রেমাস্পদকে উদ্ধার করা। ইন্দ্রানীর আত্মপ্রসাদ বিষাদের স্পর্শে করুণ, আর সুজাতার অভ্যর্থনা ধরা পড়িবার ভয়ে সশঙ্ক ও কপট। সৌভাগ্যক্রমে ইন্দ্রানী যথাসময়ে বিদায় লইয়া সুজাতার অভিসার-যাত্রার পথ নির্বিঘ্ন করিয়া দিয়াছে। সহশিক্ষা নারী-জীবনে নূতন জটিলতার গ্রন্থি পাকাইয়াছে।

'অঙ্গপালি' গল্পটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমাদের সমাজনীতিতে কিরূপ অপরিহার্য বিপর্যয় আনিয়াছে তাহার নিষ্ঠুর নিদর্শন। মুসলমান কর্তৃক অপহৃতা ও অসহায় ধর্ষণের ফলে সন্তানবতী সবিতা উদ্ধার লাভ করিয়া পরিবারের সহিত মিলিত হইয়াছে। হিন্দু পরিবারে মুসলমানের ঔরসজাত

সন্তান চিরন্তন সংস্কারের বিপর্যয় ঘটাইবে ইহাই মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু পরিবারের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রশ্নই হয় নাই। তাহাদের রক্তস্নাত, দুঃস্বপ্নবৎ ভয়াবহ অতীত অভিজ্ঞতা যেন তাহাদের যুগযুগান্তরের সংস্কারকে অসাড় করিয়া দিয়াছে। নিছক বাঁচিবার স্বস্তি তাহাদের পাপপুণ্য, ধর্মাধর্মের প্রশ্নকে, রক্তবিশুদ্ধি ও বংশগৌরবের সতর্কতাকে একেবারে শুব্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। সবিতার ভাইবোন ত ছেলেকে আদর করিয়াছে; সবিতার মাও তাঁহার সমস্ত পূর্ব সংস্কারকে চাপিয়া রাখিয়া এই অবাঞ্ছিত কলঙ্কচিহ্নরূপ সন্তানকে কোলে লইয়াছেন, কিন্তু গোপনে স্নান করিয়া স্পর্শদোষমুক্ত হইতে চাহিয়াছেন। শরৎচন্দ্র তাঁহার 'শ্রীকান্ত'-এ দেখাইয়াছেন যে কালাপানি পার হইয়া জাতিভেদের খোলস কত সহজে বাঙালীর মন হইতে খসিয়া পড়ে। বর্তমান যুগে ভাগ্য-বিপর্যয়ের কঠোরতর আঘাত অস্থিমজ্জাগত আরও বহু সংস্কারকে ঝরাইয়া ফেলিয়া নগ্ন মানবিকতার নিম্নতম প্রয়োজনের ভিত্তির উপর নূতন সমাজ ও পরিবার-জীবন-গঠনের ইঙ্গিত দিয়াছে।

অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্য বাঙালী জীবনের চিরাভ্যস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া নানা স্বল্প-পদচিহ্ন শাখা-পথ ও দুর্গম, কণ্টকাকীর্ণ, আরণ্য বীথি ধরিয়া যাত্রা শুরু করিয়াছে। বড় সাহিত্য, বড় নগরীর মতই, বৃহৎ ও প্রশস্ত রাজপথের দাবী করে। যে পথিককে প্রতি পদক্ষেপে নূতন পথ তৈয়ারী করিয়া চলিতে হয়, তাহার যাত্রা-পথ সুদূর-প্রসারিত হইতে পারে না। নূতন পথের বৈচিত্র্য আছে, দৃশ্যাবলীর অভিনবত্ব আছে ও আবিষ্কারের আনন্দও ইহার এক প্রধান আকর্ষণ। তথাপি ছোট ছোট পথ একদিন মিশিয়া গিয়া নূতন রাজপথের সৃষ্টি করিবে ও ভবিষ্যৎ সাহিত্যের বিজয়-রথ এই নবনির্মিত রাজপথ ধরিয়াই অগ্রসর হইবে ইহাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা ও পরিণতি। আজ যাঁহারা জঙ্গল কাটিয়া, পতিত জমি ভাঙ্গিয়া নূতন পথরেখার চিহ্ন আঁকিতেছেন, তাঁহারা যে ভবিষ্যৎ যুগের রাজপথ-নির্মাণের সহায়তা করিতেছেন, ইহাই হয়ত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার প্রধান অধিকাররূপে স্বীকৃত হইবে।

আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের কাব্যগ্রন্থ

আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'বিদিশা', 'ঘোড়া কর ভগবান্' ও 'অবন্তী' এই কাব্যত্রয়ে আধুনিক যুগের কবিমানসের একটি উজ্জ্বল পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে। এই কবিমানস জীবনকে এক ন্তন অনুভূতির সূক্ষ্মজালে আবৃত করে, এক মৃদুকম্পনের দোলায় আন্দোলিত করে দেখেছে। এই জীবন মনের বাতায়ন থেকে দেখা, আলো-ছায়ার আলিঙ্গনে রেখাঙ্কিত, এক সুদূর রহস্যের ইঙ্গিতবাহী দৃশ্যের মত অস্ফুট ব্যঞ্জনায় মৃদু-তরঙ্গিত। এর অখণ্ড সংহতি নাই, অবিচ্ছিন্ন আবেগ নাই, নিজস্ব স্বাধীন তাৎপর্য নাই—এ কবির পরিবর্তনশীল মনোভঙ্গীর দর্পণমাত্র, তার নিঃশ্বাস-বায়ুতে, বিচ্ছিন্ন অনুভূতির কম্পনে সদা-চঞ্চল। এক একটি খণ্ড কবিতা যেন স্মৃতি-রোমন্থনে মন্থর, রূপক-ব্যঞ্জনার তির্যকপথে বিসর্পিত এক একটি দীর্ঘশ্বাস। দূর পর্যটনের শ্রান্তি, বহুল নিরীক্ষা-পরীক্ষার মোহমুক্ত বিষণ্ণতা, জীবন-তাৎপর্যবোধের বিফল অনির্ণেয়তা কবিতাগুলির প্রতি পংক্তিতে নিদ্রালু সুরের মত সংলগ্ন আছে। জীবনের সমস্ত বস্তুকাঠিন্যের বহিরাবরণের মধ্যে যে ক্ষণিক, খণ্ডিত ভাবসত্যটি প্রচ্ছন্ন আছে কবি তাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন যৌবনের মদির উচ্ছ্বাস, নব আবিষ্কারের উন্মাদনা—সব যেন বার্ধক্যের সব-হারানো, বাহির হতে প্রতিহত চিত্তের উদাস আত্মকেন্দ্রিকতায় বিলীন হয়েছে। জীবনের প্রবাহ যেন ধারা হারিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্বলে কবির চিদাকাশকে প্রতিবিম্বিত করেছে। এ কবিতায় আকর্ষণ আছে, শিল্পপ্রাধান্য আছে, অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি-প্রবণতা আছে—কিন্তু হয়ত প্রাণশক্তির উচ্ছলতা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গতিবেগ সে পরিমাণে নাই। সমস্ত জীবন যেন আত্মসংহরণ করে কবির হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করেছে ও আভাস-ইঙ্গিত-প্রতিধ্বনিতে নিজ অখণ্ড সত্তাকে অণু-পরমাণুতে ছড়িয়ে দিয়েছে।

'বিদিশা' কাব্যগ্রন্থখানিতে কবির এই অনুভূতি-বৈশিষ্ট্য সুন্দর রূপ পেয়েছে। এর কয়েকটি কবিতা—'পান্থশালা', 'পুনর্ণবা', 'স্বর্ণরেণু', 'মুখর অতীত', 'বন্দীবিহঙ্গম', 'সূর্যসম্ভব', ও 'সঙ্কোভ'—পরিণত মননশক্তি,

সূক্ষ্মব্যঞ্জনা-নৈপুণ্য ও ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে ভাবের খণ্ডলান্বিত সম্পূর্ণতার চমৎকার পরিচয়।

'সূর্যসম্ভব' কবিতাটিতে কবির স্বাভাবিক স্বপ্নসঞ্চরণশীলতা ও ক্ষীণ নৈরাশ্যবাদের পরিবর্তে বলিষ্ঠ কর্মোদ্যমের আহ্বান শোনা যায়। গোধূলির ম্লান আলোয় করুণ শিশিরবিন্দুর মত এক একটি কবিতা আমাদের মনে একটি স্নিগ্ধ মায়ার স্পর্শ বহন করে।

'ঘোড়া কর ভগবান্' কবিতাগুচ্ছে দীর্ঘশ্বাস সরস ব্যঙ্গপ্রিয়তায় রূপান্তরিত হয়েছে। পূর্বগ্রন্থের সহিত এর মূল প্রেরণা অভিন্ন, কেবল প্রকাশভঙ্গীরই পার্থক্য। জীবনের যে অসঙ্গতি, হতাশার যে আকাশ-কুসুমচয়নপ্রবণতা জীবনবিমুখ চিত্তের যে দৈবানুগ্রহলোলুপতা ভাবুকতার একস্তরে বঞ্চনার ক্ষোভ জাগায়, তাই অন্যস্তরে তীব্র, লবণাক্ত পরিহাসরসিকতায় তির্যকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। যে জীবনসার্থকতাকে সোজাপথে পাওয়া গেল না অসম্ভব খেয়ালের বাঁকা পথে তাকে লাভ করার আশা করে চিত্তের তিক্ততা হাসির ছদ্মবেশে আপনাকে ঢাকে। এর অনেকগুলি কবিতায় parody বা অনুকারীব্যঙ্গকবিতায় পাকা হাতের নিদর্শন পাওয়া যায়। পরিকল্পনার স্বচ্ছন্দলীলা ও ভাষার ক্ষুরধার বক্রোক্তি এর অনেকগুলি কবিতাকে স্মরণীয় করে রাখবে। মনে হয় মরুভূমির তলায় যে অদৃশ্য ফল্গুধারা ঝির ঝির করে বয়ে চলেছিল, তাই হঠাৎ এক জায়গায় ফোয়ারার বিদ্রূপ-হাসিতে ফেটে পড়েছে।

'অবন্তী' কবির শেষতম রচনা। এতে কিছু নূতন পরীক্ষার সন্ধান পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম মননজাল কোথাও কোথাও আখ্যান-বস্তুর ঘটনাগত স্থূলতা লাভ করেছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা খুব সার্থক বলে মনে হয় না। ছোট স্বয়ং-সম্পূর্ণ অনুভূতিবিন্দুকে ঘটনাবেষ্টনীর মধ্যে নিবিড় ও গতিশীল করে তোলার কৌশল আয়ত্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। কয়েকটি কবিতায়—'মন', 'ছোঁয়া', 'সম্প্রতি', প্রভৃতিতে জীবনানুভূতির সঙ্গে যন্ত্র-সাদৃশ্যের সচেতন প্রয়োগ-চেষ্টা দেখা যায়—তাতে একটু বিস্ময়-চমক জাগে কিন্তু সৌন্দর্যপ্রতীতি জাগে না। মনে হয় অন্যান্য কবিতাগুলিতেও পূর্বরীতির অনুসরণে খানিকটা সচেষ্টতা এসেছে—ক্ষণিক অনুভূতি আর পূর্বতন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে নিজ রূপাবয়ব গড়ে তুলতে পারছে না। মনে হয় যেন কবির মানসচেতনায় ও

আঙ্গিক-সন্ধানে খানিকটা অনিশ্চয়তা এসে গেছে। কবি যেন অগ্রগতির পথে এক নূতন মোড়ে দাঁড়িয়ে কাব্যপ্রেরণার অভিনব উৎস অনুসন্ধান করছেন।

এই কাব্যগ্রন্থগুলিতে তরুণ কবির পরিণত প্রজ্ঞা, শিল্পকৌশল ও রূপায়ণের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর দেখা যায়। স্বভাবতই কৌতূহল জাগে যে, এখন কবি কোন্ নূতন পথে চল্‌বেন? প্রত্যেক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ কবির সম্বন্ধে ততঃ কিং এই প্রশ্ন অনিবার্যভাবে ধ্বনিত হয়। আধুনিক কবিগোষ্ঠীর একটা প্রধান সমস্যা যে এঁরা কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য ও গভীর আবেগধারার দৃঢ় আশ্রয় থেকে বঞ্চিত। মধুসূদনের কবিতায় রসাল স্বর্ণলতিকাকে যে বিপদের সম্ভাবনা জানিয়েছিল সে বিপদ আধুনিক কবির নিকট সদা-উপস্থিত। 'মধুকর ভারে তুমি পড়লো হেলিয়া'—এই উক্তি আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যাঁরা নিজ স্বাধীন অনুভূতির মাটি খুঁড়ে কোহিনূর তুলতে চান, তাঁরা হয়ত গোটা কোহিনূরের পরিবর্তে ধূলাবালিমেশা রত্নকণামাত্র আহরণ করতে পারেন এবং এই বিচ্ছিন্ন রত্নকণাগুলি যে সুচারু-গ্রথিত হীরকহারের মত কবির গলদেশে দোদুল্যমান হবে তাও সব সময় আশা করা যায় না। কাজেই আধুনিক কবির ভবিষ্যৎ অনেকটা অনিশ্চিত—তাঁহার অগ্রগতির সম্ভাব্য পথটি পূর্বানুমাণের বলে সুনির্দিষ্ট করা যায় না। আমাদের জীবনযাত্রার যে বর্তমান রূপ, জীবনদর্শনের যে খণ্ডিত আকস্মিকতা, তাতে এদের থেকে কবিতা যে কতদিন রস আহরণ করবে তা বলা যায় না। আজকাল ধর্মের পথের মত কাব্যের পথও 'ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া' হয়ে দাঁড়িয়েছে—দুধারে বিস্তৃত মরুবালুকার মাঝ দিয়ে ক্ষীণ ধারায় যে কাব্যানুভূতির সরু জলরেখাটি এঁকে বেঁকে চলেছে, কবি কখনও ডাইনে কখনও বামে হেলে স্খলিত, অলস পদক্ষেপে তারই অনুসরণ করছেন। কোথাও বা একটু দূরাগত স্নিগ্ধতার আভাস, কোথাও বা একটু শীর্ণ ধারার ক্ষীণ কলধ্বনি কোথাও বা জলশীকর রচিত ইন্দ্রধনুর ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত বর্ণ মায়া কোথাও বা মনের গহনে গভীর প্রোথিত অভিলাষ-কল্পনার ম্লানদীপ্তি—এইসব আজকালকার কবিতা ধরে রাখতে চায়। এ যেন স্থূল খাদ্যের পরিবর্তে সূক্ষ্ম প্রাণসারের দ্বারা জীবনরক্ষা। এই ভিটামিন-ভোজী কবিতা কতদিন সবল থাকবে, জীবনরসধারাপান থেকে বঞ্চিত হয়ে এর পরমায়ুর অকাল

পরিসমাপ্তি ঘটবে কিনা এরূপ সন্দেহ অস্বাভাবিক নয়। তাই এই কাব্যগ্রন্থগুলির রচয়িতা সম্বন্ধে আমাদের যে উচ্চ আশা ও ধারণা তার বিপরীত দিকে খানিকটা সংশয়ের ছায়াও মিশে আছে। কবির পরীক্ষিত শক্তির প্রতি আস্থা ও অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর নূতন পরিণতির জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকবো।

সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি

সংস্কৃতির স্বরূপ

(১)

আজকাল 'সংস্কৃতি' কথাটির বহুল ও ব্যাপক প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। শিক্ষা ও কলাবিদ্যার সহিত সম্পর্কিত প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানকেই 'সাংস্কৃতিক' নামে অভিহিত করা হয়। মনে হয় ইংরাজী culture-এর প্রতিশব্দরূপে সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু culture-এর তুলনায় সংস্কৃতি আরও অনির্দেশ্য ও সমষ্টিদ্যোতক গুণাবলীর ইঙ্গিত করে। Culture শব্দটির অর্থ প্রধানত শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যসমাজের সহিত মেশার ফলে প্রসূত মার্জিত রুচি ও অনিন্দনীয় আচরণ। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল অনুশীলনের ফলে অর্জিত মানস-সম্পদ। 'সংস্কৃতি' শব্দে ইহা ছাড়া আরও অনেক বেশী কিছু বুঝায়। বোধ হয় সংস্কৃতি অপেক্ষা অধুনা অপ্রচলিত 'কৃষ্টি' শব্দই culture-এর অধিকতর সমার্থবাচক। 'কৃষ্টি' অর্থে কর্ষণ বা অনুশীলনের দ্বারা লব্ধ চিৎ-প্রকর্ষ। দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষ্টি শব্দটি বাংলা সাহিত্য বেশ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই—ইহার প্রয়োগ এখন বিরল হইতে বিরলতর হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই চিৎ-প্রকর্ষ-সম্বন্ধীয় সমস্ত কিছু উপাদান ও উপকরণ বুঝাইবার দায়িত্ব এখন 'সংস্কৃতি'র উপর পড়িয়াছে। এই বহুধা-বিভক্ত উৎকর্ষমণ্ডলের অর্থ—বিস্তৃতি বহন করিতে গিয়া সংস্কৃতি উহার মূল অর্থ ছাড়াইয়া শিথিল ও অস্পষ্ট প্রয়োগের অনির্দেশ্যতায় কতকটা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং অপপ্রয়োগে বিহ্বল এই অতি-প্রয়োজনীয় শব্দটির মূল অর্থটি অনুসন্ধান ও পুনরুদ্ধার করার বাঞ্ছনীয়তা বিশেষ করিয়া অনুভূত হইতেছে।

'সংস্কৃতি' শব্দে একটা জাতির ভাবসাধনা ও জীবনচর্যার সমগ্রতা সূচিত হয়। ইহার মধ্যে ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজবোধ ও জীবনদর্শনের একত্রীভূত সারনির্যাস নিহিত আছে। ইহাতে জাতির মহত্তম ঐতিহ্য ও ক্ষুদ্রতম আত্মবিনোদন-প্রয়াস পাশাপাশি অবস্থিত। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ইহাতে সচেতন অনুশীলন অপেক্ষা অর্ধচেতন অথচ অপরিবর্তনীয় রূপে স্থিরীকৃত মানসরুচি বা প্রবণতাই মুখ্যরূপে প্রতিভাত হয়। 'সংস্কারে'র

সঙ্গে 'সংস্কৃতি'র কেবল রূপগত নয়, অর্থগত একটি গভীর সাম্য আছে। সংস্কার যেমন বুদ্ধি বা ইচ্ছার অতীত, জীবনের একটি নিগূঢ়, অস্থিমজ্জাগত, আত্মবিস্মৃত অভিপ্রায়ের স্পন্দন, সেইরূপ সংস্কৃতিও এই জৈবসংস্কারের একটি ভাবজীবনগত সূক্ষ্মতর প্রতিরূপ। যেমন জীবনধর্মের কয়েকটি স্থূল অথচ অপরিহার্য প্রয়োজন আমরা চিন্তা ব্যতিরেকে শুধু সংস্কারবশতই সম্পাদন করি, তেমনি একটি বিশেষ জাতির প্রতিনিধিরূপে আমরা একটি অখণ্ড মানস উত্তরাধিকার অর্জন করিয়া মনের বিভিন্ন বিকাশের মধ্যে তাহার অজ্ঞাতসারে প্রয়োগ করিয়া থাকি। বংশধারা-সংক্রামিত দোষ-গুণের ন্যায়, রক্তকণাবাহিত শক্তি-দুর্বলতার ন্যায়, সমগ্র জাতির অতীত জীবন-সাধনা হইতে প্রাপ্ত এই মানসবৈশিষ্ট্য আমাদের সচেতন চিত্তের ভিত্তি রচনা করে। অন্তরের এই গোপন-স্তর-শায়ী প্রবণতা, ঐতিহ্য হইতে আগত মনোলোকের এই প্রচ্ছন্ন জীবনীশক্তিই সংস্কৃতির সত্য পরিচয়।

সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝিতে হইলে একটি প্রধান পার্থক্যের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। যাহা আমাদের সচেতন মানস চর্চা, তাহা সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিলেও ও সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট হইলেও সংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত নহে। যখন আমরা সচেতনভাবে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করি, রঘুবংশ-কুমারসম্ভবের রস আস্বাদন করি বা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ধর্মচর্চা করি, তখন এই সচেতন অনুশীলনকে সংস্কৃতি আখ্যায় অভিহিত করা হয় না। কিন্তু এই কাব্যচর্চা বা ধর্মচর্চার ফলে আমাদের অজ্ঞাতসারে যে মানস প্রকৃতিটি গড়িয়া উঠে, যাহা অচেতন স্তরে নিমজ্জিত থাকিয়া আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞান—ধর্মসাধনার জগৎকে পাতালশায়ী কূর্মের ন্যায় ধরিয়া রাখে তাহাই সংস্কৃতি। বাস্তব জীবনের কোন আকস্মিক আঘাতে, কোন অপ্রত্যাশিত সঙ্কট-মুহূর্তে, অবসর কালের আত্মবিনোদন বা সামাজিক উৎসবের স্মৃতিবাহিত প্রেরণায় এই সুপ্ত মানস প্রবণতা, হাজার বৎসর ধরিয়া অবচেতন মনের তলদেশে সঞ্চিত এই আত্মবিস্মৃত ভাব-সত্তা হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া সংস্কৃতির রূপে আত্মপ্রকাশ করে। নদীর জলপ্রবাহের ন্যায় আমাদের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কর্মধারা ও চিন্তাধারা যখন পূর্ব-পরিকল্পিত লক্ষ্যের মুখে ছুটিয়া চলে, তখন তাহা সংস্কৃতি নহে; কিন্তু এই বেগবান্ প্রবাহের নিচে নদী-খাতের যে গভীরতা সৃষ্ট হয়, তটভূমি যে রেখা-চিহ্নিত হয়, বালুকারাশির নিচে যে ফল্গুধারা আত্মগোপন করিয়া

সুশীতল নির্ঝররূপে উৎসারিত হয়, সেখানেই আমরা মর্মমূল-জড়িত সংস্কৃতির গোপন পদচিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারি।

(২)

জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ ধর্ম, সমাজবোধ ও সাহিত্যরূপী যে ত্রিধারার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, উহারাই সংস্কৃতির মূলে রসসিঞ্চনের প্রধান হেতু। কিন্তু সংস্কৃতির প্রসার উক্ত ত্রিধারার পরিধি হইতে অনেক বেশী। সংস্কৃতির মধ্যে জাতির উৎসব, উহার সুকুমার শিল্পকলার লৌকিক প্রকরণ, উহার মনোরঞ্জনের বিবিধ আয়োজন, ও লৌকিক স্তরের নৃত্য-গীত প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। জাতির মন কোন বিশেষ-উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত না হইয়া যে উদ্বৃত্ত আনন্দ-রসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের বিচিত্র পথ অনুসন্ধান করে, তাহার মধ্যেই তাহার সংস্কৃতির পরিচয় নিহিত। উৎসবের পূজামণ্ডপে ও শাস্ত্রবিধি-অনুসরণে ধর্মের অধিকার; কিন্তু প্রতিমার চালচিত্রে অঙ্কিত যে সমস্ত মূর্তি পটুয়ার বন্ধনহীন কল্পনা-লীলার স্বাক্ষর বহন করে, উৎসব-প্রাঙ্গণে যে নানারূপ ক্রীড়াকৌতুক ও লোকচিত্তের অসংস্কৃত আনন্দোচ্ছ্বাস প্রাকৃত জনসাধারণের ভিড় জমায়েত করে, সেখানে ধর্মের সিংহাসনে সংস্কৃতি ভাগ বসাইয়াছে। কালোয়াতী সঙ্গীতের আসরে যে সমস্ত রসজ্ঞ বোদ্ধা সুর-তালের রহস্যভেদ করিয়া উহার পূর্ণ মাধুর্য আস্বাদনের অধিকার লাভ করিয়াছে তাহারা অনুশীলনের প্রত্যাশিত পুরস্কারই অর্জন করে। কিন্তু এই অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর পিছনে কলাকৌশল-অনভিজ্ঞ আর একদল শ্রোতাও এই আনন্দের প্রসাদ পায়। তাহাদের মনের গভীরে এই সুরের অনুরণন প্রবেশ করিয়া উহাকে একটা মাধুর্যরসে আপ্লুত করে ও উহার মধ্যে একটা সঙ্গীতমুখী আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়া উহার রুচি-গঠনে সহায়তা করে। এখানে আমরা পাই শিক্ষার পরিবর্তে উহার পরোক্ষ ফল সংস্কৃতি। যাহারা যাত্রা-অভিনয়ের বিষয়ের পৌরাণিক মহিমা সচেতন-ভাবে উপলব্ধি করে তাহারা বিদগ্ধ শ্রোতা। কিন্তু এই যাত্রার আসরের সুদূর কোণগুলিতে আসীন নিরক্ষর, পুরাণজ্ঞানহীন যে শ্রোতৃমণ্ডলী কতক বুঝিয়া কতক না বুঝিয়া এই অভিনয়ের দৃশ্যগুলি মুগ্ধ, আত্মভোলা মনে অনুসরণ করে ও এক অনির্দেশ্য ভাবরোমাঞ্চের শিহরণে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে, তাহারা এক গোপন-চেতনাবাহী সংস্কৃতির অনতিক্রম্য প্রভাবের

কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বাউলের গান, রামপ্রসাদী সঙ্গীতের অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা এই সংস্কৃতির গোপন-খনিত সুড়ঙ্গ পথেই প্রাকৃতচিত্তে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সহস্র বৎসরের শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনা আমাদের চারিদিকে যে একটা অদৃশ্য অথচ অতিমাত্রায় সজীব ও সক্রিয় ভাব-পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছে আমরা অজ্ঞাতসারে উহা হইতেই নিঃশ্বাস গ্রহণ করি ও এই নিঃশ্বাস-বায়ুর ভিতর দিয়াই অতীত ইতিহাসের সবটাই আমাদের অনুভূতিতে সূক্ষ্ম অশরীরীরূপে পুনরাবৃত্ত হয়। জীবন-উদ্যানে ফুল ফোটাইবার কাজে হয় ত আমাদের কোন সক্রিয় অংশ ছিল না; কিন্তু এই ফুলের সম্মিলিত সৌরভ কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে আমাদের প্রাণেন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরা পড়ে। এই অতীতের তীর হইতে বায়ুপ্রবাহের দ্বারা সঞ্চারিত সৌরভই সংস্কৃতি।

(৩)

আজকাল কিন্তু সংস্কৃতি শব্দটি সচরাচর যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা ধর্ম বা উচ্চতর সাহিত্য ও কলাবিদ্যার সহিত প্রায় নিঃসম্পর্কিত। অধুনা সংস্কৃতি বলিতে আমরা বেদ-উপনিষদ-গীতার ধর্ম বা কালিদাস-ভবভূতির কাব্য বুঝাইতে চাহিনা—জাতীয় প্রতিভার এই উচ্চতম বিকাশগুলি এখন সংস্কৃতির সর্বব্যাপী পরিধি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন সংস্কৃতি অর্থে জাতীয় মানসের লঘুতর রুচি ও প্রবণতা-সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য করা হয়। সামাজিক রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহারের মধ্যে কোন বিশেষ সৌকুমার্য বা সুরুচিবোধ, উৎসবের মধ্যে ধর্মের প্রত্যক্ষসম্পর্কবর্জিত কতগুলি কৌতূহলোদ্দীপক অনুষ্ঠান, নৃত্যগীতের মধ্যে কোন বিশিষ্ট কলাকৌশল বা ভাবদ্যোতনা, মাঙ্গল্যকর্মে সজ্জাবিধান ও আলিম্পন-রচনা, মানস আভিজাত্যের কোন বিশেষ পরিচয়—এইগুলিকেই বিশেষভাবে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সংস্কৃতি ক্রমশঃ উচ্চকোটি হইতে নিম্নকোটিতে নামিয়া আসিতেছে। জাতির অতীত কীর্তিকলাপ অপেক্ষা মানস-রুচি ও আপাতদৃষ্টিতে অকারণ উল্লাস, প্রাণ-হিল্লোলের অদম্য উচ্ছ্বাসের উপরেই ইহার দ্বারা বেশী ঝোঁক দেওয়া হইতেছে। বিবাহ বা অন্যান্য শুভকর্মে কতগুলি মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠান আছে—এগুলির হয়ত এককালে ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ

বা কিছু সাঙ্কেতিক অর্থ ছিল। এখন এগুলি সংস্কৃতির ক্ষীণসূত্রে বিধৃত ও সুস্পষ্ট-তাৎপর্যহীন হইয়া কেবলমাত্র মনের উৎসবরাগ বা আনন্দকম্পনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। উৎসবে নারীদের নৃত্যগীত ভদ্র বাঙালীর সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে এই প্রথা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও প্রচলিত ছিল, এবং এগুলিতে অঙ্গভঙ্গির যে সুরুচি-সম্মত মৃদুছন্দ, যে সুষমাময় পরিমিতি-বোধ ও আতিশয্যবর্জনের পরিচয় মিলে তাহাতে ধর্মের অনুশাসন কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা বোঝা যায়। লোকগীতির বিভিন্ন প্রকারের কবিগান, বাউলগান, দেহতত্ত্বঘটিত গান, ফকিরের গান—প্রভৃতিতেও ধর্মের আদিম ভিত্তির উপর সংস্কৃতির নবীন উন্মেষের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত লোকগীতিতে শাস্ত্রধর্মের প্রভাব পরোক্ষ, মানস-চেতনার গভীর স্তর-নিহিত, ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক আদর্শের মহিমা দীর্ঘ অনুশীলন ও অভ্যাসের ফলে স্মৃতিনিমজ্জনের অন্তরাল হইতে উত্থিত হইয়া এক নূতন-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সঙ্গীতের সুর স্তব্ধ হইলেও যেমন উহার রেশ মনে বাজিতে থাকে, তেমনি ধর্মসাধনার স্মৃতির আভাস সংস্কৃতির নব-রূপায়ণের মধ্যে নিজ অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়।

তাহা ছাড়া মেয়েদের ব্রত-পাঁচালী, কৃষিপ্রধান দেশের নবান্ন, পৌষ-পার্বণ প্রভৃতি উৎসব, নিম্নশ্রেণীর ভাদুগান প্রভৃতির মধ্যে এই ধর্ম-প্রভাবিত সংস্কৃতির নানা বিচিত্ররূপ দৃষ্টিগোচর হয়। অস্থিমজ্জাগত, অত্যাজ্য সংস্কাররূপে বর্তমান ধর্মচেতনার সহিত লৌকিক আনন্দ মিশিয়া এই সংস্কৃতিরূপ মানস আবরণীর সূত্র রচনা করিয়াছে। এগুলির মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে নিছক মনোরঞ্জিনী বৃত্তি ও ঐহিক আমোদপ্রিয়তা ধর্মের আকাশ-বাতাস-ব্যাপী অদৃশ্য প্রভাবে একরূপ উর্ধ্বায়নপ্রবণতা লাভ করিয়াছে। যাহা স্থূল ভোগের বিষয়, যাহা সুখলাভের উপলক্ষ্য, যাহা সামাজিক মিলনের উপায় তাহাই ধর্মের সূক্ষ্ম আস্তরণে আবৃত হইয়া কাষায়-বস্ত্র-পরিহিতা পূজারিণী কুলবধূর ন্যায় একটি শান্ত-মৌন শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা যে মূলতঃ ধর্মবোধ হইতে উদ্ভূত তাহার প্রমাণ ইহাদের সমাজ-মনের উপর বদ্ধমূল, অনপনেয় প্রভাবে। ইহাদিগকে শুধু লৌকিক আনন্দপ্রকাশের উপায়রূপে গ্রহণ করিলে ইহারা সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে স্বীকৃতি লাভ

করিত না। প্রয়োজনবোধে ও উৎসাহ মন্দীভূত হইলে ইহাদিগকে ত্যাগ করা সহজ হইত। কিন্তু ধর্মের মূল অনুভূতি যে গভীরে প্রসারিত সেই মূলের সহিত জড়িত হইয়া ইহারা ধর্মেরই শাশ্বত মূল্য ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ধর্মের বন্ধুর পর্বতগাত্রে শ্যামশষ্পের কোমল শোভারূপে ইহারা পর্বতের দুর্জয় শক্তি ও ধ্বংসহীন চিরস্থায়িত্বের অংশীদার হইয়াছে। তারা-শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় নিম্নশ্রেণীর কাহারদের জীবনযাত্রা-বর্ণনার মধ্য দিয়া তাহাদের সংস্কৃতি ও জীবনবোধের যে অনবদ্য ছবি আঁকা হইয়াছে তাহাতে ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতি-শাসিত জীবনের সুগভীর রহস্যটি চমৎকারভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

কাহার-পাড়ার মাতব্বর বনোয়ারীর প্রতিটি কর্ম ও চিন্তা, তাহার কুসংস্কার ও ভূতের ভয়, তাহার দলপতির কর্তব্যনিষ্ঠার আদর্শ, এমন কি তাহার পাপাসক্তি ও পদস্খলন ও কাহারগোষ্ঠীর মদের আড্ডায় অসংযম ও মাতামাতি—এ সমস্তই এক সদাজাগ্রত দৈবশক্তির অতন্দ্র পলকহীন পর্যবেক্ষণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উপনিষদের সেই মহামন্ত্র—'ঈশাবাস্য-মিদং জগৎ' এই নিম্নশ্রেণীর মানুষদের মূঢ়, সঙ্কীর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিত্তে কিরূপ দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে ভাবিলে হিন্দু সংস্কৃতির প্রসারণশীলতা ও জীবনের মূলদেশ পর্যন্ত অনুপ্রবেশ-শক্তির পরিচয়ে আশ্চর্য হইতে হয়।

(৪)

সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল সেই মানদণ্ডে আধুনিক যুগের তথাকথিত সংস্কৃতির বিচার করিলে উহা কতদূর সংস্কৃতি-পদবাচ্য সে সম্বন্ধে কতকটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়। সংস্কৃতির পরিধি ধর্মবোধ ও জীবনদর্শন হইতে ক্ষুদ্রতম আমোদ-আহ্লাদ ও কলানুশীলনের খুসি-খেয়াল পর্যন্ত প্রসারিত। অবশ্যপালনীয় ধর্মানুষ্ঠান, পটুয়ার ছবি ও মেয়েদের হাতে-আঁকা আল্পনা সবই একই অনুভূতি-কেন্দ্র হইতে উদ্ভূত। এই বিচিত্র বিকাশের সাধারণ বৃন্ত ও আশ্রয়স্থল হইল একটি জাতির জীবন-নিরীক্ষা-প্রসূত একটি কেন্দ্রগত জীবনবোধ। যেখানে এই বিশিষ্ট জীবনবোধ নাই, সেখানে সমস্ত সামাজিক উৎসব ও বিভিন্ন প্রকারের কলানুশীলন কেবল সৌন্দর্যসৃষ্টি ও চিত্তবিনোদনের বিচ্ছিন্ন প্রয়াসমাত্র।

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বতন্ত্র হইয়াও এক কেন্দ্রীয় প্রাণলীলায় বিভিন্ন-রূপ প্রকাশ-দ্যোতনা; কিন্তু মৃত বা পঙ্গু দেহের অংশগুলি এই সামগ্রিকতার উপাদানরূপে প্রতিভাত হয় না। বৃক্ষের স্থূলকাণ্ড হইতে তাহার প্রান্তলগ্ন ক্ষুদ্রতম পাতাটি পর্যন্ত একই মূলে বিধৃত, শাখা-প্রশাখাবাহী একই রসে পুষ্ট, এক প্রাণ-সত্তার কোথাও বা বজ্রদৃঢ়, কোথাও বা পুষ্পপেলব লীলাভিব্যক্তি। জীবন্ত সংস্কৃতিরও সেইরূপ অত্যাজ্য ধর্মবোধ হইতে সামান্য আচার ও নৃত্যগীতের উল্লাসছন্দ পর্যন্ত একই বৃহৎ জীবনোপলব্ধির তরঙ্গোৎক্ষেপ মাত্র। সংস্কৃতির এই কঠোর ও কোমল দিকের যদি সমন্বয় না হয়, ধর্মের মধ্যে আনন্দ ও আনন্দের মধ্যে ধর্মের চেতনা যদি না থাকে, তবে তাহা আদর্শভ্রষ্ট ও জীবনীশক্তিহীন। যে নারী কেবল নিজের অঙ্কন-নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য আল্‌পনা দেয়, তাহার মধ্যে সংস্কৃতির প্রভাব নিষ্ক্রিয়; যে আল্‌পনা আঁকিবার সময় ইহা যে লক্ষ্মীর চরণচিহ্নের পীঠস্থান, ইহা যে শুভের আমন্ত্রণের অর্ঘ্য-রচনা, ইহা যে অন্তরের একান্ত বিশ্বাস ও আকূতির চিত্ররেখা এই ধারণা উদ্ভূত হয়, তাহারই ক্ষেত্রে ইহা সংস্কৃতির সার্থক রূপায়ণ। যে ধর্মপ্রাণা মহিলা গার্হস্থ্যধর্মের উচ্চতম আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করিয়াছে, যাহারা সতীত্ব রক্ষার জন্য হেলায় প্রাণ বিসর্জন দিত বা স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিতে দ্বিধা করিত না তাহাদেরই মেয়েলী ব্রত-অনুষ্ঠান বা উৎসবে স্ত্রী-আচার-পালনের আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে সমগ্র-সত্তা-নিহিত জীবনসাধনার একটি কমনীয় রূপ প্রকাশিত হয়। আমাদের কঠোর বিধিনিষেধ-পালন, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক বিচার, আমাদের জীবনাদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিবার একটি প্রবল আগ্রহ ও উদ্যমই আমাদের চিত্তবিনোদনের বিশিষ্ট রীতি ও উৎসবের বিচিত্র বিন্যাস-পদ্ধতির পটভূমিকা রচনা করে। পূজার আসনে বসিয়া যাঁহার ধ্যান করি, মন্দিরের অভ্রভেদী মহিমায় যাঁহার বিরাটত্বের প্রতিচ্ছায়া দেখি, সুকুমার শিল্পকলার দ্বারা তাঁহারই চরণে সৌন্দর্যের অর্ঘ্য নিবেদন করি, আনন্দে ও ক্রীড়া-কৌতুকে তাঁহারই প্রসন্ন সাহচর্যের স্নিগ্ধ স্পর্শ দেহমনে পুলক-রোমাঞ্চ জাগায়। এই সর্বাঙ্গীন জীবনানুভূতিই সংস্কৃতির মূলকথা।

বর্তমান যুগে শিক্ষা-দীক্ষার ফলে যে নূতন ধরণের মানস আগ্রহ ও বিনোদন-স্পৃহা উদ্ভূত হইয়াছে তাহা পূর্ববর্ণিত সংস্কৃতির আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ

পৃথক। ইহা জীবনের মূলের সহিত নিঃসম্পর্ক, কোন গভীর জীবনবোধ ইহার উৎস নহে। আজকালকার সভা-সমিতিতে মানস-অনুশীলন ও আনন্দবিতরণের যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়, তাহারা যেন ক্ষুদ্র স্বয়ং-সম্পূর্ণ দ্বীপের মত জীবনস্রোতের উপর মাথা তুলিয়া আছে। উহাদিগকে সংস্কৃতি অপেক্ষা সচেতন কৃষ্টির সহিতই যুক্ত করা বিধেয়। সাহিত্য-আলোচনা, নৃত্যগীতের উৎসব, আবৃত্তি, অভিনয়, হাস্যকৌতুক—এগুলি আমাদের নূতন-শেখা বিদ্যা ও মনোরঞ্জন বৃত্তির সামাজিক প্রয়োগ, ইহারা কোন অখণ্ড জীবনানুভূতির নানামুখী প্রকাশ নহে। এখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় ও সমাজ-জীবনে আমাদের সমগ্র মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনের কোন সুযোগ নাই—কাজেই এই শিক্ষা ও সমাজ-চেতনা প্রসূত যে সংস্কৃতি তাহা জীবনের গভীর মূল পর্যন্ত প্রসারিত হয় না। তা ছাড়া আধুনিক জীবনযাত্রা কোন সামগ্রিক জীবন-বোধ নিয়ন্ত্রিত নহে। যে সংস্কৃতি ধর্মবোধের সম্প্রসারণ বা পরিণত ফল তাহা স্বভাবতই কেন্দ্রাভিমুখী; কিন্তু যাহা তিল তিল করিয়া বিভিন্ন উৎস হইতে সংগৃহীত, যাহার মূলে কেবল আছে মানসিক আগ্রহ, মার্জিত রুচি ও সৌন্দর্যবোধ, যাহা বিবিধ আদর্শের যদৃচ্ছালব্ধ সার-সঙ্কলনে গঠিত তাহা অখণ্ড, আদিম জীবনানুভূতির অপ্রতিরোধ্য শক্তির অধিকারী হয় না, তাহা জৈবসংস্কারের মানসসংস্করণের মত সমগ্র সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় না। হয়ত আধুনিক যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের বিপুল পরিধি, আদর্শ-সংঘাতের বিভ্রান্তকারী প্রতিক্রিয়া ও মনের স্বেচ্ছানির্বাচন-প্রবণতার মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃতির কেন্দ্রিকতা পুনরাবৃত্ত হইবে না। আমরা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে যাহা কিছু আহরণ করিব তাহা মনের উপরিভাগে একটি মার্জিত স্তর রচনা করিবে, তাহা আমাদের সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে একটি শিষ্টাচারের আদর্শ, একটি লঘু আনন্দের মৃদুকম্পন, রুচিসখ্যগত একটা নৈকট্যবোধের সৃষ্টি করিবে। ইহার অতিরিক্ত কিছু আমরা আশা করিতে পারি না। ধর্মের বন্ধনই যেখানে শিথিল, জীবনবোধ যেখানে বিচ্ছিন্ন অনুভূতি-পরম্পরার সমষ্টি, যেখানে আস্বাদ-বৈচিত্র্য নানাবিধ রুচি-বৈষম্যের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে, সেখানে সংস্কৃতির সমগ্র জীবনব্যাপী প্রভাব প্রত্যাশা করা যায় না। কোন ভবিষ্যৎ যুগেও যে এইরূপ সংস্কৃতি পুনরায় গড়িয়া উঠিবে তাহা অনুমানের অতীত। আমরা হয়ত কালের পরিবর্তন-

শীলতা ও অগ্রগতির সঙ্গে আনন্দের নূতন নূতন উপাদান খুঁজিয়া পাইব। ছায়াচিত্র যেমন এখন নাটক ও যাত্রাকে পিছু হটাইয়া নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে সেইরূপ হয়ত নূতন কোন চিত্তরঞ্জনের উপায় পুরাতনকে স্থানচ্যুত করিবে। হয়ত পুরাতন পুতুল ভাঙিয়া ফেলিয়া শিশু যেমন নূতন পুতুলের দিকে আকৃষ্ট হয়, মানব-চরিত্রের মধ্যে যে শাশ্বত শিশু বাস করে সেও তেমন নূতন ক্রীড়াকৌতুকে মাতিবে। কিন্তু মহাকাব্যের মত প্রাচীন সংস্কৃতির যে একীকরণ-শক্তি, সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতিকে একই লক্ষ্যাভিমুখী করার যে অমোঘ প্রভাব তাহা আর মানবজাতির ইতিহাসে পুনরাবৃত্ত হইবে কিনা সন্দেহ।

বাঙালীর রুচি

(প্রাক্-আধুনিক ও আধুনিক)

(১)

'রুচি' জিনিসটার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন, তবে কতকগুলি লক্ষণের দ্বারা ইহা চিহ্নিত। একটা জাতির দীর্ঘ সৌন্দর্যচর্চা ও জীবনচর্চার ফলে উহার জনসাধারণের মধ্যে যে একটি সহজ সৌন্দর্যবোধ ও আচরণ-সুষমা উদ্ভূত হয় তাহাকেই রুচি নামে অভিহিত করা হয়। জীবনের ছোট-বড় নানা ক্ষেত্রে এই রুচির পরিচয় পরিস্ফুট। কাব্য-সাহিত্য, চারুশিল্প, স্থাপত্য, ব্যাপক জীবন-নীতি প্রভৃতি বৃহৎ ব্যাপারেও যেমন, তেমনি আহার-বিহার, আমোদ-উৎসব, গৃহ-সজ্জা, হস্তশিল্প, অঙ্গাভরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি ছোট-খাটো বিষয়েও জাতীয় রুচির ছাপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। যে সুদূর অতীতে বাঙালী সর্বভারতীয় পটভূমিকা হইতে নিজ মানসবৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল, তখন হইতেই তাহার এই রুচি-স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ উহার ভক্তিরসের আতিশয্য ও সৌন্দর্যপ্লাবনের অজস্রতা লইয়া বাঙালীর

ভাবাবেগ-সম্পৃক্ত রুচিবোধের প্রথম ঐতিহাসিক স্বাক্ষর। কালিদাসের আদিরস-সিক্ত সৌন্দর্যবোধের প্রভাব ইহাতে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ইহার দুকুলপ্লাবী স্রোতোবেগ, ইহার বাঁধ-ভাঙ্গা তরঙ্গচাঞ্চল্য বাঙালী মনের নিগূঢ় উৎস-প্রসূত ও তাহার সদ্যোজাত মানসরুচি-নিয়ন্ত্রিত। হরিকথার ভক্তি-সরস আলোচনা ও বিলাসকলা-কৌতূহলের পরিতৃপ্তি—এই দুই বিভিন্ন কুলজাত প্রবণতা বাঙালীর রুচি-দৌত্যে এক অচ্ছেদ্য উদ্বাহ-বন্ধনে মিলিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় ভক্তিরসের কতটা চর্চা হইত জানি না, কিন্তু আদি-রসের আবিল জোয়ার যে বহিয়া যাইত তাহা কিংবদন্তীর সাক্ষ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শুধু রাজসভায় যাহার জন্ম ও সংস্কৃত ভাষায় যাহার বর্ণনা, তাহা যে নিজ একক প্রভাবে জনসাধারণের চিত্তে রসহিল্লোলের সৃষ্টি করিবে ইহা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। জয়দেব রাজসভা-প্রতিবেশ হইতে হয়তো কিছুটা ভাব-সমর্থন ও কারুকার্যদক্ষতার শিক্ষা লাভ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু বাঙালীর অন্তর-গভীরে নিমজ্জিত রসধারার সহিত তাঁহার কাব্য-নলকূপের সংযোগ ঘটাইয়াই যে তিনি এই অবিরল মাধুর্যপ্রবাহ উৎসারিত করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। বাঙালী শৃঙ্গাররস-আস্বাদন-উন্মুখ না হইলে জয়দেব কখনও শৃঙ্গাররসকে ভক্তিতে রূপান্তরিত ও মাধুর্যে উদ্বর্তিত করিতে পারিতেন না। কবিকল্পনার পিছনে জনরুচিই সক্রিয় থাকিয়া ইহাকে একটা নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করিয়াছিল।

তেমনি মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙালী সমাজ-রুচির আর একটা অপেক্ষাকৃত স্থূল ও বাস্তব দিক আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উহার অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর, বিশেষত অনার্য গোষ্ঠীর লোকের মধ্যে ভক্তিসাধনার ভিতরেও একটা ইতর, অমার্জিত হাস্যরসের সংমিশ্রণ দেখা যায়। জয়দেবের কাব্যের মধুররস-প্রবাহের সবটাই বৈষ্ণব পদাবলীর খাতে বহিয়া গিয়াছে; মঙ্গলকাব্যে কেবল ইহার নীচেকার পঙ্কস্তরই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙালী রুচির দিব্য, রমণীয় সৌকুমার্য, আর মঙ্গলকাব্যে ইহার মৃত্তিকাশ্রয়ী, বাস্তব জীবনের অপূর্ণতা-অসঙ্গতি-জাত স্থূল কৌতুকপ্রিয়তা দেখা যায়। বাঙালী এক দিকে ভগবৎ-প্রেমের অনুভূতিতে তন্ময় হইয়াছে, আর এক দিকে তুচ্ছ সাংসারিক জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা-নির্যাসও উপভোগ করিতে শিখিয়াছে। সে মধুর রসের বিশুদ্ধ মধু পান করিয়াছে, আবার মধুর তলানি গাদও তাহার রসনায় অরুচিকর ঠেকে নাই। বৈষ্ণব কবিতায় বাস্তবজীবনের ইঙ্গিত

অলৌকিক বিভায় ভাস্বর; নায়কের প্রসাধন ও নায়িকার আভরণ সমাজ-প্রচলিত সৌন্দর্যকলার অনুগত হইলেও, মণিকার-বিপণিতে ইহাদের লেন-দেন চলিলেও, ইহাদের দিব্যায়ন ঘটিয়াছে কবি-কল্পনার আদর্শ শিল্পাগারে। তথাপি এই বর্ণনা হইতেও সমসাময়িক রুচিবোধ ও শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যে ইহার বিপরীত দিকটা প্রতিবিম্বিত—সেখানে পারিবারিক জীবনের মর্ত্য কুশ্রীতা, পাড়াপড়শীর ইতর কোন্দল, গৃহস্থ নারীর পতিনিন্দা, সতীনের রেষারেষি, ব্যবসা-বাণিজ্যের নৌকা-বোঝাই পণ্যদ্রব্যের বস্তু-সঞ্চয় ও উহার ভিতরকার ছল-চাতুরী-প্রবঞ্চনা প্রভৃতি রুচিবিকারের নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত। অবশ্য ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক-আদর্শানুযায়ী প্রাসাদ-নির্মাণ ও বস্ত্র-ও-কাঁচুলি-তৈয়ারীর সূক্ষ্ম বয়নশিল্প কিছুটা উন্নততর রুচির চিহ্ন বহন করে। চৈতন্য-জীবনীকারগণ ভক্তিরসের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্ব-আলোচনা প্রসঙ্গে রসনাতৃপ্তিকর বিবিধ উপাদেয় ভোজ্যদ্রব্যের সুবিস্তৃত তালিকা সংকলন করিতে কার্পণ্য করেন নাই। এই তালিকা হইতে তৎকালীন বাঙালীর আহার্য-বিষয়ে রুচির উৎকর্ষ অনুমিত হইতে পারে।

(২)

ইতিমধ্যে পারিবারিক ও সমাজ-সংস্থার দৃঢ়ীকরণ ও পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে বাঙালীর জীবনদর্শন ও জীবনযাপন-পদ্ধতি একটা সুশৃঙ্খল ও সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করিল। অবশ্য কিছু কিছু বিদ্রোহাত্মক ব্যতিক্রম—যথা সহজিয়া, তান্ত্রিক বীরাচারী, আলি-বালি-মুরশিদ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়সমূহ—সমাজের বাহিরেই রহিয়া গেল ও সমাজ-ব্যবস্থার মসৃণতার উপর একটা এলোমেলো, আবড়া-খাবড়া ভাঁজ সৃষ্টি করিল। তথাপি বলা যাইতে পারে যে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাঙালী জীবনে একটা সমন্বয়ের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সমাজের এই ছন্দোময়, মিলন-সঙ্গতিপূর্ণ রূপটিই পরিস্ফুট হইয়াছে। ব্যক্তিগত বা দলগত উৎকেন্দ্রিকতার আল্‌গা সূতা যথাসম্ভব একটি পরিচ্ছন্ন বিন্যাস-কৌশলে বাঁধা পড়িল। সু-মিত রুচি সুবিন্যস্ত সমাজ-সংস্থারই ফল। বাঙালীর ধর্মভাব, ভক্তিপরায়ণতা, শাক্ত, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে সমন্বয়, আচার-নিষ্ঠা, দেবমন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপে পবিত্রভাবপূর্ণ পরিচ্ছন্নতার আদর্শ, ঘর-বাড়ির

শ্রী, আহার-বিহারে সাত্ত্বিকতা, প্রসন্ন চিত্তের প্রাণখোলা হাসি ও প্রাকৃত মনের উদ্ভট, অথচ সরল, অ-শালীন আমোদ, আলপনা-পট-মৃৎশিল্প প্রভৃতিতে সহজ শিল্পদক্ষতা ও বস্ত্রবয়ন-শিল্পে বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের অসাধারণত্ব—এই সব মিলিয়া বাঙালীর মানসরুচি সুদৃঢ় বৈশিষ্ট্য অর্জন করিল। এখনও ধর্মের মৃদু ও সহৃদয় নিয়ন্ত্রণ কুসংস্কারের লৌহবন্ধনে পরিণত হয় নাই ও উহার সহিত স্বাভাবিক চিত্তস্ফূর্তি ও সৌন্দর্যপ্রীতির কো- আপোষহীন বিরোধ জাগে নাই। সামান্য মতবিরোধ উৎকট স্বার্থপরতাদুষ্ট দলাদলিতে আবিল হইয়া উঠে নাই, যদিও ধনপতি সদাগরের পারিবারিক ব্যাপারে তাহার জ্ঞাতিবৃন্দের হস্তক্ষেপ ও ভাঁড়ু দত্তের কৌলীন্যাভিমানে এই কুখ্যাত পরিণতির অঙ্কুর উন্মেষিত হইয়াছে মনে হয়। চৈতন্যদেব অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পরিকর-গোষ্ঠীর প্রেমধর্ম-প্রচার ও সংমাজসংগঠন-প্রতিভা বাঙালীর মনে এক অপূর্ব পুলকরস ও জীবনে আশাবাদ ও আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার করিয়াছে। পদাবলী-কীর্তনের মধুর সুরহিল্লোলে বাঙলার আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ; পদাবলী-রচনার শ্রেষ্ঠ যুগ অবসিত হইয়াছে, কিন্তু উহার পরিবেশন ভক্ত ও সাধক-গোষ্ঠীর সঙ্কীর্ণ মণ্ডল অতিক্রম করিয়া সর্বসাধারণের মনের দুয়ারে আসিয়া পৌছিয়াছে। সব দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাই প্রাক্-আধুনিক বাঙালী জীবনের শ্রেষ্ঠ যুগ। এই যুগেই বাঙালীর রুচিবোধ তাহার সমগ্র জীবনাদর্শের পরিণত ফলরূপে অপূর্ব সুষমায় বিকাশ লাভ করিয়াছে। তাহার জীবনবৃক্ষে মাঝে-মধ্যে দুই একটা শুষ্ক ডাল ও বিবর্ণ পীতায়মান পত্র দেখা দিলেও, এখন প্রাণরসপূর্ণ সবুজের সমারোহ!

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি এই পরিপূর্ণ প্রাণপ্রবাহে ভাটা পড়িতে লাগিল ও রুচিবিকার-চিহ্ন প্রকট হইয়া উঠিল। এই যুগে মুসলমানী বিলাস-ব্যসন, আদব-কায়দা ও ইন্দ্রিয়ভোগ-লোলুপতা বাঙালী জীবনে বদ্ধমূল হইল। কাব্যে ভক্তির ক্ষীণ আবরণের মধ্যে কামকলাবিলাস প্রধান হইয়া দেখা দিল। বৈষ্ণব ভক্তিবাদ স্রোতোহীন হইয়া কতকগুলি কুৎসিত, সমাজবিরোধী আচরণের বদ্ধ পঙ্কিল জলাশয়ে পর্যবসিত হইল। শাক্তধর্মে মাতৃপূজার নূতন আবেগ স্ফুরিত হইলেও ইহা ইন্দ্রিয়াসক্ত সমাজের মানস প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বেশীদিন জীবনীশক্তি অক্ষুন্ন রাখিতে পারিল না। যে রামপ্রসাদ এই মাতৃমন্ত্রের প্রধান উদ্গাতা তিনিই আবার বিদ্যাসুন্দরের

অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ আখ্যানধারার অন্যতম বাহক। যখন কোন বিরাট ভাবধারা বা অধ্যাত্ম-কল্পনা প্রাণহীন ও প্রথাসর্বস্ব হইয়া পড়ে, তখনই ইহার আনুষঙ্গিক দেহবাদের স্থূল রূপকের আবরণ ভেদ করিয়া নিজ স্বভাব-বীভৎসতায় প্রকটিত হয়। বৈষ্ণব সহজিয়াতত্ত্ব ও তান্ত্রিকের পঞ্চ'ম'কার-সাধনা এই ধর্মাদর্শ-শোধিত কাম-গরলের পুনরুপচিত বিষক্রিয়ার নিদর্শন। এ যেন সাপ-খেলানো বেদের সাপের কামড়েই প্রাণ হারাইবার মত ব্যাপার। তা ছাড়া, বাংলা কাব্য ও জীবনে এই প্রথম নাগরিকতার কৃত্রিম-দুষ্ট রুচির প্রকাশ ঘটিল। কৃষ্ণনগর রাজসভার কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার অনুপম শব্দ-ইন্দ্রজাল, ছন্দ-লালিত্য ও প্রকাশ-পরিপাট্যের সাহায্যে, চটুল হাব-ভাব-ভঙ্গীতে, বঙ্কিম কটাক্ষে, প্রবৃত্তি-উদ্রেককারী ইঙ্গিত-সঙ্কেতের সুষ্ঠু সমাবেশে এই বিলাসকলাচাতুর্যকে সারস্বত মন্দির-বেদীতে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভারতচন্দ্র নিজে যে এই দুষ্ট রুচির প্রবর্তক, অথবা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে ইহার আদি প্ররোচক এ কথা ভাবিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচারই করা হয়। সমাজমনে যে সত্যোধর্মশাসনমুক্ত আদিরসের প্লাবন বহিতেছিল, নবাব-দরবার হইতে উদ্ভূত কলুষিত জীবন-নীতির যে আপাত-সুরভি বায়ুপ্রবাহ সমস্ত স্বৈরাচারী, ভোগব্যসনাসক্ত ভূস্বামীর রাজসভায় জনচিত্তকে মোহবিবশ করিয়া তুলিতেছিল, ভারতচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র সেই সার্বভৌম মানসপ্রবণতারই দুইটি উৎসার-বিন্দু। রাজসভার সম্ভ্রান্ত পরিবেশে প্রতিভাবান কবির কণ্ঠে যে চিত্তবিভ্রমকারী, মোহময় সুর ধ্বনিত হইতেছিল তাহারই নানা বিকৃত রূপ, নানা বীভৎস অতিরঞ্জন, নানা রুচিহীন, শালীনতাহীন অনুকরণ হাটে-মাঠে, দেশব্যাপী গ্রাম্য আসরে প্রতিধ্বনি তুলিতে লাগিল। বাঙালীর রুচি-বিপর্যয়ের বোধ হয় ইহাই নিম্নতম পতনসীমা।

(৩)

আমরা এই বার ইংরাজী আমলের প্রারম্ভিক প্রান্তসীমায় পৌছিলাম। ইহার প্রথম ফল হইয়াছিল রুচিবিভ্রান্তিকে আরও ঘনীভূত করা। যখন পুরাতন আদর্শ ও সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া কামায়নের বন্যা দেশকে প্লাবিত করিতে চলিয়াছে, তখন সম্পূর্ণ নূতন এক বেগবান স্রোতোধারা উহার সহিত মিশিয়া আমাদের রুচি ও শালীনতাবোধকে যে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিবে ইহাই স্বাভাবিক।

যখন আমরা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত কামরসায়ন-সেবনে নেশাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি, তখন তাহার উপর উগ্র বিলাতী মদিরা-পান যে আমাদের ভারসাম্য ও সঙ্গতিবোধকে আরও বিচলিত করিবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও উদ্দাম ভোগলালসা প্রাচীন সমাজে রূপকের আশ্রয়ে ও ধর্মসাধনার ছদ্মবেশে নিজ কুণ্ঠিত প্রকাশের উপায় খুঁজিতেছিল, তাহা ইংরেজী শিক্ষার উত্তেজনায়, তথাকথিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার দাম্ভিকতায় আরও নগ্ন, বেপরোয়াভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। যে দুর্নীতি আভ্যন্তরীণ শোষণ-ক্রিয়ার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতেছিল তাহা বিদেশীয় বাণিজ্যের দেশব্যাপী প্রসারের আনুকূল্যে, ইংরেজ বণিকের রাজশক্তি-সমর্থিত ব্যবসায়ের অবাধ অবসরে আকাশস্পর্শী বিষবৃক্ষের ন্যায় সমস্ত জাতীয় জীবনকে আচ্ছন্ন করিল। ইংরেজ-বাঙালীর এই বাণিজ্যিক সহযোগিতার প্রথম ফল দেশী মুৎসুদ্দি ও বেনিয়া-দালাল; খানিকটা সময়ের ব্যবধানে ও কিছু ইংরেজী শিক্ষার হাওয়া গায়ে লাগাইবার পর, ইহার দ্বিতীয় ফল দাঁড়াইল 'বাবু'-সম্প্রদায়। কলিকাতার অনেক অভিজাত পরিবারে প্রথম পুরুষের বাণিজ্য-সহায়ক দালাল দ্বিতীয় পুরুষে সংস্কৃতি-ধ্বংসী আলালের ঘরের দুলালে পরিণত হইল। এই বেনিয়া-বাবুর প্রাসাদের বৈঠকখানায় কবিগান, তর্জা-খেউর, আখড়াই—হাফ্-আখড়াই, বিদ্যাসুন্দর-জাতীয় যাত্রা-গান, পোষা বিড়ালের বিবাহ ও বুলবুলির লড়াই, সুরা-সঙ্গীতের স্রোত, নর্তকীর নূপুর-নিক্বণ ও মদমত্তকণ্ঠোত্থিত চীৎকার-কোলাহলের স্থায়ী আসর প্রতিষ্ঠিত হইল। হয়তো এই আসরে কিছু ভাল জিনিসেরও বীজ উপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু আগাছার জঙ্গলে এই শুভসূচনার অঙ্কুরটি আবিষ্কার করাও সে যুগে দুঃসাধ্য ছিল। বর্ষার প্রথম জলে অকর্ষিত ক্ষেত্রে জঙ্গলের মত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সমাজ-সংসর্গের প্রথম স্পর্শে বাঙালী তরুণ সম্প্রদায়ের মনে রুচিবিভ্রম ও অশিষ্টাচার উদ্দাম হইয়া উঠিল। ইহার বিপরীত দিকও একটা ছিল, কিন্তু ইহার প্রকাশে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল; ঘোলা জল থিতাইতে অন্তত অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী ফিল্টার-ক্রিয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল।

রুচিবিভ্রমের স্থূল হস্তাবলেপ যুগের সাহিত্যে ও সমাজ-চিত্রে সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত আছে। কবিগানের বড় বড় কলঙ্ক-চিহ্নগুলি কালের শ্বেতচূর্ণ-প্রক্ষেপে প্রায় বিলীন হইয়াছে। কুরুচিকীটদষ্ট জীর্ণ পাতাগুলি আপনা-আপনি খসিয়া

পড়িয়াছে ; তথাপি সমসাময়িক সাক্ষ্য ও জনশ্রুতি হইতে আমরা কলঙ্কচিহ্নের গভীরতা সম্বন্ধে অনেকটা অনুমান করিতে পারি। ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁহার কলেজীয় শিষ্যগোষ্ঠীর রচনা, আলালের ঘরের দুলাল, হুতুম প্যাঁচার নকশা দীনবন্ধুর নাটক প্রভৃতির মধ্যে এই রুচিহীনতার কাল দাগ রেখা টানিয়া গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সংস্কার-প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু সংস্কার করিতে গিয়াই ইঁহারা কাদা ঘুলাইয়া তুলিয়াছেন ; রুচিহীন আক্রমণের দ্বারা কুরুচিপূর্ণ প্রথাগুলিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন।

অবশ্য এই যুগেই স্থরুচির নূতন আদর্শ রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নীতিবোধপূর্ণ রচনা ও জনকল্যাণমূলক সমাজ-চেতনার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এই রুচিবোধ দৃঢ়তর হইল ও রবীন্দ্রনাথে আসিয়া ইহা এক আদর্শলোকের শ্রী ও সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিল। তথাপি মনে হয় যে, এই সমস্ত প্রতিভাবান লেখক সাহিত্য-কৃতির উপর যতটা গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের রুচির উপর ততটা পারেন নাই। আমরা বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথকে পূজা করিয়াছি, কিন্তু উপভোগ করিয়াছি সাময়িক-আবেদনযুক্ত ব্যঙ্গরসিক-গোষ্ঠীকে। পঞ্চানন্দ, অমৃতলাল বসু, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সুরেশ সমাজপতি—ইঁহাদেরই অমার্জিত রসিকতা ও তীক্ষ্ণ আঘাত-নৈপুণ্যই সাধারণ বাঙালীর রুচিনিয়ামক হইয়াছে। আমরা সাধারণ কথাবার্তায় বা বিতর্কমূলক আলোচনায় বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সমুন্নত, সূক্ষ্মরুচিসম্পন্ন আদর্শের অনুসরণ করি না, মাঝারি স্তরের শ্লেষ-রচনার তীব্র ঝাঁঝযুক্ত, রসনারোচক বাগ্‌ভঙ্গী ও মেজাজেরই অনুবর্তী হই। ঋষি ও কবি আমাদের মাথায় থাকেন, কিন্তু পালোয়ান-লাঠিয়াল-জাতীয় লেখকেরাই আমাদের মানস সমর্থনের অর্ঘ্য আদায় করেন। ব্রাহ্মসমাজের নীতিবায়ুগ্রস্ত অতিসতর্ক-শুচি রুচিকে হয় আমরা দূর হইতে নমস্কার জানাই, না হয় বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করি। উত্তানপাদ রাজার দুই মহিষীর মত সুনীতি ও সুরুচির মধ্যে প্রায়ই সপত্নী-সম্পর্কই দেখা যায়—নীতিকে সুয়োরাণী করিলে রুচিকে দুয়োরাণীর পর্যায়ে থাকিতে হয়। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আমাদের সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্ত ও আদর্শ-স্বপ্নকে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু সাহিত্যের প্রতি যতটা অন্তরঙ্গ অনুরাগ থাকিলে

উহাকে আমরা জীবন ও রুচির নিয়ামকত্বের মর্যাদা দিতে পারি, ঠিক ততটা অনুরাগ বোধ হয় আমাদের নাই। তাই হয়তো সাহিত্যে এককে কেন্দ্র করিয়া একটা গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে, প্রতিভার এক দীপ হইতে অন্য সমধর্মী দীপে আলোক সংক্রামিত হয়, কিন্তু সংযোগসূত্রহীন সাধারণ মানুষের মনে, দীপহীন প্রত্যন্ত-প্রদেশের অন্ধকারে কোন আলোকরশ্মির বিকিরণ অনুভূত হয় না।

দুই বিশ্বযুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে আমাদের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাহাতে যে সুস্থ ও সামগ্রিক জীবনবোধ রুচির স্থির প্রতিষ্ঠা-ভূমি তাহাতেই ভাঙ্গন ধরিয়াছে। এখন বিরাট সমস্যার সম্মুখীন মানবজীবনে রুচির প্রশ্ন খুব গৌণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেখানে হিংস্র প্রতিযোগিতা ও নির্মম আত্মপ্রতিষ্ঠা জীবনসংগ্রামে টিঁকিবার একমাত্র উপায়, যেখানে নীতি-বোধ ও ন্যায়নিষ্ঠাও অনাবশ্যক বোঝারূপে জীবনের অগ্রগতিকে ভারাক্রান্ত করে বলিয়া মনে হয়, সেই পরিস্থিতিতে রুচি জীবনযাত্রার উপরকার পালিশ ছাড়া আর কোন গভীরতর তাৎপর্য-দ্যোতক মর্যাদা পায় না। এখন সাহিত্য জীবনে কোন নূতন আদর্শের সন্ধান দেয় না, বাস্তব জীবনের বিভ্রান্তি, নৈরাশ্যবোধ ও করুণ অসহায়ত্ব প্রতিফলিত করে মাত্র। এই সাহিত্য হইতে কোন অভিনব ছন্দবোধ-প্রসূত রুচি-সুষমা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। এই যুগে যে কয়টি নূতন ভাবাদর্শ আমাদের মনকে ঈষৎ আবেগাতুর করিয়া তুলিতেছে —যথা বিশ্বমানবতাবাদ, শান্তির জন্য আকৃতি, বিড়ম্বনাময় জীবনের জন্য ক্ষুব্ধ অনুযোগ ও সুন্দরতর জীবনের জন্য এক প্রকারের ধোঁয়া ধোঁয়া স্বপ্নাকুলতা—তাহারা কল্পনাবিহার হইতে মর্ত্যজীবনের সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে অবতরণ করে নাই। তাহারা আমাদের জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে নাই, কাজেই তাহারা আপাতত কোন নূতন রুচিবোধের ভিত্তিভূমি রচনা করিতেও অসমর্থ। চন্দ্রলোকে রকেট পৌঁছিয়াছে, রক্তপতাকাও প্রোথিত হইয়াছে, কিন্তু নিবিড় মায়া-মমতা-ঘেরা গৃহ-নীড় এখনও রচিত হয় নাই।

(৪)

সুতরাং রুচি এখন বহিরঙ্গমূলক পারিপাট্যবোধের নিদর্শন, অন্তরের নির্মল শুচিস্নিগ্ধতার নহে। সাহিত্যে শব্দঘটিত অশ্লীলতা নাই সত্য, কিন্তু নারী-

রূপের মোহ ও যৌনচেতনা প্রায় সর্বত্রসঞ্চারী। ইহার উপর একটা বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধিৎসার আবরণ দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ ও আবেগহীন দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা নারী-পুরুষের স্বৈরাচারী প্রবৃত্তিচরিতার্থতা ও দাম্পত্যবন্ধনচ্ছেদী প্রেমবিলাসের যুক্তি ও হৃদয় দিয়া সমর্থনই বেশী প্রকট হইয়াছে। আজকাল যে ছায়াচিত্রে আমাদের জীবনের স্বপ্নস্বর্গ প্রতিবিম্বিত হইতেছে তাহাতেই আমাদের সৌষ্ঠবের রুচি—দাবির শূন্যগর্ভতা প্রমাণিত। সমাজ-জীবনে বাহ্য সৌজন্য ও শিষ্টাচার যেটুকু দেখা যায়, তাহার মধ্যে আন্তরিকতার পরিমাণ খুব বেশী নহে। পরিবার-জীবনের ভাঙ্গনের মধ্যে, যৌথ সংসারের বিলোপের মধ্যে, আত্মকেন্দ্রিকতার সংকীর্ণ পরিধিতে রুচি বাহির ছাড়িয়া অন্তরে প্রসারিত হইবার সুযোগ পায় না। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমরা আর যাহা শিক্ষা দিই, মার্জিত রুচি তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে। এমন কি আমাদের পবিত্রতম অনুষ্ঠান পূজা উপলক্ষ্যেও আমরা প্রতিমার সাজ-সজ্জা ও পূজামণ্ডপের মণ্ডনবিধান ছাড়া আর কোন উন্নততর রুচি-আদর্শের পরিচয় দিতে পারি না। কোন সাংস্কৃতিক উৎসবের সুন্দর, সু-মিত ও উপলক্ষ্যের সহিত প্রাণ-সংযোগময় আয়োজন ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। আমাদের বেশ-ভূষা, ঘর-সাজানো, গৃহনির্মাণ-পরিকল্পনাতে অবশ্য সৌন্দর্য-নিষ্ঠার পরিচয় মিলে, কিন্তু এগুলি অনেকটা বিদেশী রীতির অনুকরণ, আমাদের ব্যক্তিগত মৌলিক সৌন্দর্যবোধ হইতে ইহাদের উদ্ভব হয় নাই।

নন্দনতত্ত্ব-সম্মত, চারুকলার মর্মগ্রাহী যে রুচি ও রসবোধ সাহিত্য ও শিল্পের উৎকর্ষবিধানের প্রধান সহায় তাহা এক সংকীর্ণ বিশেষজ্ঞ-গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, শিক্ষিত সমাজে তাহার ব্যাপক প্রসারও দুর্নিরীক্ষ্য। কাব্য-সাহিত্যে সংযত আবেগ ও অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস, মণ্ডনকলার পরিমিতি ও মাত্রাধিক্য, সূক্ষ্ম অন্তঃসঙ্গতি ও কৃত্রিমভাবে আরোপিত সৌন্দর্যবিন্যাস এবং চিত্রকলায় গাঢ় বর্ণপ্রলেপ ও রং ও রেখার সুমিত প্রয়োগে অন্তরাত্মার প্রকাশ, চোখভুলানো চমক ও মনের গভীরে আবেদনবাহী সরলতা—ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আমাদের অসম্পূর্ণ-অনুশীলিত রুচি-সংস্কারের নিকট সহজে ধরা পড়ে না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ও কলাসৃষ্টির সঙ্গে যে সুগভীর, অন্তরঙ্গ পরিচয় রুচির বিশুদ্ধি-সাধনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই আছে। এই শ্রেষ্ঠত্বের শানে বারে বারে ঘষিয়া না লইলে

নির্বিচার ব্যবহারে ভোঁতা-হইয়া-পড়া রুচি ধারাল ও উজ্জ্বল হয় না। সঙ্গীতবোধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রভাব সত্ত্বেও আমাদের অনুভব যথেষ্ট সংবেদনশীল হয় নাই—যে কোন সস্তা সুরে গাওয়া আধুনিক সঙ্গীতকে গলাধঃকরণ করিতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত। সুরের অভিজাত কৌলীন্য ও তরল, অলঙ্কার-বাহুল্যে বর্বর, মর্যাদাহীন সুর—ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয়টিই সমধিক জনপ্রিয় ও আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিকতর দাক্ষিণ্যে অভিনন্দিত। শ্রেষ্ঠ-মাঝারি, ভাল-মন্দর মধ্যে পার্থক্য যে পর্যন্ত আমাদের সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট স্বতস্ফূর্তভাবে প্রতিভাত না হইতেছে, সে পর্যন্ত আমরা রুচিবিষয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারি না।

মোট কথা, আমরা এখন এক যুগসন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছি। আধ্যাত্মিকতা ও ঐহিকতা, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এই উভয়বিধ আদর্শের বিপরীত আকর্ষণে আমাদের জীবনবোধ ও সৌন্দর্যবোধ অস্থিরভাবে আন্দোলিত হইতেছে। ছন্নছাড়া, উৎকেন্দ্রিক, ক্ষণিক-আবেগতাড়িত জীবনে রুচিও দাঁড়াইয়াছে মুহূর্তের উত্তেজনার পেয়ালায় চুমুক দেওয়া, হঠাৎ-আঁকড়াইয়া-ধরা রঙীন আবেশের স্বপ্নাতুরতা, সব-ভুলাইয়া-দেওয়া বিচিত্র অনুভূতির লোলুপ রস-আস্বাদন। আমরা অতীতের অনেক কুসংস্কার ও রুচি-বৈকল্য বর্জন করিয়াছি, কিন্তু অখণ্ড জীবনবোধ হইতে উদ্ভূত কোন নূতন রুচিসংশ্লেষ বা প্রতীতি-সংস্কার গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। এই নৈরাজ্যের যুগের যে শীঘ্র অবসান হইবে এমন সম্ভাবনাও সুদূর মনে হয়। কেননা আমরা আমাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্যের আবিষ্কার ও অনুশীলন করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নহি। সব জাতীয় নদী আন্তর্জাতিকতার মহাসমুদ্রে মিশিবে বলিয়া আমরা পূর্ব হইতেই মন স্থির করিয়াছি। সুতরাং সেই মহাসমুদ্রের বর্ণচিহ্নহীন মোহানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রুচি-নির্ণয়ের দায়িত্ব সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপরেই ন্যস্ত করিয়াছি। রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী—সব লাল হো যাগা—আমাদের জীবনে পূর্ণ হইলে তাহাতে আমাদের ও সমগ্র মানবজাতির সত্য সত্যই কল্যাণ হইবে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

ভারতে বৌদ্ধধর্মের ভবিষ্যৎ

(১)

জগৎপূজ্য অবতারসমূহের আবির্ভাব ভগবানের স্বেচ্ছাস্ফুরিত করুণাপ্রসূত—ইতিহাসের কোন কার্যকারণ-শৃঙ্খলায় ইহার রহস্যকে বাঁধা যায় না। তথাপি যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবেশে এই আবির্ভাব ঘটে তাহার সূক্ষ্ম, অনির্দেশ্য প্রেরণা হয়ত কতকটা ইহার মধ্যে অনুস্যূত থাকে। ভগবান যুগের কোন বিশেষ প্রয়োজন-সাধনের জন্যই অবতীর্ণ হন; হয়ত যুগ এ সম্বন্ধে 'সচেতন' নহে। ভগবানের নিজের মুখের বাণী—অধর্মের প্রাদুর্ভাব-খণ্ডন, ধর্মের গ্লানিমোচন ও ইহার নবরূপে সংস্থাপন তাঁহার অবতারের উদ্দেশ্য। তাঁহার কাজ শেষ হইয়া গেলে আমরা তাঁহার আবির্ভাবের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে বিশ্ববিধানের কোন্ শূন্যতা পূর্ণ করিবার জন্য এই অবতরণ তাহা সঠিকভাবে পূর্বনির্ধারণ করা যায় না। পৌরাণিক যুগে দেবগণের সনির্বন্ধ অনুরোধ ও অসুরভারপিষ্টা ধরিত্রীর কাতর আবেদন ভগবানকে নির্বিকল্প সমাধি হইতে মরজগতের দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্যে অবতীর্ণ করাইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে যে যে অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে—বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য—ইহাদের কার্যকলাপ অলৌকিক হইলেও ইহাদের অবতরণ-হেতুকে সম্পূর্ণভাবে অলৌকিক ভাব-পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নহে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইতিহাসের আকর্ষণ ইহাদিগকে দেবলোকচ্যুত করিয়াছে ও ইতিহাস-রচিত স্থানকালের আধারে ইহাদের লীলারস বিধৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের নবধর্ম-প্রতিষ্ঠার পটভূমিকারূপে যুগপরিচয় সম্বন্ধে অবহিত হইবার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে প্রাচীন হিন্দুধর্মের কিরূপ গ্লানি বা অবসাদ আসিয়াছিল অথবা তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন কিরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল তাহার কোন স্পষ্ট চিত্র কল্পনা করা দুরূহ। ভক্তকবি জয়দেব দশাবতার-চক্রের মধ্যে বুদ্ধদেবের স্থাননির্ণয়প্রসঙ্গে বৈদিক হিন্দুধর্মের মধ্যে ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাধান্য ও পশুবলিদানের নিষ্ঠুরতাকে এই অবতারের কারণরূপে

নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রায় দেড়হাজার বৎসর পরে রচিত এই ভক্তিরসপ্লাবিত কাব্যখানিতে ঠিক ঐতিহাসিক যাথার্থ্য কতদূর অনুসৃত হইয়াছে ইহা বলা কঠিন। বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান বা পূজা-উপলক্ষে পশু-উৎসর্গের প্রথা হয়ত বুদ্ধের উদ্ভবের পূর্বেই প্রকৃত অধ্যাত্ম-তত্ত্বান্বেষী ধর্মবিদদের চক্ষে খানিকটা বহিরঙ্গমূলক বলিয়া প্রতিভাত হইতে আরম্ভ হইয়া থাকিবে। উপনিষদগ্রন্থগুলির মধ্যেও পরমতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে—উহাদের মধ্যে ক্রিয়াকাণ্ড অপেক্ষা তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও বাহ্য অনুষ্ঠানের অপেক্ষা অন্তর্মুখী ধ্যানদৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপাদিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব-প্রচারিত মতবাদের মধ্যে এই ঔপনিষদিক সাধনা-প্রকরণের ক্রমপরিণতি ও সম্প্রসারণ দেখা যায়। সুতরাং বুদ্ধধর্ম বৈপ্লবিক নহে, সংস্কারাত্মক। অনির্বচনীয় ও অনুভবাতীত ভগবৎ-তত্ত্বের আলোচনায় শক্তি ক্ষয় না করিয়া ইহা প্রজ্ঞা ও ধ্যানের সাহায্যে বাসনা-বিলোপ ও চিত্তস্থৈর্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে ও বিশুদ্ধ, সংযত, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যহীন ও করুণাস্নিগ্ধ আচরণের দ্বারা দুঃখনিবৃত্তির উপদেশই ইহাতে প্রধান স্থান পাইয়াছে।

হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ বা রাষ্ট্রনৈতিক কোন প্রচণ্ড আলোড়ন বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পিছনে কতটা ক্রিয়াশীল ছিল তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়া গেলেও কর্মকাণ্ডমূলক ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে যে একটা সংশয়ের ভাব জাগিয়াছিল ও ধর্মপিপাসু জনের চিত্ত যে একটা পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হইয়াছিল ইহা অনেকটা নিঃসন্দেহ। বৌদ্ধধর্ম এই অসন্তোষ ও পরিবর্তনস্পৃহারই পরিণতিস্বরূপ উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহার প্রচার ও প্রসারের মূলে ছিল বুদ্ধদেবের মহিমামণ্ডিত জীবনাদর্শ ও বৈরাগ্যব্রতে দীক্ষিত সংঘগুলির দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণা। ভগবান তথাগতের অনুপম চরিত্র-মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া শত শত শিষ্য ও ভক্ত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সমস্ত সমাজের মধ্যে তাঁহার অনুশাসিত জীবননীতি ও অধ্যাত্ম-চর্চাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—জড়বাদ, বিষয়স্পৃহা ও রিপু-পারবশ্যের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম চালাইবার উদ্দেশ্যে ধর্মানুশীলনের সুরক্ষিত দুর্গ-সমূহ প্রতি কেন্দ্রে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার সঙ্গে রাজশক্তির সম্পূর্ণ আনুগত্য ও অকুণ্ঠ আনুকূল্য যুক্ত হইয়া এই নব-প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে এক

বিরাট বিশ্বধর্মে পরিণত করিয়াছিল। ইহার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা ও শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া দেশ-বিদেশে অভিযান চালাইয়াছিল ও বুদ্ধের অমৃতময়ী বাণীর প্রসাদ সমগ্র এসিয়াতে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রায় অর্ধ-পৃথিবীর উপর বৌদ্ধ-ধর্মের শান্তি ও করুণার শুভ্র বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল।

(২)

মনুষ্যজীবনের দুরতিক্রম্য অভিশাপ এই যে ইহাতে অধিগত ও অনুশীলিত সত্যেরও প্রভাব কালক্রমে ম্লান ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। যে অধ্যাত্ম জ্যোতির প্রদীপ একদিন বহু সত্যদর্শী ঋষি ও সত্যধর্মাশ্রিত সাধারণ মানুষের মনে উজ্জ্বল শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, ইন্ধন-প্রেরণার অভাবে তাহা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়। পূর্ব বাণীর আবৃত্তি, পূর্ব অনুষ্ঠানের নিখুঁত অনুবর্তন সেই পুরাতন অনুভূতিকে জাগাইতে পারে না। চিত্তের গ্রহণশীলতা কমিয়া যায়, পারিপার্শ্বিকের দাক্ষিণ্য প্রতিকূলতায় বা ঔদাসীন্যে পরিবর্তিত হয়। আবেগের একাগ্রতা নানা বিরোধী ভাবের সমাবেশে বহুধা-বিভক্ত হইয়া পড়ে। নূতন লক্ষ্য ও আদর্শের বিভ্রান্তি সংশয়ের কুহেলিকাজাল বিস্তার করে। মনের কতকগুলি তারে মরীচা ধরিয়া গিয়া, উহাদের পারস্পরিক যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া, উহার একমুখীনতা নষ্ট হইয়া যায়। অভ্যাসের জড়তা প্রথম অনুভূতির তীক্ষ্ণতাকে অভিভূত করে; অনুকরণের অঙ্গুলিস্পর্শে আর সেই পুরাতন সঙ্গীতমূর্চ্ছনা ধ্বনিত হয় না। সকল ধর্মের সম্মুখেই এই সমস্যা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

ধর্ম সম্বন্ধে এই যে একটি পরিবর্তন অনিবার্যভাবে ঘটিয়াছে তাহার কারণগুলি সত্যনিষ্ঠার সহিত বিবেচনা করা প্রয়োজন। যে ঐতিহাসিক আবেষ্টন ও অধ্যাত্মপ্রেরণার সহযোগে ধর্মের প্রথম উদ্ভব, বাহির ও অন্তরের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাহার প্রাণশক্তিকে কতটুকু জীয়াইয়া রাখা সম্ভব? যে ধর্মের আগুন নূতন করিয়া জ্বলে নাই, অথচ আচারের ভস্মস্তূপ যাহার চারিপার্শ্বে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার দীপ্তিবিকিরণ-শক্তি কতটুকু অবশিষ্ট আছে? আজ বুদ্ধিপ্রধান আলোচনার দ্বারা, সভা-সমিতিতে ধর্মকথায় প্রাণহীন পুনরুক্তির সাহায্যে কি তাহাকে মানুষের

অন্তরের নিয়ামক শক্তিরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাইবে? যে যে উপাদানে ধর্মের কায়া ও অন্তরাত্মা গঠিত হইয়াছিল তাহারা কি সুদীর্ঘ যুগযুগান্তরের পর এখনও প্রাণধর্মে সঞ্জীবিত আছে? ইতিহাসের বিবর্তনের ফলে মানুষের মনে যে নূতন জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, যে নূতন জীবন-প্রেরণা তাহাকে বাহিরের অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির সহিত বোঝাপড়ায় প্রণোদিত করিতেছে, পথ চলিবার যে নূতন আগ্রহ, নূতন কর্তব্যের যে আহ্বান তাহার মানস বৃত্তিগুলিকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছে, প্রাচীন ধর্মের নিকট তাহার কতটুকু পরিতৃপ্তি বা নিবৃত্তি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? জীবন-নদীর প্রবাহ যদি ধর্মসেতুর তল হইতে সরিয়া গিয়া থাকে, তবে সেই সেতুকে অবলম্বন করিয়া কি পারাপারের ব্যবস্থা চলিবে?

যে কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিগত প্রভাব, তাঁহার অলৌকিক জীবনের প্রবল আকর্ষণই প্রধান কারণ। বুদ্ধদেবের করুণা-স্নিগ্ধ চরিত্র-মাধুর্য, তাঁহার ধর্মতত্ত্ববিষয়ক গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তাঁহার জীবন-নীতির তৃপ্তিপ্রদ, সর্বসমস্যাসমাধানকারী স্বয়ংসম্পূর্ণতা তাঁহার ধর্মমতকে লক্ষ লক্ষ লোকের অন্তর-নিয়ামক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ধর্ম যদি যুগমানসের স্বতঃউদ্ভূত প্রশ্নগুলির সদুত্তর দিতে না পারে, সমকালীন জীবনকে সমস্যাকণ্টকমুক্ত করিয়া উহাকে গভীর শান্তি ও সার্থকতাবোধের আনন্দে আপ্লুত না করিতে পারে, তবে ইহা পুঁথির পাতা ছাড়াইয়া মানবমনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের বাণী, আত্মসংযম ও শান্তির অনুশাসন বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত হইয়া যেরূপ অমোঘ প্রভাবশালী হইবে, তাঁহার অনুগামী ভক্ত-শিষ্যদের মুখে তাহার তদ্রূপ কার্যকারিতা থাকিবে না। সেই একই উপদেশের ভিতর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুরটি, নিঃসংশয় আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা পূর্বের ন্যায় ধ্বনিত হইবে না। গীতার ধর্মরহস্যব্যাখ্যার পিছনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপরূপলীলাময়, জ্ঞান ও কর্মের অপূর্ব সংমিশ্রণে মহিমান্বিত, জীবন-কাহিনীর প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের সত্যিকার উৎস তাঁহার বাচনিক উপদেশ নহে, তাঁহার লীলাভিনয়ে তন্ময়, কৃষ্ণানুভূতির জন্য উৎকণ্ঠাবিহ্বল, প্রেম-কারুণ্য-ধারায় অবিরত-সিক্ত জীবন-সাধনা। এই জীবন্ত ভাব-বিগ্রহের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্বেলিত

ভক্তিস্রোতে যে খানিকটা ভাটা পড়বে, তাহাদের আদর্শ যে খানিকটা শিথিল হইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী। ধর্মগুরুর স্মৃতি যতদিন উজ্জ্বল থাকে, শিষ্য-পরম্পরার ধর্মানুরাগ ও সংঘ-সংগঠন-শক্তি যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকে, ততদিন নব-প্রতিষ্ঠিত ধর্মও মানবচিত্তের উপর নিজ প্রভাব জীয়াইয়া রাখে। কিন্তু কালক্রমে প্রত্যক্ষ অনুভূতির আলোক-উৎস হইতে ধর্ম-সম্প্রদায়গুলি যতদূরে সরিয়া আইসে, নূতন যুগের দাবী না মিটাইয়া যতই উহারা পুরাতন বাণীর পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, ততই উহাদের কার্যকরী শক্তি হ্রাস পাইয়া উহারা জীবনের সহিত সংযোগহীন হইয়া পড়ে। বুদ্ধ-কৃষ্ণ-চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম এখন এক একটি অন্তরঙ্গ সাধক-গোষ্ঠী ছাড়া আপামর-সাধারণের নিকট জীবনচর্যার বিষয় না হইয়া বুদ্ধিগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা নির্বিচার অভ্যাস-অনুবর্তনের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ধর্মের প্রভাব নির্ভর করে শুধু উহার নীতিগত বা অধ্যাত্মতত্ত্বের উৎকর্ষের উপর নহে, জীবনে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করার সাংগঠনিক আয়োজন ও জনচিত্তের প্রস্তুতির উপরও উহা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্তিত মধুররসপ্রধান ভাবাদর্শটি ভক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্র ও পুরাণের মধ্য দিয়া জনসাধারণের নিকট ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। তথাপি শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেই এ ভক্তি-ও-প্রেম-সাধনা প্রত্যক্ষরূপ না লইলে ও চৈতন্যপরিকরবৃন্দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার-চর্চার ভিতর দিয়া ইহা স্থায়িভাবে রক্ষিত না হইলে ইহার প্রভাব এত সার্বজনীন ও গভীরশায়ী হইত কিনা সন্দেহ। ভারতীয়, বিশেষ করিয়া বাঙালী হিন্দুমানসের স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিপ্রবণতা ও কোমল সংবেদনশীলতা এই ধর্মের প্রতি একটা প্রবল উন্মুখতার সৃষ্টি করিয়াছিল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের গীতাতত্ত্ব অনুরূপ সংঘশক্তি ও মানসপ্রস্তুতির দ্বারা সমর্থিত হয় নাই বলিয়া ইহা দার্শনিক গোষ্ঠী ছাড়াইয়া সাধারণ লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কুরুক্ষেত্রের নৃশংস পরিবেশ ও গীতার নিষ্কাম অনাসক্তি বাঙালীর চিত্তধর্মের অনুকূল ছিল না বলিয়াই গীতার স্থান হইয়াছে অনায়ত্ত আদর্শ-লোকে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নহে। গীতাতেও যে একান্ত শরণাগতি ও আত্মসমর্পণের নির্দেশ আছে, ভক্তির যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার শিলাস্তূপের ফাঁকে ফাঁকে বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইয়াছে, মধুর রসের প্লাবনে চিত্তকে ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই। কাজেই প্রচুর-

প্রবাহিত ভাবধারায় অবগাহন-স্নানের যে তৃপ্তি, আবেগস্রোতে জীবন-তরী ভাসাইয়া দিয়া সমুদ্র-সঙ্গমতীর্থে পৌঁছিবার যে নিশ্চিন্ত আরাম, গীতাধর্ম ভাবপ্রবণ বাঙালীকে তাহার অধিকারী করিতে পারে নাই।

(৩)

বৌদ্ধধর্মের সাধনা আরও দুরূহ; ইহা কোনদিনই কূলপ্লাবী ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেয় নাই। ইহার শান্ত, সংযত জীবনযাত্রা, জ্ঞান ও অনুভূতির স্থির আলোকে উদ্ভাসিত জীবনাদর্শ, প্রব্রজ্যা-শাসিত, বৈরাগ্য-বলয়িত সংসার-যাপনরীতি দৃঢ় নিয়মনিষ্ঠা ও পুনঃ পুনঃ অনুশীলিত প্রবৃত্তিনিরোধের উপর নির্ভর করে। ইহার দুর্লভ সিদ্ধির প্রমাণ বুদ্ধদেবের জীবনীতে মার-পরাজয়-রূপকে উদাহৃত হইয়াছে। তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীর আচরণে ত্রুটি ও স্খলন-প্রবণতা বুদ্ধদেবের অন্তর্যামিত্ব ও গভীর অধ্যাত্ম অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা বার বার আবিষ্কৃত ও ভর্ৎসিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের কার্যপ্রণালী ছিল মঠ-বিহার-সংঘারামের দেশব্যাপী শৃঙ্খলে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-ভিক্ষু-যতি-গোষ্ঠীর সুকঠোর তপস্যা ও আত্মনিগ্রহের বন্ধনে, সাধারণ মানুষের তরলিত ভাবাবেগ ও স্বাভাবিক সুখান্বেষণস্পৃহাকে সংযমিত করা। এই সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার কোন অংশে যদি কোন কল-কব্জা শিথিল হয়, কোথাও কোন রন্ধ্রপথ থাকিয়া যায়, চিত্তের স্বভাব-দুর্বলতা যদি কোন ছলে কোথায়ও প্রশ্রয় পায়, আদর্শ-অনুসরণের মধ্যে যদি কোথায়ও কিছু আত্মবঞ্চনা থাকে, তবে সমস্ত কৃচ্ছ্রসাধনই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ইতিহাসে ঠিক ইহাই ঘটিয়াছে, এই আশঙ্কাই সত্য হইয়া দেখা দিয়াছে। তুর্কী-অভিযানের পূর্ব-যুগে বৌদ্ধবিহারগুলি আদর্শচ্যুত হইয়া তান্ত্রিক অভিচার, ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস ও অসংখ্য দেবদেবীর কামনাকলুষিত, বিকৃত-ভাবপ্রেরণাসঞ্জাত পূজানুষ্ঠান প্রভৃতি উপাদানে ভারাক্রান্ত হইয়াছে ও উহাদের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুলাংশে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠান-দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবেশ ও মানস পরিস্থিতির পরিবর্তনও ধর্মের প্রভাব-হ্রাসকে আরও দ্রুততর করিয়াছে। এতদিন পর্যন্ত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনধর্মের বাস্তব অনুশীলনের ক্ষেত্ররূপেই কাজ করিতেছিল। পরিবারজীবনে স্বার্থত্যাগ, সৌভ্রাত্র, পারস্পরিক সম্পর্কে ভক্তি-

প্রীতি-স্নেহের প্রাচুর্য, আতিথেয়তা ও সদা-জাগ্রত ধর্মচেতনা গৃহস্থের ধর্মভাবকে প্রবুদ্ধ ও সক্রিয় রাখিয়াছিল। সমাজজীবনেও ধর্মের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া প্রত্যেকটি সামাজিক অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ প্রভৃতির আচরণ ব্যক্তিজীবনকে ধর্মপ্রবণ করিয়াছিল। উপাস্য দেবদেবীর করুণাস্পর্শ, সংসারাসক্তি হইতে মুক্তিলাভ, অধ্যাত্মবোধের স্ফুরণ জীবনের কাম্যতম লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। অবশ্য এই মুক্তিকামনা ও পারলৌকিক কল্যাণস্পৃহার মধ্যে কিছুটা মেকী বা আড়ম্বর থাকিতে পারে—ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইবার জন্য বহু-বিঘোষিত আকুতি যে সবটাই অকৃত্রিম ছিল তাহা না হইতেও পারে। কিন্তু তথাপি জীবনের এই প্রধানতম সার্থকতা মানুষের মনে সর্বদা জাগরূক থাকিত ও বহুক্ষেত্রে উহার কর্মপ্রেরণা যোগাইত। দীর্ঘকাল অনুশীলনের ফলে মানুষের সমষ্টিগত সংস্থাগুলি ধর্মবোধকে ধারণ করিবার আধাররূপে গঠিত হইয়াছিল। এখন কালের অভিঘাতে ও স্বার্থবুদ্ধি-প্রধান প্রবৃত্তির সংঘর্ষে এই সংস্থানগুলি ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে ও উহাদের ধর্মসাধনার উপযোগিতা হারাইয়াছে। এ অবস্থায় মানবের ধর্মবোধ পূর্বের মত প্রবল থাকিলেও জীবনচর্চার মধ্যে উহাকে পরিস্ফুট করার সুযোগ অনেক কমিয়া গিয়াছে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের আদর্শান্বিত পুনর্গঠন না হইলে প্রাচীন ধর্মের পূর্ব প্রভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব মনে হয় না।

আধুনিক যুগে মানবজীবনে যে ধর্মপ্রেরণা ও আদর্শবাদ বিলুপ্ত হইয়াছে ইহা সত্য নহে। তবে ইহার অন্তঃপ্রকৃতি ও বহির্বিকাশ উভয়ই যে গভীর-ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এখনকার ধর্ম-সাধনা হয় বিভিন্ন ধর্মগুরুকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত, নাতিবৃহৎ কয়েকটি শিষ্য-সম্প্রদায়াশ্রয়ী না হয় স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে জনসেবার মধ্যে ভগবৎ-স্বরূপ-আবিষ্কারে উন্মুখ। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে ধর্মের প্রাচীন ধারা খানিকটা বজায় আছে ইহা ঠিক ; কিন্তু সমগ্র জাতির জীবনের বৃহত্তর সত্তাকে ইহারা যে ঐক্যবোধে অনুপ্রাণিত করিতে, জাতির প্রধান প্রাণধারা ও কর্মোদ্যমের সহিত মিলিতে পারে নাই তাহাও সুস্পষ্ট। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সরোবরে হয়ত সুশীতল পানীয় সঞ্চিত আছে, কিন্তু বেগবান নদীপ্রবাহের মত ইহাদের বহিয়া যাইবার শক্তি নাই। বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগে অশোক, কণিষ্ক, হর্ষবর্ধন প্রভৃতি রাজচক্রবর্তীগণের সোৎসাহ সমর্থনে ও

রাজশক্তির পূর্ণ সহযোগিতায় ইহা সমগ্রজাতির সম্মিলিত জীবনস্রোতকে এক মহান আদর্শের সাগরসঙ্গমাভিমুখে চালিত করিয়াছিল। মঠ ও বিহারে কেন্দ্রীভূত হাজার হাজার সন্ন্যাসীর জ্ঞানচর্চা ও অধ্যাত্মসাধনার সূক্ষ্মতর নৈতিক প্রভাব গোটা জাতির চিত্তকে এক উর্ধতর ভাবলোকে স্থির রাখিয়াছিল। চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব ধর্ম রাজশক্তির আনুকূল্য ব্যতিরেকেও নিজ অন্তর্নিহিত শক্তি ও ভাবাবেগ-গভীরতার জন্য সারা দেশে একটা ভাবের প্লাবন আনিয়াছিল। আজ বৌদ্ধ মঠ ও বৈষ্ণবের আশ্রম সমাজ-জীবনের প্রধান ধারা হইতে বহুদূরে সরিয়া আসিয়াছে। কলকারখানার বিরাট যোজনব্যাপী বিস্তার, ঐশ্বর্যাড়ম্বর ও শক্তিদম্ভের বিলাসভূমি আকাশচুম্বী প্রাসাদের কাছে ইহাদিগকে কত ক্ষুদ্র, অসহায় ও নগণ্য বলিয়া মনে হয়। আজ ইহারা যুবশক্তির প্রাণোচ্ছলতা, ব্যবসায়ীর কর্মোদ্যম, জ্ঞানীর জীবনব্যাপী সাধনাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। পরপারের খেয়াঘাটে যে কয়েকটি রিক্তপ্রাণ, কর্মবিমুখ, ইচ্ছাশক্তিহীন ব্যক্তি জীবন-সায়াহ্নে আসিয়া পাথেয়-সঞ্চয়ের লোভে সমবেত হন, প্রধানতঃ ইহাদের লইয়াই ধর্মের কারবার। 'নায়ং আত্মা বলহীনেন লভ্যতে'—উপনিষদের এই উদাত্ত সতর্কবাণী আধুনিক যুগের কর্মজীবনে মর্মান্তিকভাবে উদাহৃত হইয়াছে।

(৪)

স্বাধীন ভারত নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং এই ঘোষণার দ্বারা শুধু প্রাচীন ধর্মগুলির আচার-অনুষ্ঠান হইতে নহে, উহার সূক্ষ্মতর ভাবপ্রেরণা হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। অবশ্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক-নিয়ন্ত্রণের জন্য ইহা বৌদ্ধ জীবনাদর্শ হইতে পঞ্চশীল নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ধর্মের সামগ্রিক অনুশীলন হইতে বিচ্ছিন্ন এই একক নীতি কার্যক্ষেত্রে কতকটা সার্থকতা লাভ করিবে তাহা সন্দেহের বিষয়। পঞ্চশীল সমগ্র বৌদ্ধ ধর্মচর্যার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অন্তর্জীবনের সাধনায় ও বহির্জীবনের কর্মনিয়মনে ইহা যুগপৎ প্রযুক্ত হইয়া উভয় ক্ষেত্রেই সমতুল্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এখন যাহা প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য—জীবনসাধনার ব্যাপারে কোন নীতি স্বীকার না করিয়া কেবল পররাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগের জন্য

আবেদন। যে অধ্যাত্ম অনুভূতি ও জীবনদর্শনের উৎস হইতে পঞ্চশীলের উদ্ভব, তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কেবল যুদ্ধ-বিভীষিকা-নিবারণের ব্যবহারিক প্রয়োজনে ইহার দোহাই পাড়া যে বিশেষ ফলপ্রদ হইবে, তাহা আশা করা যায় না। অন্তর হইতে হিংসার মূল উৎপাটন না করিয়া, হিংসার সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে অহিংসার জয়-ঘোষণা করা একটা কৃত্রিম প্রতিষেধক-রূপে ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ধর্মের সাধনা-সংযমকে অস্বীকার করিয়া শুধু উহার পরিণত ফলটুকু আত্মসাৎ করিবার আকাঙ্ক্ষা খুব সুস্থ বাস্তববুদ্ধির নিদর্শন নহে। যদি বিশ্বরাজনীতিতে পঞ্চশীলকে নিয়ামক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে যে জীবনানুভূতি ইহার উদ্ভবের মূলে ছিল, তাহাকেই সর্বজাতীয় নীতিবোধ ও কর্মপ্রেরণার মধ্যে অঙ্কুরিত করা প্রয়োজন। অদ্বৈতবাদের মূল কথা—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—পরস্বাপহরণের কৈফিয়ৎরূপে উপস্থাপিত করার মত হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর কানে পঞ্চশীল মন্ত্র শোনান ভাবের ঘরে চুরির দৃষ্টান্তরূপেই ইতিহাসের হিসাব-বইএ স্থান পাইতে পারে, এ আশঙ্কা অমূলক নহে।

আজ ভারতের প্রত্যেক ধর্মমতের মধ্যেই একটা নবজাগরণের উদ্যম, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। স্বাধীনতা-লাভের পর দেশের সমস্ত চিন্তাধারার ও কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে যে নূতন আশার আলোক উন্মেষিত হইয়াছে তাহার অরুণিমা সুপ্রাচীন ধর্মমতগুলির বিবর্ণ দেহ ও বিশীর্ণ আত্মার উপরও বিচ্ছুরিত হইয়াছে। এক একটা উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া দেশের সুপ্ত ধর্মবোধ আত্মানুসন্ধান ও আত্মপ্রসারের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। ভগবান তথাগতের মহাপরিনির্বাণের আড়াই হাজার বৎসর পরে বৌদ্ধ ধর্মের মহান ঐতিহ্য ও বিপুল কীর্তির কথা আমরা নূতন করিয়া স্মরণ করিতেছি। যে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে সেখানেও রূপান্তরিত হিন্দু-ধর্মের মধ্যে ইহার গোপন, অলক্ষ্য প্রভাব, হিন্দুর জীবনদর্শনে ইহার নিঃশব্দ পদসঞ্চার, সাহিত্যে ও শিল্পে ইহার অমর নিদর্শন, লৌকিক সংস্কার ও উৎসবের মধ্যে ইহার প্রচ্ছন্ন প্রকাশ—এ সমস্তই আমাদের সশ্রদ্ধ আলোচনা ও চমকপ্রদ আবিষ্কারের বিষয় হইয়াছে। যে সমস্ত স্বাধীন দেশে—যথা, চীন, জাপান, পূর্ব-উপদ্বীপসমূহ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে—এই ধর্মাবলম্বী বহু লোক বাস করে, সেখানেও ইহা জীবনযাত্রার মুখ্যপ্রেরণারূপে গৃহীত হইয়াছে

কিনা সন্দেহ; রাজনীতিতেও ইহার প্রভাব নাই বলিলেই চলে। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এই যে নবজাগ্রত কৌতূহল ইহা কি কেবল অতীতের সমাধি-ভূমিতে স্মৃতিভারমন্থর, স্বপ্নাতুর পাদচারণা, না দুর্দম জীবন-প্রেরণার পূর্বাভাস ও প্রস্তুতি? ইহা কি কেবল নিষ্প্রাণ চিত্রসৌন্দর্যের আধার হইয়া আমাদের মনের দেওয়ালে টাঙ্গান থাকিবে, না জীবনপথের পাথেয় হইয়া আমাদিগকে অগ্রগতিতে প্রোৎসাহিত করিবে? ইহা কি কেবল দগ্ধাবশেষ অতীতের ভস্ম-বিভূতিতে মানসিক প্রলেপ-রচনা না, ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করার আন্তরিক অভিলাষ?

আজ ধর্মবোধহীন, সাধনা-সংযমভ্রষ্ট পৃথিবী উদ্‌ভ্রান্ত, লক্ষ্যহীন গতিতে সর্বনাশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। আধুনিক মারণাস্ত্রের বিস্ফোরণ-শব্দ সেই সর্বধ্বংসী প্রলয়ের ভয়াবহ-ইঙ্গিতবাহী। মানুষের মানবিকতাবাদ, স্বাধীনতার মূল্যবোধ, তাহার কাব্য-দর্শন বিজ্ঞান, এমন কি তাহার আত্মরক্ষার সহজ সংস্কারও তাহার এই আত্মঘাতী নেশা ছুটাইতে পারিতেছে না। একমাত্র যে অধ্যাত্মশক্তি তাহাকে এই সঙ্কটমুহূর্তে রক্ষা করিতে পারিত,—সেই 'একো এব সুহৃদ্‌ধর্মঃ নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ'—আজ তন্দ্রাচ্ছন্ন, নিষ্ক্রিয়, শোভাযাত্রায় ও চিত্রসৌন্দর্যে মুগ্ধ, আপনার পূর্ণশক্তি সম্বন্ধে অচেতন। শ্রীঅরবিন্দ দিব্য জীবনের সাহায্যে মুমূর্ষু পৃথিবীর আসন্ন উদ্ধারের আশ্বাসবাণী শোনাইয়াছেন, কিন্তু এই দিব্যজীবনের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা কি নূতন অবতারের উপর নির্ভরশীল, না প্রবুদ্ধ সাধারণ মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে না। ধর্ম যদি আবার এই নানা-সমস্যা-বিক্ষুব্ধ, বহু-দ্বন্দ্বক্লিষ্ট, মোহান্ধ মানবজীবনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে চায়, তবে তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন রূপে বিবর্তিত হইতে হইবে। হয়ত এই পৃথিবীকে নূতন করিয়া গড়িবার পূর্বে ইহাকে ধ্বংসই করিতে হইবে—কল্কি-অবতারের ভবিষ্যৎবাণী এই পরিণতিরই ইঙ্গিত করে। আজ সকল দেশেই সরকার দেশবাসীর বৈষয়িক জীবনের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করিতেছেন। ধর্ম যেদিন মানুষের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সমগ্র জীবনের নিয়ন্ত্রণ-দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, ধ্যান-সাধনার নির্জন কক্ষ ও কোলাহলময় কর্মজগৎ যেদিন এই একই নৈতিক অক্ষরেখার উপর আবর্তিত হইবে, রাষ্ট্রশক্তির শ্রেষ্ঠতর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যেদিন ইহা নিজ শক্তির পরিচয় দিবে, সেদিনই ইহা আপনার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত

হইবে। একদিন পাশ্চাত্ত্য জগতে ধর্মনেতা ও রাষ্ট্রনেতার মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রথমোক্তের পরাজয়ে ও শেষোক্তের সার্বভৌম ক্ষমতাধিষ্ঠানে অবসান লাভ করিয়াছিল। সেদিন মানুষের অগ্রগতি, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য এই মীমাংসাই বিশ্বের কল্যাণকর হইয়াছিল। আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইহার বিপরীতটাই কাম্যতর মনে হইতেছে। রাষ্ট্র আজ উহার নৈতিক অধিকার হারাইয়া ফেলিতেছে; ধর্মের জন্য আকুতি ধর্মের শক্তিহীনতার জন্য আজ অতৃপ্তই থাকিয়া যাইতেছে। আজ ধর্মের রথচক্র উপরে ও রাষ্ট্ররথচক্র নীচে হইলেই যেন পৃথিবীর বিচলিত ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার সম্ভব হইবে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যধর্ম

বাঙলাদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ কোন্‌টি ইহা নির্দেশ করিতে হইলে চৈতন্যযুগকেই সর্বাগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মানুষের আত্মিক বিশুদ্ধি, মানবিক সম্পর্কের শ্রেষ্ঠ মাধুর্যবিকাশ, মানব-সমাজের উদার ভাব-সংহতি ও সাম্যবোধ এই যুগে যেরূপ অভাবনীয় অগ্রগতির নিদর্শন দেখাইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এই যুগে মানুষের ঐশী উপলব্ধি যত উজ্জ্বল ও সর্বব্যাপী হইয়াছিল তাহা অন্য যুগের তুলনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু ধর্মচেতনায় নহে, কাব্যে, দর্শন-অলঙ্কারে, জীবনী-রচনায় সাহিত্যিক উৎকর্ষের এরূপ বহুমুখী ও অসাধারণ বিকাশ কোনও একটি যুগে কেন্দ্রীভূত দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষের মর্যাদা-স্বীকৃতি, সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখের প্রতি মমতাবোধ, সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে সামাজিক সহৃদয়তা ও সমপ্রাণতা, সমাজের সর্বস্তরে উচ্চ, কোমল ও আদর্শনিষ্ঠ মনোভাবের ব্যাপক বিস্তার—এই যুগটিকে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্তরূপে চিহ্নিত করিয়াছে।

জাতীয় জীবনের এই সর্বতোমুখী স্ফূরণ ও অভ্যুদয়ের কেন্দ্রশক্তি ছিলেন একজন নরদেবতা—তিনি শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁহারই মাধ্যমে স্বর্গের

দিব্যদ্যুতি মর্ত্যলোকের প্রাত্যহিক সূর্যালোকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, দ্যুলোক ভূলোকে নামিয়া আসিয়াছিল। অলৌকিক রহস্যানুভূত মানবিক দেহ-মনের চতুঃসীমার মধ্যে ধরা পড়িয়াছিল। তাঁহার কনকদণ্ডবৎ গৌরবর্ণ দেহযষ্টি অবলম্বনে অধ্যাত্ম জগতের পরম সত্য বেতার-যন্ত্রে আকাশবাণীর ন্যায় আমাদের মানবিক চেতনার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। তাঁহার পুলক-রোমাঞ্চিত দেহে দিব্যলীলার ভাব-প্রকটন, তাঁহার স্বপ্ন স্নগ্ধ, আয়ত আঁখি দুটিতে অতলস্পর্শ রহস্য ও অপার করুণার অপরূপ যুগ্ম মিলন, তাঁহার আবেগ-কম্পিত ও নৃত্যবিভোর অঙ্গ-সংস্থানে সৃষ্টির অন্তরালশায়ী গীতিসুষমার ছন্দ-দ্যোতনা। মোটকথা মনুষ্যদেহে, মানবিক বৃত্তির অনুশীলনে, মানব-সমাজ ও জীবনযাত্রার পটভূমিকায় ঐশী লীলারহস্যের যতটুকু আস্বাদন সম্ভব, চৈতন্যদেবের জীবনে তাহা পূর্ণমাত্রায় সাধিত হইয়াছে। মানবজীবনের দৈবায়নের পরিপূর্ণ সম্ভাবনা শ্রীচৈতন্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ও তাঁহার দিব্যচেতনা-বিচ্ছুরিত আলোকশিখা সমস্ত যুগজীবনকে এক অপার্থিব মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে।

কাব্যের ক্ষেত্রে বৈষ্ণবপদাবলী শুধু উৎকর্ষের দিক দিয়া নহে, প্রেরণার ব্যাপকতা ও কবি-সংখ্যার বহুলতার দিক দিয়াও শীর্ষস্থানীয়রূপে গণ্য হইবার অধিকারী। ভক্ত-সাধক ও কবির এরূপ অপূর্ব সম্মিলন কাব্যজগতে খুব বিরল সংঘটন। রাধাকৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলারস কবিগোষ্ঠীকর্তৃক এরূপ গভীরভাবে অনুভূত হইয়াছে ও এরূপ বিচিত্র কাব্যসৌন্দর্যসৃষ্টির হেতু হইয়াছে যে, সমস্ত যুগের কণ্ঠে পার্থিব প্রেমের রূপে একই দিব্যানুরাগ-মুগ্ধতা ধ্বনিত হইয়াছে। এই পদাবলীর মধ্যে এরূপ সূক্ষ্ম সঙ্গতিবোধ ও ভাবসৌকুমার্যের নিখুঁত মাত্রা রক্ষিত হইয়াছে যে কোথায় দেহ-সৌন্দর্যের সীমা শেষ হইয়া অধ্যাত্ম রূপের ব্যঞ্জনা আরম্ভ হইয়াছে, পার্থিব রূপমোহ কেমন অজ্ঞাতসারে রূপাতীতের ইঙ্গিতে বিলীন হইয়াছে, ইন্দ্রিয়ের আবেগ কেমন করিয়া অতীন্দ্রিয়ের স্বরূপ-রহস্যের প্রান্তদেশ স্পর্শ করিয়াছে তাহা সাহিত্যরসাস্বাদনের এক চিরন্তন বিস্ময়রূপেই বিরাজিত। নবনীত-কোমল, রসোচ্ছল শব্দগুলির মধ্যে দেহ ও আত্মার স্পর্শ যেন যুগপৎ মাখান আছে; মৃদু, করুণ ছন্দ-সঙ্গীতের মধ্যে একাধারে লৌকিক ও অলৌকিক আকুতির গুঞ্জন মিশিয়াছে। সরল ঘরোয়া উপমা-অলঙ্কারের মধ্যে অনায়ত্ত

রহস্যলোকের নূপুরশিঞ্জন বাজিয়াছে। স্বর্গ-মর্ত্যের এত নিবিড় নৈকট্য, এত নিগূঢ় আত্মীয়তা অন্য কোনও কবিতায় এরূপ আশ্চর্য একাত্মতার সহিত প্রকাশিত হয় নাই।

বৈষ্ণব কবিতার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ দুইটি অভিযোগ করা হয়। প্রথম যে ইহাতে কবির ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগের কথা গোষ্ঠীগত ভাবসাম্যের নীচে চাপা পড়িয়াছে। বৈষ্ণব কবিদের সমস্ত রূপোল্লাস, মান-অভিমান, বিরহ-মিলন-আত্মনিবেদনের উৎস তাঁহাদের নিজস্ব অন্তরানুভূতি নহে, একটি ধর্মসম্প্রদায়ের বিধিনির্দিষ্ট সাধারণ ও পরোক্ষ উপলব্ধি। এইরূপ অভিযোগ মানব প্রকৃতি, বিশেষতঃ মধ্যযুগীয় ধর্মকেন্দ্রিক মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতাই সূচিত করে। সমস্ত ভাব ও রসই সমাজ-জীবন-প্রসূত; সমষ্টিগত অনুভূতি হইতে ইহা ব্যক্তির অন্তর-গহনে প্রবেশ করে। এই সামগ্রিক ভিত্তি না থাকিলে ইহা লেখক হইতে পাঠকচিত্তে সংক্রামিত হইতে পারিত না। যতদিন মানবচিত্ত একটি প্রবল, সার্বিক চেতনা কর্তৃক অধিকৃত থাকে, ততদিন উহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গোষ্ঠী-মনোভাবের একটি প্রকারভেদ মাত্র। বিপুল নদীস্রোতের সমুদ্রাভিমুখী গতিবেগের মধ্যেই ছোট ছোট খাল-বিল-নির্ঝরের মন্থরগামী জলধারা বিলীন হয়। অনন্তের মধ্যে আত্মবিলোপের ঐকান্তিকতায়ই ব্যক্তিত্বের পরিচয় নিহিত। ধর্মের প্রবল বিরাট অনুভূতি, ঐশী লীলার বিচিত্র, সর্বব্যাপী রহস্য মানুষের ক্ষুদ্র হৃদয়ের বাসনা-কামনাকে আপনার সীমাহীন অতলতায় আকর্ষণ করে। নিজেরই মনের কথা, আপন অন্তরোদ্যানে বিকশিত পুষ্পসম্ভার সেই অসীম শক্তির পূজা-অর্ঘ্যরূপে তাঁহারই চরণে উৎসর্গিত হয়। ভক্ত মানব, ঈশ্বরে নিবেদিত-চিত্ত মানব, অনন্তের মধ্যে বিলীন হওয়াতেই যাহার জীবনের পরম সার্থকতা, সে আর আপনার যাত্রার মধ্যপথে আটকাইয়া থাকে না; তাহার সমস্ত কবিকৃতি, তাহার অন্তরের সমস্ত সুরভিত বিকাশ লইয়া সে আপন চরম লক্ষ্যের দিকেই আগাইয়া চলে। বৈষ্ণব কবি—চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস—তাই ক্ষুদ্র মানবিক জীবনের বিচিত্র আনন্দ-বেদনা, প্রেমের দ্বন্দ্ব-মথিত হৃদয়-নির্যাস, মিলনের উল্লাস, বিরহের অশ্রুস্নাত হাহাকার, অতৃপ্তির ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস, বিরহোত্তর পুনর্মিলনের রমণীয় কল্পনা, আত্মনিবেদনের প্রগাঢ় শান্তি—সবই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার পরিপোষক ও অঙ্গীভূতরূপে দেখাইয়াছেন। যে সর্বস্ব গোবিন্দে

সমর্পণ করিয়াছে তাহার নিজের কথা আর কি থাকিতে পারে? তথঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আপনাকে লোপ করিয়াই সার্থকতা লাভ করে। সেখানে ব্যক্তিগত জীবনের সুর খোঁজা কি ব্যর্থ অনুসন্ধান নহে?

দ্বিতীয় অভিযোগ হইতেছে বৈষ্ণব কবিতার বৈচিত্র্যের অভাব—জীবনের মধুর-রস-প্রধান দিকটি লইয়াই ইহার একমুখীন চর্চা। ইহা সত্য, কিন্তু বৈষ্ণব কবি কখনই সমগ্র জীবনের ছবি আঁকিবার প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তাঁহার সমগ্র জীবন কালিন্দীতটাধিষ্ঠিত বৃন্দাবন-লীলাকুঞ্জ, গৌর-সঙ্কীর্তন-মুখরিত নবদ্বীপের পল্লী-পরিবেশ ও সমুদ্রতরঙ্গ-বিধৌত নীলাচলের ধ্যান-তন্ময়, অনুভূতির অতলতায় নিমগ্ন সাধনা-ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বৈষ্ণব ভাবজীবন এই ত্রিবিধ পরিক্রমার অন্তহীন পুনরাবৃত্তিতে নিঃশেষিত। বৃন্দাবনলীলা চৈতন্যাবির্ভাবের যে নিগূঢ় প্রতিশ্রুতি রাখিয়া গিয়াছে, নবদ্বীপ ও নীলাচলে তাহারই পরিপূরণ। প্রেমের যে মধুর ধারা যমুনার জলের সহিত মিশিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাই নর-লীলায় আপামর-সাধারণব্যাপী মধুর রসের প্লাবন আনিয়াছে ও নীলাচল-প্রান্তবাহী, চৈতন্য-অশ্রু-নিষিক্ত নীল সমুদ্রের লবণাম্বুরাশির মধ্যে সেই মধুর রসের অমৃতই ভবিষ্যৎ সমুদ্রমন্থনে উদ্ধারিত হইবার জন্য আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। এই মধুর রসের মহাকাব্যে কেবল করুণ রস ছাড়া আর কোনও অনুষঙ্গী রসের স্থান নাই। সুতরাং আধুনিক জগতের জটিল বিমিশ্রতা বৈষ্ণব সাহিত্যে ছায়াপাত করে নাই। এইটুকু মানিয়া লইয়াই আমাদের বৈষ্ণব কবিতার রসলোকে প্রবেশ করিতে হইবে। যে মানসিক শান্তি, চিত্তের একাগ্রতা ও ভগবানের লীলামধুর-রূপে একনিষ্ঠ বিশ্বাস আজ প্রাত্যহিক জীবনের রূঢ় অভিঘাতে মুহূর্তে মুহূর্তে বিধ্বস্ত হইতেছে, বৈষ্ণব কবিতা তাহাদের শেষ আশ্রয়স্থল। সাহিত্যে জীবনের সবটুকু তিক্ততা, তীব্রতম আত্মবিরোধ প্রতিফলিত যে হইতেই হইবে এমন দাবী কি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত? অবিমিশ্র মধুর ও শান্তরসের আস্বাদন যদি আমরা একেবারেই না হারাইয়া ফেলি, তবে এই মধুররসের অফুরন্ত হ্রদে অবগাহন করিয়া শরীর-মনকে স্নিগ্ধ করিতেই বা আমাদের আপত্তি কেন?

বাংলার লোক-সংস্কৃতি

(১)

বাঙলা দেশের জনসাধারণের যে বিশিষ্ট সংস্কৃতি তা নানা ভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষা এমন কি অক্ষর-পরিচয়ের সুযোগ না পেয়েও তাদের চিত্ত বিশেষ পরিমার্জনার দ্বারা সংস্কৃত হয়ে সরস হয়ে উঠেছিল। উজ্জ্বল ধর্ম ও নীতিবোধ, সুকুমার সৌন্দর্য-রুচি ও আচার-ব্যবহারের নম্র শিষ্টাচার—ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে তাদের এই সরসতা বিকশিত হয়েছে। সবশুদ্ধ মিলে তাদের শত দৈন্য, অভাব ও কুসংস্কার সত্ত্বেও তারা এই চিত্ত-প্রকর্ষের সাহায্যে তাদের জীবনকে সার্থক-সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে। অতর্কিত বিপৎপাত ও মনুষ্যত্বের অবমাননার মধ্যেও তারা দিশেহারা হ'য়ে পড়েনি ও জীবনের মহিমা থেকে ভ্রষ্ট হয়নি। তাদের সমগ্র জীবনযাত্রা এমন একটি সুনির্দিষ্ট নীতির দ্বারা নিয়মিত হয়েছে যে, দুর্দৈবের বিপর্যয়-পরম্পরাও তাদের বিশ্ববিধানের প্রতি আস্থা ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। এদের জীবনের পাত্র বার বার তিক্ত রসে পরিপূর্ণ হয়েছে; কিন্তু এই তিক্ততা গলাধঃকরণ করেও এরা জীবনের রসোপভোগের শক্তি হারায় নি। জীবন এদের প্রতি যতই কার্পণ্য করুক না কেন, জীবনের দানকে এরা সশ্রদ্ধ, সকৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করেছে এবং মোটের উপর সুস্থ, প্রসন্ন, অবিকৃত মনোভাব নিয়েই এরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এক অবিচ্ছিন্ন আদর্শের সমন্বয়কারী প্রভাবে এদের দৈন্য-ক্লিষ্ট, ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ জীবনযাত্রা অতিবাহিত করেছে।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে ধর্ম ও নীতিবোধ অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে আনন্দ-পরিবেশনের একটা সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। শুধু ধর্মের কৃচ্ছ্রসাধনে প্রাণের সরসতা রক্ষা সম্ভব হয় না—নিষেধাত্মক অনুশাসন যে পরিমাণে পাপের পথ রোধ করে ঠিক সেই পরিমাণে প্রাণশক্তিকেও শুষ্ক-শীর্ণ করে। ভাগ্যবঞ্চিত জীবন কেবল আনন্দের রসায়ন-প্রভাবেই বেঁচে থাকে। আমাদের প্রাচীন যুগের সমাজনিয়ন্তারা এই সত্য জানতেন বলেই তাঁরা ধর্ম-প্রচারের সঙ্গে আনন্দ-

দানের চমৎকার যোগসাধন করেছেন, ধর্মতত্ত্বকে আনন্দরসে নিমজ্জিত করে তাকে সুখসেব্য করেছেন। আমাদের ধর্মের সমস্ত ক্রমবিবর্তন এই আদর্শের সূত্র ধরেই অগ্রসর হয়েছে। উপনিষদ ও গীতার দুরূহ অধ্যাত্ম-সাধনা এই প্রেরণার অনুসরণ করেই পৌরাণিক ধর্মের ভক্তি ও হৃদয়াবেগে বিগলিত উপাসনায় পরিণত হয়েছে। দেব-দেবী-পূজার সাড়ম্বর, অনুষ্ঠানবহুল পদ্ধতি প্রধানতঃ মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্য থেকে উদ্ভূত। আজ যে কারণে দেশাত্মবোধের বিদেহী ধারণাকে দেশমাতৃকার মূর্তিতে উপস্থাপিত করার, জন্মভূমিকে জননীর সমপর্যায়ভুক্ত করার প্রয়োজন ঘটেছে, ঠিক অনুরূপ কারণে, অতীত যুগের মানবের সুখ-দুঃখে উদাসীন, জগতের মূলীভূত শক্তিকে স্নেহে বিগলিত, রূপে সমুজ্জ্বল, ঐশ্বর্যে অপরাজেয় ও জীবধাত্রী-রূপে পরিকল্পনা করা হয়েছে। পিতামাতার ও সন্তানের মধ্যে যে স্নেহ পরিবার-প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রশক্তি, যাকে আশ্রয় করে জীবনের সমস্ত সদ্‌গুণ ও কোমল বৃত্তিনিচয় বিকশিত হয়েছে, তাকেই অধ্যাত্ম জীবনের ভিত্তিভূমি করাতে ভগবদ্‌-প্রেম মানুষের অন্তরে দৃঢ়মূল ও স্থায়ী হয়েছে। শুধু পৌরাণিক দেব-দেবী নয়, যেখানেই মৌলিক সংস্কার মনে ভয় ও ভক্তির উদ্রেক করেছে, সেখানেই নূতন দেবতামণ্ডলীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়ে হৃদয়াবেগের অনির্দিষ্ট স্পন্দনকে একটি বিশিষ্ট রূপ ও পদ্ধতি দান করেছে।

এই রূপেই নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে নূতন নূতন দেবতার পূজা প্রবর্তিত হ'য়ে তাদের আমোদ-উৎসবকে খানিকটা উচ্চতর গৌরবে মণ্ডিত করেছে, নিছক সহজ আনন্দের আয়োজনকে চিত্তশুদ্ধি ও ভগবৎ-অনুভূতির প্রেরণায় উন্নীত করেছে। মনসা, ষষ্ঠী, শীতলা, ধর্মঠাকুর, দক্ষিণরায়, বাস্তুদেবতা প্রভৃতি ঐশী শক্তির নানা ক্ষুদ্র অংশ এই ভাবে সাধারণ লোকের মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের আসন পেতে বসেছেন ও তাদের উৎসবের উপলক্ষ্য ও অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। যারা ঈশ্বরের বিরাট, সর্বব্যাপী শক্তির ধারণা করতে পারতো না, তারা এইরূপে তার খণ্ডাংশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেদের জীবনকে ধন্য ও চিত্তকে ঊর্ধ্বাভিমুখী করেছে। শিশির-বিন্দুতে সূর্যমণ্ডলের প্রতিফলনের ন্যায় তারা ক্ষুদ্রের মধ্যে বিরাটের প্রতিচ্ছবি দেখেছে ও তাদের জীবন যে এই বিরাটের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট নয় তা একরকম করে অনুভব করেছে।

(২)

যেমন পর্বতশৃঙ্গ হতে ঝরণার জল পতিত হয়ে প্রাচুর্য ও গতিবেগ আহরণ করে, তেমনি ভক্তির উন্নত স্তর থেকে উদ্ভূত হয়ে আমাদের জনসাধারণের মনে আনন্দ-প্রস্রবণ প্রচুরতর ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে সংশ্রব তাদের প্রাকৃত আনন্দকে ব্যাপ্তি ও গভীরতা দিয়েছে। পুরাণের উন্নত আদর্শ কথকতা, কীর্তন, পাঁচালী, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি লৌকিক আমোদের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের বোধগম্য হয়েছে ও তাদের মর্মস্থলে প্রবেশ করেছে। এই উপায়ে রামায়ণ-মহাভারতের, ভাগবতের কাহিনীগুলি সমগ্রভাবে, ও নির্ভুলভাবে না হউক সরস ভক্তি-রসাপ্লুত খণ্ডাংশগুলির ভিতর দিয়ে তাদের রসবোধ ও নীতিজ্ঞানকে উদ্বুদ্ধ করেছে। রামের বনবাস, সীতানির্বাসন, তরনীসেন-বধ, অভিমন্যু-বধ, দাতা কর্ণের পুত্রোৎসর্গ, প্রবীর-পতন প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি নিয়ে যে যাত্রার পালা রচিত হয়েছে সেগুলি দর্শন করে তারা জীবনের উদার বিকাশ ও দুর্জ্ঞেয় করুণ রহস্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে ও তাদের বাস্তব জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করে কল্পনার ভাবলোকে বিচরণ করেছে। কথকতার সংস্কৃতবহুল ভাষায় আখ্যান-বিবৃতি ও এর কঠিন স্তর হতে উৎসারিত গীতিপ্রবাহ এই দুই-এ মিলে তার মনে বোঝা-না-বোঝায় মেশান, শব্দ-ঝঙ্কার ও সুরের ইন্দ্রজালের সংমিশ্রণে রচিত এক অস্পষ্ট মায়ালোকের সৃষ্টি করেছে। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ-উপাখ্যান ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্বসমূহের ব্যাখ্যা তাদের ভক্তির মহিমা ও ঐশী শক্তির অসীমত্ব সম্বন্ধে সচেতন করেছে। দাশু রায়ের অনুপ্রাস-ও-যমক-বহুল পাঁচালী ঐশী শক্তির মাতৃত্ব ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে তরল-মধুর সঙ্গীতে দ্রবীভূত করে শ্রোতাদের সৌন্দর্যবোধ ও ভক্তিপ্রবণতাকে সমভাবে উদ্দীপ্ত করেছে। কীর্ত্তনের সরল, প্রাণমাতানো সুর তাদের অন্তরের পরতে পরতে প্রবেশ করে তাদের হৃদয়ের গুহালীন সুকুমার ভাবগুলিকে প্রকাশ-মুক্তি দিয়েছে ও সমস্ত আকাশ-বাতাসকে এক স্নিগ্ধ, অপরূপ ভাব-মাধুর্যে পূর্ণ করে তাদের স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার সঞ্চার করেছে। একটা লক্ষ্য করবার বস্তু এই যে নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কোন বিকৃত অর্থ করবার প্রবণতা দেখা যায় না। এর থেকে

তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে অবাধ লালসা ও উচ্ছৃঙ্খলতার কোন প্রশ্রয় বা সমর্থন লাভ করেনি। এক প্রকার সহজ, নির্মল ধর্মবুদ্ধি ও নীতিজ্ঞানের সাহায্যে তারা এ ঐশী লীলার বিকাশ বলেই স্বীকার করে নিয়েছে, মানবপ্রেমের কলুষিত আদর্শের মানদণ্ডে এর বিচার করতে যায় নি। এর থেকে তাদের ধর্মজ্ঞানের অনন্যসাধারণ বিশুদ্ধিই প্রমাণিত হয়।

আমাদের দেশের লোকশিক্ষার পূর্বোক্ত উপায়গুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা প্রধানতঃ মনোরঞ্জনের জন্যই উদ্ভাবিত হয়েছিল। আমাদের সমাজ-নেতারা সোজাসুজি ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন নি—পাদ্রী সম্প্রদায়ের বক্তৃতার স্থূল আদর্শ তাঁদের লোকচরিত্রাভিজ্ঞতার সমর্থন পায় নি। ধর্মতত্ত্বকে কাব্যসৌন্দর্যের মত মধুর ও আকর্ষণীয় করাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল—সুতরাং আনন্দ-পরিবেশনের উদ্দেশ্যই তাঁদের পরিকল্পনায় মুখ্যস্থান অধিকার করেছে। এই জন্যই ধর্মের বেদীকে তাঁরা আনন্দের আসরের ছদ্মবেশ পরিয়েছেন। প্রত্যেক ধর্মানুষ্ঠানই উৎসব ও সামাজিক প্রীতির আদান-প্রদানের উপলক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। আনন্দের মধ্যে হৃদয়-মনের যে প্রসার ও গ্রহণশীলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, দাক্ষিণ্যের যে অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে, তাই তাদের অন্তরে ধর্মবোধকে অংকুরিত ও পল্লবিত করতে সাহায্য করেছে। আনন্দের সংগে ধর্মের এই যে নিত্য সম্বন্ধ—যার আভাস স্রষ্টার আদিম দৃষ্টিতে সূচিত হয়েছে—এটা হিন্দুসমাজের ব্যবহারের মধ্যে যেরূপ কার্যকরী-ভাবে গৃহীত হয়েছে এরূপ অন্য কোন ধর্মে হয়েছে কিনা সন্দেহ।

আমাদের অশিক্ষিত জনসাধারণ কেবল যে উচ্চবর্ণের কাছ থেকে আনন্দের উপাদান ও উপলক্ষ্যগুলি ঋণ করেছিল তা নয়, তারা নিজেদের ক্ষুদ্র শক্তি ও অর্ধ-বিকৃত রুচির সাহায্যে নিজেদের জন্য স্বাধীনভাবে নানা নূতন আনন্দের প্রকরণ উদ্ভাবন করেছিল। এইটিই হচ্ছে প্রাণবান সংস্কৃতির একটা লক্ষণ। যেমন যে দীপশিখা প্রজ্বলিত থাকে, তার থেকে আর একটি দীপ জ্বালানো যায়, তেমনি জীবন্ত সংস্কৃতি নানা অভিনব, মৌলিক বিকাশের মধ্যে তার অক্ষুণ্ণ প্রাণশক্তির পরিচয় দেয়। আধুনিক শিক্ষার বন্ধ্যাত্ব এইখানেই সুপ্রকট যে এর থেকে সমাজের নিম্ন সম্প্রদায় কোন নূতন রস আহরণ করতে পারে নি—শিক্ষিতদের আমোদ-উৎসবে

এদের ফাই-ফরমাস খাটা ছাড়া আর কোন সক্রিয় অংশ নাই। যে সভামঞ্চ এদের মুটেগিরির সহযোগিতায় দীপমালায় ও পুষ্পদামে সজ্জিত হয়, তা তাদের অন্তরে কোন আলোক ও উত্তাপ সঞ্চার করতে পারে না— বাবুদের অনুষ্ঠানের খুঁটি-নাটি ও বক্তৃতা তাদের কাছে প্রায়ই অর্থ-হীন অংগভংগি ও কোলাহলে পর্যবসিত হয়, like a tale of little meaning, though the words are strong. শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থনে যে সভা আহুত হয়, তাতে সাড়া মিলে, কিন্তু এ সাড়া অভাববোধের জ্বালা, আনন্দের প্রশান্ত তৃপ্তি নয়। প্রাক্-ইংরেজ যুগে কিন্তু তাদের এই অসাড়তা ছিল না, ছিল সৃষ্টিশক্তির উদ্যম ও উত্তেজনা। কবি ও ঝুমুরের গান ও নানা ধরণের লোকনৃত্য—এইগুলি ছিল তাদের নূতন সৃষ্টি-প্রেরণার পরিচয়। কলাকৌশল ও রুচির দিক দিয়ে এই গণসাহিত্য ও শিল্প উঁচু স্থানের দাবী করতে পারে না। কিন্তু জাতির জীবন যে নীরস হয়ে যায় নি, সুন্দরের আহ্বান যে এদের অন্তরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে নি, প্রয়োজনের উর্দ্ধে যে এদের একটা আনন্দময় সত্তা আছে এগুলি অন্ততঃ তার পরিচয় বহন করে। শিক্ষিত সমাজ থেকে এরা বিষয়বস্তু আহরণ করেছে। কিন্তু ভাষায় ও ভাবে এই সর্বস্তরসাধারণ বিষয়ের উপর তাদের মানস বৈশিষ্ট্যের ছাপটি সুস্পষ্ট। কবিগানের উপস্থিত বুদ্ধি, ভাবের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ও পদ্য-পংক্তির অন্ত্য মিলের উপর অসামান্য অধিকার—সরস্বতীর বরপুত্রদের নিকটও নিতান্ত উপেক্ষনীয় গুণ নয়। এগুলি কবিত্ব না হলেও তার কাঁচা-মসলা-মুখ হইতে অনর্গল-নিঃসৃত আবিল ভাবধারা অনুশীলনের দ্বারা পরিস্কৃত ও লেখনীর মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট আংগিকের মধ্যে বিন্যস্ত হলে আতিশয্য-ও-স্থূলতা-বর্জিত কবিতার রূপই গ্রহণ করতে পারতো। সময় সময় এ কবিগানের মধ্যে চলমান ঘটনা-প্রবাহের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও এদের উপলক্ষ্য করে নিপুণ তর্ক-পরিচালনা ও শ্লেষ-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত মিলে—সবশুদ্ধ মিলে রচয়িতার কবিত্বশক্তি না হোক, তার মানস সচেতনতা সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না। শ্রীযুক্ত তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' নামক উপন্যাসে এইরূপ একটি নিম্ন-কুলোদ্ভব গণসাহিত্যরচয়িতার সৃষ্টিপ্রেরণা ও জীবনযাত্রার একটি চমৎকার ছবি আঁকা হয়েছে।

(৩)

গণসাহিত্য যে বিরল ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের সাহিত্যের পর্যায়ে পৌঁছিতে পারে, তার প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। রংপুরের গ্রামে প্রাপ্ত ময়নামতীর গান ও ময়মনসিংহ-গীতিকা সাহিত্যিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। হয়ত ময়মনসিংহ-গীতিকায় সচেতন শিল্পজ্ঞানের পরিচয় একটু বেশী মাত্রায় প্রকট—মৌখিক কাহিনী ব্যক্তিগত কবি-চেতনার স্পর্শে কাব্যে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত গানটি অজ্ঞ কৃষকের মুখ থেকে সংগৃহীত, এমন কি কোন হস্ত-লিখিত পুঁথিতেও লিপিবদ্ধ হয় নি। এর থেকে গণসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের কৌতূহলোদ্দীপক ধারণা করা যেতে পারে। সরল, অলঙ্কারবর্জিত ভাষায় করুণরসের মর্মস্পর্শী স্ফুরণ, জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে একটা সহজ অনুভূতি, সাধারণ জীবনযাত্রার সত্য, অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিচ্ছবি এই রচনার গৌরব। কিন্তু এর আসল পরিচয়-রহস্যটি নিহিত আছে এর পরলোকসম্বন্ধীয় চিন্তা ও পরিকল্পনার উদ্ভট মৌলিকতায় ও এর রাজৈশ্বর্য-বর্ণনার রূপকথাজাতীয়, কল্পনাপ্রবণ আতিশয্যে। সংস্কৃত আলংকারিকেরা নব রসের মধ্যে বীভৎস রসের স্থান দিয়েছেন। সভ্য অভিজাত-সাহিত্যে তার বড় একটা দৃষ্টান্ত মিলে না। দেব-দেবীর মধ্যে শিব ও কালীর মূর্তি ও আচরণে বীভৎসতার ছদ্মবেশে মহিমার ব্যঞ্জনা প্রকটতর হয়েছে। তাছাড়া দৈত্য—রাক্ষস জাতীয় অনার্য চরিত্রের পরিকল্পনায়ও এই বীভৎস রসের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। উদাত্ত মানব-চরিত্র-বর্ণনার মধ্যে মহাভারতে ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান-ব্যাপারই এই বীভৎসতার একক দৃষ্টান্ত মনে হয়। ভীমের চরিত্রে তার ক্ষাত্র সংস্কৃতি ও আর্য ধর্ম তার আদিম বীভৎসতার স্তরটিকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করতে পারেনি—তার অসম-সাহস ও হঠকারিতা যেন আর্য সভ্যতার পূর্ববর্তী যুগের সংরক্ষিত লুপ্তাবশেষ। আর দুঃশাসনের দুঃশীলতা পাঠকের মনে তার প্রতি কোন সহানুভূতি উদ্রেক না করায় তার নিষ্ঠুর হত্যার করুণ রসটি বীভৎস রসের প্রাধান্যের দ্বারা বাধিত হয়েছে।

কিন্তু জনসাধারণের রচিত সাহিত্যে বীভৎসরস অকুণ্ঠিত প্রকাশ পেয়েছে। ময়নামতীর গানে যমের নাকাল ও অপমান অশিক্ষিত কবির বীভৎসরস-প্রবণতাকে চরম স্ফূর্তির অবকাশ দিয়েছে। কবির অনিয়ন্ত্রিত, মাত্রাজ্ঞানহীন

কল্পনা যেন মৃত্যুদেবতার বিরুদ্ধে চিরসঞ্চিত ভীতিমিশ্রিত বিরাগের প্রতিশোধ তুলবার জন্য নানা হাস্যকর, উদ্ভট অবস্থায় উদ্ভাবন করেছে ও এক প্রকার মত্ত আতিশয্যের সঙ্গে এই দুরবস্থা উপভোগ করে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছে। অত্যাচারী জমিদারের অধঃপতনে উৎপীড়িত প্রজার ন্যায়, ময়নামতীর দৈববলে পরাজিত যমের লাঞ্ছনায় শমনভয়ভীত মানুষের মনে যে হর্ষের হিল্লোল জেগেছে, তার অভিব্যক্তি হয়েছে এক বেয়ারা উৎকট উল্লাসধ্বনির দ্বারা। এক দেবতার মহিমা ধূলিসাৎ করে, আর এক ধর্মসাধনার নিকট নির্বিচার নতিস্বীকারে যে কোন অসামঞ্জস্য আছে, তা কবির প্রাকৃত বুদ্ধির নিকট বোধগম্য হয় নি। এই শৈশবসুলভ, পরিমিতিহীন কল্পনার শেষ আশ্রয়স্থলরূপে লৌকিক সংস্কৃতি-মূলক জনসাহিত্যের চিরন্তন মূল্য আছে। ছড়া, গান, গাথা, রূপকথা প্রভৃতি লৌকিক সাহিত্যের বিভিন্ন বিকাশ, শিল্পের দিক দিয়ে যতই অনুন্নত ও ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন, সৃষ্টির চির-সহচর আনন্দময় প্রেরণা হতে উদ্ভূত। যে সমাজ-প্রতিবেশে এরা রচিত হত, তার মধ্যে যে আনন্দের প্রাচুর্য ছিল একথা জোর করে বলা যেতে পারে। জনসাহিত্যরচনার সুবর্ণযুগ অনেক দিনই অতীত হয়েছে—মানুষের শৈশব কল্পনা যে অস্পষ্ট অনুভূতির রাজ্যে বিকশিত হয়, ক্রমবর্ধমান প্রগতির আলোকের অভিভবে তা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ সংহতি হারিয়েছে। কিন্তু তার আনন্দের রেশটুকু ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত সমাজের বায়ুস্তরে ধরা ছিল। নূতন সৃষ্টি বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু পুরাতন সৃষ্টির ধারা তখনও অবিচ্ছিন্নভাবে বজায় ছিল। এই অনতিদূর অতীতে গ্রাম্য জীবনযাত্রায় মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। দিনের কাজ শেষ করে প্রতি সন্ধ্যায় জনমণ্ডলী সমবেত হয়ে প্রাচীন ধারার অনুসরণে আনন্দ-চর্চা করতো—ভগীরথের আনীত গঙ্গা-প্রবাহে অবগাহন করে সগরবংশ প্রাত্যহিক দিনযাপনের গ্লানির অভিশাপমুক্ত হত।

উৎসবচক্রের বার্ষিক আবর্তনে, পাল-পার্বনের নিয়মিত পুনরাবির্ভাবে, আনন্দের অবরুদ্ধ উৎস উন্মুক্ত হত। সরল, রস-পিপাসু ও আমোদপ্রবণ চিত্তের নিকট অতি সামান্য উপলক্ষ্য ও উপকরণেই আনন্দের আসর বসে যেত। সোজা মেঠো সুর, দুই একটা ভাঙ্গা, বেসুরো বাদ্যযন্ত্র, সন্ধ্যার পরে একটু অখণ্ড অবসরের নিশ্চিন্ততা, সর্বোপরি গোষ্ঠী-মনোভাবের জীবনরস-

আস্বাদনে উন্মুখ সমপ্রাণতা অতি সহজেই একটি আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি করত। এই পরিবেশে যার যতটুকু সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল তা স্ফূরিত হত। নিরক্ষর শিল্পী কাজ করতে করতে হাতুড়ির তালে তালে গান বাঁধত; কবিদলের ওস্তাদ নূতন পালা রচনা করার প্রেরণা পেত; কীতনিয়ারা কীর্তনগানের মধ্যে নূতন নূতন আঁখর সন্নিবেশ করে তাদের রসবত্তার পরিচয় দি'; আগমনী-বিজয়ার গান, ফকির-বাউলের সঙ্গীত জীবনের তটদেশে একটি কোমল ভাবার্দ্রতার স্নিগ্ধ-সজল আলিম্পন-রেখা এঁকে যেত। পল্লীগ্রামের আকাশে-বাতাসে একটা সজীব প্রাণহিল্লোল, একটা অশরীরী সৃষ্টির আবেগ ভেসে বেড়াত। পল্লীজীবনের সমস্ত সংকীর্ণতা ও ত্রুটিবহুলতার মধ্যে এই আনন্দময় সত্তার সঞ্জীবনী শক্তিই জাতিকে দুর্দশা ও অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে।

(৪)

আজ এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। মরুভূমির লেলিহান জিহ্বা পল্লীচিত্তের সমস্ত সরসতাটুকু নিঃশেষে শোষণ করে নিয়েছে। যে প্রাণশক্তি এতদিন তার জীর্ণ পঞ্জরে ধুক ধুক করছিল আজ যেন তা নিষ্পন্দ হয়েছে। তার জীবনযাত্রা যেন একটা নিছক অর্থনৈতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে—পাওয়া আর নেওয়া, অর্জন আর ব্যয়, অভাব বাড়ানো আর মেটানোতেই তার সমস্ত শক্তি নিযুক্ত হয়েছে। তার শ্রাবণ-আকাশে বর্ষণহীন মেঘ-মরীচিকার ন্যায় তার মানস আকাশও আজ দিশাহারা উদ্‌ভ্রান্তি হতে উদ্ভূত প্রেতচ্ছায়ার সমাবেশে আবিল ও বিভীষিকাময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার আত্মা আজ অন্ধকারে প্রকাশের পথ খুঁজে গুমরে মরছে। সৃষ্টির যে প্রধান সর্ত, আত্মবিশ্বাস, পল্লীজীবন তা হারিয়েছে। বৈদেশিক সংস্কৃতির যে দুই একটি বিচ্ছিন্ন আলোক-রেখা অভিনব আনন্দ-প্রকরণের বেশে তার চিত্তের গবাক্ষপথে উঁকি মেরেছে, তার সামনে তার পরাজয়-ম্লান আত্মপ্রত্যয় লজ্জা-সঙ্কুচিত হয়ে পেচকের ন্যায় অন্ধগহ্বরে আত্মগোপন করেছে।

থিয়েটার, সবাক্-চিত্রের বাহ্য ঔজ্জ্বল্যে ও নিখুঁত পারিপাট্যে তার আদিম, অসংস্কৃত আমোদ-উৎসব তিরস্কৃত হয়ে তার নিজের মনের কাছেই নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। এদিকে সহরে, সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে, যে নতুন সৃষ্টিশক্তির প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, যে নতুন সংস্কৃতি রূপ পরিগ্রহ করছে তার সঙ্গে সে সম্পূর্ণ

নিঃসম্পর্ক। আজ দেড়শ বৎসর ধরে বাংলার সংস্কৃতি যে সমস্ত নূতন উপাদান আপনার অঙ্গীভূত করতে চেষ্টা করেছে, তারা তার চিত্তে এখনও প্রবেশপথ পায়নি—লক্ষযোজন-দূরবর্তী তারকার মত তার রশ্মিরেখা তার মানস অনুভূতির মধ্যে এখনও পৌঁছায়নি। বিদগ্ধ মনের সহযোগিতা ও সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়ে, জাতীয় জীবন-স্রোতের প্রধান ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, আধুনিক জগতের সঙ্গে অসামঞ্জস্য-বোধে পীড়িত হয়ে, সর্বোপরি নিজের অন্তরানুভূতির অনুমোদন হারিয়ে আজ বাংলার লোক-সংস্কৃতি মরুবালুকা-বিচ্ছিন্ন জলধারার ন্যায় গতিবেগ ও সংহতিহীন হ'য়ে পড়েছে। জানিনা স্বাধীনতার নবজাগ্রত আত্মবোধ তার শুষ্ক, শীর্ণ ধমনীতে নূতন রক্ত-প্রবাহ সঞ্চার করতে পারবে কিনা। আমরা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার-প্রাপ্তির সম্ভাবনায় খুব উল্লসিত হয়ে উঠেছি; কিন্তু বাহিরের বাধার অপসারণ যদি অন্তরের প্রাণশক্তি-বিকাশের পথকে বাধামুক্ত না করে, তবে স্বাধীনতার প্রেরণা যে জাতির মর্মমূল পর্যন্ত পৌঁছবে না এটা সুনিশ্চিত।

পূজা-সংখ্যা

(১)

নববর্ষের যে দিনটি পঞ্জিকাতে নির্দিষ্ট থাকে, সেটিই যে সকলের পক্ষে সত্যই একটা নূতন আরম্ভের সূচনা এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। ইহা কেবল যে জ্যোতির্বিজ্ঞানিরূপিত পৃথিবীর আহ্নিক গতির উপর নির্ভর করে তাহা নয়। বিভিন্ন বৃত্তি ও ব্যবসায়ের পক্ষে এই নবারম্ভের দিনটি পৃথক পৃথক। পহেলা বৈশাখে যে নূতন বৎসরের জন্ম-তিথি তাহা আমাদের অনেকেরই অন্তরানুভূতির অভিনন্দনহীন। বাঙালী-সমাজে ঐ দিনের বিশেষ কোন উৎসবাত্মক তাৎপর্য আছে তাহা মনে হয় না। বসন্তের আরম্ভ বহু পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মধু ঋতুর প্রথম অভ্যাগমের আনন্দ ঐ দিনটিকে চিহ্নিত করে না। বাঙালীর

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কোন নূতন অঙ্কুর, বিকাশের কোন নূতন সম্ভাবনা গতানুগতিকতার অভ্যস্ত আবর্তন হইতে ইহাকে মুক্তি দেয় নাই। কৃষিপ্রধান বাঙলার পক্ষে নবান্ন উৎসবকেই বর্ষারম্ভের নবীন আশা ও আনন্দের দ্যোতকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের পক্ষে বিজয়া দশমীই প্রকৃতপক্ষে নববর্ষসূচক। সেইদিন হইতেই মাতার আশীর্বাদ স্বল করিয়া বাঙালী তাহার সংসারযাত্রার একটি নূতন পর্ব আরম্ভ করে; সমগ্র আগামী বৎসরের ভবিষ্যৎ-গর্ভ-নিহিত সম্ভাবনাকে মানস পর্যালোচনার সাহায্যে অনুভব করিতে প্রয়াসী হয়। দেবীর অবস্থিতির তিনটি দিবসের মধ্যে যে কিছু সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য ঘটে তাহারই আলোকে সে সমস্ত বৎসরের শুভ ও অশুভ ফলের পরিমাণ নির্ণয় করে। শিল্পীগোষ্ঠী বিশ্বকর্মা-পূজার দিন হইতেই তাহাদের নূতন বৎসর গণনা করিতে লাগে। অবশ্য যে সমস্ত ব্যবসায়ী নিজেরা কিছু উৎপাদন না করিয়া কেনা-বেচার সাহায্যে বণ্টন-ব্যবস্থায় সহায়তা করে, তাহারা পহেলা বৈশাখেই হালখাতা খুলিয়া নূতন আরম্ভের স্বীকৃতি জানায়। তবে এই প্রারম্ভ-বোধ কেবল হিসাব-নিকাশের খাতাতেই সীমাবদ্ধ—ইহা পূর্ববৎসরের হিসাবের জের টানিয়া নূতন বৎসরের দেনা-পাওনার একটা নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে মাত্র। ইহার মধ্যে নবীনতা-বোধের কোন মানস-স্ফূর্তি, পরিকল্পনার কোন অভি-নবত্ব, নূতন পথে মোড় ফিরিবার কোন আগ্রহ প্রকাশ পায় কি না সন্দেহ। সরকার-নির্দিষ্ট নূতন-পঞ্জিকা-অনুযায়ী বর্ষারম্ভের দিনটি যে বদলাইয়াছে তাহা আমাদের মনে বিশেষ কোন রেখাপাত করে নাই। নববর্ষ সম্বন্ধে আমাদের যে অভ্যস্ত ঔদাসীন্য, যে উৎসাহবিহীন গতানুগতিক স্বীকৃতি তাহার বিশেষ কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। যদি এই দিনটি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন আগ্রহ থাকিত, সূর্যদেব যদি বিশেষ রাশিচক্রে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনোলোকেও প্রবেশের কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারিতেন, তবে এত দীর্ঘদিনের সংস্কারের প্রতি আঘাতে, আমাদের বদ্ধমূল ধারণার অন্যথাকরণে আমরা কখনই নীরব, নিশ্চল থাকিতাম না।

উপরের আলোচনায় যে সমস্ত বিভিন্ন নববর্ষসূচক দিনের কথা বলা হইল, সেগুলি মোটামুটি আমাদের জীবনের বাহিরদিককার ব্যাপার। এমন কি শারদীয়া পূজার পরিসমাপ্তিতে যে নববর্ষের সূচনা তাহাও

প্রধানতঃ আমাদের সাংসারিক সুখ-সৌভাগ্য-ও-সমৃদ্ধি-সম্বন্ধীয়। দুর্গাপূজার জন্য আমরা বহুদিন পূর্ব হইতে যে আয়োজন আরম্ভ করি, উৎসবের সুষ্ঠু উদ্‌যাপন ও উহার অঙ্গীভূত বিচিত্র দায়িত্ব-পালনের জন্য যে উদ্বেগ পোষণ করি, পূজা নির্বিঘ্নে সমাধা হইলে তাহার জন্য একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা, একটা কৃতার্থতার আত্মপ্রসাদ অনুভব করা স্বাভাবিক। এই দুরূহ ও নানা জটিল অনুষ্ঠানে পূর্ণ কর্তব্য-সাধনের প্রত্যাশিত পুরস্কার-স্বরূপ আমরা সাংসারিক শান্তি ও সচ্ছলতারই দাবি করি। আমাদের জীবনে ভক্তির প্রসার ঘটুক, আমাদের অধ্যাত্মবোধ স্বচ্ছতর হউক, আমাদের জীবন দেবপ্রসাদে ধন্য হউক—এই ধরণের সৎসংকল্প ও অভীপ্সা বিশেষ জাগে না। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে শারদীয়া পূজাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের মাসিক ও দৈনিক পত্রিকা-গুলির সম্পাদক-মণ্ডলী যে 'পূজা-সংখ্যা' রূপে এক নূতন সংক্রামক প্রথার প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাতে আমাদের মনন-জীবনে যে প্রতিক্রিয়া জাগিয়াছে তাহা মোটেই বহিরঙ্গমূলক বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে।

(২)

আজকাল প্রায় সমস্ত পত্রিকাই এক একটি শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করিবার রীতি প্রচলন করিয়া আমাদের লেখকদের যে একটা বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন করিয়াছেন তাহার ফলাফল বিচার করিয়া দেখার প্রয়োজন। মনে হয় যেন ইঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, শরতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লেখক-মহলে একটা প্রেরণার জোয়ার আসে। বাহিরের বর্ষণ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনন-জগতে যে একটা বর্ষণপ্রাচুর্যের মরশুমী হাওয়া বহিতে সুরু করে, এ সত্য আবহতত্ত্বসম্মত না হইলেও পত্রিকাসম্পাদকদের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও তাগিদের জোরে বাস্তব ঘটনারূপে প্রতিভাত হয়। মনে হয় যেন কৃত্রিম বর্ষা ঘটাইবার আয়োজন বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডে ব্যর্থ প্রমাণিত হইলেও সাহিত্য-জগতে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। অন্ততঃ সাহিত্য-জগতের নববর্ষারম্ভ যে এই ঋতুতে আত্মঘোষণা করে তাহা নিঃসন্দেহরূপেই স্বীকার্য। সৃষ্টির যত নূতন পরিকল্পনা, মননশক্তির যত নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কল্পনা-লীলার যত নূতন বিলাস, জগৎ-ব্যাপার-পর্যবেক্ষণের যত মানস প্রস্তুতি সবই যেন একসঙ্গে আমাদের মনোজগতে এক বিরাট বিস্ফোরণের মত

ভাঙ্গিয়া পড়ে। লক্ষ্মীর সহযোগিতার ইঙ্গিতে সরস্বতীর প্রসাদ যেন শতগুণে বর্ধিত হইয়া অকৃপণ দাক্ষিণ্যের সহিত সকল প্রসাদভিক্ষুর মধ্যেই বিতরিত হয়। এই ঋতুর বিশেষ অনুগ্রহে রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতার ন্যায় লক্ষ্মী-সরস্বতীর দুই বিরোধী শক্তি এক ক্ষণিক মিলনের মাল্যবন্ধনে বাঁধা পড়ে।

যাঁহারা সাহিত-জগতে শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদের মাথার উপরেই এই ব্যবস্থার ভাল-মন্দের সমস্ত ঝড়টাই প্রবাহিত হয়। এই সময় তাঁহাদের সৃষ্টিশক্তির উপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়ে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। যদি কোন সাহিত্য-জগতের ভীমনাগকে তাঁহার কল্পনা-গাভীর বর্ষসঞ্চিত সমস্ত ছানাকেই এক রাত্রির মধ্যে সন্দেশে পরিণত করিবার ফরমায়েস দেওয়া হয়, তবে তিনি এই আমন্ত্রণের সম্মানটা নিশ্চয়ই উপভোগ করেন কিন্তু হয়ত সঙ্গে সঙ্গে একটু বিব্রতও হন। এই বিরাট তাগিদের ফলে সাহিত্য-সূতিকাগারে কত যে অপরিণত বিকলাঙ্গ শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, কত যে অপরিস্ফুট কবন্ধ-কল্পনা লেখকের মস্তিষ্কে অকালীন প্রসব-বেদনায় ছুটাছুটি আরম্ভ করে, এই কৃত্রিম উত্তাপে কত যে কাব্য-শাবক অপুষ্ট প্রেরণার ডিমের খোলস ভাঙ্গিয়া জন্ম-মুহূর্তকে অযথা ত্বরান্বিত করে তাহার ঠিকমত হিসাব করা দুঃসাধ্য। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী বাজিলে যেমন গোপসুন্দরীগণ তাঁহাদের বেশভূষা ও প্রসাধনকার্য অসমাপ্ত রাখিয়াই প্রিয়াভিসারে ছুটিয়া বাহির হইত, তেমনি লেখকের মানস কন্যা কত কাব্যসুন্দরীই আলুথালু বেশে, অঙ্গাভরণের বিসদৃশ সমাবেশে মানস উৎকণ্ঠার পরিচয় বহন করিয়া, সম্পাদকের বাঁশীর আহ্বানে প্রকাশের প্রকাণ্ড হাটে আসিয়া হাজির হন। অর্জুনের সব্যসাচিত্ব যে কেবল কবির উদ্ভট কল্পনা নয়, পরন্তু বাস্তব সত্য তাহা এই উপলক্ষ্যে বাঙালী লেখকের অজস্র অস্ত্রক্ষেপ-নৈপুণ্যে প্রতিপন্ন হয়। পৌরাণিক অতিরঞ্জনের প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণতি কেবল যে আধুনিক সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর কৃতিত্বের বিস্ময়কর নিদর্শন তাহা নহে, ইহা পুরাণের সত্যভাষণের মর্যাদা-রক্ষারও সহায়তা করে।

(৩)

এই পূজা-পূর্ব বিরাট সাহিত্যিক আয়োজন প্রধানতঃ পাঠকগোষ্ঠীর রুচি ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অনুষ্ঠিত হয়। লেখকের প্রেরণা বা

অবসর এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ গৌণ স্থানই অধিকার করে। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত আনন্দময়ীর আগমনে দেশে একটা ভাবোচ্ছ্বাসের বান ডাকিয়া যাইত এবং লেখকগোষ্ঠীর মধ্যেও ভক্তিরস কাব্য-সৃষ্টিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আধুনিক রচনার মধ্যে এই ভক্তিমূলক প্রেরণার বিশেষ আধিক্য দেখা যায় না। শরতের আগমনে প্রকৃতির নূতন সৌন্দর্য-শ্রী হয়তো কাহারও কাহারও কাব্যপ্রেরণা যোগায়। কিন্তু অধুনা বাস্তব ক্ষেত্রে যে ঋতুবিপর্যয় ঘটিতেছে, বর্ষা ও শরৎ যেভাবে পরস্পরের সীমা অতিক্রম করিয়া রাজনৈতিক অলক্ষ্য অনুপ্রবেশ-কৌশলের অনুকরণ করিতেছে, তাহাতে এই জাতীয় কাব্য অনেকটা পূর্বস্মৃতি ও চিরাচরিত প্রথার উপরই নির্ভর করিতে বাধ্য হয়, চোখের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের বিশেষ কোন সমর্থন পায় না। অবশ্য ছোটগল্প ও উপন্যাসের লেখকেরা তাহাদের কাব্যোদ্যান সাজাইবার জন্য কোন বিশেষ ঋতুর ফুলের উপর নির্ভর করেন না, বারমাসী ফুল অথবা সর্বঋতু-সাধারণ লতা ও গুল্ম তাঁহাদের ভাণ্ডারে সর্বদাই মজুত থাকে। আজকাল যে বৈজ্ঞানিক ঠাণ্ডাগারদের কল্যাণে পচনশীল ফল ও বহুদিন আগে-ধরা স্বাদহীন মাছকে টাটকা বলিয়া বাজারে চালান হয়, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। এগুলিকে অনায়াসেই সাহিত্যিক ever-green বা চিরসবুজের পর্যায়ে ফেলা যায়—বিশেষতঃ পাঠকের রুচির দিক দিয়া যখন কোন প্রতিবাদ আসে না।

আসল কথা এই যে, পূজার সময় বাঙালী পাঠকের মন অকস্মাৎ সাহিত্যের প্রতি অনুকূল হইয়া উঠে। সারাবৎসর যান্ত্রিক জীবনযাত্রায় পিষ্ট হইয়া, গতানুগতিকতার অন্ধ চক্রাবর্তনে দিশেহারা হইয়া, সে পূজার ছুটির কয়েকটা দিন হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য উৎসর্গ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। প্রতিটি দিন চাল-ডাল-লবণ-তৈলের সঙ্গে জৈব সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সে কয়েকটা দিনের জন্য তাহার চিত্তে উৎসব-আবাহনের জন্য আপনাকে যথাশক্তি প্রস্তুত করে। এই হঠাৎ-উদ্রিক্ত কুম্ভকর্ণ-ক্ষুধার তৃপ্তি-বিধানের জন্যই সাহিত্য-বিপণিতে এত অভূতপূর্ব সম্ভার-সজ্জা সংগৃহীত হয়। পূজার সময় দেহ-সজ্জার জন্য আনীত নূতন কাপড়-চোপড়ের ন্যায় অন্তরের নগ্নতা নিবারণের জন্য কিছু সাহিত্যের পোষাক যোগাড় করা দরকার হইয়া পড়ে। তাই পূজার ভিড়ের ট্রেনযাত্রীদের প্রায় সকলেরই হাতে

একখানা 'পূজা-সংখ্যা' মাসিক পত্র দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো সাহিত্যের নিয়মিত পাঠক, সাহিত্য-রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি নয়। উৎসব-প্রাঙ্গণে দর্শনার্থীর ভিড়ের মত সাহিত্য-প্রাঙ্গণেও বেশ কিছু নূতন আগন্তুকের সমাবেশ হয়। ইহাদের মনোরঞ্জনের জন্য শুধু পত্রিকাগুলির ভিতর নহে, বাহিরেও আকর্ষণীয় রূপসজ্জার ঘটা দেখা যায়। ইহাদের জন্যই প্রচ্ছদ-পটের শিল্পরুচিসম্পন্ন চিত্রাঙ্কন, পাতার পাতায় ছবির ছড়াছড়ি, বিজ্ঞাপনের রঙ্গীন হাতছানি, নানাবর্ণের কাগজের সমারোহ, মন ভুলাইবার বিচিত্র আয়োজন। ভিতরে যে উৎকর্ষের অভাব তাহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে কিন্তু না পরিবেশক না পাঠক কেহই এই অন্তর-সুষমার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল নহেন। পুষ্টিকর পানীয়ে রং-এর বাহারের মত শাঁসালো-সাহিত্যের উপরও বর্ণাঢ্যতার এই দীপ্তি আরোপিত হয়। শ্বেতশতদলবাসিনী, শুভ্রবসনা বাণীদেবী তাঁহার অন্তর-শুভ্রতাকে রঙ্গীন বহির্বাসে আচ্ছাদিত করিয়াই এই গণমহোৎসবক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

(৪)

যাহা হউক মোটের উপর 'পূজা-সংখ্যা' আমাদের প্রশংসা ও অভিনন্দনের যোগ্য। এই অবসাদ ও ক্ষয়ের যুগেও যে বাঙালীর সারস্বত সাধনা এত বিচিত্র ও সুপ্রচুর ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে ইহা সত্যই আনন্দের কথা। অনেক প্রবন্ধের রচনাগত উৎকর্ষ ছাড়াও বিষয়-নির্বাচনের পটুতা, উদ্ভাবনী শক্তির বৈচিত্র্য, সমাজ-পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, চরিত্র ও মেজাজের অলক্ষ্যপ্রায় বৈশিষ্ট্যের আবিষ্কার বাঙালী সাহিত্যিকের কল্পনার সরসতার পরিচয় দেয়। সাহিত্যের ধারা যে একস্থানে স্থির হইয়া নাই, ক্রমাগত আগাইয়া চলিয়াছে ইহা মনে বিশেষ আশারই সঞ্চার করে। এই চলমান জীবনস্রোতের তুঙ্গতম তরঙ্গশীর্ষেই প্রতিভার সোনার রেখা একদিন নিজ উজ্জ্বল স্বাক্ষর মুদ্রিত করিবে। কাজেই এই পূজাসংখ্যাগুলিতে ছোট-বড়, ভালমন্দ-মাঝারি, কাঁচা-পাকা হাতের কাজ, পরিপক্ক ও অর্ধসমাপ্ত শিল্পসৃষ্টি—সব মিলাইয়া এক আশ্চর্য সজীবতা, প্রাণযাত্রার এক সুদীর্ঘ, গতিচঞ্চল মিছিল পরিক্রমা-চিহ্ন রাখিয়া যায়। এই প্রবাহে প্রতিদিনকার ক্ষণিক ভাব-বুদ্বুদ প্রকাশের সূর্যকিরণে ঝলসিয়া উঠে—মহাকালের চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য

অপেক্ষা না করিয়াই উহাতে ঘটমান ইতিহাসের ক্ষীণ, সর্পিল রেখা প্রতিবিম্বিত হয়। আজকের ছোটখাট কথা কালকের নীরবতায় বিলীন হইবার পূর্বে এই আলোকচিত্রফলকে বিধৃত হইয়া অন্ততঃ কিছুকালের জন্য বাঁচিয়া থাকে। বৎসরের সালতামামি হিসাবে ইহাদের একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। ইহারই মাধ্যমে লেখক-পশুপতি পাঠক-হৈমবতীর নিকট অন্ততঃ স্থূলভাবেও বৎসরের ফলাফল বিবৃত করেন। জীবন-নদের যে অস্থির বারিরাশি মহাসমুদ্রে নিশ্চিহ্নভাবে মিশাইবার জন্য অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছে তাহার মধ্যে কয়েকটি তরঙ্গলীলাকেও যদি আর্টের বেষ্টনী-রেখায় বাঁধিয়া রাখা যায়, তবে তাহারও লাভ বড় অল্প নহে। মহাকালের কবল হইতে জীবনের যতটুকু অংশকে রক্ষা করা যায়, মানুষের পক্ষে ততটুকুই বর্তমানের কৃতিত্ব ও ভবিষ্যতে অমরতার আশা। এই অর্ধ-সাময়িক, অর্ধ-শাশ্বত সাহিত্যাধারে সমকালীন জীবনের যে খণ্ডছবি-পরম্পরা আঁকা হইতেছে, ভবিষ্যৎ যুগে হয়ত তাহাদের মধ্যে সামান্য অংশই নিজ বর্ণের উজ্জ্বলতা অক্ষুন্ন রাখিবে। তথাপি ইহারই দৌলতে যে মানুষ আপনার মনের সাময়িক অশান্তি ও বিক্ষোভ, নিজ রুচি ও মেজাজের ক্ষণিক পরিচয়, জীবনানুসন্ধিৎসার বিশেষ ছন্দটি বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেছে, ইহাতে বিস্মৃতি-বিলুপ্তির বিরুদ্ধে তাহার চিরন্তন সংগ্রামে সে যে ক্রমশঃ অধিক সাফল্য অর্জন করিতেছে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। হয়তো এই সামান্য অগ্রগতির সূত্র ধরিয়াই উহার রচনা সাময়িকতা হইতে চিরন্তনতায় উত্তীর্ণ হইবে এরূপ আশা বর্তমানে যত অবাস্তবই মনে হউক, ভবিষ্যতে একেবারে অসম্ভব বিবেচিত হইবে না।

মধুরাংশ্চ

(১)

পুরাণে আমরা সপ্ত-সমুদ্রের বর্ণনা পাই—সেগুলি দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি উপাদেয় তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। ক্ষীরোদ-সমুদ্রে স্বয়ং নারায়ণ অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রামগ্ন। জানি না কোন্ ঈর্ষ্যাপরায়ণ দানব এই সুমিষ্টদ্রব্যময় সমুদ্রে

এক অঞ্জলি লবণ নিক্ষেপ করিয়া উহাকে ক্ষারস্বাদ, অপেয় জলরাশিতে পরিপূর্ণ করিল। দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর-সমুদ্র বাস্তব জীবন হইতে নির্বাসিত হইয়া কবি-কল্পনায় ও বঞ্চিত মানবের দিবা-স্বপ্নে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

যে কোন কারণেই হউক, সম্প্রতি বিশ্বজগতে মধুর রসের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে—সংসারের নানাবিধ মধুচক্র আজ মধুশূন্য হইতে চলিয়াছে। ধর্ম-সাধনায়, সামাজিক উৎসবে, পারিবারিক জীবনের নানা স্নেহপ্রীতিময় সম্পর্কের মধ্যে যে অক্ষয় মধুর-রসের সঞ্চয় ছিল তাহা কোন্ অভিশপ্ত, তৃষিত জিহ্বা আজ নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে! প্রাণরসের মূলে কে বিষ-সিঞ্চন করিয়া দিয়া সমস্ত জীবনধারাকেই কলুষিত করিয়া দিয়াছে! রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের অপার্থিব মধুর-রস আজ পার্থিব স্বার্থকঠোর, হিংসা-দ্বেষ-জর্জর জীবনে প্রবেশের পথ খুঁজিয়া পায় না। যে চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্ম আপামর-সাধারণের মধ্যে অপর্যাপ্ত প্রীতি ও ভক্তিরসের প্রবাহ ছুটাইয়াছিল তাহা শিলাবারিত, বালুকাশোষিত, শীর্ণ জলবিন্দুসমষ্টিতে পর্যবসিত হইয়াছে, স্রোতোহীন লুপ্তধারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্বলের আকার ধারণ করিয়াছে। যে সমস্ত উৎসবে মানুষ স্বর্গের স্পর্শ অনুভব করিত, দেবলোক হইতে বর্ষিত সুধারস পানে ধন্য হইত, কীর্তনের তালে ও কথকতার সরস ব্যাখ্যানে আত্মবিস্মৃতির আবেশে রোমাঞ্চিত হইত, সেখানে আজ রঙচঙে পুতুল, তেলেভাজা খাবার ও ইতর আমোদ-প্রমোদেরই একাধিপত্য। এমন কি পরিবার-জীবনে যে দাম্পত্য-প্রেম, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম ও অপত্যস্নেহ অন্তরকে এক অবিচ্ছিন্ন আনন্দরসে উচ্ছ্বসিত করিত, যে পারিবারিক মধুচক্র হইতে প্রতিমুহূর্তে মধু ক্ষরিত হইয়া জীবনকে মধুময় করিত, সেখানে পর্যন্ত আজ তিক্ততার অবিরল ক্ষরণ সমস্ত রসনাকে বিস্বাদ করিয়া তুলিতেছে। রামপ্রসাদ জগজ্জননীকে যে অনুযোগ করিয়াছেন, 'চিনি বলে নিম খাওয়ালি মা' তাহা অধুনা কম-বেশী প্রত্যেকের কণ্ঠেই ধ্বনিত। মধুর রস যেন এখন জীবন হইতে সামগ্রিকভাবেই অন্তর্হিত হইয়াছে। আজকাল জীবন যেরূপ জটিল, সর্বব্যাপী যন্ত্র-ব্যবস্থার দ্বারা পীড়িত, তাহাতে মিষ্ট উপাদানও পিষ্ট হইয়া তিক্ত-কটু-কষায় রস রূপে নির্গত হইতেছে। আনন্দের মধ্যেও সূক্ষ্ম অতৃপ্তিবোধ আসিয়া গিয়াছে, উৎসবেও ব্যসনের ছায়াপাত হইতেছে, অগাধ অর্থ ও প্রচুর আরাম-বিলাসের উপকরণের মধ্যেও ক্ষুধিত আত্মা গুমরিয়া কাঁদিতেছে।

বৈষ্ণব কবির সেই অপরূপ প্রেমবৈচিত্ত্য-কল্পনা 'দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' এযুগে একটা মর্মান্তিক বিপরীত তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। দিব্য প্রেমে যে আত্মবিস্মৃত তন্ময়তা আসন্ন বিরহ-কল্পনায় পরিপূর্ণ আনন্দের মুহূর্তেও মুহ্যমান হইয়া পড়িত, আধুনিক দেহবিলাসে ঠিক বিপরীত কারণেই—আত্মরতির অতিসচেতনতার জন্যই—অনুরূপ অস্বস্তি অনুভূত হয়।

এই নিরানন্দ, গ্লানিভারাক্রান্ত পরিবেশে বিখ্যাত প্রকাশক শ্রীমান্ অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় 'মধুরাংশ্চ' নাম দিয়া একটি বিশেষ শারদীয়া সংখ্যা-প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙালীর মনে যে আনন্দকণিকা-গুলি এখনও দুঃখবাদ-কবলিত হইয়া জীবনশক্তি সম্পূর্ণ হারায় নাই, শারদীয়া পূজা-উপলক্ষ্যে তাহারা যথাসম্ভব কেন্দ্রসংহত ও প্রাণরসোচ্ছল হইয়া উঠে। পূজার কয়েকটা দিন বাঙালী সব ভুলিয়া, জীবন-সংগ্রামে তাহার শোচনীয় পরাজয়ের ব্যথা-করুণ ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া খানিকটা আনন্দের অভিনয় করিয়া থাকে। এ আনন্দ হয়ত সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম নয়। চারিদিকের উৎসব-কোলাহলে মাতিয়া, বর্ণোজ্জ্বল আলোকমালার প্রতিবিম্ব মুখে ধারণ করিয়া, রঙচঙে কাপড়-চোপড়-পরা, হর্ষোচ্ছল ছেলে-পিলের দলে মিশিয়া, জনতার উদ্বেলিত আবেগ-সমুদ্র হইতে নিজ শুষ্ক হৃদয়পাত্রটিকে কিছুটা পূর্ণ করিয়া সে আনন্দের আত্মবঞ্চনায় নিজ চিরবুভুক্ষু চিত্তে অতৃপ্তিকে সাময়িকভাবে ঘুম পাড়াইয়া রাখে। সমুদ্রতরঙ্গ-তাড়িত জলকণার ন্যায় সে আপনাকে একটা বৃহত্তর সত্তার অংশরূপে অনুভব করে। কিন্তু এ আনন্দ ক্ষণিক মাত্র—প্রতিমা-বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিরসঙ্গী হৃদয়-বেদনা তাহাকে আবার চাপিয়া ধরে। ৺বিজয়ার প্রীতি-আলিঙ্গন, নূতন জীবনযাত্রার সংকল্প, বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রসন্ন আশীর্বাদ সমস্তই পূজার পোষাকের সহিত তাহার দেহ-মন হইতে খসিয়া পড়ে। জীবন-মরুভূমিতে কয়েকদিনের জন্য মরূদ্যানের আস্বাদ পাইয়া আবার সে ভারবাহী পশুর মত ক্লান্তচরণে, নৈরাশ্য-ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বালুকাময়, খরতপ্ত পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

(২)

মানুষের জীবনে চিরন্তন আনন্দের একমাত্র উৎস ভগবৎ-সত্তার সহিত তাহার আত্মিক সংযোগ। যিনি আনন্দরূপে সকল বিশ্বে, সমস্ত সৌন্দর্যের

মর্মমূলে বিরাজিত তাঁহার জ্যোতিরশ্মি অন্তরে প্রতিফলিত না হইলে মানুষ যথার্থ স্থায়ী আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না। সূর্য যেমন সমস্ত আলোকের মূল, ভূগর্ভপ্রবাহিত জলধারা যেমন মৃত্তিকার সরস উর্বরতার কারণ, তেমনি মানব-জীবনে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও প্রেমভক্তিই উহার সমস্ত সার্থকতার, সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণবিকাশের, সমস্ত রসোচ্ছলতার একমাত্র উৎস। বাঙলা দেশের ইতিহাসে ভগবৎ-অনুভূতি, ভগবৎপ্রেম-বিহ্বলতার যুগগুলিই একাধারে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও বিমল আনন্দের যুগ। বৈষ্ণব সাহিত্যে মানুষ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার আস্বাদনের মধ্য দিয়া ভগবানের অত্যন্ত নিবিড় সংস্পর্শ লাভ করিয়াছিল। তাহারই ফলে একদিকে যেমন তাহার সারস্বত সাধনা অপরূপ কাব্যরসমাধুর্যে অভিসিঞ্চিত হইয়াছে, অন্যদিকে তাহার জীবনচর্যাও নব নব আনন্দের অভিনন্দনে ধন্য হইয়াছে। কবির কাব্য তাহার জীবনে অবিরল আনন্দ-ধারায় রূপান্তরিত হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী কেবল কবির সৌন্দর্যকল্পনা নহে, ইহা প্রগাঢ় জীবনরসনির্যাসও—পদাবলী-সাহিত্য শুধু পুঁথির পাতায়, শুধু কাব্যরসিকের বিদগ্ধ রস-রুচিতে সীমাবদ্ধ থাকে নাই, ইহা কীর্তনানন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছে, নূতন সুর-তালের মধ্য দিয়া নব সঙ্গীত-কলার জন্ম দিয়াছে, এক অভিনব আনন্দবিভোরতা ও ভাবমুগ্ধতার স্বর্গীয় হিল্লোলে সমস্ত জীবনকে আপ্লুত করিয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তপরিকরবৃন্দ যে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার মত আনন্দোচ্ছল যুগ বাঙালীর জীবনে আর আসিয়াছে কিনা সন্দেহ। সে যুগে রাজনৈতিক অত্যাচার-উৎপীড়ন ছিল, জীবনে অনিশ্চয়তা-বোধ ও আতঙ্ক ছিল, জীবনের চিরসহচর দুঃখ-দৈন্য-অভাবও নিশ্চয়ই অনুপস্থিত ছিল না। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তাহারা কোন স্থায়ী চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া যায় নাই। এক অপূর্ব ভাবমাধুর্যের প্লাবন, এক সার্বজনীন আনন্দরসের আত্মবিস্মৃত আবেশ মর্ত্যজীবনের সমস্ত কলুষ-কলঙ্ককে, দুঃখানলের সমস্ত দাহ-চিহ্নকে সম্পূর্ণভাবে ধুইয়া মুছিয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। আজিও পাঁচশত বৎসর পরে সেই ভাবসমুদ্রের ঢেউ আমাদের হৃদয়তটে আছড়াইয়া পড়িতেছে, বহু শতাব্দীর শোষণ-ক্রিয়াও তাহাকে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব পদাবলী জীবনে যে মধুর রসের প্রবাহ বহাইয়া দিয়াছিল তাহার কিছুটা হয়ত আমরা এখনও আমাদের বহু সংঘাতে জীর্ণ,

দ্রাবক রসের প্রচুর প্রক্ষেপে ছিদ্রবহুল জীবনপাত্রে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছি।

আধুনিক যুগের রবীন্দ্র-কাব্যও আমাদের নব নব পাত্রে এই আনন্দের অমৃতধারা পরিবেশন করিয়াছে, কিন্তু এই অফুরন্ত বৈচিত্র্যের মূল উৎস একখানে, তাঁহার স্বচ্ছ ও নিবিড় ভগবৎ-অনুভূতিতে। কবি-দৃষ্টি বিশ্বের নানা পদার্থে যে অভিনব সৌন্দর্য আবিষ্কার করে তাহার মূল হইল কবি-মনে এই বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যরাশির এক অখণ্ড সৌন্দর্যবোধে বিধৃতি। তিনি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানে বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, তিনি সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক নিবিড় শক্তির লীলাবিলাস অন্তরে অনুভব করেন। তাঁহার সৌন্দর্যপ্রবণতা আসে শুধু চোখে দেখা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে নহে, উহার অন্তরালশায়ী এক অদৃশ্য রূপাধারের উৎস হইতে। আদিম সৃষ্টিক্রিয়ার রহস্য খানিকটা কবির অনুভূতিতে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার বিশিষ্ট সৌন্দর্য-দৃষ্টিকে অনুপ্রাণিত করে। কবি যখন শুধু বহিঃপ্রকৃতির রূপ আঁকেন, তখন তাঁহার মনে কোন অতীন্দ্রিয় চেতনা সক্রিয়ভাবে জাগ্রত না থাকিলেও, উহার সন্নিবেশ-কৌশলে, গাঢ়তর বর্ণপ্রলেপে, ভাবোচ্ছ্বাসের উর্ধ্বোৎক্ষেপে ও এক বৃহত্তর পটভূমিকার সহিত সম্বন্ধ-দ্যোতনায় তিনি এই রূপকে রহস্যময় ও ভাস্বর করিয়া তোলেন। তিনি যখন শুধু পার্থিব প্রেমের, শুধু রূপজ আবেগের বর্ণনা দেন, তখন অকস্মাৎ-আবির্ভূত অভাবনীয় জ্যোতির্মণ্ডল ইহাকে বেষ্টন করে, এক রূপাতীত রহস্যের তিলকরেখা ইহার ললাটে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। নতুবা কবি-দৃষ্টি হইতে সাধারণ মানুষের বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানীর দৃষ্টির কোন পার্থক্য থাকিত না। বাইবেলে কথিত আছে যে, ভগবান সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত করিয়া তাঁহার সৃষ্ট জগতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন ও ইহা নয়নরুচিকররূপে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল। কবিও কিছু পরিমাণে আদি স্রষ্টার এই প্রসন্ন দৃষ্টিক্ষেপ, এই আনন্দ-রসসিক্ত উপলব্ধি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন কি নাস্তিক কবিও মুখে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও তাঁহার সৃষ্টিশক্তির দ্বারা পরোক্ষভাবে তাঁহাকে স্বীকৃতি জানান। পিতার নাম তাঁহার অজ্ঞাত থাকিলেও জাবাল সত্যকামের মত তিনি সত্যবংশজাত।

অতএব যে সমাজে যত ঈশ্বরের ভক্ত সাধক ও ঐশীদৃষ্টিসম্পন্ন কবিসাহিত্যিকের প্রাদুর্ভাব, সেই সমাজ তত বিশুদ্ধ মধুর রস আস্বাদনের

অধিকারী। জগতের কোন সুখে বা সৌন্দর্যে যে মাধুর্য নিহিত, তাহা মধুর রসের আদি-প্রস্রবণ-প্রসূত। ইহার অস্তিত্ব বস্তুতে নহে, দৃষ্টিভঙ্গীতে ও মানস রুচিতে। যাঁহারা কেবল বস্তুতে বা লৌকিক সুখ-সম্ভোগে আনন্দ খোঁজেন তাঁহারা মুক্তাহীন শুক্তিতে রত্নের বৃথা অনুসন্ধান করেন। এমন কি জনহিতকর কার্য বা কর্তব্যসম্পাদনও মূলকারণ-বিচ্ছিন্ন হইলে আত্মপ্রতিষ্ঠার সাময়িক তৃপ্তি দিতে পারে, কিন্তু স্থায়ী, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সন্ধান দেয় না। ভারত সংস্কৃতির উন্মেষ-যুগে, যখন বিশ্বের মূলীভূত শক্তির প্রথম উপলব্ধিকে কেন্দ্র করিয়া বৈদিক সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তখনই মধুর রসের যে বিপুল উচ্ছ্বসিত স্তব ধ্বনিত হইয়াছিল তাহা আর কোনও পরবর্তী যুগে সেই পরিমাণে পুনরাবৃত্ত হয় নাই। বৈদিক ঋষি একই দৃষ্টিক্ষেপে, একই অনুভূতি-সূত্রে তমসার অন্তরালস্থিত আদিত্যবর্ণ জ্যোতির্ময় মহাসত্তাকে ও ধূলিধূসর মর্ত্য-জীবনের প্রতি রেণুতে প্রবাহিত মধুর রসের ধারাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সোনার গভীরস্তরশায়ী অফুরন্ত খনি ও উপরিভাগের স্বর্ণদীপ্তি একই সঙ্গে তাঁহার চক্ষুতে প্রতিভাত হইয়াছিল। 'মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'—এই মহামন্ত্র পুলক-রোমাঞ্চে বিহ্বল, আনন্দ-আবেগে উচ্ছ্বসিত তাঁহার কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইয়াছিল। সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি, পঞ্চভূতের প্রতিটি উপাদান, মানবের অর্জিত সম্পদের সুখসৌভাগ্যসূচক প্রতিটি উপকরণ, তাহার ইন্দ্রিয়লোক ও মনোলোকের প্রত্যেক বৃত্তি ও জীবন-স্পন্দন সবই এক মধুর রসস্রোতে অবগাহন করিয়া, প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে মধু-সুরভিত হইয়া, এক বিশ্বব্যাপ্ত, অবিচ্ছিন্ন মাধুর্য-সঙ্গীতে অনুরণিত হইয়া, এক অখণ্ড চিন্ময় রসে ভাসমান ভাবকণিকারূপে আত্মপরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে কবি যতটা যথার্থ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইবেন, তিনি আধুনিক জগতের সমস্ত গ্লানিপঙ্ক ও বীভৎস বিকৃতির মধ্যে ইহার সত্য আনন্দময় রূপটি প্রত্যক্ষ করিবেন ও আমাদের অনুভব করাইবেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের কল্পনাতীত অবমাননা ও অবক্ষয়ের মধ্যেও এই চিন্ময়জ্যোতিরুদ্ভাসিত জীবনমহিমাকে দেখিয়াছিলেন। আমরা এই মধুসমুদ্রের উত্তরাধিকারী হইয়াও আজ এক ফোঁটা মধুর জন্য লালায়িত—কোটিপতির সন্তান হইয়াও ভিক্ষুকের উঞ্ছবৃত্তি, উচ্ছিষ্ট-ভোজন-লোলুপতার আশ্রয় লইয়াছি। কোল্‌রিজের প্রবীণ নাবিক যেমন অগাধ সমুদ্রের বারিরাশিবেষ্টিত হইয়াও এক বিন্দু পানীয় জলের জন্য

তৃষিত হইয়াছিল, আমাদের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। এই মধুরাজ্যের বিনষ্ট উত্তরাধিকার আমরা কিরূপে উদ্ধার করিতে পারিব অথবা অতৃপ্ত পিপাসাতেই প্রাণ হারাইব, এই হেঁয়ালিময় প্রশ্নই আমাদের সমস্ত জীবনের উপর এক বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে।

অবতারতত্ত্ব

(১)

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাশগুপ্ত কবিশেখর প্রণীত 'অবতারতত্ত্ব' নামক কাব্যগ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অতীব প্রীতিলাভ করিলাম। হিন্দুধর্মের অবতারবাদের এমন সূক্ষ্মযুক্তিপূর্ণ, বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আর কোথাও দেখি নাই। ইহাতে লেখক যে মনস্বিতা ও মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই দুর্লভ। সকল জাতিরই আদিম সৃষ্টিবাদ ও দেবপরিকল্পনার মধ্যে এমন একটা উদ্ভট কল্পনার আতিশয্য থাকে, যাহা আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারার সমর্থন লাভ করিতে পারে না। লেখক প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সমস্ত উদ্ভট কল্পনা প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক সত্য ও বিবর্তনধারার ছদ্মবেশ মাত্র। অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন অবতারবৃন্দকে সৃষ্টির ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, হিন্দুর সৃষ্টিতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির সুদৃঢ় আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নিজ যুক্তি-সমর্থনের জন্য তিনি প্রামাণ্য শাস্ত্র হইতে যে সমস্ত বচন উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে একাধারে তাঁহার ব্যাপক শাস্ত্রজ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মিলে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইরূপ দুরূহ তত্ত্ব-প্রতিপাদন তিনি স্বচ্ছন্দগতি কাব্যচ্ছন্দের ভিতর দিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। যুক্তি-তর্কের শৃঙ্খলা কোথাও ছন্দ-প্রয়োজনের দ্বারা ব্যাহত হয় নাই—ছন্দের গতি ও যুক্তির তীক্ষ্ণতা ঘনিষ্ঠ বন্ধনে সংহত

হইয়া গঙ্গা-যমুনাধারার ন্যায় পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়াছে। কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য—সৌন্দর্য-সৃষ্টি—তাঁহার অভিপ্রায়-বহির্ভূত। কিন্তু দুরূহ তত্ত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যানাবশ্লেষণে, সূক্ষ্ম যুক্তিধারার অস্খলিত অনুসরণে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিশদ অভিব্যক্তিতে, ছন্দোবন্ধনের নিয়ম রক্ষা করিয়া আলোচনার বুদ্ধিগত উৎকর্ষ-বিধানে লেখক যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে কাব্যক্ষেত্রেও তিনি যে অনধিকার-প্রবেশ করেন নাই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যে সমস্ত মনস্বী হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের গূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া ইহার প্রকৃত মহিমা ও নিগূঢ় সত্যানুসন্ধিৎসার গৌরবময় পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন কবিশেখর মহোদয় যে তাঁহাদের মধ্যে স্থানলাভের অধিকারী তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কবিশেখর মহাশয় এই গ্রন্থে হিন্দুধর্মের অবতারতত্ত্বের যে ক্রমবিবর্তন-মূলক ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা যেমন শাস্ত্রসম্মত সেইরূপ আধুনিক বিজ্ঞানের অনুমোদিত। তাঁহার কল্পনা সৃষ্টি-প্রারম্ভের রহস্যময় অবস্থার ভিতর অনুপ্রবেশ করিয়া তাহাতে সৃষ্টির আদিম বীজের অঙ্কুরোদ্গম আবিষ্কার করিয়াছে। মহাশূন্যের নীরন্ধ্র অন্ধকারে ঝটিকাপ্রসূত 'ওম' শব্দই আদিম সৃষ্টির ধ্বনিবীজ, নিরাকার ঈশ্বরের প্রথম আত্মস্ফুরণ-সূচনা। তাই শব্দব্রহ্মের মাহাত্ম্য সমস্ত পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে।

মহাব্যোমে শব্দতরঙ্গ-ব্যাপ্তির ফলে জ্যোতির্ময় সূর্য ও সূর্য-উৎক্ষিপ্ত অগ্নিপিণ্ড পৃথিবীর আবির্ভাব। এই বৈজ্ঞানিক তথ্য হইতে ভগবানের আদিরূপের ধ্যানমন্ত্র—'সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী ভর্গের' পরিকল্পনা। তারপর ব্যোম, বায়ু ও তেজোরাশির যুগপৎ ক্রিয়ায় আকাশব্যাপী সলিল-প্লাবনের উদ্ভব। ইহাই ক্ষীরোদসাগরশায়ী ভগবানের অনন্ত শয়নের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। অনন্ত-নাগ দেহাভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল প্রাণবায়ুর প্রতীক্। ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ তাঁহার অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থায় সংক্রামণ সূচিত করে।

এইবার সর্বপ্রথম প্রাণশক্তির উন্মেষ। এই বিশ্বগ্রাসী প্রলয়পয়োধিজলে মৎস্য-সৃষ্টি ভগবানের অবতারতত্ত্বের প্রথম সক্রিয় নিদর্শন। মৎস্য-মেদে গঠিত বলিয়া সাগর-উত্থিতা পৃথিবীর নাম মেদিনী। বিশ্বের ব্রহ্মাণ্ড নামকরণ এই তথ্যেরই সূক্ষ্ম আভাস। তারপর মধুকৈটভ-সংহার সৃষ্টি-বিবর্তনের এই স্তরেরই কাহিনী। বিষ্ণুকর্ণমলজাত অসুর মধুকৈটভ সৃষ্টির আদিম যুগে

মহাব্যোম-পরিব্যাপ্ত বাষ্প ও কুহেলিকার রূপক। শব্দশ্রুতির আধার মহাকাশই বিষ্ণুর কর্ণ। বৃষ্টির দ্বারা এই দিগন্তব্যাপী বাষ্প ও ধূম্ররাশির সংহারেই সৃষ্টি বিবর্তনের পথে আর এক স্তর অগ্রসর হইল। স্বচ্ছ নির্মল আকাশ-বাতাস সৃষ্টি-পরিণতির অনুকূল প্রতিবেশ রচনা করিল। মধু সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান বলিয়া বেদমন্ত্রে মধুর মহিমা উদ্গীত হইয়াছে। মৎস্যের দ্বারা বেদ-উদ্ধার অর্থে সৃষ্টির মাধ্যমে চিৎশক্তির বিকাশ সূচিত হইয়াছে। 'বেদ' অর্থে সৃষ্টিতত্ত্বজ্ঞান ও উদ্ধার অর্থে স্বরূপ-প্রকাশ।

জলে স্থলের উপাদান ক্রমশঃ গঠিত হইতে থাকিলে ভগবানের দ্বিতীয় অবতাররূপে উভচর কূর্মের উদ্ভব। কূর্ম পৃষ্ঠে পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন এই প্রচলিত শাস্ত্রোক্তি সম্বন্ধে লেখক বলেন যে, ধারণ অর্থে সমগ্র পৃথিবীর ভার বহন বুঝায় না; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা মৃত্তিকার খণ্ডাংশ গ্রহণ বুঝায়। কূর্ম ও পৃথিবীর মধ্যে সাধারণভাবে আধার ও আধেয় সম্বন্ধই উক্তির দ্বারা নির্দেশিত হইয়াছে।

তৃতীয় অবতার বরাহ সৃষ্টি-বিবর্তনের পরবর্তী পরিণতি-স্তরের যোগ্য অধিবাসী। পল্বলধর্মী সিক্ত মৃত্তিকাকে দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যে দন্ত দ্বারা মাটি-খনন একটি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া; তলদেশের মাটি সূর্যকিরণ-সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশঃ শুষ্ক ভূভাগ-গঠনে সহায়তা করিয়াছে। ইহাই বরাহের দন্ত দ্বারা পৃথিবী-ধারণের নিগূঢ় অর্থ। হিরণ্যাক্ষ অসুর ভূগর্ভজাত, অক্ষিচিহ্ন-সমন্বিত বন্য উদ্ভিদের প্রতীক্। বরাহ দন্ত দ্বারা এই সমস্ত উদ্ভিদের উচ্ছেদ করিয়া পৃথিবীকে কর্ষণোপযোগী করিয়াছিল বলিয়াই তাহার অবতারত্ব। বিশ্বের নিগূঢ় প্রাণ-সম্ভাবনার উন্মেষ সাধন করিয়া যে শক্তি তাহাকে চরম পরিণতির পথে অগ্রসর করিয়া দেয় তাহাই ভগবানের আত্মপ্রকাশরূপী অবতার।

(২)

এতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ মানব জাতির আবির্ভাব হয় নাই। পরবর্তী যুগে অর্ধপশু অর্ধনর নরসিংহ-মূর্তির মাধ্যমে সৃষ্টিপ্রেরণা আত্মপ্রকাশ করিল। পশুরাজের দুর্ধর্ষ শক্তির সহিত মানবোচিত অমোঘ

স্থায়নীতির সংমিশ্রণে গঠিত এই পরিকল্পনা হিন্দু শাস্ত্রকারদের বৈজ্ঞানিক তথ্যানুবর্তনের সহিত ধর্মবিষয়ক সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির এক বিস্ময়কর সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। এতাবৎকাল ভগবদিচ্ছা সৃষ্টিবিবর্তনের ভিতর দিয়া অনেকটা অর্ধ-সচেতন, প্রাণিধর্মে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়াছিল—মৎস্য, কূর্ম ও বরাহ কেবল বিশ্বের বহিরঙ্গমূলক গঠনের অপরিহার্য প্রয়োজনে উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু নরসিংহ হইতে বিবর্তন-ধারা সর্বপ্রথম অন্তর্মুখীন হইল—সমাপ্তপ্রায় বিশ্বদেহের অভ্যন্তরে ধর্মবোধের সজ্ঞান নীতির প্রথম বীজ উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইল। বাহিরের নিয়মের সহিত অন্তরের বিধান সংযুক্ত হইল। শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশ্ববিধানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বস্তুবিন্যাসের মধ্যে গর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় মানবের শাশ্বত নীতিবোধ প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠিল। বিশ্বের মধ্যে সর্বব্যাপী বিশ্বনাথের প্রতিষ্ঠা হইল। হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষের অনুজ—ভূগর্ভস্থ কষায়রসপ্রধান উদ্ভিদের প্রকারভেদ। নরসিংহ এই উদ্ভিদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া কেবল যে নবগঠিত পৃথিবীর বহির্দেশকে জঞ্জালমুক্ত করিলেন তাহা নহে; তাঁহার বজ্রগম্ভীর সিংহগর্জনে অমোঘ ন্যায়নীতির সর্বাতিশায়ী শক্তির জয়-ঘোষণা হইল। স্ফটিকস্তম্ভ হইতে বিনির্গত হইয়া এই নব অবতার নিজ সর্বব্যাপকত্ব সপ্রমাণ করিলেন। হিরণ্যকশিপু কেবলমাত্র লতা-গুল্ম-উদ্ভিদের পর্যায় হইতে উন্নীত হইয়া অত্যাচারী, হিংস্র মানবশক্তির সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়াছে। 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং'—রূপী যে মূলমন্ত্র প্রত্যেক বারে ভগবানের অবতারত্বের হেতুভূত হইয়াছে তাহারই সূক্ষ্ম পূর্বাভাস এই নরসিংহ-অবতারে ধ্বনিত হইল।

প্রহ্লাদের রূপক-ব্যাখ্যা লইয়া লেখকের অভিমত একটু কষ্টকল্পনাদুষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রহ্লাদ নিষ্কাম হরিভক্তিপরায়ণদের মধ্যে সর্বপ্রধান; অহেতুকী ভক্তিরসের প্রথম সাধক। তাহার জীবন-কাহিনী কিংবদন্তীর কুহেলিকার আবরণ ভেদ করিয়া সুপরিস্ফুট ব্যক্তিত্বের আলোকে ভাস্বর। ভক্তির বিশুদ্ধি ও চরমোৎকর্ষ তাহাকে যুগ-প্রসারিত ভক্তশ্রেণী-পরম্পরার শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সুতরাং তাহার এই প্রজ্ঞাপ্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে কদলী-ফলের রূপক-কল্পনায় উড়াইয়া দেওয়াতে আমাদের বিচার-বুদ্ধি ও পূর্ব সংস্কার উভয়ই সংশয়াচ্ছন্ন হয়। মনুষ্যভক্ষ্য প্রথম ফল হিসাবে এই কদলী দেবানুগ্রহের সুস্পষ্ট চিহ্ন বহন করিয়া আমাদের দেবপূজাবিধিতে,

ধর্মোৎসবের ক্রিয়াকলাপে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে এখন পর্যন্ত একটি গৌরবময় প্রাধান্যের আসন অধিকার করিয়া আছে। এই কদলী-প্রীতি ও ইহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা ও পবিত্রতার স্বীকৃতির পিছনে নিশ্চয়ই কোন সমাজতত্ত্ব-ঘটিত কারণ বর্তমান। সৃষ্টির প্রথম যুগে খাদ্যাভাবক্লিষ্ট মানবের প্রথম সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে ইহার যে মর্যাদা তাহাই বোধ হয় ভবিষ্যৎ যুগের শাস্ত্র-বিধি-বিধানে ইহার কৌলীন্য-গৌরবের মূলে। প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ইহার প্রাণশক্তির টিকিয়া থাকিবার যে অসাধারণ প্রবণতা তাহাই পুরাণ-সাহিত্যে ইহার অমরত্বের নিদর্শন বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। তথাপি প্রহ্লাদকে কদলীতে পর্যবসিত হইতে দিতে আমরা বিশেষ রাজী নই। এখানে পারম্পর্য-সূত্রের একটি শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কিংবা পরবর্তী যুগের ভক্তিবাদের প্রবল প্রভাব ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে প্রাকৃতিক হইতে মানবিক পর্যায়ে উন্নীত করিয়া অনেকটা রূপান্তরিত করিয়া থাকিবে।

ইহার পর সত্যযুগের অবসানে মানবিক আদর্শের ক্রমোন্নতির সূত্রে অবতার-পরম্পরা গ্রথিত। প্রথম মানবরূপী অবতার বামন; তাঁহার ত্রিপাদ রাখিবার স্থান সঙ্কুলান না হওয়ার অর্থ লেখক করিয়াছেন সে যুগে পরিষ্কৃত ভূমির অপ্রাচুর্য ও বলিকে পাতালে প্রেরণের অর্থ জঙ্গল পরিষ্কার করা। বামন অবতারের উল্লেখযোগ্য আর কোন কীর্তি নাই। ইহা মানবের প্রথম আবির্ভাব সূচিত করার জন্যই স্মরণীয়।

ত্রেতার প্রারম্ভে পরশুরাম-যুগের অধ্যাত্ম-তাৎপর্য-উদ্‌ঘাটনে লেখক অপূর্ব মনীষার পরিচয় দিয়াছেন—পৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক সত্য-আবিষ্কারে অত্যদ্ভুত নিপুণতা দেখাইয়াছেন। ভৃগুরাম যে যুগের প্রতীক তাহাতে সভ্যতা প্রথম সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। তাঁহার হস্তের পরশু জঙ্গলাকীর্ণ পৃথিবীকে পরিষ্কার ও মনুষ্যোপযোগী করিবার নবাবিষ্কৃত অস্ত্র। তাঁহার একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়-উৎসাদন পৃথিবীর অস্বাস্থ্যকর, সূর্যালোক-বায়ুপ্রবাহরোধী অরণ্যানীর বিরুদ্ধে পৌনঃপুনিক অভিযানের রূপক। 'ক্ষাত্রিয়' জাতিবিশেষকে বুঝায় না। কেন না জাতি-ভেদের প্রবর্তন একটু পরবর্তী যুগের ব্যাপার; ইহা ক্ষেত্রজ বৃক্ষের বোধক। বিশেষতঃ একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল উৎসাদিত হইলে ক্ষত্রিয়-বংশ নির্মূল

হইত ও ক্ষত্রবংশোদ্ভূত দশরথ ও রামের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। পরশু-রামের পিতৃমাতৃহন্তা সহস্রবাহু কার্তবীর্যার্জুন অসংখ্য শাখাপ্রশাখাসমন্বিত মহাকায় অর্জুন-দ্রুমেরই রূপক; এবং গৃহাশ্রয়হীন তরুতলবাসী জমদগ্নি ও তাঁহার পত্নী ভগ্ন বৃক্ষ-শাখার আঘাতেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। পরশুরামের মাতৃহত্যাবিষয়ক অপবাদ লেখক অতি সুকৌশলে ক্ষালন করিয়াছেন। মাতৃহন্তা কখনও অবতারের অনবদ্য কীর্তি-গৌরব অর্জন করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার অবতারত্বে উন্নয়নই এই অপবাদের যথেষ্ট খণ্ডন। এই অলীক অপবাদের উৎপত্তির মূল তাঁহার সংস্কারক-প্রবণ ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই নিহিত। তিনি সভ্যতায় সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজে গৃহনির্মাণ ও ভূমিকর্ষণের সূত্রপাত করেন। ধরিত্রী-জননীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত, মৃত্তিকা-খনন প্রাচীন যুগের সংস্কারে মাতৃহত্যার মত অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহার মাতার "রেণুকা" এই নামের মধ্যেই কর্ষণ-ফলে সূক্ষ্ম রেণুতে পরিণত ভূভাগের সাঙ্কেতিক অর্থের আভাস মিলে; যাহা হউক, তাঁহার পরবর্তী জীবনে পরশুরাম এই অমূলক কলঙ্ককে কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তৎপ্রবর্তিত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে অবতারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

(৩)

বামন ও পরশুরাম অবতারের প্রধান অবদান প্রয়োজনাত্মক, পৃথিবীর শিল্পকৃষিসম্পদের পরিবর্ধন, উন্নততর জীবনমানের প্রবর্তন। ইহার পরবর্তী অবতার শ্রীরামচন্দ্রে কিন্তু নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের উন্নতির পরাকাষ্ঠা। রামচন্দ্রের যুগে পৃথিবীর সহিত আদিম সংগ্রামের অবসান হইয়াছে, ভৌগোলিক আবেষ্টনের সহিত মানব জাতির একটা সুষ্ঠু, নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন বহির্জীবনে ভার-সাম্যপ্রাপ্ত মানব নিজ সমাজ-ও-পরিবার-ব্যবস্থা ও অধ্যাত্ম সত্তার দিকে অখণ্ড মনোযোগ দিবার অবসর পাইয়াছে। রামচন্দ্র এই অন্তঃপ্রকৃতিকে মার্জিত, বিশুদ্ধ করিবার যে নবোদ্ভূত প্রেরণা তাহারই ধারক ও বাহক, আদর্শপ্রধান, আত্মশুদ্ধি-মূলক নীতিবাদের প্রবর্তক। প্রথম জীবনে পরশুরামের সঙ্গে তাঁহার যে

শক্তি-পরীক্ষা হয়, তাহাতে বিজয়ী হইয়া তিনি নবযুগের উদ্বোধকরূপে পরিচিত হইলেন। পশুভাবাপন্ন আদিম সমাজে ক্ষাত্র শৌর্যের ভিত্তির উপরই চরিত্র-মহিমার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। কাজেই রামের প্রথম কীর্তি তাঁহার পূর্ববর্তী অবতার পরশুরামের দর্প চূর্ণ করা। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যেও শস্ত্রকৌশলের ক্রমোন্নতির নিদর্শন মিলে—স্পর্শযোগ্য ব্যবধানে ব্যবহার্য কুঠারের দূরপাল্লার ধনুর্বাণের নিকট পরাভব। যে নিয়ম-অনুসারে পরবর্তী-কালে আগ্নেয়াস্ত্রের নিকট ধনুর্বাণ পরাভূত, ব্যোমচারী বোমাবাহী বিমানের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র তিরস্কৃত, ঠিক সেই নিয়মেই নব-প্রহরণ-উদ্ভাবনকারী রামচন্দ্রের নিকট কুঠারধারী ভার্গবের নতি-স্বীকার। এইরূপে নিজ বাহু-বলের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়া রামচন্দ্র পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনে সে যুগের অনধিগম্য আদর্শবাদের অনুশীলনে, ত্যাগপূত, সত্যনিষ্ঠ, ক্ষমাস্নিগ্ধ জীবনাদর্শের দৃষ্টান্ত-স্থাপনে আত্মনিয়োগ করিলেন। রাবণের বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের অভিযান বর্বরযুগসুলভ বিজিগীষা-প্রসূত নহে,—ন্যায়নীতির মর্যাদা-রক্ষার্থ। তিনি পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে আদর্শ স্থাপন করিলেন তাহাই ভারতের ঐতিহাসিক যুগে তাহার জীবনযাত্রা-নিয়ামক নীতিরূপে গৃহীত হইয়াছে। ভারতের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ রামচন্দ্র-প্রবর্তিত বীজমন্ত্রেরই অনুশীলন ও বাস্তবজীবনে সম্প্রসারণ। অসভ্য বানরজাতি ও অন্ত্যজ গুহক চণ্ডালের সহিত তাঁহার মৈত্রী সাম্যবাদ-মূলক সমাজসংস্কার-প্রচেষ্টার পরোক্ষ ইঙ্গিত বহন করে। পক্ষান্তরে তপস্যানিরত শূদ্রকের প্রাণবধ নবপ্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রমধর্মে যাহাতে বিশৃঙ্খলা ও সমাজবিধ্বংসী স্বৈরাচার প্রবেশ না করে তাহারই প্রতিষেধক প্রয়াস। আধুনিক যুগের মানদণ্ডে এই কার্যের বিচার করিলে ঐতিহাসিক অনৌচিত্য-দোষের স্পর্শ লাগিবে।

কৃষ্ণ-চরিত্র সম্বন্ধে লেখক মোটামুটি বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করিয়াছেন। এখানে তাঁহার মৌলিকতার পরিচয় সেরূপ সুপরিস্ফুট নহে। তবে কৃষ্ণ-চরিত্র-বর্ণনায় তাত্ত্বিক মৌলিকতার অভাব কবি পূর্ণ করিয়াছেন গীতিকবিতার অকৃত্রিম সুরমাধুর্যে। তাঁহার কাব্য তত্ত্বা-লোচনা-প্রধান বলিয়া কবিতার ভাষা ও ভাবের সৌকুমার্য, কাব্যের সৌন্দর্যরীতি তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল না। যুক্তিতর্ক-আলোচনার দীর্ঘ-

গ্রথিত শৃঙ্খল পায়ে জড়ান আছে বলিয়া তাঁহার কবিতা ভাবরাজ্যের ঊর্ধ্বগগনে উঠিতে পারে নাই। তাঁহার কবিতার চমৎকারিত্ব ছন্দ-ঝঙ্কারে বা ভাষার সুললিত বিন্যাসে নহে, ছন্দের মাধ্যমে অতি-সূক্ষ্ম যুক্তি ও আলোচনার দাবী মেটানোর নিপুণ সাবলীলতায়। নদীপ্রবাহ যেমন ভূভাগের উচ্চাবচ-সংস্থিতির অলক্ষিত, অথচ অনিবার্য আকর্ষণ অনুবর্তন করিয়া চলে, লেখকের কবিতাও সেইরূপ নানা জটিল তত্ত্বালোচনার আঁকা-বাঁকা প্রণালী বাহিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। যুক্তিপরম্পরার ধারাবাহিকতা ও ছন্দের গতিভঙ্গিমা যেন এক সাধারণ প্রেরণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও সহযোগিতার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে স্থানে স্থানে নিছক কাব্যমাধুর্যের হয়ত কতকটা হানি হইয়াছে। যুক্তিচক্র-আবর্তনের কর্কশ শব্দ সময় সময় কাব্য-সরস্বতীর বীণাধ্বনিকে অভিভূত করিয়াছে; কবিতা-প্রবাহের মধ্য হইতে উদ্দেশ্যের অসম উপল-খণ্ড কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ অশোভনরূপে মাথা তুলিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর বিষয়ের সহিত রীতির, তত্ত্বপ্রতিপাদনের সহিত ছন্দোবিন্যাসের একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্য কোথাও উৎকটভাবে ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

(৪)

অনাগত ভবিষ্যতে যে কল্কি-অবতারের আবির্ভাব সম্বন্ধে আশ্বাসবাণী শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লেখক অতি আধুনিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করিয়াছেন। যেমন সুদূর অতীত, সেইরূপ ছায়া-ভাসে অনুভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনাতেও গ্রন্থকার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সূক্ষ্ম-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতে যে আত্মঘাতী নীতি অনুসৃত হইতেছে তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ম্লেচ্ছনিবহ-নিধনে করবালধারী কল্কি-দেবের আবাহন। লেখক ঋষির এই ভবিষ্যৎবাণীতে দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল; এবং সমসাময়িক উদভ্রান্ত জগতের সমস্ত কার্যকলাপ এই সম্ভাবনার আশু-পূরণের লক্ষণ। এই নিখিলব্যাপী জড়বাদের ধ্বংসস্তূপের উপর ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সৌধ গড়িয়া উঠিবে এবং সমস্ত জগতে নূতন শান্তি ও ধর্ম-সাধনার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। গ্রন্থকার এই প্রত্যাশিত, আকাঙ্ক্ষিত নব

পরিস্থিতির জয়-গানের মধ্যেই তাঁহার অপূর্ব গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। হিংসালোভবর্জিত, ব্রহ্মবাদের সার্বভৌম অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, মৈত্রী-সৌহার্দ্যবন্ধনে একীভূত ভবিষ্যতের এই মানব সমাজে অবতারবাদের চরম সার্থকতা মূর্তি পরিগ্রহ করিবে। গণনাতীত অতীত হইতে কল্পনাতীত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত নিগূঢ় ঐশী অভিপ্রায়ের ক্রমপ্রসারশীল জয়যাত্রা অস্খলিত গতিতে অগ্রসর হইবে। লেখকের কল্পনা এই বিরাট সম্ভাবনার প্রতিচ্ছবিকে প্রত্যক্ষ করিয়া গৌরবোৎফুল্ল হইয়াছে ও নিরাশাক্লিষ্ট যুগমানবের মনে নিজ জ্বলন্ত বিশ্বাস ও আস্তিক্য বুদ্ধির উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছে।

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর লেখকের এই গ্রন্থখানি যে প্রকাশিত হইতে চলিয়াছে ইহা বিশেষ আশা ও আনন্দের বিষয়। যে প্রকাশক সম্ভাবিত আর্থিক ক্ষতিকে উপেক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ-প্রকাশের ভার লইয়াছেন তিনি প্রত্যেক স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন। যদিও কবিশেখর মহাশয়ের রচনা প্রকাশের পূর্বেই বাঙ্গালার সুধী সমাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করিয়াছে, তথাপি প্রকাশক মহাশয়ের দৌত্যে ইহার বাণী যে সাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করিবার সুযোগ পাইল তাহার পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁহার প্রাপ্য। কবিশেখর মহাশয় বার্দ্ধক্যের চরম প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাঁহার এই অপূর্ব গ্রন্থখানিকে যে সাধারণের মধ্যে পরিবেশন করিবার সুযোগ পাইলেন, তাহার জন্য তাঁহার তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ সহজেই অনুমান করা যায়। আমরা তাঁহার এই সংকল্পসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি।

ধর্মবিষয়ক গ্রন্থরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য পাণ্ডিত্য-প্রকাশ নহে, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জাগরূক করা, অধ্যাত্মবোধের মন্দীভূত প্রবাহে নূতন স্রোতো'বেগ সঞ্চার করা। ধর্মপ্রেরণা আধুনিক যুগে যে প্রস্তরীভূত অন্ধ-সংস্কারে পরিণত হইয়াছে তাহাকে দ্রবীভূত করিয়া আবার চলমান হৃদয়াবেগের সহিত পুনঃসংযুক্ত করা, বাস্তব জীবনে ইহার প্রভাবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাতেই ইহার সত্যিকার সার্থকতা। কবিশেখর মহাশয় আমাদের শাস্ত্রবিৎ ঋষিরা যে কেবল উদ্ভট-কল্পনাবিলাসী ছিলেন না, তাঁহারা যে ধ্যান-দৃষ্টিতে পার্থিব জীবনের নিগূঢ় রহস্যোদ্ভেদে সক্ষম ছিলেন, তাহা নিঃসংশয়িতভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং স্বধর্মভ্রষ্ট আধুনিক হিন্দুর মনে ঋষি-বাক্যে আস্থা স্থাপন করিবার যে প্রবণতা ধর্মের নৈতিক প্রভাব-পুনরুদ্ধারের

প্রথম সোপান তাহা তিনি রচনা করিয়াছেন। সর্বান্তঃকরণে আশা করি যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই হিন্দুধর্মকাব্য সাহিত্যমূলক গবেষণায় উৎসাহ দান করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না—ইহা জীবনের মর্মমূলে নিজ পূর্বতন অধিকার স্থাপন করিয়া আস্তিকবুদ্ধিপূত কর্মযোগের প্রেরণা দিবে। সেই ঈপ্সিত পরিণতির পথপ্রদর্শকরূপ এই গ্রন্থখানির প্রতি আমি অনন্যসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। অবতারবাদ সম্বন্ধে সত্য, সুস্পষ্ট ধারণা অবতার-প্রতিষ্ঠিত আদর্শবাদকে জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে এই আশা দৃঢ়ভাবে পোষণ করিয়া এই ভূমিকার উপসংহার করিলাম।

শারদীয় পূজা

(১)

হিন্দুজাতির প্রধান উৎসব শারদীয় পূজা আবার আসন্ন হইয়াছে। কোন্ বিস্মৃত অতীতে যে ইহার উদ্ভব, কোন্ আশ্চর্য রূপকল্পনা ও ভক্তিপ্রেরণা ইহার মধ্যে আত্মবিকাশের পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাহা এখন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়। বাঙালীর যে স্বর্ণ-যুগে সমস্ত বৈষয়িক কামনা, সমস্ত সমাজ-বোধ, পরিবার-জীবনের সমস্ত মধুর সম্বন্ধ-বন্ধন ভক্তি-মহাসমুদ্রের মোহানায় আসিয়া মিলিত হইত, সেই সঙ্গমস্থলের মৃত্তিকা লইয়া আমাদের সাধনার দশভুজা মূর্তি নির্মিত। ধর্মকেন্দ্রিক জীবনের যে শতদলপদ্ম বাঙালীর অন্তরলোকে বিকশিত হইয়াছিল, দুর্গাপ্রতিমা তাহারই যেন বাহ্য প্রতীক ও প্রতিরূপ। এই পূজার আয়োজনে তাহার সমস্ত শক্তি ও ঐশ্বর্য নিয়োজিত হইত, এই উৎসবের দিন-কয়েকটি ব্যাপিয়া তাহার মর্ত্যজীবনে স্বর্গ-সুষমা নামিয়া আসিত, ইহার আগমনীতে তাহার মনের প্রত্যাশার সব তারগুলি বাজিয়া উঠিত, ইহার বিজয়াতে তাহার সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া এক অলৌকিক শোকের দিব্য প্রশান্তি পূর্ণতার প্রসাদ বিতরণ করিত। পূজা

শেষ করিয়া বাঙালীর চিত্ত এক নূতন তৃপ্তি ও সার্থকতাবোধে ভরিয়া উঠিত; সে প্রতি অঙ্গে নবশক্তির প্রেরণা অনুভব ও জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার নূতন পাথেয় সঞ্চয় করিত। দৈবশক্তির আরাধনার মধ্যে এরূপ সর্বাঙ্গীণ বৃত্তির অনুশীলন, এরূপ সার্বভৌম জীবনবিকাশের অনুভূতি, সর্বেন্দ্রিয়ের এরূপ উর্ধ্বায়িত পরিমার্জনার অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর কোন দেশের পূজাবিধির মধ্যে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

কোন একটি জাতীয় ধর্মোৎসবের মধ্যে অধ্যাত্ম সাধনা ছাড়া সামাজিক প্রয়োজন-বোধ ও চিত্তের আনন্দবিধান-উপাদান উদ্দেশ্যরূপে বর্তমান থাকে। সমাজের বিশেষ অবস্থা ও জাতির মনোধর্মের বিশেষ প্রেরণা এই সমস্ত উৎসবের পটভূমিকা রচনা করে। দুর্গার দশভুজা মূর্তি, তাঁহার অনুচর অন্যান্য দেবতা ও একটি সমগ্র দেব-পরিবারের একত্র উপস্থিতি জাতির মানস আকাঙ্ক্ষার বহুমুখী প্রসারেরই ইঙ্গিত বহন করে। দেবী পরিবার-জীবনের কেন্দ্রবিন্দুরূপে, সমস্ত সুখ-সৌভাগ্য সিদ্ধির উৎস-রূপে আমাদের পারিবারিক আদর্শেরই মূর্তি-কল্পনা। আমরা তাঁহার নিকট প্রসাদরূপে সংসার-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য-পূরণই প্রার্থনা করিয়া থাকি; আদর্শ গৃহী যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষা করেন তাহাই আমরা তাঁহার প্রসন্ন দাক্ষিণ্যের নিকট প্রত্যাশা করি। এই ঐশ্বর্যসমারোহপূর্ণ, ষোড়শোপচার-সমৃদ্ধ, অবারিত আতিথেয়তার আমন্ত্রণে উদার পূজাবিধি হইতে আমরা পারলৌকিক মুক্তি অপেক্ষা ঐহিক জীবনযাত্রার পূর্ণতম সম্প্রসারণ ও শ্রেষ্ঠতম সমৃদ্ধির আশাই পোষণ করি। যে জাতি পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে নিবিড়তম আনন্দের আস্বাদ ও সমাজজীবনের মধ্যে নিজ সত্তার ব্যাপকতম বিস্তার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে, সেই জাতিই এই মহাপূজার মধ্যে নিজ উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় আবিষ্কার করিয়াছে।

দুর্গাপূজা কোন নির্জন সাধকের আত্মসমাহিত ধ্যান-সাধনা নহে, ইহা সমগ্র সমাজের ভক্তির অর্ঘ্যদান। এই পূজার সহস্রবিধ আয়োজনে সমগ্র সমাজ-চেতনা নূতন করিয়া স্পন্দিত হয়। সমাজের প্রতিটি স্তরের ব্যক্তি ইহার মধ্যে নির্দিষ্ট কর্তব্যপালনের প্রেরণা অনুভব করে। এক বিরাট যৌথ প্রচেষ্টা এই পূজার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে আসিয়া সংহত হয়। তা ছাড়া পূজার আগমনের পূর্ব হইতেই প্রত্যেকটি পরিবার

উৎসবোচিত চিত্তমার্জনার আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়া যায়। যেমন ঘর-দুয়ার নূতন করিয়া পরিষ্কার হয়, যেমন বিবর্ণ, নানাচিহ্নাঙ্কিত দেওয়াল-গুলি নূতন বর্ণপ্রলেপে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, যেমন অঙ্গনে আলিম্পন-বিন্যাস দেবীর চরণ-চিহ্ন-ধারণের প্রত্যাশায় সূক্ষ্মরেখার কারুকার্যে আপনাকে বিকীর্ণ করে, যেমন ঘরে ঘরে নূতন বস্ত্রালঙ্কারের ও অঙ্গসজ্জার আয়োজন স্তূপীকৃত হয়, তেমনি মনের সংস্কারের দিকেও সকলের লক্ষ্য পড়ে। মনের আনাচে-কানাচে যে সমস্ত ধূলিজঞ্জাল জমিয়া থাকে, যে স্বার্থচিন্তার সঙ্কীর্ণতায় ইহা স্বাভাবিক প্রসারণশীলতা হারায়, যে অভ্যাসের জড়ত্ব ইহার প্রাণধর্ম ও স্বাধীন স্ফূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করে, উৎসবের প্রেরণায় সেগুলি দূরীভূত হইয়া মন আবার উহার স্বভাব-প্রসন্নতা ও ঔদার্যে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়, আবার ইহার ঊর্ধ্বায়ন-প্রবণতা বাধামুক্ত হইয়া দিব্যজীবনের মুক্তি আস্বাদ করে। কোন নিগূঢ় সংসার-বিমুখ ভাবসাধনায় নহে, কিন্তু সংসারের প্রীতি ও আনন্দরসের নির্মল ধারায় স্নাত হইয়া মানুষ দেব-সান্নিধ্য অনুভব করে, দৈব জীবনে সাময়িকভাবে উন্নীত হয়।

আধুনিক যুগে সমাজজীবন ও সামাজিক আদর্শের যে রূপান্তর সাধন হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্গোৎসবের বর্তমান উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রাচীন যুগেও এই পূজার অধ্যাত্মসাধনার দিকটাই বড় ছিল না, কিন্তু ভক্তিরসাপ্লুত মানস আবেগ সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ককে নূতন করিয়া অনুভব করিতে, উহার বিশুদ্ধ আদর্শটি, ধর্মের ও উচ্চতর নীতির সহিত উহার আত্মীয়তা-বন্ধনটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষভাবে উদ্যোগী হইত। দেবতত্ত্বরহস্যটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলেও সংসার যে দেবপূজার মন্দির, মানবিক সম্পর্কের মধ্যে যে দেবমহিমার ছায়াপাত হয় অন্ততঃ এই জ্ঞানটি সর্বসাধারণের চেতনায় দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইত। সূর্যের দিকে চাহিয়া থাকিবার শক্তি না থাকিলেও সূর্যের আলোক ও উত্তাপ যেমন আমরা আমাদের আবেষ্টনের মধ্য দিয়া অনুভব করি, তেমনি ঐশী শক্তি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না থাকিলেও আমরা আমাদের পার্থিব জীবন ও মানবিক সম্পর্কের ভিতর দিয়া উহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করি। দেবীপূজার মধ্য দিয়া অধ্যাত্ম সত্যানুভূতির পরোক্ষ জ্যোতি আমাদের সমস্ত ব্যবহারিক জীবনের উপর বিচ্ছুরিত হয়। অবশ্য এই দেব-

স্বরূপের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ খুব অল্পসংখ্যক সাধকের দ্বারা সম্ভব হইত। অন্যান্য সকলে রাজসিক পূজার আড়ম্বর ও সমষ্টিগত আনন্দ-উপভোগের মধ্যে পূজার সাত্ত্বিক ভাবের কিছুটা স্পর্শলাভ করিত। কিন্তু এই পূজার সমস্ত আনন্দ-আয়োজনকে সার্থক ও চিত্তবিশুদ্ধির হেতুভূত করিতে হইলে অন্ততঃ কিছু-সংখ্যক পূজকের মধ্যে অধ্যাত্ম অনুভূতির স্ফুরণ অত্যাবশ্যকীয়। নতুবা সমস্তই বৃথা হইবে। গঙ্গোত্রীর উৎস-মুখ রুদ্ধ হইলে উহার সমস্ত সমতল-বাহী প্রবাহ অর্থহীন আচারের শৈবালদামে গতিবেগ হারাইবে। পূজার পরোক্ষ উদ্দেশ্য—সামাজিক ঐক্যবোধ ও পারস্পরিক প্রীতি-সম্পর্ক-স্থাপন, মনের উদারতা ও আনন্দানুভব ব্যাহত হইবে। ভালবাসা প্রাণের বস্তু না হইয়া কৃত্রিম রীতি-অনুসরণে পর্যবসিত হইবে। আনন্দও উহার ভাবশুদ্ধি হারাইয়া ইতর ও স্থূল ভোগাসক্তির পর্যায়ে নামিয়া আসিবে। মোট কথা অন্তরে আলোক না জ্বলিলে বাহিরে উহার কোন আভাস দেখা যাইবে না। কৃত্রিম রোসনাই-এর মশাল জ্বালিয়া মনের আঁধার দূর হইবে না।

(২)

এখন পরিবর্তিত অবস্থায় ও জনসাধারণের শিথিল ধর্মবিশ্বাসের জন্য দুর্গোৎসবের অধ্যাত্ম তাৎপর্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এই পূজার মধ্য দিয়া জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহিত ভাবসংযোগ ও তাঁহার মহিমা-উপলব্ধি খুব কম ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। অধিকাংশ পূজামণ্ডপ এখন পারিবারিক কুলাচারের সাধনাপূত ঐতিহ্য ছাড়িয়া বারোয়ারির তরল আমোদের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। পুরোহিত ও পূজক-ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাস্ত্রধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ—মন্ত্রতাৎপর্যগ্রহণ তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির অতীত। নিতান্ত প্রাণহীন গতানুগতিকভাবে কোনও রূপে পূজার নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। যে গৃহস্থ পূজার অধিকারী তিনি ইহার আনুষঙ্গিক বৈষয়িক আয়োজন লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। হয়ত বলিদান ও আরতির সময় ছাড়া তিনি পূজামণ্ডপে উপস্থিত থাকিবারই সুযোগ পান না। গ্রামের অন্যান্য ব্যক্তি সারাদিনের মধ্যে একবার সময় করিয়া প্রতিমার দর্শন ও প্রণাম করেন। সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন ভাবগাম্ভীর্য বা ভক্তিপ্রণোদিত আত্মসমর্পণের ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করা যায়

না। কেবল ছেলেপিলের দল তাহাদের সরল বিস্ময়মণ্ডিত দৃষ্টি লইয়া প্রতিমার দিকে চাহিয়া থাকে ও তাহাদের আনন্দ-কলরবে পূজাঙ্গনের শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়া তোলে। রাত্রে গান-বাজনার আসর বা নাটক-অভিনয়ে অবশ্য লোকের ভিড় জমিয়া উঠে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে পূজার উপযোগী বিষয়-নির্ধারণ বা সম্ভ্রমশুচি মনোভাবের কোন পরিচয় মিলে না। দেবীর আগমন ও উপস্থিতির তিনটি দিন যে আমাদের সাধারণ আমোদ-প্রমোদ বা বিষয়চিন্তার দিনগুলি হইতে স্বতন্ত্র, ইহারা যে অধ্যাত্ম-লোকের বাণী বহন করিয়া আনিয়া আমাদের ঐহিক জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে বিরাটের সহিত সংযুক্ত করিতে প্রয়াসী, আমাদের কোন কর্ম বা চিন্তার মধ্যে, আমাদের জীবনযাপনের প্রণালীর মধ্যে এই সত্য সম্বন্ধে সচেতনতার কোন নিদর্শন দেখা যায় না।

অধ্যাত্ম উদ্বোধন ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ও তদ্‌ভাব-ভাবিত সামাজিক প্রথাগুলিরও ক্রমাবনতি দেখা দিয়াছে। আজকাল ৺বিজয়ার আলিঙ্গন ও প্রীতিবিনিময় সত্যিকার চিত্তবিশুদ্ধি আনে না —বৈরিভাবের অবসান, হিংসাদ্বেষের বিলোপ ও সকলের সহিত সৌহার্দ্য ও সহৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্ক-স্থাপনের সূচনা করে না। ৺বিজয়ার পরে জীবনযাত্রার কোন নূতন প্রেরণা, আত্মশোধনের কোন নূতন সঙ্কল্প জাগে না; গতানুগতিক জীবনধারার কোন পরিবর্তনই দেখা যায় না। চিত্তের সঙ্কীর্ণতা ও আনন্দহীনতার জন্য পূজার উৎসবের মধ্যেও হৃদয়বৃত্তির কোনও অসাধারণ আলোড়ন মনকে প্রাত্যহিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে সহায়তা করে না। যে ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতি আমাদের সাধারণ তরল আমোদ-প্রমোদের ফল, আমাদের ধর্মমূলক উৎসবেও তাহার বেশী কিছু লাভ করা যায় না। সুতরাং উৎসব হিসাবে ইহার যে উপকারিতা, তাহাও এখন বহুল পরিমাণে ক্ষুন্ন হইয়াছে।

(৩)

বর্তমান যুগে আমাদের সামাজিক কর্তব্যের পরিধি ও বৈচিত্র্য পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মধ্যযুগের গ্রাম্যজীবনে কয়েকটি সহজ, সুনির্দিষ্ট কর্তব্য ছিল। পরিবারকে প্রতিপালন করিয়া, ধর্মসঙ্গত গার্হস্থ্য জীবনযাপন করিয়া, গ্রাম্য-পূজাপার্বন ও সামাজিক মজলিসে যোগ দিয়া, সামাজিক বিধি

ও ধর্মের অনুশাসন-লঙ্ঘনের জন্য দোষীর দণ্ডবিধান করিয়া, দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি অক্ষুণ্ণ ও পূর্বপুরুষের কীর্তিকলাপ যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া আমাদের কর্তব্য নিঃশেষ হইত। সমাজপতির আদেশের নির্বিচার অনুসরণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। অবশ্য যতদিন সমাজপতির ধর্মনিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ প্রবল ও অবিকৃত ছিল, ততদিন গ্রাম্য সমাজের ছোটখাটো প্রয়োজনগুলি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হইত ও গ্রামের জনসাধারণের সমষ্টিগত কল্যাণ-সাধন ব্যাহত হইত না। কিন্তু সে-যুগের গ্রাম্য-সমাজের নিকট বৃহত্তর জগতের কোন আহ্বান পৌঁছাইত না। এখন গ্রাম্য-সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে হইলে নিঃস্বার্থ, কর্মকুশল ও মহত্তর-আদর্শ-প্রণোদিত নেতৃত্বশক্তির প্রয়োজন। নানা জনহিতকর পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে হইলে গ্রাম্য জনসাধারণের সক্রিয় সোৎসাহ সহযোগিতা অত্যাবশ্যকীয়। গ্রাম্য জীবনে নানা জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে; গ্রামের উপর নানা নূতন কর্তব্যের চাপ পড়িতেছে। করভার-নির্ধারণ, সমবায় প্রথার সাহায্যে গ্রামের বৈষয়িক কর্মের পরিচালনা, বিচার-ও-শাসন-সম্বন্ধীয় ছোটখাটো দায়িত্ব, গ্রামবাসীর মনে নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার ও গ্রামোন্নতিমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ—অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্ত দায়িত্ব-বহনে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। এই যোগ্যতার উৎস কি, কেমন করিয়া ইহা লাভ করা যাইতে পারে, ইহাই বিশেষ চিন্তার বিষয়।

বাঙালীর ঐতিহ্য হইতে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তাহার সমুদয় গৌরবময় কীর্তি ধর্মকেন্দ্রিক। তাহার রাজনৈতিক ইতিহাস তাহার জাতীয় জীবনের পূর্ণতার পরিচয় বহন করে না; ইহা তাহার সৃষ্টিধর্মী অন্তরের সহিত কোন অন্তরঙ্গ সংযোগে সম্পৃক্ত নহে। বাঙালীর প্রতিভা রাষ্ট্রগঠনে বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংরক্ষণে ততটা আত্মপ্রকাশ করে নাই, যতটা করিয়াছে ধর্মনীতিমূলক সমাজব্যবহারে ও অধ্যাত্ম-অনুভূতি-প্রেরিত কাব্য-রচনায় ও জীবনচর্যায়। যে সমস্ত যুগে তাহার মনে ধর্মচেতনা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে বা আধ্যাত্মিক রহস্যের গভীর উপলব্ধি চিত্তে এক উদ্বেলিত ভাব-হিল্লোলের উৎসমুখ উন্মুক্ত করিয়াছে, সেই সমস্ত যুগেই সে একাধারে স্মরণীয় কাব্য, সহনীয় সমাজ-সংস্থিতি ও আদর্শ-সাধনাপূত ব্যক্তিজীবন গড়িয়া তুলিয়াছে। বৈষ্ণবপদাবলী ও শাক্তপদাবলী কেবল যে ঐকান্তিক ভক্তি-

রসের অতুলনীয় কাব্যপ্রকাশ তাহা নহে: ইহা বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধনার পীঠভূমিরূপে এক সামাজিক ভাবপ্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছে ও সমস্ত সমাজকে এক নিবিড় ভাবানুভূতিতে কেন্দ্রসংবদ্ধ করিয়াছে। কাব্য যেমন সমাজচেতনাকে দৃঢ়তর করিয়াছে, তেমনি এই দৃঢ়তর সমাজচেতনা হইতে নূতন রসপ্রেরণাও লাভ করিয়াছে। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস একদিকে যেমন ঐশী প্রেমের রসলীলা অনুপম কাব্যমাধুর্যের মাধ্যমে ভক্তরসিকচিত্তে সংক্রামিত করিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে এই সর্বব্যাপী, সমাজ-মানস-উৎসারিত ভক্তি-বিহ্বলতার ভাবাবহে সহজ নিঃশ্বাস লইয়া আপন আপন কবিচেতনাকে অনুকূল-প্রতিবেশপুষ্ট করিয়াছেন। কবি সমাজকে ও সমাজ কবিকে পরস্পর-প্রভাবিত করিয়াছে। রামপ্রসাদের মাতৃসাধনা শুধু কবিগোষ্ঠীর জন্ম দেয় নাই, সাধকগোষ্ঠী ও সাধনার অনুকূল সমাজবিন্যাসকেও সুদৃঢ় করিয়াছে। সুতরাং ইতিহাসের সাক্ষ্যে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাঙালীর ধর্ম-চেতনাকে আবার নূতন করিয়া উদ্দীপ্ত না করিতে পারিলে নূতন কর্তব্যভার সে স্কন্ধে বহন করিতে পারিবে না। রাষ্ট্র-স্বাধীনতা তাহার মনে ভোগের স্পৃহা ও শক্তির মাদকতা জাগাইয়াছে, কর্তব্য-পালনে দীক্ষিত করে নাই। ইহার মধ্যে ধর্মের আশ্রয় সে কোথায়ও পাইতেছে না বলিয়া তাহার সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিবার প্রেরণাও পাইতেছে না। নিজের ব্যক্তি-জীবন, বৃহত্তর সমাজজীবন, প্রতিবেশীর সহিত সুস্থ সম্বন্ধ, পারিবারিক জীবনের আদর্শ, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ, জীবন-জিজ্ঞাসার সার্থক দিঙ্‌নির্ণয়—কোনটি সম্বন্ধেই একটা নিশ্চিন্ত নির্ভরের আশ্বাস তাহার দ্বিধাগ্রস্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে সত্যাভিমুখী করিয়া তুলিতেছে না। এই দিগন্তজোড়া বিহ্বলতা ও অন্ধ অনুসন্ধিৎসা হইতে তাহাকে মুক্তি দিতে পারে কেবল ধর্মের অচঞ্চল আলোক। তাই আজ শারদীয়া মহাপূজার প্রাক্‌কালে এই প্রশ্নই আকুলভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠে—এই পূজার মধ্যে আমরা কি আত্মোপলব্ধির মন্ত্রপ্রেরণা খুঁজিয়া পাইব? বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের মুখে মাতৃপূজার অনধিকারী সন্তানের গভীর খেদোক্তি আরোপিত করিয়াছেন তাহার তীক্ষ্ণতা ও মর্মদাহী অন্তর-বেদনা স্বাধীনতা-লাভের পরেও কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। এই অগ্নিস্রাবী অনুশোচনার প্রখর বিদ্যুৎ-চমকেই কি মা আমাদের পথ দেখাইবেন?

কৃষ্ণলীলা-উৎসব

(১)

বাঙলা সমাজে এক শারদীয়া দুর্গাপূজাকে বাদ দিলে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক উৎসবসমূহই জনচিত্তকে বেশী আকর্ষণ করে। জন্মাষ্টমী, ঝুলন, রাস, দোল—এই উৎসবগুলিই বাঙালী চেতনায় বেশী পরিমাণে দিব্য আনন্দরসের উদ্দীপক। দুর্গাপূজার আকর্ষণ কেবল দেবারাধনার মধ্যে নিঃশেষিত নহে—ইহার মধ্যে সামাজিক প্রথা, পারিবারিক প্রীতি, সহৃদয়তার আদর্শ বিবিধ চিত্ত-বিনোদন-ব্যবস্থা—সমস্ত সন্নিবিষ্ট হইয়া ইহার আবেদনের ব্যাপ্তি ও গভীরতা বাড়াইয়াছে। সাধারণ গ্রন্থের সহিত কোষগ্রন্থের (Encyclopædia) যে পার্থক্য, অন্যান্য পূজার সহিত ইহারও সেই পার্থক্য। একপক্ষ ধরিয়া ইহার সুদীর্ঘ আয়োজন, জীবনে এক নূতন আরম্ভের উদ্দীপনা, দীর্ঘ-বিচ্ছিন্ন প্রিয়-পরিজনের সহিত মিলনের শুভ অবসর, নূতন পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণচ্ছটা, পূজার তিনদিনব্যাপী অফুরন্ত আনন্দ-প্রকরণের ব্যবস্থা, প্রতিমা-নির্মাণের ব্যগ্র প্রতীক্ষা ও বিসর্জনের বিদায়-ব্যথাতুর শোকোচ্ছ্বাস, বিজয়ার প্রীতি-আলিঙ্গন ও সমাজের সমস্ত স্তরের মধ্যে এক নূতন ঐক্য-চেতনার অনুভূতি—এই সমস্ত বিচিত্র ভাব-সমাবেশ এই পূজাকে দেব-মানবের পুণ্য মিলন-ভূমির মর্যাদা-মণ্ডিত ও ইহাকে একটি জাতীয় মহোৎসবে উন্নীত করিয়াছে। পূজাবিধির দিক দিয়াও ইহা কেবল মহামায়ার একক অর্চনা নহে, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, শক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন মানবিক বৃত্তি ও আদর্শের উপাসনাও ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাছাড়া, ইহার বিরাট স্তব-স্তুতি-সমুচ্চয়ের মধ্যে এমন কোন দেবতা নাই, এমন কোন প্রাকৃতিক বা দৈবশক্তি নাই, ভক্তি-কল্পনার এমন কোন পাত্র নাই, যাহার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদিত হয় নাই। ইহারই ফাঁকে ফাঁকে প্রাকৃত জনসাধারণের অশালীন স্ফূর্তি-কোলাহল, রুচি-বিগর্হিত ইতর আমোদ, বিসর্জনের সময় ঢাক-ঢোলের কর্ণবিদারী বাদ্যের সমতালে নেশা-ভাং-মাতোয়ারা উদ্দাম নৃত্যগীত, নারিকেল-কাড়াকাড়ি বা গরুর দৌড়ের মত চিরাগত গ্রাম্য প্রথার

পালন প্রভৃতি অনুষ্ঠান নিম্নশ্রেণীর লোকেরও আনন্দ-বিধান-কল্পে পরিকল্পিত হইয়াছে। এই সার্বজনীন আনন্দ-যজ্ঞ হইতে কেহই বাদ পড়ে নাই।

তথাপি এই মহাপূজার জটিল তান্ত্রিক পদ্ধতি ও আয়োজন-বাহুল্য যে সব সময় ও সকলের মনে বিশুদ্ধ ভক্তিরসস্ফুরণের সহায়ক হইয়াছে ইহা বলা যায় না। ইহার ধুমধাম-আড়ম্বর, ইহার নিশ্ছিদ্র-নিবিড় মন্ত্রব্যূহ ও নানা-উপচারসমন্বিত ভোগ-ব্যবস্থা মনের মধ্যে ভক্তি অপেক্ষা একটা বিস্ময়-বিমূঢ় হতবুদ্ধি ভাবই জাগায় বেশী। এই সমস্ত বস্তু-স্তূপ ও বিধি-জটিলতা ভেদ করিয়া দেবানুভূতির প্রত্যক্ষ স্পর্শ খুব কম লোকের মনেই ভাব-রোমাঞ্চের উদ্রেক করে। অনেক সময় যাঁহার গৃহে পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে, তিনিও পূজামণ্ডপ হইতে অনুপস্থিত থাকিয়া ইহার বৈষয়িক দিকটার প্রতিই বেশী মনোযোগী থাকেন—দেবী-মহিমা-উপলব্ধি অপেক্ষা অতিথি-অভ্যাগত-নিমন্ত্রিতদের আদর-আপ্যায়নই তাঁহার নিকট বড় হইয়া উঠে। চণ্ডীপাঠ বা শান্তিজল-প্রক্ষেপের সময় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইতে হয়, যাহাতে তিনি পূজার লৌকিক ফল হইতে বঞ্চিত না হন। পূজার সামাজিক বা আনন্দসম্পর্কিত অঙ্গটাই যেন প্রতিযোগীরূপে খাড়া হইয়া অধ্যাত্ম-সাধনার নিবিড়তা হইতে মানব মনকে বিক্ষিপ্ত করে। অনুষ্ঠানের গোলকধাঁধার মধ্যে পথ হারাইয়া উপাসক কেন্দ্রবিন্দুবিচ্যুত হইয়া পড়ে। দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত অর্ঘ্য বহু পরিমাণে মানবের ভোগেই নিয়োজিত হয়—বিরাট সার্বজনীন উৎসবের ভীড়ের মধ্যে ভক্ত-হৃদয় আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে। মা তাহার দশভুজে এত প্রচুর আশীষ বহন করিয়া আনেন যে তাঁহার প্রসাদ-প্রাচুর্যের অন্তরালে তিনি নিজে যেন অন্তর্হিত হইয়া যান। আমরা মা-র দান উপভোগ করিতে করিতে মা-কেই ভুলিতে বসি।

(২)

ইহার সহিত তুলনায় বৈষ্ণব উৎসবগুলি সরল, সংক্ষিপ্ত ও মানবিক সহজ প্রীতি ও ভক্তিবৃত্তির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত। চৈতন্য-প্রেমধর্মের মূলেই যে বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির পার্থক্য দেখান হইয়াছে, তাহারই ফল-স্বরূপ বৈষ্ণব পূজাবিধি অনেকটা উপচার-প্রাধান্য মুক্ত। বিধি-নিষেধের জটিলতা পরিহার করিয়া ভগবানের নিকট অন্তর হইতে স্বতঃউৎসারিত

ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করাই বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ এবং এই আদর্শই উহার প্রধান উৎসবগুলিতে উদাহৃত হইয়াছে। জন্মাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব-অনুষ্ঠানে ভগবানের ঐশীশক্তির অনুভূতির সহিত নবজাত, দীর্ঘ-অপেক্ষিত শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ায় প্রাকৃতজনের যে সহজ আনন্দাতিশয্য তাহারই সমন্বয় ঘটিয়াছে। 'গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ'— এই বর্ণনায় কৃষ্ণ-জন্মে সমস্ত গোয়ালা-সমাজে যে প্রাকৃতজনসুলভ হর্ষোদ্বেলতার পরিচয় পাওয়া যায়, আমরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-উৎসবে, তাঁহার পরবর্তী জীবনের সমস্ত রহস্যাবৃত দুর্জ্ঞেয়তা সত্ত্বেও, সেই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের সুরটি ধরিয়া রাখিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার হইয়াও আমাদের নিকট চিরশিশু ও চিরকিশোর। বৈষ্ণব ভক্তের অনুভূতি, বৈষ্ণব পদকর্তার চিত্রাঙ্কন-দক্ষতা তাঁহার এই রূপটিই আমাদের অন্তরে চিরমুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। জন্মাষ্টমী-উৎসবেও এই চিরপরিচিত মূর্তিটির উপরে নূতন রং-এর প্রলেপ দেওয়া হয়, চির-পরিচিত আনন্দকে আবার নূতন করিয়া অনুভব করার আয়োজন হয়, মন্ত্র-তন্ত্রের কথা আমরা ভুলিয়া যাই, প্রাণে জাগে নব-রাগদীপ্ত ভাব-মূর্ছনা।

ঝুলন, রাস ও দোল এই তিনটি উৎসবে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার তিনটি আবেগ-ঘন মুহূর্তের পুনরভিনয় হয়। এই তিনটিরই মূলে ছিল ঋতু-উৎসব; বৈষ্ণব ধর্মের অপরূপ আত্মসাৎকরণ ও ভাবোন্নয়নপ্রভাবে ইহারা কৃষ্ণের দিব্যলীলার অঙ্গীভূত হইয়াছে। প্রকৃতি-সৌন্দর্যে যাহাদের উদ্ভব, অপ্রাকৃত, অলৌকিক রস-ব্যঞ্জনায় তাহাদের পরিণতি। কিন্তু তবুও এই অধ্যাত্ম রূপান্তর সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে সেই আদিম সৌন্দর্য-মোহ, ঋতু-পরিবর্তনে মানব-মনের চিরন্তন, আনন্দ-কুহকময় বিস্ময়বোধের স্পর্শটি অক্ষুণ্ণ আছে। এই উৎসবগুলির সঙ্গে প্রকৃতি-পরিবেশের, আমাদের চারিদিকের আবেষ্টনে নবীন হর্ষ-হিল্লোল-সঞ্চারের নিবিড় স্পর্শ অনুভূত হয়। ইহাদের তাৎপর্য হইল রূপের ভিতর দিয়া চিরসুন্দর, রূপপ্রস্রবণাত্মক ভগবৎ-সত্তার দিকে মানব মনকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া, প্রকৃতির নবীন সৌন্দর্যে প্রতীক্ষা-চঞ্চল ও পুলকাকুল মানব অনুভূতিকে অনন্তাভিসার-পথের যাত্রী করিয়া তোলা। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার নিগূঢ় ভাব-সত্য ও অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার এক একটি ইঙ্গিত এই উৎসবগুলির রসবিহ্বল, রূপোন্মত্ত বিলাস-চাতুরীর

মর্মস্থলে নিহিত আছে—প্রণয়-কলার পিছনে সাধনাতত্ত্বের সঙ্কেত ভক্ত সাধককে এক নূতন রহস্যলোকের সন্ধান দেয়।

(৩)

শ্রাবণ-পূর্ণিমা-তিথিতে ঝুলন-উৎসবের অনুষ্ঠান—এই মেঘ-জ্যোৎস্নার সংমিলনে ক্ষীণালোক-দীপ্ত, কুহকময় আকাশতলে নিখিল বিশ্বের অধীশ্বর-অধীশ্বরী পুষ্প-হিন্দোলায় আসীন হইয়া দোলন-সুখে বিভোর। কিন্তু শুধু তাঁহারাই কি দুলিতেছেন—এই দোলার কম্পন সমগ্র বিশ্বে সঞ্চারিত হইয়াছে। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরুলতা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সরোবর, প্রতিটি তৃণ ও ধূলিকণা এই পরমাত্মক আকর্ষণের সূত্রবদ্ধ হইয়া একটি ছন্দে দোদুলামান। আজ জগতের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত যুগল-সত্তা সমস্ত বিশ্বে তাঁহাদের ছন্দোময় প্রেরণা বিকীর্ণ করিয়াছেন। সৃষ্টির নিগূঢ় মূলতত্ত্ব, স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির একান্ত সংযোগ, যে অদৃশ্য আকর্ষণ সমগ্র বিশ্বের চেতন-অচেতন পদার্থনিচয়কে এক পরমাত্মার লীলারহস্যের অঙ্গীভূত করিয়াছে, আজ শ্রাবণ-পূর্ণিমায় মেঘ-বিচ্ছুরিত, ম্লান জ্যোৎস্নালোকে, আজ চেনা-অচেনার অপূর্ব মিলনলগ্নে তাহা অনুভূতির নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী না জানিয়া পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক কক্ষ-আবর্তনের অংশীদার—এই গতিরহস্য কিন্তু তাহাদের নিকট কোনদিনই প্রকটিত হয় না। কিন্তু এই পৃথিবী ও সৌরজগতের আকর্ষণ-বিকর্ষণের উপরে যে আর একটি অধ্যাত্ম জগতের টান আছে, বিশ্বের কেন্দ্রশক্তির সহিত তুচ্ছতম জাগতিক পদার্থের যে অচ্ছেদ্য মিলন-বন্ধন বিরাজিত সেই পরম অনুভূতিই আজ যুগল-লীলার মধ্য দিয়া আমাদের চেতনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। যে ছন্দ চিরন্তন, সমস্ত বৈষম্য-বিচ্ছেদ-আপাত-সঙ্ঘলনের মধ্যেও যাহা অবিচ্ছিন্নভাবে অনুস্যূত, এই উৎসবে ভগবানের সঙ্গে ছন্দোমিলনের সেই তত্ত্বটিই আজ আত্মহারা আনন্দ-প্লাবনের মধ্যদিয়া আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ-অনুভূত সত্যের ন্যায় ঝলসিত হয় রথযাত্রার দিনে জগন্নাথের রথরজ্জু-আকর্ষণের দ্বারা যে গতিরহস্যের প্রথম স্পন্দন অঙ্কুরিত হইয়াছিল, ঝুলনযাত্রার মেঘগুণ্ঠিত পূর্ণিমা রজনীতে তাহাই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িল।

(৪)

এই উৎসব-ত্রয়ীর মধ্যে রাসের শ্রেষ্ঠত্ব ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত। ভাগবতে বিস্তারিতভাবে এই রাস-উৎসব বর্ণিত হইয়াছে ও ইহা হইতে রাসেশ্বরী শ্রীরাধারও আত্মমহিমার প্রকাশ সূচিত হইয়াছে। ঝুলন ও দোল পরবর্তী কালের সংযোজনা, রাস কৃষ্ণলীলায় একটি কেন্দ্রীয় প্রকটন ও উহার অধ্যাত্ম তাৎপর্য, ইহার কৃষ্ণ-মহিমা-দ্যোতক অর্থটি স্বয়ং ভাগবতকারের দ্বারা স্বীকৃত ও ব্যাখ্যাত। এই রাসলীলায় ভক্তের অগ্নিপরীক্ষা ও ভক্তির তারতম্য-অনুসারে শ্রেষ্ঠ ভক্তের নির্বাচন হইয়াছে। ইহাতে দৃশ্যতঃ কামা-কর্ষণের অনুকূল প্রতিবেশ ও চিত্রকল্প-প্রয়োগের মাধ্যমে অপ্রাকৃত দিব্য-প্রেমের সর্বত্যাগী, সর্বমোহমুক্ত, চিরসুন্দরে আত্মসমর্পিত রূপটি ফোটানই শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত। ইহাতে একটানা, সুখমন্থর, সহজলভ্য প্রেমের কাহিনী নাই—আছে আকর্ষণ-প্রত্যাখ্যানে জটিল, অভিমান-আত্মশ্লাঘায় স্পর্ধিত, বিরহে খিন্ন ও অনুশোচনায় মর্মস্পর্শী এক দুরূহ প্রেম-সাধনার ইতিহাস। ইহার পরিণতি পূর্ণ মিলনানন্দে নহে—অনুসন্ধানের ব্যাকুল অনিশ্চয়তায়। ইহার প্রণয়ের অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ লীলার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। শারদকৌমুদীফুল্ল, পুষ্পগন্ধসুরভিত, বংশীধ্বনির মধুর আমন্ত্রণে মাদকতাময়, যমুনাতীর-সংলগ্ন অরণ্যভূমি এই প্রেমের সার্থক পটভূমিকা ও ইহারই চিত্ত-আলোড়নকারী, দুরতিক্রম্য আকর্ষণ প্রেমকে এত দুর্বার ও আবেগবিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। ঝুলনে বহিঃপ্রকৃতির আলোড়ন এত সুস্পষ্ট নহে; রাসে বহিঃপ্রকৃতি লীলার স্বরূপ-দ্যোতক। ঝুলনের সঙ্গে রাসের আর একটি পার্থক্য এই যে, ঝুলনের মৃদু ছন্দান্দোলন সমস্ত বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত, কিন্তু রাসের আবেদন ব্যাপক নহে—নিবিড়, অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাসের মণ্ডলীনৃত্য কয়েকটি গোপ-যুবতীকে লইয়া গঠিত, ইহার মধ্যে রাধার প্রাধান্য ক্বচিৎ স্বীকৃত, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহার স্থান অন্যান্য গোপীর সহিত সমপর্যায়ের। ঝুলনে ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনার ও রাসে ভাব-নিবিড়তা ও নাটকীয় গতিবেগ ও দৃশ্য-বৈচিত্র্যের প্রাধান্য। কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী গোপ-রমণীবৃন্দের বেশ-বিপর্যয় ও চিত্ত-বিভ্রমের মধ্যে নাটকীয়তার প্রভাব সুপরিস্ফুট। এই প্রেমের পথে অকস্মাৎ রাধার উদ্ভব—শ্রীকৃষ্ণের নির্বিকার মনোভাব ও ব্রজাঙ্গনাদের সংসারধর্ম-পালনের উপদেশ, প্রধানা গোপীর

আত্মাভিমানজাত, অসঙ্গত আবদার, আনন্দ-রস-সম্ভোগের মধ্যে নায়কের অতর্কিত অন্তর্ধান ও গোপীগণের অনুসন্ধান এই নাটকীয় রসেরই পরিপোষক। শেষ পর্যন্ত গভীর মিলনানন্দের, দিব্য রসবিস্তারের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা ও অতৃপ্তির রেশ রহিয়া যায়। প্রাণবঁধূকে পাইয়াও পাইলাম না, নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যেও কোথাও ফাঁক রহিয়াছে, যে মন্ত্রে প্রিয়কে বশ করা যায় সেই মন্ত্র মনকে দোলা দিয়া গেলেও আয়ত্ত করা গেল না—এইরূপ একটা সূক্ষ্ম, অনির্দেশ্য বেদনাবোধ চিত্তকে অহরহঃ পীড়িত করিতে থাকে।

আমাদের অনুষ্ঠিত রাসোৎসব কিন্তু নিখুঁতভাবে ভাগবতের কাহিনী ও ভাবরসকে অনুসরণ করে না—আমাদের রাস পূর্ণ, রসোচ্ছল মিলনেরই প্রতীক। তাহার কারণ ভাগবতকারের রাধা সম্বন্ধে যে অনিশ্চিত মনোভাব ছিল তাহা আমরা অতিক্রম করিয়াছি, তিনি আমাদের নিকট যাহা অর্ধব্যক্ত রাখিয়াছিলেন সেই 'রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা' আমরা পরবর্তী পুরাণ ও চৈতন্যদেবের দৃষ্টান্ত ও বৈষ্ণবপদাবলী হইতে নিশ্চিতভাবে জানিয়াছি। ভাগবতের রাধা পরীক্ষা বিনা আত্ম-প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসিনী, অ-নামিকা নায়িকা, আমাদের রাধা সর্বপরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণা, কৃষ্ণ প্রেমে পূর্ণাধিষ্ঠিতা, রাসলীলার শুভ গৌরবভাগিনী মহাশক্তি। কাজেই আমাদের রাসানুষ্ঠানে অন্য গোপীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, নায়িকার কোন আদর্শচ্যুতি নাই, কোন অস্বস্তিকর ইঙ্গিত নাই। আমাদের হৃদয়-সমুদ্র এই প্রেমকৌমুদী-প্লাবনে কানায় কানায় পরিপূর্ণ, আমাদের অন্তর-সিংহাসনে যুগল সত্তা এক অভিন্ন একাত্মতায় পরস্পরবিলীনরূপে বিরাজিত।

দোললীলা প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যে বহুল-বর্ণিত বসন্তোৎসবের ধর্মভাব-সংস্কৃত প্রতিরূপ মাত্র। বসন্তে বহিঃপ্রকৃতিতে নবজীবনের যে প্রাণোচ্ছলতা ও বর্ণোচ্ছ্বাস জাগে, মানব মনেও তাহার রক্ত-দীপন আভা স্বতঃই সঞ্চারিত হয়। দোল-উৎসব অন্তরে ও বাহিরে এই যে দুর্বার প্রাণশক্তি ও বর্ণাঢ্য ভাববিলাস বিচ্ছুরিত হয়, তাহাকেই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার অধ্যাত্ম পরিবেশে নূতনভাবে বিন্যাস করিবার প্রয়াস। শীতের কুয়াসামুক্ত দিগন্তে অশোক-পলাশ-কিংশুকের যে রক্তিমা-সমারোহ, আবীর-কুম্‌কুমের অজস্র প্রক্ষেপে প্রেমিক-প্রেমিকার অঙ্গকান্তি অনুরঞ্জিত করার মধ্যে যে দুরন্ত হৃদয়াবেগের নিঃসরণ তাহাই রাধাকৃষ্ণের দিব্য প্রেমে আরোপিত হইয়া এক অতীন্দ্রিয় রস-তাৎপর্যে

মণ্ডিত হইয়াছে। এখানে ধর্মবোধ প্রাকৃত মনোভাবকে আত্মসাৎ করিয়া উহার বিশুদ্ধি-সাধনের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু হয়ত সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই। ধর্মের ক্ষীণ পালিশের নীচে জীবনের আদিম বর্বর উদ্দামতা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে নাই, হোলির অসংযত অশালীনতা দোলের ধর্মানুশাসনকে বিদীর্ণ করিয়া উন্মত্ত আতিশয্যের সহিত প্রকটিত হইয়াছে। যেখানে প্রকৃতির প্রাণ-চেতনা বা মানুষের ভাবোচ্ছ্বাস অত্যন্ত প্রখর, সেখানে উহা সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় রূপান্তর স্বীকার করে না। ঝুলন পূর্ণিমার স্নিগ্ধ, মেঘ-ম্লান চন্দ্রিকা ও রাসের দুগ্ধ-ধবল, ঈষৎ-হিমকণা-স্পৃষ্ট জ্যোৎস্না-প্লাবনের প্রাকৃতিক জীবন ও ইহাদের প্রভাবে মানবের প্রসন্ন-মধুর মনোভাব, অধ্যাত্ম সাধনার সহায়করূপে গৃহীত হইবার বিপক্ষে কোন বিদ্রোহ করে না—প্রকৃতির শান্তি সহজেই ধর্মসাধনার গভীরে বিলীন হইয়া যায়। দোলের মধ্যে প্রাকৃত মনোবৃত্তির বে-পরোয়া বিদ্রোহ খানিকটা থাকিয়াই গিয়াছে। তথাপি বৈষ্ণব ধর্ম বসন্তের উদ্দামতাকে যে বিশ্বছন্দ-সুষমার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিশ্বদেবতার অঙ্গকান্তি-প্রসাধনের কার্যে নিয়োগ করিতে, প্রবৃত্তির অদম্য উচ্ছ্বাসকে যে দেবপূজার অনুষ্ঠান-মন্ত্রে উদ্বর্তিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে, তাহা সর্বথা অভিনন্দনীয়। প্রকৃতির প্রাণময় সৌন্দর্য, অন্তরের স্বতঃ-উৎসারিত আবেগ—ইহাদিগকে লইয়া চিরসুন্দরের অর্ঘ্য-ডালা সাজান—এই ত ধর্মের আদর্শ এবং এই শিব ও সুন্দরের মিলন বৈষ্ণবধর্মে যতটা সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছে তাহার তুলনা অন্যত্র মেলা দুরূহ।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস বিচিত্র ও বহুমুখী। বাল্য—কৈশোরে বৃন্দাবন-লীলা, যৌবন ও প্রথম প্রৌঢ় বয়সে মথুরা-ও-দ্বারকা-লীলা, পরিণত বয়সে কুরুক্ষেত্র-লীলা ও অন্তিম পর্যায়ে আত্মসংহরণের অব্যবহিত পূর্বে প্রভাস-লীলা। এই লীলাগুলি সবই অপূর্ব ও মানবিক কর্তব্য-পালনের ছদ্মবেশে ঐশী মহিমার প্রকটন। ইহাদের মধ্যে বৃন্দাবনলীলা গার্হস্থ্য ও

ব্যক্তিগত জীবন-সম্পর্কিত। পরবর্তী লীলাগুলি প্রধানতঃ রাজনীতি ও জনশিক্ষামূলক। কুরুক্ষেত্রে গীতার যে অপূর্ব ধর্মরহস্য-ব্যাখ্যা তাহা অর্জুনকে রাজনৈতিক কর্তব্যে প্রণোদিত করার উদ্দেশ্যমূলক। সমস্ত লীলার সহিত তুলনায় বৃন্দাবনলীলা এক অপরূপ রসমাধুরী-সিঞ্চিত। ইহাতে পারিবারিক জীবনের ও অপ্রাকৃত প্রেমের যে বাৎসল্য ও মধুররসপ্রধান চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, সাধারণ লোকের নিকট উহাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য পরিচয়। সাধারণ মানুষের রসকল্পনা, ভক্তি ও ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধি বৃন্দাবন-লীলাকে অবলম্বন করিয়াই স্ফুরিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাল, ব্রজরাখাল ও গোপীবল্লভমূর্তি তাঁহার আর সমস্ত পরিচয়কে ছাপাইয়া আমাদের মনে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ভগবান এখানেই মানুষের মধ্যে নামিয়া আসিয়া, মানুষের ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনে জড়িত হইয়া, মানবের রসানুভূতির আস্বাদ্য হইয়াছেন ও বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর ন্যায় গৃহস্থালীর সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যেই অসীমের লীলারহস্য উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। আমরা বৃন্দাবনলীলার কথা স্মরণ করিতে গিয়া ঐশ্বর্যের দিকটা প্রায় ভুলিয়া যাই; বিশুদ্ধ মধুর রস ও অপার্থিব সৌন্দর্যের মায়াই আমাদের সমস্ত চেতনাকে অধিকার করিয়া রাখে।

অথচ ঐশ্বর্যের পটভূমিকায়ই এই সান্দ্র মাধুর্যবিগ্রহের উদ্ভব। কংস-কারাগারে মেঘবিদ্যুৎ-চমকিত নিশীথে যাঁহার জন্ম, তাঁহার প্রথম আবির্ভাবেই ঐশ্বর্যলীলার প্রকটন। মাতাকে নিজ ভগবৎ-মহিমায় প্রবোধিত করিয়া, পিতাকে নিজ অঙ্গদ্যুতিতে আঁধারের মধ্যে পথ দেখাইয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যমুনার স্ফীত বারিরাশির বাধা অতিক্রম করিয়া, তাঁহার কংস-কারাগার হইতে নিষ্ক্রমণ ও নন্দালয়ে উদয়। নন্দালয়ে আসিয়াই ভগবান মানবিক স্নেহ-সখ্য-প্রেমের উচ্ছ্বসিত সাগরে ডুবিয়া গেলেন। মাতার সদা-শঙ্কিত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও শিশুর খাওয়া-পরা লইয়া অসীম উৎকণ্ঠা, সখাদের খেলাধূলার আমন্ত্রণ, গোপীদের প্রেমনিবেদনের আত্মবিস্মৃত তন্ময়তা—এই সবই যেন ভগবানকে নিজের স্বরূপ-মহিমা ভুলাইয়া দিয়া তাঁহাকে আমাদের ঘরের ছেলেতে পরিণত করিল। মানুষ স্মরণাতীত কাল হইতে ভগবানকে একান্ত আপনরূপে পাইবার যে কামনা পোষণ করিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার মধ্যে তাহা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল। বৃন্দাবনের রসোচ্ছ্বাসকে অবলম্বন করিয়া

বৈষ্ণবীয় দর্শনশাস্ত্র ও সাধনাক্রম নির্ধারিত হইল। ভালবাসার মহিমা, ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠত্ব, একান্ত আত্মসমর্পণের স্নিগ্ধ প্রশান্তি, ভগবানের রসঘন, আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি—এ সমস্তই ব্রজলীলার ঘনীভূত রসনির্যাসরূপে মানব-চিত্তকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে।

এই রসসাগরে ভগবানের ঐশ্বর্যপ্রকাশক লীলাসমূহের যেন বুদ্‌বুদের মত প্রকাশ ও বিলয় ঘটিয়াছে। পূতনা ও কংসপ্রেরিত অন্যান্য অসুর-বধ যেন শৈশবলীলারই একটা ক্রীড়াকৌতুক-জাতীয় মধুর ভঙ্গিমার প্রকাশ। এখানে শক্তির পরিচয় খেলাধূলার খেয়ালী উদ্দেশ্যহীনতার আড়ালে প্রচ্ছন্ন। ভগবান স্তনপান করিতে করিতে অথবা শিশুর মত হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে বা বনমধ্যে কৈশোর-ক্রীড়ার উপলক্ষ্যে অসুর সংহার করিতেছেন ও ব্রজবাসিগণ স্নেহাবেশে অন্ধ হইয়া তাহার এই অলৌকিক কার্যগুলিকে দৈবানুগ্রহ মনে করিয়া কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছেন। শৈশবের দুরন্তপনায়, আদর-আবদারে ভগবান নিজ ঐশ্বর্যের স্মৃতিটি তাঁহার পরিজনবর্গের মন হইতে মুছিয়া দিবার জন্যই সচেষ্ট। অবশ্য রজ্জুবন্ধন ও মৃত্তিকাভক্ষণের লীলায় মাতার নিকট ঐশ্বর্যের অনিবার্য অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, কিন্তু সমুদ্রের গভীরে মেঘের ছায়ার ন্যায় স্নেহ-উদ্বেল মাতৃহৃদয়ে বাৎসল্যের বায়ুহিল্লোলে ঐশ্বর্যের প্রতিবিম্ব শীঘ্রই মুছিয়া গিয়াছে। এই বাল্যলীলাগুলি বাঙলার সাধারণ গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনে এমন একটি রসোচ্ছলতা ও দৈবী লীলার ইঙ্গিত সঞ্চার করিয়াছে যাহার ফলে ইহাদের সমস্ত ভিতরকার তাৎপর্যটি এক দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে আমরা শিশুর মুখে দেব-প্রতিচ্ছায়া দেখিতে শিখিয়াছি, কৈশোর-চাপল্যের মধ্যে এক অপার্থিব ব্যঞ্জনার লীলা লক্ষ্য করি, ও আমাদের স্নেহ-সখ্য-প্রেমের মধ্যে এক লোকাতীত আবেগের মূর্ছনা অনুভব করিতে পারি।

অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার মধ্যে দুইটি ঘটনাকে কৈশোর-লীলাচাপল্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। ইহাদের মধ্যে একটি কালীয়নাগ-দমন ও দ্বিতীয়টি গোবর্ধন-ধারণ। কালীয়দমনের ব্যাপারে পরিণত বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির সুপরি-কল্পিত প্রয়োগ দেখা যায়। অন্যান্য অসুর-সংহারের ক্ষেত্রে কেবল বাধার অপসারণই উদ্দেশ্য; এখানে ক্রূর হিংসককে ভক্তে পরিণত করার ন্যায় অবতার-লীলা-প্রকটনই লক্ষ্য। কালীয় নাগের বিষস্রাবী শত ফণায়

শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যলীলা নিতান্ত বিসদৃশ স্থলেও তাঁহার মাধুর্যশক্তি-প্রকাশের, তাঁহার বিশ্বমনোহারী বিভূতিরই উদাহরণ। তিনি কালীয়কে প্রাণে মারেন নাই, তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া তাহার বিষ-প্রস্রবণকে অমৃত-ধারায় পরিশুদ্ধ করিয়াছেন। গোবর্ধন-ধারণ ও ইন্দ্রের আধিপত্য-অস্বীকার আশ্চর্য রকম আধুনিক মনোভাবের পরিচয় বহন করে—প্রচলিত প্রথার বিরোধ ও সংস্কারমুক্ত স্বাধীনচিন্ততার বিকাশ এই লীলাটির উপর অনন্য-সাধারণ মর্যাদা আরোপ করিয়াছে। যিনি ভক্তি ও প্রেমরসে সর্বদাই বিগলিত, পরিবেশের সঙ্গে যাঁহার অবিচ্ছিন্ন মাধুর্যের বন্ধন, তিনি যে প্রয়োজন-স্থলে তীক্ষ্ণ যুক্তিধারার নিপুণ প্রয়োগে সক্ষম ও অবিচলিত দৃঢ়সংকল্পে যে-কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত—এই বিপরীত মনোবৃত্তির সমন্বয়ই তাঁহার ভগবত্তার নিদর্শন।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা এক শাশ্বত, চিন্ময় মধুর রসের অফুরন্ত প্রস্রবণ। ভক্তের ভক্তিরস-উদ্দীপনে, ভগবান ও ভক্তের সমস্ত ব্যবধান দূর করিয়া উভয়ের মধ্যে একান্ত আত্মীয়তার সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠায় ইহার প্রভাব চিরন্তন। বৃন্দাবনের লীলাকুঞ্জে ভগবানকে লাভ করা নিঃশ্বাস-বায়ুর মতই সহজ, তরুণ মনে প্রেমের স্ফুরণের মতই অনিবার্য, জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক ছন্দের মতই স্বতঃই অনুসরণীয়। এখানে জ্ঞানের অভিমান নাই, সাধনার উৎকট সচেষ্টতা নাই, সংসার হইতে মনকে সরাইয়া ভগবৎ-চরণে সন্নিবিষ্ট করার দুরূহ মানস প্রস্তুতি নাই। এখানে বাঁশীর টানে ঘর হইতে বাহির হওয়া যায়, প্রবৃত্তির রমণীয় আকর্ষণে নিবৃত্তি-মার্গের পথিক হওয়া যায়। দেহসৌন্দর্যের অনুসরণে চিন্ময় সৌন্দর্যের রহস্যলোকে প্রবেশ করা যায়, চিত্তবৃত্তির নিরোধে নয়, উহাদের সম্পূর্ণ বিকাশেই পরম সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে এক অভূতপূর্ব শুভ পরিস্থিতির ফলে সাধনা আপনা হইতেই অগ্রসর হয়, যে পথ বন্ধ হইবার তাহা বন্ধ হয় ও যাহা খুলিবার তাহা উন্মুক্ত হয়, চরম সিদ্ধি এক অভাবনীয় দৈবানুগ্রহে শুধু চাওয়ার জোরেই করতলগত হয়। এখানে মায়া প্রলুব্ধ করে না, প্রতিবন্ধক অতি সহজেই অপসারিত হয়, নিষেধের ক্ষীণকণ্ঠ আমন্ত্রণের বাঁশীর তানে ডুবিয়া যায়, চিরকিশোর প্রেম পরম প্রাপ্তির রূপক-রূপে অপ্রাকৃত বিভায় দীপ্ত হইয়া উঠে। যুগ যুগ ধরিয়া বিশ্বাসী ভক্তের নিকট বৃন্দাবনে অপ্রকট-লীলা অভিনীত হইয়া আসিতেছে। ভগবান

যে তদুৎসর্গীকৃতপ্রাণ গোপীগণকে আশ্বাস দিয়াছিলেন—'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'—তাহাই কি ব্রজলীলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি নহে? যে ভক্তের জীবনে ব্রজলীলার মধুর রস অক্ষয় হইয়া আছে, তিনিই ধন্যতম, কেননা কৃষ্ণলীলার যে সারকথা, যে মর্মবাণী তাহাতেই তিনি লব্ধপ্রবেশ হইয়াছেন।

কৃষ্ণলীলা—গোবর্ধন-ধারণ

হিন্দুধর্মের সমস্ত অবতারের মধ্যে কৃষ্ণ-অবতারের মধ্যেই ঐশী শক্তির নিগূঢ় রহস্যটি অভিব্যক্ত হইয়াছে। অন্যান্য অবতারসমূহের আবির্ভাবের একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য-সাধনেই তাঁহাদের সমস্ত লীলাভিনয় নিয়োজিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের উদ্দেশ্য কিন্তু বিচিত্র ও বহুমুখী, কোন বিশেষ কর্মধারায় সীমাবদ্ধ নহে। তাঁহার কর্মপরিধি বহুবিস্তৃত, বহু আপাত-সংযোগহীন অধ্যায়ে বিভক্ত ও স্থূল দৃষ্টিতে কোন বিশেষ কেন্দ্রানুগরূপে প্রতিভাত হয় না। তাঁহার বৃন্দাবনলীলা, মথুরা-ও-দ্বারকালীলা, কুরুক্ষেত্রলীলা ও প্রভাসলীলার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায় না—নিয়তিরহস্যের মতই ইহা দুরধিগম্য ও কার্যকারণ-শৃঙ্খলে অনাবদ্ধ। তাঁহার চরিত্রে বহু পরস্পরবিরোধী গুণের সহাবস্থান; তাঁহার জীবনের এক পর্ব হইতে পরবর্তী পর্ব অনুমিত হয় না। বৃন্দাবনে তিনি চিরকিশোর, অপ্রাকৃত মধুর রসের ঘনীভূত বিগ্রহ। তাঁহার শক্তি-প্রকাশও লীলা-চাপল্যের লক্ষণাক্রান্ত ও মাধুর্যে অভিসিঞ্চিত। মথুরা-ও-দ্বারকালীলায় তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিভার ও গৃহস্থ জীবনের অদ্ভুত বিকাশ। তিনি কংসের অত্যাচার-নিবারণ ও তাহার ধ্বংসসাধন করিয়া তাঁহার অবতারত্বের যে ঘোষিত উদ্দেশ্য তাহা পূর্ণ করিলেন। কিন্তু এইখানেই যদি তাঁহার লীলার পরিসমাপ্তি ঘটিত, তবে তাঁহার মহিমান্বিত, দিব্য-জ্যোতির্ময় পরিচয়ের অনেকখানিই অজ্ঞাত থাকিত। তিনি পরিচিত

থাকিতেন যদুবংশের একজন সামন্ত-প্রধান, ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর এক অর্ধখ্যাত নায়করূপে। বহু-সপত্নী-বিক্ষুব্ধ পরিবারের কৌশলময়, সমস্যা-সমাধানদক্ষ গৃহকর্তারূপেই তিনি তাঁহার অসংখ্য ভক্তের নিকট পরিচিত থাকিতেন। মথুরা-দ্বারকা লীলায় তাঁহার যে অসাধারণ রাষ্ট্রপ্রতিভা সংকুচিত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল তাহা তাঁহার কুরুক্ষেত্রলীলার উত্তাল-তরঙ্গ-সমাকুল সংঘর্ষ-সমুদ্রের মধ্যেই দিব্যতম পরিণতি লাভ করিয়াছে। কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের প্রস্তুতি-পর্বে ও ইহার সংঘটনকালে তাঁহার কূটবুদ্ধি, ক্ষুরধার মনীষা, দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক আদর্শবোধ আশ্চর্য দীপ্তিতে বিচ্ছুরিত হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বেই তাঁহার গীতারহস্য-ব্যাখ্যাই তাঁহার দেবলীলার উজ্জ্বলতম অধ্যায়। ইহাতে তাঁহার শাস্ত্রমন্থনকারী, অধ্যাত্মতত্ত্বের নিগূঢ়তম রহস্যভেদী, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-সমন্বয়ে মানব জীবনের পরম আদর্শ-সন্ধানী প্রজ্ঞাদৃষ্টি দেদীপ্যমান। এই গীতারহস্য তাঁহার দুজ্ঞের্য় চরিত্রের কোন্ অনমুমেয় গভীরতা হইতে উৎসারিত হইয়াছে, তাঁহার পূর্ব জীবনের বিচিত্র কাহিনী হইতে তাহার কোন নির্দেশ মিলে না। শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ইতিপূর্বে আর যে রূপেই কল্পনা করিয়া থাকি না কেন, তাঁহার এই যুগোপদেষ্টা, মানব-জীবনের চিরন্তন দিশারী রূপটি কল্পনা করি নাই। বৃন্দাবনের মধুর-রসপিপাসী প্রেমিক, মথুরা-দ্বারকার সংসারকর্তব্যনিষ্ঠ গৃহস্থ, কুরুক্ষেত্রের কূটকৌশলী মন্ত্রণাদাতা ও নীতিনিয়ামকের অন্তরালে কোথায় যে গীতাকারের এই বিরাট্ বিশ্বাতিসারী রূপ লুকান ছিল তাহার কোন ইঙ্গিতও দুর্নিরীক্ষ্য। আর একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, অন্য কোন অবতারই নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন নাই; প্রচলিত ধর্মকেই তাঁহাদের আচরণের দৃষ্টান্তে পরিশুদ্ধ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতোক্ত নিষ্কামধর্মপ্রবর্তনের দ্বারা আমাদের জীবনে এক বিপ্লব আনিয়াছেন, আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত ধর্ম-সাধনাকে এক কেন্দ্রীয় আদর্শে সংহত করিয়া ও জীবনযাত্রার নিয়ামক শক্তি-রূপে দেখাইয়া এক নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়াছেন। তিনি (বুদ্ধকে বাদ দিয়া) একমাত্র অবতার যিনি নবধর্ম-প্রতিষ্ঠাতার গৌরবে আসীন।

তাঁহার বৃন্দাবন-জীবনের একটিমাত্র লীলায়—গোবর্ধন-ধারণে—তাঁহার ধর্ম-ব্যাখ্যাতারূপের একটি সুদূর ক্ষীণ ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। তাঁহার বৃন্দাবনলীলা হয় মধুর-ও-বাৎসল্যরসবিষয়ক, না হয় অসুর-ধ্বংসাত্মক।

ব্রহ্মমোহণ ও গোবর্ধন-ধারণ—এই দুই অধ্যায়ে শীর্ষস্থানীয় দেবতাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অবশ্য ব্রহ্মার আপাত-বিরোধিতা তাঁহার কৃষ্ণলীলারহস্য-আস্বাদনের জন্য একটা ছলনা মাত্র। শেষ পর্যন্ত অপহৃত গোপবালক ও ধেনুবৎস প্রত্যর্পণ করিয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সর্বাতিশায়ী ঐশ্বর্যশক্তির নিকট ভক্তিবিহ্বলচিত্তে নতি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যে যে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিলেন তাহাতে নিজেই বন্দী হইয়া উদ্ধারের জন্য পরমদেবের মার্জনা ভিক্ষা করিয়াছেন। বোধ হয় এই পরাজয়ের পর হইতেই ব্রহ্মার পূজা ভারতবর্ষে ক্রমশঃ বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। সূর্যকিরণে নক্ষত্রের ন্যায় ব্রহ্মার ক্ষুদ্রতর মর্যাদা পূর্ণ ঐশী মহিমার জ্যোতিঃসমুদ্রে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। ব্রহ্মস্তুতি ব্রহ্মার স্বতন্ত্র দৈব-অস্তিত্বলোপের ভূমিকা।

ইন্দ্রের সহিত সংঘর্ষ কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত লীলাবিকাশ। ইন্দ্র বেদের একজন শ্রেষ্ঠ দেবতা, ইন্দ্রপূজা বেদের সময় হইতেই প্রচলিত আছে। বর্ষণের অধিষ্ঠাতা দেবতারূপে, শস্য-উৎপাদনের নিয়ন্তারূপে, কৃষিজীবী ও পশুপালক-সমাজে তাঁহার প্রাধান্য স্বতঃস্বীকৃত। হঠাৎ বাল্যক্রীড়ারসে নিমগ্নচিত্ত কৃষ্ণের দৃষ্টি এই ইন্দ্রযজ্ঞের চিরপ্রচলিত প্রথার উপর পড়িল। তিনি সুপ্রাচীন প্রথার উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া গোপসমাজে ইহার অনাবশ্যকতার কথা প্রচার করিলেন ও উহার পরিবর্তে গো-ব্রাহ্মণের পূজা, দরিদ্রসেবা ও গোবর্ধন পর্বতকে মাল্যভূষিত করিয়া উহার সংবর্ধনা করিবার নির্দেশ দিলেন। কৃষ্ণের এই ধর্মসংস্কারক রূপটি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ও তাঁহার বাল্যলীলার সাধারণ প্রকৃতির একটা অসাধারণ ব্যতিক্রম। তিনি যে যুক্তিপ্রয়োগে ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করিলেন তাহা অনেকটা আধুনিক যুগের দৈবনির্ভরতামুক্ত, প্রাকৃতিক শক্তিতে আস্থাশীল বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অনুরূপ। মেঘ রজোগুণচালিত হইয়া বৃষ্টি দেয় ও বৃষ্টির জন্য শস্য উৎপন্ন হয়—এই প্রাকৃতিক অস্খলিত নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে অতিপ্রাকৃত দেবানুগ্রহ-কল্পনার স্থান কোথায়? এই যুক্তি ভাগবতের ন্যায় ভগবৎ-মহিমা-প্রতিপাদক, ভক্তিরসাপ্লুত, অজ্ঞেয়-স্তুতিমুখর ধর্মগ্রন্থে খুব আশ্চর্য, এমন কি বৈপ্লবিক বলিয়া মনে হয় না কি?

শ্রীকৃষ্ণের মতবাদে একটি আপাত-অসঙ্গতির সংশয় জাগে। তিনি ইন্দ্রকে অস্বীকার করিতেছেন, আবার সেই সঙ্গে পর্বতপূজার অনুমোদন করিতেছেন।

যদি দেবনিরপেক্ষ মেঘ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বারি বর্ষণ করিতে পারে, তবে জড় পর্বতও সেই নিয়মের অধীন হইয়া আমাদের পূজা দাবী করিতে পারে না। যদি আকাশচারী বৃষ্টিসুধাবর্ষী মেঘে দেবতার স্পর্শ নাই, তবে মৃত্তিকা-প্রোথিত, মানুষের বিশেষ হিতসাধনে অক্ষম পাহাড়ের মধ্যে কোন দেব-আত্মা কল্পনা করিয়া তাহার কি পূজা করা যাইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের এই নির্দেশের পিছনে নিশ্চয়ই কোন নিগূঢ়-মঙ্গলময় অভিপ্রায় ছিল, ইহাকে বালসুলভ কল্পনার পর্যায়ে ফেলিলে ভগবানের অনন্তজ্ঞানময়, সর্বশক্তিমান সত্তার মর্যাদা থাকে না। হয়ত ইন্দ্রপূজাবিলোপের পিছনে বেদবিহিত, দেবানুগ্রহপ্রার্থী, মানবিক-প্রয়োজনমূলক পূজাবিধির পরিবর্তে পূর্ণবিকশিত ঐশী সত্তার নিকট উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ, ভক্তিপূত আত্মনিবেদনের আদর্শ-প্রতিষ্ঠা শ্রীভগবানের অভিপ্রেত ছিল। ইন্দ্র যাহার ঐশ্বর্যকণার প্রতিচ্ছায়া, ইন্দ্রের পরিবর্তে শাশ্বতসত্যরূপী, নিখিল বিশ্বের অণু-পরমাণু-পরিব্যাপ্ত সেই পরম শক্তিকেই আরাধনাযোগ্য-রূপে উপস্থাপিত করাই যেন এই ধর্মসংস্কারের অন্তরের প্রেরণা। যে ইন্দ্রত্ব ভোগকলুষিত, ঐশ্বর্যমত্ত, পুনঃ পুনঃ দৈত্যনির্জিত তাহার উপর অধ্যাত্মমহিমার ছাপটি অদৃশ্যপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। পার্থিব রাজার ভাগ্য-লাঞ্ছিত, স্থূলতা-মলিন গৌরবের সঙ্গে দেবরাজের বিশেষ কোন পার্থক্য রহিল না। ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বেদের দেবমুখ্যেরা মানুষের সূক্ষ্মতর ধর্মানুভূতির আন্তর-সমর্থন-বঞ্চিত হইয়া উচ্চতর ব্যঞ্জনাহীন মানবিক শক্তির পর্যায়ে নামিয়া আসিলেন। তাই ধর্মনীতির সূক্ষ্মতাৎপর্য-বেত্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপূজা রহিত করিয়া মানব মনের আধ্যাত্মিক আকূতির সহিত দেবতত্ত্বের নূতন সামঞ্জস্য বিধান করিলেন।

কিন্তু তাহা হইলে ভগবান্ আবার গোবর্ধন-পর্বত-পূজার প্রবর্তন কেন করিলেন? ইন্দ্ররাজের শূন্য সিংহাসনে পর্বতরাজকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য কি? পর্বতকে পূজা করার মধ্যে মানবের কোন্ আধ্যাত্মিক বৃত্তির চরিতার্থতা হইবে? পর্বতের সহিত গোপসমাজের প্রাত্যহিক জীবনের একটা প্রত্যক্ষ যোগ ছিল; উহার তৃণশষ্পাচ্ছাদিত পার্শ্বদেশ গোচারণভূমি-রূপে ব্যবহৃত হইত। উহার প্রতি গোকুলবাসীর একটা সহজ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সম্পর্ক ছিল। সমস্ত বিশ্বজগৎ ভগবৎসত্তার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সুতরাং সেই দিক দিয়া পর্বতের মধ্যেও সেই সত্তার স্পর্শ অনুভবগম্য। যে প্রাকৃতিক পদার্থ ভগবানের স্বচ্ছ

দর্পণ-স্বরূপ, যাহা নিজ কল্পিত দেবত্বাভিমানের দ্বারা পরমাত্মার সুস্পষ্ট প্রতিবিম্বক্ষেপে বাধা দেয় না, তাহাকে ভগবানের অংশরূপে পূজা করার মধ্যে দূষণীয় কিছু নাই। বিন্ধ্যপর্বত যদি অহঙ্কারস্ফীত শিখর উচ্চে তুলিয়া অগস্ত্য ঋষির পথ রোধ করিবার দুঃসাহস না দেখায়, তবে উহাকে ভগবৎস্বরূপের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা সম্পূর্ণ বিধিসঙ্গত। গোবর্ধন কোন কৃত্রিম দেবত্বের দাবী না তুলিয়া সহজভাবে নিজ পারিপার্শ্বিকের সহিত মিশিয়া আছে ও নিজ বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিতেছে। সুতরাং গোবর্ধন ইন্দ্র অপেক্ষা মানবের নিকট অধিকতর অর্চনীয়। বিশেষতঃ কৃষ্ণলীলার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য গোবর্ধনের সহজ দেবধর্মিত্ব আরও সমুজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট। প্রতিটি অবতার তাঁহার লীলাবিলাসের নব নব প্রতিবেশে নূতন পবিত্রতা, নবতীর্থমহিমা বিকশিত করেন। রাম-অবতারে অযোধ্যা প্রদেশ, সরযূ নদী, পঞ্চবটীবন প্রভৃতি স্থল তাঁহার পবিত্র পাদস্পর্শে, তাঁহার লীলাক্ষেত্ররূপে, ভাগবত সত্তার আধাররূপে, প্রতিভাত হইয়াছে। কৃষ্ণ-অবতারেও যমুনাবারি-বিধৌত ব্রজপরিমণ্ডল তাঁহার দিব্যলীলার চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া মানবের ভক্তি ও পূজা আকর্ষণ করিয়াছে। সেইজন্যই বোধ হয় শ্রীভগবান ইন্দ্রকে মানবের হৃদয়-সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া তাঁহার লীলারঙ্গভূমি প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভক্তি-অর্ঘ্য-ভূষিত করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা গহন ও দুষ্প্রবেশ্য ; ভক্ত ভিন্ন ইহার মর্মোদ্‌ঘাটন সম্ভব নহে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে ইহার যে তাৎপর্য প্রতিভাত হইল তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি, সহৃদয় ভক্তমণ্ডলী আমার এই দুঃসাহস মার্জনা করিবেন।

ভারতীয় ভাষা-সমস্যা

(১)

ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ভাষা-কমিশনের সদ্যোপ্রকাশিত রিপোর্ট অহিন্দী অঞ্চলে যে সন্দেহ ও অসন্তোষ ধূমায়িত ছিল, তাকে আবার অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত করে তুলেছে। হিন্দীকে একমাত্র সরকারী

ভাষার মর্যাদাদানে অন্যান্য ভাষা-ভাষীরা অন্তরের সঙ্গে কখনই সায় দেয় নাই ; একে একটা বাধ্যতামূলক সরকারী বিধানরূপে মেনে নিয়েছিল মাত্র ও সংশয়তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ঘটনার ভবিষ্যৎ পরিণতি লক্ষ্য করছিল। হয়ত তাদের মনে মনে আশা ছিল যে, এই ব্যবস্থা সত্যকার কার্যকরী রূপ নিতে অনেক সময় লাগবে। হিন্দী নিজ মর্যাদালাভে সন্তুষ্ট হয়ে অন্য ভাষার উপর আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি পরিহার করবে। হয়ত তারা ভেবেছিল যে, সমস্ত ভারতে হিন্দী-প্রবর্তনের বাস্তব অসুবিধা লক্ষ্য করে এর অত্যুৎসাহী সমর্থকদের উৎসাহ খানিকটা মন্দীভূত হবে। অন্ততঃ নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা সময়ের মধ্যে এর প্রবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে তারা বিরত থাকবে। এ কয় বৎসরে হিন্দীর যে মন্থরগতিতে উন্নতি হয়েছে তাতে এই আশাকে নিতান্ত স্বপ্ন-বিলাসের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কিন্তু ভাষা-কমিশনের রিপোর্ট তাদের এই আশার মূলোচ্ছেদ করেছে। এর বিপদ-সম্ভাবনা যে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পরিমাপহীন দূরত্বে পশ্চাদপসরণ করবে এই বিশ্বাস ভাষা-কমিশনের জরুরী তাগিদ ও অশোভন ব্যস্ততার রূঢ় আঘাতে বিচলিত হয়েছে। যাকে দূর ভেবেছিল তা যে অত্যন্ত কাছিয়ে এসেছে, যে মেঘ আমাদের চিন্তাকাশে লঘু মন্থরপদে বিচরণ করছিল তা যে অকস্মাৎ ঘনীভূত বাষ্পরূপে বজ্র ও বিদ্যুতের সংযোগে মুষলধারা-বর্ষণে মাথার উপর ভেঙ্গে পড়তে প্রস্তুত হয়েছে, এই উপলব্ধি অন্তঃরুদ্ধ অসন্তোষকে বিস্ফোরক তীব্রতার সহিত বহিঃপ্রকাশে উত্তেজিত করেছে।

অবশ্য এই অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার মূল কারণ হলো কমিশন-সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের এবং স্বয়ং সভাপতির মতভেদ-অসহিষ্ণু, একরোখা, উদ্ধত মনোভাব। এমন একটা গুরুতর বিষয়ে মতভেদ যে অনিবার্য এবং এই মতভেদ-প্রকাশ যে অমার্জনীয় অপরাধ নয়, সভাপতি মহাশয় যেন সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন নন। তিনি শোভনতা ও ঔচিত্যবোধের সীমা লঙ্ঘন করে দু'জন ভিন্নমতাবলম্বী সদস্যের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করেছেন ও দুইটি অভিমতের সমর্থনে যে যুক্তি-পরম্পরা তা নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপিত না করে আবার বিশেষভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ মতটি তীব্র ভাষায় খণ্ডন করতে চেয়েছেন। এই ছাত্রের কান-মলে-দেওয়া গুরুমহাশয়ী মনোবৃত্তি, এই পুনশ্চ-যোজনা দ্বারা তিরস্কারের উগ্রতর ধমক দেওয়ার প্রবণতা যে গুরুতর রাজনৈতিক

বিষয়-আলোচনার পক্ষে অশোভন, এ-খেয়াল হয়ত তাঁর ছিল না। তা ছাড়া, কমিশনের অধিকার-বহির্ভূত বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করে ও জোরাল নির্দেশ দিয়ে কমিশন নিজ উগ্র পক্ষপাতিত্ব আরও বেশী মাত্রায় প্রকট করেছেন। সংবিধান-অনুযায়ী হিন্দীর উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে সেই দায়িত্ব-পালনের সুষ্ঠু-উপায়-নির্দেশই কমিশনের কার্যক্ষেত্রের সীমা ছিল। সরকারী কার্য-পরিচালনা ও বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার প্রভৃতি ব্যাপারে হিন্দীকে কি করে উপযুক্ত করে তোলা যায় সেটাই তাঁদের একমাত্র বিচার্য বিষয়। এক্ষেত্রে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানে ও রাজ্য-বিচারালয়গুলিতে ব্যবহারে হিন্দীকে একমাত্র বাহনরূপে নির্দেশ করে তাঁরা শুধু যে অশালীনতার পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, প্রত্যেক অহিন্দী রাজ্যে একটা আতঙ্কময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের এই সুপারিশ যে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক রাজ্য-প্রচলিত ভাষার সমাধি-রচনা করবে তাঁদের অত্যুৎসাহের জন্য তাঁরা এ সম্ভাবনার প্রতি স্পর্ধিত উপেক্ষাই দেখিয়েছেন। এঁরা যে নিজ ভাষার গৌরববৃদ্ধির কৃত্রিম সুবিধার জন্য অন্য সমস্ত ভাষাকে ভারতের মানচিত্র থেকে মুছে দিতেও পশ্চাৎপদ নন এই উৎকট একদেশ-দর্শিতা তাঁদের রিপোর্টের প্রতিছত্রে সঙ্গীন উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

যাই হোক, এই রিপোর্ট-প্রকাশ সমস্ত প্রশ্নটিকে আবার নূতন করে বিবেচনা করার যে সুযোগ দিয়েছে তার জন্য আমরা রচয়িতাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁদের অনুদার মনোবৃত্তির অনুকরণ না করে আমাদের ধীর মস্তিষ্কে ও ভাল মন্দ সমস্ত সম্ভাবিত ফলের দিকে অপক্ষপাত দৃষ্টি রেখে এই ভাষা-সমস্যার মূল নীতি আলোচনা করা উচিত। প্রথম কথা হচ্ছে যে, একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার এই কৃত্রিম, একাধিপত্যমূলক মর্যাদাদানের প্রশ্ন উঠেছে কেন? এর পক্ষে দুটি যুক্তি উপস্থাপিত করা যেতে পারে—একটা প্রয়োজনগত সুবিধা-মূলক। ইংরেজী বিদেশী ভাষা, আমাদের পরাধীনতার স্মৃতিচিহ্ন ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রয়োগের অনুপযোগী—এই ত্রিবিধ যুক্তির ত্রিশূলা-ঘাতে একে ছিন্ন-ভিন্ন-পর্যুদস্ত করার ব্যবস্থা হয়েছে। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ইংরেজী ভাষাকে আমরা যে চক্ষে দেখি তাতে পরাধীনতার কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত নাই, আছে প্রীতি-শ্রদ্ধার উজ্জ্বল-করা মোহাঞ্জন-প্রলেপ। কোন একটি বিদেশী ভাষাকে যদি আমাদের দেশের মনীষীমণ্ডলী আপনার করে

নিয়ে থাকতে পেরেছেন, এর প্রভাব যদি আমাদের মাতৃ-ভাষায় রচিত সাহিত্যের শিরায় শিরায় রক্ত-প্রবাহ ও সৌন্দর্যসুষমা সঞ্চার করে থাকে, এখনও উন্নত ভাবাদর্শ ও প্রগতিশীল চিন্তার বাহন-রূপে এ যদি আমাদের মননক্ষেত্রে একটা মর্যাদাপূর্ণ ও অতিপ্রয়োজনীয় স্থানের অধিকারী হয় তবে অন্ততঃ বিদেশী অপবাদ দিয়ে একে বরখাস্ত করাটা সঙ্গত হবে না।

জনসাধারণের অনুপযোগী—এ যুক্তির মধ্যে যে কিছুটা সারবত্তা আছে তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মননশীলতার যে উচ্চস্তরে পরিচালিত হয় তাতে সাধারণ লোকের অবাধ প্রবেশাধিকার না থাকলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। পণ্ডিত জওহরলাল যখন ভারতের বৈদেশিক রাষ্ট্র-নীতি ব্যাখ্যা করেন বা মেনন যখন বিশ্বপরিষদে কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারতের দাবীর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁরা তথাকথিত রাষ্ট্রভাষা প্রয়োগ না করে জাতিসংঘস্বীকৃত, মর্যাদার উচ্চাসনে আসীন ইংরেজী ভাষাই ব্যবহার করেন এবং তাতে আমাদের জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। তার পরের দিনের সংবাদপত্রে সমস্ত ভারতীয় ভাষায় তাঁদের বক্তৃতা অনূদিত হয়ে ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ প্রতিটি নাগরিকের কৌতূহল-নিবৃত্তি ও জ্ঞান-ভাণ্ডারের সমৃদ্ধিবিধান করে থাকে। লোকসভায় বিতর্ক-আলোচনার ক্ষেত্রেও যদি আমাদের প্রতিনিধিবর্গ ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী না-হন, তবে এক হিন্দী ভাষার সর্বক্ষেত্রপ্রসারিত প্রয়োগে অহিন্দী-অঞ্চলের সদস্যেরা যে বিশেষ উৎসাহবোধ করবেন বা তাঁদের বক্তব্য চিত্তাকর্ষক ও জোরালো করে প্রকাশ করতে পারবেন তা মনে করার কোন হেতু নাই। অন্ততঃ দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের নিজের নিজের ভাষায় বক্তৃতা দিবার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে এবং হিন্দী ও ইংরেজীতে সেই সমস্ত বক্তৃতার দ্রুত ও সহজবোধ্য অনুবাদের ব্যবস্থা করে পারস্পরিক ভাববিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে যে অসুবিধা হতে পারে তার চেয়ে আরও গুরুতর অসুবিধার আমরা প্রতিদিনই সম্মুখীন হচ্ছি—সুতরাং ভারতীয় ভাষাসমূহের বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের এই অসুবিধা-নিরাকরণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। হয়ত এই সময় স্বাভাবিকভাবে আসতে পারে, যখন হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্র হিন্দী ভাষা জনসাধারণের পক্ষে সুগম ও অনায়াস-ব্যবহার্য হবে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন অসীম ধৈর্য ও প্রতীক্ষাশীলতা।

কোন এক কৃত্রিম বিধিনিষেধের চাপে ও মাতৃভাষাকে হঠিয়ে দিয়ে একটি ভাষার অসপত্ন প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের দ্বারা সেদিন যে এগিয়ে আসবে না এ-সত্য প্রত্যেক হিন্দী-প্রচারের অত্যুৎসাহী সমর্থককে মনে রাখতে হবে।

(২)

এবার ভাবাবেগমূলক যুক্তিটির বিচার করা যাক। স্বাধীন দেশের একটি রাষ্ট্রভাষা থাকা, সম্ভব হলে, উচিত এটা স্বীকার করা যায়, কিন্তু থাকতেই যে হবে এমন কথায় সায় দেওয়া যায় না। প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে কোন-একটিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার পূর্বে দেশের অতীত ইতিহাস, দেশবাসীর বর্তমান মনোভাব, ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক—এগুলি বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ঐক্য কোন দিনই একভাষাভাষী পাশ্চাত্ত্য দেশের ঐক্যের সঙ্গে এক পর্যায়ের ছিল না। এর প্রাদেশিক ভাষাগুলি ঐতিহাসিক কারণে প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে উদ্ভূত হয়ে এক-একটি প্রদেশ-গোষ্ঠীর আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের উপায়রূপে পুষ্টি-লাভ করেছে। বড় বড় ধর্মীয় আন্দোলন, গভীর আবেগ ও ভাবানুভূতি, জীবনযাত্রার বিশিষ্ট ছন্দ ও প্রেরণা সমস্তই এই ভাষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সংযোগে যুক্ত হয়ে এদেরকে গোষ্ঠীর অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে, সত্তার অভিব্যক্তির অপরিহার্য অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলা ভাষা ছাড়া বাঙালী জাতির, তামিল ভাষা ছাড়া মাদ্রাজী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। এই সত্তার নিগূঢ় আকর্ষণের সঙ্গে তুলনায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য এদের কাছে অকিঞ্চিৎকর। কোন বাঙালী কৃত্তিবাস-কাশীদাস-রামপ্রসাদ-চণ্ডীদাস রবীন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্রকে ভুলে গিয়ে, কোন হিন্দুস্থানী তুলসীদাস-মীরাবাঈ-এর সম্পর্ক ত্যাগ করে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার অবাস্তব স্বর্গে বাস করতে রাজী হবে না। স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য কেবল পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে নয়; আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ পাওয়া যাবে বলেই এর যথার্থ গৌরব। যদি কোন রাজনৈতিক নেতা মনে করেন যে, ভারতের সমস্ত ভাষাবিভেদ অবলুপ্ত হয়ে, সমস্ত বৈচিত্র্য মুছে গিয়ে হিন্দী ভাষার এক অবয়বচিহ্নহীন পিণ্ডাকার শিলামূর্তি সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র মহিমায় সিঁদুর-তেলের রাজকর আদায় করবে

এবং এই কূর্মাবতারের পূজা করেই ভারতের শক্তি ও ঐক্যবোধ বৃদ্ধি পাবে তবে তিনি যে আশা-মরীচিকায় বিভ্রান্ত হবেন তা নিঃসন্দেহ। মানুষের মননশক্তি ও আত্মাকে ক্ষুন্ন করে তাকে বড় করা যাবে না; সব প্রদেশের লোকই যদি তাদের প্রাদেশিক পরিচয় অস্বীকার করে নিজেদের তারস্বরে কেবলমাত্র ভারতীয় বলে ঘোষণা করে, তা হলেও তাদের ভারতীয়ত্বের পেছনে কোন সতেজ প্রাণ-চেতনা থাকবে না। গাছের পাতা যদি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম শিকড় ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শাখার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল বৃহৎ কাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চায়, তবে সে প্রাণরস আকর্ষণ করতে না পেরে শুষ্ক ও শীর্ণ হয়ে যাবে। তেমনি বাঙালী, অসমীয়া, তামিল, তেলেগু, মহারাষ্ট্রীয়—এরা নিজেদের প্রাদেশিক সত্তার ভেতর দিয়েই সর্বভারতীয় ঐক্যবন্ধনে সংযুক্ত থাকবে। কথামালার গল্পে মানবদেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদরের সঙ্গে অসহযোগ করে যে দুর্দশা ঘটিয়েছিল, প্রাদেশিকতা-বর্জিত ভারতীয়ও সেই-দুর্দশাকে আমন্ত্রণ করে আনবে।

অবশ্য হিন্দী একেশ্বরবাদীরা যে আঞ্চলিক ভাষাসমূহের উচ্ছেদ করতে চান একথা স্বীকার করবেন না। তাঁরা হয়ত মনে করেন যে, হিন্দীর রাজচ্ছত্রছায়াতলে অন্যান্য ভাষাগুলি রাজার মোসাহেবের ন্যায় তৈলচিক্কণ, মেদস্ফীত দেহকান্তি নিয়ে চিরকালই বিরাজ করতে থাকবে। কিন্তু এইরূপ অনুমান ভাষাতত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞতাই প্রকাশ করে। তাঁরা সমস্ত মান-সম্মান, সমস্ত উচ্চশিক্ষা, সমস্ত উন্নত চিন্তা ও ভাবাবেগের উপর হিন্দী ভাষার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে কি যুক্তিতে আশা করবেন যে আঞ্চলিক ভাষাগুলি পূর্বের ন্যায় সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী থাকবে? এ কোন্ মূঢ় সন্তান যে মায়ের রসদ বন্ধ করে দিয়ে মাতৃস্তন্যে ক্ষীরধারার অব্যাহত প্রাচুর্য দেখতে আশা করেন? ভাগীরথীর সমস্ত জলপ্রবাহ কৃত্রিম খাতে সঞ্চারিত করে আবার তার বর্ষার দুকূলভরা সৌন্দর্য ও দুরন্ত গতিবেগ দেখতে কেমন করে আশা করতে পারি? সমস্ত মনীষা, উচ্চাভিলাষের সমস্ত প্রেরণা, সৃষ্টি-শক্তির সমস্ত উচ্ছ্বাস যদি রাষ্ট্রভাষাকে আশ্রয় করে, তবে অন্যান্য ভাষার ভাব-সম্বল ও আবেগ-সঞ্চয় আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে? এককালে ইংলণ্ডে ইংরেজী ও লাটিন ভাষার মধ্যে প্রায় এইরূপ সম্পর্ক গড়ে ওঠারই উপক্রম হয়েছিল; অথচ তখন লাটিনের কেবলমাত্র ধর্মাচরণে শ্রেষ্ঠত্ব ও

অন্তর্নিহিত উৎকর্ষের জন্য সে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার বিশেষ সুযোগ পেয়েছিল, আইনের জোরে তাকে রাষ্ট্রভাষার সিংহাসনে বসাবার কোন জবরদস্তি ছিল না। সেই সুদূর অতীতে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ যে খানিকটা এই দুই প্রতিযোগী ভাষার আকর্ষণে দোলায়িতচিত্ত হয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। তবে শেষ পর্যন্ত ইংরেজের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও মাতৃভাষার প্রতি আস্থা তাকে এই অবস্থা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছিল। সুতরাং এবিষয়ে কোন সংশয় থাকা উচিত নয় যে, দেশের ঐক্যের দোহাই দিয়ে হিন্দীর এইরূপ কৃত্রিম উন্নয়ন ভারতীয় অন্যান্য ভাষাগুলির অবসাদ ও অবসান ঘটাবে।

অতীত ইতিহাস অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে যে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য কোন দিনই একভাষাভিত্তিক ছিল না; এর মূল ছিল ধর্ম ও সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য ঐক্যবোধে। কিছুদিন হয়ত সংস্কৃত ভাষা সর্বভারতীয় ঐক্যবিধানে সহায়তা করে থাকতে পারে, কিন্তু প্রাকৃত ও অপভ্রংশের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে এক দুর্বোধ্য আঞ্চলিক চেতনা-সঞ্চারের ফলে এদের মধ্যে প্রাদেশিক বিভিন্নতা দেখা দিল এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি এই সূক্ষ্ম বিভেদেরই ক্রমবর্ধমান, পরিণত রূপ। আজ ভাষানদীগুলি একই উৎস থেকে জন্মলাভ করে ক্রমশ বিসর্পিত গতি ও দিকপরিবর্তনের ফলে এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ মহানদীতে পরিণত হয়েছে; এখন এরা আর ফিরে গিয়ে একই সঙ্গমস্থলে মিশতে পারে না। একই তূণ থেকে বিভিন্ন দিক্ লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত শরগুলি আর সেই তূণে পুনঃপ্রবেশ করবে না। এখন এই স্বাতন্ত্র্যকে অপরিবর্তনীয় বলে স্বীকার করে নিয়ে এদের মধ্যে আবার নূতন আত্মীয়তাবোধ জাগ্রত করতে হবে। একই পিতৃভিটার মায়া কাটিয়ে যারা দিকে-দিকে সুদূর অভিযানে বার হয়েছে, তাদের আর একান্নবর্তী পরিবারের গায়ে-গায়ে ঘনিষ্ঠতায় ফেরান যাবে না—যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে তার মর্যাদা রক্ষা করেই, পারস্পরিক সংবাদের আদান-প্রদানে, ভাব-বিনিময়ে, উৎসবে নিমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে, সুখ-সৌভাগ্যের আনন্দবার্তা বহন করে এরা যে একবংশোদ্ভূত এই ধারণা দৃঢ়তর করতে হবে। বৃহৎ বনস্পতি যেমন সুদূর-বিক্ষিপ্ত শাখা-পুঞ্জে পাখীর হর্ষ-কাকলী, আলোকের প্রাণোত্তাপময় স্পর্শ, বসন্তানিলের শিহরণ, অস্থিমজ্জাবাহী রসের নিগূঢ় সঞ্চার, আসন্ন নব-কিশলয়ের স্বপ্ন অনুভব করে আপনার ঐক্যে দৃঢ়-

প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারতীয় ভাষার বিভিন্ন শাখাবিভক্ত বনস্পতিও, সমস্ত শাখা ছেদ করে একমাত্র শাখায় এর প্রাণচেতনাকে কেন্দ্রীভূত করে নয়, অনুরূপ বিস্তার ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই আপনার ঐক্যসাধনায় অভিনিযুক্ত থাকবে।

(৩)

প্রশ্ন করা চলে যে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়ার জন্য ভারতীয় ঐক্যের কি বিশেষ কোন ক্ষতি হয়েছে? ঐক্যসাধনার উপায় ও ঐক্যের আদর্শ সবদেশে ঠিক একই ছাঁচে ঢালা নয়। আসলে ঐক্য নির্ভর করে জীবনসাধনার পন্থা ও চরম লক্ষ্যের অভিন্নতার উপর। ভারতে পৌরাণিক ধর্মের বিশ্বাস-সংস্কার, শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ ও ভক্তিবাদের চর্চা এক ভাষা-নিরপেক্ষ, অন্তরগত ঐক্য রচনা করেছে। তীর্থভ্রমণে এই ঐক্যবোধের বাস্তব পরিচয় হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্রই মেলে। উত্তর-ভারতের লোক দক্ষিণ-ভারতের ভাষা হয়ত এক বর্ণও বুঝে না; তথাপি দক্ষিণ-ভারতের অপরূপ শিল্পকলামণ্ডিত, ভক্তিরসের অক্ষয় আধার বিরাট মন্দিরগুলি ও মন্দির-গাত্রে ক্ষোদিত, রামায়ণ-মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনীর প্রস্তর-রূপায়ণ দেখলে আমরা যে ভাষার অতীত এক গভীর ভাব-সংবেদনের স্তরে এক ও অবিভাজ্য, এই প্রতীতি আমাদের মনে স্বতঃই জাগে। সমস্ত রীতি-নীতি ও বাঙ্ময় প্রকাশের বিভেদ সত্ত্বেও আত্মার এই ঐক্য-বন্ধন, অধ্যাত্ম অনুভূতির এই সমপ্রাণতা কোনদিনই ছিন্ন হবার নয়। বরং গোষ্ঠীভেদে প্রকাশভঙ্গীর যে একটু-আধটু বৈচিত্র্য, ভক্তিসাধনা ও উৎসব-অনুষ্ঠানের যে অল্পবিস্তর রীতি-পার্থক্য তাতে অন্তরশায়ী ঐক্য আরও গভীরভাবে প্রতিভাত হয়। নানা-বর্ণের ফুলে সাজি ভরে, নানা ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করে, হৃদয়াবেগের স্বর-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে যে বিরাট ঐকতান সঙ্গীত ভারতমাতার পূজারতির জন্য আকাশের দিকে উত্থিত হচ্ছে, তার ঐক্য-বিধায়ক শক্তি কি ভাষার একীকরণ অপেক্ষা কোন অংশে কম? যখন কোন পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে সমবেত বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতবাসী আপন-আপন ভাষায় দেবমাহাত্ম্য কীর্তন করে, একই ভক্তির অর্ঘ্য বিভিন্ন বাগভঙ্গীর স্বতন্ত্র পত্রে দেব-চরণে নিবেদন করে, ভাব-বিগলিত অশ্রুজলে, মুখের বিনম্র ভঙ্গিমায়, উৎসর্গিত চিত্তের আত্ম-নিবেদনে আপনাদের অভিন্ন মানস সংস্থিতির অখণ্ডনীয় প্রমাণ বহন করে,

তখন ভারতের অসম্পূর্ণ ঐক্য যে এক ভাষার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করবে এ বিশ্বাসের কোন হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া, ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্রেই যে একভাষিকতা এক-জাতীয়ত্বের অপরিহার্য লক্ষণরূপে গৃহীত হয় তা নয়। রুশ, সুইট্জারল্যাণ্ড প্রভৃতি বহুভাষিক দেশে জাতীয়তা-বন্ধন যে শিথিল, ইতিহাস থেকে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং ভারতবর্ষের ঐক্য বজায় রাখবার জন্য এক ভাষার লৌহ বন্ধনে তার আত্মাকে জর্জরিত করার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই।

অবশ্য এ-কথা স্বীকার্য যে ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক থেকে সমস্ত ভারতে একই ভাষা প্রচলনের বিশেষ সুবিধা আছে। যদি এমন দিন আসে যখন ভারতীয় জনসাধারণ স্বেচ্ছায় এবং স্বাভাবিকভাবে হিন্দী ভাষাকে তাদের সাধারণ ভাষারূপে স্বীকার করে নেবে, তা হলে সেদিন নিশ্চয়ই অভিনন্দনীয়। এখনও অনেক প্রদেশ রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করবার জন্য স্বেচ্ছায় ও আগ্রহ-সহকারে বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্লেশ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু আইনের বলে বাংলাকে তাদের উপর চাপাতে গেলে তাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ প্রবল বিরাগে পরিণত হত। হিন্দী যদি নিজ অন্তর্নিহিত উৎকর্ষের গুণে অন্যান্য ভাষাভাষীর চিত্ত জয় করতে পারে, তবে সেই জয় তার চিরন্তন গৌরবরূপে ঘোষিত হবে। সেই আকাঙ্ক্ষিত দিবস না-আসা-পর্যন্ত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে যে প্রয়োজন সাধিত হচ্ছে, যে ঐক্যানুভূতি জাগ্রত হয়েছে তাকে নষ্ট করা কি মূঢ়তার পরিচয় দেওয়া হবে না? ভারতের বড় বড় নদ-নদীগুলির উপর বিদেশী বাস্তুকারদের দ্বারা সেতু নির্মিত হয়েছে এই যুক্তিতে যদি সেতুগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তবে তাতে স্বদেশপ্রীতি অপেক্ষা আত্মঘাতী বর্বরতাই কি বেশী উৎকটভাবে ফুটে উঠবে না? দেশী মাল-মশলায় নূতন ঐক্যের স্তম্ভ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত বিদেশী উপাদানে গঠিত স্তম্ভই আমাদের ঐক্য-সৌধকে বহন করতে থাকুক। যদি পরাধীনতার যুগে বিদেশী ভাষার সাহায্যে জাতীয়তা-বোধ জেগে থাকে, তবে স্বাধীন ভারতে এই জাতীয়তাবোধকে প্রবলতর করার আর কোন উপায় কি আবিষ্কৃত হবে না? বিদেশী ভাষা দেশবাসীর প্রবল বিরাগভাজন হওয়া সত্ত্বেও যে একতার ভিত্তি পত্তন করেছিল, দেশীয় জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ কি তাকে আরও উন্নত ও স্থায়ীরূপ দিতে পারবেন না?

তার জন্যে কি ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে হিন্দীভাষা-প্রবর্তনের জন্য একটা কালসীমা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে? এই সীমার ঔচিত্য ও যৌক্তিকতা কোন্ মানদণ্ডে নির্ধারিত হবে? হিন্দীর সাবালকত্ব কি বয়সের হিসাবে না বয়স্কবৎ আচরণের দ্বারা ঠিক হবে? কথার জোরে নাবালককে সাবালক বলে চালিয়ে দিলে আমাদের জাতীয় উৎকর্ষের মান কি অবনমিত হবে না; আমাদের চিন্তা-কর্ম, বিচার-বিবেচনা সব কিছুর উপর অনভিজ্ঞতার স্থূল অঙ্গুলি-স্পর্শ কি অঙ্কিত হবে না? আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি যে আমাদের দেশীয় ভাষার মধ্যে যে কোন একটি ইংরেজীকে স্থানচ্যুত করার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করুক, কিন্তু অযোগ্য রাজপুত্রকে কেবল শারীরিক স্থূলতার বিচারে সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরূপে আগে থাকতেই ঘোষণা করলে যে অবশ্যম্ভাবী ভ্রাতৃবিরোধ ঘটবে তার জন্য কি আমাদেরই অবিমৃষ্যকারিতা ও অসংগত পক্ষপাত দায়ী হবে না? আয়োজনের তোড়জোড় চলতে থাকুক, কিন্তু অভিষেক-উৎসবটা যেন শক্তি-আহরণ পর্যন্ত স্থগিত থাকে, আমাদের এ-টুকুই বিনীত প্রার্থনা।

(৪)

তাহ'লে অন্তর্বর্তী কালে কি বাস্তব নীতি অনুসৃত হবে তা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা কর্তব্য। হিন্দীকে ইতিপূর্বেই সরকারী ভাষারূপে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এই সাময়িক সরকারীত্বের সুযোগে তার মর্যাদা-বৃদ্ধির আর যেন কোন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ চেষ্টা না হয়, সে দিকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলে নিজের সেরেস্তায় হিন্দী ব্যবহার করতে পারেন, রাজ্যসমূহের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদানেও উক্ত ভাষার প্রয়োগ পরীক্ষা-মূলকভাবে প্রবর্তন করতে পারেন। কিন্তু এই অধিকার-সীমা যেন কোন ছলেই লঙ্ঘিত না হয়। যে চারিটি রাষ্ট্রে হিন্দী-মাতৃভাষা, সেখানে ওর ভবিষ্যৎ-পরিধি-বৃদ্ধির পরীক্ষা চলতে পারে। হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ওর প্রয়োগ, প্রাদেশিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ওর প্রবর্তন, সাহিত্যের সূক্ষ্ম কারুকার্যে ওর শক্তি-বৃদ্ধি এ সবই চলতে পারে ও এর ফলাফল অন্যান্য রাজ্যের গোচরীভূত করা যেতে পারে। হিন্দীর সর্বময় কর্তৃত্ব এই সমস্ত রাজ্যে পরীক্ষিত হবার পর অন্যান্য রাজ্য এ সম্বন্ধে তাদের ভবিষ্যৎ নীতি-নির্ধারণের একটা সুস্পষ্ট নির্দেশ লাভ করবে।

অ-হিন্দী রাজ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হিন্দীকে অবশ্য-পাঠ্যরূপে প্রবর্তন করে ছেলে-মেয়েদের উপর চতুর্থ ভাষা-শিক্ষার অনাবশ্যকীয় ও ক্লান্তিকর বোঝা চাপানো বর্জনীয়। তবে সপ্তাহে একঘণ্টা করে মৌখিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যে সমস্ত অভিভাবক ভবিষ্যৎ উন্নতির ভরসায় তাঁদের ছেলেদের হিন্দী শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী তাঁরা স্কুলের বাইরে যে কোন হিন্দী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে পারেন।

অ-হিন্দী রাজ্যের হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন অজুহাতে হিন্দী-প্রবর্তনের চেষ্টা করলে তার প্রতিক্রিয়া যে ভয়াবহ হবে এটা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দেওয়াই ভাল। রাজ্যের তীক্ষ্ণ ও প্রাগ্রসর মনীষা এই দুই ক্ষেত্রকে অবলম্বন করেই আত্মবিকাশ ও আত্মোন্নতির পথ খোঁজে। এই দুটি পথ বন্ধ করে দেওয়ার মানেই প্রাদেশিক ভাষার উপর ফাঁসির হুকুম-প্রচার। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হবে যে, প্রাদেশিক সাহিত্য আবার গ্রাম্যপর্যায়ে অবনমিত হবে এবং বাংলা আবার মঙ্গলকাব্য, কবি ও পাঁচালির যুগে ফিরে যাবে। এই সম্ভাবনাকে কেউ বিচলিত না হয়ে গ্রহণ করতে পারবেন না। এইরূপ সুপারিশ করার মধ্যে যে উদ্ধত ও আত্মতুষ্ট মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সেটাই হিন্দীর উন্নতির পথে সবচেয়ে বেশী বাধা সৃষ্টি করবে। এই রকম বে-পরোয়া ফতোয়া জারি করার জন্যই হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আতঙ্কিত মনোভাব ভারতের সমস্ত অঞ্চলে প্রসারলাভ করেছে।

সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় হিন্দীর উপর অতিরিক্ত প্রাধান্য-আরোপ কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে সন্দেহ উদ্রেক করবে। এই সব পরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় যুব-সমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষাকে আবিষ্কার করে তাদের দেশের শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া। হিন্দীতে কে কতটা ওস্তাদ তা ঠিক করা এর উদ্দেশ্য নয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃপা-বিতরণ নয়, প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন। হিন্দী শিক্ষার সঙ্গে মানস উৎকর্ষের এমন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই যাতে এ দুটোকে সমার্থবাচক বলে মনে করা যেতে পারে। তর্ক উঠতে পারে যে, ইংরেজী ভাষা সম্পর্কেও অনুরূপ আপত্তি প্রযোজ্য। কিন্তু একটা বিদেশী প্রগতিশীল ভাষাকে আয়ত্ত করে তার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশ

করা ও পারদর্শিতার নিদর্শন দেওয়া উচ্চ মানসিক শক্তির পরিচয় দেয়। দ্বিতীয়, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচালিত হলে সকলের উপর বোঝা সমান হবে ও কোন প্রদেশের উপর অযথা পক্ষপাত দেখান হবে না। প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় অপক্ষপাত মূল্যনির্ধারণ-পদ্ধতিই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ। যদি ইংরেজীর পরিবর্তে এমন কোন দেশীয় ভাষা পাওয়া যায় যাতে পারদর্শিতা সম্বন্ধে প্রদেশ-ভেদে কোন তারতম্য নাই, তবে সেই ভাষাই শেষ পর্যন্ত গ্রহণীয় হবে। কিন্তু বর্তমানে বা নিকট-ভবিষ্যতে সেরূপ কোন ভারতীয় ভাষা যে ইংরেজীর স্থান গ্রহণ করতে পারবে তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কোন প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচালিত হলে সেই ভাষায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাই পরীক্ষক নিযুক্ত হবেন এবং তাতে পরীক্ষাগ্রহণে পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ আরও তীব্রতর হবে। সুতরাং মিথ্যা দেশাত্মবোধের অজুহাতে বর্তমানে সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন মুষ্টিমেয় ভাষা-উন্মাদ ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে প্রশ্রয় দিলেও সর্বভারতীয় উচ্চতম নেতৃত্বের পক্ষে তা অশুভ ফলই প্রসব করবে। এ প্রসঙ্গে আরও লক্ষণীয় যে জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষা কোনদিনই ইংরেজীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না—সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ছেলেরা ইচ্ছামত ইংরেজী শিখতেও পারে বা না পারে, কিন্তু যারা উচ্চতম প্রশাসনিক স্থানে অধিষ্ঠিত হবে তাদের পক্ষে একটা আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠ ভাষার অকুণ্ঠিত অধিকার অপরিহার্য ও প্রার্থনীয়। যদি প্রতিযোগিতা শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে এরা যে কোনদিন ইংরেজী-সংস্রব-চ্যুত হবে তা অকল্পনীয়। সুতরাং বর্তমান ব্যবস্থাকে অনির্দিষ্টকাল স্থায়ী করলে কারও কোন অসুবিধা হবে না। যদি হিন্দী ভাষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম-পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তবে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের একটা হিন্দী রচনার পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করলেই তারা হিন্দীভাষা-প্রয়োগে যোগ্যতা অর্জন করবে। কিন্তু হিন্দীকে পরীক্ষার বাহনরূপে নির্দিষ্ট করে অহিন্দী অঞ্চলের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ছাত্রদের গোড়া থেকে পথ রুদ্ধ করলে তার ফল সবদিক দিয়েই মারাত্মক হবে। কোন দায়িত্বশীল ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিসম্পন্ন সরকার যে এরূপ মারাত্মক ভুল করবেন তা কল্পনাতীত।

আজ স্বাধীনতা-লাভের দশম তিথি উত্তীর্ণ হলেও আমাদের অগ্রগতি আশানুরূপ হয় নাই। আমরা এখনও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চায়, বুদ্ধির মানের উন্নয়নে, শিল্প-বাণিজ্য-প্রসারে, দারিদ্র্য-দুঃখ-মোচনে ও জনসমাজে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রবর্তনে অনেকখানি পিছিয়ে আছি। এখন দেশের মধ্যে গৌণ ব্যাপারে তীব্র মতবিরোধিতা সৃষ্টি না করে এই সমস্ত প্রাথমিক সমস্যা-সমাধানে দেশের ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যখন ভাষাভিত্তিক প্রদেশ-গঠন উপলক্ষ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণে দেশব্যাপী বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, যখন বোম্বাই ও আমেদাবাদের রাজপথে রক্তগঙ্গা বয়ে চলেছিল, যখন শিল্পাঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এই জাতীয় উপদেশামৃত বিতরণের দ্বারাই এই উত্তেজনার প্রশমন করতে চেয়েছিলেন। যদি তখন এই উপদেশের মধ্যে কোন সারবস্তু থেকে থাকে তা এই এক বৎসরের ব্যবধানে নিশ্চয়ই উপে যায় নি। আজ হিন্দীর বাধ্যতামূলক প্রবর্তনের বিভীষিকার মধ্যে তাঁরা কি নিজের উপদেশবাক্যের মর্যাদা রক্ষা করবেন, না—স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে তা লঙ্ঘন করবেন? আমরা অন্যান্য ভাষার ন্যায় হিন্দীর প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ও এর উজ্জ্বল ভবিষ্যতে আস্থাবান। কিন্তু কোন গণতান্ত্রিক জনপ্রিয় নেতা যদি যথেচ্ছাচারী স্বৈরশাসকের আসন দখল করতে চান, তবে যেমন তাঁর জনপ্রিয়তা অচিরাৎ বিলুপ্ত হয়, তেমনি অন্যান্য ভাষার মধ্যে হিন্দীর স্বাভাবিক সমকক্ষতা যদি উদ্ধত শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে রূপান্তরিত হয়, তবে তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে বাধ্য। যে রাজনৈতিক ঐক্যের তথাকথিত প্রয়োজনে এই দাবী উত্থাপিত হয়েছে তা কার্যে পরিণত করতে গেলে সেই ঐক্যই বিধ্বস্ত হবে। ভারত-মায়ের কণ্ঠে যে বিভিন্ন ভাষার বিচিত্র-রত্নগ্রথিত মণিহার প্রলম্বিত হয়ে তাঁর শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে, অতিরিক্ত টানের ফলে তা' যেন শ্বাসরোধী উদ্বন্ধন-রজ্জুতে পরিণত না হয়, প্রত্যেক দেশভক্ত সন্তানের সে-দিকে বিশেষ অবহিত থাকাই আজ প্রধান কর্তব্য।

পরিভাষার পরিকল্পনা

(১)

স্বাধীনতা-লাভের অব্যবহিত পরেই পশ্চিম বাংলা সরকার সরকারী অফিস ও শাসনব্যবস্থা-সংক্রান্ত পদগুলির সংজ্ঞা বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্‌কে লইয়া একটি পরিভাষা-সংসদ গঠন করিয়াছিলেন। এই সংসদ কয়েক মাস পরিশ্রমের পর অধুনা-প্রচলিত মুখ্য সরকারী পদসমূহের বাংলা প্রতিশব্দ আহরণ করিয়া পরিভাষা শব্দাবলীর প্রথম কিস্তি প্রস্তুত করিয়া সাধারণের অবগতি ও অভিমতের জন্য প্রচার করিয়াছেন। এই ব্যাপারে তাঁহারা প্রধানতঃ সংস্কৃত আকর হইতেই তাঁহাদের শব্দ-সম্ভার গ্রহণ করিয়াছেন, ও নূতন নূতন পারিভাষিক শব্দ-সংকলনে সকল ভারতীয় ভাষার আদি জননী সংস্কৃতের শব্দৈশ্বর্যের সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের সংগৃহীত অনেকগুলি প্রতিশব্দ পূর্বপ্রচলিত ইংরেজী অভিধানগুলির চমৎকারভাবে ভাবানুসারী হইয়াছে ও বাংলা ভাষার প্রকৃতি তথা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সদা-ব্যবহৃত শব্দজাতের সহিত সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। সুতরাং আমরা সমগ্রভাবে সংসদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি বা না পারি, ইহার সংকলনে সদস্যবৃন্দের পাণ্ডিত্য, অনুসন্ধিৎসা ও শব্দায়নকৌশল বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। ইঁহারা রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করিয়া আমাদের স্বাজাত্যবোধের উন্মেষে সাহায্য করিয়াছেন।

পারিভাষিক শব্দাবলীর ঔচিত্য-বিচারের পূর্বে সংসদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া আলোচনা করাই বিধেয়। কেননা, তাঁহাদের নির্বাচন এই আদর্শ দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। তাঁহাদের কার্য যদি সাধারণের অনুমোদন লাভ না করে, তবে তাহাও মুখ্যতঃ আদর্শ সংঘাতেরই ফল। সংসদের সদস্যবৃন্দ তাঁহাদের অনুসৃত পদ্ধতির যে বিবরণ দিয়াছেন ও ভূমিকাতে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহাদের আদর্শ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। তাঁহাদের প্রথম নিয়ামক হইল স্বাজাত্যাভিমান ও শব্দের বিশুদ্ধি রক্ষার প্রয়াস। আমাদের শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় শব্দ-সম্ভার সমস্তই আমাদের সুপ্রাচীন, সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষা হইতে গ্রহণ

করিব ও কোনো কিছুর জন্য পরের নিকট ঋণগ্রহণের হীনতা স্বীকার করিব না—এই প্রশংসনীয় মৌলিক মনোভাবই তাঁহাদের প্রচেষ্টার আদিম উৎস। ইহারই সঙ্গে তাঁহাদের ভাষাতাত্ত্বিক বিশুদ্ধিজ্ঞানও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আরবী, পারসী, ইংরেজী প্রভৃতি নবাগত শব্দগুলিকে তাঁহারা অনেকটা অনধিকার-দোষদুষ্ট মনে করিয়া তাহাদের প্রতি যথাসম্ভব বর্জননীতিরই প্রয়োগ করিয়াছেন। বেচারারা বহুদিন বাঙলাদেশে বাস করিয়া, বাঙলার সুখ-দুঃখের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়াও নাগরিক অধিকার অর্জন করিতে পারিল না। ইহাদের প্রতি সংসদের আচরণে অনুমান হয় যে—শাসনক্ষেত্রে গুণ্ডা-বহিষ্কারক বিধান সাহিত্যক্ষেত্রে এই নিরীহ গৃহপালিত জীবগুলির প্রতি সম্প্রসারিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সংসদ সর্বভারতীয় সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্য মুখ্যভাবে অনুসরণ করিয়াই সংস্কৃতের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন—আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষে সরকারী কাজে প্রযুক্ত ভাষা ও সংজ্ঞা যাহাতে একই হয় ইহাই ইঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য। সুতরাং শব্দচয়নে প্রাদেশিক ভাষার মর্যাদা রক্ষা হইল কিনা ইহা তাঁহাদের নিকট অনেকটা গৌণ ব্যাপার। যেমন সিন্দুর-চন্দন-লিপ্ত দেবীমূর্তির নিকটে সকল প্রদেশের লোকই ভক্তিভরে মাথা অবনত করে সেইরূপ অক্ষর বহুল বর্ণাঢ্য পারিভাষিক শব্দসমূহের নিকট প্রদেশনিরপেক্ষ, সর্বভারতীয় সংহতিবোধ প্রণতি জ্ঞাপন করিবে ইহাই তাঁহাদের কাম্য। সিন্দুর-চন্দনের অতিলেপনের জন্য যদি মূর্তি কিয়ৎ পরিমাণে অস্পষ্ট ও অবয়ব-বিন্যাসে বিকৃত ঠেকে তাহাতেও ক্ষতি নাই। পূর্বোক্ত যুক্তি হইতে একটি উপসিদ্ধান্ত (corollary) অনিবার্যভাবেই আসে।—যে পারিভাষিক শব্দাবলী শ্রাদ্ধ-মন্ত্রের মত দুরূহ ও দুরুচ্চার্য হইলেও এই অসুবিধা সহনীয়। কেননা, শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য বোধ-সৌকর্যকে বলি দিতে হইবে। আদর্শবাদের উপলাকীর্ণ পথ চলিতে চলিতে বারংবার হোঁচট খাওয়াই ত আমাদের ভক্তির পরিমাপক। সুতরাং সংসদ ইহা ঘোষণা করিতেছেন যে, সাধারণ ভাষার সহিত তাঁহাদের সংগৃহীত শব্দের কোন সামঞ্জস্য থাকিবে না। কেননা, কে না জানে যে, দপ্তরখানার প্রবেশদ্বার যেমন পুলিশ-প্রহরী, সেইরূপ বিভীষিকাপূর্ণ, সঙীন-উঁচা শব্দজালের দ্বারাও সাধারণের নিকট অবরুদ্ধ থাকে।

(২)

সংসদের অনুসৃত মূলনীতিগুলি আলোচনা করার পূর্বে একটা আরও গোড়ার কথা তোলা ভাল। কেননা, সেই কথাটি প্রণিধান করিলে বোঝা যাইবে যে, সংসদের কার্যের আংশিক অসাফল্যের জন্য প্রধানতঃ দায়ী তাঁহাদের উপর অর্পিত কার্যভারের অন্তর্নিহিত অসম্ভাব্যতা। জাতিতে জাতিতে ও ভাষায় ভাষায় যে ব্যবধান বহু শতাব্দীর ক্রমবিবর্তনের ফলে বাড়িয়া উঠিয়াছে, ভাষান্তরের সাহায্যে তারা দুরতিক্রম্য। ব্যাবেল দুর্গ রচনার উপর যে আদিম অভিশাপ, তাহা স্বয়ং সরস্বতী দেবীও তাঁহার অশেষ জ্ঞানভাণ্ডার লইয়া সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিতে পারেন না। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃত ভাষার অতুলনীয় শব্দৈশ্বর্য এদেশে আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে কখনও নিজ পরিধির অন্তর্ভুক্ত করে নাই। কাজেই আমলাতন্ত্রের শাখা-প্রশাখার অপরিমিত বিস্তার, ইহার পদসমূহের প্রাচুর্য ও অধিকার ও প্রতিষ্ঠার সূক্ষ্ম তারতম্য ভারতীয় মনে বা ভারতীয় ভাষায় কখনও প্রতিফলিত হয় নাই। রাজকর্মচারীর যে সমস্ত পদপ্রকরণ আমাদের অতীত ইতিহাসে প্রচলিত ছিল, তাহা রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত। হয়ত এখনও দেশীয় রাজন্যবর্গের দপ্তরখানায় এই সমস্ত প্রাচীন পদমর্যাদাজ্ঞাপক অভিধানের উল্লেখ পাওয়া যাইবে। কিন্তু যেখানে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে অভিধান-সাম্য আবিষ্কার করা যায়, সেখানেও ইহা কর্তব্য-ও অধিকার-সাম্যের দ্যোতক নহে। রাজতন্ত্রের অধীন মন্ত্রী ও বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত মন্ত্রী নাম-সাদৃশ্যের অন্তরালে গভীর মনোভাব-বৈষম্য ও অধিকার-স্বাতন্ত্র্য বহন করে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বৈদেশিক ট্রাক্টরের দ্বারা মথিত, শিথিল মূল মাটিতে সরকারী কর্মচারীর যে সংখ্যাবাহুল্য ও প্রকরণ-বৈচিত্র্য বর্ষাজলপুষ্ট আগাছার মতো অস্বাস্থ্যকর অজস্রতায় গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা ইহাদের খাঁটি-জন্মস্থান বিলাতেও মিলিবে না। কেননা, ইহার আসল উদ্দেশ্য শাসন-সৌকর্যের নহে, পরাধীন জাতির মধ্যে ভেদ-বুদ্ধির বীজ-বপন ও শাসকের বৈষম্যমূলক অনুগ্রহ-বিতরণের অজুহাত-সৃষ্টি। ভারতীয়, প্রাদেশিক ও নিম্ন-প্রাদেশিক এই তিনটি প্রধান পর্যায়ের মধ্যে আবার যে কত সূক্ষ্মতর উপশ্রেণী বিভাগ ভারতের সনাতন জাতিভেদ-বৈচিত্র্যকে গঞ্জনা দিয়া মাথা তুলিয়াছে

তাহার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করিতে সংখ্যাশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। এক সেক্রেটারী—এডিশন্যাল, জয়েন্ট, ডেপুটি, অ্যাসিষ্ট্যান্ট, আণ্ডার প্রভৃতি পরিবারবর্গসমন্বিত হইয়া দপ্তরখানায় কৈলাসবাসে নন্দী-ভৃঙ্গী-পরিবৃত ভূতনাথের মহিমায় বিরাজ করিতেছেন। আবার শিক্ষা-বিধানের কর্তৃত্বে, কোথাও ডিরেক্টর, কোথাও বোর্ড, প্রেসিডেন্ট, কোথাও প্রিন্সিপ্যাল, কোথাও সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট, কোথাও বিভাগীয় মণ্ডল ইত্যাদি নামমালা-ভূষিত হইয়া ভক্তোজনোচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনামের প্রতিদ্বন্দ্বী-স্পর্ধায় অধিষ্ঠিত আছেন। এই সমস্ত আসুরিক অভিধানের উপযোগী প্রতিশব্দ খুঁজিয়া বাহির করিতে যে আমাদের দেবভাষার দেবত্ব শিশি-খোলা কর্পূরের মত অনেক পরিমাণে উপিয়া যাইবে তাহা সুনিশ্চিত। মণিজাল-পূর্ণ সংস্কৃত ভাষার খনি-খননরত সঙ্কলয়িতার উর্বর মস্তিষ্ক খনন করিলেও একার্য দুরূহ হইবে। তাহা ছাড়া নূতন শব্দ সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়িয়া যাইবে। দেশে যেমন সোনা-রূপা না থাকিলেও কাগজের নোটের অপরিমিত প্রসারের কোনো বাধা হয় না, সেইরূপ ভাষার প্রকাশিকা শক্তি নিঃশেষ হইলেও প্রকাশিতব্য সংজ্ঞাসমূহ প্রতিদিন ক্রমবর্ধমান নূতন দাবী উপস্থাপিত করিবে। কেননা, গণতান্ত্রিক নীতি-সমথিত আমলাতন্ত্রের আর যে শক্তির অভাব হোক না কেন, নূতন পদ-সৃষ্টির ক্ষমতা অব্যাহতই থাকিবে এবং যেমন কান টানিলে মাথা আসে, স্বেচ্ছায় না হইলেও অনিচ্ছায়, সেইরূপ আমলাতান্ত্রিক পদসৃষ্টি বৈয়াকরণিক পদসৃষ্টিকে টানিয়া আনিবে।

দপ্তরখানার বাহিরে জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেও একই রকমের দৃশ্য চোখে পড়ে। এক এক দেশের বিশিষ্ট পরিভাষা অন্যান্য ভাষার ঠিক গ্রহণোপযোগী হয় না। বিশেষ অনুশীলনের ফলে যে প্রবণতা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে অন্য ভাষার ছাঁচে ঢালাই করা কষ্টসাধ্য—কৃচ্ছ্রসাধনের হাঁপানীর ভাষা সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মিত ছন্দে গাঁথা যায় না। ইংরেজী ভোজ্যদ্রব্যের নানা প্রকরণ—চপ, কাটলেট প্রভৃতি—আমাদের রসনার রস সঞ্চার করে কিন্তু লেখনীর অগ্রভাগে এই রস প্রবাহিত হয় না। সেইরূপ আমাদের জাতীয় নানাবিধ ব্যঞ্জন—শুক্তো, দালনা, ছেঁচড়া, ঘণ্ট, পায়েস, পিষ্টক প্রভৃতি—ইংরেজী ভাষার অতুলনীয়

সম্পদ সত্ত্বেও উহাতে স্থান লাভ করে নাই। ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত লালবিহারী দে বড়ির অম্বলের কোন প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পান নাই। এমনকি বর্ণনার বাঁকা পথ দিয়াও ইহার স্বাদুতার পরিচয় দিবার চেষ্টা করেন নাই। সেইরূপ পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও সুপরিচিত কোট, প্যাণ্ট, কলার, হ্যাট প্রভৃতি আমাদের অঙ্গ-সংলগ্ন হইয়াও ভাষা-সংলগ্ন হয় নাই। হ্যাটকে 'মস্তকাবরণ', কোটকে 'অঙ্গাবরণ', কলারকে 'গলবেষ্টনী' প্রভৃতি সংস্কৃত আখ্যা দিবার দুঃসাহস এখনও পর্যন্ত কাহারও হয় নাই। শার্ট কথাটি কোনোমতে যাবনিক 'কামিজ' শব্দের আশ্রয়লাভ করিয়া ভারতীয় ভাষার সীমান্ত-প্রদেশে শিথিলভাবে ঝুলিয়া আছে; পক্ষান্তরে আমাদের উত্তরীয়, উষ্ণীষ, অঙ্গরক্ষক প্রভৃতি পরিচ্ছদ-প্রকরণগুলিও বৈদেশিক ভাষার আতিথ্যে সম্বর্ধিত হয় নাই। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, অপরের বিশেষ সংস্কৃতি ও সমভাবদ্যোতক সংজ্ঞা-শব্দগুলির গ্রহণ করার অক্ষমতা কোনো ভাষার পক্ষে লজ্জার কথা নহে এবং এই গ্রহণ-শীলতা সম্বন্ধে কোন ভাষার উচ্ছ্বসিত গুণানুকীর্তন প্রায় কটুবচন-পর্যায়ভুক্ত হইয়া থাকে।

(৩)

এখন সমিতি কর্তৃক অনুসৃত মূলনীতিগুলির যৌক্তিকতা আলোচিত হইতে পারে। প্রথম কারণ হইল যে, তাঁহাদের নির্বাচিত শব্দসমূহের বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতির অনুযায়ী হইতে বাধ্যবাধকতা আছে কি না। কেননা, এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর তাঁহাদের শব্দ-চয়নের গ্রহণীয়তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। তাঁহাদের অবলম্বিত প্রণালী সম্বন্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, সংস্কৃত বাক্যরীতির প্রতি আনুগত্যের ফলে তাঁহাদের পারিভাষিক-সংকলন বাংলা ভাষার স্বভাবধর্মকে অতিক্রম করিয়াছে। সমিতির পক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, পারিভাষিকের কোন ভাষাগত জাতি নাই; উহা বাংলার ভাষার প্রত্যন্ত প্রদেশে সংস্কৃতের উপনিবেশ-স্থাপনের মত ব্যাপার। সর্ব-ভারতীয় বোধগম্যতার ভিত্তিতে উহাদের নির্বাচন; বাংলা ভাষার সহিত ইহাদিগকে যে নিশ্ছিদ্রভাবে মিশিতেই হইবে এমন কোন হেতু নাই। রাজনৈতিক উগ্রতর প্রয়োজনের নিকট শাব্দিক উপাদানের ঐক্য নিজ দাবী প্রত্যাহার করিতে বাধ্য। বিশেষতঃ দপ্তরখানার সরকারী

কার্যে ব্যবহৃত শব্দমূল সাধারণ প্রয়োজনের বহির্ভূত এবং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্রেণী—এই বিশেষ শব্দগোষ্ঠীর সহিত অন্যান্য শব্দসম্ভারের সম্বন্ধ কেবল প্রয়োজনমূলক, নিবিড়-ভাববিনিময়মূলক নহে। ইহাদের পক্ষে সদা প্রচলিত শব্দগুলি কেবল এক কারখানায় খাটিবে, রসের নিমন্ত্রণে পংক্তি-ভোজনে বসিবে না। এইরূপ যুক্তি আমাদের সংশয়-নিরসনের পক্ষে যথেষ্ট কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। একটি সজীব চলমান ভাষার পক্ষে এরূপ একটি বিশেষ শ্রেণীর শব্দকে আত্মনিষ্ঠ, সংকীর্ণ প্রয়োজনের গণ্ডীতে চিরকাল আবদ্ধ রাখা সম্ভব কিনা তাহা বিতর্কের বিষয়। প্রবল আবেগের প্রেরণায় আকস্মিক ভাবোচ্ছ্বাসে, শাসনব্যবস্থার যান্ত্রিকতার মধ্যে অনিবার্য-ভাবে উৎসারিত হৃদয়বৃত্তির প্রবাহে এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবারই সম্ভাবনা। আতিথেয়তার আগ্রহাতিশয্যে সীতা যেমন লক্ষ্মণ-নির্দিষ্ট নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিদেশী শত্রুর কুক্ষিগত হইয়াছিলেন, অনুরূপ কারণে অযত্ন-সংরক্ষিতা এই পারিভাষিক ভারতী সীমার বাহিরে পা দিয়া অনার্য-শব্দের অশুচি স্পর্শ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবেন। এই পারিভাষিক শব্দগুলি কি চিরকাল সাহিত্যে অপাংক্তেয় থাকিবে? তাহারা কি প্রয়োজনের রূঢ় আবেষ্টন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভাবদ্যোতনার সৌন্দর্য লোকে স্থান গ্রহণ করিবে না? অন্ততঃ এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তাহাদের বর্তমান আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোনো উপন্যাসে পোষ্টমাষ্টার ও পিয়নের পারস্পারিক পদমর্যাদাবোধের অভিমান লইয়া হাস্যরসের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। আশংকা হয় যে, 'মহা-প্রৈষাধিকারিক' কোনো ভবিষ্যৎ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনালীলা উদ্রেক করিতে পারিবে না। ইহার বিরাটত্ব ও আয়তন-বাহুল্য সাহিত্যিক প্রেরণাকে কি প্রতিহত করিবে না? যদি বিশুদ্ধভাবে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের নামোচ্চার অভিযোগ-উপস্থাপনের একটা অবশ্যকরণীয় অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে এই নামের বিভীষিকাতেই ডাক-বিভাগের অভিযোগের সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে তাহা নির্ভয়ে বলা যায়। মোটের উপর পরিভাষার খাল কাটিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিশালকায় সংস্কৃত কুমীর আমদানী করিয়া বাংলার ছোট-খাট চুণাপুঁটিমাছগুলিকে তাহার উদরস্থ হইবার আমন্ত্রণ-জ্ঞাপন কি ভাষার ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে?

রসবোধ ও পরিমিতি-জ্ঞানের দিক দিয়া ভাষার উপর পারিভাষিক প্রভাব কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য; যদি এই নব প্রণয়নগুলি ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া সাহিত্য-রচনার উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়, তবে যেমন সৌরজগতে বিশালায়তন বস্তুপিণ্ডের আকর্ষণ সূক্ষ্মকায় বস্তুপিণ্ডের উপর ক্রিয়াশীল হইয়া উহার কক্ষাবর্তন-পথ নির্ধারিত করে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই ঘটিবে। বাক্যের মধ্যে বড় ও ছোট বাক্যগুলির পারস্পরিক সন্নিবেশে লেখকের শিল্পজ্ঞানের শিরঃপীড়া ঘটিবে এরূপ অনুমান মোটেই অসঙ্গত নয়। সাধারণ হইতে অসাধারণে মুহুর্মুহুঃ স্থান-পরিবর্তন, এক জগৎ হইতে আর এক জগতে ঘন ঘন লম্ফপ্রদান শব্দ পদাতিকগুলির পাদচারণায় সমতাকে প্রায়ই বিপর্যস্ত করিবে। একজন অপরাধী চুরি করিয়া যে রাজ-কর্মচারীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে তিনি একজন অবর-আরক্ষা-পরিদর্শক, তাঁহাকে আর দারোগাবাবু বলা চলিবে না। তাহার বিচার হইবে একজন উপশাসক ও সমাহর্তার নিকট (Deputy Magistrate and Collector) শেষ পর্যন্ত আপীল হইবে মহাধর্মাধিকরণের ন্যায়াধীশের (High Court Judge) বিচারালয়ে। বেচারি একটা সামান্য অপরাধ করিয়া এমন একটা অপরিচিত, ভীতি বিধায়কশব্দব্যূহ-বেষ্টিত হইয়া পড়িবে যে, বিচারের পূর্বেই তাহার দণ্ডভোগের পালা আরম্ভ হইবে। এই অজানা, অচেনা নাম-সমুদ্রে পড়িয়া সে এমন হাবুডুবু খাইবে যে, তাহার আত্মপক্ষসমর্থনের আসল সমস্যাটাই তাহার নিকট গৌণ হইয়া দাঁড়াইবে। অবশ্য বর্তমান ব্যবস্থায় যে এই নাম-বিভ্রাটের অসদ্ভাব আছে তাহা নয়। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে পাড়াগেঁয়ে মস্তিষ্ক জটিল অভিধানসমূহের সরলীকরণের দ্বারা এগুলিকে নিজের বোধশক্তির তথা উচ্চারণশক্তির মাপসই করিয়া এই সমস্যার একরূপ সমাধান করিয়া লইয়াছে। দারোগা, জমাদার, ডিপুটি, হাকিম প্রভৃতি শব্দগুলি কতক মুসলমানী আমলের জের, কতক বা গুরুভার প্রপীড়িত গণ-বুদ্ধির বোঝা-কমানোর স্বতঃস্ফূর্ত কৌশল। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় উদ্ধারের উপায় যে কতদিনে উদ্ভাবিত হইবে কে জানে। চুরি অপরাধটি চুরিই থাকিবে, কিন্তু এই সামান্য অতিপরিচিত ক্রিয়ায় এমন একটি শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করিবে যাহার আকম্পন ব্যোমদেশ পর্যন্ত অনুভূত হইবে।

এখন ধরা যাউক যে, কোন সাহিত্যিকে চুরির একটি বর্ণনা দিতে হইল। তিনি চোরের সঙ্গে তাহার আনুষঙ্গিক প্রতিবেশের যথা, অবর আরক্ষা পরিদর্শক, উপশাসক ও সমাহর্তা প্রভৃতির সমন্বয় ঘটাইতে কি অতিমাত্রায় বিব্রত হইয়া পড়িবেন না? পারিভাষিকের স্ফীতি কি একবাক্যগ্রথিত অন্যান্য শব্দের অনুরূপ স্ফীতি-সংঘটনের প্রেরণা দিবে না? যদি তিনি তাঁহার শিল্প-বোধকে অসাড় করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে 'আরক্ষা' 'সমাহর্তা' প্রভৃতির সহিত মিল রাখিয়া চোরকে 'তস্করবৃত্তিপরায়ণ বা ['তস্করতা অপরাধে অভিযুক্ত'] এইরূপ মেদবহুল আভিজাত্য-পদবীতে আরোহণ করাইতে হইবে। এইরূপ-ভাবে সমস্ত বাংলা ভাষাই আবার পুনরুজ্জীবিত সংস্কৃত-প্রভাবে স্ফীতোদর হইয়া উঠিবে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার কল্যাণে আমরা অচিরকাল পূর্বে সংস্কৃতের যে অনুচিত প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি তাহাই আবার স্বাজাত্যভিমানের বর্ম-পরিহিত হইয়া বাংলার উপর চড়াও হইবে। প্রাড়বিবাক্ ধৃষ্টদ্যুম্নের বংশধর-সম্প্রদায় আবার বাংলা সাহিত্যে উপনিবেশ স্থাপন করিবে ভাবিলে ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মন ঠিক পুলকোৎফুল্ল হইয়া উঠে না।

(৪)

দ্বিতীয় যুক্তি হইতেছে সর্বভারতীয় যোগসূত্র-রচনা। কয়েকটি শাসন-সংক্রান্ত কার্যের সংজ্ঞা এক হইলেই যে ভারতীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এইরূপ মনে করা সমস্যার অন্তর্গূঢ় প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা-প্রকাশ। প্রাদেশিক ব্যবধানের এইরূপ সুলভে সেতু-রচনা পূর্তবিজ্ঞানশাস্ত্রের অনধিগম্য। শাসনতন্ত্রের দিক দিয়া প্রত্যেক প্রদেশ, কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া, অন্য সব দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরস্পর-নিরপেক্ষ। সরকারী কর্মচারীর আন্তঃপ্রাদেশিক অদল-বদলও যে সচরাচর ঘটিবে এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। আর যদিই কোন বিশেষ প্রয়োজনে এরূপ ঘটেও তথাপি স্থানান্তরিত কর্মচারীদিগকে যে পূর্ব সংজ্ঞা বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবেই এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। গোলাপ সকল নামেই নিজ সুগন্ধ বিতরণ করিবে —রাজকর্মচারীরও নূতন নাম-গ্রহণে কার্যদক্ষতার কোনো ব্যত্যয় ঘটিবে না। তবে অকস্মাৎ-ঐক্যের নামে এই পরিভাষা-মরীচিকার অনুসরণে ফল কি? সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্ম ও ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া সকল প্রদেশের মধ্যে যে একটি

নিগূঢ় আত্মীয়তার বন্ধন বহুদিন হইতেই অস্তিত্বশীল. কয়েকটি সরকারী কর্মচারীর সংজ্ঞা-সাম্যে কি তাহা আরো সুদৃঢ় হইবে? যেখানে নাড়ীর টান বিদ্যমান, সেখানে আবার দড়ি দিয়া বাঁধিবার প্রয়োজনীয়তা কি? না হয় যে কয়টি বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের সংরক্ষিত বিষয় সেগুলি সম্বন্ধে সর্ব প্রদেশে প্রযোজ্য সাধারণ সংজ্ঞা প্রযুক্ত হউক। রেলওয়ে, যান-বাহন, ডাক ও তার, আয়কর প্রভৃতি বিভাগগুলি সাধারণ সংজ্ঞার সূত্রে বাঁধা পড়িলে হয়ত কাজের সুবিধা হইতে পারে। মহাপ্রৈষাধিকারিক না হয় নিজ সংজ্ঞার বিশাল স্তম্ভের উপর সর্বভারতীয় সংবাদ-আদান-প্রদানের গুরুভার দায়িত্ব বহন করিতে থাকুন—হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত প্রোথিত প্রত্যেক টেলিগ্রাফ-কীলকে তাঁহার নামের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হউক। কিন্তু যে সমস্ত কর্মচারী একান্তভাবে প্রাদেশিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ, তাহারা প্রাদেশিক সংজ্ঞার দ্বারা নির্দিষ্ট হইলে ক্ষতি কি? ইহাতে ঐক্যের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে না, অথচ প্রদেশের লোকে তাঁহাদের নাম-মহিমা বুঝিতে পারিবে। সর্বভারতীয় বোধগম্যতার নিকট প্রাদেশিকতার বোধগম্যতাকে বলি দেওয়া যেন একটু অদ্ভুত মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। প্রদেশের জীবনধারার সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, প্রাদেশিক ভাষাতেই তাঁহাদের নামকরণ হওয়া উচিত। যেখানে প্রদেশ-প্রচলিত ভাষার সহিত সংস্কৃতের কোনো পার্থক্য নাই, যেখানে কোনোও অসুবিধা হইবে না; কিন্তু যেখানে বৈষম্য আছে, সেখানে প্রদেশের প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আবার তথাকথিত বিশুদ্ধি-রক্ষা সম্বন্ধে অত্যুগ্র সচেতনতার বিষয়ে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। যে বৈদেশিক শব্দগুলি বাহিরের প্রয়োজনের দেউড়ী পার হইয়া ভাষার অন্তঃপুরে একবার স্থান লাভ করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে খুঁৎখুঁতে মনোবৃত্তি বিকৃত শুচিবাই-এর নিদর্শন। তাহারা ভাষার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ—উহার অস্থিমজ্জার সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। বিদেশী বই, দোয়াত, কলম বহুকাল ভাষা-সরস্বতীর সেবা করিয়া তাঁহার প্রসাদে ভাষায় চিরস্থায়ী স্বত্ব অর্জন করিয়াছে—এখন গ্রন্থ, মস্যাধার, লেখনী প্রভৃতি অভিজাতবংশীয়েরা সংস্কৃত উদ্ভবের দলিল দেখাইয়া তাহাদিগকে আর স্থানচ্যুত করিতে পারিবে না। সংস্কৃতে আমার জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ আমার কাহারও অপেক্ষা কম নহে।

তথাপি এই অনুরাগের দোহাই দিয়া ইতিহাস-বিবর্তনের অপ্রতিবিধেয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। বাংলা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত এবং তাহার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও বহু শতাব্দী ধরিয়া সংস্কৃতের তত্ত্বাবধানে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, সংস্কৃতের ভাব-পরিমণ্ডলে বাস, সংস্কৃতের আদর্শের অনুসরণ যুগ যুগ ধরিয়া তাহার অগ্রগতিকে নিয়মিত করিয়াছে। এতদিন সে এক প্রকার সংস্কৃতের করদ রাজ্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। এখনও যদি কোনো কোনো শব্দ তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়া থাকে ও নূতন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সেগুলি অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়, তবে উহাদিগকে আত্মসাৎ করিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু ব্যাপক-ভাবে ঋণ-গ্রহণ আর তাহার আত্মমর্যাদা ও আত্মপুষ্টির পরিপন্থী বিশুদ্ধির একটা মোহ আছে, কিন্তু এই মোহকে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সব সময় প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। হরিদ্বারের গঙ্গার নির্মল সলিল কাহার মনে ভক্তির উদ্রেক না করে ও অবগাহনেচ্ছা না জাগায়? কিন্তু সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথী যখন নিম্নভূমির আকর্ষণে নানা গ্রাম ও জনপদের জীবনযাত্রার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের ছবি বক্ষে ধারণ করিয়া, গতিবেগ ও পরিধি-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কলুষ ও আবিলতা সঞ্চয় করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া চলে, তখন তাহাকে উৎপত্তি-স্থলে ফিরিয়া যাইবার আবেদন জানানোর কি কোনো সার্থকতা আছে?

(৫)

এই পর্যন্ত গেল নীতি-আলোচনার পর্ব; এখন আসিতেছে প্রয়োগপর্ব। ভাষা ও সাহিত্যের যতই আপত্তি থাকুক, শাসনতন্ত্র ঘুরিবেই এবং ঘূর্ণ্যমান যন্ত্র হইতে বাহির হইবে নূতন নূতন পদ এবং নবজাত শিশুর ন্যায় এই নবোদ্ভূত পদাবলীর নামকরণ করিতেই হইবে। সুতরাং ভাষাতাত্ত্বিক প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া এই শাসনরথ চারিদিকে ধূলিজাল বিকীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইবেই। এখন এই যন্ত্ররাক্ষসের খাদ্য না জোগাইলেই নয়। আর বাস্তবিকই ত, স্বাধীনতা-লাভের পর যদি গোটাকয়েক নূতন পারিভাষিক শব্দের সংকলন না করা গেল, তবে স্বাধীনতার একটা বাস্তব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ কি করিয়া জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা যাইবে? অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা ত এখনও

মিটিল শাসনব্যবস্থার অন্তঃপ্রকৃতি অপরিবর্তিতই রহিয়া গেল ; স্বাধীন মতের বায়ুপ্রবাহও এই মেঘাচ্ছন্ন গুমটধরা আকাশের তলে একরূপ বন্ধ হইয়াই গেছে। সুতরাং লোকের মনে একটা অভিনবত্বের চমক জাগাইবার জন্যও ত এরূপ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া ইংরেজীভাষার নাগপাশের বেষ্টনকেই বা কেমন করিয়া অভিনন্দন করা যায় ? মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও অভিমানে ঘা লাগে।

বিদায় করেছ যারে নয়নজলে (আনন্দাশ্রু !)
এখন রাখিবে তারে কিসের ছলে !

কাজেই অতি বড় নাস্তিককেও পরিভাষা-সঙ্কলনের দরকারটা মানিয়া লইতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে কি করিয়া এই পরিবর্তনের পরিধিটুকু যথাসম্ভব সংকীর্ণ করিয়া ইহাকে ভাষার প্রকৃতি ও প্রবণতার সঙ্গে মিলাইয়া লওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমার প্রথম নিবেদন (Suggestionএর যথোচিত বিনীত প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাইলাম না) যে, সর্বপ্রথম দপ্তরখানার কণ্টকিত ব্যবস্থাগুলি সাফ করিতে হইবে। যদি কর্মচারীর সংখ্যাবাহুল্য নিতান্তই কমানো না যায়, তবে অন্ততঃ নামকরণে বৈচিত্র্যবিলাসটা বর্জন করিতে হইবে। ছোটবড় মাঝারি নানাপ্রকার পদমর্যাদা ও বেতনহার-বিশিষ্ট সেবকদের মাথা ছাঁটিয়া সমান করিতে হইবে। আমেরিকার যে গণতান্ত্রিক নীতি আমেরিকান সহরে রাস্তার নামকরণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। একজন প্রধান কর্মসচিব ও প্রতি বিভাগের একজন বিভাগীয় কর্মসচিব (Secretary ইহাকে 'সচিব' আখ্যা ইহার কর্তব্যের দ্যোতক কি না, তাহা বিবেচ্য) থাকুন ; কিন্তু তাঁহার সহকারিবৃন্দের এক ক্ষুরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া একই নামে অভিহিত করাই বিধেয়। অ্যাডিসনাল, জয়েন্ট্, ডেপুটী প্রভৃতির স্থলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি নামকরণ হইলে ব্যাপারটা অনেক সরল হয়। এই পরিবর্তনটি সাধিত হইলে একদিকে ভাষার উপর, অন্যদিকে করদাতার কষ্টার্জিত অর্থের উপর চাপটা যেমন কমে, তেমনি দপ্তরখানার অন্তরালে প্রতিযোগিতার তীব্রতা, বিস্তর মান-অভিমান, হাসি-কান্নার অভিনয়ও অনেকটা সংকুচিত হয়। সহকারিবৃন্দেরও এক একটা সিঁড়ি ডিঙ্গাইবার তদ্বিরে ও পরিশ্রমে গলদ্ঘর্ম

হইতে হয় না; প্র-পরা-উপ প্রভৃতি উপসর্গগুলির দেহেও অত্যাচারজনিত রোগের উপসর্গ প্রকাশিত হয় না। বর্ণমালার 'প' ও 'ব' অতি নিকট প্রতিবেশী, কিন্তু হায়, চাকুরীর শব্দকোষে 'অবর' ও 'অপরের' মধ্যে মর্মান্তিক ব্যবধান; এবং এই ব্যবধানটুকু কত ভাগ্যবিড়ম্বিত রাজপরিবারের লবণাশ্রু-নিষেকে পিচ্ছিল।

(৬)

এবারে কতগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া—যাহাকে বলে গঠনমূলক বক্তব্য পেশ—তাহা করিবার চেষ্টা করিব। প্রথমেই দেখিতেছি যে "General" কথাটির "মহা" এই পূর্বগামী প্রত্যয়ের দ্বারা ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। 'Accountant General' 'মহাগাণনিক' পর্যন্ত একরকম চলে, কিন্তু যখন দেখি 'Surgeon General' এর প্রতিশব্দ 'মহা-চিকিৎসক' গৃহীত হইয়াছে, তখনই খট্‌কা লাগে ও প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকের "শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে, যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে" নিষেধ মনে জাগে। 'মহা-চিকিৎসক' কথাটির মধ্যে কি একটু আত্মশ্লাঘার স্পর্শ, একটু শ্লেষের ব্যঞ্জনা অনুভূত হয় না? প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বক্তব্য যে 'মহা' শব্দের প্রয়োগ একটু বিবেচনার সহিত করা উচিত। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে প্রাচীনযুগে রাজপরিকরের সংজ্ঞার মধ্যে মহামাত্য, মহাপ্রতীহার প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে সে-যুগে রাজার উপাধি বহু বিশেষণভূষিত ও আড়ম্বরবহুল ছিল; সুতরাং এ বিষয়ে রাজা ও রাজসভাসদদের নামকরণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে রাজমহিমার খর্বতা রাজোপাধির ক্রমক্ষীয়মান সংক্ষিপ্ততার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে; এমন কি রাজার সহিত মহাশব্দের বিচ্ছেদও ক্রমশঃ সাধারণ হইয়া উঠিতেছে। যেখানে রাজার কিরীটপ্রভাই মলিন, সেখানে তাঁহার বিচ্ছুরিত জ্যোতি কি রাজভৃত্যের শিরোদেশ বেষ্টন করিয়া থাকিবে? পরিভাষা-সংসদ যে সমস্ত উপাধি প্রাচীন যুগ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই রাজতন্ত্রের ভাবাসঙ্গ-বিজড়িত; সুতরাং যে যুগে রাজা শাসনতন্ত্র হইতে নির্বাসিত সে যুগের আবহাওয়ার সঙ্গে ইহার ঠিক খাপ খাইবে না। এই চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়া আমার মনে হয় যে 'মহাগাণনিক', 'মহাচিকিৎসক'

প্রভৃতির স্থলে 'গাণনিক-প্রধান', 'চিকিৎসক-প্রধান' ইত্যাদি সংজ্ঞা যুগধর্মের অধিক উপযোগী হইবে। 'প্রধান' কথাটি ঠিক শ্রেষ্ঠতাব্যঞ্জক নয়, ইহা official head-এর ধারণারই দ্যোতক। 'গ্রাম-প্রধান' অর্থে গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বুঝায় না; গ্রামের সরকারী নেতাই বুঝায়। অন্ততঃ ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দ্যোতনা উগ্রভাবে প্রকট নয়। শব্দের পূর্বগামী head ও পরগামী general-কে একই 'প্রধান' নামে অভিহিত করিলে কোনোই ক্ষতি দেখিতেছি না।

আর একটি বহু প্রযুক্ত ও বহু অপপ্রয়োগ-লাঞ্ছিত শব্দ হইতেছে 'Commissioner'। ইহা সংসদকে যথেষ্ট বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। এই শব্দটির সাধারণ প্রতিশব্দ 'মহাধ্যক্ষ' দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কর্তব্যের পার্থক্য ও গুরুত্ব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন কথাও প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ, 'Commissioner of a Division' কে 'ভুক্তিপতি' বলা হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সরকারী কর্মচারীকে 'পতি' আখ্যা দিতে সংসদ এত উৎসুক কেন? কমিশনার সাহেব হয়ত কর্মচারীদের শীর্ষস্থানীয়; তথাপি তিনি একজন কর্মচারী মাত্র—'তথাপি সিংহ পশুরেব নান্য'। 'পতি' শব্দের সঙ্গে যে আধিপত্যের ভাব জড়ানো তাহা আমরা কোনো কর্মচারীতে, তা সে তিনি যতই উচ্চপদস্থ হউক না কেন, আরোপ করিতে নারাজ। 'পাল' বা 'শাসক' প্রত্যয়টি কিসে অপ্রযুক্ত হইল? গভর্ণর ত প্রদেশপাল। 'অধ্যক্ষ' উপাধির প্রয়োগ শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন; অতি-বিস্তৃতিতে ইহা অর্থহীন হইয়া পড়ে। শুধু অফিসের কর্তাকে 'অধ্যক্ষ' নামে অভিহিত করিলে উহার সঙ্গে যে নৈতিক নিয়ন্ত্রণের ব্যঞ্জনা থাকে তাহার যথার্থ প্রয়োগ হয় না। যেখানে Commissioner-এর নীচে আর কোনও অধীন কর্মচারী থাকে না, যেমন (Commissioner for workmen's Compensation) সেখানে অধ্যক্ষ অযৌক্তিক; তাহাকে 'শ্রমিক নিষ্ক্রয়-নির্ধারক' নাম দিলে হয়ত অভিধান-গৌরব কমে, কিন্তু কর্তব্যের সুষ্ঠুতর নির্দেশ ব্যঞ্জিত হয়। সেইরূপ Agriculture Development Commissioner-এর (ইহার অধীন কর্মচারীর নাম তালিকায় দেখিলাম না) প্রতিশব্দ 'কৃষি-উন্নয়ন-ব্যবস্থাপক' করিলে মনে হয় যেন ভালই শোনায়। 'কৃষিবর্ধন' কথাটি শিষ্ট প্রয়োগ নহে বলিয়া ঠিক আমাদের হর্ষবর্ধন করে না।

তারপর 'Director' কথাটির প্রয়োগ-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ইহাকে 'অধিকর্তা' শব্দে ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। 'অধিকর্তার মধ্যে যেন 'over-lordism'-এর গন্ধ পাওয়া যায়। হয়ত সংসদ ইহাকে অধিকার-পরিচালনায় সক্রিয় শক্তিরূপেই প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ আমাদের পরিচিত নয়। Director-এর প্রতিশব্দরূপে 'নিয়ন্তা' বা 'নিয়ামক' শব্দটিই অধিকতর ভাবানুযায়ী বলিয়া মনে হয়। নিয়ামক 'Controller'-এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত ; হইয়াছে ইহার অর্থ 'Director' হইতে ঈষৎ বিভিন্ন। 'Director' স্থায়ী নীতি নির্ধারণ করেন, Controller অনেকটা অস্থায়ীভাবেই হউক বা বহিরঙ্গমূলকভাবেই হউক নিয়ন্ত্রণ মাত্র করেন। এ ক্ষেত্রে 'Director'-কে নিয়ামক বা নিয়ন্তা বলিয়া Controller-কে নিয়ন্ত্রক বলিলে উভয়ের কর্তব্যের পার্থক্যটুকু বজায় থাকে। 'Director of Public Instruction or Director of Pubilc Health-কে শিক্ষা-নিয়ামক ও স্বাস্থ্য-নিয়ামক বলা বেশ চলে। Director of Fire Services-কে Controller বলা অধিকতর সঙ্গত হইবে কি না, তাহা তাঁহার কর্তব্যের প্রকৃতি হইতে নির্ধারিত হইতে পারে। 'Director of health Services' ও Director of Public Health-এর মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র অভিধানের উপযোগী কোনো পার্থক্য আছে কিনা তাহা বিচার করিয়া উভয়কে এক নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

(৭)

এইবার কতকগুলি বিশেষ শব্দ লইয়া আলোচনা করিব। 'Assistant-in-charge'—'আযুক্ত সহায়ক' শব্দটি কেমন কেমন ঠেকে। এই Assistant কি কেরাণী না তদূর্ধ পদাধিকারী? যদি কেরাণী হন, তবে সহায়ক পদটির অর্থ কি? তিনিও তাঁহার সাধারণ 'করণিক' নামেই অভিহিত হইতে পারেন। যদি তিনি কোনো অনুবিভাগের কর্তা হন, তবে Head Assistant-এর প্রতিশব্দ তাঁহার প্রতি 'প্রযোজ্য', অন্যথা তাঁহাকে 'ভার প্রাপ্ত করণিক বলা যাইতে পারে। District Magistrate and Collector-কে শুধু জেলা-শাসক বলিলে ক্ষতি কি? তাঁহার রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্তব্যটুকু না হয় একটু অন্তরালেই থাকিল। প্রজা-সাধারণের চক্ষে তিনি রাজস্ব-সংগ্রাহকরূপে প্রতিভাত নন, শাসক-রূপেই প্রতিভাত হন। Commissioner

of Excise'-কে 'অন্তঃশুল্ক মহাধ্যক্ষ' বলা হইয়াছে—শুল্ক সংগ্রহের সঙ্গে অধ্যক্ষতার যোগসূত্র ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া ঠেকে না। Collector of Excise-কে 'অন্তঃশুল্ক সংগ্রাহক' বলিয়া Commissioner-এর প্রতি 'সমাহর্তা' প্রয়োগ করিলে বোধ হয় উভয়ের পদমর্যাদার তারতম্য ঠিক থাকে। Commercial Manager-এর ব্যাপার-নির্বাহিক অভিধানের তলে তাঁহার অর্থবিষয়ক দায়িত্বটুকু চাপা পড়িয়াছে—বরং তাঁহাকে 'অর্থব্যাপারিক' বলিলে তাঁহার কর্তব্যের বৈশিষ্ট্যটুকু পরিস্ফুট হয়। Vagrancy-র প্রতিশব্দ 'চক্রচর' কথাটি যে পরিমাণে আমাদের চিত্র-সৌন্দর্যবোধের উদ্রেক করে, সে পরিমাণে অর্থস্ফুটতা আনে না। 'উদ্বাস্তু' বা 'বাস্তুহীন' শব্দটি কবিত্বের দিক দিয়া খাট হইলেও অর্থবোধের দিক দিয়া বোধহয় শ্রেষ্ঠ। Caretaker, Overseer ও Electrical Overseer' এই তিনটি শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য Caretaker-এর হয়ত কোনো বিশেষ গুণপনা না থাকিতে পারে—সুতরাং তাহাকে শুধু 'রক্ষক' বলিয়া আর দুইজনকে 'নির্দেশক' বলিলে অন্ততঃ একটি অতিরিক্ত পারিভাষিকের চাপ হইতে ভাষা বাঁচে। "Inspecting Overseer" এর প্রতিশব্দ 'পরিদর্শী উপদর্শক' 'হরির উপরে হরি হরি শোভা পায়'কে স্মরণ করাইয়া দেয়। 'নিরীক্ষক' তথা 'উপদর্শক' বলিলে কি চলে না? Deputy Administrator General and Official Trustee-মিশ্র কর্মভারের গুরুত্ব ঠিক বুঝি না; সুতরাং নাম বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই পদটির দ্বিখণ্ডতা সম্পাদন সম্ভাব্য কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। Deputy Director of Post and Telegraphs-কে ডাক-তার-উপনিয়ামক ও Deputy Postmaster General-কে সহকারী ডাককর্তা নামে অভিহিত করিলে উভয়ের কর্তব্যের পার্থক্য সুপরিস্ফুট হইতে পারে। Deputy Provincial Transport Commissioner-এর নামটি অযথা ভারাক্রান্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, Commissioner-এর কোনো সার্থকতা নাই, বরং Controller প্রযোজ্যতর মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, Provincial কথাটি যোগ না করিলেই বা ক্ষতি কি? ক্ষুদ্রতর পরিধিজ্ঞাপক সংজ্ঞা যোগ করিলে প্রাদেশিক কর্তার আর বিশেষ পদমর্যাদা বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে না। ইহাকে হ্রস্বক্ষর 'উপ-যান-নিয়ামক' বলিলে বুঝিবার কষ্ট হইবে না। Director of Fees ও Director of Employment (এরূপ চাকুরী আছে নাকি?)

ইহাদিগকে Controller নামে অভিহিত করাই অধিক সঙ্গত। Director of Rationing ও Controller of Rationing-এর প্রতিশব্দ যথাক্রমে দ্রব্য-নিয়ন্ত্রণ-নিয়ামক ও দ্রব্যনিয়ন্ত্রক বলা যাইতে পারে, একজন নীতি নির্ধারণ করিবেন, অপরজন নির্ধারিত নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ করিবেন।

এক্ষণে পুলিশ বিভাগের কয়েকটি পদের নামকরণ আলোচ্য। District Police Superintendent ও Deputy Superintendent of Police জেলা-পুলিশাধিনায়ক ও সহকারী জেলা-পুলিশাধিনায়ক শব্দদ্বয়ের দ্বারা নির্দেশিত হইতে পারে। অধিনায়ক শব্দটি পুলিশের আধা-সৈনিক প্রকৃতির সহিত খাপ খায়। Police Inspector ও Sub-Inspector of Police পদ দুইটির প্রতিশব্দ-নির্বাচনে সংসদ হাস্যকর বিভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। Inspector অর্থে পরিদর্শক শব্দটিকে তাঁহারা সর্বত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছেন যে ইঁহাদের কাজ পরিদর্শন নয়, অনুসন্ধান। আমি উহাদের পুলিশ-আনুসন্ধানিক ও সহকারী আনুসন্ধানিক এইরূপ নাম-করণের প্রস্তাব করিতেছি। আশা করি, আরক্ষা-পরিদর্শক ও অবর-আরক্ষা-পরিদর্শক অপেক্ষা এই বৈকল্পিক পদগুলি অধিকতর গ্রহণীয় হইবে।

Extra Assistant পদের প্রতিশব্দরূপে 'অতিরিক্ত' ব্যবহৃত হইয়াছে। এখন Additional-এর পরিবর্তে 'অতিরিক্ত'-এর প্রয়োগ সুপরিচিত। Extra Assistant খুব বিরল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে ; পরন্তু Additional-এর প্রয়োগ অনেক বেশী ব্যাপক। সুতরাং 'অপর' কথাটি Extra Assistant সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া Additionalএর 'অতিরিক্ত' সংজ্ঞা পুনর্গ্রহণ করিলে লোকের অভ্যাসের উপর বেশী জুলুম করা হইবে না। House Surgeon ও Civil Surgeon-এর এক যাত্রায় পৃথক ফল হইয়াছে; একজন কেবল চিকিৎসক ও অপরজন শস্ত্র-চিকিৎসক সংজ্ঞাচিহ্নিত হইয়াছেন। উভয়ের একত্ব-বিধানে কি কোনোও বাধা আছে? Industrial Chemistকে হঠাৎ স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে সাজানোর কি প্রয়োজন হইল? 'শিল্প-রাসায়নিক' বলিলে কি কিছু অপরাধ হইত? Instrument-keeperএর সংজ্ঞা-নির্দেশে 'সাধিত্র' কথাটি যেন একটু বেশি মাত্রায় পাণ্ডিত্যপ্রকাশক মনে হয়। যন্ত্ররক্ষক বলিলে যদি Engineering বিভাগের সহিত কোনো যোগাযোগ আভাসিত হয় তবে বন্ধনীর মধ্যে বিভাগ-নির্দেশ করিলে সে ভ্রমের অপনোদন হইতে

পারে। Circle Officerকে মণ্ডলাধিকারক না বলিয়া মাণ্ডলিক বলিলে অনেক সরকারী কালি ও কাগজ বাঁচিতে পারে। Labour Commissionerকে শ্রম-মহাধ্যক্ষ বলার কোনো যৌক্তিকতা নাই। শ্রমনীতি-বিধায়ক বা 'শ্রম-কল্যাণ-বিধায়ক' প্রয়োগ করিলে মহাধ্যক্ষের মহত্ত্বের অপপ্রয়োগ হয় না। একজন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি Assistant-এর প্রতিশব্দরূপে 'সহ' এর প্রয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি জানাইয়াছেন, 'সহ' শব্দ সম-মর্যাদাজ্ঞাপক যথা সহাধ্যায়ী, সহকর্মী। পরিভাষার কিন্তু ইহার মধ্যে অধীনত্ব সূচিত হইতেছে। Assistant অর্থে 'সহকারী' শব্দটিই সুষ্ঠু। সহকে এইরূপে সহকারীর সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত বলিয়া গ্রহণ করিলে এই বৈয়াকরণিক আপত্তির নিরসন হইতে পারে। পরিভাষা সম্বন্ধে সংস্কৃতের প্রতি অতিমাত্রায় আনুগত্যশীল হইয়া সংসদ সংস্কৃত প্রয়োগরীতি কেন উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন বুঝিলাম না।

(৮)

আর বেশী দৃষ্টান্ত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। অনেকগুলি প্রতিশব্দ ভালই হইয়াছে এবং সেগুলি গ্রহণ সম্বন্ধে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির মূলনীতি পরিবর্তন করা দরকার। সর্ব ভারতকে বুঝাইতে গিয়া নিজপ্রদেশবাসীর বিভীষিকা-উৎপাদন ও নিজের ভাষার অন্তঃপ্রকৃতিকে উৎকটভাবে উল্লঙ্ঘন করিলে, হিত অপেক্ষা অহিতই হইবে। 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর'—বৈষ্ণব সাধনার এই নীতি বর্তমান যুগে ও অবস্থায় ঠিক প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয় না। ঘর সামলাইয়া বাহিরের সঙ্গে যথাসম্ভব মিতালীতে কোন আপত্তি নাই।

উপসংহারে বলিতে চাই যে, পরিভাষা-সংসদের সদস্যবৃন্দের পাণ্ডিত্য বা বিদ্যাবত্তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার আমার অনুমাত্র উদ্দেশ্য নাই। আমার মনে হয় যে, এই পরিভাষা-প্রণয়ন-ব্যাপারে তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে সংকীর্ণ ধারণার জন্যই তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে স্ফূর্তি পায় নাই। ঐরূপ ধারণার লৌহ-বন্ধনের মধ্যে তাঁহাদের মানস স্থিতিস্থাপকতা অনেকটা আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অনুরূপ ধারণার বশবর্তী হইলে অপরেরও হয়ত সেই দুর্দশা হইত। অন্ততঃ আমি আমার নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি। হরধনুতে জ্যা-আরোপণ পরীক্ষায় অনেক ধনুর্ধরই ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ যদি এই ধনুককে বিপরীত দিকে বাঁকাইয়া তাহাতে

গুণ-সংযোগ ধনুর্বেদ-পারদর্শিতার পরীক্ষা বলিয়া বিবেচিত হয় তবে ধূলিশয়নের সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়িয়া যায়। তবে হয়ত এই কর্তব্য-পালন যদি রসবোধ ও মাত্রাজ্ঞানের দ্বারা আর একটু সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত, তবে কোনো কোনো শব্দসন্নিবেশের উৎকট অসঙ্গতি কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইত। সংসদের সদস্যবৃন্দ তাঁহাদের পুস্তিকায় নূতন-শব্দ-সংকলনে সংস্কৃত সাহিত্যের অসাধারণ উপযোগিতা, ইহার অতুলনীয় শব্দৈশ্বর্যের কথা উল্লেখ করিয়া এই ভাষা-পিতামহীর অকুণ্ঠ গুণগান করিয়াছেন। আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের সহিত একমত। কিন্তু বাংলা দেশে সংস্কৃতের চর্চা আজ যে কি শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা সংসদের শিক্ষাব্রতী সদস্যেরা নিশ্চয়ই জানেন। এমন কি তাঁহাদের মধ্যেও একজন কি দুইজন ছাড়া অন্যান্য সদস্য রীতিমতভাবে সংস্কৃতের আলোচনার সুযোগ পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। মনে হয় যে এই স্থান লাভ না করিলে সংস্কৃতের এই অসাধারণ গুণবত্তা তাঁহাদের নিকট অনাবিষ্কৃতই থাকিয়া যাইত। এইরূপ অবস্থায় সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পর্যন্ত সংস্কৃতবিদ্যা-অনুশীলনের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, যে পর্যন্ত না তাঁহারা সংস্কৃতে রসগ্রহণ ও মহিমা-উপলব্ধির যোগ্যতা অর্জন করেন, সে পর্যন্ত সদস্যগণের পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসা লোকমতের দ্বারা যথোপযুক্তরূপে অভিনন্দিত না হওয়াই স্বাভাবিক। শিক্ষিতসমাজের সমর্থন পাইলে ইহা ক্রমশঃ অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহারা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া যাইত ও এই অভ্যাস ক্রমে এক প্রকারের অনুমোদনে পরিণতি লাভ করিত। তাঁহারা অসীম ধৈর্য ও শিল্পকৌশলের সহিত পরিভাষার যে রথখানি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাকে চালু করিতে হইলে জনসাধারণের মানস-সমর্থন-রূপ ঘোড়ার সহিত ইহাকে সংযুক্ত করিতে হইবে। এখানে ঘোড়া ও রথ দুইই আছে, কিন্তু তাহাদের সংযোগ-স্থাপনে একটু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আর রথের গঠনে ত্রুটির জন্য যদি ঘোড়া আঁতকাইয়া উঠে, তবে অন্ততঃ যে পর্যন্ত ঘোড়া সায়েস্তা না হয় সে পর্যন্ত ইহাকে রাস্তা হইতে সরাইয়া মিউজিয়মের শান্ত, নিরাপদ বেষ্টনীর মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করাই বিধেয়। পাণ্ডিত্যের জয়স্তম্ভকে রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার উপযুক্ত ঘোড়া এখনও তৈয়ার হয় নাই বলিয়া মনে হইতেছে।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার

(১)

শিশিরকুমারের মহাপ্রয়াণ কেবল যে একজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তির জীবনাবসান তাহা নহে, ইহা বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়কলার এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের উপর যবনিকা-ক্ষেপ। প্রতিভার নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদের নিকট সর্বদাই কিছু পরিমাণে রহস্যাবৃত থাকে—তাহার পূর্ণ পরিচয় আমরা নিজেরাও পাই না অপরকেও দিতে পারি না। একজন প্রতিভাশালী পুরুষ যে কেমন করিয়া নিজ ব্যক্তিসত্তা ও পরিবার-মণ্ডলীর সঙ্কীর্ণ পরিধি অতিক্রম করিয়া জাতীয় জীবনের একটা অংশের উদারতর, সার্বভৌম বিস্তারের সহিত আত্মিক যোগ স্থাপন করেন, সেই রহস্যময় রোমাঞ্চকর ইতিহাস তাঁহার জীবনতথ্য-আলোচনার মধ্যে ধরা পড়ে না। কাজেই শিশিরকুমারের পরিচয় শুধু তাহার ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা সমগ্র বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিকাশ-সাধনা ও পরিণতির পূর্ণাদর্শের সহিত অবিচ্ছেদ্য-সম্পর্কান্বিত। তাহার ব্যক্তিপ্রাণ সম্প্রসারিত হইয়া নাট্যকলার প্রাণের সহিত যুক্ত হইয়াছে। নাটকের যে মর্মবাণী অভিনয়-কৌশলের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশে উন্মুখ, জাতির প্রাণসত্তাকে স্পর্শ করিতে ব্যগ্র, রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্য-সন্নিবেশ, আলোকোৎসার ও নট-নটীর উদ্বেলিত হৃদয়াবেগের ইন্দ্রজাল-সমবায়ে বস্তু অতীত যে মায়ালোক-উদ্ঘাটনে তৎপর, শিশিরকুমার কেমন করিয়া জানি না সেই সৃষ্টি-রহস্যের কেন্দ্রস্থলে, সেই নূতন জগৎরচনার মন্ত্রধ্বনিমুখর যজ্ঞশালায় আপনার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র প্রাণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে। যাদুসম্রাট প্রস্‌পারো আর নেপ্‌লসের পার্থিব রাজা মাত্র নহে, অমর-সভায় বিশ্ববিধাতার নির্মিতি-কৌশলের সহকারীরূপে তাহার স্থান চিরতরে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

তথাপি ব্যক্তি হইতেই প্রতিভার উদ্ভব, অসম্পূর্ণ ব্যক্তি-জীবনের ভাঙ্গা-চোরা সোপান বাহিয়াই মানুষ অনন্ত যশের মন্দিরে আরোহণ করে। কাজেই প্রতিভার বিচার করিতে গিয়া ব্যক্তিজীবন হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। বিকাশের যে স্তরে প্রতিভা আমাদের সহিত এক, আমাদের মতই পথ খোঁজে ও হোঁচট খায়, আমাদের মতই বিচার-বিমূঢ় ও সঙ্কোচ-শ্লথ,

সেইখান হইতে তাহার জীবন-ইতিহাস অনুসরণীয়। সাগর-সঙ্গমের উপকণ্ঠ-স্থিতা শতবাহুবিস্তৃতা গঙ্গাকে বুঝিতে হইলে গোমুখী-নিঃসৃত ক্ষুদ্র জলধারার সন্ধান লইতেই হইবে। তাই যেখান হইতে শিশিরকুমারকে ব্যক্তিগতভাবে জানি, যেখান হইতে তাহার বিরাট পরিণতির প্রথম সূচনা আমাদের নিকট ঈষৎ দেখা দিয়াছে, সেখান হইতেই তাহার পরিচয় সুষ্ঠুভাবে প্রতিভাত হইবে মনে হয়।

১৯০৮ সালে স্কটিশচার্চ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে শিশিরকুমারের সংগে আমার প্রথম পরিচয়। আমি পল্লী-গ্রামের ছেলে প্রথম সহরে আসিয়া অনভ্যস্ত পরিবেশে অস্বস্তি বোধ করিতেছি। সুতরাং সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিয়া শিশিরের মত রূপে উজ্জ্বল, আত্মপ্রত্যয়ে স্থির, বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল ছেলের সহিত আলাপ জমাইবার মত সাহস আমার ছিল না। পল্লীগ্রামের স্কুল-কলেজে যে সমস্ত সহপাঠীর সহিত মিশিয়াছি, শিশির তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নজাতীয়। তাহার গ্রীক দেবতার মত সুঠাম অঙ্গবিন্যাস, অনর্গল ইংরাজী বলার ক্ষমতা, অধ্যাপকদের সংগে প্রায় সমান ভাবে মেশার সাহস, সহপাঠি-মহলে জনপ্রিয়তা ও প্রভাব—এ সবই আমার মত আনাড়ী নবাগতের পক্ষে অভাবনীয়ই মনে হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে আমাদের অন্তরঙ্গতা মুখ-চেনাচিনির, যাতায়াতের সময় মাথা হেলাইয়া পরিচয়-স্বীকৃতির বেশী অগ্রসর হয় নাই। তার আরও একটা কারণ ছিল যে, শিশির ক্লাস-পলাতক ছেলের দলে ছিল—যাহারা নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকিত, তাহাদের সংগে শিশিরের ঘনিষ্ঠতা হইবার কথা নয়। ক্লাসে তাহার গতিবিধি অতর্কিত, অনিয়মিত ও খেয়ালখুশী-নিয়ন্ত্রিত ছিল। এমন কি ইংরাজী অর্নাস ক্লাসের স্বল্পসংখ্যক ছাত্রের মধ্যেও তাহাকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তখন কলেজের বহির্ভূত যে বহু-বিস্তৃত, নানা প্রতিষ্ঠানে শাখায়িত, আড্ডা-মজলিশের আয়োজন ছিল, সেইখানেই যে তাহার প্রধান আকর্ষণ ও তাহার শক্তির স্বচ্ছন্দ, লীলাময় বিকাশ এ রহস্যটি তখন জানিতাম না, পরে জানিয়াছিলাম।

অবশেষে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিবার পর সহপাঠীদ্বয়ের এই সামান্য আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। ইতিমধ্যে আমার সহপাঠীদের মনে আমার সম্বন্ধে তাহাদের পূর্ব ধারণার কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়া থাকিবে।

আমার গ্রাম্য চে: ।, পোষাক-পরিচ্ছদে রুচিহীনতা ও আলাপ-আলোচনায় আড়ষ্টতা হইতে আমাকে যতটা নির্বোধ মনে হইত ঠিক হয়ত আমি ততটা নই, এরূপ একটা সংশয় তাহাদের মনে জাগিয়া থাকিবে। কাজেই আমার প্রতি আচরণে অবজ্ঞার মধ্যে একটা ক্ষীণ সম্ভ্রমও হয়ত দেখা দিতে সুরু করিল। এই সন্ধিক্ষণেই শিশিরের সঙ্গে গাঢ়তর বন্ধুত্বের সূচনা। এই বন্ধুত্ব অংকুরিত হয় কলেজে নহে, আমাদের ছাত্রাবাসে। সেখানে অনেক বন্ধু-বান্ধবের আকর্ষণে আমাদের আড্ডা-মজলিশে শিশিরের প্রায় দৈনিক আগমনই ঘটিতে লাগিল। এই তরুণ-সমাজে তখন কি বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা, আমোদ-উদ্ভাবনে কি নব নব প্রয়াস, প্রাণ-চাঞ্চল্যের কি উদ্দাম কল্লোলিত প্রবাহ! এই মজলিশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি খেলা-ধূলার নেশা, কি কৌতুক-রঙ্গরসের উচ্ছ্বাস, আলোচনার কি প্রচণ্ড আলোড়ন! পরবর্তী জীবনে শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে যাহারা দেশ-ব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুইজন—শিশির ভাদুড়ী ও নরেশ মিত্র—এই আড্ডায় অজ্ঞাতসারে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করিতেছিল।

এই অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী-সম্মেলনেই শিশিরের অন্তরের সবটুকু পরিচয় পাইলাম—তাহার অদম্য জ্ঞান-পিপাসা, ক্ষুরধার মনীষা, কাব্য-সাহিত্যের প্রগাঢ় রসবোধ, যুক্তি-তর্কের সাহায্যে পরমত-খণ্ডন ও নিজমত-প্রতিষ্ঠার আশ্চর্য কৌশল, সংলাপের সরসতা ও আঘাত-প্রতিঘাত-নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি তাহার উদার, আত্মভোলা, বন্ধুবৎসল হৃদয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রবেশে সেই আমাদের প্রথম পথ-প্রদর্শক। আমাদের কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ তখনও স্কুল-কলেজের ছাত্রদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত ছিলেন: মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রই আমাদের নিকট শ্রেষ্ঠ কবিত্বের আদর্শ স্বরূপ বিরাজিত। শিশির মাইকেল-প্রতিভা স্বীকার করিত; কিন্তু হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহাদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ কবি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে সে বদ্ধপরিকর ছিল। কবিত্ব-বিচারের যে মানদণ্ড সে উপস্থাপিত করিত তাহা তখন আমাদের নিকট প্রায় সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। হেমচন্দ্রের একটি দুর্বল পংক্তি—'মহত্ত্ব হারাও কেন লঘুত্ব প্রকাশি'—উদ্ধার করিয়া সে তাঁহার কবিযশঃ-

স্পর্ধিতাকে শ্লেষবাণে জর্জরিত করিত। আর যুক্তি-বিচার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর ও প্রত্যক্ষতর উপায়ে—তাহার মধুর উদাত্ত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে দীর্ঘ আবৃত্তি করিয়া—সে আমাদের রবীন্দ্রকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব-স্বীকারে বাধ্য করিত। আমরা হয়ত যুক্তিকে যুক্তি দিয়া প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু অনুপম কণ্ঠস্বরে অনর্গল উদগীরিত, ভাব ও রসের সুষ্টু প্রকাশে মোহময় সেই ছন্দসংগীতপ্রবাহকে ঠেকাইব কি দিয়া? বাস্তবিক, কাব্য-আবৃত্তি যে এত মধুর হইতে পারে, কবিতার রস যে এমন প্রাণস্পর্শীভাবে অভিব্যক্ত হইতে পারে, বিশুদ্ধ, ভাবানুগামী উচ্চারণ যে অন্তরের এত গভীরে আবেদন সঞ্চার করিতে পারে, আমরা শিশিরের সুধাস্রাবী কণ্ঠ হইতে তাহার প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। নগেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরে যেমন মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ হরিদাসী বৈষ্ণবীর তালমানলয়শুদ্ধ, ভ্রমরগুঞ্জনবৎ এক অব্যক্ত অনুভূতি-মূর্ছনার অন্তশ্ছন্দে অণুরণিত, অপূর্ব সংগীত হতবুদ্ধি হইয়া শুনিয়াছিল, আমরাও সেইরূপ মন্ত্রমুগ্ধবৎ শিশিরের আবৃত্তি শুনিতাম।

আমার মনে হয় এই ভাবানুগামী, রসোচ্ছল আবৃত্তিই শিশিরের অভিনয়-কলা-সিদ্ধির প্রথম অঙ্কুর। আবৃত্তি হইতে অভিনয় মাত্র একপদ অগ্রসর হওয়া। বিশেষতঃ তাহার আবৃত্তির মধ্যেই অভিনয়ের বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল। শিশির শেষের দিকে আবৃত্তিকেও অনেকটা অভিনয়সঙ্কেতবাহী করিয়া তুলিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের শিল্পীর প্রয়োগে ইহা যে অনেকটা ভঙ্গীপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না, তবে শিশিরের অসাধ্যসাধনক্ষম প্রতিভা এই বিপদ-সম্ভাবনাকে অনায়াসে কাটাইয়াছিল।

(২)

ইহার পরের কালপর্বকে শিশিরের জীবনব্রতসাধনের প্রস্তুতি-পর্ব বলা চলে। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট, ওল্ড ক্লাব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সৌখীন রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে তাহার অভিনয়-প্রতিভার প্রথম সচেতন বিকাশ। ১৯১০ হইতে ১৯১৫-১৬ পর্যন্ত শিশির-জীবন ধীরে ধীরে, নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বিক্ষেপের ভিতর দিয়া উহার নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হইবার উপাদান সংগ্রহ করিতেছিল। প্রেসিডেন্সিতে এম, এ, ক্লাসে তাহার ক্লাস-পলায়ন-বৃত্তি একটা রীতিমত শিল্পকলায় উন্নীত হইল। ক্লাসের নির্দিষ্ট, নিয়ম-বন্ধুর

গণ্ডী ছাড়াইয়া সে ইনষ্টিটিউটে নিজ স্বচ্ছন্দ মানস বিহারের সিংহাসন পাতিল। তাহার চক্ষে প্রতিভা, বক্ষে দুর্জয় ফলাফল-তুচ্ছকারী সাহস, কল্পনায় সাহিত্য-প্রীতির সঙ্গে অভিনয়-নেশার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সর্বদেহমনে যৌবনস্বপ্নের পুষ্পিত মদিরতা, চারিদিকে সমরুচি, অনুরাগী বন্ধু-বান্ধবের মেলা—কলিকাতার ঊষর প্রান্তরে বৃন্দাবনলীলার যতখানি অনুস্মৃতি সম্ভব, শিশিরের জীবনে যেন তাহাই ঘটিয়াছিল। শিশির পড়িত, কিন্তু পরীক্ষার পাঠক্রমের সংগে তাহার কোন সংশ্রব ছিল না। নিজের রুচির তাগিদে, খেয়াল-খুশীর যদৃচ্ছ নির্বাচনে তাহার পড়ার বিষয় নিরূপিত হইত। যে কেন্দ্রশাসিত, উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত বৃত্তির অনুশীলনে পরীক্ষায় ভাল করা যায়, তাহা শিশিরের যাযাবর প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। এই সময়ে অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্যের প্রথম মাদকতা শিশির আস্বাদন করিল। শিশিরের রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ যেন কোন স্বভাব-রাজার নিজ রাজত্বে অভিষেক—প্রথম হইতে দিগ্বিজয়ীর আত্মপ্রত্যয় ও জয়-গৌরব লইয়াই তাহার পাদ-প্রদীপের সম্মুখে আবির্ভাব। তাহার এই প্রথম প্রতিভার নবোন্মেষিত অঙ্কুরে কে বারিনিষেক করিয়াছিল জানি না—আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ, সৌভাগ্যক্রমে এখনও জীবিত*—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু হয়ত এই হাতেখড়ির ব্যাপারে কিছুটা কৃতিত্বের অধিকারী বিবেচিত হইতে পারেন। কিন্তু মনে হয় শিশিরের অভিনয়ে জন্মগত অধিকার, নৈসর্গিক নৈপুণ্য। মাছ যেমন স্বচ্ছন্দে জলে সাঁতার দিতে শেখে, পাখী যেমন জন্মের পরেই নীল অনন্ত আকাশে পক্ষ-বিস্তারের শক্তি অর্জন করে, শিশিরও সেইরূপ রঙ্গমঞ্চের মায়ালোকে সহজ বিচরণের অধিকারী হইয়াছিল। তাহার এই তরুণ প্রতিশ্রুতি ছাত্র-জগতের সীমা ছাড়াইয়া পেশাদার থিয়েটারের জগতেও বিস্ময় ও কৌতূহলের সৃষ্টি করে। তাহার 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চাণক্য অংশে যে নব সৃষ্টির দীপ্ত বিকাশ, দৃশ্যসংস্থাপনে ও সাজ-সজ্জা-বিন্যাসে ইতিহাস-জ্ঞান ও বিদগ্ধ রুচির যে বর্ণচ্ছটা তাহা এক অভাবনীয় সম্ভাবনার ইঙ্গিত লইয়া সমস্ত কলারসিক সমাজের চিত্তকে প্রত্যাশায় উৎসুক করিয়াছিল। জ্ঞান-সরস্বতী ও কলালক্ষ্মী উভয়েই এই প্রতিভাধর যুবকের দুই পাশে দাঁড়াইয়া তাহার চিত্ত-অধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজ নিজ আকর্ষণী শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন।

* মন্মথবাবু শিশিরের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই পরলোকগমন করিয়াছেন।

আমাদের দেশে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা ও জনমতের প্রভাব এত বেশী যে সম্পূর্ণ স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তিও নিজ রুচির অবাধ প্রয়োগের অবসর পায় না। শিশিরকেও এম, এ, পাশ করার পর গতানুগতিক ধারারই অনুবর্তন করিতে হইল। ইতিমধ্যে তাহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় পরিবার-প্রতিপালনের দায়িত্ব ও ছোট ছোট ভাইদের তত্ত্বাবধান তাহার উপরে আসিয়া পড়িল। তাহার বাবার ইচ্ছা ছিল তাহাকে হাইকোর্টের উকীল করা এবং সেই উদ্দেশ্যে সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী স্বর্গগত দাশরথি সান্যালের নিকট তাহার শিক্ষানবীশীরও ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু শিশির এই পিতৃ-উদ্দেশ্যের সহিত সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করিয়া ইহাকে ব্যর্থ করিয়া দিল। সে আইন পরীক্ষার সময় আমাদের মেসে ঘুমাইয়া থাকিয়া ও অন্য পরীক্ষার্থীর নিকট হইতে মসীচিহ্নিত প্রশ্ন-পত্র ধার করিয়া পিতাকে দেখাইয়া নিজেকে সুবোধ ও সুশীল পুত্ররূপে প্রতিপন্ন করিল। অবশ্য পিতা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় তাহার নাম না দেখিয়া তাহাকে কিরূপ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন শিশির সে সম্বন্ধে আমাদের নিকটও নীরব ছিল। পিতার পরলোকগমনের পর সমস্ত লুকোচুরির প্রয়োজন ফুরাইল। কিন্তু কিছু একটা না করিলে সংসার চলে না। সুতরাং শিশিরকে বাধ্য হইয়া তাহার সমস্ত রঙ্গীন স্বপ্ন-কল্পনাকে বাস্তবের কঠোর প্রয়োজনের ঘেরাটোপে আচ্ছাদন করিয়া বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরাজী অধ্যাপকের কাজ গ্রহণ করিতে হইল।

অধ্যাপক-জীবন শিশিরের পক্ষে বিশেষ সুখের হয় নাই। তাহার জ্ঞানভাণ্ডার ছিল বিপুল, কিন্তু আমাদের প্রায়শঃ সাহিত্যবোধহীন ছাত্রদের নিকট যে ভাবে ঝিনুকে জ্ঞান পরিবেশন করিতে হয়, তদনুরূপ ধৈর্য তাহার ছিল না। কাব্যরস-আস্বাদনের যে প্রত্যক্ষ উপায়ের সে অধিকারী ছিল, তাহার পরিবর্তে পরোক্ষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তাহার মোটেই রুচিকর ছিল না। অধিকাংশ দিনই সে কলেজের পড়া পূর্ব হইতে পড়িয়া আসিত না—অনুপম কবিতাপাঠ, উপস্থিত বুদ্ধি ও রসিকতার দ্বারা শ্রমশীলতার অভাব পূর্ণ করিতে তাহার বিশেষ অসুবিধা হইত না। এই সময়কার একটা গল্প সে আমাদের নিকট করিয়াছিল। একদিন পড়াইতে পড়াইতে একটা অর্থ-না-জানা অজ্ঞাত শব্দ পাঠের মধ্যে দেখা যায়। শিশির তাহার অভ্যস্ত সপ্রতিভতার সহিত সেই দুরূহ শব্দটিকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে, এমন সময় এক-

হতভাগা ছাত্র সেই শব্দটির অর্থ জানিতে চাহে। শিশির এই অতর্কিত বিপদের সম্মুখীন হইয়া তাহার স্বভাব-সিদ্ধ রসিকতার সাহায্যে আপনাকে উদ্ধার করিল। সেই ছেলেটির দিকে উপহাস-ভরা পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকেই পালটা প্রশ্ন করিল: 'আমাকে কি অভিধানের মত দেখাইতেছে?' (ডু আই লুক লাইক এ ডিকস্নারী?)—'অভিধান খুলিয়া মানে দেখিয়া নাও।' এই উত্তরে ক্লাসের মধ্যে যে হাসির রোল উঠিল তাহারই অন্তরালে অভিনয়-কুশল শিশির অক্ষত মর্যাদা লইয়া সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করিল।

(৩)

অবশেষে ১৯২১ সালে শিশিরের মনে গতানুগতিক ভদ্র জীবনযাত্রা ও প্রতিভার নির্দেশ-অনুসরণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহার অবসান হইল। সে অধ্যাপনা ছাড়িয়া ম্যাডান থিয়েটারের পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা ও অভিনয়-ব্যবস্থাপকের বৃত্তি গ্রহণ করিল। তাহার অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধবই এই গুরুতর সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছিল। প্রথম প্রথম যে একটু উন্নাসিক সমালোচনা হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু প্রতিভার অপূর্ব ক্রমবিকাশ, নব নব সৃষ্টি-মুগ্ধ বিস্ময়ের নিকট নিন্দা ও প্রতিবাদের সে ক্ষীণ কণ্ঠ ডুবিয়া গেল। আজ ভাবি যে শিশির যদি সেদিন তথাকথিত ভদ্রজীবনের মোহে নিজ প্রতিভাকে অস্বীকার করিত, তবে আজ দেশের চারুশিল্পে তাহার যে অবিস্মরণীয় অবদান তাহা কি সে দিতে পারিত? অধ্যাপক শিশির আর দশটা অধ্যাপকের মত দিনগত পাপ ক্ষয় করিয়া বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়া যাইত—অভিনেতাশ্রেষ্ঠ ও বাংলা রঙ্গমঞ্চের নবস্রষ্টা শিশির কালের পাষাণ-ফলকে নিজ নাম চিরতরে মুদ্রিত করিয়াছে। প্রাক্তন যুগের কত খ্যাতিমান পণ্ডিত নিজ নিজ পর্বত-প্রমাণ জ্ঞানের বোঝা লইয়া মহাকালের খেয়াতরীতে স্থান পান নাই। আবার সৃষ্টিধর্মী শিল্পী দুই একটি ছোট কাব্য-গ্রন্থে, রং-তুলিকার দু'একটি টানে, মনের গভীর ভাবদ্যোতক কয়েকটি বাণী ও উচ্চারণ-অঙ্গভঙ্গির সহায়তায় অক্ষয়, কালজয়ী কীর্তির অধিকারী হইয়াছেন।

শিশিরকুমারের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব সত্য সত্যই বাংলা নাট্যকলার নবযুগের তোরণদ্বার উন্মুক্ত করিল। ঠিক এই সময় নাট্যজগতে একটা

সাময়িক অবসাদ ও জীর্ণ প্রথাবদ্ধতার যুগ চলিতেছিল। গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ, অমৃত মিত্র, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি পূর্বযুগের নটশ্রেষ্ঠ-গোষ্ঠী তখন হয় জীবন না হয় রঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর লইয়াছেন। আধুনিক যুগের কাব্যসাহিত্যের তুলনায় নাটক ও অভিনয় অতীত যুগকেই আঁকড়াইয়া ছিল, যুগ-প্রগতির চিহ্ন উহাতে ছিল না। নাট্যাভিনয় ও রঙ্গমঞ্চ-বিন্যাস উনবিংশ শতকের রোমাণ্টিক ভাববিলাস ও কল্পনাপ্রধান অবাস্তবতাকেই আশ্রয় করিয়াছিল। সেই রাজ-রাজড়ার জমকালো পোষাক, সেই স্বদেশ-প্রেম ও সুলভ আদর্শবাদের মাতামাতি, সেই বীররসের অবিচ্ছিন্ন সিংহহুঙ্কার, সেই করুণ রসের শোকোচ্ছ্বাসের আতিশয্য—কণ্ঠদীর্ণকারী হাহাকার ও প্রেক্ষাগৃহ-ভাসানো অশ্রুপ্লাবন—, সেই হাস্যরসের উতরোল অসংযম ও অশালীনতা, সেই বাঁধাধরা ছকে-আঁটা জীবনচিত্রণ—সমস্ত মিলিয়া কেমন যেন একটা স্বপ্নাচ্ছন্নতা, অতিরিক্ত মিষ্ট ভোজনের পর যে অতৃপ্তি জাগে তাহারই অনুরূপ একটা অসঙ্গতিবোধ মনের উপর অপরিচয়ের কুহেলিকা বিস্তার করিত। এ-জীবন যেন আমাদেরই অথচ আমাদের নয়। এ যেন বর্তমানের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক একটা অতীতের স্বপ্ন-রোমন্থন, এ যেন প্রাত্যহিক ঘটনার ছদ্মবেশে একটা অপরিচিত জগতের মায়াবিভ্রম—এই অস্পষ্ট ধারণা আমাদের মনকে সংশয়-দোলায় দোলাইত। নাটক-চিত্রিত জীবনের অবাস্তবতা অভিনয়ের আতিশয্যের দ্বারা আরও ঘনীভূত হইত। অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে শুধু যে স্থান-ব্যবধান থাকিত তাহা নহে, আত্মিক যোগের পথেও একটা দুরতিক্রম্য ব্যবধান থাকিত। প্রধান নট ও প্রধানা নটী আত্মশ্রেষ্ঠতার নিঃসঙ্গ গৌরব-বোধে বন্দী হইয়া সহযোগী অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাহচর্য হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকিত। সাধারণ নট-নটীর হাব-ভাব, অঙ্গ-ভঙ্গী, কটাক্ষ-ইঙ্গিত, নৃত্য-গীত প্রভৃতির মধ্যে এমন একটা স্থূল লালসা-উদ্দীপনার আমন্ত্রণ প্রকট হইয়া উঠিত, যাহা রুচিবান্ দর্শকের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল। ইহার সঙ্গে রুচিহীন শ্রোতৃমণ্ডলীর ইতর হাসি-হুল্লোর, কুৎসিত রসিকতা ও অভদ্র মন্তব্য যুক্ত হইয়া রঙ্গালয়ে একটা কদর্য, কুরুচিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিত। সুতরাং নাট্যালয়ের প্রতি শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি সমাজের যে একটা তীব্র ঘৃণা, একটা ক্ষমাহীন বিরোধিতা ছিল তাহাকে নিতান্ত অকারণ বলা যায় না।

এই অস্বাস্থ্যকর ও জীবনের সহিত শিথিল-সংযুক্ত পরিবেশে শিশিরের নাট্য-প্রতিভা অসাধ্যসাধন করিয়াছে বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। তাহার যাদুদণ্ড-প্রয়োগে এই বিশৃঙ্খলা ও অসঙ্গতির একটা অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সমস্ত রঙ্গমঞ্চে এক নূতন আদর্শ-প্রেরণা ও শৃঙ্খলাবোধ ইহার দূষিত আবহাওয়াকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ও কলাসঙ্গতিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। নাটকের উপস্থাপনাকৌশল ও অভিনয়-পদ্ধতি আমাদিগকে এক নূতন বাস্তবতাবোধের ও জীবনানুস্যূতির সন্ধান দিয়াছে। রঘুবীর, রিজিয়া প্রভৃতি পুরাতনধর্মী রোমান্সকেও শিশির নূতন ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছে, অবিমিশ্র রোমান্সের মধ্যেও যে চিরন্তন ভাব-সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে শিশিরের অভিনয়-প্রতিভা তাহাই আবিষ্কার ও পরিবেশন করিয়াছে। বীরচরিত্র-সুলভ একটানা চেঁচামেচি ও দীর্ঘ-প্রলম্বিত আবেগ-প্রবাহের মধ্যে যে সত্য জীবনানুভূতি আছে, কণ্ঠস্বর ও আবৃত্তিভঙ্গীর সূক্ষ্ম পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই শিশির তাহা প্রমাণিত করিয়াছে। অভিনয়ের পূর্ণ সাফল্য যে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত সমস্ত নরনারীর সমপ্রাণ সহযোগিতার উপর নির্ভর করে তাহাও সে দেখাইয়াছে। যে সাময়িক বক্তা আর যাহারা মঞ্চস্থিত নীরব শ্রোতা উভয়ে মিলিয়াই নাটকের উদ্দেশ্য সাধন করে। কাজেই আগে যে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ষ্টেজ কাঁপাইয়া বক্তৃতা করিত, আর সকলে শূন্য দৃষ্টিতে, ভাবলেশহীন মুখে চারিদিকে তাকাইয়া থাকিত, যেন তাহাদের ইহাতে কোন অংশ নাই—এইরূপ প্রয়োগে দৃশ্যের রস যে জমে না তাহা শিশিরের আবিষ্কার। সপ্ততন্ত্রীবিশিষ্ট বীণায় যেমন যে তারে সুর বাজে তাহার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য তারগুলিতে শিহরণ জাগে ও সমস্ত মিলিয়া একটা বিচিত্র-জটিল ঐকতানকম্পন সৃষ্ট হয়, তেমনি অভিনয়-ক্ষেত্রেও একের ভাব অন্যের মুখদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া ও নানাবিধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া এক পরস্পর-নির্ভর, অথচ বহুমুখী ভাবসমবায় গঠিত করে। দৃশ্যসজ্জায় ও প্রসাধন-নৈপুণ্যেও শিশিরের রঙ্গমঞ্চ ব্যবস্থাপনার এক উন্নততর মানে পৌঁছিয়াছে। সব দিক দিয়া অভিনয়কে আধুনিক যুগ ও আধুনিক মানুষের চিত্তবৃত্তি ও বাস্তবতাবোধের উপযোগী করিয়া শিশির-প্রবর্তিত নাট্যকলা মঞ্চের সহিত জীবনের ব্যবধানকে ঘুচাইয়াছে; অসাধারণ পরিবেশের মধ্যেও তাহার অভিনয় জীবনের অকৃত্রিম সুর ধ্বনিত করিয়াছে।

(৪)

কিন্তু কেবল মঞ্চব্যবস্থাপনার নৈপুণ্যে প্রতিভার পরিচয় মিলে না—রূপসজ্জাকার ও নাট্যপরিচালকই ইহার পক্ষে যথেষ্ট। প্রতিভার আসল পরিচয় হইল অভিনব সৃষ্টির দ্বারা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের সৃষ্টি, নাট্যকারের অবচেতন মনের নিগূঢ় ভাবকল্পনাকে মূর্ত করিয়া তোলা। শিশিরের অভিনয়-প্রতিভা এই নবরূপায়ণের অপূর্ব দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র শিশিরের অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া বারবার স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা চরিত্র-সৃষ্টির সময় চরিত্রের এত গভীরে অবতরণ, এত সূক্ষ্ম ও জীবন্তভাবে চরিত্রের প্রতিটি ভাবস্পন্দন, অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাত কল্পনা করেন নাই। নাট্যকারের সৃষ্টি অভিনেতার রূপায়ণে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এমন অনেক জটিল ও রহস্যময় চরিত্র আছে যাহাদের সম্বন্ধে নাট্যকার নিজেও সম্পূর্ণ জ্ঞানের দাবী করিতে পারেন না, যাহারা তাঁহাদের চোখেও খানিক দুর্বোধ্যতার কুহেলিকায় আবৃত থাকে। শেকস্‌পীয়ারের হ্যামলেট বা ইয়াগো বা লেডি ম্যাকবেথের চরিত্র লইয়া সমালোচক-মহলে মতভেদের আলোড়ন এখনও স্তব্ধ হয় নাই, লেখকের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা এখনও দূরীভূত হয় নাই। এই অনিশ্চিত অবস্থায় প্রতিভাশালী অভিনেতার রূপায়ন যতটা আলোকপাত করে, অসংখ্য সমালোচকের পরস্পর-বিরোধী তর্কজালবিস্তার ততটা পারে না। প্রত্যক্ষ দর্শনের স্বচ্ছতা শত অনুমানের পরোক্ষ উপলব্ধিকে হঠাইয়া নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। সহস্র সম্ভাবিত ছবির মধ্যে একটি চোখে-দেখা ছবি আমাদের মনে অনপনেয় রেখায় অঙ্কিত হইয়া যায়। শিশিরের অভিনয়-পরম্পরা যেন নানাজাতীয় চরিত্রের একটি প্রামাণ্য বর্ণোজ্জ্বল চিত্রশালা। এমন কি জীবনও আমাদের কাছে তাহার অন্তিম রহস্যের, তাহার নিগূঢ়তম সত্যের যে অংশটুকু ঢাকিয়া রাখে, শ্রেষ্ঠ অভিনয় সেটুকুকেও আমাদের সামনে মেলিয়া ধরে। কাজেই অভিনয়-প্রতিভা কবি-কল্পনা ও জীবনসত্যের গভীরতম-স্তরশায়ী প্রাণরহস্যের চরম ইঙ্গিতটুকুও উদ্‌ঘাটিত করিতে পারে বলিয়াই শিল্পকলার মধ্যে ইহার স্থান এত উচ্চে।

শিশিরের অভিনয় যে কেবল স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত তাহা নয়, উহা স্বভাবের পিছনকার রহস্যলোকের উদ্‌ঘাটন। তাহার যে কোন অভিনয়

হইতেই ইহা উদাহৃত করা যায়। তাহার আলমগীর নির্মম, কূটকৌশলী, আত্মগোপনদক্ষ মোগল সম্রাটের এক অপূর্ব প্রতিকৃতি। তাহার লৌহবর্মের পিছনে যে আবেগ-স্পন্দিত, কোমল রক্তমাংসে গড়া, হৃদয়-নিঃসঙ্গতার ছদ্মবেশের মধ্যে সহানুভূতির কাঙ্গাল প্রকৃতি লুকান ছিল তাহা কোন ঐতিহাসিক আমাদের বুঝাইতে পারেন নাই। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ইহার ক্ষীণ ইঙ্গিত দিয়াছেন, কিন্তু নটশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমারই ইহাকে পরিপূর্ণ, সর্বজনসংবেদ্য রূপ দিয়াছেন—দূর ইতিহাসের আলো-ছায়ায় আবৃত, নাট্য-কলায় ঈষৎ প্রতিভাত, রহস্যময় চরিত্রটি একেবারে আমাদের কাছের মানুষ, আমাদের সহজ উপলব্ধির বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয় চিরপ্রহেলিকাময় আলমগীরের ইহাই যেন সত্য প্রতিকৃতি, যেন অন্তরলোকের যে গোপন চাবি-কাঠির দ্বারা তাহার মনের কলকব্জার জটিল প্যাঁচ খোলা যায়, তাহাই শিশিরকুমার আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। তাহার 'সীতা'-নাটকে কেবল যে পৌরাণিক জগতের রূপোজ্জ্বল, সম্পূর্ণ পরিবেশ ও যথাযথ ভাবসমন্বিত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে কেবল তাহাই নহে, সার্বভৌম, যুগনিরপেক্ষ মানবিক স্বরটিও ধ্বনিত হইয়াছে। পৌরাণিক পরিবেশকে নিখুঁতভাবে বজায় রাখিয়া তাহার মধ্যে সর্বকালীন মানব-হৃদয়ের আর্তি-প্রকাশ-শক্তিই শিশিরপ্রতিভার পরিচয়। রামের মর্মবেদনা যে কেবল কোন সুদূর অতীতের এক বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থায় ও নীতি-নিগড়ে আবদ্ধ দেব-মানবের নহে, তাহা যে সকল দেশের, সকল কালের শোক-দগ্ধ মানবাত্মার অসংবরণীয় রোদনাবেগ তাহা শিশিরের কণ্ঠে শাশ্বত অভিব্যক্তি পাইয়াছে।

সামাজিক নাটকেও এই প্রতিভার দীপ্ত স্পর্শ সমভাবেই বর্তমান। জীবানন্দ, রাসবিহারী, কবি মধুসূদন—এই সমস্ত চরিত্র আমাদের নিকট একান্ত সজীব ও অন্তর-রহস্যের আবরণ-উন্মোচনে ভাস্বর। জীবানন্দ কতখানি পাষণ্ড ও কতটা হৃদয়বান, তাহার মধ্যে নীচ ও উচ্চ প্রবৃত্তি কি পরিমাণে মিশ্রিত, অত্যাচারী জমিদার ও ব্যথানিপীড়িত মানবসত্তার পরস্পর-বিরোধী অংশ তাহার মধ্যে কি অপরূপ ঐক্যে সম্মিলিত, দুষ্ক্রিয়াসক্ত বিলাসী ও ট্রাজেডির উন্নত-চরিত্র নায়ক কেমন করিয়া তাহার মধ্যে পাশা-পাশি অবস্থিত এই জটিল দ্বৈততত্ত্ব—যাহা হাজার বার বই পড়িয়া ও সহস্র প্রকারের সূক্ষ্ম সমালোচনার সাহায্যেও সুস্পষ্ট হইত না—শিশিরের অভিনয়ে

খোলা বইএর পাতার মত সহজবোধ্য হইয়াছে। জীবানন্দের পরিবর্তন যে অতর্কিত ও অবিশ্বাস্য নহে, ধীরে ধীরে তুষের আগুনে পুড়িয়া তাহার অন্তর বিশুদ্ধ হইয়াছে, রায় মহাশয়ের ন্যায় ক্ষুরধার বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন ও চক্রান্তকুশল সমাজপতির বিরুদ্ধে, নিজে অপরাধের সহকারী রূপে জেলে যাইবার আশঙ্কার সম্মুখীন হইয়াও, সে যে তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া দাঁড়াইয়াছে—শিশিরের অভিনীত জীবানন্দকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা আমাদের নিকট সূর্যালোকবৎ স্পষ্ট হইয়া উঠে। রাসবিহারীকে কেহ কেহ অতিমাত্রায় স্থূল বলিয়া অনুভব করিয়াছেন ও চরিত্রের এবংবিধ রূপায়ণে শিশিরের অভিনয়-শক্তির আপেক্ষিক অভাবই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু হয়ত তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই যে তাহার বাহিরের মার্জিত রুচি ও সংস্কৃতি-ধর্মবোধের নীচে তাহার এই স্থূলতা দেখানই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সে ব্রাহ্মধর্মের নামে যতই সূক্ষ্ম ধর্মবোধ ও রুচি-বৈদগ্ধ্যের ভান করুক না কেন আসলে সে একজন অর্ধ-শিক্ষিত, গ্রাম্য পাটোয়ারির পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তি। তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ ও বাহিরের আচরণের সমস্ত ভব্যতা ও ধোলাই-করা শুভ্রতার পিছন হইতে বর্বরত্বের কালিমা উঁকি মারিতেছে। দয়ালের প্রতি তাহার আচরণ, এমন কি বিলাসের প্রতি তাহার রূঢ় ভর্ৎসনা-বাক্য ও নিজ জাতি সম্বন্ধে হীনম্মন্যতা—সে ত এই স্থূলত্বেরই পরিচয়। ভণ্ড মাত্রেই স্থূল; পেক্‌সনিফ, টারটাফ প্রভৃতি বিশ্বসাহিত্যের আদর্শস্থানীয় ভণ্ড বাহ্য বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলময়তার অন্তরালে এই প্রকৃতিগত ইতরতাকেই প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। এই গোপনসংরক্ষিত ইতরতার বহিঃপ্রকাশই হাস্যরস-সৃষ্টির হেতু হইয়াছে। যদি কেহ অজ্ঞাতসারে ভণ্ডামি ও আত্ম শ্রেষ্ঠত্ববোধের অভিমান পোষণ করে—যেমন মেরিডিথের ইগোইষ্ট উপন্যাসে স্যার উইলোবি প্যাটার্ণ—তবে সেইরূপ চরিত্র আমাদের সমবেদনার আংশিক উদ্রেক করিতে পারে ও তাহার চরিত্রে খানিকটা গৌরব লগ্ন হইয়া থাকে। শিশির তাহার অভিনয়ে এই স্থূলতাকেই সূক্ষ্মভাবে প্রকট করিয়াছে। হয়ত কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা জানি না—তাহার চেয়ারে বসিবার ভংগী, তাহার দুগ্ধ-শুভ্র পরিচ্ছদের মাঝে মধ্যে যেন বিস্মৃতিবশে হাঁটুর উপরে উঠিবার অশালীন প্রবণতা—এই জাতীয় দুই একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে শিশির এই চরিত্রটির প্রকৃত রূপ ফুটাইয়াছে।

সাধারণ ব্যক্তির জীবন যদি দুর্বোধ্য হয়, তবে কবির জীবন আরও কত রহস্যময়! বিশেষত মধুসূদনের মত দ্বৈত-উপাদান-সংগঠিত, বিপরীত রুচি ও আদর্শের আকর্ষণে অস্থির চরিত্রের ব্যক্তিত্ব-রহস্য ভেদ করা প্রায় অসম্ভব মনে হয়। মধুসূদন একাধারে প্রাচীন ও উগ্র আধুনিকতাপন্থী, হ্যাটকোট-পরা সাহেব ও প্রচ্ছন্ন-টিকিভূষিত ব্রাহ্মণপণ্ডিত, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও অসহায় পরনির্ভরতার অদ্ভুত সমাবেশ। এ হেন দুর্জ্ঞেয়, দ্বিধা-বিভক্ত ব্যক্তিত্বকে শিশির আশ্চর্যরূপে পরিস্ফুট করিয়াছে। তিলোত্তমা-সম্ভব, ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় কাব্য এক সংগে লেখার মধ্যে এই বিভক্ত সত্তার বহুমুখীন শক্তি ও প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ। যখন কবি পণ্ডিতদের মুখে মুখে কবিতার ছত্রগুলি বলিয়া যাইতেছে, তখন তাহার অস্থির উদভ্রান্ত পদচারণা যেন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। এই এক আঁচড়েই কবির সমুদ্রতরঙ্গবৎ বিক্ষুব্ধ-চঞ্চল, বাস্তবের তটভূমিতে অশান্ত—অধীরভাবে আছড়াইয়া-পড়া অন্তর-প্রকৃতি কি অপূর্বভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে! মধুসূদনের অন্তর-সমুদ্রের একটা ঢেউ শিশিরের অভিনয়-ছন্দে ধরা পড়িয়া দর্শকের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শিশিরের চাণক্যের অভিনয়—তাহার অভিনয়-প্রতিভার একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে সর্ব সম্মত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। আত্রেয়ীর পুনঃপ্রাপ্তির দৃশ্যে নাট্যকার চাণক্যের অন্তর্জগতে যে তুমুল ভূমিকম্প-রূপ বিপর্যয়ের কল্পনা করিয়াছেন, আবেগের শ্বাসরোধী আতিশয্যে তাহাকে যে জীবন-মৃত্যুর সন্ধি-স্থলে দোলায়িত করিয়াছেন, তাহার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে যে স্খলিত উক্তির সমাবেশে তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের বিপুলতার ইঙ্গিত দিয়াছেন, শিশিরের অপূর্ব অভিনয়ে তাহা সমস্ত প্রত্যক্ষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কবি-কল্পনার সুদূর নভোচারী ধূমকেতু যেন মাটির জগতে নামিয়া আসিয়া, মানুষের ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া নিজ নিখুঁত প্রতিচ্ছবি নিক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু আমি আর একটি দৃশ্যের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। নন্দের হত্যার পর চাণক্য যখন রক্তরঞ্জিত হস্তে তাহার অসংবদ্ধ শিখাকে বাঁধিতেছে, তখন তাহার মুখে অস্বাভাবিক উল্লাসের কি একটা বিকৃত, কুঞ্চিত-কুটিল ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে! এ আনন্দ যেন ফেলিবারও নয়, পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবারও নয়—চাণক্যপ্রকৃতির এক অংশ যাহা গভীর তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতেছে

অপর অংশ তাহার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানাইতেছে। বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যে বিষামৃতের সংমিশ্রণ, তপ্তইক্ষুচর্বণবৎ যে অস্বস্তিকর আনন্দের কথা বলিয়াছেন, চাণক্যের মুখে যেন তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এই দৃশ্যের চরম অভিব্যক্তি রূপে শিশির নাট্যকারের অপরিকল্পিত আর একটি অঙ্গ-সঞ্চালনের আশ্রয় লইয়াছে। বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ চাণক্য, পৃথিবীর সকল আনন্দ হইতে নির্বাসিত চাণক্য, কূটনীতির পাকে সমগ্র প্রাণশক্তিকে গুটাইয়া-রাখা চাণক্য, আনন্দ-বিহ্বল স্কুলের ছেলের ন্যায় তিনটি লম্ফ প্রদানের দ্বারা তাহার অন্তর-নিরুদ্ধ উদ্বৃত্ত আবেগকে মুক্তি দিয়াছে! এই তিনটি লাফ চাণক্যের স্বাভাবিক চরিত্রের কত বিসদৃশ, অথচ বর্তমান মুহূর্তে কত অনিবার্যরূপে সুসঙ্গত। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, রঞ্জন-রশ্মির ন্যায় অস্থিচর্মভেদী নট-প্রতিভাই শিশিরকে এই আঙ্গিক-প্রচেষ্টার রহস্যটি শিখাইয়াছে!

(৫)

ক্ষুদ্র বুদ্ধির ক্ষুদ্রতর মুকুরে প্রতিভা-রহস্যকে প্রতিবিম্বিত করার চেষ্টায় আর বেশীদূর অগ্রসর না হওয়াই ভাল। শিশিরের ব্যক্তিগত চরিত্র ও তাহার নাট্যাদর্শ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপ-সংহার করিব। ভগবান শিশিরকে রাজোচিত সৌন্দর্য ও উদার, প্রশস্ত হৃদয় দিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন—সে ভগবদ্দত্ত রাজদণ্ড হাতে লইয়াই জন্মিয়াছিল। এমন সহজ, অসঙ্কোচ, প্রকৃতি-চিহ্নিত রাজ-অধিকার খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। সে যেন হুকুম করিতেই আসিয়াছিল, অন্য লোকে স্বেচ্ছায়, সানন্দে সেই হুকুম পালন করিয়াই কৃতার্থ। যেমন থিয়েটারে, তেমনি সর্বত্রই সে ছিল বড়বাবু। অন্য লোকে অজস্র টাকা খরচ করিয়া যাহা করিতে পারিত না শিশির তাহার স্বভাব-মধুর আচরণে, প্রতিভার অবর্ণনীয় আকর্ষণী-শক্তিতে একটি কথাতেই তাহা নিষ্পন্ন করিত। রঙ্গালয়-পরিচালনার গুরু ও বহুমুখী দায়িত্ব, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান ও নিজের অভিনয় সবই সে অবলীলাক্রমে নিজের বিশাল স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিল। হয়ত এত গুরুভার-বহন একজন লোকের সাধ্যাতীত। সেইজন্য শেষ পর্যন্ত তাহার মত লোকোত্তর প্রতিভাকে রঙ্গমঞ্চ হইতে

বিদায় লইতে হইয়াছিল। ধনী পরিচালক ও ছায়া-চিত্রের সুলভ আনন্দ-বিধানের প্রতিযোগিতায় নিঃসম্বল প্রতিভাশালী শিল্পী কতদিন টিকিয়া থাকিতে পারে? এই অসম যুদ্ধে তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল, কিন্তু এ পরাজয় শুধু কি তাহার? ইহা দেশের বিদগ্ধ রুচি শিল্পের উন্নত মান, সস্তা চটকদারী আমোদ-প্রকরণের দ্বারা স্থানচ্যুত গৌরবময় ঐতিহ্যের, মেকির নিকট খাঁটির পরাজয়। এ পরাজয়ের ফল জাতীয় জীবনের উপর সুদূর-প্রসারী।

অনেকে মনে করেন যে, শিশিরকে এত জটিল দায়িত্বের মধ্যে জড়াইয়া না পড়িয়া নিছক অভিনয়-শিল্প-সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করিতে হইত, ব্যবসাদারীর ফাঁদে পা না দিয়া কলা-চর্চাতেই সীমাবদ্ধ থাকিতে হইত। তাহার তীক্ষ্ণ আত্মসম্মানবোধ ও দুর্জয় স্বাধীনতা-স্পৃহাই তাহাকে এই নিরাপদ, সর্বপ্রকার দায়িত্বমুক্ত পথের অনুসরণে বাধা দিয়াছে। তাহার অভিনয়-জীবনের প্রারম্ভে ম্যাডান কোম্পানির বাঁধা চাকরি তাহার পোষায় নাই। আবার জীবন-সায়াহ্নে যখন অস্তগামী প্রতিভা-সূর্যের চারিদিকে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের মেঘপুঞ্জ ঘনীভূত হইয়াছে, তখনও বাঙলা সরকারের নাট্য-একাডেমির সংগে সংশ্লিষ্ট থাকিবার প্রস্তাবও সে বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। হয়ত যে আপোষী মনোভাব সংসার-সাফল্যের একটা প্রধান হেতু, তাহার একরোখা মেজাজের সংগে তাহার কোনই সঙ্গতি ছিল না। হয়ত অভিমান-প্রবণতার বাষ্প তাহার বাস্তব দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। যাঁহারা এইরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহারা যে সাংসারিক জ্ঞানে বিজ্ঞ তাহা অস্বীকার না করিয়াও বলা যায় যে তাঁহারা প্রতিভা-রহস্যের মর্মজ্ঞ নহেন। উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়াকে দিয়া ছ্যাকড়া-গাড়ী টানান যায় না—শকটের নিয়মিত অগ্রগতি যাঁহাদের কাম্য, তাঁহারা উচ্চৈঃশ্রবার গ্রীবা-ভঙ্গাভিরাম, খেয়াল-নিয়ন্ত্রিত, কখনও উর্ধশ্বাস, কখনও হঠাৎ-থামিয়া-পড়া চাল-চলনকে পছন্দ করিবেন না ইহা স্বাভাবিক। তাই বলিয়া সব উচ্চৈঃশ্রবাই ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়াতে পরিণত হউক এ কামনাও কেহ করিবেন না। আসল কথা শিশিরের উদ্দেশ্য ছিল শুধু নিজের অভিনয়-শক্তির চূড়ান্ত বিকাশ নহে, সমগ্র নাট্যকলার আরও ব্যাপকতর, সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন। সে চাহিয়াছিল রঙ্গমঞ্চকে নূতন রূপ দিবার, নূতন নূতন

পরীক্ষার দ্বারা উহার প্রাণ-শক্তিকে বিকশিত করিবার জন্য অবাধ স্বাধীনতা। একটা নাটকের মঞ্চারোহণ-ব্যবস্থাকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও অভিনব-ভাবকেন্দ্রিক করিতে গেলে শুধু প্রধান অভিনেতার অংশটি চমৎকারভাবে রূপায়িত করিলে চলিবে না। পাত্র-পাত্রী-নির্বাচন, দৃশ্য-সন্নিবেশ, সময় সময় দর্শকের রুচিকে আঘাত করিবার দুঃসাহস, নাটকের ভাবানুযায়ী পরিবর্তন—সমস্ত কিছুর সম্বন্ধেই স্বাধীন কর্তৃত্ব থাকা চাই। স্বত্বাধিকারীর লক্ষ্য থাকিবে প্রধানতঃ টিকেট ঘরের জানালার উপর; তাঁহার প্রিয় নট-নটীকে ইচ্ছানুযায়ী অংশ দিতে হইবে; দর্শকের স্থূলতম রুচিকেও প্রশ্রয় দিতে হইবে; কোনরূপ অনিশ্চয় বা বিপদের ঝুঁকি সর্বথা বর্জন করিতে হইবে। এইরূপ বাঁধা-ধরা সর্তে শিশির-প্রতিভা কাজ করিতে প্রস্তুত ছিল না। শিল্পের জন্যই সে পরিচালনার স্বাধীনতা চাহিয়াছিল। যখনই তাহার আশঙ্কা হইয়াছে যে বাঁধা বেতনের নিরাপদ, আরামদায়ক আশ্রয়ে তাহার উচ্চতর বিবেকবুদ্ধি ব্যাহত হইবে, যখনই সে অনুভব করিয়াছে যে তাহাকে স্বাচ্ছন্দ্য-সচ্ছলতার ঘুষ দিয়া তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শিল্পকে উপবাস-শীর্ণ রাখার ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তখনই তাহার পথ-নির্বাচনে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও খেতাব সে তাহার উচ্চতর আদর্শের প্রতিকূল বিবেচনায় অবহেলায় ত্যাগ করিয়া শেষ জীবনের অভিমান-দুর্বিষহ দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়াছে। আমাদের এই মেরুদণ্ডহীন দেশে, ক্ষমতার চরণতলে অপ্রতিবাদ মাথা নোয়াইতে অতিব্যগ্র এই সমাজে, এই প্রখর, অনমনীয় আত্মসম্মানজ্ঞানের নৈতিক মূল্যটাও কি উপেক্ষার বিষয়?

শিশির তাহার দোষ-গুণ, শক্তি-দুর্বলতা লইয়া আজ আমাদের নিকট হইতে চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। সে মধুসূদনের ন্যায় বেহিসাবী ছিল ও ঈশ্বর গুপ্তের ন্যায় মেকীর চিরশত্রু ছিল। দেশবাসীর নিকট তাহার অনেক আশা, অনেক দাবী ছিল। দেশ যে তাহার প্রতিভার প্রতি উদাসীন ছিল না তাহা সে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছে। তবে প্রতিভার সৃষ্টিশক্তির ন্যায় তাহার আশাও অপরিমিত—সেই জন্য তাহার অনেক আশাই অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। জাতীয় নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠা, নাটক ও অভিনয়ের সাহায্যে জাতীয় জীবনকে নূতন করিয়া গঠিত করবার স্বপ্ন, জাতির বিচ্ছিন্ন আকাঙ্ক্ষা, কর্মশক্তি ও ভাবপ্রেরণাকে একটা কেন্দ্রীয়

সংহত রূপ দিবার কল্পনা তাহার শেষ জীবনের একান্ত কাম্য আদর্শ ছিল। সে ভগবানের পরিবর্তে এই সর্বাঙ্গসুন্দরী, সর্বালঙ্কারভূষিতা, প্রাণময়ী, প্রেরণা-রূপিণী কলালক্ষ্মীর মূর্তি ধ্যান করিয়া অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। সে মর্মর মূর্তি, স্মারক স্তম্ভের কাঙ্গাল ছিল না; যদি তাহার স্মৃতি-রক্ষায় উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হয় তবে তাহার এই চিরপোষিত কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে হইবে। আজ শিশিরকুমারের অগণিত গুণমুগ্ধ অনুরাগীকে এই কর্তব্য-পালনের আহ্বান জানাইয়া, জাতির শোকাশ্রুর সহিত আমার ব্যক্তিগত শোকাশ্রু মিশাইয়া তাহার স্মৃতির প্রতি আমার শেষ বন্ধুকৃত্য সম্পাদনের প্রয়াস পাইলাম।